১ম বর্ষ, | মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প উপন্যাস ইত্যাদি।

আরাধনা।

(কুমারী প্রফুল্ল নলিনী সরস্বতী)

"মা, মা, তুমিই যে আমার সব!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জ্যোৎস্না এই কথা কয়টি বলিয়া আসন্ন-মৃত্যু দীনশয্যা-শায়িনী সত্যবতীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অতি কষ্টে রোগশীর্ণ অবশ প্রায় হস্তদুটি তুলিয়া জননী বিধাতার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি মা? ভাবনা কি? অনাথের নাথ বিশ্বনাথ আছেন। তাঁর চরণে প্রাণ রাখিস্। আমি গেলাম,—তাঁর দুটি পা ধ'রে থাকিস্। কোন ভয় নাই।"

জ্যোৎস্না জলে ভাসা বড় বড় চোক দুটি তুলিয়া মার মুখের পানে চাহিল। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "সেই আশীর্ব্বাদই আজ কর মা! বিশ্বনাথের চরণেই যেন প্রাণ রাখ্‌তে পারি। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! অনাথাকে তোমার চরণে স্থান দিও!"

মা নীরবে জলভরা চোখে কন্যার মুখে স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল। নিষ্প্রভ দৃষ্টি কন্যার মুখপানেই নিবদ্ধ রহিল!

মাতার মৃত্যুর পর জ্যোৎস্না শ্বশুর গৃহে গেল।

* * * * *

মেয়েকে লইয়া সত্যবতী অতি অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামী দরিদ্র ছিলেন। অভিভাবক এমন আর কেহ ছিল না যে, বিধবাকে আশ্রয় দেয়।

পরের বাড়ী খাটিয়া সত্যবতী মেয়েটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না মেয়েটি অতি শান্ত স্নিগ্ধ-স্বভাবা এবং সুন্দরী।

চুঁচুঁড়ার একটি অপরিষ্কার গলিতে সত্যবতীর ছোট ভাঙ্গা একতালা একখানি ভাড়াটে বাড়ী, দুইটি মাত্র ছোট ঘর তাহাতে ছিল।

জ্যোৎস্নার অর্দ্ধ-বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর মুখখানিতে বিশ্বশিল্পী তাঁহার নিপুণ তুলিকায় এমন একটি সকরুণ দীনভাব আঁকিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিলে সকলেরই বুক ভরিয়া করুণার উচ্ছ্বাস উঠিত।

জ্যোৎস্নার বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর, তখন চুঁচুঁড়ার একজন বেশ বড় গৃহস্থের ঘরে জ্যোৎস্নার বিবাহ হইয়াছিল।

দুঃখিনী জননীর তাপদগ্ধ হৃদয়ের আকুল আবেদনে অস্থির হইয়া বুঝি স্বয়ং প্রজাপতি আসিয়া জ্যোৎস্নার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, নতুবা রিক্ত-সম্বলা অনাথা বিধবার মেয়ের অট্টালিকাবাসী অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে বিবাহ হওয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সহজ নহে। সত্যবতীর জামাতার নাম ছিল, ভূপতিভূষণ।

ভূপতিভূষণ যে দিন জন্মিয়াছিল, সেই দিনই একজন জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, চব্বিশ বৎসর বয়সে সে হয় সংসারত্যাগী, নয় রাজ্যেশ্বর হইবে। ভূপতি শিবনাথের সবে ধন নীলমণি—দশটি ছেলের মধ্যে আছে কেবল ভূপতিভূষণ।

জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন,—ভূপতি হয় সংসারত্যাগী, নয় রাজ্যেশ্বর হইবে। স্নেহময় পিতামাতার দ্বিতীয় আশা অপেক্ষা প্রথম আশঙ্কাটাই সর্ব্বদা মনে উঠিত।

ভূপতি বড় হইয়া উঠিল। পিতামাতা ভাবিলেন, একটি ভাল ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা বয়স্থা কন্যা দেখিয়া ভূপতির বিবাহ দিবেন। কে জানে যদি সেই বাঁধনে ভূপতিকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। 'রাজ্যেশ্বরে' কাজ নাই। ভূপতি কোনও মতে সংসারে থাকিলেই যে তাঁরা বাঁচেন।

অনেক বড় ঘরের ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিল। সহসা একদিন ভূপতি বলিল, "যদি জ্যোৎস্নাকে বিবাহ করিতে পারে, তবেই বিবাহ করিবে। নতুবা বিবাহ করিবেই না।"

ভূপতি নিজের পছন্দকরা কন্যা বিবাহ করিতে যায়, তবে আর কি? পিতা মাতা আনন্দে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ভূপতির বিবাহ দিলেন।

* * * * *

পূজার ছুটিতে ভূপতিভূষণ দূরে কোনও পাহাড়ে বেড়াইতে গেল। সঙ্গে যে লোক ছিল, এক মাস পরে সে একদিন সহসা আসিয়া সংবাদ দিল, কলেরায় সেই দূর নির্জ্জন পাহাড় অঞ্চলে ভূপতির মৃত্যু হইয়াছে!

ইহার অল্প পরেই দারুণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া সত্যবতীও অভাগী কন্যাকে ছাড়িয়া গেলেন। বৈধব্যের পর মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না মাতার গৃহেই ছিল। মাতার মৃত্যুর পর বিধবা বধূ প্রথম শ্বশুরালয়ে গেল।

জ্যোৎস্না একান্তচিত্তে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত হইল। সংসারে আর তার কি অবলম্বন আছে? এ সংসারে তার দেবতা যিনি ছিলেন, তিনি সংসারে তাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন সেই দেবতার দেবতা যাঁরা, তাঁদের সেবা করিয়াই সে তার দেবতার আরাধনা করিবে। দেবতা কি তুষ্ট হইয়া তাকে স্মরণ করিবেন না? একটি দিনের তরে মনে করিয়া তাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন না?

তাহার ছোট বুকখানির ভিতর যে আগুন জ্বলিত, জ্যোৎস্না বড় সাবধানে তাহা চাপিয়া রাখিত, কাহাকেও দেখিতে দিত না। শান্তভাবে দিন ভরিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর ও পরিজনগণের সেবা করিত, দিনান্তে প্রদীপ লইয়া তুলসী তলায় যাইত। সেখানে বসিয়া ক্ষুদ্র কর দুটি জোড় করিয়া অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিত— "দেবতা! আমার দেবতা! নিজে গেলে ত আমাকে কেন লইয়া গেলে না? কতদিন আর ফেলিয়া রাখিবে? এই তুলসী তলাতে তুমিই আমার নারায়ণ! তুমিই আমার বিশ্বনাথ! তোমার উপরে আর কোনও দেবতা যে আমার নাই! কতদিনে দয়া করিবে? কতদিনে তোমার পায়ে স্থান দিবে? বল—বল! একটিবার বল! একটিবার আমায় দেখা দেও!"

শোকসন্তপ্ত শিবনাথ জীবনের বাকী দিন কয়টা কাশীতে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে কাটাইবার সংকল্প করিলেন। গৃহিণী বলিলেন—"আমি তবে আর এখানে থাকিব কি করিতে? চল আমিও কাশীবাস করিগে।"

আর জ্যোৎস্না,—সেও ভাবিল, কাশী যাই, সেখানে যদি বিশ্বনাথ দয়া করেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে—স্বামীর চরণে স্থান পাইব।

যথাসময়ে শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে জ্যোৎস্নাও কাশীধামে আসিল।

* * * * *

শরতের শেষ সন্ধ্যায় কেদারঘাটের অনতিদূরে দ্বিতল গৃহের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না ভাবিতেছিল, "কই বিশ্বনাথ ত আমার মনোবাঞ্ছা এখনও পূর্ণ করিলেন না?"

সেই সময় গঙ্গাতীর দিয়া একটি সন্ন্যাসী গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল— "কলপত মোরি হিয়া, ম্যায় নিশিদিন ঢুঁড় আপন পিয়া"—জ্যোৎস্না ভাবিল— সন্ন্যাসী কি তাহারই মনের কথা বলিতেছে?

মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার মনে হইত—তার স্বামী মরেন নাই। আর যদি সত্যই মরিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাকে দেখা দিবেন,—দেবতা যেমন মানুষকে শরীর ধরিয়া দেখা দেন! তিনি যে জ্যোৎস্নাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া ত তিনি থাকিতে পারিবেন না! আজ নয় কাল—একদিন তিনি দেখা দিবেনই। তাকে সাথে লইয়া যাইবেনই।

* * * * *

বেলা দ্বিপ্রহর—বিশ্বনাথের মন্দিরে লোকের ভিড় কিছু কমিয়াছে। যারা পূজা করিতে আসিয়াছিল, পূজা করিয়া প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। একটি তরুণ-বয়স্কা বিধবা তখনও বিশ্বনাথের পূজা করিতেছিল। শুভ্রবসনা নিরাভরণা তরুণী—যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বসিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে বিশ্বনাথের আরাধনা করিতেছে! আহা! এই অতি সুন্দর করুণ পূত দৃশ্য জগতে আর কোথাও কি দেখা যায়? তার অনতিদূরে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন,—বিধবার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী একবার সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—বিধবা তখনও ধ্যাননিরতা,—চক্ষু ঈষৎ নমিত, শুভ্র দুকুলের ভিতর হইতে তাহার বিশৃঙ্খল মুক্ত কেশদাম অল্প অল্প দেখা যাইতেছে; কণ্ঠে অঞ্চল জড়িত,—যুগ্ম কর বক্ষের উপর রক্ষিত,—যেন মূর্ত্তিমতী আরাধনা আসিয়া দেবতার চরণতলে বসিয়াছেন!

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া অতৃপ্তনয়নে তাহাকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল,—গভীর নিশ্বাসে মধ্যে মধ্যে বিশাল বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পূজা শেষ হইল, বিধবা গললগ্নীকৃতবাসে বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রুর সহিত বিশ্বনাথের চরণে আপনার সমস্ত বেদনা ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করিল।

বিধবা মন্দিরের বাহির হইল, সন্ন্যাসীও তাহার পশ্চাতে চলিলেন। মধ্যপথে আসিয়া সন্ন্যাসী ডাকিল—"জ্যোৎস্না"—

বিধবা স্তম্ভিত—বিস্মিতা! চমকিয়া পিছন দিকে চাহিল,—একি! এ কি স্বপ্ন! একি মোহের ভ্রান্তি! না—না—এযে সত্যই তার দেবতা—এ যে তার চিরপরিচিত চিরআকাঙ্ক্ষিত চিরআরাধিত সেই দেবতা—ভূপতিভূষণ! তবে কি সত্যই তার আরাধনায় পরলোক হইতে শরীর ধরিয়া তার দেবতা আসিয়া তাকে দেখা দিলেন। সত্যই কি এতদিনে বিশ্বনাথ তাকে দয়া করিলেন! জ্যোৎস্নার

বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল! যদি একটু আন্‌মনা হয়, যদি চোখের পলক পড়ে,—তবে যদি আর না দেখিতে পায়? তাই একান্তমনে নির্ণিমেষ নয়নে সে চাহিয়া রহিল!

* * * * *

ভূপতি ভূষণ জানাইল—সে মরে নাই, মৃতবৎ অসাড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গের লোক মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া আসে। সেই বিজনপ্রদেশে অগ্নিসৎকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই, বোধ হয় সে ঐ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া আসে। একটি সন্ন্যাসী দৈবাৎ আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকিয়া তাহার কেমন বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। পিতা মাতা ও পত্নীর মমতা ভুলিয়া সে সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। গৃহে সংবাদ পাঠাইবার কথাও তার মনে হয় নাই। কিছুদিন হইল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে কাশীতে আসিয়াছে।

জ্যোৎস্না স্বামীর চরণতলে পড়িয়া বলিল—'তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার জীবনসঙ্গিনীকে কেন ফেলে যাও? চল প্রভু, আমিও সন্ন্যাসিনী হইব।"

ভূপতির নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে কহিল, "গুরুর অনুমতি ব্যতীত—"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "গুরুর আদেশ,—বৎস, তুমি এই দেবীরূপা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। সন্ন্যাসের সময় তোমার এখনও হয় নাই। যখন হইবে, আমি ডাকিব। তখন আসিও।"

স্বামী স্ত্রী নতজানু হইয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রবীন সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিল।

সুদূর দৃষ্টি।

(শ্রীযুত অনন্ত মোহন রায় বি, এ,)

"নরেন্ বাবু,—ইনি আমার পরম বন্ধু, শিশির কুমার; ইহার গুণ অশেষ। তাস পাশাতে ইনি সুদক্ষ, গান বাজনায় অদ্বিতীয়, জাল জুয়াচুরীতে সুনিপুণ, আর মেস্‌মেরিজম হিপ্‌নটিজম প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী। শিশির,—মনুষ্য সমাজে ইন্দ্রের ন্যায় ইনি—সেই নরেন্দ্র বাবু।"

নরেন বাবু একটু ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শিশির বাবু প্রতিনমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "নরেন বাবু, আপনার নাম আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি। এই যামিনী বাবুই কতবার শতমুখে আপনার প্রশংসা করিয়াছেন; প্রশংসাগুলির অধিকাংশ উপরোক্ত প্রকারের। যাহা হউক, আপনার সহিত চাক্ষুষ আলাপ হইয়া কৃতার্থ হইলাম। রত্নেই রত্ন আকর্ষণ করে,—আমরা দুজনে বেশ যুগল রতন মিলিব।"

নরেন বাবু একটী ছোট "হুঁ"—বলিয়া সমুদ্রের ঢেউ দেখিতে লাগিলেন। ষ্টীমার তখন দ্রুতবেগে চট্টগ্রাম হইতে সমুদ্র বক্ষে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল, উপরোক্ত বন্ধুগণ রেঙ্গুন হইতে আসিতেছেন। ডেকের উপরে নানাবিধ আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল। সরোজ বাবু বয়সে সকলের কনিষ্ঠ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শিশির, তুমি না Crystal Gazing (ক্রিষ্টাল গেজিং) * জান?"

শিশির বলিলেন, "কিছু কিছু জানি।"

নরেন কিছু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "আমি ও সব বিশ্বাস করি না—কেবল বুজরুকী।" শিশির যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। সরোজও কিছু লজ্জিত হইলেন, অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইয়া নরেনের দিকে চাহিল।

সরোজ কহিলেন, "প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে সন্দেহ কেন? আমার কাছে একটা ক্রিষ্টাল বল আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে।"

নরেনের ক্ষুদ্র চক্ষু বিড়ালের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। "আমি ও সব চাহি না," এই বলিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় বসিয়া একপাশে বিমর্ষ ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। সরোজ ক্যাবিনের মধ্য হইতে একটি কাচের বল আনিয়া শিশিরের হাতে দিলেন। ষ্টীমারের সকল লোক তামাসা দেখিবার নিমিত্ত সেখানে সমবেত হইল।

শিশির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একমনে বলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যামিনী ও সরোজ ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কি দেখিতেছ?" শিশির অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "কি দেখিতেছি?—আচ্ছা, তবে মন দিয়া শোন।" শিশির বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

* স্বচ্ছ স্ফটিক খণ্ডের সাহায্যে অতিলৌকিক শক্তিবলে অতীত ও ভবিষ্যতের অজ্ঞাত দৃশ্য দেখা যায়,—এইরূপ একটা কথা আছে।

"গভীর অন্ধকার; ভাল দেখা যাইতেছে না। একে আঁধার রাত, তায় ঘন কুয়াসা। রাস্তার ক্ষীণ দীপালোক তাহা ভেদ করিতে অক্ষম। রেঙ্গুনের একটি রাস্তা—কর্দ্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল।

"দ্বিপ্রহর রাত্রি; পার্শ্বের একটি গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিল। পথে কোথাও কেহ নাই, সমস্ত জগত যেন নীরব, নিস্পন্দ। যাত্রীরা গৃহস্থের বারান্দায়, গলির কোণে কোন আবৃত স্থানে সব মড়ার মত পড়িয়া আছে। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি লোক—বোধ হইতেছে ভদ্রবেশী যুবক—তাহার সমস্ত শরীর ম্যাকিনটসে আবৃত করিয়া, মাথায় একটি কালো টুপী পরিয়া, দ্রুত গতিতে কোথায় চলিয়াছে। কিন্তু মনের আবেগের অনুপাতে পদদ্বয় যেন তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিতেছে না,—মাঝে মাঝে পদচ্যুত হইয়া প্রায় ভূপতিত হইতেছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আবার পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে। মনে তখন তার কি হইতেছিল, কে জানে?"

সরোজ কহিলেন, "নরেন বাবু, আপনি বিশ্বাস করেন না, তথাপি একমনে হাঁ করিয়া কি শুনিতেছেন?"

শিশির বলিতে লাগিলেন,—

"তারপর লোকটি গলির মোড় ফিরিল, এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া প্রায় সহরতলীর নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইল। সেখানে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী, তাহার সম্মুখে আসিয়া ম্যাকিনটস পরা যুবক দাঁড়াইল, এবং একপ্রকার বাঁশীতে তীব্র আওয়াজ করিল। সহসা সম্মুখের দরজা খুলিয়া গেল, এবং একখানি অতি সুন্দর মুখ ও দুখানি কোমল হস্ত তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। এতক্ষণে দরজা আবার বন্ধ হইয়াছে —ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। যে দরজা খুলিয়াছিল—দেখিতে পাইতেছি সে একজন পূর্ণযৌবনা রমণী—অগ্রে অগ্রে সাবধানে চলিয়াছে, পশ্চাতের লোকটি রুদ্ধশ্বাসে তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। বাড়ীখানি দ্বিতল। পশ্চাতে প্রাঙ্গন, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, তাহাতে একটি খিড়কীর দরজা আছে। খিড়কীর পিছনে একটি পুস্করিণীর ঘাট্‌লা। পুষ্করিণীটি একটি মনোহর উদ্যানের মধ্যস্থলে। দুজনে ক্রমে খিড়কীর দরজা পার হইয়া ঘাটের ইষ্টক নির্ম্মিত আসনে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহারা মৃদুস্বরে পরিষ্কার কথা কহিতেছে—এস, মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহাদের কথোপ-কথন শ্রবণ করি। যুবতী বলিল——

'তোমার এ সন্দেহে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি নিতান্ত অভাগিনী, তাই তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি। কিন্তু যদি বিশ্বাস কর, তবে এই নিশীথ রজনীতে তোমার শপথ পূর্ব্বক, এবং গর্ভস্থিত তোমারই সন্তানের শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ '

'এ কথা বিশ্বাস করা কষ্ট। আমি প্রবাসী,—আমার গৃহ এ স্থান হইতে দুই মাসের পথ। কিন্তু তোমার জন্য গৃহ পরিজন সকল ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, বিদেশিনীর চরণে যথা-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শেষে তাহার এই প্রতিদান ?

যুবতী কহিল,—

"ভাবিয়া দেখ—বেশী হতভাগ্য কে ? তুমি কাল্পনিক বেদনা সৃজন করিয়া অসুখী হইতেছ,—আর আমি ধর্ম্ম লোকলজ্জা সকলই উপেক্ষা করিয়া তোমার মুখ চাহিয়া তোমার পদে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি। কিছু দিন পরে সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা, তাঁহার এ সংসারে আর কেহ নাই। তিনি লজ্জা এবং ঘৃণায় লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। সকলের অজ্ঞাতসারে, নিজের ধর্ম্ম ছাড়িয়া আর কোনও বিবেচনা না করিয়া তোমার সহিত বিধর্ম্মীর নিয়মানুযায়ী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। পিতা জানেন, আমি তোমার নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিয়া অচিরে অগ্রগণ্য বিদুষী হইব, দেশের লোকে আমার প্রতিভা দেখিয়া চমকিত হইবে ! কিন্তু তিনি অচিরে শুনিতে পাইবেন তাঁহার বহুকালের পোষিত আশা অতল সলিলে ডুবিয়াছে—তাঁহার কন্যা গৃহ ছাড়িয়া বিদেশীর সাথে প্রস্থান করিয়াছে। আমাদের বিবাহের কথা কেহই জানে না,—সুতরাং দেশের লোকে চিরদিন আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়াই জানিবে। হয়ত, এ স্থানে ইহজীবনে আর আসিব না। এই পবিত্র জন্মভূমি, (যুবতীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল)—যে স্থানের অণুপরমাণু লইয়া আমার দেহ, দেহের প্রাণ, সৃজিত হইয়াছে, তাহা চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। হায়, ভাবিয়া দেখ, অভাগিনীর কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে ! কিন্তু তোমার মুখ চাহিলে, সে যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। পিতা, জন্মভূমি, সমাজ ভুলিয়া যাই। তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ সুখ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তুমি যদি ক্ষণেকের তরেও আমায় অবিশ্বাস কর, তবে আমার পক্ষে মরণই ভাল। তুমি দেশে ফিরিয়া যাইতেছ, ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সঙ্গী হইতে চাহিব না। যে দিন দেখিতে পাইব,

এ ভগ্ন হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলি ধুসরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে,—সে দিন আপন হস্তে প্রাণ বায়ু বাহির করিয়া দিব। তোমার স্মৃতি পটে যদি আমার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাক,—তবে মুছিয়া ফেলিও। কিন্তু তাহাতে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিও না—আমার এই শেষ ভিক্ষা।'

যুবতী দীন ভাবে অজস্র অশ্রু মোচন করিতেছিল।"

সরোজ কহিলেন "নরেনবাবু, উঠিয়া যাইতেছেন কেন ?—আর একটু বসুন।'

শিশির বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সহসা, প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী ভেদ করিয়া যেন একটি মনুষ্য মূর্ত্তি তথায় আবির্ভূত হইল। জলদ গম্ভীর স্বরে মূর্ত্তি কহিল, 'পাষণ্ড ! এই সুশীলা রমণী তোর মত কুক্কুরের উপযুক্ত নহে। আমি স্পষ্ট বলিতেছি যে, এই রমণী আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা, কিন্তু তোর মত পশুর জন্য ইহার হৃদয় হইতে আমি আজিও প্রেমের প্রতিদান পাই নাই। আর নয়,—তুই সহজে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর্ ! ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রত্যহ তুই ইহাকে ক্রোধভরে যেরূপ যন্ত্রণা দিতেছিস্, আমার চক্ষুর তাহা অগোচর নহে। প্রত্যেকবার তোকে সমুচিত দণ্ড দিব ভাবিয়াছি, কিন্তু নানা বিবেচনায় ক্ষান্ত হইয়াছি। নহিলে তোর মস্তক আজ শৃগাল কুক্কুরে চর্ব্বণ করিত। কিন্তু আর নয়,—বহুদিনের একটি বাসনা আজ পূর্ণ করিতেছি, এই নে—তোর যোগ্য যাহা তাহা গ্রহণ কর্।" এই বলিয়া সজোরে তাহার ললাটে সে পদাঘাত করিল ; ম্যাকিনটস্ সহ লোকটি আহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিল।

"আগন্তুক তখন যুবতীর পার্শ্বে যাইয়া দেখিল, সে সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িয়া আছে। তখন আগন্তুক সযত্নে তাহার ক্ষীণ দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিল ; অতি সন্তর্পণে তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিল। তাহার মনে যেন তখন ঝড় বহিতেছিল। তখন সেই নৈশ অন্ধকারে নিভৃত উদ্যানের সোপানাবলীর উপরে, হৃদয়ের আবেগভরে, সে মূর্চ্ছিত রমণীর বিম্বাধরে একটি চুম্বন করিল !

"ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া ২।৩টি পিস্তলের আওয়াজ হইল,—রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল—প্রতিধ্বনি সুদূর নভোমণ্ডলে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল, পাখীগুলি কুলায় ছাড়িয়া কলরব করিতে করিতে উড়িল। আগন্তুক এবং যুবতী উভয়ে সজোরে কঠিন সোপানের উপরে নিক্ষিপ্ত হইল। পিস্তলের গুলি উভয়েরই মস্তক বিদ্ধ করিয়া ছুটিয়া গিয়াছে।"

সরোজ কহিলেন, "নরেন বাবুকে দেখ, নরেন বাবুকে দেখ,—উনি যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন!"

শিশির সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঘাতক তখন পিস্তল দূরে পুষ্করিণীর ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া, সোপানের উপরে আসিল—মৃত দেহ ৩টি মুহূর্ত্ত মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—পরে দ্রুত পদক্ষেপে সেস্থান হইতে পলায়ন করিল, ম্যাকিনটস্ খুলিয়া স্কন্ধে লইল।

"কিছুদূরে গিয়া ঘাতক বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে, ভদ্রোচিত বেশ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া সে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল, এবং মলিন মজুরের বেশ ধারণ করিল। সর্ব্বাঙ্গে এবং মুখে কালি মাখিয়া সহরতলীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল। রাত্রি প্রভাত না হইতেই দূরে প্রস্থান করিল।

"দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। খালাসির বেশে সে আমাদের ষ্টীমারে আসিয়া উঠিয়াছে। ষ্টীমারে প্রভাত হইবার পরেই পুনরায় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বেশে ভদ্রলোক সাজিয়া এখন বসিয়া আছে।"

নরেন দ্রুতপদে লোকের ভিড় ঠেলিয়া সে স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। শিশির তখন বলটি সরোজকে ফিরাইয়া দিয়া নরেনকে ধরিলেন, এবং ছদ্মবেশী সিপাহীদ্বয়কে হুকুম দিলেন, "ইহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক।" দর্শক-মণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া শিশির বলিলেন,——

"আমি ডিটেক্‌টিভ্। এই হতভাগ্যই সেই ম্যাকিনটস পরা যুবক। দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনারা সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলেন, রেঙ্গুণে একটি সম্ভ্রান্ত মগ পরিবারের একটি যুবতী এবং তাঁহার কোনও আত্মীয় যুবকের মৃতদেহ তাঁহাদের বাড়ীর পশ্চাতে পাওয়া যায়। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক যুবতীর শিক্ষক ছিলেন। তিনিও সেই অবধি নিরুদ্দেশ। পুলিস্ দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই হত্যা ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারে নাই, সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সন্ধানও এ পর্য্যন্ত মেলে নাই। কিন্তু আমার সহৃদয়বন্ধু যামিনীবাবু এবং সরোজ বাবুর অনুগ্রহে ও সহায়তায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। ঘাতক মনে করিতেছিল. ষ্টীমারে উঠিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছে। সিপাহী,—হাতকড়ি লাগাও।"

ছোট বড়।

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় খণ্ড।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[পূর্ব্বাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—মালঞ্চপুরের জমিদাররা দুই ভাই—ললিতকান্ত ও মোহিতকান্ত, ললিতকান্ত ভোগবিলাসে অনুরক্ত হইয়া প্রায়তঃ কলিকাতায়ই থাকিতেন। কখনও বাড়ীতে আসিলেও স্ত্রী বিজয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত না। বাহিরেও ভোগবিলাসের উপকরণ লইয়া থাকিতেন। স্বামীসুখে বঞ্চিতা হইয়াও বিজয়া ধীর শান্ত ভাবে পরিজনের এবং প্রতিবেশী অনুগত দীনদরিদ্রগণের সেবায় সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেন। ললিতের কনিষ্ঠ মোহিতকান্ত এখনও তরুণ যুবক। স্ত্রী মীরার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত। মীরার পিতৃগৃহ হইতে মীরার সঙ্গে সাগরী নাম্নী একটি যুবতী দাসীও আসিয়াছে। সাগরী কোনও হিন্দুস্থানী দাসীর কন্যা,—বাল্যাবধি মীরার পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা,—এখনও বিবাহ হয় নাই।

ঐ গ্রামে গোপকৈবর্ত্ত পল্লীতে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল, রাইচরণ। রাইচরণ বলিষ্ঠ, তেজস্বী ও সাহসী যুবক এবং পল্লীর গোপকৈবর্ত্ত যুবকগণ সকলেই রাইচরণের বিশেষ অনুগত ছিল। রাইচরণের স্ত্রী ছিল মালতী—অতি সুন্দরী ও সুশীলা। সাগরী একদিন গোপপল্লীতে বেড়াইতে গিয়া মালতীর সঙ্গে 'সই' পাতাইয়া আসিল। নিজেদের অতি প্রিয় সহচরী সাগরীর 'সই' বলিয়া বিজয়া ও মীরা মধ্যে মধ্যে আদর করিয়া মালতীকে গৃহে আনিতেন।

বিষয়কর্ম্মের সুবন্দোবস্তের জন্য বড়বাবু (ললিতকান্ত) কিছুকাল বাড়ীতেই থাকিবেন বলিয়া কলিকাতার বাসা উঠাইয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁর একজন অতি অনুগত কর্ম্মচারী—মজুমদার মহাশয়। মজুমদার মুখে অতি মিষ্টভাষী, কিন্তু কূটকৌশলে অন্যের অনিষ্ট করিয়া প্রভুর স্বার্থসাধনে সিদ্ধহস্ত। তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, মোহিতকে কোনও মতে বঞ্চিত করিয়া ললিতকেই সম্পূর্ণ জমিদারীর অধিকারী করেন। মজুমদার পরামর্শ স্থির করিলেন, মোহিতকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। সেখানে কুসংসর্গে পড়িয়া যাহাতে মোহিতের চরিত্র স্খলিত হয়, তারও উপায় করিবেন। তারপর ক্রমে সরল ও তরলমতি মোহিতকে ফাঁকি দিয়া সমস্ত জমিদারী ললিতের হস্তগত করিতে পারিবেন। বড়বাবুর সঙ্গে আর একটি পরিচারিকা আসিয়াছিল—চন্দরী। বড়বাবুর জন্য ভোগ্যা নারীর অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করাই চন্দরীর কাজ ছিল।

দৈবাৎ কোনও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে জমিদার গৃহে আগতা মালতী বড়বাবুর চক্ষে পড়িল। মালতীর রূপে বড়বাবু মুগ্ধ হইলেন। বাড়ীতে বহুদিন থাকিতে হইবে বলিয়া বড়বাবু আমোদ-প্রমোদের জন্য একটি বাগান বাড়ীর স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রাইচরণের বাড়ীটির অবস্থান বড় সুন্দর। সেই স্থানটিই বড়বাবুর পছন্দ হইল। এখন রাইচরণের গৃহ ও গৃহিণী উভয়ই

কিরূপে হস্তগত করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে বড়বাবু ও মজুমদার মন দিলেন। ইচরণের প্রতিবেশী দরিদ্র জগা অর্থাভাবে বিবাহ করিতে না পারায় বড় ক্ষুণ্ণ ছিল। রাইচরণ তাহার বিবাহের জন্য জমিদার বাড়ী ঋণ প্রার্থনা করিল। মজুমদারের কৌশলে ললিতের অনুগত একজন উকিল রাইচরণের বসতবাড়ী তিনমাসের কটে আবদ্ধ রাখিয়া প্রার্থিত অর্থ ধার দিলেন।

মীরার সাধ উপলক্ষে জমিদার বাড়ীতে বৃহৎ উৎসবের আয়োজন হইল। মালতীও নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছিল। চন্দরী লোকজনের গোলমালের মধ্যে কৌশল করিয়া মালতীকে বাহিরের বাগানে লইয়া গেল। সাগরী ও বিজয়া তখনই এ ঘটনা জানিতে পারিয়া দ্রুত বাগানে গিয়া মালতীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। সাধের পরে মীরা সাগরীর সঙ্গে তার পিত্রালয়ে প্রেরিত হইল। মোহিত কলিকাতায় গেল। মজুমদার নিখিলনাথ নামক কলিকাতাবাসী ললিতের এক চতুর সহচরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়া দিয়া আসিলেন। সাধের দিন চন্দরীর কৌশলে মালতী যে বিপদে পড়িয়াছিল, অশান্তি ঘটিবার ভয়ে মালতী সে কথা রাইচরণকে জানাইল না। কিন্তু মালতীকে চন্দরী বাগানে লইয়া যাইবার সময় জমিদার গৃহে নিমন্ত্রিতা গ্রামবাসিনীরা কেহ কেহ দেখিয়াছিল। এ কথা লইয়া গ্রাম্যনারীগণের কাণাকাণিতে মালতীর বড় কলঙ্ক হইল।

চতুর নিখিল সত্বরই মোহিতকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। কতকগুলি তরলমতি প্রমোদ-পরায়ণ [যু]বকের সঙ্গে মোহিতের পরিচয় হইল। মোহিতের গৃহেই ইহাদের আড্ডা বসিত। প্রায়ই ইহাদের [ল]ইয়া মোহিত থিয়েটারে যাইতেন। বরুণা রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেত্রী বেলার অভিনয়ে মোহিত [মু]গ্ধ হইয়াছিল। নিখিল কথার ছলে মোহিতকে ভুলাইয়া একদিন বেলার বাড়ীতে লইয়া গেল।

রাইচরণের মাখনের ব্যবসায় ছিল। বড় একটা মাখনের চালান কলিকাতায় পাঠাইয়া তার [টা]কায় সে ঋণ শোধ করিবে স্থির করিয়াছিল। মজুমদার-নিযুক্ত গুণ্ডার দল মাখনের নৌকা [ডুবি]য় করিল। রাইচরণ অর্থসংগ্রহের জন্য কলিকাতায় মহাজনের নিকটে গেল। [বৃ]থা চেষ্টায় কয়েক দিন কাটাইয়া সে গৃহে ফিরিয়া মজুমদারের নিকট শুনিল, কটের [সম]য় উত্তীর্ণ হওয়ায় উকিল হরেনবাবু আদালতে নালিশ করিয়া নোটিস বাহির [ক]রিয়াছেন। আর দুইদিন মাত্র সময় আছে, এর মধ্যে টাকা দিতে না পারিলে তার বসতবাড়ী [হ]রেনবাবু দখল করিবেন। রাইচরণ স্থির করিল, কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে খুচরা হাওলাতে ও জিনিষ [প]ত্র বিক্রয় করিয়া দুদিনের মধ্যেই টাকা সংগ্রহ করিবে। মজুমদার দেখিলেন, অল্পেরজন্য সব বৃথা [হয়]। রাইচরণ এখনও মালতীর কলঙ্কের কথা শোনে নাই। যদি সে তা শোনে এবং বিশ্বাস করে, [তা]ব সে পাগলের মত হইবে এবং টাকার চেষ্টা করিবে না। মজুমদার চন্দরীর সহায়তায় সেই [উপা]য় মন দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কে ও!

অনেক রাত্রিতে রাইচরণ বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়া [আ]হার করিতে বসিল। মালতী কহিল—"হাঁগা, তা অত হাঙ্গামা

ক'চ্চ কেন? আগে কেন গওনা পত্তর যা আছে, তা বিক্রী ক'রেই দেখ না?"

"ছশ টাকা চাই, গওনাপত্তরে আর কত হবে?"

"কেন ৪।৫ ভরি সোণা আছে,—আর রূপোও ৪০।৫০ ভরি কি হবে না?"

"তাতে হদ্দ এক শ সওয়া শ টাকা কষ্টে হতে পারে।"

মালতী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। রাইচরণ হাসিয়া কহিল,—

"তা গায়ের গওনা দিয়ে যদি পতিভক্তি দেখাতেই চাও,—তবে ভাবনা নাই। সে সাধে বঞ্চিত হ'তে হবে না। গওনা গুলিও দরকার হবে। বুঝ্লে?"

মালতী রাইচরণের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল,—তখনই লজ্জায় আবার হাসিমাখা লাল মুখ খানি নত করিল। রাইচরণ মাথা ভাতে হাত রাখিয়া অতৃপ্ত নয়নে মালতীর সেই বড় সুন্দর মুখ খানির দিকে চাহিয়া রহিল। আহা! ওই যে রাঙা উষায় ফোটা হাজার হাজার সুরভি ফুলের মাধুরী, তার অধিকারী সে,—আজ এই বিপদেও সে কি সুখী, কত ভাগ্যবান্! রাজার রাজাও কি তার রাজপ্রাসাদে তার চেয়ে বেশী সুখী? যদি পৈতৃক বাড়ীঘরও যায়, তবু কি গাছের তলায় পাতার কুটীরেও সে মানবদুর্লভ সুধাভরা স্বর্গের সুখে থাকিবে না?

মালতী কহিল, "তা আমি ত আর তার জন্য ব'ল্‌ছি না? গওনা পর্‌তে কার না সাধ যায়? গওনা দুখানা থাক্‌লে তাকি কেউ ইচ্ছে ক'রে হারাতে চায়? তবে টাকা টাকা ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে—তাই বল্‌ছিলুম—"

"আগে আমার গওনা কখানা নেও,—আমি একটা জাঁদ্‌রেল পতিব্রতা হ'য়ে নি,—তারপর যত পার ঘুরে ঘুরে বাকী টাকা যোগাড় ক'রে নিও,—কেমন?"

মালতী একটু মধুর ঝাম্‌টায় মুখ ফিরাইয়া কহিল, "যাও তুমি ভারি দুষ্ট! কেবল তোমার ঠাট্টা! আমি যেন ব'ল্‌ছি, আমি ভারি পতিব্রতা! ছিঃ!"

রাইচরণ হো হো হাসিয়া উঠিল,—কহিল, "তুমি যে পতিব্রতা, এটাও কি বড় 'ছি'এর কথা হ'ল মালতী? তবে তোমাকে কি ব'ল্‌ব বল ত? পতি-ব্রতার উল্টো আর কিসে তোমার গরব হবে?"

"যাও যাও! তুমি এখন ভাত খাও! ঐ যা—মাছ ভাজা যে ছাই বেড়ালে নিয়ে গেল? দূর—দূর—দূর! না—এ হতভাগা বেড়ালের জ্বালায়ও আর বাঁচিনে!"

মালতী ঠ্যাঙা লইয়া বিড়াল তাড়াইতে ছুটিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর প্রেম-রঙ্গাভিনয়ের অবসরে বিড়ালটা এতদূর সরিয়া গিয়াছে, যে মালতী আর

তাকে ধরিতে পারিল না। অগত্যা ঠ্যাঙাটা জোরে বিড়ালের পানে নিক্ষেপ করিয়া মালতী কহিল, "দূরহ আপদ!—ম'র্‌তে আর যায়গা পেলে না? আহা, সাম্‌নের মাছখানা নিয়ে গেল,—আর ত মাছ ভাজা নেই?"

রাইচরণ কহিল, "নেই ত নেই! আজ নেই,—কাল ত হবে? তার জন্যে আর দুঃখ কি? বেড়ালকে ত আর আদর ক'রে কেউ মাছ ভেজে খেতে দেয় না। এই রকম জোর জবর ক'রে যতটা নিয়ে খেতে পারে।"

"আহা, সাম্‌নের মাছ খানা নিয়ে গেল!"

রাইচরণ কহিল, "তা মাছ খানা ত সাম্‌নে আমারও ছিল,—তারও ছিল। তার সাম্‌নেরটা আমি খেতুম,—না হয় আমার সাম্‌নেরটা সেই খেল। সমানই কথা। কেষ্টর জীব—ভাল জিনিষ, যায় ভোগে হয়, লাগ্‌লেই হল। তবে দুঃখু এই বেড়ালটা কিনা হঠাৎ আমাদের প্রেমালাপে এমন রসভঙ্গ ক'রে গেল! কি বল?"

"যাও!—তোমার রঙ্গ রাখ। এখন খাও!—ঝোলের মাছও শেষে নিয়ে যাবে!"

"তা যায় যাবে। ঝোলের মাছ আর প্রেমের আলাপ এর মধ্যে কোন্‌টা বড় বল ত সই?"

"ক্ষিদের মুখে ঝোলের মাছ অনেক বড়!"

"ক্ষিদে কি কেবল পেটে? বুকের ক্ষিদেটাও কম নয়। কোন্‌টা বেশী মিষ্টি, সেটা ঠিক হবে ক্ষিদের রকম বুঝে। আমার এখন এই ক্ষিদেটাই যে বেশী মালতী?"

মালতী মধুর হাসিমাখা চটুল চোক দুটিতে রাইচরণের পানে একটু চাহিয়া, হাসিয়া আবার লাল মুখখানি ফিরাইল। রাইচরণ কহিল, "দেখ দিকি, অমন লোভ দেখিয়ে ক্ষিদেটা জ্বলিয়ে দিচ্চ,—আবার ব'ল্‌ছ—'

"ওই আবার দেখ বেড়ালটা আস্‌ছে? দূর—দুর! কি আপদ গো! নেও,—এখন তুমি খাও! আর রঙ্গে কাজ নেই, তার ঢের সময় আছে।"

"আর ত কাল পরশু দুইদিন তার একেবারে কচু!"

মালতী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আহা! ঠাকুর করুন! বিপদ থেকে ত উদ্ধার পাও। রঙ্গের সময়, আমোদের সময় তখন ঢের পাবে? বলি, টাকা হবে ত?"

রাইচরণ কহিল, "হবে, হবে! হবে বই কি? দুদিন আরও সময় আছে।

দুদিনে যদি এও না পারি, তবে আর এত বয়স বাপের ছেলে হ'য়ে বাপের বাড়ীতে মিছেই আছি।"

আহারাদি হইল। স্বামী স্ত্রী সুখশয্যায় শয়ন করিল। আজ এ বিপদ ছোট নয়, কিন্তু দুজনে দুজনের সঙ্গে তারা যে ক্লান্তিহীন অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী ছিল, সে আনন্দ আজ এই বিপদের চিন্তায়ও এতটুকু ক্ষুব্ধ করিতে পারিল না। সুস্থ সবল দেহ, পরস্পরের প্রতি অনাবিল অফুরন্ত প্রেমেভরা সুস্থ সরল প্রাণ,—উভয়ের সঙ্গে উভয়ের কেবলই আশা, কেবল সুখ, কেবলই আনন্দ,—দুঃখের কি দুশ্চিন্তার স্পর্শও তার মধ্যে কখনও আসিতে পারিত না। এ আশা, এ সুখ, এ আনন্দ, এমনই ভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়া জীবনেরই স্বভাবের মত হইয়া গিয়াছে, যে আজকার এই দারুণ দুশ্চিন্তার কারণও তার মধ্যে তার ক্ষীণতম ছায়াও পাত করিতে পারিল না।

আহা! বিধাতার আপন হাতে সাজান সুন্দর দিব্যসুরভি পারিজাতের বাগান খানি এই পল্লীবাসী সরল গোপদম্পতির জীবন ভরিয়া ফুটিয়াছিল। হায়! কোন জন্মের কোন কর্ম্মফলে সেই বাগান খানি ধ্বংস করিতে বিধাতারই হাতে আজ দারুণ অশনি উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল! আজ এই সুখশয্যার সুখস্বপ্নের মধ্যে ত তার কোনও আভাসই ইহারা পাইল না! কি এ বিধাতার লীলা,—কোন কর্ম্মের এ কি ফল,—বিধাতাই তা জানেন।

* * * *

গভীর রাত্রি। বাহিরে বড় বিকট উচ্চৈঃস্বরে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। রাইচরণের ঘুম ভাঙ্গিল। মালতীও জাগিল। সহসা অজ্ঞাত কি এক আতঙ্কে তার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। রাইচরণ উঠিয়া দরজা খুলিল।

বারান্দায় কে বসিয়াছিল,—সে মৃদুস্বরে কহিল, "এই যে এসেছ বোন্—! কতক্ষণ ব'সে আছি। ডাক্‌তেও ভরসা পাইনি—"

"কেও?" রাইচরণ গম্ভীরস্বরে এই প্রশ্ন করিল।

"ওমা! কি সর্ব্বনাশ! এযে"—এই বলিয়াই যে বসিয়াছিল, সে লাফাইয়া বারান্দা হইতে উঠানে পড়িল।

"কে! কে তুমি?"

রাইচরণ দ্রুত দরজার কাছ হইতে বারান্দায় নামিল। রাত্রি অন্ধকার। নক্ষত্রালোকে রাইচরণ দেখিল, কোনও স্ত্রীলোক দ্রুত পলায়ন করিতেছে। রাইচরণ বারান্দা হইতে উঠানে নামিবে, সহসা মালতী আসিয়া তাহাকে

ধরিয়া কহিল, "কি। কি! কে ও? কোথায় যাও? যেও না! যেও না। আমার বড় ভয় ক'চ্চে?"

স্ত্রীলোক ইতিমধ্যে বাড়ীর বাহিরে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। রাইচরণ আর একবার নামিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মালতী বড় শক্ত করিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। রাইচরণ ফিরিয়া কহিল, "কেও মালতী? কেন তোমার কাছে এসেছিল?"

"আমার কাছে? ওমা কে? আমার কাছে এত রেতে কে আস্‌বে?"

"তবে ও কি ব'ল্‌ছিল?"

"কি ব'লছিল?"

"বল্‌ছিল,—'এসেছ বোন্‌? আমি কতক্ষণ বসে আছি, ডাক্‌তেও ভরসা পাই নি, কে ও মালতী? কেন তোমার কাছে এসেছিল?"

কেমন একটা অজানা ভয়ে ও সন্দেহে মালতীর বক্ষের স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া আসল। সমস্ত দেহের শোণিত প্রবাহ যেন রুদ্ধ হইল,—শিথিল হস্ত স্বামীর দেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। কোনও বাক্যস্ফুর্ত্তি তাহার হইল না।

রাইচরণ আবার কহিল, "কে ও মালতী? কেন আসিয়াছিল? কারও কি কোনও কাজে আসার কথা ছিল?"

মালতী ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "না!"

"তবে ও কি বল্‌ল? কেন পালাল! কে ও?"

রাইচরণ আবার বাহিরের দিকে চাহিল। যে আসিয়াছিল, সে এতক্ষণ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। আর তাহাকে ধরা যাইবে না। কোনদিকে গিয়াছে, তারই বা ঠিক কি?

মালতীর সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত শীতল হতে সে রাইচরণকে ধরিয়া কহিল, "এস এস! ঘরে এস! আমার বড় ভয় ক'চ্চে!"

রাইচরণ কহিল, "তুমি কি কিছুই জান না?"

"না—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না? কে ও? এস ঘরে এস! আমার আমার বড় ভয় ক'চ্চে!"

কম্পিত দেহা ভীতা মালতীকে লইয়া রাইচরণ ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এক একবার ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া তার মনে হইতে লাগিল। মালতীকে অনেক প্রশ্ন সে করিল। কম্পিত দেহে মালতী রাইচরণের বক্ষলগ্ন হইয়া রহিল। সে কিছুই জানে না —

কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। কি বলিবে? মধ্যে মধ্যে 'না' 'জানিনা' 'বুঝি না'—এই মাত্র উত্তর সে করিল। এক একবার তার মনে হইতেছিল, রাক্ষসী চন্দরীর কোনও চক্র নয় ত? ওমা! তবে কি হবে? মালতী আরও কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল!

রাইচরণ এ রহস্যের কোনও সূত্রই ধরিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপন্না।

অতি সকালেই রাইচরণ বন্দোবস্ত মত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় গ্রামান্তরে গেল। নিতাই, যাদব, বাঁশীও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গেল।

সকাল হইতেই প্রতিবেশিনীদের মধ্যে বড় তুমুল একটা আন্দোলন আরম্ভ হইল। কতদিন পরে রাইচরণ কাল বাড়ী আসিয়াছে, তা একদিনও কি ধৈর্য্য ধরে? কালও চন্দরী মালতীকে বাগানে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। তা চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন—কাল মাগী ধরা পড়িয়াছে। রাইচরণ তাকে গরুপেটা করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছে। সকাল হইতে রাইচরণ বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিতাই, বাঁশী, যাদব এরাও নাই। দল বাঁধিয়া কোথায় সব গিয়াছে। আজ কি জানি, একটা অত্যাহিত কাণ্ড কারখানা হয়। বলা বাহুল্য, চন্দরীর কৌশলেই রাত্রির ঘটনা এইভাবে প্রভাতেই প্রচারিত হইয়াছিল।

আজ আর চাপা চাপির কি প্রয়োজন? রাইচরণ ত জানিলই। ভয় যা ছিল, তা ত হইলই। উচ্চকণ্ঠেই আজ সকলে এ কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

জগার পিসী বড় ভীত হইয়া ছুটিয়া মালতীর কাছে আসিল।

"বৌমা! বৌমা! একি কথা মা? পাড়ার আটকুঁড়িরা একি সব বল্‌ছে মা? তবে কি সত্যিই মা? না—মা—তাও কি হয়?"

"কি পিসী? কি সত্যি! কি সবাই বল্‌ছে?"

"বল্ মা বল্—আমার ত বিশ্বাস হয় না। তুই সতী লক্ষ্মী ভগবতী, তোর মুখপানে চাইলে সীতা সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে—বল্ মা তবে এ কথা কেন

হ'ল? চন্দরী নাকি রেতে বাগানে তোকে নিয়ে যায়? কালও নাকি সে এসেছিল,—ধরা প'ড়েছে? রাইচরণ কোথায় চ'লে গেছে——"

মালতীর মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, থর থর কাঁপিয়া সে বসিয়া পড়িল! একি সর্ব্বনাশ! কার এ চক্র! সে ত কিছুই জানে না! কি ক'রে এ সব কথা হ'ল?

বুড়ী মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া গায় মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল,—"বৌমা! ভয় পাস্‌নি! আমি তোর মা! আমায় সব খুলে বল্! দুর্গা! দুর্গা! হরি ঠাকুর! গৌর! গৌর! রক্ষে কর। বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী সাক্ষাৎ ভগবতী! ঠাকুর! রক্ষে কর! রক্ষে কর! বৌমা বল্—কি হ'য়েছিল। চন্দরী পোড়ারমুখী কেন এসেছিল?"

মালতী কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "পিসী! কাল রেতে কে এসেছিল,—সে কি চন্দরী?"

"কালামুখারা ত সবাই তাই ব'ল্‌ছে! কেন সে এসেছিল বৌমা?"

মালতী কাঁদিয়া কহিল, "তা ত জানি না পিসী! কিছুই ত আমি জানি না! একি সর্ব্বনাশ আমার হ'ল? পিসী! পিসী! একি হ'ল? আমি কি ক'র্‌ব? তিনি বাড়ী এসে যখন শুন্‌বেন, তখন কি হবে পিসী? পিসী? সবাই কি আমার কলঙ্ক দিচ্চে? এরা কি বলে পিসী?"

"ওমা, এরা যা ব'লে তাকি মুখের বের ক'ত্তে পারি? অভাগীদের জিভ কেন খ'সে পড়ে না গা? একি আজ থেকে ব'ল্‌ছে? ঐযে ছোট বৌরাণীমার সাধের নেমন্তন্ন খেতে যাই—তোমার কি অসুখ ক'রেছিল!—তারপর থেকেই এই কথা হ'চ্চে! কালামুখীরা ব'লে মা, সেইদিন দিনে দুপুরেই চন্দরী তোমাকে বাগানে নিয়ে যায়! তারা চোকে দেখেছে। তারপর বরাবর নাকি চন্দরী রেতে এসে তোমায় নিয়ে যায়। মাগীরা এ নিয়ে সেই হ'তে কত কোচল ক'চ্চে।"

মালতী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। দুই হাতে শান্ত ভাবে চোকের জল মুছিল। সহসা সে যেন দারুণ অন্ধকারে আলোকের রেখা দেখিতে পাইল,—চিত্তে একটা স্থিরতার ভাব আসিল,—মুখেও একটা দৃঢ়তার তেজোময় আভা উঠিল। মালতী কহিল, "পিসী! আমি এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্চি। অনেক দিন অবধি লোকে আমার নামে এই কুৎসা ক'চ্চে?"

"হাঁ মা? ব'ন্নু না,—সেই সাধের দিনের পর থেকেই শুন্‌চি। তা আমি কি এ কথা কাণ করি?"

মালতী কহিল, "পিসী! কেন আমায় এ কথা আগে বলনি? কেন আমি এ কথা আগে শুনিনি? তাহ'লে বুঝি এর প্রতিকার হ'ত? আজ কি আর পার্‌ব? যখন তিনি আস্‌বেন,—যদি পথে এ কথা শুনে আসেন—আমি কি তাঁকে ব'লব? কি ক'রে তাঁকে বোঝাব সব মিছে কথা। তিনি কি তা বিশ্বাস কর্‌বেন? পিসী, কি হবে? বিধাতা বাদী! আমি যে কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্চি না। আহা! আজ যদি আমার সই থাকৃত?"

মালতী বড় কাঁদিয়া জগার পিসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। জগার পিসী শান্ত করিয়া কহিল, "চুপ কর্‌, চুপ কর্ মা! কাঁদ্‌লে কি উপায় হবে? আমায় সব খুলে বল্‌। কিসে কি হ'য়েছে,—যদি বুঝ্‌তে পেরেছিস, আমায় বল্‌। রাইচরণ পাগল ছেলে নয়। সত্যিকথা কেন সে বিশ্বাস ক'র্‌বে না?"

মালতী অনেকক্ষণ কাঁদিল। তারপর উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া, সাধের দিন যা ঘটিয়াছিল, তা সব জগার পিসীকে বলিল। চন্দরী যে তার আগে মধ্যে মধ্যে আসিত, তাও বলিল।

বুড়ী কহিল, "বুঝেছি মা, বুঝেছি! পোড়ারমুখীরা তাই দেখেছিল,—কথায় কথায় কাণাকাণিতে শেষে এত বড় কথাটা রটেছে! নইলে রোজ রেতে চন্দরী এসে তোমায় বাগানে নিয়ে যায়, তাও কি হয়? রাইচরণ নিজে ঘরে র'য়েছে,—আবাগীদের মুখে কেন কুড়ি কুষ্ঠ মহারোগ হয় না? তা, কাল চন্দরী এসেছিল কেন?"

"কেন এসেছিল! আর কেন আস্‌বে? আমার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে সর্ব্বনাশী কি জানি কি চক্র ক'রেছে!"

"রাইচরণ কোথায় গেল? সে কি সত্যিই চন্দরীকে ধ'রেছিল? কি ব'ল্লে সে?"

"না, না। ধরেন নি। সে যে চন্দরী, তাও তিনি জান্‌তে পারেন নি। সর্ব্বনাশী এসে ব'সেছিল,—উনি বেরুতেই কি ব'লে পালিয়ে গেল,—যেন আমার কাছেই এসেছিল। আমিও তখন বুঝিনি, সে যে চন্দরী। তবে মনে সন্দ হ'য়েছিল।"

"তাই বল্ মা! পাড়ার কালামুখীরা বলে কি রাইচরণ সব টের পেয়ে রুকে বাড়ীথেকে বেরিয়ে গেছে। কি জানি কি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেল্‌বে!"

মালতী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"না—না! তা নয়! তিনি কাজে গ্যাছেন। আজ রেতে কি কাল সকালে ফির্‌বেন। এ শুন্‌লে কি আর রক্ষে আছে?—পিসী, এক উপায় আছে। কাল যা হ'য়েছে,—আমার কিছু বল্‌বার মুখ আর নেই। জমিদার বাড়ীর বড় দিদিমণির সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌ব। আমায় তুমি নিয়ে যাবে?"

"ওমা বলিস্ কি মা? এখন সেখানে গেলে কি আর রক্ষে আছে? পোড়ারমুখীরা ওঁৎপেতে আছে,—সবাই দেখ্‌বে,—কত কি ব'ল্‌বে!"

"নূতন আর কি ব'ল্‌বে পিসী? যা ব'ল্‌বার তাত ব'ল্‌ছেই! না—না—তবু যাব না! তিনি যদি শোনেন,—কি ভাববেন কে জানে? পিসী, তুমি সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বে?"

"কি ব'ল্‌ব, বল মা? কেন পার্‌ব না?"

মালতী ধীরে ধীরে বিজয়াকে যাহা বলিতে হইবে বুড়ীকে বুঝাইয়া বলিল। বুড়ী কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে বুঝিয়া লইল। মালতী কহিল, "পিসী, তাঁকে ব'লো,—আমি আজ বড় বিপদে। যদি দরকার হয়,—তিনি আমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। আমার স্বামী যদি যান, যেন তিনি তাঁর দেখা পান, যেন তিনি তাঁর মুখেই শুন্‌তে পান, সে দিন কি হ'য়েছিল। আর শোন পিসী, পাড়ার কাউকে কিছু ব'লো না। কি জানি, কার মনে কি আছে, কিসে কি হবে শেষে।"

বুড়ী তখনই জমিদার বাড়ীতে বিজয়ার নিকটে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"যাক্,—যাক্,—সব যাক্।"

সে দিন রাইচরণ ফিরিতে পারিল না। পরদিন সকালে ফিরিল। তিনশত টাকার কিছু উপরে সে সংগ্রহ করিয়াছিল। বাঁশী, নিতাই, যাদব যদি আর দেড় শত টাকাও আনিতে পারে, তবে বাকী শ'দেড়েক টাকা মালতীর অলঙ্কার এবং দুই একটা গরু কিম্বা জিনিষ পত্র কিছু বিক্রয় করিয়া পাওয়া যাইবে। শেষ শত খানেক টাকা সংগ্রহ করিতে রাত্রি অনেক হইয়াছিল। কাজেই রাত্রিতে

আর গৃহে ফিরিতে পারে নাই,—সকালে উৎফুল্লচিত্তে রাইচরণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দরী ধরা পড়িয়াছিল,—রাইচরণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে—এই সব কথা লইয়া আগের দিন দিন ভরিয়া গ্রামে বড় আন্দোলন চলিয়াছিল। আন্দোলন আর কেবল নারীদের মধ্যে তখন আবদ্ধ ছিল না। পুরুষরাও অনেকে এ কথা আলোচনা করিতে লাগিল। রাইচরণ কেন গিয়াছে, তার কতিপয় বন্ধু ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিত না। সেই বন্ধুরাও সে দিন গ্রামে ছিল না। সুতরাং সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, রাগের মাথায় রাইচরণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাঁশী নিতাইরাও ত কেহ নাই। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কি জানি সে কি করিয়া ফেলে!—বড়বাবু ও মজুমদারও এ সংবাদ শুনিলেন। উভয়ে বড় সাবধানে গৃহ মধ্যে রহিলেন। বড়বাবু রিভল্‌বারটি গুলি ভরিয়া হাতের কাছে রাখিলেন।

পরদিন বেলা চারি ছয় দণ্ডের সময় রাইচরণ গ্রামে ফিরিল। ফিরিয়াই রাইচরণ এই সংবাদ শুনিল। রাইচরণকে দেখিয়াই অনেকে গিয়া তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিল,—কেহ সান্তনা দিতে চেষ্টা করিল,—কেহ হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইল,-কাঁদিয়া তাহার গায় হাত বুলাইল। বিস্মিত রাইচরণ ক্রমে প্রশ্ন করিয়া সকল কথা শুনিল! রাইচরণের মনে হইল,—যেন সমস্ত পৃথিবী তার পার নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে। কিছুকাল বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া সে বসিয়া রহিল। এও কি সম্ভব! সেই তার মালতী,—সে যে বড় সরল, বড় সুন্দর, বড় কোমল! সে যে ফুলেভরা নরম লতাটির মত তাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে! তার যে স্নেহের পার নাই, প্রেমের পার নাই! সে যে তার—তার—সকল প্রাণে তার! সে যে স্বামী বই কিছু জানে না,—সে যে একদিনের তরে তাকে ছাড়িয়া পিত্রালয়েও যাইতে চায় না! সে যে তাকে চক্ষে হারায়! গৃহে ফিরিলে মালতী তার মুখ পানে চাহিয়া হাসে,—আহা! সে যে কি সুন্দর, কি সরল, কি মধুর,—সকল প্রাণের সকল স্নেহময় মাধুরী যে সে হাসিতে ভাসিয়া ওঠে! সেই মালতী———! না, না! অসম্ভব! এ সব মিথ্যা কুৎসা! মিথ্যা রটনা!—কিন্তু পরশু রাত্রির সেই কথা! চন্দরী আসিয়াছিল,—সে বারান্দায় বসিয়া মালতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল! তাকে ত সে নিজেই দেখিয়াছে!—তার সে কথা ত নিজেই সে শুনিয়াছে! ওঃ! এ কি করিয়া হইল! এ ত মিথ্যা নয়! সত্য—সত্য—বড় কঠোর সত্য! অসহ্য

দহনে রাইচরণের বুক ভরিয়া দারুণ জ্বালাময় আগুন জ্বলিয়া উঠিল!—ছলনা! ছলনা! মালতীর ভালবাসা—মালতীর স্নেহ—মালতীর সেই হাসি,—সব ছলনা। মালতী কলঙ্কিনী! মালতী তাকে ছলিয়া পাপিষ্ঠ জমিদারের কুৎসিত সম্ভোগে আত্মদান করিয়াছে! ওঃ! অসহ্য! অসহ্য! যেন একসঙ্গে সহস্র সর্পদংশনের বিষের জ্বালায় রাইচরণ পাগল হইয়া উঠিল। আয়ত চক্ষু দুটি ভরিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! ক্রোধের আবেগে সমস্ত দেহের পেশী ফুলিয়া উঠিল! রাইচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ রাইচরণের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত—বড় ভীত হইল! রাইচরণ এদিক ওদিক একবার চাহিয়া দ্রুতপদে একদিকে ছুটিয়া চলিল।

"কোথায় যাও, কোথায় যাও রাইচরণ! কোথায় যাও বাবা! থাম! থাম! ব'সো,—ব'সো একটু স্থির হও! শোন!"

কেহ কেহ গিয়া রাইচরণকে ধরিল। দারুণ উত্তেজনার আবেগে রাইচরণের দেহে তখন মত্ত মাতঙ্গের বল! জোরে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিল। পদাঘাতে কাহাকে কাহাকেও দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর ছুটিয়া চলিয়া গেল। কেহ আর তাহার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না।

রাইচরণ দ্রুত ছুটিয়া চলিল, গৃহের দিকে গেল না,—গ্রামের বাহিরে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। রাইচরণের গতির কোনও লক্ষ্য ছিল না। রোষের ও ক্ষোভের আবেগ আর সে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সঙ্কীর্ণ স্থানে লোকের মধ্যে মুহূর্ত্ত আর বসিয়া থাকা তার পক্ষে অসহ্য হইল। সে ছুটিয়া চলিল—মুক্ত প্রান্তরের দিকে। প্রবল ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ-মহাসিন্ধু যেন তার বক্ষে তোলপাড় করিতেছিল!—সে যেন এই খুঁজিতে ছুটিয়া চলিল—কোথায় সেই সিন্ধুরই মত বিশাল মুক্ত দেশ আছে,—যেখানে সে এই আবেগ ঢালিয়া দিয়া একটু হাঁপ ছাড়িতে পারে!

অনাহারে দিন ভরিয়া রাইচরণ মাঠে মাঠে পথে পথে ঘুরিল! অপরাহ্নে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে রাইচরণ গ্রামের প্রান্তভাগে নদীর তীরে আসিয়া বসিল। প্রথম আবেগের বুকভাঙ্গা বিক্ষোভ তখন একটু শান্ত হইয়াছে,—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় প্রাণেও কিছু অবসন্নতা আসিয়াছে,—অবসন্নতার সঙ্গে চিত্তে কিছু ধীরতাও ফিরিয়াছে! বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার শক্তিও তখন কিছু মনে আসিয়াছে! রোষের আবেগ কিছু নরম হইলেও বড় বেদনা তখনও প্রাণে বাজিতেছিল! বড় ব্যথায় বড় যাতনায় রাইচরণ কাঁদিতে লাগিল!

মালতীকে সে যে বড় ভালবাসিত! সেই যে বুড়ীরহাট নদীর তীরে এমনই এক সন্ধ্যার রাঙা আভায় বালিকা মালতীর সেই বড় সুন্দর রাঙা মুখখানি সে দেখিয়াছিল,—সমস্ত প্রাণ ভরিয়া তার তেমনই মধুর রাঙা আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—সে রাঙা আভা যে কাল পর্য্যন্তও তার প্রাণ ভরিয়া ফুটিয়াছিল! আজ তা কোথায় গেল! সেই দিনের সেই সন্ধ্যা—তার সেই রাঙা আভায় কত সুন্দর কত মধুর তার লাগিয়াছিল। কিন্তু আজ! আজও ত ঠিক তেমনই এক রাঙা সন্ধ্যা তার চারিদিকে তার রাঙা আভা ছড়াইতেছে! কিন্তু এ আভায় ত সে হাসি নাই, সে মাধুরী নাই! এ যে আগুণ! আগুণের রক্তিম আভা চারিদিক হইতে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে—প্রাণের মধ্যে পর্য্যন্ত—আগুণের জ্বালা ছড়াইতেছে! মালতী! মালতী! তার সেই মালতী!—তার জীবনভরা এক মাধুরীর উৎস! আজ তায় এমন বিষের জ্বালা উঠিতেছে! এ সংসারে সর্ব্বস্ব তার মালতী,—আজ তাকে সে হারাইল। মালতী মরিলে তার চিতায় রাইচরণ হাসিতে হাসিতে দেহ ঢালিতে পারিত,—সেই মালতীকে আজ সে এমন করিয়া হারাইল! তার প্রাণের প্রাণ যে মালতী, সেই মালতী পাপ জমিদারের কুৎসিত ভোগের পাত্রী! ছি—ছি—ছি! এও কি সহিবার মত! রাইচরণের অশ্রু শুষ্ক হইল। আবার বুক ভরিয়া দারুণ অবমাননার—অসহ্য ঘৃণার—রোষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিছুকাল চুপ করিয়া রাইচরণ বসিয়া ভাবিল। বড় ভীষণ একটা সঙ্কল্প তার মনে উঠিল! ভবিষ্যতে তার আর ইহ সংসারে কি আছে? পৈতৃক বাড়ীঘর যাইতেছে, যাক্! সে ত তুচ্ছ কথা! কিন্তু মালতী! সে কি পাপ জমিদারের উপপত্নী হইয়া জীবন কাটাইবে? ধিক! এ কল্পনাও যে অসহ্য! তার চেয়ে মালতীর পাপ জীবনের অবসান আজই হউক্! মালতীকে যদি সে এত ভালবাসিয়াছিল,—পাপে তাকে রাখিয়া যাইবে না! ইহজীবনে অভাগী তার নারীজীবনের সর্ব্বস্ব যদি হারাইয়াছে,—কেবল পাপের ভোগের জন্য কেন আর সে এ পৃথিবীতে থাকিবে? এ পৃথিবীর কলঙ্কিত জীবনান্তে সে তাকে ক্ষমা করিবে, আশীর্ব্বাদ করিবে। পরলোকে দেবতা তাকে দয়া করিবেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। রাইচরণ সেই নদীতীরে বসিয়াই রহিল। বসিয়া ঐ এক কথাই ভাবিতে লাগিল। ক্রমে বহু আত্মসংগ্রামে তার সংকল্প স্থির হইল,—চিত্তেও সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্থিরতা আসিল।

নিতাই ধাঁশী ও যাদব তখন গৃহে ফিরিতেছিল। নদীতীরে তারা রাইচরণকে দেখিতে পাইল।

"এই যে রেয়ে দা! এখানে ব'সে আছ যে! আমরা দেড়শ টাকা এনেছি। বাকী টাকার যোগাড় হ'য়েছে ত?"

রাইচরণ কহিল, "হাঁ, হ'য়েছে।"

"তবে ঘরে চল না! টাকাগুলো বুঝে নেও!"

"পরে যাব। তোরা যা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এসেছিস্ খাওয়া দাওয়া করগে।"

"টাকা!"

"টাকা রেখে যা!"

বাঁশার কাছে টাকা ছিল। সে কোমর হইতে ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকা গুলি রাইচরণের সম্মুখে রাখিল।

রাইচরণ কহিল, "যা! তোরা এখন ঘরে যা।"

"তুমিও চল না? এখানে একা ব'সে আছ কেন?"

রাইচরণ উত্তর করিল, "একটি লোক আস্‌বে, তার সঙ্গে কথা আছে। তোরা যানা! আমি সে এলে পর যাব।"

বাঁশী নিতাই ও যাদব গৃহে গেল। রাইচরণ টাকার পুঁটলীটি তুলিয়া জোরে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

"যাক! যাক্! আর কেন? সব যাক্!"

তার নিজের সংগৃহীত তিন শত টাকাও একটা থলিতে তার কোমরে বাঁধা ছিল। তাও খুলিয়া সে নদীর জলে ফেলিয়া দিল।

"যাক্—যাক্! সব গেল ত—এ আর কেন? সব যাক্!"

তখন উঠিয়া রাইচরণ অন্য দিকে গেল। যদি বাঁশী নিতাইরা ফিরিয়া আসে, যদি কোনও গোল বাধায়!

সত্যই তারা ফিরিয়া আসিয়াছিল। গৃহে গিয়াই তারা সকল কথা শুনিল। তখনই তারা নদীতীরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু রাইচরণকে পাইল না। ছুটিয়া তারা রাইচরণের বাড়ীতে আসিল। রাইচরণ বাড়ীতেও আসে নাই। ভীত হইয়া তারা রাইচরণের অনুসন্ধানে আবার নদীর দিকে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীর স্পর্দ্ধা।

"মালতী!"

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান রাইচরণ। রাইচরণের চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশ রূক্ষ, দেহ ধূলিমলিন। বহিরাকৃতি উন্মত্তের ন্যায় হইলেও মুখে কি এক ভীষণ স্থির সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। স্বামীর দিকে চাহিয়া মালতী একবার শিহরিল! কিন্তু তখনই চিত্ত স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি এসেছ?"

"হাঁ, এসেছি! তুমি কি ভাবছিলে ব'সে মালতী? আমায় দেখে কি তোমার মনে হ'চ্চে মালতী?"

মালতী পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবেই স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি তবে সব কথা শুনেছ? তাই কি দিন ভ'রে বাড়ীতে এসনি? এখন কি মনে ক'রে এসেছ? আমায় কি ভাবছ? কি চোকে আমার পানে চেয়ে দেখ্ছ?"

"মালতী!"

"উঁ!"

"মালতী! তুমি কি ভাবছ? বেশ ত স্থির ভাবে চেয়ে আছ! একটু ভয় নেই, একটু লজ্জা নেই! আশ্চর্য্য সাহস তোমার! তুমি কি আমার সেই মালতী?"

মালতী স্থির অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি তোমার সেই মালতীই। তুমি আজ আমায় সে চোকে—ঠিক তোমার সেই মালতী ব'লে—দেখ্‌তে পাচ্চ না। কিন্তু আমি তোমার সেই মালতীই। পরশু পতিব্রতা ব'লে আমায় ঠাট্টা ক'রেছিলে,—আমি বড় লজ্জা পেয়েছিলুম। কিন্তু আজ আমার লজ্জা নাই। তুমি যাই শুনে, যাই ভেবে এসে থাক,—আজ বড় বিপদে আমার ভয় নাই, লজ্জা নাই,—আজ খোলা মুখে, খোলা চোকে তোমার মুখ পানে চেয়ে ব'লছি—আমি পতিব্রতা—কলঙ্কিনী নই। তুমি য শুনেছ, তা মিথ্যা!"

"মিথ্যা! মিথ্যা! বল—বল—মালতী! মিথ্যা হ'লেও আবার বল সব মিথ্যা! বল—বল—ব'লে—ব'লে—আমার মনে একটিবারের তরেও তোল—এ কথা মিথ্যা! একটিবারের তরেও যদি মনে ক'ত্তে পারি, সব মিথ্যা,—তবে এত আগুণের পর—ঐ একটুকালের শান্তির মধ্যেও—আহা! যদি আমার মাথায় আকাশের বাজ পড়ে, সুখে আমি মরব!"

"মিথ্যা—সব মিথ্যা—হুশবার ব'লব, মিথ্যা! দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন,—তাঁরা জানেন, সব মিথ্যা। আমি সতী,—এমন পাপচিন্তা মনেও কখনও ধরিনি,—সেই গরবে আমি বল্‌ছি, সব মিথ্যা। তুমি আমার স্বামী,—আমায় বড় ভালবেসেছ, বড় সুখে রেখেছ,—আজ কবছর তোমার ঘর ক'চ্চি,—দিনের পর দিন কতদিন আমাকে দেখছ, আমার প্রাণ তুমি চিনেছ,—তুমিও মনে মনে বল্‌বে, এ কথা মিথ্যা! এমন পাপ আমার মনের ধারেও আস্‌তে পারে না!"

রাইচরণ উচ্ছ্বসিত আবেগভরে কহিল, "মালতী! হয় তুমি দেবী—নয় রাক্ষসী! তোমার ওই স্পর্দ্ধায় আমি অবাক্ হ'য়ে যাচ্চি। মালতী, সত্যই আমার মন এক একবার ব'লে উঠ্‌ছে—একথা মিথ্যা! কিন্তু—কিন্তু—মালতী, কেন তবে এ কথা হ'ল। এর কি কোনও ভিত্তি নাই? সুধুই কি মিথ্যা এত বড় একটা কথা হ'ল?"

"কেন কথা হ'ল! শুন্‌বে? বিশ্বাস ক'র্‌বে?"

"বল! বিশ্বাস—সত্য ব'ল্‌ছি মনের ভিতর থেকে উঠ্‌ছে,—কিন্তু তবু মন বোঝাতে পাচ্চিনি। বল!"—

মালতী তখন ধীর স্বরে চন্দরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হইতে মীরার সাধের দিনের সকল কথা বলিল।

রাইচরণ শুনিল। একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর কহিল, "এ কথা তখন কেন আমায় বলনি, মালতী?"

"সই বারণ ক'রেছিল। কি জানি রাগের বশে যদি তুমি একটা কিছু ক'রে বস। তারপর আমিও ভাবলুম, কেন তোমার মনে একটা অশান্তি ঘটাব, তাই কিছু বলিনি।"

"হুঁ—এ কথা হয়ত বিশ্বাস ক'ত্তেও পাত্তাম,—মনকে বোঝাতেও পাত্তাম। কিন্তু পরশু রেতে—যা ঘটেছিল!"

মালতীর মুখ নত হইল। চক্ষু হইতে দুফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কম্পিত

কণ্ঠে মালতী কহিল, "কি ব'লে তোমায় বোঝাব জানি না—তাও ওই সর্ব্বনাশীর ছল,—আমার সর্ব্বনাশ ক'ত্তে, তোমার মন ভাঙ্গ্তে, রাক্ষসী ওই ছল ক'রে গেল! তুমি বিশ্বাস ক'চ্চ না। করা শক্ত। কিন্তু আমার আর কিছুই ব'লবার নাই। যদি আগের কথা বিশ্বাস কর,—যদি মনে কর আমি নির্দ্দোষ, তবে পরশুকার কথাও ছল ব'লে আপনিই মনে ক'র্‌বে। যদি তা না কর, তবে আর আমি কি ব'লব? ওই দা রয়েছে,—নেও। আমায় কেটে ফেল। সতী আমি, মত্তে ডরাইনা,—তোমার হাতে ম'রে স্বর্গে চ'লে যাব। কিন্তু তোমার কি হবে?"

মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। রাইচরণের চিত্ত সত্যই বড় নরম হইতেছিল,—মালতীর প্রতি কথায় এক একটি কোমল করুণ স্পর্শ তার মর্ম্মের তল পর্য্যন্ত গিয়া লাগিতেছিল। মালতীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে কহিল, "মালতী! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি আমি! আহা, যদি বিশ্বাস ক'ত্তে পাত্তাম,—যদি কেউ সত্যি ক'রে আমায় বুঝিয়ে দিতে পাত্ত,—এ সব মিথ্যা,—তুমি যা ব'লছ, তাই সত্য।"

মালতী অশ্রু মুছিয়া কহিল, "এমন একজন আছে, যে ব'ল্‌বে, আমার কথা সত্য। যদি ভরসা ক'রে তার কাছে যাও, সে বুঝিয়ে দেবে, কেন, কিসে আমার এ কলঙ্ক হ'য়েছে। তার কথা বিশ্বাস না ক'রে পার্‌বে না। এ কলঙ্কে সত্যই আমি কলঙ্কিত হ'লে, সে আমার হ'য়ে তোমাকে একটি কথাও ব'ল্‌বে না,—আমার মুখে নাথি মেরে চলে যাবে।"

"কে সে মালতী?"

"জমিদার বাড়ীর বড় দিদিঠাকরুণ। তিনি আমায় জানেন,—সে দিনের সব কথাও তিনি জানেন। সে দিনের কথা—আমি যা ব'ল্‌ছি,—তা যদি সত্য হয়,—তবে সব কলঙ্ক আমার মিথ্যা। পরশুকার ঘটনাও চন্দরীর চক্র!"

"মালতী! যত ভাব্‌ছি যত তোমার কথা শুন্‌ছি,—আমার মন আপনা থেকেই যেন ব'ল্‌ছে,—এ সব মিথ্যা রটনা। আমি একা হ'লে হয়ত আর কোনও প্রমাণ চাইতাম না। কিন্তু পাঁচ জনের মধ্যে তোমার কলঙ্ক হ'য়েছে, আমি বিশ্বাস ক'ল্লেও লোকে বুঝ্‌বে না। তাঁর মুখে শুন্‌তে পাল্লে, ভাল হ'ত। জোর ক'রে আমিও লোককে ব'ল্‌তে পাত্তাম, এ কলঙ্ক মিথ্যা। কিন্তু কি ক'রে তাঁর দেখা পাই? আমি আজই—এই রাত্রিতেই—সব কথা

জানতে চাই— একেবারে নিঃসন্দেহ হ'তে চাই। মনের এই অবস্থায় এক রাত্রিও আমি আর তিষ্ঠিতে পারব না। আজ এই রাত্রিতেই সবাইকে ব'লতে চাই, তুমি নিষ্কলঙ্ক। তাছাড়া আরও কারণ আছে,—আর তার প্রতিকার হবে কি না জানি না, তবু—আমি কি ক'রেছি জান?

"কি? কি ক'রেছ?"

"বাড়ী খালাশ করব ব'লে টাকা সংগ্রহ যা ক'রেছিলাম,—মনের ক্ষোভে সব তা জলে ফেলে দিয়েছি।"

"সর্ব্বনাশ! তবে কি হবে? আর যে একদিনও সময় নেই।"

"যা হয় হবে, যদি তোমাকে আবার আমার মালতী ব'লে ফিরে পাই,—সব সইব। এর মধ্যে উপায় কিছু হয়, ভাল, না হয় ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁর দেখা এখন কি ক'রে পাব?"

"চল, আমার সঙ্গে।"

"তোমার সঙ্গে! কোথায় যাবে?"

"জমিদার বাড়ীতে—বড় দিদিঠাকরুণের কাছে!"

রাইচরণ ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কঠোর স্বরে কহিল,—

"মালতী!"

মালতী মুখ তুলিয়া গ্রীবা হেলাইয়া কহিল,—"তুমি সন্দেহ ক'চ্ছ? ভাবছ, আমার মনে কোন কুঅভিসন্ধি আছে? তাই যদি থাকৃত, দুদিন তোমার অপেক্ষায় তোমার ঘরে কেন ব'সে থাকৃব? পালিয়ে যেতে পাত্‌ম না? চল, সন্দেহ ক'রো না, ওই দা আছে, সঙ্গে নেও। তুমি একাই দশজনের চেয়ে জোয়ান,—যদি সন্দেহের কোনও কিছু দেখ, আমায় কেটে ফেলে দিও!"

রাইচরণ আর দ্বিরুক্তি করিল না। বাড়ীর বাহিরে লোকজন যারা থাকিত,—তার একজনকে রাইচরণ সঙ্গে লইল। মালতীর ইচ্ছায় জগার পিসীকেও [illegible] ডাকিয়া আনিল। তারপর অন্ধকারে কয়জনে জমিদার গৃহের দিকে চলিল।

ক্রমশঃ

নাগানন্দ।

(শ্রীহর্ষদেব প্রণীত নাগানন্দ নাটকের গল্পাংশ সংকলন)

১

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে একটি মত আছে এই, যে মানুষ এবং দেবতা ইঁহাদের মধ্যে মানুষ অপেক্ষা উন্নত এবং দেবতা অপেক্ষা নিম্ন কয়েক শ্রেণীর জীব আছেন। সাধারণতঃ, 'দেবযোনি' এই নামে ইঁহারা অভিহিত। যক্ষ গন্ধর্ব্ব অপ্সর কিন্নর বিদ্যাধর সিদ্ধ প্রভৃতি ইঁহাদের মধ্যে। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত মানব ও দেব সমাজের বিবরণে অনেক সময় ইঁহাদের কথা পাওয়া যায়। এই নাগানন্দ নাটকের নায়ক বিদ্যাধর-রাজপুত্র জীমূতবাহন এবং নায়িকা সিদ্ধ-রাজপুত্রী মলয়বতী।

বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু বৃদ্ধ হইয়াছেন। পুত্র জীমূতবাহনের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া তিনি বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে তপোবনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পিতৃ-সেবায় বঞ্চিত থাকিয়া রাজ্যসুখভোগ পিতৃভক্ত পুত্র জীমূতবাহনের ভাল লাগিল না। তিনি রাজ্যশাসনের সকল সুব্যবস্থা করিয়া, সুযোগ্য বিশ্বাসী মন্ত্রিগণের হস্তে শাসন ভার রাখিয়া, তপোবনে পিতামাতার নিকট আসিয়া রহিলেন। রাজ্য সুশাসিত, প্রজাগণ সুখে আছে,—তার জন্য জীমূতবাহনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি পালন করিয়াছেন। ভোগের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। সুতরাং নিশ্চিন্ত প্রশান্ত চিত্তে জীমূতবাহন তপোবনে থাকিয়া পিতামাতার সেবায় আপনার জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

জীমূতবাহনের সখা ও সহচর আত্রেয় একদিন কহিলেন, "সখা! রাজ্য ছাড়িয়া কতদিন ত এই বনে থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিলে! এখন কিছুদিন গিয়া রাজ্য ভোগ করনা ?"

জীমূতবাহন উত্তর করিলেন, "কি প্রয়োজন তাতে সখা? পিতার সম্মুখে ভূমিতলে বসিয়া যে সুখে আছি, রাজসভায় সিংহাসনে বসিয়া কি তার চেয়ে বেশী সুখী হইব? পিতার চরণসেবায় আজ যে আনন্দের অধিকারী আমি, সাম্রাজ্যভোগে সে আনন্দ ত কখনও পাইব না? পিতার প্রসাদ ভোজনে যে তৃপ্তি পাইতেছি,—ত্রিভুবনে কি এমন ভোজ্য আছে, তাতে সেই তৃপ্তি আমি পাইব?"

"কেবল সুখের জন্য নাই হইল। কর্ত্তব্যও ত অনেক আছে।"

"তার ত ত্রুটি কিছুই হইতেছে না? রাজ্য সুসাশনের সকল ব্যবস্থাই ত করিয়া আসিয়াছি? আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?"

আত্রেয় কহিলেন, "দুঃসাহসিক মতঙ্গ * তোমার প্রবল প্রতিপক্ষ রহিয়াছে। সে যদি তোমার রাজ্য হরণের চেষ্টা করে, তোমার সহায়তা ব্যতীত কেবল মন্ত্রিগণ কি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন?"

জীমূতবাহন কহিলেন, "মতঙ্গ যদি আমার রাজ্য গ্রহণ করে, আমি সুখী হইব। নিজের শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্ব আমি পরার্থে সঁপিয়া দিতে পারি। রাজ্য কেবল পিতার অনুরোধেই রাখিতেছি,—নহিলে অনায়াসে তাকে তা ছাড়িয়া দিতে পারিতাম। রাজ্য বল, ধন বল, সব অনিত্য অসার,—তার জন্য কি এমন চিন্তা সখা?"

জীমূতকেতুর ইচ্ছা হইল, প্রকৃতির মধুময় লীলাভূমি মলয় পর্ব্বতে † আশ্রম স্থাপিত করিয়া বাকী জীবন সেখানেই বাস করেন। মনোমত একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য তিনি জীমূতবাহনকে মলয় পর্ব্বতে পাঠাইলেন। আত্রেয়কে লইয়া জীমূতবাহন মলয় পর্ব্বতে গেলেন।

ঘন চন্দনবনে পর্ব্বতগাত্র সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ সুশীতল নির্ঝর-জল-ধারা ঝর ঝর নামিতেছে,—কোথাও প্রস্তরে আহত-চূর্ণ সেই সলিলধারা হইতে শীকরকণা চারিদিকে উড়িতেছে। মধুর মলয় মারুত চন্দনের মিষ্ট গন্ধ বহিয়া, চূর্ণ নির্ঝরের শীকরকণার স্নিগ্ধ শীতলতা লইয়া, চারিদিকে বহিতেছে। মুক্তাময় শিলাভূমি পর্ব্বতচারিণী সিদ্ধাঙ্গনাগণের চরণের অলক্তকরক্তে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। জীমূতবাহনের দেহ অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। জীমূতবাহন কহিলেন, "কেমন আনন্দের আবেশে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে,—দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে। কোন ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা ত আমি করি না। তবে কেন এমন হইতেছে, সখা?"

আত্রেয় কহিলেন, "আকাঙ্ক্ষা কর না কর, নিশ্চয় বড় কোনও সুখলাভ তোমার এখানে হইবে। তাই তোমার দক্ষিণ নয়ন এমন স্পন্দিত হইতেছে।"

* বিদ্যাধরদের মধ্যেও ছোটবড় অনেক রাজা ছিলেন। জীমূতকেতু রাজচক্র বর্ত্তিত্বের দাবী করিতেন। ইহাতে বাদী ছিলেন, তাঁহার এক প্রতিপক্ষ বিদ্যাধররাজ মতঙ্গ।

† মহারাষ্ট্রে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের পৌরাণিক নাম।

জীমূতবাহন হাসিয়া কহিলেন, "দেখি কি হয় ?"

আত্রেয় সম্মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওই যে একটি তপোবন ওদিকে দেখা যাইতেছে। কি সুন্দর ঘন তরুচ্ছায়া ওখানে,—সুগন্ধ হবির ধূম ওই উঠিতেছে! মৃগশিশু নির্ভয় নিরুদ্বিগ্ন মনে ওই সুখাসনে বসিয়া আছে।"

জীমূতবাহন কহিলেন, "হাঁ তাই বটে। ওই দেখ গাছের বাকল বসনের জন্য যত্নে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। জীর্ণ কমণ্ডলু ওই স্বচ্ছ নির্ঝরের জলতলে দেখা যাইতেছে।—এখানে ওখানে ব্রাহ্মণবালকদের ছিন্ন মৌঞ্জমেখলা পড়িয়া আছে। আর শোন, গাছে ওই শুকপাখী উচ্চ শাখায় সাম গান গায়িতেছে। নিয়ত শুনিয়া শুনিয়া কিসুন্দর গান গুলি তাদের অভ্যাস হইয়াছে! আহা!"

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। জীমূতবাহন কহিলেন, "আহা, ওই দেখ সখা,—ওই শোন মুনিরা বালকদের নিকট বেদব্যাখ্যা করিতেছেন। ওই যে মুনিবালক কেহ কেহ সমিৎ কাঠ কাটিতেছে! ওই যে বালিকারা চারা গাছে জল সেচন করিতেছেন! আহা, এই যে ফলভারে নত গাছগুলি ভ্রমরগুঞ্জন ছলে যেন আমাদের স্বগত সম্ভাষণে অভিবাদন করিতেছে! আহা! কি সুন্দর! কি মধুর! বনের গাছগুলিও যেন আশ্রমে থাকিয়া অতিথি সেবা শিখিয়াছে!"

অদূরে বড় মধুর বীণার সুর বাজিয়া উঠিল। বীণার সুরে সুরমিলান মধুরতর কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। মুখের ঘাস মুখে রাখিয়া হরিণগুলি গ্রীবা হেলাইয়া উৎকর্ণ হইয়া মুগ্ধ চিত্তে সে গান শুনিতে লাগিল!

আত্রেয় কহিলেন, "বাঃ কি সুন্দর গান! কি মধুর বীণাবাদন! এই তপোবনে বীণা বাজাইয়া কে গান করিতেছে, সখা ?"

জীমূতবাহন কহিলেন, "ওইযে একটি দেবালয় দেখা যাইতেছে। বীণা ওখানেই বাজিতেছে! কোন দিব্যাঙ্গনা বোধ হয় বীণা বাজাইয়া বীণার সুরে স্তোত্র গাহিয়া দেবারাধনা করিতেছেন। চল সখা! সম্মুখে গিয়া দেখি।"

উভয়ে দেবালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

২

মলয়পর্ব্বতে সিদ্ধগণের বাস ছিল। ঐ তপোবন কুলপতি * বিশ্বামিত্রের তপোবন। তপোবনে গৌরীদেবীর একটি মন্দির ছিল। সিদ্ধ রাজকুমারী

* কোনও বিশেষ ঋষিকুলে যিনি প্রধান এবং ১০,০০০ শিষ্যকে যিনি অন্নদান ও বিদ্যাদান করেন, তাঁহার উপাধি কুলপতি।

মলয়বতী মনোমত পতিলাভের কামনা করিয়া আশ্রমে থাকিয়া গৌরীদেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। তিনিই মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া তখন বীণা বাজাইয়া দেবীর স্তুতিগান গায়িতেছিলেন।

জীমূতবাহন আত্রেয়কে লইয়া মন্দিরের কাছে আসিলেন। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, দেবালয় আলো করিয়া একটি দেবকন্যা যেন ভূতলে বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে।

জীমূতবাহন কহিলেন, "না—না—সখা! ওদিকে যাইব না। স্ত্রীলোক একা বসিয়া গান করিতেছে,—আমাদের দেখা উচিত নয়। এস, এই বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়াই আমরা গান শুনি।"

সঙ্গীতটি হইল,—বাদন বন্ধ করিয়া মলয়বতী সহচরীর দিকে চাহিলেন। সহচরী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, ভর্ত্তৃদারিকা! দেবীর সন্মুখে অবিরত এমন বাজাইয়া তোমার আঙ্গুল কি কখনও শ্রান্ত হয় না?"

মলয়বতী উত্তর করিলেন, "দূর! দেবীর কাছে বাজাই,—তাতে আঙ্গুল কখনও শ্রান্ত হয়?"

সহচরী কহিল, "না—না—আমি বলিতেছিলাম, এই নিষ্করুণা দেবীর কাছে বৃথা কত আর বাজাইবে? কুমারীজনের পক্ষে দুষ্কর নিয়মে উপবাসাদি করিয়া কতকাল ত এমন বাজাইলে, কত ত দেবীর আরাধনা করিলে! কই দেবী ত এখনও প্রসন্ন হইলেন না?

আত্রেয় মৃদুস্বরে কহিলেন, "সখা! ইনি কুমারী,—তবে দেখিতে আর দোষ কি?"

জীমূতবাহন একটু পুলকিত ভাবে হাসিয়া কহিল, "হাঁ, ইনি যদি কুমারী, তবে দেখিতে পারি বই কি? কাছে গিয়া কাজ নাই। ওই গাছের আড়াল হইতেই দেখি।"

উভয়ে আরও নিকটে একটি গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মলয়বতী আবার বীণা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলেন। মলয়বতীর নিপুণ অঙ্গুলী সঞ্চালনে বীণা হইতে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেমন মধু বর্ষিত হইতেছিল, লহরে লহরে আরও মধুর সঙ্গীতের সুরলহরী উঠিতেছিল,—রূপে যেন মূর্ত্তিময়ী মাধুরী পুষ্পিত দেবালয়-প্রাঙ্গণখানি একেবারে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। গানে ও বীনার তানে জীমূতবাহনের শ্রুতি মুগ্ধ হইয়াছিল, রূপে তাঁর নয়ন মুগ্ধ হইল, প্রাণ ভরিয়া গেল। সেই রূপ-সুধায় বিভোর হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহচরী কহিল, "ভর্তৃদারিকা! আবারও বলি, নিষ্করুণা দেবীর কাছে আর কত এমন বাজাইবে?"

এই বলিয়া সে মলয়বতীর হাত হইতে বীণাটি টানিয়া নিল।

মলয়বতী কহিলেন, "চতুরিকা দেবীর নিন্দা করিস্ না। ভগবতী আমার উপরে প্রসন্ন হইয়াছেন।"

"প্রসন্ন হইয়াছেন! সত্য? কি তবে,—কি হইয়াছিল,—কিসে বুঝিলে, বল ভর্তৃদারিকা?

মলয়বতী মধুর রক্তিমাভ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আজ স্বপ্নে এই বীণা বাজাইতেছিলাম। তখন ভগবতী গৌরীদেবী সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'মলয়বতী! তোমার এই মধুর বীণাবাদনে আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ভক্তিময়ী আরাধনাতেও আমি পরিতুষ্ট। আমি বর দিতেছি, বিদ্যাধর রাজচক্রবর্ত্তী অচিরে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।'

চতুরিকা কহিল, "এ স্বপ্ন নয় ভর্তৃদারিকা তোমার হৃদয়ের বরকেই দেবী তোমায় সত্যই দান করিয়াছেন।"

জীমূতবাহনের পুলকিত হৃদয় নাচিয়া উঠিল,—সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইল। আত্রেয় তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া মলয়বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কল্যাণ হউক! চতুরিকা, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। দেবী সত্যই বর দিয়াছেন।"

"ওমা! ইনি কে?" শশব্যস্তে উঠিয়া মলয়বতী ভয়ে ও সঙ্কোচে একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন। চতুরিকা মৃদুস্বরে কহিল, "ইনিই বুঝি গৌরীদেবীর দেওয়া সেই বর! আহা! এমন রূপ কি আর কারও হয়?"

মলয়বতী আড়চোকে একবার জীমূতবাহনের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চতুরিকা! আমার বড় লজ্জা করিতেছে। চল যাই, আর এখানে আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

এই বলিয়া মলয়বতী যাইতে উদ্যত হইলেন। আত্রেয় কহিলেন, "এই তপোবনে আপনাদের এ কিরূপ ব্যবহার? আমরা অতিথি। একবার বাক্য-সম্ভাষণও করিলেন না,—দেখিয়াই পলাইয়া যাইতেছেন।"

চতুরিকা কহিল, "সখী! সত্যই অতিথির অবজ্ঞা করা ত উচিত নয়। একজন সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত,—আর তুমি কিনা মূঢ়জনের মত একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলে? ছিঃ! আচ্ছা,—কথা মুখে না সরে,—তুমি থাক, যা বলিবার আমিই বলিব।"

এই বলিয়া চতুরিকা অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহাশয়, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আসুন,—এই স্থানটি অলঙ্কৃত করিয়া এইখানে বসুন!"

জীমূত বাহন ও আত্রেয় বসিলেন। চতুরিকাও মলয়বতীকে লইয়া নিকটে বসিল। মলয়বতী মৃদুস্বরে কহিলেন, "ছি, চতুরিকা! কোনও তাপস যদি এখানে আসিয়া দেখেন, আমাকে অবিনীতা বলিয়া মনে করিবেন।"

সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর বাসনা ছিল, বিদ্যাধর-কুমার জীমূতবাহনের হস্তে তিনি কন্যাদান করেন। জীমূতবাহন এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া বিশ্বাবসু তাঁহার পুত্র মিত্রাবসুকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি আশ্রমে আসিয়াছেন,—এদিকে মধ্যাহ্ন-স্নানেরও সময় অতীত হয়। বিশ্বামিত্রের আদেশে মলয়বতীকে ডাকিবার জন্য আশ্রমের একজন তাপস দেবমন্দিরে আসিলেন।

অদূরে মলয়বতীর নিকটে উপবিষ্ট জীমূতবাহনকে দেখিয়া তাপস মনে মনে কহিলেন, "আহা এই সুলক্ষণ বীরশ্রীময় সৌম্য দর্শন পুরুষই বোধ হয়, ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী জীমূতবাহন, ওই যে কাছেই আমাদের রাজপুত্রী। ইঁহাদের মিলন যদি বিধাতা ঘটান, সত্যই তবে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের একটি মিলন হয়!"

তাপস নিকটে গিয়া জীমূতবাহনকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "কল্যাণ হ'ক্!"

"মহর্ষি! আমি জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি।" এই বলিয়া জীমূতবাহন তাপসকে প্রণাম করিতে উঠিলেন।

তাপস কহিলেন, "না—না! উঠিবেন না। আপনি অতিথি,—গুরুর ন্যায় আমাদের পূজ্য। কষ্ট পাইবেন না,—যথাসুখে অবস্থান করুন।"

মলয়বতী উঠিয়া প্রণাম করিলেন। "মনোমত পতিলাভ কর" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তাপস তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের আদেশ জানাইলেন।

মুগ্ধচিত্তা মলয়বতীর একেবারেই ইচ্ছা হইল না, যে এখন উঠিয়া স্নানে যান। কিন্তু গুরুর আদেশ,—যাইতেই হইবে। অগত্যা তিনি উঠিলেন। অতৃপ্ত নয়নে জীমূতবাহনের দিকে চাহিতে চাহিতে মন্থর গমনে তিনি আশ্রমে আসিলেন। জীমূতবাহনও তেমনই অতৃপ্ত আকুল নয়নে মলয়বতীর পানেই চাহিয়া রহিলেন।

* * * * *

গৌরী মন্দিরের নিকটেই জীমূতবাহন পিতামাতার জন্য আশ্রমের স্থান করিলেন। তাঁহারাও মলয় পর্ব্বতে আসিলেন। এদিকে সিদ্ধরাজপুত্র

মিত্রাবসুর সঙ্গেও জীমূতবাহনের পরিচয় হইল। পিতার ইচ্ছামত তিনি আদরে জীমূতবাহনকে, মলয়বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া জীমূতবাহন সিদ্ধরাজপুরীতে গেলেন। সেখানে মহা সমারোহে জীমূত বাহনের সঙ্গে মলয়বতীর বিবাহ হইল।

৩

বিবাহের পরদিন জীমূতবাহন মলয়বতীকে লইয়া কুসুমাকর উদ্যানে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল মিত্রাবসু কি গুরু প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান।

জীমূতবাহন কহিলেন, "মলয়বতী, তোমরা তবে ঘরে যাও, আমি মিত্রাবসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শুনি, কি প্রয়োজনে তিনি আসিয়াছেন।"

মলয়বতী দাসীদের লইয়া গৃহে গেলেন। মিত্রাবসু প্রবেশ করিলেন।

মিত্রাবসুর মুখে বিশেষ ক্রুদ্ধ ভাব দেখিয়া বিস্মিত জীমূতবাহন কহিলেন, "কি হইয়াছে মিত্রাবসু? তুমি এমন ক্রুদ্ধ হইয়া কেন আসিয়াছ?"

মিত্রাবসু কহিলেন, "কুমার জীমূতবাহন! তোমার শত্রু মতঙ্গ তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। জীমূতবাহন, তোমার এখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমার আদেশ হইলেই ব্যোমচারী সিদ্ধগণ বিমানে চড়িয়া আকাশ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপে সসৈন্যে মতঙ্গকে বধ করিবে,—তোমার রাজ্য, তোমার অধীনস্থ রাজগণ, সকলকে রক্ষা করিবে। আদেশ কর জীমূতবাহন, সিদ্ধদের লইয়া যাই,—এখনই গিয়া মতঙ্গকে নিহত করি।"

জীমূতবাহন ধীর শান্তভাবে কহিলেন, "কুমার মিত্রাবসু! তুমি বীর, মতঙ্গকে বধ করিতে কোনও আয়াস তোমাকে পাইতে হইবেনা, একথা সত্য। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর হত্যার আদেশ আমি ত দিতে পারি না! অকাতরে অযাচিত হইয়া পরের সুখের জন্য এই দেহ আমি বিসর্জ্জন করিতে পারি,—রাজ্যের জন্য জীবহিংসা আমি করিব! যদি কিছু আমার শত্রু এ জগতে থাকে, তবে তা ক্লেশ। কাহারও ক্লেশের বিনাশ করিতে পারিলেই, আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার শত্রুনাশ হইল। আহা, মতঙ্গ রাজ্যলাভের জন্য বড় ক্লেশ করিতেছে,—আমাদের কৃপাপাত্র সে, তাকে কৃপা কর। তাহাতেই আমি সুখী হইব।"

মিত্রাবসু অমর্ষভরে কহিলেন, "হাঁ! বড়ই উপকারী বন্ধু সে—বড়ই আমাদের কৃপাপাত্র! তাকে দয়া করিব বই কি?"

জীমূতবাহন মিত্রাবসুর হাত ধরিয়া কহিলেন, "মিত্রাবসু! শান্ত হও,— ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, আমার কথাই সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবে। ওই আকাশে ওই সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, ওঁরদিকে একবার চাও,— নিয়ত নিজের করজালে দিগ্‌দিক্‌ পূর্ণ করিয়া অশেষ বিশ্বের প্রাণদান উনি করিতেছেন। শুধু পরহিতেই উদিত হইয়া উনি শুধু পরহিত সাধিয়াই অস্ত যাইতেছেন। সিদ্ধগণ তাই সূর্য্য দেবের স্তুতি গান করিয়া থাকেন। তুমিও সিদ্ধ, উঁহার দিকে একবার চাও, উঁহার কথা স্মরণ কর,—পরপীড়ন পরহিংসা বিস্মৃত হও,—পরহিতে একান্ত মনে রত হও!"

৪

জীমূতবাহন মলয়বতীকে লইয়া পিতার আশ্রমে আসিলেন। মলয় পর্ব্বতের নিম্নেই মহাসমুদ্র। মিত্রাবসুর সঙ্গে জীমূতবাহন সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গেলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে জীমূতবাহন কহিলেন, পূতশীলা বসিবার আসন, হরিৎ নবতৃণ শয্যা, বৃক্ষতল গৃহ, শীতল নির্ঝরসলিল পানীয়, বনের স্কন্দ মূল ভোজ্য, বনের সরল মৃগ সহচর,—প্রার্থনীয় যাহা কিছু, সব এই আশ্রমে পাইতেছি। কিন্তু একটি কেবল দুঃখ, পৃথিবীর দুঃখী কেহ এখানে নাই,—তাদের সেবার কোনও অবসর পাইতেছি না,—তাই মনে হয় বৃথাই এখানে আছি।"

তখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দ্রুতবেগে বেলাভূমির দিকে আসিতেছিল,— উভয়ে পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। দূরে পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত শুভ্র কি দেখিয়া জীমূতবাহন কহিলেন, "আহা! ওই যে মলয় পর্ব্বতের সানুদেশ গুলি শুভ্র শরতের মেঘে আবৃত হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

মিত্রাবসু কহিলেন, "কুমার! ও পর্ব্বতের সানুদেশ নয়, মৃত নাগদের স্তূপীকৃত অস্থিরাশি!"

জীমূতবাহন শিহরিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, "এত নাগ একসঙ্গে কি প্রকারে মরিল!"

মিত্রাবসু উত্তর করিলেন, "একসঙ্গে মরে নাই। বহুবৎসর দিনের পর দিন এক একটি মরিয়া ওই পর্ব্বত প্রমাণ অস্থি রাশি সঞ্চিত হইয়াছে।"

"সেকি?"

"তবে শোন তোমাকে কথাটা বলি। গরুড় পাখার তাড়নে সমুদ্র উলট পালট করিয়া এক একদিন এক একটি নাগ ধরিয়া খাইতেন।"

জীমূতবাহন কহিলেন, "ওঃ কি কষ্ট! কি নিষ্ঠুরতা! তারপর?

মিত্রাবসু কহিলেন, "গরুড় একটি মাত্র নাগ ধরিয়া খাইতেন বটে, কিন্তু তার জন্য যে ভাবে তিনি সমুদ্র উলট পালট করিতেন, তাহাতে বহু নাগ মরিত। এরূপ চলিলে নাগ কুল অচিরেই বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় নাগরাজ বাসুকি গরুড়কে কহিলেন যে———

"আমাকেই প্রথমে খাও,—নয়?"

"না—না—তা নয়?"

"এ ছাড়া আর কি তিনি বলিতে পারেন?"

"তিনি বলিলেন, 'তোমার আক্রমণে বহু নাগ অনর্থক বিনষ্ট হইতেছে। একটি মাত্র নাগ তোমার প্রয়োজন। ভাল, তুমি আর এমন করিয়া নাগকুল ধ্বংস করিওনা। নিরূপিত সময়ে প্রতিদিন একটি করিয়া নাগ তোমার আহারের জন্য আমি পাঠাইয়া দিব।'

জীমূতবাহন কহিলেন, "নাগরাজ বাসুকি তবে আর তাঁর নাগ কুলকে রক্ষা কি করিলেন? ধিক! তাঁর এক সহস্র মস্তক, দুই সহস্র জিহ্বা, তার মধ্যে একটি জিহ্বা দিয়াও কি তিনি শত্রুকে বলিতে পারিলেন না, 'একটি নাগের জন্য আমি আগে প্রাণ দিব?'

মিত্রাবসু কহিলেন, "যাই হ'ক্, গরুড় তাহাতে সম্মত হইলেন। সেই অবধি প্রত্যহ এক একটি নাগ আসে,—গরুড় তাহাকে ভক্ষণ করেন। তাদেরই অস্থিরাশি ওই হিমাচলের ভাতিতে শোভা পাইতেছে। কতবড় হইয়াছে,—দিন দিন বাড়িতেছে.—ক্রমে আর কত বাড়িবে, তার ঠিক কি?

জীমূতবাহন যারপর নাই ক্লিষ্ট বিষণ্ণমুখে কহিলেন, "ধিক! এই ত ক্ষণধ্বংসী অশুচির আধার ক্ষুদ্র শরীর। এর তরে লোকে কি না পাপাচার করিতেছে! আহা! এই নাগদের অন্তিমদশা কি ভয়ঙ্কর!"

জীমূত বাহনের মনে হইল, 'হায়! আমি কি আমার এই অসার দেহ দ্বারা একটি নাগেরও প্রাণরক্ষা করিতে পারি না?"

সিদ্ধরাজের প্রতিহারা * আসিয়া জানাইল, রাজা কুমারদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

জীমূত বাহন কহিলেন, "মিত্রাবসু! তুমি যাও। আমি একটু পরে যাইব।"

* সাধারণতঃ এই সব কার্য্যে নারী 'প্রতিহারী'রাই নিযুক্ত থাকিত। কচিৎ কখনও পুরুষ প্রতিহারের কথাও দেখা যায়।

৫

মিত্রাবসু চলিয়া গেলেন। জীমূতবাহন ক্ষুণ্ণ মনে নাগদের এই ভয়াবহ দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সহসা অদূরে স্ত্রীকণ্ঠে কাতর রোদন ধ্বনি উঠিল, "শঙ্খচূড়! বাছা আমার! তোকে আজ বধ করিবে, কেমন করিয়া তা আমি চক্ষে দেখিব ?"

জীমূত বাহন চমকিত হইয়া রোদন শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। জীমূত-বাহন দেখিলেন, একটি নাগ চলিয়াছে, তার পশ্চাতে একটি বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে, একটি দাস ছুইখানি রক্ত বস্ত্র লইয়া সঙ্গে যাইতেছে।"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "শঙ্খচূড়! বাপ আমার! নিষ্ঠুর গরুড় তোর কোমল দেহ ছিঁড়িয়া খাইবে,—কেমন করিয়া আমি তা চক্ষে দেখিব? কোন প্রাণে এ ব্যথা সহিব?"

শঙ্খচূড় কহিল, "কেন মা কাঁদিতেছ? কেন মা দুঃখ করিতেছ? অনিত্য এ জীবের জীবন। জন্ম মাত্র ধাত্রীর ন্যায় অনিত্যতাই জীবকে কোলে করেন। জননী ত তার পরে, তিনিও সেই অনিত্যতারই অধীনে। তবে আর কেন শোক কর মা? আমাকে বিদায় দেও।"

বৃদ্ধা শঙ্খচূড়ের গলা ধরিয়া বড় কাঁদিতে লাগিল। দাস কহিল, "এস শঙ্খচূড়! পুত্রস্নেহে উনি আত্মহারা, রাজকীয় প্রয়োজন বুঝিবার শক্তি উহার এখন নাই। এস, বধ্যচিহ্ন এই রক্তবস্ত্র পর,—তারপর বধ্যশিলায় উঠিয়া গরুড়ের অপেক্ষায় থাক।"

গরুড়ের আসার সময় হইয়া আসিল। দাস এইকথা বলিয়া শঙ্খচূড়ের হাতে বস্ত্র দিয়াই ভয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল। শঙ্খচূড়ের মাতা আকুল স্বরে কাঁদিয়া আছড়িয়া পড়িল।

জীমূতবাহন নিকটে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে ছিলেন। তাঁহার পর-দুঃখকাতর কোমল হৃদয় এই মাতা পুত্রের দুঃখে বড় করুণ বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আহা! এই হতভাগ্যই তবে বাসুকির পরিত্যক্ত! আহা! কেউ ত এদের নাই? আত্মীয় বন্ধু সকলেই ত এদের পরিত্যাগ করিয়াছে। আহা! এমন দুর্ভাগ্যকে যদি রক্ষা না করিতে পারি, এ শরীর ধারণে কি ফল?"

বৃদ্ধা বড় কাঁদিতে ছিল। শঙ্খচূড় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "মা, ওঠ মা, ওঠ! মন স্থির কর! আমাকে বিদায় দেও।"

বৃদ্ধা শঙ্খচূড়কে ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "হায়, হায়, হায়! বাছারে আমার! নাগকুলের রক্ষক স্বয়ং বাসুকিই তোকে ত্যাগ করিলেন, কে আর তোকে রক্ষা করিবে?"

জীমূতবাহন আর সহিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কেন, আমি রক্ষা করিব, আমি!"

বৃদ্ধার তখন আর জ্ঞান বুদ্ধি স্থির ছিল না। সহসা জীমূতবাহনকে সম্মুখে দেখিয়া সে মনে করিল, গরুড় আসিয়াছে। উন্মত্তার ন্যায় আপন উত্তরীয় বস্ত্রে শঙ্খচূড়কে ঢাকিয়া সে জীমূতবাহনের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, বড় কাতর স্বরে কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, পক্ষিরাজ! ওগো বিনতানন্দন গরুড়! আমাকে খাও, আমাকে খাও! তোমার আহারের জন্য নাগরাজ আজ আমাকেই এখানে পাঠাইয়াছেন।"

জীমূতবাহনের চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, "আহা, ইহা দেখিয়াও কি গরুড়ের একটু দয়া হইবে না?"

শঙ্খচূড় কহিল, "মা! ভয় নাই, ভয় নাই। ইনি গরুড় নন। নাগের শত্রু নন। দেখনা, সৌম্য শান্তরূপ কে এক সাধুপুরুষ এই দাঁড়াইয়া!"

জীমূতবাহন কহিলেন. মা, কাঁদিও না। আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব।"

বৃদ্ধা কৃতজ্ঞ চিত্তে অঞ্জলি বাঁধিয়া দুই হাত জীমূতবাহনের মাথায় রাখিয়া কহিল, "চিরজীবী হও রাজা চিরজীবী হও!"

জীমূতবাহন কহিলেন, "মা, ওই বধ্যচিহ্ন রক্ত বস্ত্র আমাকে দেও। আমি তায় গা ঢাকিয়া বধ্যশিলায় বসিয়া থাকি। গরুড় নাগ মনে করিয়া আমাকেই খাইবে,—তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইবে!"

বৃদ্ধা দুইহাতে কাণ ঢাকিয়া কহিল, "একি কথা বাছা, একি কথা! এযে বড় বিরুদ্ধ কথা তুমি বলিতেছ! তুমি যে রাজা, আমার পুত্র,—বরং পুত্রেরও অধিক! তোমার প্রাণ দিয়া আজ সকলের পরিত্যক্ত অভাগা শঙ্খচূড়ের প্রাণ তুমি রক্ষা করিবে? তাও কি হয়?"

শঙ্খচূড় বড় বিস্ময়ে কহিল "আহা! কি অসাধারণ উচ্চতা ইঁহার মনের গতির! এমন যে দেখা যায় না। যে প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র চণ্ডালের ঘায় কুক্কুর মাংস খাইয়া ছিলেন,—যে প্রাণ রক্ষার জন্য মহর্ষি গৌতম উপকারী নাড়ী জঙ্ঘমুনিকে বধ করিয়াছিলেন, যে প্রাণ রক্ষার জন্য পক্ষিরাজ প্রতিদিন একটি করিয়া নাগ আহার করিতেছেন—ইনি কিনা পরের হিতে অকাতরে সেই

প্রাণ দান করিতেছেন ?—মহাশয়! পরদুঃখে কৃপালু হইয়া কেমন করিয়া আত্মদান করিতে হয়, আপনি তা আজ দেখাইলেন। কিন্তু এসংকল্প আপনি ত্যাগ করুন। আমার মত ক্ষুদ্র জীব এ জগতে কত জন্মিতেছে, কত মরিতেছে। কিন্তু আপনার মত পরহিতে বদ্ধকটি মহাপুরুষ কয়জন এ পৃথিবীতে জন্মে! তাই বলিতেছি, আপনি এসংকল্প ত্যাগ করুন। আমাকেই মরিতে দিন।"

জীমূতবাহন কহিলেন, "শঙ্খচূড়! পরহিতে আত্মদান করিবার এমন অবসর যদি আজ পাইয়াছি,—আমাকে তাতে বঞ্চিত করিও না। তোমার জননী, দেখ, কিরূপ শোকাতুরা। তাঁর দিকে চাও। তাঁকে রক্ষা কর। বধ্যচিহ্ন আমাকে দেও।"

শঙ্খচূড় কহিল, "মহাশয়! আর কেন? ক্ষমা করুন! আপনার মহা-প্রাণের বিনিময়ে আমি এই ছার প্রাণ কখনও রক্ষা করিব না। এমন মহাপাপে আমার শঙ্খ-ধবল পিতৃকুল কখনও আমি মলিন করিব না। যদি আমাকে রক্ষা করিতেই চান, অন্য উপায় চিন্তা করুন। এ উপায়ে হইবে না।"

আর যে কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না শঙ্খচূড়? এই যে একমাত্র উপায়!"

জীমূতবাহন শঙ্খচূড়কে অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ইহাতে সম্মত করিতে পারিলেন না। শঙ্খচূড় তাহার মাতাকে কহিল, "মা, গরুড়ের আসিবার সময় হইল। তুমি যাও, আমাকে বিদায় দেও। মা যতবার এপৃথিবীতে আমার জন্ম হয়,—প্রতি জন্মে যেন তোমাকেই জননী পাই,—তোমার গর্ভেই জন্মি।"

মাতা কহিল, "তোকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবরে শঙ্খচূড়! আমার চরণ যে চলে না! যা হবে হউক, আমি তোর সঙ্গে এখানেই থাকিব।"

শঙ্খচূড় কহিল, "আর ত সময় বেশী নাই, মা চল তবে—ঐযে সিন্ধু তীরে ভগবান্ দক্ষিণ গোকর্ণ শিবের মন্দির। চল, ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ আর প্রণাম করিয়া আসি; তারপর নাগরাজের আদেশ পালন করি।"

শঙ্খচূড় মাতাকে লইয়া শিবমন্দিরে প্রণাম করিতে গেল। জীমূতবাহন ভাবিলেন, "আহা! এই অবসরে যদি গরুড় আসে! কিন্তু হায়! বধ্যচিহ্ন রক্ত বস্ত্র কোথায় পাইব?"

সিদ্ধরাণী মলয়বতীর জননী কুঞ্চুকীকে দিয়া জামাতাকে একজোড়া মাঙ্গলিক রক্ত বস্ত্র উপহার পাঠাইয়া ছিলেন। জীমূতবাহন ' এতীরে আছেন শুনিয়া

কঞ্চুকী ঠিক এমনই সময়ে সেই বস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইল। অযাচিত দেবতার আশীর্ব্বাদের মত এই বস্ত্রযুগল জীমূতবাহন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "যাও! দেবীকে আমার প্রণাম জানাইও।"

কঞ্চুকী চলিয়া গেল। জীমূতবাহন কহিলেন, "আহা! মলয়বতীর পাণি-গ্রহণ আজ আমার সফল হইল।"

এই বলিয়া সেই জীমূতবাহন সেই রক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বধ্যশিলায় উঠিলেন।

মেঘের ন্যায় বিশাল পক্ষপুটে গগণ আবৃত করিয়া, সেই পক্ষের তাড়নে ঝটিকার ন্যায় বাতাস উড়াইয়া গরুড় আসিল!

জীমূতবাহন বধ্যশিলায় উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "আহা! মলয়-চন্দন-লিপ্ত মলয়বতীর কোমল দেহ আলিঙ্গনে যে সুখ পাই নাই,—শৈশবে নিঃশঙ্কে মাতার কোলে শুইয়া যে আনন্দ অনুভব করি নাই, আজ এই বধ্যশিলার স্পর্শে আমি সেই সুখ ও আনন্দ পাইতেছি! আজ এই শরীরে নাগের জীবন রক্ষা করিয়া যে পুণ্য আমি অর্জ্জন করিলাম, সেই পুণ্যের ফলে জন্মে জন্মে যেন পরহিতের তরেই দেহ ধরিতে পারি।"

গরুড় অশনি-বেগে নামিয়া আসিয়া জীমূতবাহনকে লইয়া মলয় পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিল। আকাশে দেব-দুন্দুভি বাজিল,—পুষ্পবৃষ্টি হইল!

জীমূতবাহন মনে মনে কহিলেন, "আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম।"

৬

আশ্রমে জীমূতকেতু বসিয়া আছেন। পাশে বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী। মলয়বতীও শ্বশুর শ্বশ্রূর সেবার আশায় তাঁহাদের আদেশ অপেক্ষায় নিকটে বসিয়া আছেন।

জীমূতকেতু আপন মনে কহিলেন, "যৌবনে বিষয় সম্ভোগ করিয়াছি,—সুযশে রাজ্য শাসন করিয়াছি,—যাগযজ্ঞ তপস্যা ব্রতাদিও করিয়াছি। এমন শ্লাঘনীয় পুত্র আমার! অনুরূপ বংশজাতা এমন এই পুত্রবধূ আমার! জীবনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।"

এমন সময় বিশ্বাবসুর প্রতিহার আসিয়া কহিল, "কুমার জীমূতবাহন কি এখানে নাই?"

"না! সেত এখানে নাই! কেন?"

"অনেকক্ষণ তিনি সমুদ্র দেখিতে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। তাই মহারাজ বিশ্বাবসু বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছেন, তিনি এখানে আছেন কিনা ?"

সহসা কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় বৃদ্ধ পিতামাতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মলয়বতীও বড় ভীত হইলেন। অনেকক্ষণ স্বামী কোথায় গিয়াছেন,—কি জানি কি হইয়াছে ?

জীমূতকেতু করজোড়ে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন, "ত্রিভুবনের একমাত্র চক্ষু যিনি, সেই ভগবান্ সহস্রকিরণ আমার জীমূতবাহনকে রক্ষা করুন! ওকি! তারকা-জ্যোতির মত অমন উজ্জ্বলছটা বিকীর্ণ করিয়া আকাশ হইতে একি আমাদের সন্মুখে পড়িল ? কি এ ? আহা! রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার এ মাথার মণি!"

"ওমা! এ যে আমার জীমূতবাহনের চূড়া-মণি, মহারাজ!"

এই বলিয়া জীমূতবাহনের মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"না—না—না!—অমন কথা বলিওনা মা! অমন কথা বলিওনা!

এই বলিয়া মলয়বতীও সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন।

প্রতিহার কহিল, "মহারাজ! ব্যস্ত হইবেন না। এখন গরুড়ের আহারের সময়। বোধ হয় তার নখে ছিন্ন হইয়া কোন নাগের মাথার মণি উচ্চশিখর হইতে আসিয়া পড়িয়াছে।"

জীমূতকেতু কহিলেন, "তাই—তাই বুঝি হইবে। এটি কোনও নাগের চূড়া-মণিই হইবে!"

বৃদ্ধা রাণী মলয়বতীকে বুকে ধরিয়া কহিলেন, "ভয় নাই মা, ভয় নাই! তোমার অমঙ্গলের কিছু হয় নাই। আহা! এমন মঙ্গল-লক্ষণা মূর্ত্তি যার,—তার কি এমন সর্ব্বনাশ হইতে পারে ?"

শঙ্খচূড় হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই দিকে আসিতেছিল।

শঙ্খচূড় গোকর্ণদেবকে প্রণাম করিয়া যখন বধ্যশিলার কাছে আসিল, তখনই গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া পর্ব্বতশিখরে গিয়া উঠিল। সে হাহাকার করিয়া সেই পর্ব্বতশিখরে উঠিতে যাইবার পথে এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছে।

'ও কে! ও কে এমন কাঁদিতে কাঁদিতে এদিকে আসিতেছে ? মহারাজ, জিজ্ঞাসা করুন ত ও কে, কেন এমন কাঁদিতেছে ? আমার প্রাণ যেন কেমন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিতেছে!"

জীমূতকেতু শঙ্খচূড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি বাছা? কেন অমন কাঁদিতেছ? কোথায় পাগলের মত ছুটিয়া যাইতেছ?"

শঙ্খচূড় কাঁদিতে কাঁদিতে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, 'নাগরাজ আমায় আজ গরুড়ের আহারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু এক বিদ্যাধর সাধু আসিয়া আমার দুর্ভাগ্যে আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। আমি যাই, ধূলিতে ওই রক্তধারার চিহ্ন অলক্ষ্য হইয়া যাইবে,—শেষে আর পথ পাইব না।"

জীমূতকেতু কহিলেন, "কে এ তবে? পরহিতে এ আত্মাদান আর কার? এ যে আমার জীমূতবাহনই!"

হাহাকার করিয়া সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

৭

মলয়পর্ব্বতের উচ্চশিখরে জীমূতবাহনের ছিন্ন-ভিন্ন দেহের সম্মুখে গরুড় বসিয়া। গরুড় ভাবিতেছিল,—"কি আশ্চর্য্য! কত নাগই ত খাইতেছি!—এমন ত কখনও দেখি নাই!—নখে চঞ্চুতে মাংস ছেদন করিতেছি, ইহার বেদনা বোধ নাই। বরং আনন্দই যেন ইনি বোধ করিতেছেন! কে ইনি?"

"গরুড়! গরুড়! খাও, খাও!—আরও খাও! তৃপ্ত হও! এখনও ত দেহে মাংস আছে! এখনও ত শিরার মুখে রক্ত ঝরিতেছে! খাও—খাও! তৃপ্ত হও! কেন বিরত হইলে?"

জীমূতবাহনের কথায় গরুড়ের কঠোর হৃদয়ও স্পর্শ করিল। সে কহিল, "কে তুমি মহাত্মা! কঠিন চঞ্চু দিয়া তোমার হৃদয়ের রক্ত আমি আহরণ করিয়াছি,—ধৈর্য্য বলে আমার হৃদয়ের রক্তও তুমি এখন আহরণ করিতেছ! কে তুমি মহাত্মা?"

জীমূতবাহন কহিলেন, "তুমি ক্ষুধার্ত্ত!—খাও,—তৃপ্ত হও! তারপর আমার পরিচয় শুনিবে।"

শঙ্খচূড় ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিতে করিতে কহিল, "গরুড়! গরুড়! এমন সর্ব্বনাশ ক'রোনা,—ক'রোনা! একে ছাড়! ইনি নাগ নন এই যে নাগ আমি আসিয়াছি,—আমাকে খাও! বাসুকি আজ আমাকেই তোমার আহারের জন্য পাঠাইয়াছেন।"

জীমূতবাহন কাতরস্বরে কহিলেন, "শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়! হায়, হায়! কেন তুমি আসিলে! আমার মনোবাঞ্ছা পূরণে কেন আসিয়া এমন বাধা দিলে?"

গরুড় কহিল, 'তুমি নাগ আমার আহারের জন্য আসিয়াছ ? হায়, হায়! এ তবে আমি কোন মহাত্মার দেহের মাংস নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন করিয়া খাইতেছি ?"

শঙ্খচূড় কহিল, "ইনি বিদ্যাধর বংশতিলক জীমূতবাহন!"

"ইনিই জীমূতবাহন! সুমেরুশৈলে, মন্দরের গুহায়, হিমাচলের সানুদেশে, মহেন্দ্রে ও কৈলাশে, মলয়ের পূর্ব্বভাগে, দিগন্তের কানন সীমায়, লোকালোক গিরিশিখরে, বৈতালিকগণ উচ্চকণ্ঠে নিয়ত যাঁর যশোগান গায়, ইনি কি সেই জীমূতবাহন! তিনিই কি আজ বিপন্ন নাগের প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকে আত্মশরীর দান করিয়াছেন! হায়, হায়! কি এ মহাপাপ আমি করিতেছি! একজন বোধিসত্ত্ব মহাত্মাকে আমি বধ করিতেছি! অগ্নিতে প্রবেশ করা ব্যতীত এ মহাপাপের আর যে কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছিনা ? কোথায় অগ্নি! কোথায় অগ্নি! কে আমাকে অগ্নি দিবে ?—ওই যে কে একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ—যেন এ দিকে আসিতেছেন! উনিই তবে আমাকে দয়া করিবেন।"

শঙ্খচূড় চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "কুমার! কুমার! ওই যে তোমার পিতা মাতা এ দিকে আসিতেছেন ?"

জীমূতবাহন কহিলেন, "শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়! শীঘ্র তোমার উত্তরীয় বস্ত্রে আমার এই ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ ঢাকিয়া দাও! ওরা যদি এ অবস্থায় আমাকে দেখিতে পান, তবে প্রাণে বাঁচিবেন না।"

শঙ্খচূড় দ্রুত উত্তরীয় বস্ত্র খুলিয়া জীমূতবাহনকে ঢাকিয়া দিল।

জীমূতবাহনের পিতামাতা এবং মলয়বতী ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া কাছে আছড়িয়া পড়িলেন। তারপর জীমূতবাহনকে জীবিত দেখিয়া কথঞ্চিৎ চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহারা নিকটে আসিয়া বসিলেন। জীমূতবাহন পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। মাতা পুত্রের নবযৌবন শোভাময় দেহের এই দশা দেখিয়া—গরুড়কে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জীমূতবাহন কহিলেন, "মা! গরুড়ের কি দোষ মা! দেহ ত এইই! বাহিরে তার যাই শোভা থাক্,—ভিতরের মেদ মাংস অস্থি রক্তের ত স্বভাবতঃই এই বিভৎস দর্শন। গরুড় তা খুলিয়া দেখাইয়াছে মাত্র। কি এমন দোষ তার ?"

গরুড় কহিল, "হায়! হায়! আমি যে নরকের আগুনে দগ্ধ হইতেছি! মহাত্মা! বলুন, কিসে আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? কিসে আমি এ দারুণ জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করিব ?"

জীমূতবাহন কহিলেন, "জীবহিংসায় ক্ষান্ত হও! অনুতাপে হিংসাজাত পূর্ব্বপাপ ক্ষয় কর! সকল জীবকে অভয় দেও। তোমার পাপের ফল সেই পুণ্যে ক্ষীণ হইবে!"

গরুড় কাঁদিয়া কহিল, "তাই করিব, তাই করিব! আজ শপথ করিলাম, আর কখনও প্রাণী হত্যা করিব না। আজ হইতে সিন্ধুজলে নাগেরা সুখে বিচরণ করুক!"

জীমূতবাহনের মুখে আনন্দের ও তৃপ্তির প্রসন্নতা ভাতিয়া উঠিল। কিন্তু অবিলম্বেই দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল! যেন গরুড়ের মুখে এই কথাটি শুনিবার জন্যই তিনি অমিত ধৈর্য্যে ও তেজে দেহমধ্যে প্রাণ ধরিয়া রাখিতেছিলেন। শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল,—শেষ তৃপ্তিতে তিনি চরিতার্থ হইলেন। সংসারের সকল কামনা যেন তাঁর পূর্ণ হইল,—সকল বাঁধন টুটিল। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর কালছায়া তাঁর উজ্জ্বলমুখে আসিয়া পড়িল। মৃত্যুর অবসাদে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

সকলে আবার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া তাঁর দেহের উপরে লুটাইয়া পড়িলেন।

মাতা করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে কাঁদিয়া কহিলেন, "ভগবান্ লোকপালগণ! অমৃত সিঞ্চন করিয়া আমার পুত্রের প্রাণ তোমরা দেও!"

"অমৃত! অমৃত! ভাল আমিই কেন স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে গিয়া অমৃত প্রার্থনা করিনা? স্বর্গ হইতে অমৃতবর্ষণে—কেবল জীমূতবাহনকে কেন, সমস্ত ওই অস্থিশেষ নাগদেরও বাঁচাইব! যদি ইন্দ্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন,—পক্ষাঘাতে সমস্ত আকাশের বায়ুমণ্ডল উথল পাথল করিব,—সমস্ত সাগরের জল পান করিব,—আমার নেত্রানলদাহে দ্বাদশ আদিত্যকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভূতলে ফেলিব। চঞ্চুর আঘাতে ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, কুবেরের গদা চূর্ণ বিচূর্ণ করিব! দেবলোক জিনিয়া নূতন এক অমৃত দেশ সৃজন করিব।"

এই বলিয়া গরুড় ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিয়া গেল।

সকলে চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মলয়বতী করজোড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন, "ভগবতী গৌরী! তুমি না বলিয়াছিলে, বিদ্যাধর-রাজচক্রবর্ত্তী আমার পতি হইবেন? এ কি তবে হইল মা? অভাগিনীর কর্ম্মদোষে তুমিও কি মা অলীক-বাদিনী হইলে?

মলয়বতীর কাতর প্রার্থনায় সহসা গৌরীদেবী আবির্ভূতা হইলেন। গৌরী কহিলেন, "মা, ভয় নাই,—আমি অলীক-বাদিনী নই!"

গৌরীর হাতে কমণ্ডলু ছিল, কমণ্ডলু হইতে জীমূতবাহনের দেহে জল-সিঞ্চন করিতে করিতে গৌরীদেবী কহিলেন, "বৎস! নিজের জীবন দিয়া তুমি জগতের হিতসাধন করিয়াছ! ওঠ বৎস! ওঠ! আবার বাঁচিয়া ওঠ!"

গৌরীর আশীর্ব্বাদে অক্ষতদেহে জীবিত হইয়া জীমূতবাহন উঠিয়া বসিলেন, উঠিয়া দেবীর চরণে নতশিরে প্রণাম করিলেন।

সহসা আকাশ হইতে তখন অমৃত বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

গৌরী কহিলেন, "ঐ দেখ,—ঐ দেখ, মহারাজ! গরুড় আকাশ হইতে অমৃতবৃষ্টি করিতেছেন। ঐ দেখ, অস্থি-শেষ নাগেরা সকলে বাঁচিয়া উঠিয়া রসনাগ্রে অমৃতধারা পান করিতে করিতে গিরি-নদীর ন্যায় সাগরজলে নামিতেছে!—বৎস জীমূতবাহন! স্থধু জীবনদানই তোমার যথেষ্ট পুরস্কার নয়। বিদ্যাধর-রাজচক্রবর্ত্তীর পদে তোমাকে আমি আজ অভিষিক্ত করিলাম। তোমার শত্রু মতঙ্গ এবং তার অনুগত আর আর বিদ্যাধর রাজগণ,—ঐ দেখ, দূরে নতশিরে আমাকে নমস্কার করিতেছেন। তারা তোমারই অধীন হইয়া থাকিবেন! বল জীমূতবাহন! আর কি তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে?"

জীমূতবাহন করজোড়ে কহিলেন, "দেবী! সব আকাঙ্ক্ষাই আমার আজ পূর্ণ হইল। আর কি চাহিব! তবু এই একটি প্রার্থনা আমার আছে—মেঘ সকল যেন যথাকালে বারিবর্ষণ করেন; এ রাজ্যের প্রজাগণ যেন মঙ্গলে থাকে; পরের দ্বেষ না করিয়া নিয়ত যেন সকলে পুণ্য আহরণ করে; সকলে যেন সকলের বন্ধু হইয়া মনের সুখে জীবন যাপন করে।"

মণিমুকুট। (শার্লক হোম)

(শ্রীযুত প্রমথ নাথ দাস গুপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পূর্ব্বাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—ইংলণ্ডের অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তি, বিখ্যাত ব্যাঙ্কার আলেকজণ্ডার হোল্ডারের নিকট একটি অতি বহুমূল্য এবং সাধারণের পরিচিত 'মণিমুকুট' চারিদিনের জন্য বন্ধক রাখিয়া ৫০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ করেন। হোল্ডার সাবধানে রাখিবার জন্য মুকুটখানি গৃহে আনিয়া নিজের পোষাকের ঘরে দেরাজের মধ্যে রাখিলেন। তাঁহার পুত্র আর্থার এবং ভ্রাতুস্পুত্রী মেরী এই মুকুটের কথা জানিল। আর্থার কুসঙ্গে পড়িয়া অপব্যয়ে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। সেইদিন রাত্রিতেই পিতার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু পিতা দিলেন না।

আর্থার অসন্তুষ্ট হইয়া শুইতে গেল। রাত্রি দুইটার সময় হঠাৎ কি শব্দ হওয়ায় হোল্ডার সাহেব বাহির হইয়া দেখিলেন, আর্থার সেই পোষাকের ঘরে মুকুটখানি দুইহাতে ধরিয়া মোচড়াইতেছে এবং তিনটি মণি সহ মুকুটের একটি কোণ নাই। আর্থারই এই ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিতেছে, দেখিয়া হোল্ডার সাহেব ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গালি দিয়া পুত্রকে আসিয়া ধরিলেন। আর্থারও রূঢ় ভাবে উত্তর করিল, সে চুরি করিতেছে না। প্রকৃত ঘটনা কি তাও বলিবে না। অবশেষে পুলিশ ডাকিয়া পুলিশের হাতে আর্থারকে দিয়া তিনি শার্লক হোমের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন। হোম হোল্ডার সাহেবের বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর চারি ধারে বরফের উপর পদচিহ্নাদি পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য অনেক তদন্ত করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, আর্থার এই দুষ্কার্য্য করে নাই। তাঁহার ভাবে বোধ হইল, প্রকৃত রহস্যও তিনি ভেদ করিতে পারিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তখন কিছু না বলিয়া সঙ্গী ডাক্তার ওয়াটসনকে লইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। তারপর একজন বাজে লোকের ছদ্মবেশ ধরিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আমার চা পানের অব্যবহিত পরেই হোম পুরাতন একজোড়া বুট জুতা হাতে করিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন; ভাবে বেশ ফুর্ত্তি দেখাগেল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি জুতা জোড়া এককোনে ফেলিয়া দিয়া চা পান করিতে করিতে বলিলেন, "ওয়াট্সন্, আবার এখনই আমি যাইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায়?" হোম কহিলেন, "ওয়েষ্টেণ্ডের একেবারে ওধারে। সম্ভবতঃ আমি শীঘ্রই ফিরিব; যদি বিলম্ব হয় তবে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

আমি। তোমার কাজের খবর কি?

হোম। একরকম মন্দ নয়। বিশেষ আপশোষের কারণ এখনও কিছু নাই। তোমার সহিত সাক্ষাতের পরে আমি ষ্ট্রেথামে গিয়াছিলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে যাই নাই। ঘটনাটি বেশ রহস্যপূর্ণই বটে। যাহা হউক, এখানে বসিয়া বৃথা গল্প করিয়া কোন ফল নাই। কার্য্য শেষ করিয়া আমার এই কদর্য্য কাপড় চোপড় ছাড়িয়া আবার বেশ ভদ্রলোকটি হইয়া বসিতে হইবে।"

হোমের উজ্জ্বল চক্ষু ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে বেশ সন্তুষ্টই বোধ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি শেষ করিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন।

আমি দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত হোমের জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে শয়ন করিলাম। অনেক সময় কার্য্যোপলক্ষে তিনি ক্রমাগত কয়েকদিন বাড়ীতে আসিতেন না। সুতরাং তাঁহার এরূপ বিলম্বের জন্য চিন্তার কোন কারণ ছিল না। তিনি যে কখন বাড়ী ফিরিলেন, তাহা আমি টের পাই নাই। সকালে আহারের সময়

নীচের ঘরে আসিয়া দেখিলাম, হোম অন্যদিনের মতই কফি পান করিতে করিতে সংবাদপত্র পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি কহিলেন, "ওয়াট্‌সন্, তোমাকে ফেলিয়াই আজ কফি পান করিতেছি, সেজন্য ক্ষমা করিও। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে আমাদের মক্কেলটির আজ সকালেই এখানে আসার কথা।"

আমি কহিলাম,—"সকাল আর কোথায় আছে,এখন ত বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।—ওহে ঘণ্টার শব্দ পাইতেছি—বোধ হয় তিনি আসিতেছেন।"

এই কথা বলিবামাত্রই আমাদের মিষ্টার হোল্ডার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার চেহারার ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহার বর্ত্তমান ক্লান্ত ও উদাস ভাব প্রথমদিনের উন্মত্ত-ভাব অপেক্ষা অধিক শোচনীয় বোধ হইল। তিনি সম্পূর্ণ উদাস ভাবে চেয়ারে বসিয়া কহিলেন—"হায়, কি পাপে আমার এমন শাস্তি হইল! দুই দিন পূর্ব্বেও আমি পৃথিবীর মধ্যে একজন অতি সুখী লোক ছিলাম। কোন ভাবনা চিন্তাই আমার ছিল না। আর আজ আমার বিপদের উপর বিপদ, প্রাণাধিকা মেরীও আমাকে একাকী ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

হোম। বলেন কি? মেরী চলিয়া গিয়াছেন?

হোল্ডার। হাঁ মহাশয়। আজ সকালে তার বিছানা শূন্য দেখা গেল। কেবল আমার নামে একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি রাগ করিয়াও কিছু বলি নাই। কাল রাত্রে নিতান্ত দুঃখের সহিত মাত্র বলিয়াছিলাম যে, সে যদি আমার ছেলেকে বিবাহ করিত, তবে সকল দিকেই ভাল হইত। বোধ হয় আমার একথা বলা ভাল হয় নাই। তাহার পত্রে সে ঐ কথাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছে। পত্রে লেখা ছিল—

'প্রিয়তম খুড়া মহাশয়—আমার মনে হইতেছে যে আমিই আপনার সর্ব্বনাশের মূল, আমি যদি ভিন্ন পথে চলিতাম তবে বোধহয় আজ আপনি এরূপ ভাবে বিপন্ন হইতেন না। এমতাবস্থায় আমি আর আপনার নিকটে থাকিয়া কখনই সুখী হইতে পারিব না, সুতরাং চিরকাল আপনার চক্ষুর অন্তরালে থাকাই উচিত মনে করিয়া আপনার বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, কারণ আমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা একপ্রকার স্থির হইয়াছে। আপনার নিকট বিশেষ অনুরোধ যে আমার অনুসন্ধান করিবেন না, কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না বরং আমার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। জীবনে মরণে আমি আপনারই—

স্নেহের মেরী!'

মিষ্টার হোম্, মেরীর এই পত্র পড়িয়া কি আপনার মনে হয় যে সে আত্মহত্যা করিবে?"

হোম্। না না, সে আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। মিষ্টার হোল্ডার, আমার বোধ হয় আপনি শীঘ্রই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

হোল্ডার। আহা! আপনি এমন কথা বলিতেছেন! তা'হলে বোধ হয় আপনি কিছু শুনিয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিলে দয়া করিয়া বলুন, হীরা কয়খানি কোথায়?

হোম। তার প্রত্যেকটির জন্য হাজার পাউণ্ড করিয়া দিতে হইলেও, বোধ হয় আপনি অধিক বলিয়া মনে করিবেন না?

হোল্ডার। আমি দশহাজার পাউণ্ড ও দিতে পারি।

হোম। অত লাগিবে না, তিন হাজার হইলেই চলিবে। তাহার উপর বোধ হয় যৎসামান্য পুরস্কারও দিবেন। যাক্ আপনার চেক বহি সঙ্গে আছে কি? এই কলম রহিয়াছে, চারি হাজারের চেকই বরং দিতে পারেন।

হোল্ডার তখন অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে একখানা চেক লিখিয়া দিলেন। হোমও চেকখানি লইয়া গিয়া ডেস্কের ভিতর হইতে তিনখানা হীরকবসান ছোট ত্রিকোণ একখণ্ড স্বর্ণ বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন। দেখিয়াই হোল্ডার সাহেব আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এই যে আপনি পাইয়াছেন। আঃ! আমাকে রক্ষা করিলেন। বাঁচিলাম মহাশয়!"—এই বলিয়া তিনি সেই রত্ন সহ সোণাখণ্ড বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ঐ সময়ের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, দুঃখের প্রতিক্রিয়ায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস হইল, তার সেই দুঃখের উত্তেজনারই সমান। হোম তখন গম্ভীরভাবে হোল্ডারকে কহিলেন—"আপনি আরও এক বিষয়ে ঋণী আছেন।" হোমের এই কথা শুনিয়াই হোল্ডার পুনরায় কলম হাতে লইয়া কহিলেন—"বলুন আর কত টাকা দিতে হইবে। এখনই চেক দিতেছি।"

হোম। সে ঋণ আমার নিকট নহে—আপনার সদাশয় পুত্রের নিকট। এই মহানুভব যুবক এ ব্যাপারে যেরূপ মহত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আপনিও উহার পিতা বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

হোল্ডার। তবে আর্থার চুরি করে নাই?

হোম। আমি কালও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—আর্থার নির্দোষী।

হোল্ডার। আপনি ঠিক বলিতেছেন! তবে চলুন মহাশয়, আমরা

এখনই গিয়া তাকে বলি যে আমরা ভুল করিয়াছিলাম, এখন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি।

হোম। সে তাহা পূর্ব্বেই জানিয়াছে। আমি সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াই একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। যখন দেখিলাম সে কোন কথাই প্রকাশ করিবে না, তখন আমিই তাহাকে ঘটনাটি সমস্ত বলিলাম। আমার বলার পরে সে আমার কথিত বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আমি স্পষ্ট জানিতে পারি নাই এরূপ দুই চারিটি কথাও সে প্রকাশ করিয়াছে। আজ আপনি যে সংবাদ আনিয়াছেন, তাহা জানিলে আজ আপনাকেও সব বলিবে।

হোল্ডার। দোহাই ঈশ্বরের, মহাশয়, বলুন এ ভয়ানক রহস্য কি?

হোম। সমস্তই বলিব,—কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আমি এই জটিল রহস্য ভেদ করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি. তাহাও আপনাকে বুঝাইয়া দিব। প্রথমেই আপনাকে এমন একটি কঠিন কথা বলিতে হইবে, যাহা আমার পক্ষে বলাও যেমন ক্লেশকর, আপনার পক্ষে শোনাও তেমন ক্লেশকর হইবে। কথাটি এই যে মেরী ও সার জর্জ্জ বার্ণওয়েলের মধ্যে একটা গুপ্ত সম্বন্ধ হইয়াছে। উভয়েই একত্রে পলায়ন করিয়াছে।

হোল্ডার। আমার মেরী! অসম্ভব!

হোম। আপনি এ ঘটনা অসম্ভব মনে করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা কেবল সম্ভব যে তা নয়,— নিশ্চিত। সার জর্জ্জ বার্ণওয়েলকে যখন আপনি ও আর্থার বন্ধু জ্ঞানে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেন তখন উহার প্রকৃতি কেহই জানিতেন না। লোকটা ইংলণ্ডের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর বদমায়েস, ইহার মত বিবেক ও হৃদয়হীন, দুঃসাহসী পাপিষ্ঠ লোক অ'ত অল্পই আছে। জুয়া খেলিয়া লোকটা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। মেরী উহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, সুতরাং আরও শত শত বালিকার ন্যায় নানাপ্রকার মিষ্টবচনে সরলা মেরীকেও সে ভুলাইয়াছিল। মেরী এখন তাহার ক্রীড়ার পুতুলের মত হইল। নিত্যই সন্ধ্যায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইত।

হোল্ডার। আমি একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

হোম। সেদিন রাত্রিতে আপনার বাড়ীতে কি ঘটনা হইয়াছিল, তবে শুনুন। মেরী যখন মনে করিল যে আপনি শয়ন করিতে গিয়াছেন, তখন সে নীচের তালায় গিয়া আস্তাবলের গ'লর কাছের জানালা দিয়া বার্ণওয়েলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকায় বরফের উপরে অত্যন্ত

গভীর হইয়া উহার পদচিহ্ন পড়িয়াছিল। কথায় কথায় মেরীর নিকট হই
মণিমুকুটের কথা শুনিয়া উহার মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। তখন সে মের
দ্বারা কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। উহাদের কথাবা
চলিতেছে, এমন সময় আপনি নীচের তালায় যান। মেরী তাড়াতাড়ি জানা
বন্ধ করিয়া আপনাকে কাঠের পা-ওয়ালা একটা লোকের সহিত কোন বি
বাহিরে যাওয়ায় কথা বলিল। সে কথাও সত্যই বটে। আপনি ইহার প
গিয়া শয়ন করিলেন। এ দিকে আর্থারও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি
গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু ক্লাবের দেনার চিন্তায় তাহার ভাল ঘুম হয় নাই
মধ্যরাত্রে সে তাহার দরজার নিকটে মৃদু পদ শব্দ পাইয়া উঠিয়া দেখিল
মেরী চোরের ন্যায় আপনার পোষাকগৃহে প্রবেশ করিল। আর্থার তৎ
অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত অন্ধকারে লুকাইয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিল।
দেখিল মেরী মুকুট হস্তে আপনার পোষাক ঘর হইতে বাহির হইয়া নী
চলিয়া গেল, আর্থারও দৌড়িয়া গিয়া লুকাইয়া দেখিল যে মেরী জানা
খুলিয়া মুকুট খানি একজনের হাতে দিয়াই আবার উহা বন্ধ করিয়া গিয়া শ
করিল। যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে সেই মেরী লজ্জা পাইবে ইহা ভাবি
আর্থার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু মেরী চলিয়া গেলে পর তাহার ম
হইল এঘটনায় আপনার কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে। সে তৎক্ষণাৎ খা
পায়েই নীচে গিয়া জানালা দিয়া পথে বাহির হইল এবং চন্দ্রালোকে অদূ
একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া বরফের উপর দিয়া দৌড়াইয়া গিয়া লোকটা
ধরিয়া ফেলিল। সার জর্জ্জ বার্ণওয়েল মুকুট লইয়া পলায়নের চেষ্টা করি
কিন্তু আপনার পুত্র মুকুটের এক ধার ধরিয়া টানাটানি করি
লাগিল,—উভয়ে কতকক্ষণ টানাটানি ধস্তাধস্তি হইল। আপনার পুত্র বা
ওয়েলকে চক্ষুর উপরে অত্যন্ত আঘাত করিল। হটাৎ কেমন
করিয়া একটা আওয়াজ হইল। আর্থার দেখিল মুকুট খানি তারই হাতে
সে অমনই ছুটিয়া ঘরে আসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া উপরে আপনার ঘ
আসিল। এবং মুকুট খানি বাঁকিয়া গিয়াছে দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইয়
উহা সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই অবস্থায় আপনি তাহা
দেখিতে পাইয়াছেন।

হোল্ডার—কি আশ্চর্য্য! এও কি সম্ভব?

হোম—তারপর সে যখন মনে করিতেছিল, এই কার্য্যের জন্য আপনা

নিকট হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবে, আপনি সেই সময় নানা দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিলেন। এদিকে মেরীর খাতিরে সে কিছু প্রকাশও করিতে পারে না—যদিও মেরী এরূপ দয়ার যোগ্য একটুও নয়। যাহা হউক, মহাপ্রাণ আর্থার স্থির করিল, সে কিছুই বলিবে না।

হোল্ডার। ওঃ সেই জন্যেই মেরী মুকুট দেখিয়াই চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। হায়! আমি কি বোকার মতই কার্য্য করিয়াছি! আর্থার পাঁচ মিনিটের জন্য একবার বাহিরে গিয়া বোধ হয় দেখিতে চাহিয়াছিল, যে মুকুটের ভাঙ্গা অংশ পথে পড়িয়া রহিয়াছে কিনা। তখনও আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম!

হোম। আপনার বাড়ীতে আসিয়াই আমি চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম বরফের উপরে কোন দাগ রহিয়াছে কিনা। ঘটনার রাত্রির পরে আর বরফ পড়ে নাই বলিয়া সমস্ত চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল। রান্নাঘরের দরজার নিকটে হতে পদচিহ্ন পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, একটি স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়াইয়া একটি পুরুষের সহিত কথা বলিয়াছিল,—পুরুষের একটি পায়ের দাগ গোল দেখিয়া বুঝিলাম তাহার কাঠের পা ছিল। এখানকার এই দাগগুলি ঝির এবং তাহার প্রণয়ীর বলিয়া আমার তখন মনে হইল, কারণ একথা আপনার নিকটেই শুনিয়াছিলাম। বাগানের চতুর্দ্দিকের পদচিহ্ন কয়টি পুলিশের বলিয়াই বোধ হইল। পরে আস্তাবলের গলির দাগগুলির মধ্যে দেখিলাম, একটি জটিল রহস্যপূর্ণ ঘটনা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত রহিয়াছে। সেখানে দুই সারি বুটের চিহ্ন ও অপর দুই সারি খালি পায়ের চিহ্ন দেখিয়াই আপনার বিবরণের সহিত মিলাইয়া বুঝিলাম, খালি পায়ের দাগগুলি আপনার পুত্রের। প্রথম দাগগুলি যাহার সে একবার আসিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর গুলি মধ্যে মধ্যে বুটের দাগের উপরে পড়ায় বুঝিলাম শেষের লোকটি প্রথম লোকের পশ্চাতে দৌড়াইয়া গিয়াছে। প্রথম বুটের দাগ অনুসরণ করিয়া জানালা পর্য্যন্ত আসিয়া সম্পূর্ণ বুটের গভীর চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, লোকটি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। ঐস্থান হইতে বিপরীত দিকে দ্বিতীয় লাইন বুটের দাগ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রায় একশত গজ দূরে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে বরফ গুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং বুটের কয়েকটি দাগ ঘুরিয়া ফিরিয়া পড়িয়াছে, তার উপরে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগও রহিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিলাম যে ঐস্থানে ধস্তাধস্তি হইয়াছে। সেখান হইতে বুটের দাগ ধরিয়া কিয়দ্দুর গিয়া আবার রক্তের দাগ দেখিয়া বুঝিলাম আহত

লোকটি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বড় রাস্তায় পড়িয়া আর সেই চিহ্ন দেখিলাম না। সুতরাং ঐ সূত্রটি সেখানেই শেষ হইল। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই পরকলা দ্বারা জানালার কাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। তাহাতে বুঝিলাম, একজন বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে কারণ ভিতর দিকে ভিজা পায়ের দাগ ছিল। এই সব হইতেই ঘটনা সম্বন্ধে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম যে একজন জানালার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, অন্য একজন মুকুট আনিয়া তাহাকে দেয়, আপনার পুত্র এ ব্যাপার দেখিতে পাইয়া চোরের পশ্চাদনুসরণ করে এবং তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া মুকুট খানি কাড়িয়া লয়। কিন্তু উহার একখণ্ড চোরের হাতেই থাকে ও দুজনের কাড়াকাড়ির সময় একজন আহত হয়। এপর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তখন প্রশ্ন হইল এই যে, এই অপর লোকটি কে এবং মুকুটখানি তাহার নিকট কে আনিয়া দেয়?

আমার একটী পুরাতন সিদ্ধান্ত এই যে অসম্ভব বলিয়া বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহাই সত্য। আমি দেখিলাম যে আপনি মুকুট আনিয়া দিতে পারেন না, তখন বাকী রহিল মেরী আর ঝি চাকর। কিন্তু ঝি চাকর হইলে আপনার পুত্র কখনই নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নীরবে থাকিত না। মেরীকে আর্থার ভালবাসে বলিয়া তাহার পক্ষে এরূপ ভয়ানক অপরাধ গোপন করা সম্ভব। তৎপরে যখন মনে হইল আপনি মেরীকে জানালার ধারে দেখিয়াছিলেন, এবং সে মুকুট দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তখন আমার মেরী সম্বন্ধে ধারণা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। এখন কথা এই যে মেরী যাহার জন্য এরূপ কার্য্য করিতে পারে তাহাকে সে নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে অধিক ভালবাসে। আমি শুনিয়াছি বার্ণওয়েল ভিন্ন অন্য অতি অল্প লোকের সহিতই আপনাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আছে। স্ত্রীলোক সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার সুযশ নাই, একথা জানিতাম। সুতরাং আমার ধারণা হইল বুট পায়ে দিয়া সেই আসিয়া মুকুট লইয়াছিল এবং তাহার নিকটেই বাকী টুকরা খানা আছে। বার্ণওয়েলের স্থির বিশ্বাস ছিল যে আর্থার তাহাকে চিনিতে পারিয়াও মেরীর জন্য কিছুই প্রকাশ করিবে না।

তারপরে আমি একটা ছোটলোকের বেশে বার্ণওয়েলের বাড়ীতে গিয়া তাহার চাকরের সহিত ভাব করিয়া জানিলাম গতরাত্রে তাহার প্রভুর কপাল কাটিয়া গিয়াছে। তখন ছয় শিলিং দিয়া তাহার প্রভুর পরিত্যক্ত একজোড়া

বুট ক্রয় করিয়া ষ্ট্রেথামে যাইয়া দেখিলাম পায়ের দাগের সহিত ঠিক মিলিয়াছে।

হোল্ডার—ওহো, তাই আমি কাল সন্ধ্যার সময় ছোটলোকের মত কাহাকে গলিতে দেখিয়াছিলাম।

হোম—সে আমিই। পরে আমি বাসায় গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। লোক কে তা বুঝিলাম, কিন্তু বড় কঠিন সমস্যায় পড়িলাম। কোন মামলা মোকদ্দমা হইতে পারে না, কারণ তাহাতে বড় কেলেঙ্কারী হইবে। যাহা হউক, আমি বার্ণওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। প্রথমে সে সমস্ত অস্বীকার করিল। কিন্তু আমি যখন সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলাম, তখন সে আমাকে মারিবার জন্য রিভল্‌বার হাতে লইল। আমি তার পূর্ব্বেই তাহার কপালে পিস্তল ধরিয়া বলিলাম, 'সাবধান! নড়িলেই মৃত্যু!—ইহাতেই সে ভীত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল। আমি তাহাকে মুকুটের টুকরা খানার জন্য অনেক টাকা দিতে স্বীকার করায়, সে বলিল যে ৬০০ পাউণ্ডে একজনের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। তখন সেই লোকের ঠিকানা জানিয়া তাহাকে ৩০০০ পাউণ্ড দিয়া মুকুটের কোনাটি লইয়া আসিলাম। তাহার পরে আর্থারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাকে সমস্ত বলিয়া সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রি ২ টার সময় বাসায় যাইয়া শয়ন করিলাম।

হোল্ডার—(চেয়ার হইতে উঠিয়া) আহা! সেই সমস্ত দিনের পরিশ্রম ইংলণ্ডকে ভয়ানক কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছে! মহাশয়, আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নাই। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন আমি অকৃতজ্ঞ নহি। যাহা হউক, এখনই আমি আর্থারের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। মেরীর কথা শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। হায়! আপনার কৌশলও বোধ হয় তার সন্ধান আমাকে দিতে পারিবে না।

হোম—মেরীর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এই বলা যাইতে পারে যে সে বার্ণওয়েলের সঙ্গেই আছে। আরও বলিতেছি—নিশ্চয় জানিবেন—অচিরেই তার পাপ যতবড়, তার বড় শাস্তি তার হইবে।

সমাপ্ত।

ডাক্তারের দৈনন্দিন লিপি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী)

খরচ পত্র আমি অত্যন্ত সংক্ষেপ করিয়াছিলাম; কিন্তু উপার্জ্জন মাত্রও না থাকায় যাহা ব্যয় হইত, তাহা পরিপূরণ করিয়া সমতা রক্ষা করিতে পারিতাম না। কাজেই আমার হাতের টাকা গুলি, যেন বরফের মত গলিয়া যাইতে লাগিল। অনাহার ও কারাগার আমার সম্মুখে তাহাদের বিকট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্যোপায় হইয়া আমি, একখানা দৈনিক সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত রূপ বিজ্ঞাপন দিতে প্রলুব্ধ হইলাম :—"কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্রাজুয়েটের কিঞ্চিৎ অবসর সময় থাকায় কলেজের বিদ্যার্থী বা অপর ভদ্রমহোদয়গণকে তিনি গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।"

প্রায় এক সপ্তাহ পরে মাত্র একখানি উত্তর পাইলাম। পত্রখানি পিমলিকো বাসী জনৈক যুবক লিখিয়াছিল। লোকটি গবর্ণমেণ্টের অধীনে সাধারণ একটি কার্য্য করিত। এই ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে যাইয়া প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার অপরাহ্নে শিক্ষা দিবার জন্য আমাকে মাসিক মাত্র দুইটি গিনি দিতে চাহিতেছিল। কিন্তু আমি এতদুর হীনাবস্থায়ই পতিত হইয়াছিলাম যে আমাকে এই কঠোর ব্যবস্থাতেই স্বীকৃত হইতে হইল। হা, অদৃষ্ট! সত্যসত্যই, অবশেষে, একটি ভদ্র সন্তানকে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত একটি ভদ্র যুবককে, এই তুচ্ছ প্রাপ্তির জন্য, একটি মূর্খ কেরাণীর অগভীর, পঙ্কিল, জ্ঞান-সলিলে কয়েক বিন্দু গ্রীক ও লাটিন বর্ষণ দ্বারা, তাহার উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হইল। আমি বড় জোড় একমাস তাহাকে শিক্ষা দিতে না দিতেই লোকটা বাচালের মত একদিন বলিল যে তাহার গ্রীক ও লাটিন ভাষায় কাজ লইবাৎমত জ্ঞান হইয়াছে, অতএব আর আমার প্রয়োজন নাই। আমি ত শুনিয়াই অবাক। স্থূলবুদ্ধি মূর্খটার তখন পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায়, সকর্ম্মক, অকর্ম্মক ক্রিয়ার পার্থক্য জ্ঞান হয় নাই, আর গ্রীক ত মোটে তাহার বোধগম্যই হইত না। কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রাথমিক পাঠে অতি চেষ্টায়ও দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেই বাধ্য হইয়াছিল। যাহা

হউক, এই মেধাবী উন্নতিশীল ছাত্রের সহিত শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইতেছিল, যে কেন আমি দুরাশার প্ররোচনায় লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা সামরিক বিভাগে প্রবেশ, আমেরিকায় গমন বা বাণিজ্য বিভাগে কোন নিম্নপদস্থ কার্য্যে যোগদান করাও যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। যে দারুণ গর্ব্বে আমি স্বীয় প্রতিভার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অসীম উন্নতির আশায় নিশ্চিন্ত ছিলাম, আজ তাহা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতে লাগিল। আমি সহস্র সহস্র বার আমার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। আমি যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সাধারণ চিকিৎসকের অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতাম, তবে আজ ৩০০০ পাউণ্ড পরিশোধের সুবিধাও হইত, অথচ সম্মানের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও করিতে পারিতাম। কিন্তু এই সকল সুচিন্তা সচরাচর এরূপ অসময়ে মনে ওঠে যে, তখন তাহাতে শুধু নিষ্ফলতার মর্ম্মন্তুদ গ্লানিই মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে—আর কোন ফললাভ হয় না।

ইহুদির নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার অবশিষ্ট ছিল মাত্র এখন ৩০০ পাউণ্ড, আর আমাকে প্রায় এক পক্ষের মধ্যেই দিতে হইবে যাণ্মাসিক সুদের বাবদ ২২৫ পাউণ্ড এবং বাড়ী ভাড়া—ইহা ছাড়া বহু দোকান-দারেরও পাওনা ছিল। আমার অক্ষমতা দেখিয়া প্রত্যহই, যেন, ইহাদের অসন্তুষ্টি ও কঠোরতা বৃদ্ধি হইতেছিল। ফলে, খাদ্য পরিধেয়াদি সংগ্রহ ক্লেশ-সাধ্য হইতেছিল। এদিকে আবার আমার পত্নী তখন আসন্ন-প্রসবা,—অতিশয় কঠোরতা ও দুশ্চিন্তার যুগপৎ ভারে আমার নিজের স্বাস্থ্যও ভগ্ন-প্রায়। এই অবস্থায় এখন কি করা যায়, ইহাই আমার বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ নৈরাশ্য প্রযুক্ত আমার বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি মানসিক শক্তি সমূহ শিথিল হইয়া যাইতেছিল। আমি সমস্ত পথই যেন রুদ্ধ দেখিতেছিলাম। রাত্রিতে আমার দুই এক ঘণ্টার বেশী নিদ্রা হইত না। যতটুকু নিদ্রা হইত তাহাও সুনিদ্রা নহে—দুঃস্বপ্ন পূর্ণ। প্রত্যহ প্রাতে জাগ্রত হইলে, সজীবতার পরিবর্ত্তে বরং অধিকতর দুর্ব্বল ও অবসন্ন বোধ করিতাম এবং শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতাম। তখন আমার শ্রান্ত ক্লিষ্ট মস্তিষ্কে নানা অভিসন্ধি ও কল্পনা উদিত হইত। পুনঃ পুনঃ চিন্তার ফলে অবশেষে উহা যেন সম্ভবপর আকার ধারণ করিত—কিন্তু হায়! দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গেই সে সব শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত! কখনও মনে হইত একখানি সরল চিকিৎসা

বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিব বা ফুসফুসের রোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব; নতুবা কোন ক্ষুদ্র ঔষধালয়ের অংশীদার কর্ম্মচারীর পদ প্রার্থী হইয়া বিজ্ঞাপন দিব—এইরূপ সহস্র চিন্তা আমার মস্তিষ্কে উদিত হইত। কিন্তু হায়! আমার অর্থ কোথায়? এই জগতে আমার সম্বল ছিল মাত্র ৩০০ পাউণ্ড,—এদিকে সেই ভীষণ কুসীদজীবী বৃদ্ধটাকেই দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, প্রতি বৎসর ৪৫০ পাউণ্ড—এই ত আমার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা! এই অবস্থার বিষয় এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেও ভীষণ নৈরাশ্যে আমি আত্মহারা হইতাম। আমি দুর্ভাগ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলাম আমার জীবনের প্রতিও ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিয়াছিল; এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে লোকে আত্মহত্যায় শান্তিলাভের চেষ্টাও করে,—আমার কিন্তু সেইরূপ ইচ্ছা কখনও হয় নাই। দৈবাৎ কোন সময়ে আমার নিয়ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে এইরূপ একটা বুদ্ধির আবির্ভাব হইত বটে, কিন্তু মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বদাই সেই ভীষণ আগন্তুককে হৃদয়ের দ্বার হইতে বিদূরিত করিয়া দিত। যাহা হউক, যদিও আমি একেবারে নাশ পাইতে বসিয়াছি, তথাপি কোন অভাবনীয় উপায়ে সহসা আমার সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে পারে এই ক্ষীণ আশা আমি ত্যাগ করিতে পারিতে-ছিলাম না। এই আশাতেই আমার ব্যাকুল চিত্তে সাময়িক শান্তির আবির্ভাব হইত এবং আমাকে বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি প্রদান করিত।

একদিন সমস্ত প্রাতঃকাল অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্ত হইয়া সেণ্টজেমস পার্কের একখানি বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। দেহ বড় অসুস্থ ও দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষাও অধিক মানসিক বিষণ্ণতা অনুভব করিতেছিলাম। সেইদিন প্রত্যুষে আমার ভৃত্য একটি দোকানদারের প্রাপ্য দশ পাউণ্ড পরিশোধ করিতে গিয়াছিল। দোকানদার তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল, যে আমার নিকট হইতে টাকা পাইতে যেরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, তাহাতে সে আর আমার ন্যায় ক্রেতালাভের সৌভাগ্য বা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে না। ইহাতেই বুঝিলাম, পল্লিবাসিগণ আমাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যদি মহাজনদের ঋণ শীঘ্র পরিশোধ করিতে অক্ষম হই, তবে আমি প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব ও সত্বরই সমাজের ক্রোড় হইতে বিষধর সর্পবৎ পরিত্যক্ত হইব। এই সকল দুর্ভাবনা যদিও

অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, তথাপি ইহাতে আমাকে বিশেষ উদ্বেলিত করিতে পারে নাই; কারণ আমার ততটুকু মানসিক শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। সন্দেহ-দোলায় এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থা আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল এবং ইহার পরিবর্ত্তে নিশ্চিত অন্ধকারতম অদৃষ্টকেও আলিঙ্গন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল।

এইরূপ দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছি, এমন সময়ে সুমধুর ঐক্যতান বাদ্য বাজাইয়া একদল সৈন্য আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। উঃ! সেই বাদ্যের ধ্বনি আমার ছিন্ন হৃদয়তন্ত্রীতে কি আঘাতই করিয়া গেল। কতলোক দলে দলে উজ্জ্বল মুখে, সুখ সমৃদ্ধির হাস্য লইয়া সেই বাদ্য শুনিতে শুনিতে চলিয়া গেল,—কিন্তু পাশেই গভীর চিন্তাভারে কাতর হইয়া এক হতভাগ্য যে বসিয়াছিল, তাহার অবস্থা তাহারা জানিতেও পারিল না। আমি মর্ম্মন্তুদ যাতনায় প্রবহমান অশ্রুধারা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এমিলির চিন্তা আমার মনে উদয় হইল। তাহার সেই শারীরিক অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার মন যেন পাগল হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীতে ফিরিয়া কেমন করিয়া তাহার স্নেহপূর্ণ মুখ-পানে তাকাইব, তা ভাবিতেও পারিতেছিলাম না। আহা! সে কি শান্ত ভাবেই এই দুর্দ্দশায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। তাকে ভরণপোষণ করিবার শক্তি আমার আছে কিনা তাহা না ভাবিয়াই আমি কেন তাকে বিবাহ করিয়াছিলাম? সে আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে বটে, কিন্তু আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে আমি যে তাকে আশ্বাস দিতাম—যে লণ্ডনে বসিলেই ব্যবসায়ে নিশ্চয়ই সফল হইব, এই কথা কি সে না ভাবিয়া থাকিতে পারে? পূর্ব্বে বালসুলভ উৎসাহে তাহার নিকট যে সকল আকাশকুসুমের চিত্র আমি অঙ্কিত করিতাম, এখন তাহা কোথায় গেল? এখন সে যে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ভোগ করিতেছে এবং যেরূপ বোধ হইতেছে, আরও বহুদিন ভোগ করিবে। ইহাতে আমার প্রতি কি তাহার অনুরাগের হ্রাস ঘটিবে না? আমার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করিবে না? হইলেও আমি তাহাকে দোষী করিতে পারি কি? যদি আমার এই সৌভাগ্যের সুদৃশ্য ভবন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে আমিই তার ভিত্তি শিথিল বা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছি। এইরূপ ক্লেশকর চিন্তার কষাঘাতে আমি জর্জ্জরিত হইতেছিলাম,—এমন সময় একটি প্রাচীন, রুগ্ন ভদ্রলোক ধীর কম্পিত পদে আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। যে ভৃত্যের হাতে ভর করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, সে বেঞ্চের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইল। পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, ভদ্রলোকটি ধনী ও সম্মানী। ক্ষাঁপানী

কাশিতে ভুগিয়া তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর একটি রোগেও তিনি ভুগিতেছিলেন। তার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি এইরূপ ভাবে দুই একবার আমার দিকে তাকাইলেন যেন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিলে, তিনি অভদ্রতা মনে করিবেন না। আমি বলিলাম, "আমার আশঙ্কা হইতেছে, মহাশয় বোধ হয় ঐ কাশিটাতে অত্যন্ত যাতনা পাইতেছেন?"

তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়, কিরূপে যে এই রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাইব তা জানিনা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার এইমাত্র বাসনা যে, আমার কবরের শমন তলবটা যেন আর বেশী কষ্টদায়ক না হয়।"

কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কতদিন যাবৎ এই কাশিতে কষ্ট পাইতেছেন। তিনি বলিলেন, ন্যূনাধিক প্রায় দশ বৎসর যাবৎ—কিন্তু সম্প্রতি ইহা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না।

আমি বলিলাম, "আমার বোধহয় আপনার রোগের প্রবল উপসর্গ গুলি দূর করা যায়।" এই বলিয়া আমি একটুকু সঙ্কুচিত ভাবে তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিনি ভদ্রতার সহিত আমার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর করিলেন। তাঁহার ভাবে বোধ হইল, আমার কথায় যেন তাঁহার কতকটা আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কোন সুনিপুণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হন নাই। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে সহজ দুই একটি উপায় অবলম্বন করিলেই তাঁহার রোগের প্রবল উপসর্গ গুলির যাতনা অন্ততঃ দূর হইবে। তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে আমি চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং পাছে আমি ক্ষুব্ধ হই, ইহা ভাবিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে একটি গিনি দিতে উদ্যত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি যে যৎসামান্য উপদেশ দিয়াছি তার জন্য কোন পারিশ্রমিক আশা করি না।

এই সময়ে একটি সৌখিন যুবক আসিয়া বলিলেন, যে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। এই শেষোক্ত ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া বৃদ্ধের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া বোধ হইল। ইনি আমার প্রতি দাম্ভিকতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করিলেন। বৃদ্ধ ইহাকে বলিলেন যে আমি তাঁহাকে কয়েকটি উত্তম উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তার জন্য কোন পারিশ্রমিক আমি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হই নাই। এই কথা শুনিয়াও যুবকের দাম্ভিকতার হ্রাস হইল না। আমাকে লক্ষ্য করিয়া

গর্ব্বিত ভাবেই তিনি বলিলেন, "আপনার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম। বাড়ী ফিরিয়াই আমাদের পারিবারিক চিকিৎসককে জানাইব।" এই বলিয়াই রুগ্ন বৃদ্ধের বাহু ধারণ পূর্ব্বক মৃদু পাদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি যাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই একজন সম্ভ্রান্ত লোক, কারণ যদিও স্পষ্টরূপে আমি নামটি বুঝিতে পারি নাই, তবু তাঁহার ভৃত্যকে অনেকবার "সার" উইলটল বা উইলিয়ম বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে শুনিয়াছি। আমার তখন মনে হইতে লাগিল, এইরূপ সুযোগ আর কেহ পাইলে এই ভদ্রলোকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ইহার চিকিৎসক হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইত। আর মনে হইতে লাগিল আমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! আমাকে যখন ইনি ফি দিতে চাহিতেছিলেন, তখন যদি আমি একখানি আমার নামের কার্ড দিতাম, তবে নিশ্চয়ই আগামী কল্য প্রাতে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং তাহা হইলে না জানি কত ভাল ভাল স্থানে আমি পরিচিত হইতে পারিতাম এবং আমার বেশ দু পয়সা প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইত।

আমি আমার এই অযথা সঙ্কোচ ও অব্যবসায়ীর ন্যায় আচরণে আপনাকে অজস্র তিরস্কার করিলাম। ঘটনাচক্রে সৌভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হইয়া একটা সুযোগ প্রদান করিলেন, আমি আমার অক্ষমতা বশতঃ সেই প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। ব্যবসায়ের কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যতৎপরতায় আমি নিতান্ত হীন,—আমি দুর্ভাগ্য ভোগেরই সম্পূর্ণ যোগ্য। যে লাজুকতা, সংসারের বহু লোকের ক্ষতি করিয়াছে, আমার নিস্ফলতাও তাহারই স্বাভাবিক পরিণাম। যাহা হউক,—বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শান্তিহীন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম।

ক্রমশঃ।

কেনিলওয়ার্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[পূর্ব্বাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—কর্ণওয়ালের সার হিউ রবসার্টের কন্যা এমী রবসার্টের সঙ্গে টেসিলান্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। রাণী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র লর্ড লিষ্টার, ভার্ণি নামক কোন সহচরের সহায়তায় কৌশলে এমীকে হরণ করিয়া আনিয়া গোপনে বিবাহ করেন। কেহ, বিশেষ রাণী এলিজাবেথ, এই বিবাহের সংবাদ না জানিতে

পারেন, তাই লর্ড লিষ্টার তাঁহার অধিকৃত কাম্‌নর দুর্গে ভার্ণি এবং ফষ্টর নামক কাম্‌নর গ্রামবাসী কোন অর্থলোভী দুর্দ্দান্তস্বভাব ভৃত্যের রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে এমীকে রাখিয়া দেন। সেখানে এমীর অনুসন্ধানে এমীর পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত টেসিলানের সঙ্গে এমীর সাক্ষাৎ হয়। টেসিলানের কথায় এমী পিতৃগৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন না। টেসিলানের ধারণা ছিল, ভার্ণিই এমীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। রাণী এলিজাবেথ এমীর সম্বন্ধে জনরব কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। ভার্ণিকে জিজ্ঞাসা করায়, প্রভুকে রাণীর কোপ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ভার্ণি উত্তর করিলেন, এমী রবসার্ট তাঁহার পত্নী,—তাঁহার শাসনাধীন কাম্‌নর দুর্গে তিনি বাস করেন। নানা কারণে কাম্‌নর দুর্গে থাকা নিরাপদ নয় মনে করিয়া ফষ্টরের কন্যা জেনেটের সহায়তায়—ওয়েলান্‌ নামক কোন বাজীকরের সঙ্গে এমী পলায়ন করিলেন। স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় এমী কেনিলওয়ার্থে গেলেন। রাণীর আগমন উপলক্ষে কেনিলওয়ার্থ দুর্গ তখন বহু লোকজনে পূর্ণ হইয়াছে। ওয়েলানের চেষ্টায় অতি কষ্টে একটি থাকিবার ঘর এমী পাইলেন। এমী স্বামীর কাছে পত্র লিখিলেন। পত্রখানি কোনও মতে লিষ্টারের হাতে পৌছাইবার জন্য ওয়েলানকে দিলেন। লিষ্টারের বিপক্ষে লর্ড সাসেকের দলভুক্ত হইয়া টেসিলানও দুর্গে আসিয়াছিলেন। টেসিলানের সঙ্গে আবার এমীর সাক্ষাৎ হইল।

লিষ্টারের কোনও জবাব আসিল না। টেসিলানের সঙ্গে আবার দেখা না হয়, আর স্বামীর সঙ্গে যদি দেখা কোনও মতে হয়, এই ভাবিয়া এমী রাত্রি প্রভাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া দুর্গের অভ্যন্তরে কোনও নির্জ্জন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবাৎ এলিজাবেথ সেই কুঞ্জে আসিয়া এমীকে দেখিতে পাইলেন। প্রশ্ন করিয়াও এমীর নিকট আর কোনও উত্তর তিনি পাইলেন না। ভীতিবিহ্বলা এমী কেবলমাত্র এই বলিলেন, লর্ড লিষ্টার তাঁর কথা সব জানেন। এলিজাবেথের বড় ক্রোধ হইল, মনে নানারূপ সন্দেহও হইল। তিনি এমীকে ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। বাহিরে লিষ্টার অন্যান্য লর্ডদের সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রুদ্ধা রাণী এমীকে টানিয়া আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, লিষ্টার ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ভার্ণি আসিয়া জানাইল, এই নারী তাঁহারই স্ত্রী, উন্মাদরোগগ্রস্থা, কাম্‌নর দুর্গে ছিল, রক্ষিদের এড়াইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। একদিকে লিষ্টারের জন্য ভয়ে, অপরদিকে ভার্ণির প্রতি ক্রোধে, এমী অসংলগ্ন ভাবে এমন সব কথা বলিলেন, যাহাতে এলিজাবেথের মনেও সেইরূপ বিশ্বাস হইল। লর্ড হান্‌ডনের হাতে এলিজাবেথ এমীর রক্ষার ভার দিলেন। ভার্ণিকে কহিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব সে যেন তার পাগল স্ত্রীকে তাহার কাম্‌নর দুর্গে পাঠাইয়া দেয়।

লিষ্টার গোপনে ভার্ণির সঙ্গে গিয়া অবরুদ্ধা এমীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এমীর কথায় ও ব্যবহারে লিষ্টারের সুবুদ্ধি ফিরিল। লিষ্টার সংকল্প করিলেন, সত্বর এমীকে প্রকাশ্য ভাবে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। আত্মরক্ষার চেষ্টায় এ জন্য যদি রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও উপস্থিত করিতে হয়, তাও করিবেন।

ভার্ণি প্রমাদ গণিল। সে অনেক কৌশলে লিষ্টারকে বুঝাইল, টেসিলান এমীর উপপতি, তার প্ররোচনায় এমী কেনিলওয়ার্থে আসিয়াছে। কৌশলে রাণীর নিকট সকল ঘটনা প্রকাশ

করিয়া লিষ্টারের সর্ব্বনাশ করিবে। তারপর টেসিলানের সঙ্গে লিষ্টারের সম্পদ ভোগ করিবে। লিষ্টার ক্রোধে ও যাতনায় উন্মত্তবৎ হইলেন,—কামনর দুর্গে গিয়া অবিলম্বে এমীর প্রাণদণ্ড করিবে, এইরূপ আদেশ ভার্ণিকে দিলেন। সে দিন অপরাহ্নে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল। কোনও অবসরে টেসিলান লিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় কথা তাঁহার লিষ্টারকে জানাইবার আছে। এত সহজে টেসিলানকে হাতে পাইলেন, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার সুযোগ উপস্থিত হইল বলিয়া লিষ্টার আনন্দিত হইলেন। তিনি টেসিলানকে বলিয়া দিলেন, উৎসবের পর প্রমোদউদ্যানের কোনও নিভৃত স্থানে সাক্ষাৎ হইবে। গভীর রাত্রিতে উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহসা কয়েকজন প্রহরী নিকটে আসিয়া পড়ায় লিষ্টার ক্ষান্ত হইলেন, পরদিন প্রভাতে আবার যুদ্ধ হইবে, এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে মৃগয়াকাননের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লিষ্টার ভূপতিত টেসিলানকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একটি বালক আসিয়া বাধা দিয়া লিষ্টারের হাতে একখানি পত্র দিল। এমী লিষ্টারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহা ওয়েলান লিষ্টারকে দিতে পারে নাই। পত্রে সকল কথাই পরিষ্কার ভাবে লেখা ছিল। পত্র পড়িয়া লিষ্টার আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিলেন ভার্ণির চক্রান্তে এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনুতপ্ত লিষ্টার টেসিলানের নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন। এবং তখনই রাণীকে তাঁহার গুপ্ত বিবাহের সংবাদ জানাইয়া এমীকে প্রকাশ্য ভাবে পত্নী রূপে গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

টেসিলান দুর্গে ফিরিয়াই দেখিলেন যেন এই অল্পক্ষণের মধ্যে সেখানে কোনও বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। উৎসব কোলাহল থামিয়া গিয়াছে—দর্শক ও অভিনেতৃগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সন্ত্রস্ত ভাবে কথোপকথন করিতেছে—কোনও নিদারুণ ভীতিকর সংবাদ প্রচারিত হইলে নগরীর রাজপথের যেরূপ দৃশ্য হয়, চতুর্দ্দিক যেন সেইরূপ দেখাইতেছে।

টেসিলান বহিরঙ্গন পার হইয়া প্রাসাদোপান্তে পৌঁছিলেন, সেখানেও সেইরূপ ভৃত্যগণ—অনুজীবীবর্গ, কর্ম্মচারীগণ সকলেই স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া অনুচ্চস্বরে কি বিষয়ের আলোচনা করিতেছে—এবং মধ্যে মধ্যে ভীত, চকিত ও চঞ্চল দৃষ্টিতে দরবার গৃহের গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

টেসিলান প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন অনতিকাল পূর্ব্বে লর্ড লিষ্টার উন্মত্তবৎ বেগে অশ্বারোহনে দুর্গে প্রবেশ করেন—তারপর মহারাণীর নিকট কোনও গোপনীয় বিষয় নিবেদন করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন—তদবধি দরবার গৃহের পার্শ্বস্থিত মন্ত্রণাগৃহে মহারাণী, লর্ড লিষ্টার, মন্ত্রী লর্ড বারলে ও কতিপয় বিশ্বস্ত সভাসদ্ সমবেত হইয়া নিভৃতে কি পরামর্শ করিতেছেন—

বিষয় কি এখনও বাহিরে কেহ জানিতে পারে নাই—তবে রাজদ্রোহ কিম্বা ঐরূপ কোনও গুরুতর ঘটনা হইবারই সম্ভব। টেসিলান আরও জানিতে পারিলেন, ইতিমধ্যে মন্ত্রণাগৃহ হইতে তাঁহারও তলব হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন বিশ্বস্ত পারিষদ আসিয়া সংবাদ দিলেন, টেসিলানকে এই দণ্ডেই মহারাণী তলব করিয়াছেন। টেসিলান তাঁহার পশ্চাদনুসরণে মন্ত্রণা ভবনে উপস্থিত হইলেন।

প্রবেশ করিয়া টেসিলান দেখিলেন—মহারাণী এলিজাবেথ কক্ষের একপার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত অধীর ভাবে পরিক্রমন করিতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যভাব দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগে নিতান্ত আকুল—আত্মসংযমের কোনও চেষ্টাই নাই। দুই তিনজন বিশেষ বিশ্বস্ত অমাত্য উৎকণ্ঠিতভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া পরস্পর অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময় করিতেছেন, কিন্তু মহারাণীর বর্ত্তমান ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কোনও কথা বলিতে সাহস পাইতেছেন না। অদূরে রাজসিংহাসন খানি বক্রভাবে স্থাপিত। বোধ হয় মহারাণী প্রথম ক্রোধাবেগে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় ঐরূপ হইয়া থাকিবে। সেই পরিত্যক্ত সিংহাসন-নিম্নে অবনত মস্তকে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট লর্ড লিষ্টার কবরের উপর সংস্থাপিত প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল, নিষ্পন্দ ও তাঁহার বাহু দুইটি বক্ষোপরি সংন্যস্ত—কোষমুক্ত অসি অদূরে ভূপতিত;—পার্শ্বে পদমর্য্যাদাসূচক দণ্ড হস্তে দাঁড়াইয়া রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—লর্ড সুজবেরী।

টেসিলান দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্র এলিজাবেথ থমকিয়া দাঁড়াইলেন ও নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া পরুষকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি এ ব্যাপারের সকলই জানিতেন—আমাকে এরূপ অবমানিত করার ষড়যন্ত্রে আপনিও লিপ্ত ছিলেন—আমি যে এ বিষয়ে অবিচার করিয়াছি তাহার প্রধান কারণও আপনি!"

টেসিলান অবনতবদনে নিরুত্তর রহিলেন—বুঝিলেন এরূপ অবস্থায় আত্মসমর্থন করিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবে।

রাণী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বাকশক্তিহীন না তোমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে? তুমি এ ব্যাপারের কিছু জান কিনা বল!"

টেসিলান কহিলেন, "মহারাণী! এ অভাগিনী যে কাউন্ট-পত্নী তাহা আমি জানিতাম না।

রাণী কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, সে পরিচয় আর কেহ জানিবেও না।

'লর্ড লিষ্টার' বলিয়া আর কেহ থাকিবে না—বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী রবার্ট ডাড্‌লির স্ত্রী অথবা বিধবা পত্নী এই পরিচয়েই লোকে তাহাকে জানিবে—তাই যথেষ্ট!

লিষ্টার এই সময়ে ধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাণী আমি অপরাধী, যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয় আমাকেই দিন। টেসিলান নিতান্ত সদাশয় ভদ্রলোক, ইঁহার কোনও অপরাধ নাই।"

রাণী দ্রুতপদে লিষ্টারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সে যাহা হয় আমি বুঝিব—ভণ্ড, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক! তোমার আচরণে রাজ্যমধ্যে আজ আমি উপহাসের পাত্র—তোমার অনুরোধে আবার কাহারও দোষের লাঘব হইবে তুমি মনে কর? হায়, এতদিন আমি কি অন্ধই ছিলাম! ইচ্ছা হয় এ নিরর্থক চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি।"

এই সময়ে মন্ত্রী লর্ড বার্লে নিকটে আসিয়া বলিলেন "ঠাকুরাণী, আপনি রাজ্ঞী আপনি ইংলণ্ডের মহারাণী—প্রজাবর্গের মাতৃস্বরূপা—হৃদয়াবেগে এরূপ আত্ম-বিস্মৃত হওয়া আপনার শোভা পায় না।"

রাণী মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন—তাঁহার গর্ব্বিত ক্রুদ্ধ নয়নপ্রান্তে একবিন্দু অশ্রু দীপ্তি পাইতে লাগিল। অতি করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধ বার্লে—তুমি কি বুঝিবে?—তুমি রাজনীতি কুশল, তুমি রমণী-হৃদয়ের কি জান! ওই ভণ্ড প্রতারক আমার জীবন কিরূপ বিষময় করিয়াছে—আমার হৃদয় কিরূপ ধিক্কারে পূর্ণ করিয়াছে—তাহার তুমি কি বুঝিবে বার্লে?"

মন্ত্রী দেখিলেন,—রাণীর হৃদয় করুণভাবে দ্রব হইয়া আসিতেছে। সযত্নে ও সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তাধারণ করিয়া বার্লে ধীরে ধীরে দূরে গবাক্ষপার্শ্বে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। গবাক্ষসন্নিকটে অপর কেহ ছিল না। বার্লে তখন বলিলেন, "মহারাণী! আমি রাজনীতি-চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়াছি সত্য, কিন্তু আমারও মনুষ্যহৃদয় আছে। আপনার সেবায় কেশ শুভ্র করিয়াছি—আপনার গৌরব সম্ভ্রম ও সুখ ব্যতীত এ বয়সে অপর কামনা আমার কিছুই নাই। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন—আপনি শান্ত হউন।"

রাণী বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বার্লে, তুমি—তুমি—কি বুঝিবে—" আর কথা সরিল না—দরবিগলিত ধারে অশ্রুপ্রবাহ গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

বার্লে বলিলেন, "মহারাণী! আমি সব বুঝি, আপনার হৃদয়ের আঘাত এ বৃদ্ধের হৃদয়ও স্পর্শ করিয়াছে—কিন্তু সাবধান, আপনি শোকে এরূপ বিহ্বল

হইলে লোকে কি মনে করিবে,—তাহারা কিছুই জানে না—আপনার এরূপ অবস্থা দেখিলে তারা নানারূপ সন্দেহ করিবে।"

এ কথায় এলিজাবেথের বিলুপ্তপ্রায় মর্য্যাদাজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার মনোমধ্যে নূতন চিন্তাপ্রবাহ জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ—ঠিক বলিয়াছ বার্লে। আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা চাই—সাধারণের উপহাস হইতে আপনাকে রক্ষা করা চাই। আমি প্রতারিত, প্রবঞ্চিত—লোকে এ কথা না বুঝিতে পারে নিশ্চয়ই তা করা চাই—এ দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই হইবে।"

বার্লে কহিলেন, "হাঁ, এইবার আমার রাণীকে ফিরিয়া পাইলাম। আপনার ব্যবহারে সন্দেহের কোনও কারণ যদি না দেখা যায়, আপনি যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, ইংলণ্ডে কেহ বিশ্বাস করিবেনা যে মহামহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের হৃদয়ে এরূপ কোনও দুর্ব্বলতা কখনও স্থান পাইয়াছিল!"

তখন রাণীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলেন, "কি সে দুর্ব্বলতা মন্ত্রী! তুমিও কি বলিতে চাও যে ঐ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আমি তাহার রাণী যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছি, তাহা কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও কারণ-প্রসূত?" নবজাগ্রত শক্তিবলে রাণী এরূপ ভাবে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—লজ্জায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। পুনরায় ক্ষীণ করুণ কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"থাক্ ও কথা বার্লে। তুমি আমার বড় বিশ্বস্ত অমাত্য—তোমাকে প্রতারণা করিয়া লাভ কি?"

এ দৃশ্য দেখিয়া বার্লের প্রাণে নিতান্ত আঘাত লাগিল। তিনি বেদনাতুর হৃদয়ে রাণীর দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া শির আনমিত করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া রাণীর হস্ত আর্দ্র করিয়াছিল—এরূপ সমবেদনার অশ্রু রাজগণের ভাগ্যে নিতান্ত দুর্লভ।

এইরূপ সমবেদনা লাভে রাণীর হৃদয় আরও দৃঢ় হইল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার চাঞ্চল্যে বা আচরণের বৈলক্ষণ্যে তিনি এইরূপ প্রতারিত ও অবমানিত হইয়াছেন—ইহা সাধারণে বুঝিতে পারিলে তাঁহার নারীমর্য্যাদা ও রাজমর্য্যাদা বিশেষ রূপে ক্ষুণ্ণ হইবে। বার্লের নিকট বিদায় হইয়া রাণী ধীরভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিলেন। ক্রমে তাঁহার আকৃতির সৌম্যভাব ও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ফিরিয়া আসিল।

তারপর রাণী লর্ড লিষ্টারের দিকে অগ্রসর হইয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "লর্ড

সুজ্‌বেরী! আমরা আপনার আসামীকে মুক্তি দিলাম। লর্ড লিষ্টার! বিগত কয়েকমাস যাবত আপনি যেরূপ ছলনা ও চাতুরী করিয়া আসিতেছেন, তাহার দণ্ড স্বরূপ এক-চতুর্থ ঘটিকা কাল প্রধান সেনাপতির রক্ষণাধীনে আপনাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল—অপরাধের তুলনায় শাস্তি কঠোর হয় নাই, ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে আপনার তরবারী গ্রহণ করিতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া রাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তারপর বলিলেন, "আমরা এই ব্যাপারের সম্যক্ তদন্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি—টেসিলান্, আপনি কি জানেন—বলুন।"

টেসিলান সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিলেন—তবে লর্ড লিষ্টারের বিরুদ্ধে যাইতে পারে এমন অনেক কথা গোপন করিয়া গেলেন। তাঁহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাও কিছু বলিলেন না, বলিলে লিষ্টার বিশেষ বিপন্ন হইতেন।

এরূপ অবস্থায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার অপরাধে লর্ড লিষ্টারই দোষী। এ অভিযোগে তাঁহার কঠোর শাস্তি বিধান করিলে সাধারণের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইতে পারিত না। কিন্তু এরূপ কোনও কারণ ব্যতীত তাঁহার দণ্ডবিধান করিলে যে সকল কারণ মহারাণী গোপন রাখিতে চান, তাহা সাধারণের অলোচনার বিষয় হইয়া পড়িত।

টেসিলানের বক্তব্য শেষ হইলে মহারাণী কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, "ওয়েলানের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে রাজ দরবারে লওয়া হইবে। টেসিলান্, আপনি এ সকল সংবাদ আমাদিগের গোচর না করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন—আর এ সকল বিষয়ে গোপন রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়াও আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। তবে অভাগিনীর নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া আপনি যে তাহা রক্ষা করিয়াছেন, ইহা ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত বটে। মোটের উপর আপনার আচরণ আমরা প্রশংসনীয় মনে করি।—তারপর লর্ড লিষ্টার! এবার আপনি যাহা জানেন বলুন। বহু দিন যাবত সত্য মিথ্যার বিচার আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন জানি, তবুও আশা করি এ বিষয়ে কোনও সত্য গোপন করিবেন না।"

লর্ড লিষ্টারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণী কৌশলে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া এমী রবসার্টের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ, গোপন বিবাহ, এমীর প্রাত সন্দেহ, —সন্দেহের কারণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের বিবরণ বাহির করিলেন। লিষ্টার আর কোনও বিষয়ে সত্য গোপন করিলেন না, তবে শেষযাত্রায় কাউণ্টপত্নী

সম্বন্ধে ভার্ণিকে যে নিদারুণ আদেশ দিয়াছিলেন, সে কথার কোনও উল্লেখ করিলেন না। অথচ এই কারণেই তাঁহার মন নিতান্ত উচাটন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে লাম্বোনের সহিত চিঠি লিখিয়া এ আদেশ রহিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মন আশ্বস্ত হইতে পারিতেছিল না—তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন মহারাণীর নিকট হইতে সত্বর ফিরিয়াই স্বয়ং কাম্নর অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

কিন্তু লিষ্টার বড় ভুল বুঝিয়াছিলেন। এলিজাবেথের প্রকৃতি তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যদিও লিষ্টারের উপস্থিতি, লিষ্টারের প্রতি কথা এলিজাবেথের রমণীহৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, তবু প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি অম্লান বদনে সে বেদনা সহ্য করিতেছিলেন। রাণী লিষ্টারের ভাবে বুঝিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গের আলোচনায় লিষ্টার ব্যথিত হইতেছেন—সেই জন্যই অবিশ্রান্ত নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়কে তিনি আরও নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অন্য সুযোগের অভাবে স্বীয় হৃদয়-বেদনার দিকে দৃকপাত না করিয়াও, বিশ্বাসঘাতী প্রণয়ীকে এইরূপে মনঃপীড়া দিয়া রাণী বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিলেন। শুনা যায় অসভ্য বন্য লোকেরা তপ্ত লৌহ-সাঁড়াসী দ্বারা রজ্জুবদ্ধ শত্রুর দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তৃপ্তিলাভ করে,—সেই তপ্ত লৌহের উত্তাপে স্বীয় হস্ত ক্ষত বিক্ষত হয় সেদিকে দৃক্পাতও করে না।

বহুক্ষণ এইরূপ বেদনায় লিষ্টার নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহারাণী—আমি অনেক দোষে দোষী, আপনার ক্রোধেরও যথেষ্ট কারণ আছে। আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার উদ্দীপক কারণও যথেষ্ট ছিল। রমণীর সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে ও মহিমাময়ীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় অনেক দুর্ব্বল চিত্তই সত্য পথ হইতে বিচলিত হইতে পারে—আমিও হয়ত সেইরূপ কারণেই সত্য গোপন করিয়াছিলাম।"—লিষ্টার এরূপ অনুচ্চস্বরে এ কথাগুলি বলিলেন, যে অপর কাহারও শ্রুতিগোচর না হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় লিষ্টারের মুখে এরূপ উত্তর শুনিয়া রাণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। লিষ্টারও সুযোগ মনে করিয়া পুনরায় বলিলেন, "মহারাণী কল্য প্রাতে এরূপ ভাবের কথা বলিলে আপনি অপ্রসন্ন হইতেন না,—কিন্তু আজ আর আমার সে সৌভাগ্য নাই, এরূপ কথা বলিবার অধিকারও নাই,—অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এ প্রগলভ্তা মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয় দেখিতেছি আপনার দুঃসাহস ও নির্লজ্জতার কোনও সীমা নাই—কিন্তু আমার ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে—এরূপ বাতুলের চেষ্টায় কোনও লাভ হইবে না।"

তারপর অমাত্যবর্গের দিকে ফিরিয়া রাণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "অমাত্যবর্গ! একটি নূতন সংবাদ শুনুন—লর্ড লিষ্টারের গোপন বিবাহে আমি নাকি স্বামী হারাইয়াছি এবং ইংলণ্ডও নাকি রাজা হারাইয়াছে। তবে লর্ড লিষ্টার নিতান্ত সদাশয়—প্রাচীন কালের ন্যায় বহু বিবাহেও তাঁহার অরুচি নাই—আমাকেও বাম হস্তে গ্রহণ করিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। এরূপ নির্লজ্জতার পরিচয় কেহ কোথায়ও পাইয়াছেন কি?

"আমি কুমারী, কিন্তু আমি এদেশের রাণী—যদি কোনও রাজপারিষদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে কোনও রাজঅনুগ্রহ দেখাই, তাহা হইলেই কি তিনি মনে করিবার অধিকার পাইবেন—আমি তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? আশাকরি আপনারা কেহই এরূপ ভ্রম ধারণা কখনও মনে করেন নাই। তবে উচ্চ আশার মোহে প্রতারিত হইয়া ইনি যদি এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়া থাকেন—তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই কৃপার পাত্র। বালক যেরূপ জল বুদ্বুদের শোভায় মোহিত হইয়া তাহা ধরিতে যায় ও ধরিতে না পারিয়া শোকার্ত্ত হয়, উচ্চ আশার কুহকে প্রতারিত হইয়া ইঁহারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। আমরা এক্ষণে দরবার গৃহে যাইবার অভিলাষ করিতেছি—লর্ড লিষ্টার! আপনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন।"

দরবার গৃহে সমবেত পারিষদবর্গ সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত ভাবে মহারাণীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহারাণী প্রবেশ করিয়াই ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "অভিজাতবর্গ, মহিলাবৃন্দ! কেনিলওয়ার্থের আমোদ উৎসব এখনও শেষ হয় নাই—অদ্য হইতে দুর্গে স্বামীর বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইবে।"

এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদে ও মহারাণীর এবম্বিধ আচরণে সভাস্থ সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। সকলেই পরস্পরের সহিত এ সংবাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মহারাণী পুনরায় বলিলেন, "আপনাদিগের অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই, আমরা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়াছি। বোধহয় আপনাদিগকে এইরূপ ভাবে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যেই এ সংবাদ গোপন করা হইয়াছিল। সেই ভাগ্যবতী নববধূ কে ইহা জানিবার জন্য সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন

দেখিতেছি। তবে শুনুন গত কল্যকার রঙ্গ অভিনয়ে যিনি ভার্ণির পত্নী রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই গ্রাম্য কুমারী এমী রবসার্টই আমাদের দুর্গস্বামিনী কাউণ্ট পত্নী।"

লর্ড লিষ্টার লজ্জা, অপমান ও ক্ষোভে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া করুণ ভাবে অনুচ্চস্বরে মহারাণীকে বলিলেন, "মহারাণী! দোহাই আপনার! আমাকে এ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি দিন—আমার প্রাণদণ্ড করিবেন একবার বলিয়াছিলেন, তাই করুন,—আর আমি এ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারি না। পদদলিত কীটের প্রতিও লোকের একটু মমতা হয়।"

এলিজাবেথও কেবল মাত্র তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় এইরূপ অনুচ্চস্বরে উত্তর করিলেন, "সে কি—আপনি কি হেয় কীটের সহিত তুলনীয়? বরং অদ্ভুত শক্তিশালী সরীসৃপের সহিত আপনার তুলনা হইতে পারে। প্রাচীন উপাখ্যানেও আছে শীতে মৃতপ্রায় কোনও সর্পকে কেহ নিজ বক্ষে স্থান দিয়া বঁচাইয়াছিল তারপর——"

লিষ্টার অধীর ভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! আমাকে একেবারে উন্মাদ করিবেন না—এখনও আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই—"

রাণী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "লর্ড লিষ্টার! আপনার যাহা বক্তব্য থাকে দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলুন যাহাতে সভাসদ সকলেই আপনার কথা শুনিতে পান, আপনি কি চান বলুন।"

হতভাগ্য লর্ড লিষ্টার নিরুপায় হইয়া অবনত বদনে বলিলেন, "মহারাণীর অনুমতি হইলে আমি একবার কামনর গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করি।"

রাণী কহিলেন, "নব বধূকে গৃহে আনিবার জন্য?—অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনার সঙ্কল্প সাধু, আর যেরূপ শুনিতে পাই, কামনর প্রাসাদে নববধূর সেবা যত্নেরও যথেষ্ট ত্রুটি হইয়া থাকে।—তবে একটি কথা—আমরা আপনার কেনিলওয়ার্থ দুর্গে অতিথি—কয়েকদিন আমোদ উৎসবে কাটাইব আশা করিয়াই আসিয়াছিলাম। আপনি গৃহস্বামী আপনার স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া সৌজন্য-প্রথা-সম্মত হইবে না। আমি এ দেশের রাণী, আমার প্রতি আপনার এরূপ সৌজন্যের অভাব দেখিলে প্রজা সাধারণই বা কি মনে করিবে। অতএব আপনার যাওয়া হইতে পারে না। কাম্‌নর প্রাসাদ টেসিলানের পরিচিত, বরং টেসিলান আপনার পরিবর্ত্তে যাইবেন। তবে শুনিয়াছি টেসিলান একসময়ে আপনার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—পাছে আপনার মনে কোনও সন্দেহের কারণ

উপস্থিত হয়, তাই টেসিলানের সঙ্গে আমাদের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর কেহ থাকিবেন। টেসিলান্, আপনি কাহাকে সঙ্গে লইতে চান?"

টেসিলান গতিক বুঝিয়া রাণীর প্রিয়পাত্র যুবক র‍্যালের নাম করিলেন।

রাণী কহিলেন, "আপনার নির্ব্বাচন আমরা বিশেষ প্রশংসনীয় মনে করি। যুবক র‍্যালের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, অল্পদিন হইল আমি ইহাকে "নাইট" উপাধি দিয়াছি। অসহায়া রমণীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করা ইহা নবীন "নাইটেরই" উপযুক্ত কাজ। আপনারা সকলে হয়ত জানেন না প্রাচীন কাম্‌নর প্রাসাদ কারাগার অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নয়।—ঐ প্রাসাদে কয়েকটি দুর্ব্বৃত্ত আছে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিতে হইবে।—বিচার বিভাগের কার্য্যাধিকারী! আপনি রিচার্ড ভার্ণিকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার একখানি পরোয়ানা ইহাদিগের সহিত দিবেন। জীবিত কি মৃত তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতেই হইবে। আপনাদের ইচ্ছানুরূপ সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান—আমাদিগের নূতন কাউণ্টপত্নীকে সসম্মানে এখানে নিয়া আসিবেন।—বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

টেসিলান ও র‍্যালে মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

লর্ড লিষ্টারের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। মহারাণী সমস্ত দিন তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া নানাপ্রকার তীব্র শ্লেষ বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। যেন এই উদ্দেশ্যেই তিনি কেনিলওয়ার্থ দুর্গে রহিলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথ রাজকার্য্যে যেরূপ নিপুণ, রমণী সুলভ বাক্যবানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে জর্জ্জরিত করিতেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত। মহারাণীর অনুসরণে তাঁহার সহচরীবৃন্দ এমন কি অন্যান্য পারিষদবর্গও লর্ড লিষ্টারের প্রতি সেইরূপ আচরণ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বের মত সে সম্ভ্রম সম্মান আর কেহ দেখায় না,—সকলের নিকটই যেন তিনি উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িলেন। আপনার প্রাসাদে উৎসব আমোদের আয়োজনের মধ্যে নিজ অতিথিবর্গের নিকট এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া লর্ড লিষ্টার বুঝিলেন, তাহার জীবনে রাজ অনুগ্রহের বসন্ত অকস্মাৎ ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন জীর্ণ শীর্ণ ভাবে দীর্ঘ জীবনভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

অবশেষে দীর্ঘ দিবসের অবসান হইল। লর্ড লিষ্টার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ কক্ষে পৌছিয়া সে দিনের মত অব্যাহতি লাভ করিলেন। হায়! রাজ অনুগ্রহ, উচ্চআশা—জীবনে যাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এতকাল ছুটিয়াছিলেন,

যে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই—আজ তাহা নিদাঘের স্বপ্নের মত—মরুভূমির মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া গেল। তবে দীর্ঘজীবনের অবলম্বন আর কি রহিল—সবই যদি গেল, দুর্ব্বিসহ জীবনভার অবশিষ্ট থাকিল কেন?—অকস্মাৎ এমীর শেষ পত্রখানি—সেই স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছ জড়িত পত্রখানি—তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। কি এক নূতন চিন্তা প্রবাহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় নূতন এক শান্তির আস্বাদ পাইল। লিপিখানি গ্রহণ করিয়া পুনরায় তিনি পাঠ করিলেন—কি এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিল। পত্রখানি সযত্নে ভাঁজ করিয়া আগ্রহে চুম্বন করিলেন—আবার—আবার—শত শত চুম্বন করিয়াও তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। কি এক মোহজাল তাঁহার মানস নেত্র হইতে অপসারিত হইল, এক নূতন জগত ও নূতন জীবনের দৃশ্য তাঁহার কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। লিষ্টার রাজনিগ্রহ অপমান লাঞ্ছনা সকলই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল "আমি মূর্খ, তাই ভুল বুঝিয়াছিলাম। জীবনের এখনও অবলম্বন আছে। রাজ-অনুগ্রহ আলেয়ার আলো, আর তাহা অনুসরণ করিতে চাহিব না। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মন্দিরে প্রতিদিন আর মনুষ্যত্বের বলিদান করিতে চাহিব না—রাজনৈতিক জীবনের মরুভূমিতে বিচরণ করিয়া ক্লিষ্ট হইয়াছি, এখন শান্তি চাই। এমন প্রেমময়ী পত্নী যার আছে, তার শান্তির অভাব কিসে? দূরে—বহুদূরে—রাজ পারিষদবর্গের বিদ্রূপ লাঞ্ছনার সীমার বাহিরে, নিতান্ত দরিদ্র কুটিরেও যদি এরূপ পত্নীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি, জীবন ধন্য হইবে—শান্তিতে কাটিবে—প্রেমময়ীর অনাবিল প্রেমধারায় তৃষিত হৃদয় শীতল হইবে।"

ক্রমশঃ।

অসময়ে।

যবে তুমি ছিলে কাছে, বুঝিতে পারিনি তবে
তোমারে যে এত ভালবাসি;
অবিরল-সঙ্গমাঝে অজানিত প্রেমটুকু
ছিল যেন চির পরবাসী।
বিরহের মাঝে আজি আঁখি জলে অসময়ে
দে'ছে প্রেম আপনারে ধরা;
কিন্তু হায়! তুমি প্রিয়া, আর তাহা দেখিবে না
এ যে মোর মিছে কেঁদে মরা!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন

প্রার্থনা।

পরমেশ!

এসেছে অতিথি দীন কুটীর দুয়ারে
পথহারা তোমা বিনে হে করুণাময়!
অজানা অচেনা পথে ভ্রমিবার তরে,
দেখাও প্রেমের পথ মূঢ় অভাগায়;
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার,
যে প্রেমেতে সুধাবিন্দু ঝরে অনিবার,
যে প্রেম সমান ভাবে রহে চিরদিন,
নিমেষে কখন যাহা না হয় বিলীন;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের পথ গেছে ও রাঙা চরণে,
সে প্রেম শিখায়ে দাও দান অভাজনে;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু ভুলে পথ দেখায়ো আবার,
চরণে আশ্রয় যাচে আশ্রিত তোমার।

শ্রীনীরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।

নিবেদন।

আমার প্রাণের মাঝে ডেকেছে ভাদর বান,
ছেয়েছে দুকুল আজ, হৃদি মম কানে কান্।
কামনা বাসনা রাশি,
আজিকে গেছেগো ভাসি,
আজিকে হয়েছে মোর সব দুঃখ অবসান।
তোমারি কৃপায় নাথ! তোমারে চিনেছি আজ
ঘুচেছে সকল ভয়, দূরে গেছে মোহ লাজ।
আমার আঁধার ঘোর,—
আজিকে কেটেছে মোর;
আজিকে চিনেছি আমি, তোমায় গো রসরাজ।
আকাঙ্ক্ষা আগুনে দেব! হতেছিনু পুড়ে ছাই,
শান্ত এ হৃদয় মোর, জ্বালা আর কিছু নাই।
আজিকে তোমার কাছে,
একটি মিনতি আছে,—
সংসার মায়ায় পুনঃ তোমারে না ভুলে যাই!!

শ্রীঅনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অংশ।

আলোচনা সংগ্রহ ইত্যাদি।

আমাদের শিক্ষা ও বিদ্যালয়।

দেশের শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এখন বিদ্যালয়। সমাজে যে সব শ্রেণীর বালক ও যুবকগণের লেখাপড়া শেখা নিতান্ত প্রয়োজন,—অথবা যারা লেখাপড়া শিখিতে চায়, তারা সহজেই কোন না কোন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইতে পারিতেছে, বেশ লেখাপড়াও শিখিতেছে,—অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী ঘোড়াও বেশ চড়িতেছে।

আমরা যাহাকে শিক্ষিত বলি—অর্থাৎ যে বলিতে কহিতে, লিখিতে পড়িতে ভাল,—বেশভূষায়, চালচলনে যাহার ভাব সাব বেশ সুমার্জ্জিত, সামাজিক ব্যবহারের প্রকৃতি যার সপ্রতিভ, প্রীতিপ্রদ ও গ্রাম্যতা-বর্জ্জিত,—বিদ্যাবলে দু-পয়সা রোজগার করিয়া যে বেশ ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল থাকে—এমন লোক দেশে এখন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দেশে আমরা মানুষ চাই; কেবল শেখাবুলি বলে, এমন সোনার পিঁজরায় সোনার নূপুর পরা পাখী চাই না। মানবদেহে বড় এক এক একখানি জীবন্ত প্রাণ চাই,—সুন্দর সাজে সাজান, সুন্দর আসনে বসান, রক্ত-মাংসে গঠিত পুতুল চাই না। দেশের বাগানে আমরা কেবল চঞ্চল বায়ু ভরে অবিরত আন্দোলিত কুসুম-শোভিত কোমল লতিকা চাই না, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূলোচ্ছিন্ন শুষ্ক অসার তৃণ চাই না,—দৃঢ়মূল ঝঞ্ঝাবাতে অটল,আতপতাপে অশুষ্ক, তুষারপাতে সজীব, বৃক্ষ চাই—যার রসাল-ফল ভরে অবনত বিস্তৃত শাখার শীতলছায়ায় ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম করিবে, ক্ষুৎপীড়িত দীনদরিদ্র যাহাতে তৃপ্ত হইবে,—যার শাখায় শাখায় ঘন পল্লবের অন্তরালে পাখী গাহিবে,—গাহিয়া তার মধুর স্বর-লহরীর স্নিগ্ধ স্পর্শে চিন্তাক্লিষ্টের প্রাণের যাতনা, ব্যথিতের হৃদয়বেদনা দূর করিবে। অনেকেইত লেখা পড়া শিখিতেছেন, কিন্তু এমন মানুষ কয়জন দেখিতে পাই?

শিক্ষার জন্য ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলাম; নিম্ন, মধ্য ও উচ্চশিক্ষার সাত সমুদ্র তেরনদী গুলি সব সে পার হইয়া আসিল, কিন্তু মানুষ হইয়া আসিল কৈ? অফিসের কাজে গেলে, সে ইংরেজি চিঠি-পত্র বেশ লিখিবে; উকিল হইলে চতুর কূটপ্রশ্নে বিপক্ষ সাক্ষীর মাথা ঘুরাইবে, আইনের বক্তৃতায় হাকিমকে স্তম্ভিত করিবে। বিচারাসনে বসিলে সে গুছাইয়া বেশ সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিবে; রায়ের যুক্তি ও ভাষায় উচ্চ আদালতের ইংরেজ বিচারকের প্রশংসা-লাভে ধন্য হইবে; শিক্ষক হইলে প্রতি বৎসর শতকরা ৯০টি করিয়া ছেলে পাশ করাইবে।

কিন্তু এত শিখিয়াও—এত বিবিধ যোগ্যতালাভ করিয়াও—প্রকৃত জ্ঞানলাভের যে ফল তা ত তার মধ্যে বড় দেখিতে পাই না। জ্ঞানে জ্ঞানপিপাসা জাগে সে পিপাসার পরিচয় ত তার মধ্যে তেমন পাই না। জ্ঞানানুশীলনে অভিনিবেশ তার কৈ? জ্ঞানানুশীলন হইতে হইতে যে জ্ঞানতত্ত্ব-দর্শন ও বিবেকবুদ্ধির পরিস্ফুরণ হয়, তার শক্তি, তার ক্রিয়া ত তার জীবনে দেখি না? তবে সে শিখিল কি?

আবার এদিকে মন তার ষড়রিপুর পূর্ণ প্রভাবেই অধিকৃত, আচরণ তার ষড়রিপুর শক্তিতেই পরিচালিত। জীবনের কর্ম্ম-প্রবাহ তার সুখে-দুঃখে. সম্পদে বিপদে, সম্মানে অসম্মানে, বাধায় সুবিধায়, শান্তিতে কোলাহলে, সমান বলে সমান গতিতে এক নিয়মিত পথে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে না,—অস্থির অনির্দ্দিষ্ট গতি সাময়িক ঘটনা ও অবস্থার আবর্ত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে মাত্র। কর্ম্মে সে প্রবৃত্তির দাস, ধর্ম্মের সাধক নহে,—দৈবের ক্রীড়নক, পুরুষকারের অনুবর্ত্তক নহে। জীবনে তার লক্ষ্য নাই, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নাই; লক্ষ্যের অনুকুলতা বা প্রতিকূলতা কখনও তার কর্ম্মে রতি বা বিরতির কারণ নহে। তার যখন যাতে সুখের অনুভূতি, আনন্দের উত্তেজনা হয়. সে তাহাই করে—আর যাহাতে দুঃখের অনুভূতি, অশান্তির ভীতি জন্মে, সে তাই করে না। আর যাহাতে সে ঠেকে, তাই করে,—যাহাতে ঠেকে না, তাহা করে না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহা লইয়া, সে সম্বন্ধে অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষকে আর তাহাতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। দেহে পরিণত হইয়াও বালকেরই ন্যায় সে নিতান্ত চঞ্চল, প্রবৃত্তি মাত্র চালিত, ভাবের তরঙ্গে তৃণবৎ আন্দোলিত। বালকেরই মত যখন যেমন—হাসিয়া কাঁদিয়া, মিলিয়া ভাঙ্গিয়া, জাগিয়া ঘুমাইয়া, বালকের এক একটি দিনের মত সারাটি জীবন সে কাটাইয়া দিতেছে।

শিক্ষায় মানুষ গড়ে—মানব-প্রকৃতি ও মানব-চরিত্রকে সংযত, নিয়মিত ও পরিণত করে। শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে, মানবে ও বালকে যদি পার্থক্যই না রহিল, তবে শিক্ষা হইল কি?

হয় 'শিক্ষা' কথাটির অর্থ আমরা ভুল বুঝি, না হয় কেবল 'শিক্ষা'য় মানুষ হয় না। হয় বলিতে হইবে, শিক্ষা কেবল 'জ্ঞান গ্রহণ' নয়, উহা 'জ্ঞানের সাধনা'ও বটে। না হয় বুঝিতে হইবে মানুষ গড়িতে হইলে, শিক্ষা ও সাধনা উভয়েরই প্রয়োজন। জ্ঞান-গ্রহণে মানুষের মনোবৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়, শক্তি বাড়ে, শক্তির ক্রিয়াও চলিতে থাকে। মানবত্বের ধর্ম্ম এই, সেই শক্তির ক্রিয়া

কখনও কাহারও মনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এক দিকে তাহা অন্তরের দিকে ধাবিত হইয়া মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উন্মেষ করিয়া দেয়, অপরদিকে বাহিরের দিকে ধাবিত হইয়া তাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। সাধনায় এই দুইটি গতিই সংযত ও নিয়মিত হইয়া ঠিক পথে চলে। সাধনার অভাব হইলে অন্তর্গতি মোহে বিকৃত হয়, বহির্গতি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এক দিকে—মনে জ্ঞানগ্রহণ, গৃহীত-জ্ঞানের অনুশীলনে ও সম্যক্ অধিকারে জ্ঞানতত্ত্ব-দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহের পরিস্ফুরণ, মানসিক ক্রিয়া-শীলতার জাগরণ,—অপর দিকে সে সবের সাধনা, যে সাধনায় যেমন মানব মোহমুক্ত আত্মদৃষ্টি লাভ করিবে, তেমনি আবার কর্ম্মবৃত্তিগুলি তার সেই আত্মদৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত এক নিয়মিত পথে সম্পূর্ণ জীবনতার এক লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে।

ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞান-গ্রহণ ও জ্ঞান-সাধনা—এই দুইটিতেই শিক্ষার পূর্ণাঙ্গতা। একটি অঙ্গ বাদ দিয়া কেবল একটি মাত্র ধরিয়া থাকিলে, কেবল একটির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিলে, অপূর্ণ শিক্ষার অপূর্ণ মানব গড়িবে, পূর্ণ মানব কখনও গড়িতে পারে না।

এ দেশে বিদ্যালয় অনেক আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নাই। জ্ঞানদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, সাধনার কোন ব্যবস্থা নাই। কেবল এ দেশে কেন,—বর্ত্তমান সভ্য-জগতের কোথায়ও কোন বিদ্যালয়ে, কোন শিক্ষাপ্রণালীতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—এমন ত শুনি নাই। এক ছিল বুঝি প্রাচীন ভারতে, তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিদের শাসিত-সমাজে;—যখন জ্ঞানমহিমায় দীপ্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, বিষয়বিরাগী, নিত্যব্রতপরায়ণ, ধীর সাধক গুরুর দীনকুটীরে উপনীত ও ব্রহ্মচর্য্যায় দীক্ষিত শিষ্যগণ বাল্য হইতে যৌবনের পূর্ণ-বিকাশ পর্য্যন্ত—জীবনের যে কালে শিশু-মানব পরিণত-মানবে গড়িয়া উঠে, সম্পূর্ণ সেইকালে, গুরুর পদপ্রান্তে তৃণাসনে বসিয়া গুরুর মুখে জ্ঞানলাভ করিত, গুরুর সেবায় গুরুর আদেশে সাধনা করিত;—যখন গৃহের অপূর্ণতা, সমাজের অপূর্ণতা, সংসার-বিকার, বিলাসের দুর্ব্বলতা, ভোগের মত্ততা, ক্লান্তির অবসাদ ভার চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারিত না;—এক একটি বালক যখন সজীব-প্রাণ, তেজোময় মন, চিন্তা-ধীর চিত্ত, ধর্ম্মনিরত মানবে পরিণত হইয়া গৃহে ফিরিত,— মানবত্বের গৌরবে গৃহ উদ্ভাসিত হইত—গৃহের গৃহের পুঞ্জীকৃত গৌরবের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে বিশ্বজগৎ ঝলসিত হইত! হায়, সে জ্যোতি এখন কোথায়!

আমাদের বিদ্যালয়গুলি এমন মনুষ্যত্ব সাধনার আশ্রম নয়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিদ্যা অভ্যাসের কারখানা মাত্র। আমাদের ভুল, সেই বিদ্যালয়ের হাতে ছেলে সঁপিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি,—মনে করি, মানুষ হইবার পক্ষে ছেলের প্রতি সকল কর্ত্তব্যই আমরা পালন করিলাম। আর বাকী কিছুই রহিল না। এত বড় ভুল করি, তাই ছেলে মানুষ হয় না। আর ছেলে মানুষ হইল কি না, তাও কি একটু ভাবি? ভাবিবার শক্তি কি আমাদের আছে? অবসর কি আমাদের হয়?

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাও যদি তেমন হইত, বুঝিতাম, বিদ্যালয়ের একটা সার্থকতা হইতেছে; বুঝিতাম, যে অঙ্গটি ধরিয়া বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে, যে অঙ্গটির ক্রিয়ার ভার বিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে, পূর্ণভাবে সেই অঙ্গটির ক্রিয়াও সেখানে চলিতেছে।

ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান দেওয়া হয়, সে জ্ঞান তাঁরা তেমন গ্রহণ করে কি? তারা অনেক শেখে, কিন্তু তার কতটুকু তারা অধিকার করে? জ্ঞানের অধিকারীর যে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, জ্ঞানানুশীলন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বপ্রচার,—এ সব কয়জনের মধ্যে দেখা যায়? বোঝা বহিয়া বেড়ায় অনেকে, কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ কয়জন দেখিতে পাইলাম? কারখানায় গাড়ী আসে, মালিকেরা গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া দেন, মাল লইয়া গাড়ী তার গন্তব্য পথে গন্তব্য স্থানে যায়। যে মালের বোঝাই বহুক, গাড়ী গাড়ীই থাকে,—মালের স্পর্শে মালের মূলত্বগুণ সে পায় না। সোণা বহিয়া গাড়ী সোণার খনি হয় না, ধান বহিয়া ধানের ক্ষেত হয় না, ফল বহিয়া ফলের গাছ বা কাপড় বহিয়া কার্পাস হয় না।

বিদ্যালয়ে পুস্তকের পাতায় ও শিক্ষকের মাথায় এইরূপ অনেক জ্ঞানের মাল বোঝাই করা থাকে! যে গাড়ীতে যত আঁটে, সেই গাড়ীতে তত মাল বোঝাই করিয়া দেওয়া হয়। মন-গাড়ীতে জ্ঞানের মালের বোঝা লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে 'শিক্ষিত'গণ যার যার গন্তব্যপথে বিচরণ করিতে থাকেন। বোঝার ভারে গাড়ী কখনও বড় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে; কখনও বড় ক্লান্ত, আর চলিতে পারে না; কখনও ভাঙ্গে ভাঙ্গে, কখনও বা ভাঙ্গিয়াই পড়ে।

কতকগুলি আহার-গ্রহণে উদরপূর্ত্তি হইলেই দেহের পুষ্টি হয় না। আহার জীর্ণ হওয়া চাই, দেহের উপাদানে তার পরিণতি আবশ্যক। তবেই তাহাতে দেহের পুষ্টি হইবে, পুষ্টির সঙ্গে দেহের জীবনী-শক্তি যেমন বাড়িবে, শক্তির ক্রিয়া

যেমন চলিবে,—তেমনি ক্ষুধা বাড়িবে, আহারের প্রয়োজন এবং গ্রহণে ও পরিপাচনে সামর্থ্যও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। দিনের পর দিন, নূতন ক্ষুধায়, নূতন আহারে দেহের পুষ্টি বাড়িয়া, পূর্ণ পরিণতির পূর্ণশক্তি ও পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, দেহ-ধারণের পূর্ণ সার্থকতায় মানব-জীবন ধন্য হইবে।

আহার গ্রহণে ও পরিপাচনে যেমন দেহের পুষ্টি, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শক্তি ও ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি হয়, জ্ঞান গ্রহণে ও জ্ঞান অধিকারে তেমনই মনের পুষ্টি, মানসিক বৃত্তি সমূহের শক্তি ও ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি হয়। পুস্তকে অধীত বা শিক্ষকের মুখে ব্যাখ্যাত কতকগুলি বিষয় মাত্র মনে বা স্মৃতিভাণ্ডারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলেই চলিবে না। খাদ্য যেমন পরিপাক যন্ত্রের বিবিধ ক্রিয়ায় দেহের উপাদানে পরিণত হয়, স্মৃতিতে গৃহীত জ্ঞানকেও তেমনি চিন্তা ও কল্পনা প্রভৃতির ক্রিয়ায় মনের নিজস্ব জিনিষে পরিণত করিতে হইবে। এই পরিণতির ফলে যখন মনোবৃত্তি সমূহের পরিস্ফূরণ হয়, সেই পরিস্ফুরণের শক্তি বলে মানব যখন জ্ঞানতত্ত্বদর্শী হয় তার বিবেকবুদ্ধি ও বিচার-শক্তি প্রভৃতি পূর্ণতার দিকে যায়, তখনই তার জ্ঞানশিক্ষার চরম সার্থকতা হয়।

এই সার্থকতা লাভ সম্যকভাবে সকল বালকের পক্ষে সম্ভব না হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার লক্ষ্য যদি এই আদর্শের দিকে থাকে, তবে শিক্ষার্থী সকল বালকেরই স্বাভাবিক শক্তির পরিমাণ ও গতি অনুসারে, যতটুকু বা যে রকমেরই হউক, জ্ঞান-লাভের সার্থকতা একটা হইবেই। যে বালকের স্বাভাবিক শক্তির গতি যেদিকে, পরিমাণ যতটুকু—সেই দিকে সেই পরিমাণের অনুসারে যদি তার শক্তির বিকাশ ও ক্রিয়া হয়, তবে তাহাই তার জ্ঞানলাভের চরম সার্থকতা।

আমাদের বিদ্যালয় সমূহে জ্ঞান দানের একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে ব্যবস্থার লক্ষ্য এ দিকে নাই। থাকিলেও প্রায়শঃ তাহা জ্ঞানদাতার অজ্ঞতার আঁধারে আবরিত।

তাই দেখিতে পাই, বালকগণ শেখে অনেক, কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানের তত্ত্ব-দর্শন অল্পেরই হয়। তাই বিজ্ঞান শেখে অনেকে, কিন্তু বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্ বড় কম দেখি। দর্শন পড়ে অনেকে, দর্শনতত্ত্বদর্শী বড় বিরল। সাহিত্য নাড়ে চাড়ে অনেকে, কিন্তু সাহিত্যে মৌলিকতা অল্পেরই দেখা যায়। ঠাকুরমার গল্পের মত ইতিহাসের কথা অনেকের মুখে, কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্ব-দৃষ্টি কয়জনে পাইয়াছে? তাই বিজ্ঞান শিখিয়া উকিল, দর্শন পড়িয়া কেরাণী, কাব্য পড়িয়া বণিক, ভাষাতত্ত্ব

পড়িয়া দারোগা, ইতিহাস পড়িয়া কণ্ট্রাক্টর, কৃষিতত্ত্ব পড়িয়া ডেপুটী,—এইরূপ শিক্ষার্থী হইতে কর্ম্মিজীবনে অদ্ভুত পরিণতির বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

শিক্ষার যে সাধনা-অঙ্গে মানুষ গড়ে, আমাদের বিদ্যালয়গুলি সে অঙ্গহীন যে অঙ্গটি আছে, তাও বিকল, তবে উপায় কি?

বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ এই তিন ক্ষেত্রে বালকগণের শিক্ষা-জীবন অতিবাহিত হয়। বিদ্যালয়ের বিকল অঙ্গটি যদি ঠিক করিয়াও লওয়া যায়, তবু সাধনার জন্য গৃহ ও সমাজের উপর নির্ভর করা বই মানুষ গড়িবার আর উপায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমাদের গৃহে ও সমাজে মানুষ গড়িবার অনুকূল অবস্থা অপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থাই বেশী। তাই দেশে মানুষ কম।

মানুষ কম, কিন্তু একেবারে নাই এমন কথা বলিতে পারি না, বলা আমাদেরও উদ্দেশ্যও নয়।

মানবের মধ্যে এমন সৌভাগ্যবান্ অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রাক্তন কর্ম্ম-ফলে প্রবলশক্তিময় অনেক উচ্চ সংস্কার লইয়া আসেন। আপন শক্তিবলেই সে সব সংস্কারের বিকাশ হয়, কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাহাদিগকে দমিত, বিকৃত বা খর্ব্ব করিতে পারে না। আবার কাহারও কাহারও ভাগ্যে গৃহক্ষেত্রে এমন অনুকূল শিক্ষার প্রভাব ঘটে, যে অন্য সব প্রতিকূল অবস্থার বিকার তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইঁহারাই মানুষ হন,—হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন দেশে কোন সমাজে কয়জন জন্ম গ্রহণ করেন?

মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

(শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী)

আমরা সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবকে অতি স্বার্থপর, ভণ্ড, কপট, মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি। সাধারণের পরিচিত ইতিহাস আওরেঙ্গজেবকে এইরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল "সাজাহান" নাটক খানিতে আওরেঙ্গজেব চরিত্রে যতদূর সম্ভব দোষারোপ করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

কোন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে আওরেঙ্গজেবের চরিত্রে সাধুত্ব ভিন্ন অসাধুত্বের কালিমা প্রলেপ করা হয় নাই। কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিকও আওরেঙ্গজেবকে "অসাধু" বলিয়া অভিহিত করেন নাই। কেবলমাত্র আওরেঙ্গজেবের সমসাময়িক ড্রাইডেন তাঁহাকে ভণ্ড ও প্রতারক বলিয়াছেন। ড্রাইডেন বলেন, "আওরেঙ্গজেব সিংহাসনাধিকারের জন্য ধর্ম্মের ভাণ করিতেন এবং অতি নিষ্ঠুর হত্যা কার্য্য লুকাইবার জন্য নমাজাদি করিতেন।" এখন দেখা যাউক ড্রাইডেনের উক্তির মূলে কতটা যথার্থ্য নিহিত রহিয়াছে। আওরেঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু আওরেঙ্গজেব এইরূপ ভ্রাতৃহত্যা ব্যতীত যে ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিতেন না, একথা কেহ কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দারা, সুজা বা মোরাদ ইহারা কেহই সিংহাসন লাভের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এমতাবস্থায় আওরেঙ্গজেব যদি স্বয়ং ফকিরবেশে সংসার হইতে দূরেও থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য কখনও আওরেঙ্গজেবকে জীবিত রাখিতেন না।

মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের কোনও নির্দ্দিষ্ট আইন বা নিয়ম ছিল না। সাধারণতঃ যেমন জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, ভারতে মোগল শাসনকালে এরূপ কোনও নিয়ম ছিল না। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই সম্রাটের পুত্রগণ প্রত্যেকেই সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। একে জীবিত থাকিতে অন্যের সিংহাসন নিরাপদ নহে,—কেবল সিংহাসন কেন, জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইত। তাই বহুপূর্ব্ব হইতেই কোনও বাদসাহের শেষ জীবনে—কখনও বা জীবনান্তে—তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অতি মারাত্মক বিরোধ উপস্থিত হইত। রাজ্য লাভ করিয়াও হুমায়ুন ও আকবরকে তাঁহাদের ভ্রাতাদের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সিংহাসন অধিকারের সময় জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা কেহ জীবিত ছিলেন না। কিন্তু পুত্রের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। পিতৃ-বিদ্রোহের ফলে কারাগারেই হতভাগ্য খসরুকে মরিতে হয়। সাজাহানকেও পিতার বিদ্রোহী ও ভ্রাতাদের বিরোধী হইতে হয়। রাজ্যলাভের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে সাহাজানও নিহত করেন। হয় রাজসিংহাসন, নয় মৃত্যু—ইহার একটি ব্যতীত মোগল রাজপুত্রগণের আর গত্যন্তর ছিল না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সিংহাসনে বসিতে হইবে—সিংহাসন ও জীবন নিরাপদ করিতে হইলে, প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকেই পথ হইতে সরাইতে হইবে। ইহাছাড়া আর উপায় ছিল না। ঔরঙ্গজেবের

ভ্রাতৃহিংসার কারণও এইরূপ আত্মরক্ষার প্রয়োজন। দারার পক্ষপাতী পিতাকে তাই তিনি কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ-জীবনে আওরেঙ্গজেব যে একেবারে দোষশূন্য ছিলেন, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজত্বকাল ভরিয়া ঔরঙ্গজেব অতি কঠোর নিয়মে, আত্মজীবনে স্বীয় ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ড্রাইডেন ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে "ভণ্ড" এই বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস ডাইডেন আওরেঙ্গজেব চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ধর্ম্ম তাঁহার "স্বধর্ম্ম" সেই ধর্ম্ম হইতে যে তিনি কখনও বিচ্যুত হইয়াছেন, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। তিনি মুসলমানধর্ম্মে অতি বিশ্বাসী ছিলেন। কি রাজ্য কি সিংহাসন, কি ধন, কি ঐশ্বর্য্য কিছুই কোনদিন তাঁহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। হিন্দু প্রজাদের উপর নির্য্যাতনও তিনি ধর্ম্মবুদ্ধিতেই করেন। এই বুদ্ধি ভ্রান্ত ও অসমীচান হইতে পারে, কিন্তু ঔরঙ্গজেব সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, বিধর্ম্মীদের প্রতি এইরূপ শাসননীতিই তাহার ধর্ম্মানুমোদিত।

সম্রাট্ হইলেও আওরেঙ্গজেব ফকিরের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। পশুমাংস তিনি ত আদৌ ভক্ষণ করিতেন না; পানীয়ের মধ্যে কেবল মাত্র জলপান করিতেন, কাজেই তাঁহার দেহও অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে উপবাসও করিতেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া ভারতে একটি প্রকাণ্ড ধূমকেতুর উদয় হয়, আওরেঙ্গজেব সেই দীর্ঘ চারি সপ্তাহ কেবলমাত্র একটু দুধ পান করিয়া কাটাইতেন এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। ট্যাভারনিয়ার সেই সময়ে আওরেঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,—"আওরেঙ্গজেব মাটীতে কেবল মাত্র একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শয়ন করিতেন। ইহাতে তিনি মৃতকল্প হন এবং সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য আর তিনি ফিরিয়া পান না। ভণ্ড কেহ এ সংযম করিতে পারে না।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপদেশ এই যে, "যাঁহারা প্রকৃত মুসলমান হইবেন, তাঁহারা একটি না একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন।" আওরেঙ্গজেব এই কারণে

আপন অবসর সময়ে টুপী নির্ম্মাণ করিতেন। মস্কোর রমণীগণ যেমন কাউণ্ট্ টলষ্টয়ের জুতা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতেন, সেইরূপ দিল্লীর ওম্‌রাহগণ সেই সমস্ত টুপী অধিক মূল্যে ক্রয় করিতেন। তিনি যে কোরাণ কেবল কণ্ঠস্থই করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু দিবসে সুন্দর ভাবে সেই সমস্ত কোরাণোক্ত বাণী লিখিতেন এবং সেই পাণ্ডুলিপি সুন্দর আবরণে মণ্ডিত করিয়া মক্কা ও মেদিনায় প্রেরণ করিতেন। এক তীর্থযাত্রা ব্যতীত তিনি প্রকৃত মুসলমানের করণীয় ও অনুষ্ঠেয় কিছুই করিতে বাকী রাখেন নাই।

এ কঠোর ব্রত ভণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে।

আওরেঙ্গজেবের সময়ে যে সমস্ত ইংরাজ বণিক সুরাটে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে এক ওভিংটন ব্যতীত অন্য সকলেই আওরেঙ্গজেবের ভূয়সী প্রসংসা করিয়াছেন ! *

এদেশের জনৈক সমসাময়িক ঐতিহাসিক আওরেঙ্গজেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আওরেঙ্গজেব মুসলমানধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় ভগবদুপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রথমে মস্‌জীদে নমাজ করিয়া পরে বাড়ীতে আসিয়া আবার নমাজ করেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে এবং অন্যান্য পবিত্র দিনে উপবাস করেন এবং প্রতি শুক্রবারে "জুম্মা" মস্‌জিদে সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া নমাজ করেন। কোন পবিত্র রজনীতে তিনি সারানিশি জাগরিত থাকেন। এক দরবার ব্যতীত অন্য কোন সময়ে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন না। রাজ সরকার হইতে আপন ভরণ পোষণের জন্য তিনি যাহা গ্রহণ করেন, তাহার কিয়দংশ তিনি সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে দরিদ্রদিগকে দান করেন। "রমজানের" সমস্তমাস তিনি উপবাস করেন এবং সারারাত্রি ধার্ম্মিকলোক দিগের সহিত মিলিয়া কোরাণ পাঠ করেন। রমজানের শেষ দশদিন তিনি মস্‌জিদে গিয়া প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে বলিয়া যদিও তিনি স্বয়ং তীর্থযাত্রা করেন না, তত্রাচ তীর্থযাত্রীর সুবিধার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি কখনও ধর্ম্মনিষিদ্ধ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন না, অথবা কখনও সুবর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রে আহার করেন না। তাঁহার দরবারে কোন প্রকার অসংযত কথোপকথন তিনি অনুমোদন করেন না। তিনি অভিযোগকারীদের অভাব অভিযোগাদি স্বকর্ণে শুনিবার জন্য ও যাহাদের

* Ovington's voyage to Surat in the year 1689. (London 1696. P.195.)

অভাব প্রতীকার করিবার জন্য প্রতিদিন দুই তিন বার বিনীত অথচ সহাস্য মুখে দরবারে উপস্থিত হন। অভিযোগকারীরা নির্ভয়ে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হয় এবং নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্ত হয়। যদি অভিযোগকারী কোন লোক কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করে, তিনি কখনও অসন্তুষ্ট হন না। তিনি কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও প্রতি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। নৈতিক উপদেশ পূর্ণ কবিতাদি ব্যতীত অন্য কিছুই শুনিতেন না।" *

আওরেঙ্গজেব ইচ্ছা করিলে মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য উল্লিখিত প্রকার কষ্ট স্বীকার না করিয়া—ঐরূপ অসাধারণ সংযমী না হইয়া - অমিত তেজে সমগ্র হিন্দুস্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন। সাজাহান ও জাহাঙ্গীর যারপরনাই ভোগবিলাসী ছিলেন, আওরেঙ্গজেব ইচ্ছা করিলে তদ্রূপ বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও হিন্দুস্থানে একাধিপত্য করিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ প্রবৃত্তি আওরঙ্গজেবের কখনও হয় নাই। এরূপ ভোগবিতৃষ্ণা ভণ্ডের দেয়া যায়?

কোন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি যে প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, আওরেঙ্গজেব ইহা বিশেষরূপেই জানিতেন। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। প্রজাদের মধ্যে হিন্দুই বেশী—তাঁহাদের মতের প্রতিকূলে চলিলে তাঁহাকে যে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা জানিয়াও, আওরেঙ্গজেব, জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত, নিজ বিশ্বাসমত স্বধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। দাক্ষিনাত্যে তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় যখন তিনি রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হন, সেই সময়েই তিনি ফকিরের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসমস্ত যে তিনি রাজ্য লাভাশায় করিতেন তাহা নহে। জন্মাবধি তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তৃণের ন্যায় রাজ মুকুট ভাসাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু আপন ধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য কখনও প্রকাশ করেন নাই। পাঠক, এস্থলে আমি আওরেঙ্গজেবের একটি দিনের ঘটনা বর্ণনা করিতেছি তাহা পাঠ করিয়া আপনারা সহজেই আমার বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপণে সমর্থ হইবেন।—বল্‌মার যুদ্ধে যখন শত্রুগণ আসিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল, তখন সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। নমাজের সময় উপস্থিত দেখিয়া আওরেঙ্গ-

* Mirat-i-Alam. Elliot Dawson's History of India Vol VII P. P.-56—162.

জেব ত্বরিতে আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে নমাজ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আজ্‌বেগ অধিপতি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এইরূপ লোকের সহিত যুদ্ধ করাও যাহা, আত্মবিনাশ করাও তাহা।" বলা বাহুল্য শত্রুপক্ষ তাঁহার অকপট ধর্ম্ম বিশ্বাসে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল! এ সাহস এ নির্ভীকতা ধর্ম্মপ্রাণের—ভণ্ডের নহে।

একেবারে দোষ রহিত লোক দৃষ্ট হয় না, আওরেঙ্গজেবও যে একেবারে দোষহীন ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। তবে নিরপেক্ষ ভাবে আওরঙ্গজেবের জীবন আলোচনা করিলে, স্বাকার করিতেই হইবে যে পিতৃ-দ্রোহ ও ভ্রাতৃহিংসা প্রভৃতি কলঙ্কের জন্য ঔরঙ্গজেবের প্রকৃতি নয়, যে অবস্থায় তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাহাই দায়ী। ধর্ম্মে তিনি ভণ্ড কি কপট ছিলেন না। দোষ যতই থাক্, অনেক গুণেও তিনি অসাধারণ ছিলেন।

ইয়োরোপের কথা।

(২)

জর্ম্মাণ বিপ্লব—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন।

ক। পূর্ব্ব ও পশ্চিম রোম।

সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিই প্রথম ধর্ম্মকে রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। আর একটি ব্যাপারেও ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ভূমধ্য সাগরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে হ্রদের ন্যায় দুইটি সাগর দেখিতে পাওয়া যাইবে। একটি ছোট, আর একটি বড়। ছোটটির নাম মর্ম্মর সাগর এবং বড়টির নাম কৃষ্ণসাগর। এই দুটি সাগরের মধ্যে একটি প্রণালী আছে, নাম বস্ফোরাস্। এই বস্ফোরাস্ প্রণালীর উত্তরে গ্রীক্ অঞ্চলের মধ্যে তখন একটি নগর ছিল—বাইজান্টিয়াম্। এই নগরটির অবস্থান বড় সুন্দর, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিন্ধুশাখাকুলে। সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন্ এই স্থান দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং এখানে নূতন একটি রাজধানী করিবার উদ্দেশ্যে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি

নগরটির নাম রাখিয়াছিলেন, নূতন রোম। কিন্তু কন্‌ষ্টাণ্টাইনের প্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া সকলে এই নগরটিকে 'কন্‌ষ্টাণ্টিনিনো-পোলিস্' অর্থাৎ 'কন্‌ষ্টাণ্টাণ্টা-ইনের পুরী' এই নামেই অভিহিত করিত। তাহাই একটু সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল 'কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল'। এই নগর এখনও বর্ত্তমান। এখনও এই নগর ইহার স্থানীয় সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ অধুনা তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই নগর প্রতিষ্ঠার সহস্রাধিক বৎসর পরে অটোমান নামক তুর্কীজাতি এই নগর জয় করিয়া তাঁহাদের নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি এই পর্য্যন্ত এ নগর তুর্কীর সুলতানের রাজধানী রূপেই রহিয়াছে। রোম হইতে মুশলমানগণ ইহাকে 'রুম্' বলিয়া থাকেন। এই রুম্ রাজধানীতে রাজত্ব করেন বলিয়া এদেশের মুসলমানগণ তুর্কী সুলতানকে 'রুমের বাদসাহ' বলিয়া থাকেন। এ নাম এদেশের হিন্দু মুশলমান সকলেরই পরিচিত। বর্ত্তমান মহাসমরে তুর্কীর সুলতান বা 'রুমের বাদসাহ' যে জর্ম্মাণীর পক্ষে যোগ দিয়াছেন,—ইহাও সকলের বিদিত।

অল্প দিনেই নূতন রোম বা কনষ্টাণ্টিনোপল বিস্তৃতিতে, জনসংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে রোমের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিল। সম্রাটগণ কেহ রোমে কেহ কনষ্টাণ্টি-নোপলে বাস করিলেন!

কনষ্টাণ্টিনোপল্ গ্রীক্ অঞ্চলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য সত্বেও রোমীয় সভ্যতা প্রবলতর ও প্রাচীনতর গ্রীক্ সভ্যতাকে অভিভূত করিতে পারে নাই! প্রাচ্য গ্রীক্ অঞ্চলে রোমানরাই বরং গ্রীক্ সভ্যতার প্রভাবের অধীনে আসিয়া পড়িতেন। গ্রীক্ অঞ্চলে অবস্থিত নূতন এই রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপল্ অচিরেই গ্রীক্ সভ্যতা ও গ্রীক্ বিদ্যার বড় একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। গ্রীক্ ভাষাই এখানে চলিত,—গ্রীক্ সাহিত্যেরই আলোচনা এখানে হইত,—গ্রীক্ আচার নিয়মই এখানে প্রভুত্ব করিত। রোমীয় ভাষা, রোমীয় সাহিত্য, রোমীয় আচার নিয়ম এখানে বিশেষ স্থান পাইল না।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোমের সম্রাট ছিলেন থিওডোসিয়াস্। থিওডোসিয়াসের দুই পুত্র ছিলেন, হনোরিয়াস্ এবং আর্কেডিয়াস্। হনো-রিয়াস্ রোমে এবং আর্কেডিয়াস্ কনষ্টাণ্টিনোপলে সম্রাট্ হইলেন। সাম্রাজ্য এই সময় হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইল। রাজধানী রোম্ এবং প্রধানতঃ ইটালী, গল স্পেন্ ও বৃটেন্ লইয়া হইল পশ্চিম রোম্ সাম্রাজ্য। রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল্ এবং গ্রীস্ এসিয়ামাইনর এবং মিসর প্রভৃতি লইয়া হইল পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্য।

এই সময়েই রোম্ সাম্রাজ্যে জর্ম্মাণ্ বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং শতাব্দীকাল

মধ্যে পশ্চিমরোম্ সাম্রাজ্য এই বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইল—সর্ব্বত্র প্রাচীন রোমাণের স্থানে নূতন জার্ম্মাণ্রা আধিপত্য আরম্ভ করিলেন।

খ। রোমাণের জাতীয় অবনতি—বিপ্লবের সূচনা।

শৌর্যে বীর্য্যে, জাতীয় মহত্বে, তেজোময় মনুষ্যত্বের বহু গুণে প্রাচীন রোমীয় জাতি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এই সব গুণেই রোমাণ্‌গণ বহুদেশ জয় করিয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন একরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী রোমে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমরে ও রাজ্যশাসনে রোমীয় প্রজা সাধারণের একটা কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব ছিল। রোমাণ্ প্রজাদের লইয়া রোমীয় বিশাল দিগ্বিজয়ী সেনাসমূহ গঠিত হইত। শাসন কার্য্যেও রোমীয় প্রজাগণের অভিমত উপেক্ষিত হইত না। রোমাণ্ প্রজা-সাধারণ একদিকে যেমন সমরে ও শাসনে আপনাদের একটা কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিতেন. অপর দিকে এই সব কার্য্যের উপযোগী শক্তিরও অধিকারী তাঁহারা যথেষ্ট ছিলেন। শাসন বিষয়ে প্রজা-সাধারণ প্রতিভাবান্ নেতৃবৃন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেও, ইঁহাদেরই বাহুবল রাজ্য বিস্তারে ও রাজ্যশাসনে এই নেতৃগণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। মোটের উপর প্রজা সাধারণ যে অবস্থায় থাকিয়া যে সব অধিকার ভোগ করিলে, এবং যে সব শক্তিতে শক্তিমান্ হইলে, একটা জাতি শক্তিমান্ হইয়া জগতে আপন প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া উন্নতিশীল থাকিতে পারে, রোমাণ্ প্রজাবর্গ প্রথমে সাধারণতঃ সেই অবস্থায় থাকিয়া সেই সব অধিকারই ভোগ করিতেন,— সেই শক্তিতেই শক্তিমান্ ছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে দেশে সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল,—রোমাণ্‌গণ ক্রমে বিলাসী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইল,—তাহার স্থানে সম্রাট্‌গণের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় অবিরত যুদ্ধে নূতন রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ত্যাগ করিয়া সম্রাটগণ, হস্তগত সাম্রাজ্যে সুকঠোর ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগী হইলেন। প্রজা সাধারণ সম্পূর্ণভাবে এই শাসন শৃঙ্খলার অধীন হইল। সেনা প্রধানতঃ বহু বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইল। যাহা কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ উপদ্রবাদি হইত, তাহা সীমান্তেই হইত। সামাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে মোটের উপর একটা সুদীর্ঘ শান্তির যুগ আসিল।

সম্রাটগণের প্রতিষ্ঠীত ও পরিচালিত শাসনের ফলে প্রজাসাধারণ সুখে ও শান্তিতে রহিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোনও অধিকার কি দায়িত্ব তাহাদের

কিছু রহিল না। সম্পূর্ণরূপে তাহারা সম্রাট পরিচালিত শাসনের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিল, কিন্তু যে সৈন্যবলে সম্রাটগণ দেশে শান্তি রক্ষা করিতেন, শাসন-তন্ত্রে আপনাদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব রক্ষা করিতেন, সেই সৈন্য বাহিনী যত দিন প্রধানতঃ রোমীয় প্রজাবর্গে গঠিত ছিল, তত দিন বিদেশীর আক্রমণে এমন ভয় বা বিপদের কথা কিছু ছিল না। কিন্তু ক্রমে এমন হইল যে রোমীয় সেনায় রোমাণের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রায় লুপ্ত হইতে চলিল। ভোগবিলাসে এবং সুদীর্ঘ শান্তির আরামে রোমাণ্‌গণ রণবিমুখ হইয়া পড়িতেছিলেন। ইয়োরোপের মধ্যে রোম্ সাম্রাজ্যের সীমান্তের বাহিরেই রণদুর্ম্মদ জার্ম্মণ্‌দের বাস। রোমাণ্‌রা যতই ভোগবিলাসে ও শান্তির আরামে হীনবীর্য্য ও রণবিমুখ হইতে লাগিলেন, রাজপুরুষগণ ততই রোমীয় সেনায় জর্ম্মাণ্‌সৈন্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রোমীয় সৈন্য প্রায় জর্ম্মাণ্‌সেনায় পরিণত হইয়া উঠিল। বহু জর্ম্মান্ এইরূপে রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসী হইয়া রোমীয় প্রজামণ্ডলী-ভুক্ত হইলেন। রোমীয় সেনাপতিদের অধীনে উচ্চতর রোমীয় রণনীতিতেও ইহারা অভ্যস্ত হইলেন। বিস্তৃত রোমসাম্রাজ্য জর্ম্মাণের বাহুবলের উপরে নির্ভরশীল হইল।

ওদিকে সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্বাধীন জার্ম্মাণ্‌রাও বিবিধ সম্বন্ধে রোমাণ্‌দের সঙ্গে সুপরিচিত হইতেছিলেন। রোমীয় সভ্যতার প্রভাবও কিছু কিছু ইঁহাদের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল। কিন্তু ইঁহারা স্বাধীন, বাহুবলে বলীয়ান্, নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে অভ্যস্ত। সুতরাং রোমীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জার্ম্মাণ্‌দের কোনওরূপ অবনতি না হইয়া বরং উন্নতিই হইল। পূর্ব্বে যে নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় রাষ্ট্রীয় একতার অভাব জর্ম্মাণ্‌দের মধ্যে ছিল, সভ্যতার কথঞ্চিৎ উন্নতিতে কতক পরিমাণে সেই অভাব দূর হইতে লাগিল। কোনও কোনও প্রবল শক্তিমান্ দলপতি বহু ক্ষুদ্রতর দলকে আপন অধীনে আনিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। শাসন শৃঙ্খলায় ইঁহাদের রাজ্য রোমান্-শাসিত কোনও প্রদেশের ন্যায় উন্নত না হইলেও, সামরিক শক্তিতে ইঁহারা বড় বড় প্রাদেশিক রোমীয় সেনাপতিগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন।

এদেশে একটি সংস্কৃত প্রবাদ আছে, 'বলং বলং বাহুবলম্।' ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল প্রভৃতি অন্য হিসাবে যতই বড় হউক, কোনও জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাহুবলের প্রয়োজন সকলের উপরে। ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল ব্যতীত কোনও জাতি উন্নত অবস্থায় আসিতেও পারে না, থাকিতেও

পারে না, একথা সত্য। কিন্তু বাহুবলের সহায়তা ব্যতীত কেবল ধর্ম্মবলে বা বুদ্ধিবলেও কোনও জাতি আপনার প্রভুত্ব দূরে থাক্, স্বাধীন অস্তিত্বও রাখিতে পারে না। সভ্যতার ও উন্নতির গৌরব যাঁরাই যত করুন, এখনও এই পার্থিব মানবসমাজ এমন অবস্থায় আছে, যে বাহুবলে শ্রেষ্ঠ যে কোনও জাতিই দুর্ব্বলতর অপর সকল জাতিকেই বিধ্বস্ত করিয়া তার শ্রেষ্ঠ অধিকার ও সুখগুলি কাড়িয়া নিতে চায় এবং নিতেছেও। বাহুবলে হীন কোনও জাতি প্রবল কাহারও লোভ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এ পর্য্যন্ত পারেন নাই, এখনও পারিতেছেন না। ধর্ম্মবলে ও বুদ্ধিবলে যে জাতি যতই বড় হউন, বাহুবলের প্রতি উদাসীন হইলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

আরও একটি ঐতিহাসিক প্রমাণে নির্দ্ধারিত সত্য এই যে রাষ্ট্রীয় গৌরবে কোনও সাম্রাজ্য যতই গৌরবান্বিত হউক, সেই সাম্রাজ্যের প্রজা যদি ভোগ-বিলাসে দুর্ব্বল এবং রণবিমুখ হইয়া ওঠে, এবং তার জন্য সাম্রাজ্যের অধিপতিকে যদি বিদেশীয় কোনও রণকুশল জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই সেনার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়, তবে অচিরেই তাঁহার সাম্রাজ্যে রণকুশল সেই বিদেশীয় জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদেশী যখনই বুঝিবে, সাম্রাজ্যের সকল শক্তি তাহারই বাহুবলের উপরে নির্ভর করিতেছে,—সাম্রাজ্যের প্রাচীন প্রজা হীন দুর্ব্বল, তাঁহাদের অস্ত্রের সম্মুখীন হইতে অশক্ত, তখনই লুব্ধ হইয়া সে সেই সাম্রাজ্যে আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের ঠিক এমনই অবস্থা হইয়াছিল। রোমীয় প্রজা হীনবল ও রণবিমুখ, রোমীয় সেনা দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মাণে গঠিত—সাম্রাজ্য আত্মরক্ষার জন্য রণদুর্ম্মদ জর্ম্মাণের উপরে একান্ত নির্ভরশীল। আবার ওদিকে সীমান্তের বাহির প্রবল জর্ম্মাণ্ রাজাদের অধীনে বড় বড় জর্ম্মাণ্ শক্তি গঠিত হইতেছিল। বর্ব্বর হইলেও বাহুবলে জর্ম্মাণ্ শ্রেষ্ঠ, সভ্যতায় উন্নত হইলেও রোমাণ্ বাহুবলে হীন, আত্মশক্তিতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ,—তাঁহাদের একমাত্র রক্ষার উপায় এখন জর্ম্মাণের বাহুবল। আবার বাহুবলে বলীয়ান্ বহু জর্ম্মাণ্ তাহাদের প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী।

জর্ম্মাণ্‌রা অচিরেই এ পার্থক্য অনুভব করিলেন। তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি বহু বিভবে পূর্ণ রোমীয় সাম্রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইল। বহু কারণে নিজেদের দেশ ছাড়িয়া নূতন দেশ অধিকার করিবার দুষ্পরিহার্য্য প্রয়োজনও উপস্থিত হইল। অচিরেই রোম সাম্রাজ্য ভরিয়া জর্ম্মাণ্ বিপ্লব আরম্ভ হইল।

অতি প্রাচীনকালে জর্ম্মাণ্‌রা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন,—এবং ক্রমে যে শক্তিমান্ এক একজন দলপতির অধীনে নিকটবর্ত্তী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মিলিয়া বড় এক একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে-ছিলেন, এ কথা প্রথম প্রবন্ধ উপক্রমণিকা ভাগেই উল্লেখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দেখা যায়, মূল জর্ম্মাণজাতি বিভিন্ন রাজাদের অধীনে কয়েকটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত। এই সব শাখার মধ্যে গথ, ভেণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, সাক্সন্, সোয়েভি, আলিমানি, বার্গাণ্ডিয়ান্. লম্বার্ড প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

জর্ম্মাণ্‌রা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিলেন। জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি বশতঃ স্বদেশে সকলের আহার মিলিবার সম্ভাবনা রহিল না। আবার উত্তর পূর্ব্ব হইতে স্লাভ হুন্ শক্ প্রভৃতি জাতি সমূহও নূতন দেশে নূতন নূতন আহার্য্য অন্বেষণে বোধহয় জর্ম্মাণ মুলুকের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। দেশে স্থান সঙ্কুলন হয় না,—পশ্চাৎ হইতে প্রবল চাপ আসিতেছে,—সম্মুখে হীনবল রোমাণের অধ্যুসিত বহু বিভবে পূর্ণ বহু বিস্তৃত লোভনীয় দেশ সমূহ রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, এই সব কারণেই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দলে দলে বহু জর্ম্মাণ্, বড় বড় রাজা বা দলপতির নেতৃত্বাধীনে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গতি রোধ করিতে পারেন, এমন সামর্থ্য রোমীয় রাষ্ট্রশক্তির ছিল না। রোমীয় রাষ্ট্রশক্তির সৈন্যবলও তখন প্রধানতঃ জর্ম্মাণ্। এই জর্ম্মাণ্ সৈন্য যে কেবল রোমীয় সেনাপতিদের অধীনেই ছিল, তা নয়। অনেক সময় এক এক দল জর্ম্মাণ্ নিজেদের দলপতির অধীনেই রোমীয় সেনা বলিয়া গৃহীত হইতেন। দলপতির অধীনেই এক একটি প্রদেশে ইঁহারা বসতি করিতেন। প্রয়োজন হইলে দলপতির অধীনেই যুদ্ধ করিতেন। এই দলপতিরাও এখন সুযোগ বুঝিয়া আপনাদের অধ্যুষিত প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইলেন। নূতন নূতন দল যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও অনেকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে দুর্ব্বল সম্রাটদের নিকট হইতে এক একটি অঞ্চলের ভূমি অধিকার করিয়া বসিতেন। তারপর সেখানে প্রায় আপনাদের স্বাধীনশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিতেন। গ্রীসের উত্তরে ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে উত্তর ইটালী, গল স্পেন প্রভৃতি রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের দেশগুলি এইরূপে দলে দলে বহু জর্ম্মাণে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

রোমাণ্‌দের ভূসম্পত্তি জর্ম্মাণ্‌রাই অধিকার করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ বাহুবলে বলীয়ান্‌ জর্ম্মাণ্‌রাই হীনবল রোমাণ্‌দের উপরে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। একেবারে নামতঃ না হউক্‌, কার্য্যতঃ-- পশ্চিম রোমসাম্রাজ্য ভরিয়া জর্ম্মাণ্‌ শাসনাধীনে আসিতে লাগিল।

জর্ম্মাণ্‌জাতি সমূহের মধ্যে গথ্‌রাই প্রথমে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগেই একবার জর্ম্মাণ্‌ বিপ্লবের সূচনা হয়। বহু গথ এই সময়ের রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে আসিয়া পড়েন। কিন্তু সম্রাট্‌ ক্লডিয়াস্‌, ডাইওক্লিসিয়ান্‌ এবং কন্‌ষ্টাণ্টাইনের পরাক্রমে ইঁহাদের গতিরোধ হয়। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজ নিজ দলপতির অধীনে সম্রাট্‌দের প্রয়োজনে যুদ্ধ করিবেন, এই অঙ্গীকারে শান্তভাবে সাম্রাজ্য মধ্যে বসতি আরম্ভ করিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে সম্রাট কন্‌ষ্টাণ্টাইনের আবির্ভাব হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতে আবার প্রবলভাবে জর্ম্মাণ্‌ বিপ্লব আরম্ভ হইল। শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট থিওডেসিয়াস্‌ রাজত্ব করেন। এ পর্য্যন্ত সম্রাটগণ এই বিপ্লবের প্রবলস্রোতের বিরুদ্ধে যুঝিতেছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, থিয়োডেসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র আর্কে-ডিয়াস্‌ এবং হনোরিয়াস্‌ পৃথকভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যর অধিপতি হইলেন। ইঁহারা উভয়েই যারপরনাই অকর্ম্মণ্য ছিলেন। রোমীয় সৈন্য-দলভুক্ত জর্ম্মাণগণের বিদ্রোহে, নূতন নূতন জর্ম্মাণ্‌দের আক্রমণে বাধা দিতে পারেন, এমন শক্তি ইঁহাদের কাহারও ছিল না।

গ্রীকের উত্তরে এবং ডানিয়ুবের দক্ষিণে বহু গথ পূর্ব্ব হইতে বাস করিতে-ছিলেন। পূর্ব্ব গথ ও পশ্চিম গথ প্রধানতঃ এই দুই নামে বড় দুইটি শাখায় ইঁহারা বিভক্ত ছিলেন। সম্রাট থিওডেসিয়াসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পশ্চিম গথগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাদের দলপতি মহাবীর এলারিক্‌কে আপনাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এলারিক প্রথমে গ্রীক্‌ অঞ্চলে স্বাধীন একটি গথরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ইটালী আক্রমণ করিলেন। প্রতীচ্য সম্রাট্‌ হনোরিয়াস্‌ তখন রোম ত্যাগ করিয়া ইটালীর পূর্ব্ব উপকূলভাগে রাভেনা নগরে বাস করিতেছিলেন। এলারিক্‌কে বাধা দিতে পারেন, এমন শক্তি তাঁহার ছিল না। ৪১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে এলারিক রোম অধিকার করিলেন,—গথ সৈন্য নগর লুণ্ঠন করিল। জগজ্জয়িনী রোমলক্ষ্মী আজ

বর্ব্বরবীরের বাহুবলে লাঞ্ছিতা হইলেন,—তাঁহার আসন টলিল,—মাথার মুকুট শিথিল হইল!

ইহার অল্প পরেই এলারিকের মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্বন্ধী আথল্‌ফ্‌ পশ্চিমগথ জাতির আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। রোমে সম্রাটের জননী এবং ভগিনী প্লাসিডিয়া গথদের হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। আথল্‌ফ্‌ সাম্রাট্‌-সোদরা প্লাসিডিয়াকে বিবাহ করিলেন। ইঁহারই প্রভাবে আথল্‌ফ্‌ সম্রাটের সঙ্গে শত্রুতার ভাব ত্যাগ করিয়া মিত্রতার সম্বন্ধে সন্ধি করিলেন। সম্রাট অনুমোদন করিলেন, অন্যান্য যে সব জর্ম্মাণ্‌ জাতি গল (বর্ত্তমান ফ্রান্স) ও স্পেন্‌ অধিকার করিতেছে,—আথল্‌ফ্‌ তাহাদের দুরীভূত করিয়া সেই দেশগুলি গ্রহণ করিতে পারেন। আথল্‌ফের অধীনে পশ্চিম-গথগণ ইটালী ত্যাগ করিয়া গল ও স্পেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ গল জয় করিয়া তিনি স্পেনের অধিকাংশ ভাগ অধিকার করিলেন। স্পেনেই তাঁহাদের আধিপত্য স্থায়ী হয়। ইঁহাদের এই রাজ্য কালে বর্ত্তমান স্পেনরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

আথল্‌ফ্‌ চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ইটালী ভরিয়া একরূপ অরাজকতার বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রবই চলিতে লাগিল।

সম্রাটের সৈন্য প্রায়তঃ জর্ম্মাণ্‌। অর্থাভাবে ও উপযুক্ত শাসনাভাবে ইহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গ্রাম ও নগরাদি ইচ্ছামত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নূতন নূতন বহু জর্ম্মাণ্‌ দল আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। দেশময় ঘোর বিপ্লব ও অশান্তি উপস্থিত হইল। বিলাসভোগে রত শক্তিহীন সম্রাটগণ কোনও মতে রাভেনার দুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া রহিলেন। অডোভেকার নামে একজন শক্তিমান্‌ জর্ম্মাণ্‌ বীর এই সময়ে ইটালীতে ছিলেন। তিনি আপন প্রতিভাবলে বিশৃঙ্খল জর্ম্মাণ সৈন্যগণকে আপনার অধীনে আনিলেন। তখন পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। রোমুলাস্‌ আগষ্টুলাস্‌ নামক একজন বালককে একদল তখন সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে অডোভেকার রোমে একটি সিনেটের সভা আহ্বান করিলেন। বালক রমুলাসকে সেই সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। রমুলাস পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে তখন সম্রাট্‌ ছিলেন জেনো। এলারিকের ব্যর্থচেষ্টার পর গথ বা অন্য কোন জর্ম্মাণ্‌ জাতি পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্য আর আক্রমণ করেন নাই। আর্কেডিয়াসের পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ছিলেন। ইটালী এবং পশ্চিম রোমসাম্রাজ্য জর্ম্মাণ্‌দের

কর্ত্তৃক ক্রমাগত বিধ্বস্ত হইতে থাকিলেও পূর্ব্ব রোমসাম্রাজ্য নিরুপদ্রবে আপনার আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

রোমুলাসের পদত্যাগ বা পদচ্যুতির পর আডোভেকারের আদেশে সিনেটরাও মুকুট, দণ্ড ও পতাকা প্রভৃতি রাজকীয় নিদর্শন সমূহ কন্‌ষ্টান্টিনোপলে সম্রাট্‌ জেনোর নিকটে প্রেরণ করিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন, পশ্চিম অঞ্চলে আর পৃথক কোনও সম্রাটের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে এক সম্রাটই যথেষ্ট। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলই এখন অবধি সাম্রাজ্যের এক রাজধানী থাকিবে। জেনোই একমাত্র সম্রাট্‌ থাকিবেন। সম্রাট জেনো 'পেট্রিসিয়াস্‌' (প্রধান) উপাধি সহ অডোভেকারকে ইটালীর শাসন ভার প্রদান করুন।

জেনো রাজকীয় নিদর্শন সমূহ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অডোভেকার সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলিলেন না। প্রার্থিত উপাধি বা শাসন ভারও তাঁহাকে দিলেন না, অথবা তাঁহাকে দমন করিয়া ইটালী অধিকারেরও কোনও চেষ্টা করিলেন না। অডোভেকার সম্রাটের মতামতের কোন অপেক্ষা না করিয়া পেট্রিসিয়াস্‌ এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ইটালী শাসন করিতে লাগিলেন।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দে এইরূপে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান হইল।

সুদূরের অতীতের পৌরাণিক যুগে এক রোমুলাস প্রথমে আপন নামে রোম নগরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র রোম আপন শক্তিবলে বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইয়াছিল। আজ সেই শক্তি হারাইয়া আর একজন রোমুলাসেরই অবনত মস্তক হইতে স্খলিত রোমের সেই বহু শতাব্দীর গৌরবকীরিটি ভূ-লুণ্ঠিত হইল!

ক্রমশঃ।

একা।

(১)

হাটের মাঝে ঘুমিয়েছিনু,
সঙ্গী পথে জেনে
সবাই আমার সবাই আপন্‌
সবাই আমায় চেনে।
ঘুমের ঘোরে চেয়ে দেখি,
সবায় গেছে ছেড়ে;
সঙ্গীহারা হাটের মাঝে,
আছি আমি পড়ে।

(২)

সাগর তীরে আপন মনে,
দেখি ঢেউয়ের খেলা;
সব চলেছে সবার সাথে,
কত প্রেমের মেলা।
একটা হঠাৎ পর্ল্ল পিছে,
(ওগো) হলো সঙ্গী-হারা;
সব চলেছে আপন মনে,
কেউ দিল না সাড়া।

(৩)

সন্ধ্যা যখন ফেল্‌ল আঁধার,
কামিনী গাছের আঁড়ে;
সবাই চল্‌ল খেলা ছেড়ে
আপন ঘরের পানে।
তখন আমার মনে হ'ল
(ওগো) একি তব লীলা,
শেষ দিনে কি এম্নি একা
ভাঙ্গব সব খেলা?

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালী-জীবনের ছায়াপাত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
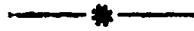
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি, এল।

পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে কত যত্নের সহিত বহুপ্রকার ধান্যের চাষ হইত, তাহা উপরে উদ্ধৃত ভারতচন্দ্রের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায়। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রামেশ্বরও তাঁহার "শিবায়ন" কাব্যে নানাবিধ ধান্যের নাম করিয়াছেন—

"হরিশঙ্কর হৈল ধান্য হাতিপাঞ্জর হুড়া।
হরকুলি হাতিনাদ হিঙ্কি হলুদগুঁড়া॥

কেলে কামু কেলেজিরা কালিয়া কার্ত্তিকা
কয়া কচ্চা কাশী ফুল কপোতকণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুমশালি কনকচুর।
দুদরাজ দুর্গাভোগ পর্দ্দেশী ধুস্তূর॥
কৃষ্ণশালি কোঙরভোগ কোঙরপূর্ণিমা।
কল্মিলতা কনকলতা কামোদ গরীমা॥
খেজুরথুপী খয়েরশালি ক্ষেম গঙ্গাজল।
গয়াবালি গোপালভোগ গৌরীকাজল॥
গন্ধমালতী গুয়াথুপী গুণাকর।
চামরঢালি বন্দনশালি কৈল তারপর॥
ছত্রশালি জটাশালি জগন্নাথভোগ।
জামাইলাড়ু জলারাঙ্গী জীবনসংযোগ॥
ঝিঙ্গাশালি বলাইভোগ ধুল্যা বিলক্ষণ।
নিমুই নন্দনশালি রূপনারায়ণ॥
পাতসাভোগ পায়রারস পরম সুন্দর।
পিপীড়াবাঁক্ তিলসাগরী কৈল তারপর॥
বাঁকশালি বাকোই বুয়ালি দাড়বঙ্গী।
বাঁকচুর বুড়ামাত্রা রামশালি রাঙ্গী॥
রাঙ্গামেট্যা রামগড় রঞ্জয় করি।
পুণ্যবতী ধান্য রাখে নাম ধরি ধরি॥
নছীপ্রিয় লাউশালি লক্ষীকাজল।
ভোজনা ভবানীভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥
সীতাশালি শঙ্করশালি শঙ্করজটা।
এই মত আর কত হৈল ধান্যঘটা॥
লক্ষনাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লোকহিত।
কতনাম কবতার কহিল কিঞ্চিত॥"

রামাই পণ্ডিত কৃত "শূন্য পুরাণে" যে সকল ধান্যভেদের নাম পাইয়াছি, তাহাদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আজান লক্ষী।	চন্দন সাল।	বোআলি।
আজান সিঅলি।	ছিছুরা।	বোর।

আম পাবন।
আন্ধার কুলি।
আমলো।
আলাচিত।
আসআঙ্গ।
আস তির।
আস মুক্তাহার।
উড়াসালী।
কআ।
ককচি।
কনকচুর।
কাত্তিক।
কামদ।
কাঁওদ।
কালা।
কালমুগড়।
কুসুমমালা।
কোঙরভোগ।
কোটা।
খীরকম্বা।
খুদ্দহুহুরাজ।
খেজুর ছড়ি।
গআবালি।
গন্ধ তুলসী।
গন্ধমালতী।
গুজুরা।
গেঁড়ি।
গোতম পলাল।
গোপাল।
গোপালভোগ।

জেঠ।
জলারাঙ্গি।
ঝিঙ্গাসাল।
টাঙ্গন।
তসরা
তিল সাগরি।
তুলনধান।
তোজনা।
তুলাসালি।
দলা গুঁড়ি।
দাড়।
দুগ্‌গাভোগ।
দুহুরাঅ।
নাগর জুআন।
পব্বতজিরা।
পসি।
পাঙ্গুসিআ।
পাথরা।
পার্চ্ছাভোগ।
পিপিড়া বাঁসগজা।
পুআন বিড়ি।
ফেফেরি।
বককড়ি।
বন্ধি বাঁসগজা।
বাঁকচুর।
বাঁকসাল।
বাঁকই।
বাগন বিচি।
বাঁসকাটা।
বাঁসমতী।

ভাদোলী।
ভজনা।
ভাদ্দমুখি।
ভুলি।
মরিচমাইপাল।
মসিলোট।
মহীপাল।
মাধবলতা।
মুক্তাহার।
মুলামুক্তাহার।
মেগি।
মেটা।
মৌকলস।
রক্তসাল।
রঞ্জঅ।
রাঅগড়।
রাজদল।
লতামো।
লাউসালী।
লাল কামিনী।
সনা খড়কি।
সমধুনা।
সালছাটী।
সীতাসালী।
সুআসান।
সোলপনা।
হরি।
হরিকালি।
হাটিআ।
হাতিপাঞ্জর।

ঘুমলে উলি।	বিন্ধসালী।	হুকুলি।
	বুথি।	হুটিআ।
	বুড়ামাত্তা।	হুড়া।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হাটবাজার কিরূপ ছিল এবং কেনো বচা কিরূপে হইত, কবিকঙ্কণ প্রসাদাৎ তাহাও আমাদের জানিতে বাকী নাই।

দুর্ব্বলার বেসাতি।

"দুর্ব্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়া কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পাণ, মুখে গুয়া
পরিধান তসরের সাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেরে যায় দোধারী লোকে চায়
হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয়লাজ
ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই॥
লাউ কিনে কুমুড়া শতমূল পলা-কড়া
পাকা আম্র কিনে বুড়ি মূলে।
বিশাদরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
পাণ কিনে পাই বদলে॥
মূল্য দিয়া পণ দশ জীয়ন্ত কিনিল শশ
যাবক তারক কিনে রুই।
খরসালী কিনে খই কিনিল মহিষা-দই
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই।
বাছি কিনে তাল-শাস হিঙ্গু জীরা রস বাস
চৈমেতি জোয়ানী মহুরী।
মুগ মাস বরবটী কিনিল সরল পুঠী
সের দরে ঘৃত ঘড়া ভরি।
কুড়ি মূলে নারিকেল কুল করঞ্জা পানীফল
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।

কিছু কিনে ফুল গাভা করুণা কমলা টাবা
সেরে জুঁথি লয় ফুল বড়ি ॥
কলা কিনে মর্ত্তমান সরস গুয়া রঙ্গিলা পাণ
কর্পূর কিনিল শংখ-চূণ।
শাক বাগুণ সার-কচু থাম আলু কিনে কিছু
বিশা দুই তিন কিনে মুণ ॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা বিশা দরে কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
চতুর সাধুর দাসী আটকাহনে কিনে খাসী
তবে কিছু মাঙ্গিলা যে ভাট ॥
আগু পাছু ভারী জন দুয়া যায় নিকেতন
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুর সাধুর দাসী আগে ভেট দিয়া খাসী
প্রণাম করিল সদাগরে ॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

দুর্ব্বলার হাটের হিসাব।

"হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গণি
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম ॥
প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে
ডাকে মীনরাশির কল্যাণ।
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাল পঞ্জী
বুড়ি কয় দশ পণ দান ॥
কান্ধে কুশের বোঝা নগরে কুশাই ওঝা
বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইছিয়া তোমার যশ দিনু তারে পণ দশ
দক্ষিণা আছিল বহুদিস ॥

বাজারে কর্পূর নাই চায়া বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতনে পাইনু পাঁচতোলা।
পাঁচ কাহনের দর পঁচিশ কাহন কর
চারি কাহনের নিনু কলা॥
আলু কচু শাক পাত আর যত বস্তু জাত
নিনু চারি কাহন দশ পণে।
তৈল ঘৃত লবণ মূলা পাঁচ কাহনের কলা
খাসী নিনু আটকাহনে॥
প্রবেশ করিতে হাটে তথা মিলে রাজভাটে
কয়বার পড়ে উভহাত।
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিনু পণ দশ
কাণা কড়ি পড়িল পণ সাত॥
সঙ্গে ভারী দশ জন তা সবারে দশ পণ
আমি খাইনু চারি পণ কড়ি।
হাটে ফিরে অনুদিন সেখ ফকীর উদাসীন
তায় ব্যয় ত্রয়োদশ বুড়ি॥
প্রাণ ভয়ে দুয়া কয় সাধু বলে নাহি ভয়
দুর্ব্বলা করিল প্রাণপণ।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে দুয়ার নাসা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

ক্রমশঃ

কামনা।

জীবনে আমার কি গো সফলতা
প্রেম-ভক্তি-ময় হৃদি;
মনুষ্য-জনমে কিবা ফলোদয়
(যদি) পতিতে প্রকাশি ঘৃণা?
পূজিতে তোমায় দাও দেব মোরে
প্রেম-ভক্তি-ময় হৃদি;

পতিত-সেবায় ক্ষুদ্র প্রাণ মোর
হয় যেন ক্ষয় বিধি !
হৃদি হতে মোর নাশ দেব যত
অজ্ঞান-আঁধার রাশি ;
উজল আলোকে বিজ্ঞান-স্বরয
উঠুক আমার হাসি।
গাহিতে শিখাও গান তার তরে
যাহার সফল প্রাণ
তোমার করমে দেশের তরেতে
হয় দেব অবসান।

শ্রীঅজিত কুমার সেন।

আশার স্বপন।

এ আশা ত' আশা নয় এ যে মরীচিকা,
বিশাল মরুভূ বুকে বারিধি আঁকা,
চাঁদের আচল ক্ষ'রে
তরল জ্যোৎস্না ঝরে
এ যে শুধু তা'র মাঝে দিবানিশি ডুবে থাকা।
এ আশা ত' আশা নয় এ যে চলে যাওয়া,
আপনা ভুলিতে গিয়ে তা'রে ফিরে চাওয়া,
মনের মন্দির মাঝে
বাসনা-বাসিনী রাজে
এ যে শুধু ক্ষণতরে তাহারে স্বপনে পাওয়া।
এ হাসি ত' হাসি নয় এ যে গো গুমরি মরা,
বাঁধন ছিঁড়িতে গিয়ে এ যে গো বাধিয়ে পড়া,
হৃদয়ের ক্ষত গুলি
যতনে ঢাকিব বলি
নিঠুর কঠিন হাতে এ যে তা'রে চেপে ধরা।
এ কি হাসি, এ কি আশা ! এতে কি গো সুখ পাও,
আমারে সান্ত্বনা দিতে কেবলি কাঁদায়ে দাও,

আমার যা কিছু আছে
থাকুক্ আমার কাছে
যা' কিছু দিয়েছ তুমি নাও সব ফিরে নাও,
কাজ নাই ভালবেসে, দয়া কর—ফিরে যাও।

শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহ রায়।

সংগ্রহ।

ভারতবাণী।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ
যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাম্ ॥

ইনিই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী,—ইনি সকলের কারণ,—সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥

অনাদিকাল হইতে মায়ানিদ্রায় সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখনই সে জন্ম-রহিত নিদ্রা-স্বপ্ন-বিহীন অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষ্যতে ॥

আদিতে ও অন্তে যাহার অস্তিত্ব নাই,—(অর্থাৎ যাহা) অসৎ,—বর্ত্তমানেও তাহা অসৎ অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। পদার্থ সমূহ বিতথ অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণাদিতুল্য অপ্রকৃত হইয়াও অবিতথ অর্থাৎ প্রকৃতের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র।

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥

স্বপ্রকাশ (দেব) আত্মা আপনার মায়াতেই আপনাকে বিভিন্নরূপে কল্পিত করেন। তিনিই আবার সেই সব বিভিন্ন ভাব অনুভব করেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

বিকারোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্।
নিয়তাংশ্চবহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥

সেই প্রভু আত্মা বা ঈশ্বর অন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিত বিবিধ ভাবের কল্পনা করেন। আবার বহিশ্চিত্ত হইয়া পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহও কল্পনা করেন।

অব্যক্তা এব যেঽন্তস্তু স্ফুটাএব চ যে বহিঃ।
কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে॥

অন্তঃকরণে বাসনাদিরূপে সে সব পদার্থ অপরিস্ফুট, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ পরিস্ফুট সকলই এইরূপ কল্পিত। গ্রহণযোগী ইন্দ্রিয় ভেদে কেবল ভেদ প্রতীতি হয় মাত্র।

জীবং কল্পয়তেপূর্ব্বং ততোভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথা বিস্তা স্তথা স্মৃতিঃ॥

প্রথমে 'আমি কর্ত্তা, সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জীব কল্পিত হয়, তারপর বাহ্য শব্দাদি এবং আধ্যাত্মিক প্রাণাদি বিষয়সমূহ কল্পিত হয়। উক্ত জীব যেরূপ জ্ঞান পায় সেইরূপ তার স্মৃতি হয়।

প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈর্ব্বিকল্পিতঃ।
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্॥

আত্মা যে এই সব অসংখ্য প্রাণাদি পদার্থ স্বরূপে বিকল্পিত হন, ইহা সেই প্রকাশমান আত্মারই মায়া। সেই মায়ায় তিনি নিজেও মোহিত হইয়া থাকেন।

সুধি বচন।

চিন্তনীয়াহি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়া।
নকুপ খননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে॥

কোন বিপদের কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা আগেই চিন্তা করিতে হয়। ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, তখন আর কুপ খননে ফল নাই।

বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্বিভবাদিহ।
কৃশতামভিমতা দেহে পীনতা নতু শোফতঃ॥

অন্যায় প্রভাবে বিভব অপেক্ষা দারিদ্র্য ভাল, শোথজাত পীনতা অপেক্ষা কৃশতাও প্রার্থনীয়।

বৃথা বৃষ্টি সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তস্য ভোজনম্।
বৃথা দানং সমর্থস্য বৃথাদীপো দিবাপি চ॥

সমুদ্রে বৃষ্টি বৃথা, তৃপ্তের ভোজন বৃথা, সমর্থকে দান বৃথা, দিবায় দীপ বৃথা। *

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানপি।
বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ॥

অর্থনাশ, মনস্তাপ, ঘরের কোন দোষ, বঞ্চনা বা অপমানের কথা, বুদ্ধিমান লোকে প্রকাশ করে না।

সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রুতে স পুত্রো যত্র নির্বৃত্তিঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে॥

সেই ভার্য্যা যে প্রিয়কথা বলে, সেই পুত্র যাহা হইতে শান্তি আছে, সেই মিত্র যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, সেই দেশ যাহাতে জীবনধারণ করা যায়।

প্রিয়বাক্য-প্রদানেন সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা॥

প্রিয়বাক্যে সকলেই সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং প্রিয় বাক্যই বলিবে,—বচনে কাহার কি দরিদ্রতা আছে?

যো ন সংচরতে দেশান্ যো ন সেবেত পণ্ডিতান্।
তস্য সঙ্কুচিতা বুদ্ধি ঘৃতবিন্দু মিবাম্ভসি॥

যে বহুদেশে বিচরণ না করে, পণ্ডিত গণের সেবা না করে—জলে ঘৃত বিন্দুর ন্যায় তার বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়।

যস্ত সংচরতে দেশান্ যস্ত সেবেত পণ্ডিতান্।
তস্য বিস্তারিতা বুদ্ধিস্তৈলবিন্দু মিবাম্ভসি॥

পরন্তু যে দেশে দেশে বিচরণ করে, পণ্ডিত গণের সেবা করে,—জলে তৈল বিন্দুর ন্যায় তার বুদ্ধি বিস্তারিত হয়।

ব্যাপারান্তরমুৎসৃজ্য বীক্ষমাণো বধূমুখম্।
যো গৃহেষেব নিদ্রাতি দরিদ্রাতি স দুর্ম্মতিঃ॥

অন্যকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বধূমুখ দেখিয়া যে গৃহে অলস হইয়া থাকে, সে দুর্ম্মতি অতি দরিদ্র হয়।

---

* 'তেলো মাথায় তেল ঢালা'—বাঙ্গালায় এইরূপ একটি চলিত প্রবাদ আছে।

ইয়োরোপের রাষ্ট্রনীতি।

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের চারিটী প্রধান অঙ্গ—

(১) রাজা (২) কমন্‌স্‌সভা অর্থাৎ জন সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ
(৩) লর্ড সভা অর্থাৎ অভিজাতদিগের সভা।
(৪) ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রিসভা।

১। রাজা।

আইন অনুসারে ও নামে রাজা সর্ব্ববিষয়েই প্রভু, তিনি প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। সেনা ও নৌ-বিভাগ তাঁহার আজ্ঞাধীন। মন্ত্রীগণ তাঁহারই মন্ত্রী এবং তাঁহার দ্বারাই নিযুক্ত। তিনি ন্যায় ও সম্মানের উৎস। সন্ধি ও বিগ্রহ তাহার ইচ্ছাধীন। 'ব্যাজহট' বলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সেনা ও নৌ-বিভাগ উঠাইয়া পর্য্যন্ত দিতে পারেন। প্রায় সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতে পারেন ও সমস্ত দোষীর দণ্ড মাপ করিতে পারেন এবং পররাজ্য অধিকারের জন্য যুদ্ধ বাধাইয়া ইংলণ্ডের অংশ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে পারেন।

এই অনুসারে ও নামে এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজে এই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনের ভার এখন আর তাঁহার নিজের হস্তে নাই। এই গুলি সমস্তই এখন তাঁহার মন্ত্রিসভার হস্তে পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডের—শাসনতন্ত্রের একটি নীতিসূত্রের (maxim) অতি চমৎকার ব্যাখা দ্বারা এই অবস্থার সমর্থন করা হইয়া থাকে। সেটির অর্থ পরিবর্ত্তনের দ্বারা রাজার অবস্থা পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেটী এই—রাজা কোন অন্যায় করিতে পারে না (the King can do no wrong)। ইহার অর্থ, রাজাকে কেহ কোন অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী করিতে পারেনা। সূত্রটি বহু পুরাতন এবং রাজার অতীত ক্ষমতার জ্বলন্ত সাক্ষী। এখন ইহার অর্থ অন্য রূপ হইয়াছে। নিজের দায়িত্বে কাজ করিলেই অন্যায় হইতে পারে। রাজা অন্যায় করিতে পারে না, সুতরাং রাজা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না,— তাহার প্রত্যেক কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাহার প্রত্যেক হুকুমে তাঁহার সহিত একজন মন্ত্রীর সহি আবশ্যক। দায়ীত্ব যখন সমস্ত মন্ত্রীর

এবং মন্ত্রী ব্যতীত রাজার কোন কার্য্য হইতে পারে না, তখন সমস্ত ক্ষমতাই যে মন্ত্রীদিগের হস্তে পড়িবে—তাহার আর বিচিত্র কি।

এই পরিবর্ত্তন কিন্তু অল্পে সাধিত হয় নাই। অষ্টম হেনরীর সময় (ষোড়শ শতাব্দীর (প্রথম ভাগে) পার্লামেণ্ট এবং মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণরূপে রাজার আজ্ঞাবহ ছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়—পার্লিয়ামেণ্ট প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ আরম্ভ করে। প্রথম জেম্‌সের সময় ইহা বিদ্রোহোন্মুখ হয় এবং প্রথম চার্লসের সময় বিদ্রোহী হইয়া—রাজার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া কিছুদিন রাজা না রাখিয়া দেশ শাসন করে। দেশের জনসাধারণ কিন্তু বিদ্রোহীদের শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই—প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে রাজত্বে পুনঃ সংস্থাপিত করেন। ইহাতে রাজার ক্ষমতা কিছু বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু চার্লসের উত্তরাধিকারী—দ্বিতীয় জেমস্ পার্লামেণ্টের অনভিমতে রাজ্য শাসন করিতে গিয়া রাজ্যচ্যুত হন। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর মহারাজ তৃতীয় উইলিয়াম ও রাজ্ঞী এনের শাসনকালে রাজার মন্ত্রিনিয়োগ ও মন্ত্রিসভায় সভাপতির কার্য্য প্রভৃতি যে কিছু ক্ষমতা ছিল, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্জের সময় একেবারে লোপ পায়। কারণ শেষোক্ত দুইজন রাজা বিদেশী (জর্ম্মাণ) ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষা আদৌ জানিতেন না বলিয়া রাজকার্য্য বিষয়ে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিদিগের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে এবং এই সময় হইতেই মন্ত্রিসভার সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর পদের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় জর্জ এই ব্যবস্থার অন্যথা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার সময় বর্ত্তমান বন্দোবস্ত পাকা হইয়া যায়।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে কি রাজার কোন কার্য্য বা আবশ্যকতা নাই? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে রাজার নিজের কার্য্য করিবার কোনও ক্ষমতা না থাকিলেও মন্ত্রিদিগের পরামর্শ সমূহ জানিয়া উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত বা সতর্ক করিয়া দিবার তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। এবং তাঁহার উপদেশ রাজকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতার জন্য সময় সময় বিশেষ মূল্যবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী সাধারণ প্রজাদিগের সহজে বোধগম্য বলিয়া ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের রাজা থাকায় বিশেষ সুবিধা আছে। তারপর রাজা থাকায়, ইংলণ্ডের প্রকৃত শাসনকর্ত্তার (অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর)

পরিবর্ত্তনের সময় কোন গোলযোগের আশঙ্কা নাই। সাম্রাজ্যের একত্বের নিদর্শন স্বরূপও রাজা ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়।

(অন্য তিনটি অঙ্গের বিবরণ ক্রমে প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম, এ, বি, এল।

বিবিধ—কৌতুকরঙ্গ।

'ক'এর কর্ত্তৃত্ব।

নমস্কার মহাত্মাগণ, চিনিতে পারিলেন কি? আমি আপনাদেরই চির. পরিচিত চির ব্যবহৃত 'ক'। স্পষ্টতর পরিচয় দিতে হইলে বলিব—মহাশয়গণ আপনারা বাঙ্গলা কি সংস্কৃতে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণের পাঠ শেষ করিয়া ব্ঞ্জনবর্ণ শিক্ষার প্রারম্ভেই যাহার সহিত পরিচিত হইয়া থাকেন, আমি স্বয়ং তিনি শ্রী'ক' কুমার কবিকঙ্কণ। আমি দেখিতে মন্দ নই—বেশ সুঠাম, ত্রিকোণাকার, ত্রি সরলরেখা বেষ্টিত মস্তকে মাত্রা সংযুক্ত (মাথা তুলিবার সাধ্য নাই), এবং বামস্কন্ধে (১) একাকার একখানি হস্তসংযুক্ত। ভদ্রলোকে স্বভাবতঃই আত্মপরিচয় দিতে একটু লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। আমিও ভদ্র সন্তান, অতএব আমার সে স্বভাব আর নিন্দনীয় নহে।

তবে আমি বর্ত্তমান যুগেরও লোক (যদিও প্রাচীনে ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকিব আশা আছে)। এ যুগে কেহ একটু সুখ্যাতির কার্য্য করিলে, একটু দান ধ্যান করিলে, এমন কি পিতামাতার শ্রাদ্ধে বা পুত্রকন্যার বিবাহে একটু ব্যয় বাহুল্য করিলে, পাছে অন্য কেহ তাহার সুখ্যাতি গান না করে, এই ভয়ে স্বয়ং তাহা সংবাদপত্রে প্রচার করিতে থাকেন। আমিও যখন এই যুগের, তখন আমারই বা তা না করিলে নাম বাহির হইবে কেন? তাই নিজেই নিজের সুখ্যাতি কথা প্রচার করিতে যাইতেছি, মহাশয়গণ, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দেখুন, সেই সুদূর ত্রেতা যুগে রামসীতার নিদারুণ বনবাস ক্লেশ, দশরথের মৃত্যু প্রভৃতি শোকাবহ ব্যাপারের কর্ত্রীদ্বয় হইলেন কৈকেয়ী ও কুঁজী। (অত্র ক'কার সংযোগাদেব কুব্জীকৈকেয্যোঃ কর্ত্তৃত্বং স্যাদিতি বোদ্ধব্যম্।) সেই যুগের আদর্শ রাজা জনকে আমি আছি, আদর্শ স্ত্রী সতীসাধ্বী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি

কৌশল্যা-জানকীতে ও আদর্শ ভ্রাতা লক্ষ্মণে আমারই প্রভাব; রত্নাকর বা বাল্মীকিও আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। অধিক কি ইক্ষ্বাকুকুল আমারই প্রাধান্য প্রকাশ করিতেছে। আমি এই যুগের কুশে, কশ্যপে, কুশধ্বজে। অষ্টাবক্রে গুহক চণ্ডালে আমি। আমি লঙ্কায়, দণ্ডকে, অশোকবনে,—আমি নাই কোথায়? তাড়কা, তাহার সংহারক জৃম্ভক অস্ত্রাদি, চন্দ্রকেতু সকলেই ত আমারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। অতএব এযুগে আমার আধিপত্য ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

অনন্তর দ্বাপরে দেখুন ভীষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, কুরুকুল, বীরবর কিরীটি, বৃকোদর, কর্ণ, কৃপ সকলেই দেখুন আমাকে কত সম্মানের সহিত অর্চ্চনা করিতেছেন। অতঃপর কুরুকুলের ধ্বংসের কর্ত্তা কৃষ্ণেরও আদিতে আমি এবং তদীয় জীবনের প্রতিসম্বন্ধে আমি কেমন লিপ্ত আছি, তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—কৃষ্ণের শত্রু কংসে আমি বর্ত্তমান্। কৃষ্ণের রাজ্য দ্বারকা, কংসের কারাগৃহ, তাঁহার মাতা দৈবকী সকলেই আমার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছেন। আমি আছি কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র কদম্ব-মূলে। কালিন্দী কল্লোলেও কালীয় নাশেও আমি বর্ত্তমান। প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবীর আদিতেও আমি।

অতঃপর একটু ক্লেশস্বীকার পূর্ব্বক বর্ত্তমান্ কলিযুগের আলোচনায় আসুন, দেখিবেন কলিতে আমি, কলির কর্ত্তা কল্কিতে আমি। হিন্দুশাস্ত্রেও আমার প্রভাব কম নয়। হিন্দু দেবদেবীর দিকে আসিলে দেখিতে পাইবেন, ঐশ্বর্য্যের কর্ত্রী কমলা, যুদ্ধের কর্ত্তা কার্ত্তিকেয়, আবার আজকাল শীতকালের সেই ভয়াবহ কলেরার কর্ত্রী কালী এবং নীলকণ্ঠ সকলেই আমি আছি। আমি কালভৈরবে আছি, কুবের কন্দর্পে আছি। কামধেনুতেও আমারই কীর্ত্তি। কল্পবৃক্ষ আমারই কৃপায় কল্পলতাময়।

তারপর প্রকৃতির দিকে ধরুন্। প্রকৃতিতে দিবাকরই আমাদিগের বিশেষ পরিচিত। দেখুন তাঁহাতে আমি বর্ত্তমান। আবার কবিকল্পনায় তাঁহার হৃদয়ের কর্ত্রী কমলিনীর আদিতে আমি। তারপর রজনীর সুধাকর, তারকা, চকোর সকলেই আমি। পশু পক্ষী রাজ্যে আমার প্রভুত্ব অল্প নহে। 'রজনী প্রভাতা' ইতি জ্ঞাপন করিবেন কে—না কাক, তাহার 'কা' 'কা' ভরিয়াই আমি। পক্ষী জাতির মধ্যে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইল কোকিল। সেই কোকিলে আমি আছি এবং তাহার কুহু কুহু কাকলীতেও বেশ ভরিয়া আছি।

এখন একবার আপনাদের সাধারণ জীবনের দিকে দেখুন। ভারত বর্ষের মধ্যে প্রধানতম কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় আমি বর্ত্তমান। কলিকাতা অতি মনোরম স্থান। এস্থানের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের সাধারণের কর্ত্তা কর্পোরেশনের দেখুন আদিতেই আমি। তারপর কলিকাতার প্রসিদ্ধ কি কি? প্রথমতঃ কলেরা, পক্স,—দুটিতেই আছি। তারপর দুইরকম প্লেগ নিউমোনিক ও বিউবোনিক,—সে দুটিতেই আছি। আফিসের বা কলেজের কর্ত্তা হইলেন কেরাণী, তিনি আমাতেই আশ্রিত।

তারপর সভাসমিতির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স। তাহাদের উভয়েই আপন আপন গৌরব বর্দ্ধনার্থ নামের আদিতে আমাকে স্থান দিয়াছেন। কলিকাতার কারবার অতি বিস্তৃত, তাহাতে এবং তাহার সাধারণ পরিচায়ক 'এণ্ডকোম্পানীতে' আমি বর্ত্তমান। কলিকাতার তীর্থস্থান কালীঘাট আমারই সংস্পর্শে ধন্য। এস্থানের বায়স্কোপ, পার্ক, স্কোয়ার, নাটক কন্‌সার্ট, ক্লেরিওনেট, কর্ণেট এবং কোমল কামিনী কণ্ঠ—সকলই আমার কীর্ত্তি প্রসারিত করিতেছে।

আমি ভারতের শুধু রাজধানী কলিকাতায় আছি এমন নহে। শীতবস্ত্রের বাণিজ্যস্থল কাশ্মীরে আমি, কর্ণাট কাণপুর ক্যানানোর কোকনদ কোচিন কালীঘাট কালনা কাটোয়া, কাছাড়, কাটীহার কুচবিহার কটক—কত আর নামকরিব—কোথায় না আমি আছি। এক কথায় কৈলাস গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই আমি বিদ্যমান্। শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্র কাশী কামরূপ কামখ্যা কাঞ্চী দ্বারকা নাসিক সকলেই একমাত্র আমার সংযোগে এত পবিত্র—যেহেতু আমি বর্গের প্রথম বর্ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত আমি জাপানের রাজধানী টোকিও, লঙ্কার রাজধানী কলম্বো এবং কাবুল, কোরিয়া, টার্কী আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতিতে আছি—পৃথিবীর অনেক স্থলেই আমার কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ চিরকাল কবি-প্রসূ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাই দেখুন প্রাচীন কবি-রাজ্যের বাল্মীকি কালিদাস কাশীরাম কৃত্তিবাস শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আমারই গৌরব বিস্তার করিতেছেন। সম্প্রতি বঙ্কিম অক্ষয় মাইকেল কৃষ্ণচন্দ্র সকলেরই মধ্যে আমি লক্ষিত হইয়া থাকি। রবীন্দ্র প্রথমে আমাবিরহিত থাকিলেও 'কবীন্দ্র' নামে এখন আমারই ভজনা করিতেছেন। কবি নবীনচন্দ্রে না থাকিলেও তাহার কীর্ত্তির কারণ, বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য রতন কুরুক্ষেত্র রৈবতকে আমার

আধিপত্য আছে। বিদেশীয় সাহিত্যিক গণের মধ্যে সেক্ষপিয়র, বার্ক, কার্লাইল কিট্‌স স্কট্‌ ডিকেন্স কোনানডয়েল প্রভৃতিতে আমি বর্ত্তমান।

ভারত সকল ধর্ম্মের মিলনস্থল। তাই বড় বড় ধর্ম্মের নেতৃগণের মধ্যে দেখুন—কৃষ্ণ, শাক্যমুনি, শঙ্কর, অশোক, নানক, কবীর, কেশব আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্রাইষ্টও দেখুন আমাকে সম্মান করিতেছেন। মহম্মদ তাঁর কোরাণের আদিতে আমাকেই স্থান দিয়াছেন। সাধক শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণে, আমি আছি। স্বামী বিবেকানন্দও নামের মধ্যস্থলে আমার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তি এবং মুক্তিলাভের উপায় যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তি এ সকলেই আমারই কীর্ত্তির ধ্বজা উড়াইতেছে।

ভারতের শাসন বিভাগেও আমার আধিপত্য অল্প নহে। এখানে বঙ্গবিভাগের কর্ত্তা কর্জ্জনে আমি ছিলাম। যুক্ত বঙ্গের প্রথম অধিপতি কারমাইকেলেও আমি আদি।

এই ত গেল শাসন বিভাগের কথা। তারপর ইউরোপীয় মহাসমরের জর্ম্মাণ সম্রাট কাইজার, রুষ জার নিকোলাস্‌ ফরাসী নায়ক করেনকার্‌ ইংরাজ সমর সচীব কিচেনার ও নৌসেনাপতি জেলিকো ইহাদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদের বীরত্ব ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছি। অনন্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা ডক্টর মুখার্জ্জী বা সর্ব্বাধিকারী উভয়েই আমাকে মান্য করিয়া থাকেন।

অতঃপর মানব চরিত্রের আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইবেন, তাহার শ্রেষ্ঠ গুণ করুণা, কোমলতা, কমনীয়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতিতে থাকিয়া তাহাদের গৌরব ও আদর বর্দ্ধিত করিয়াছি। লক্ষান্তরে দুরন্ত রিপুদ্বয় কামক্রোধ আমার কাছে অবনত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। শুধু মানবের চরিত্রে নয় তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌ সকলেই আমি বর্ত্তমান।

নাকে (স্বর্গে) নরকে, আকাশে, গোলকে, যক্ষে রক্ষে, কিন্নরে কোথাও আমার অভাব নাই। তারপর মহকুমায় আমি, চৌকিতে আমি, কোর্টে স্কুলে কলেজে কোথায় না আমি আছি? উকিলে আমি, মোক্তারে আমি, ডাক্তারে আমি, গ্রাম্য কমিটিতে আমি, আমি নাই কিসে? মোকর্দ্দমায় আমি, মক্কেলে আমি কবুলিয়তে, আইনের প্রতি সেক্‌সনে আমি, এবং ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্‌সনেও আমি।

তারপর আজ যে আমরা ঘরে বসিয়া সেই সুদূর হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা সকল জানিতে পারিতেছি, এবং ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানের ইতিহাস রাখিতে পারিতেছি, জাতীয় উন্নতির চেষ্টা ঘরে বসিয়া করিতে পারিতেছি, কোথায় কোন দেশে কখন কি হইতেছে ঘরে বসিয়া সকল খবর রাখিতে পারিতেছি, চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন এ সকলেরই মূলে একমাত্র কাগজ, কালি ও কলম এবং কৌতুহল। দেখুন ইহারা সকলেই আমার মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। তারপর যে জিনিষের জন্য সকলে দিনরাত্রি গায়ের রক্ত জল করিয়া খাটিতেছে, যাহার প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ খুন, ডাকাইতি, চুরি, কত কি করিতেছে, মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। সেই জিনিষটি— সংক্ষেপে যে জগৎকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে— সেই 'টাকা'ও আমারই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমি অস্ত্ররাজ্যে রামের ও অর্জ্জুনের ধনুকে আছি, কৃষ্ণের চক্রে আছি, পরশুরামের কুঠারে আছি, মহাদেবের পিনাকেও আমি বর্ত্তমান। তারপর বর্ত্তমানে যুদ্ধের কামানে বন্দুকে আমারই বীর্য্য ঘোষিত হইতেছে। তারপর সাধারণ সংসারের কাস্তে কাঁচি কুড়াল কাটারী কোদালে—কুলকামিনীদের কোঁদল কলহে ক্রন্দনে কুৎসায় কটাক্ষে, কলকণ্ঠে,—কোমল করে, ক্ষীণ কটিতে, কেশকলাপে কম্বুকণ্ঠে আমারই প্রভাব বর্ত্তমান।

আমি ব্রাহ্মণের টিকীতে আছি, বৈদ্যের মকরধ্বজ কস্তুরীতে আছি, বৃত্তি কবিরাজীতে আছি, ক্ষত্রিয়ের কলহে আছি, কায়স্থের কলমে বৈশ্যের কর্ষণে আছি, শূদ্রের সেবাকার্য্যে আছি। এতদ্ভিন্ন কাঁসারী, শাঁকারি, মালাকার কুরী, কামার, কুমার, কৈবর্ত্ত, সেক্‌রা, কুর্‌মী, কোরজা, কোয়েরী, কাহার, চর্ম্মকার, বাজিকর, বণিক প্রভৃতির মধ্যে আমার সম্পূর্ণ প্রভাব। বর্ণশঙ্করেও আমার অভাব নাই।

আমি কালিয়া কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাবে আছি, আলুবকৃড়া কিস্‌মিসের টকে আছি। আমি বিস্কুটে কেকেও আছি। চায়েব কাপে আমি আছি বড় চায়ের দোকানে দেলখোস ক্যাবিনে আছি। মিঠাইয়েব দোকানে আমি কচুরী, নিম্‌কি, কালজাম, কাঁচাগোল্লা, লেডিকেনীতে মধুরতার সঞ্চার করিয়াছি।

পুষ্পরাজ্যে আমা'র প্রভাব অতি বিস্তৃত। সেখানে করবী, কেতকী, কদম্ব, কেওয়া, কনকচাপা, বকুল, কামিনী, চট্‌কা কৃষ্ণকলী, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন, বক্, নাগকেশর, মল্লিকা, ঝুমকা, কাঁঠালচাপা, কমল, সেফালিকা সকলেই অলক্ষ্যে আমারই সৌরভ-গন্ধ বিস্তার করিতেছে। সেইরূপ তরকারী রাজ্যেও কচু,

কুমড়া, কুসী, কড়ল্লা, কাক্‌রোল, শাক্‌, কফি প্রভৃতিতে আমার সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল আহার্য্যের পাক কার্য্যে এবং পাকের কাঠ বা কয়লাতেও আমার অভাব নাই।

আমি বর্ত্তমান বাবুদের বৈঠকখানায়, তাকিয়ায়, তামাক টিকে, হুকা ক'ল্কে এবং কয়লাতে আছি, তাহাদের কোটে, কলারে কেশে কাম্বেলিনে, কস্‌মেটে, স্পেক্‌টেক্‌ল্‌সে আছি। দুর্ভাগ্য বশতঃ নস্যের মধ্যে এখন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারি নাই, তবে নস্যের কৌটায় বেশ আছি। আমি যুবতীগণের কালাপেড়ে বা কল্কাপেড়ে কাপড়ে আছি, কাজললতায় আছি, কুন্তলীন কেশরঞ্জন কেশোলায় আছি। তাঁহাদিগের অতিপ্রিয় অলঙ্কারের মধ্যেও চিকে, কাণে, কর্ণফুলে, নেক্‌লেসে, কুণ্ডলে, কঙ্কণে, মাকড়ীতে এমন কি ছেলেপিলের কোমর-পাটায়ও আমি আছি। এই হইল তাঁহাদের বিলাসের সময়ে। বৈরাগ্যেও আমিই তাহাদের সহায়—তাহাদের আত্মহত্যার উপকরণ কেরোসিন, কার্ব্বলিক বা করবী বীজে আমিই বিষরূপে বর্ত্তমান্‌। এতদ্ভিন্ন অনাথা বিধবার কাঁথা কম্বল, এবং তামাকগুড়ির কৌটায় আমি আছি।

আর কত কহিব? বলিয়াই বা কি হইবে? যখন হিন্দুমতে জগতের মুলভূত কারণ সেই ওঁকার—যাহার মহিমা নাকে, নরকে. জন্মে মায়ের কোলে এবং মৃত্যুতে মৃত্তিকা ক্রোড়ে প্রসারিত—স্বয়ং তিনিই যখন আমার কীর্ত্তির পতাকা উড়াইয়াছেন, শাক্ত বৈষ্ণবের প্রধান উপাস্য কালীতে কৃষ্ণে সমান ভাবেই আমি রহিয়াছি, তখন আর অধিক উক্তি করিয়া বাচাল হইতে যাইব কেন? যাহা হউক উপসংহারে যাঁহারা হ্রস্বদীর্ঘ ভেদাভেদ উঠাইয়া দিতে প্রয়াসী, যাঁহারা ভাষার শ্রীগৌরব প্রসাধনে কৃতযত্ন সেই সাহিত্য পারিষদের মাননীয় সভ্যগণ সমীপে আমার এই নিবেদন এবং প্রার্থনা হে মহাশয়গণ, আমাকে আর এক খানি হস্ত প্রদান করুন,—আমার মাত্রাটী উঠাইয়া দিন, আমাকে কিছু দিন স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে দিন, আমার আরও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হউক আপনাদের সাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধিত হউক! সকলেরই মঙ্গল হউক!! মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হউক!!!

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

চাট্‌নী।

গিন্নী।—হাঁগা! দুধ যে বড় পাতলা দিচ্ছ।

গোয়াল।—কি ক'র্‌ব গিন্নি মা, ঘাস মেলে না, না খেয়ে গরু কাহিল হ'য়ে গেল। গাই খেয়ে দেয়ে মোটা না হ'লে কি দুধ ঘন হয়? দুধ পাতলা—নিন্দের কথা,—গরুগুলো পর্য্যন্ত দুইবার সময় চোকের জলে ভাসে।

গিন্নী।—ওমা! তাই নাকি? তা দেখো বাছা, চোকের জল যেন দুধে না পড়ে।

* * *

ডাক্তার।—(পরীক্ষা করিয়া) তোমার দাঁত ভাল না, তোমাকে ত সৈন্যের দলে নেওয়া যেতে পারে না।

লোক।—আজ্ঞে, শত্রুকে কামড়াতে যাব না,—কাট্‌তে যাব। হাত ত ঠিক আছে, দাঁত দিয়ে কি হবে?

* * *

মুখরা স্ত্রী।—ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথা যাবে গো?—আমি তোমার সঙ্গে যাব গো!

মুমূর্ষু স্বামী।—না-না তার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। একাই আমি বেশ থাক্‌ব।

* * * * *

বামণী।—ভাত আর দুটি দেব মা?

যাদুমণি।—এক ভাতারেই বাঁচিনে মা—আবার দুটি। রক্ষে কর বাছা।

INSURANCE & PROVIDENT SCHEMES

—various advantages—

For Particulars apply to the Secretary.

শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্ এ প্রণীত

২। সচিত্র

রাজপুত কাহিনী

দ্বিতীয় সংস্করণ।

রাজপুত বীর ও বীরনারীগণের জীবনের গল্প অবলম্বনে রাজপুতজাতির অপূর্ব্ব ইতিহাস। সুন্দর সহজ সরল ভাষায় লিখিত, বহুবিধ চিত্রে অলঙ্কৃত। উপহার দিতে, পুরস্কার দিতে, আনন্দের সহিত শিক্ষালাভের উপযোগী পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে, রাজপুত কাহিনী অতুলনীয়। ছাত্রগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও শিক্ষার বিষয় থাকায় ইহা বহুবিদ্যালয়ে পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমরা আশাকরি প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবক গৃহপাঠ্য রূপে বালকগণকে ইহা পাঠ করিতে দিবেন। ৩০০ পৃষ্ঠার উপরে। মূল্য কাপড়ের বাঁধাই ১।০ ও কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা।

৪। সচিত্র **পুরাণ কথা**

—ছেলেমেয়েদের জন্য বিবিধ পুরাণ হইতে সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর গল্প। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য প্রতি খণ্ড ৫০ আনা।

৴১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে এই সমস্ত পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ও অনেকগুলি হাফটোন চিত্র সম্বলিত 'নমুনা পুস্তক' প্রেরিত হয়।

সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা স্বদেশ বাসী সকলেরই সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করি।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় মালঞ্চের নাম অনুগ্রহপূর্ব্বক উল্লেখ করিবেন।

দারুণ উপদংশ পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া যখন জীবনে হতাশ হইবেন,—অনুতাপের প্রখর বহ্নি যখন হৃদয় ছারখার করিবে,—বাজারের অন্যান্য পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া যখন বিফলমনোরথ হইবেন তখন একবার ১ শিশি মাত্র "মহামৃত রসায়ন" সেবন করিয়া দেখিবেন করুণাময় ভগবানের অপার করুণা লাভ হইল বলিয়া মনে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা।

স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রজোদোষ, ঋতুকাল বেদনা (বাধকবেদনা), মৃতবৎসাদোষ প্রভৃতি রোগের পক্ষে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। এক মাস সেবনোপযোগী ঘৃতের মূল্য ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা।
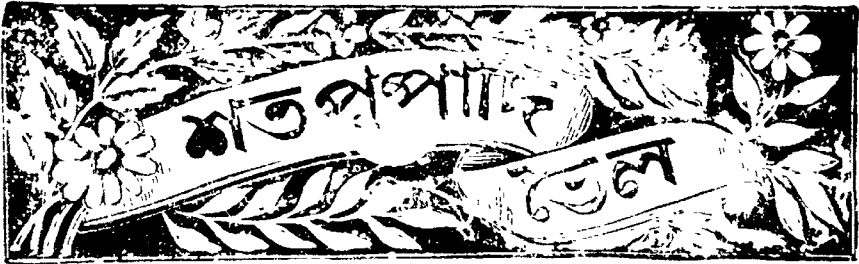
আভাবিক্ত ইন্দ্রিয়দোষ, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, চিন্তা ও বাতপিত্তজন্য শিরোরোগ অর্থাৎ মস্তক জ্বালা, শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল, মস্তিস্ক-দুর্ব্বলতা, নিদ্রানাশ প্রভৃতি রোগ এই তৈল মর্দ্দনে অচিরে উপশমিত হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শ্রীকালীভূষণ সেন কবিরত্ন।

৩নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মালঞ্চ।

সরস সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা—চৈত্র, ১৩২১।

বিষয় সূচি *

* স্থানাভাব বশতঃ এই সংখ্যায় 'ছোট বড়' উপন্যাস দেওয়া গেল না, আশা করি, পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না। আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে পুনরায় উহা আরম্ভ হইবে।

কবিতা—

মালঞ্চ---চৈত্র---বিষয় সূচী।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

চিত্র সূচি।

মালঞ্চ সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী।

১। মালঞ্চের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ডাকমাশুল সমেত ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রতিখণ্ড ।॰ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসরের মধ্যে যিনি যখনই মালঞ্চের গ্রাহক হইবেন, বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখের সংখ্যা হইতেই তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে,— এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য ৩৲ টাকা দিতে হইবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন,—নাম ও ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই তাঁহাদের নামে ভি, পি, ডাকে পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। প্রত্যেক মাসের পত্রিকা সেই মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। কোন মাসের সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। ভাল কোন গল্প কি আলোচনা সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ কেহ ফেরত চাহিলে পূর্ব্বে জানাইবেন এবং দয়া করিয়া তার জন্য মাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত হইলে, কোন সংখ্যায় বাহির হইতে পারে, যত শীঘ্র সম্ভব লেখককে জানান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মালঞ্চ।

মালঞ্চের বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কার্য্যপবিচালনা সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষেব নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বা প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কোন পরিবর্ত্তন কবিতে হইলে যে মাসেব সংখ্যায় উহা প্রকাশিত বা পবিবর্ত্তিত হইবে তাহাব পূর্ব্ব মাসের ১৫ তাবিখেব মধ্যে তাহা পাঠাইতে হইবে।

৩। মালঞ্চে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেব মাসিক মূল্যেব হাব নিম্নে প্রদত্ত হইল

মলাট ৪র্থ পৃষ্ঠা—	১৫৲ টাকা
ঐ ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা—	১২৲ টাকা
ভিতবকাব এক পৃষ্ঠা—	স্থানভেদে ১০৲ হইতে ৬৲ টাকা
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—	৪৷৷০ টাকা ৩৷৷০ টাকা
" " সিকি পৃষ্ঠা—	২৷৷০ টাকা ২৲ টাকা

(দীর্ঘ কালেব জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পাবে।)

কার্য্যাধ্যক্ষ—মালঞ্চ।

প্রথম সাক্ষাৎ

(জীবন আবর্ত

১ম বর্ষ, } চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প উপন্যাস ইত্যাদি

জীবন-আরতি।

(শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত)

[১]

সকালের ডাক আসিয়াছে। শচীন্দ্রনাথ ত্রস্তহস্তে একবার চিঠি ও কাগজ-পত্রগুলি উল্‌টাইয়া দেখিতেছিল। একখানি ধূসর বর্ণের সুদৃশ্য খাম তাহার চক্ষে পড়িল। খামের উপর সুন্দর সাজান মোটা মোটা ইংরাজি অক্ষরে শচীন্দ্রনাথের নামটি লিখিত রহিয়াছে। লেখাটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। শচীন্দ্রের সন্দেহ হইল; লেখাটি পুরুষের নহে! কাহার লেখা? শচীন্দ্রনাথের অন্তর মধ্যে একটি নীরব প্রশ্ন সাড়া দিতেছিল;—খানিকক্ষণ চিঠি খানি এপিঠ ওপিঠ করিয়া শচীন্দ্র ধীরে ধীরে খামটার পাশ দিয়া নিপুণ হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। চিঠি পড়ার পর তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল! চিঠিতে লেখিকার নাম ছিল না। একটি ভাব-প্রবণ কোমল হৃদয়ের অভিব্যক্তিতে চিঠিখানি পরিপূর্ণ!

যে চিঠি লিখিয়াছে, সে যে নারী, তাহা চিঠির আন্তরিকতাপূর্ণ কোমল ভাষা ও লিখন ভঙ্গিটিই প্রকাশ করিয়া দিতেছিল।

আজিকার সকালের ডাক শচীন্দ্রের কাছে যে অভিনন্দন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, শচীন্দ্র তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও আশা করে নাই।

শচীন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম হইতেই একটা বিশেষত্ব লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মতামত গুলি, তাহার নিজস্ব সতেজ কুণ্ঠাশূন্য ভাষায় সে প্রথম দিন হইতেই প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। কবিতায় ও ছোট গল্পের মধ্যে সে তাহার উদ্দেশ্যকে এমনি করিয়া ফুটাইয়া তুলিত, যে তাহার লেখা পড়িয়া গেলেই, পাঠকের মনে হইত, চরিত্রগুলি কল্পিত নহে; সমাজের মধ্যে যাহারা চিরদিন প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সমাজকে তাহাদের অস্তিত্ব দ্বারা ক্রমাগতই কুণ্ঠিত, দুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এ তাহাদেরই স্বরূপ চিত্র। এই লেখার ভিতর দিয়া শুধু তাহাদিগকেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। ব্যঙ্গে, হাস্যে, কৌতুকে তাহার লেখাগুলি উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিত,—অথচ কোথায়ও তাহার ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই! বহুযুগ ধরিয়া সমাজ যে সকল দোষকে মজ্জাগত করিয়া রাখিয়াছে, সে গুলিকে ক্রমাগত টানিয়া বাহির করিয়া সে সমাজের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিতে চাহিত।

নিপুণ পরিদর্শকের চক্ষু লইয়া সে যাহা প্রত্যক্ষ করিত, শুধু সেই গুলিই সে সাধারণ পাঠকের বিচারবুদ্ধির নিকট আনিয়া উপস্থিত করিত। কল্পনার অতিরঞ্জনে সে তাহার চিত্রগুলিকে কোনও দিনই অবাস্তব করিয়া তুলিতে চাহে নাই। শচীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মুখের শাসনবাণীতে পরিবার শাসিত হয়, কিন্তু যখন বিস্তৃত সমাজ-পরিবারকে শাসন করিতে হইবে, তখনই সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য একদিকে যেমন সমাজকে সংগঠিত করিয়া তুলিবে, অন্য দিকে তেমনি সমাজকে তাহার প্রত্যেক দোষের বিষয়ে সাবধান, সতর্ক করিয়া দিবে!

মানুষের জীবন সংযমের পথ দিয়া ধীরে ধীরে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইবে;—শুধু বিলাসরঙ্গের মধ্য দিয়া জীবনকে ও জীবনের উদ্দেশ্যকে সার্থকতার অভিমুখে লইয়া যাওয়া অসম্ভব;—এই সত্যটিই তাহার চিন্তা ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল।

আজিকার ডাকে যে অভিনব চিঠিখানি আসিয়াছিল, সে চিঠি তাহার মতকেই সমর্থন করিয়াছে, এবং বিলাসকে কুণ্ঠিত করিয়া সে যে সহজ, সরল, তৃপ্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এতদিন দেখাইয়া আসিয়াছে, সেই জীবন-নির্ব্বাহ প্রণালীকেই লেখিকা অভিনন্দন করিয়াছেন।

শচীন্দ্রনাথের কাছে এই চিঠি অনেকটা তৃপ্তি ও গৌরব বহন করিয়া

আনিয়াছিল। সে তৃপ্তি ও গৌরব তাহাকে উৎফুল্ল না করিলেও, একটি নির্ম্মল পুলকধারায় তাহার অন্তরকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল!

সমস্ত দিনের নানা কার্য্যের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ কোনও মতেই এই চিঠিখানার কথা ভুলিতে পারিল না। চিঠিখানির অন্তরাল দিয়া এক মহিমা-মণ্ডিতা নারীর সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত মূর্ত্তিখানি তাহার কল্পনা-পুলকিত নয়নের কাছে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সে কে,—কি তাহার শিক্ষা, কি তাহার রূপ,—কি নাম তাহার, কিছুই ত শচীন্দ্রনাথ জানে না! হাতের লেখার ছন্দের মধ্য দিয়া তবুও যেন সেই নারীর কঙ্কনজড়িত শুভ্র হস্তখানি শচীন্দ্রের কল্পনা-কুহেলিকাবৃত নয়নের কাছে ধরা দিতেছিল!

লেখার ছন্দের মধ্যে নাকি মানুষের অন্তর প্রকৃতি প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই তথ্যটি শচীন্দ্রনাথের কাছে আজি আর মিথ্যা বলিয়া মনে হইল না। অক্ষর গুলির প্রত্যেক অঙ্কন রেখার মধ্য দিয়া, ভাষার সরল মধুর অভিব্যক্তিটির মধ্য দিয়া সে যেন সেই অপরিচিতার অন্তরের সংবাদ অনেকটা পাইতেছিল!

[২]

শচীন্দ্রনাথ এতদিন অনাড়ম্বর শান্ত পল্লীজীবন অতিবাহিত করিতেছিল, আজ হঠাৎ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাহার আহ্বান আসিল।

মাসিক পত্র 'কল্যাণীতেই' সে তাহার অধিকাংশ লেখা দিয়া আসিতেছিল। কল্যাণীর প্রৌঢ় সম্পাদক শচীন্দ্রনাথকে বহুদিন হইতে সহকর্ম্মীরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

সংসারে শচীন্দ্রনাথের একমাত্র বৃদ্ধা জননী ও একটি কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ভগিনীর বিবাহান্তে শচীন্দ্রনাথ জননীর সেবাকেই জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কার্য্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এতদিন বাহিরের কোনও আহ্বানই তাহাকে টলাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, শচীন্দ্রনাথের পল্লীগ্রামে আর বিশেষ কোনও বন্ধনই ছিল না। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, পুরাতন বিশ্বাসী নায়েব হরিহর বাবুর উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া শচীন্দ্রনাথ পরম নিশ্চিন্ততার সহিত কল্পনা-লক্ষ্মীর বরাঙ্গ প্রসাধনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিল। কিন্তু কল্যাণী সম্পাদক রাখালবাবু এই সংবাদ পাইলেন। এবার রাঅ তিনি শচীন্দ্রকে ছাড়িলেন না।

শান্ত পল্লীজীবনের মায়া কাটাইয়া কিছু কালের জন্য তাহাকে কলিকাতার কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইল।

গঙ্গার ধারে ছোট একখানি একতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া শচীন্দ্রনাথ, ঠাকুর ও চাকরের উপর গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিল, এবং পরদিনই একরাশি পুস্তক ও কতকগুলি ছবি খরিদ করিয়া আনিয়া নিজের পাঠাগারটি সুসজ্জিত করিতে লাগিয়া গেল।

ঠাকুর ও চাকর সে সঙ্গে করিয়া দেশ হইতেই আনিয়াছিল; তাহারা আপনার জন, সুতরাং শচীন্দ্রনাথের গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের জন্য আর কোনও প্রকার উদ্বেগই রহিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শচীন্দ্রনাথ রাখাল বাবুর বাসায় দেখা করিতে গেল। রাখাল বাবু তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ছোট একটি কক্ষের মধ্যে বসিয়া রাখালবাবু লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে শচীন্দ্রের কার্ড বহন করিয়া উড়িয়া চাকরটি গৃহ প্রবেশ করিল। রাখালবাবু নিজে উঠিয়া গিয়া শচীন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

রাখালবাবু প্রৌঢ়; শচীন্দ্রনাথ পঁচিশ বৎসরের যুবক; ইতিপূর্ব্বে কোনও দিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে দেখা শুনা হয় নাই। শচীন্দ্রের লেখার মধ্যে কল্পনার ও ভাবের পরিণতি এবং শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া রাখালবাবু তাহাকে আর একটু বয়স্ক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

"কখন এলেন আপনি ?"—স্মিতআস্যে রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

'তুমি' ব'লবেন্ আমায়! পরশু সকালে এসেছি! একেবারে বাসাটা ঠিক করে রেখেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!"—শচীন্দ্রনাথ তাহার স্বভাব সুলভ প্রফুল্লতার সহিত কথাকয়টি বলিয়া গেল।

রাখালবাবু শচীন্দ্রনাথের উত্তর দেওয়ার প্রণালীর মধ্যে, এবং তাহার সরল, উদার, স্মিতহাস্যটুকুর মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাইলেন, যাহা এই প্রথম আলাপেই তাঁহার হৃদয়স্থিত স্নেহ-উৎসের মুখে যাইয়া আঘাত করিল! "—পরশু এলে, আর আজ বুঝি আমি দেখা পেলাম!"

শচীন্দ্র হাসিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কক্ষে আর একজন প্রবেশ করিল; সে রাখালবাবুর একমাত্র কন্যা কল্যাণী।

রাখালবাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"মা,—ইনিই শচীন্দ্রবাবু—"

কল্যাণী নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং

দুই পাণি যুক্ত করিয়া ললাটের কাছে নিল; তারপর আবার বসিয়া পড়িল।

কল্যাণীও যথারীতি একটি ছোট রকমের নমস্কার করিল।

কল্যাণী ভাবিল শচীন্দ্র অতিথি, প্রথম কথা আরম্ভ করা তাহার পক্ষে অশোভন হইবে না।

সে একবার তাহার নতচক্ষু তুলিয়া শচীন্দ্রের মুখের উপর স্থাপন করিল; মৃদুকণ্ঠে কহিল, "পল্লী ছেড়ে কলিকাতা আপনার কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করেছেন দেখে সুখী হলেম,—" কথা বলিয়াই কল্যাণী আবার তাহার চক্ষু নত করিয়া লইল।

কল্যাণীর বুকের মধ্যে যেন বড় কাঁপিতেছিল; কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, কথাটা খাপছাড়া হয় নাই ত!

শচীন্দ্র একটু হাসিল, কহিল, "কর্ম্মক্ষেত্রটা স্থির করা খুব সহজ, কিন্তু দেখ্‌তে হবে সে ক্ষেত্রের উপযুক্ত কর্ষণ হয় কি না!"

উত্তর শুনিয়া কল্যাণী একটু আরাম বোধ করিল। তাহার অন্তর মধ্যে যে একটা কুণ্ঠার ভাব আসিতেছিল, সেটুকু কতক পরিমাণে কাটিয়া গেল। প্রথম আলাপের সূত্রপাতেই যে কৃত্রিমতার আবরণ দিয়া আপনাকে ঢাকিতে চাহে না, এবং স্বচ্ছ দর্পণের উপর ছায়াপাতের ন্যায় আলাপের ভঙ্গির মধ্যে নিজের অন্তর-প্রকৃতির একটা স্বরূপ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেয়, তাহার সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা একদিনেই, এক মুহূর্ত্তেই স্থাপিত হইতে পারে।

রাখালবাবু লিখিতেছিলেন, শচীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কৃষক ভাল হইলে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রও ফসল বহন করে।"

কল্যাণী দেখিল, সেই উন্নতদেহ যুবা, এক দণ্ডেই পিতার হৃদয়ে খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে! তাহার সরল সুগঠিত দেহ, উন্নত ললাট, বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ের স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু তাহাকে একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে! সে চক্ষুর দৃষ্টি সহ্য করা খুব কঠিন নহে—শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, মধুরতায় পরিপূর্ণ সেই অনাবিল কুণ্ঠাশূন্য দৃষ্টিটুকু!

বাহিরে কি একটু কাজ ছিল, রাখালবাবু উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "মা, তুমি শচীন্‌বাবুর সঙ্গে আলাপ কর,—আমি এখনই ফিরিয়া আসিব!"

চিত্রাঙ্গদা কোন্ এক বসন্ত প্রভাতে মুকুলিত কুঞ্জবন পথে পার্থের সম্মুখে

তাহার বিস্ময়বিমুগ্ধদৃষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং সে যে নারী সেই দিনই তাহা সর্ব্বপ্রথম অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া সরমকুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিল।

কল্যাণী চাহিয়া দেখিল, সেই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যেও এমন একজন তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন রহিয়াছে, যাহার স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবটি, নারীকে অভ্রান্তভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, সে নারী!

কল্যাণী আর কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া নিজের দিকে চাহিয়া দেখে নাই! তাহার নারী প্রকৃতি এমন করিয়া আর কাহারও কাছে সরমকুণ্ঠিতা হইয়া পড়ে নাই।

কল্যাণী কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে শচীন্দ্র কহিল, "একেবারে পল্লীসমাজ ছেড়ে এখানে এসে পড়েছি, অনেক সময়ে হয়ত অসুবিধার সৃষ্টি করে তুলব।"

"—হয় ত সহরের সমাজ আপনাকে ততটা তৃপ্তি দিতে পারিবে না—" কল্যাণী মৃদুস্বরে কথাকয়টি বলিল!

"প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যেটুকু মন্দ, তাহা চিরদিনই পীড়া প্রদান করিবে, যেটুকু ভাল, তৃপ্তি তাহার মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। সহরের ও পল্লীর সমাজ, উভয়ই মানুষের সমাজ; ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণেই মনুষ্য-সমাজ গঠিত। কোনও সমাজই নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল বা মন্দ নহে!—সুতরাং পল্লীর সমাজে যে দোষযুক্ত অংশটুকু লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহা দোষবিমুক্ত দেখিতে পারি; আবার পল্লীসমাজের মধ্যে যে সারল্য, নিষ্ঠা ও মাধুর্য্য দেখিয়াছি, এখানে তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি!" শচীন্দ্র একাগ্রভাবে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল; কল্যাণী দেখিল, এই নবাগত তাহার মতকে প্রথম হইতেই একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া উপস্থিত করিতে পারে।

এমন সময়ে রাখালবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবক আসিয়াছিল।

"শচীনবাবু, আপনাকে নীপেশবাবুর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিতেছি—ইনি"—

রাখালবাবুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া নমস্কার করিল, এবং কহিল, "নীপেশবাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিলনা,

তবে নীপেশবাবুর কবিতাগুলি আমি আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি! আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলেম !”

নীপেশ প্রতিনমস্কার করিল, এবং সামান্য দুই একটি কথায় তাহার সম্ভাষণ শেষ করিয়া দিল। নীপেশ তাহার বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল।

তাহার এই অনুৎসাহের ভাবটুকু কল্যাণী লক্ষ্য করিল। একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সে নীপেশের মুখের দিকে চাহিল। সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে বুদ্ধিমতী কল্যাণী যেন তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া লইল।

হঠাৎ নীপেশ কল্যাণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, সে তাহার দিকে চাহিয়াছে; তাহার যুগ্ম-ভ্রূকুঞ্চিত; দৃষ্টিতে একটা বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীপেশ মনে মনে ভাবিল, এ বিরক্তিভাব কেন? কল্যাণীর কাছে তাহার অন্তর সে যে লুকাইতে পারে নাই, ইহা সে বুঝিল; বুঝিয়া একটু সুখীও হইল। কিন্তু কল্যাণীর বিরক্তির ভাবটুকু বিশ্লেষণ করিয়া সে যাহা পাইল, তাহা তাহার পক্ষে কোনও ক্রমেই তৃপ্তিপ্রদ হইল না।

নীপেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “তা' হলে বসুন আপনারা, আসি আমি, একটু বিশেষ কাজ আছে আমার।” বিদায় নমস্কার করিয়া নীপেশ বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন গর্ব্বিতা কল্যাণীর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও তাহাকে অনুসরণ করিতেছে!

কল্যাণী মনে মনে ভাবিল, “ছিঃ নীপেশ, এত দুর্ব্বলতা তোমার!”

রাখালবাবু কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন “নীপেশকে একটু কেমন দেখ্‌লাম, ওর অসুখ করে নাই ত!”

কল্যাণী উত্তর দিল না।

প্রৌঢ় রাখালবাবুর স্নেহদৃষ্টির নিকট যাহা ধরা পড়ে নাই,—কল্যাণীর তীক্ষ্ণ নারী চক্ষুর কাছে তাহা এড়াইতে পারিল না।

এবার শচীন্দ্র উঠিল; পিতাপুত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিল!

[৩]

শচীন্দ্রের কলিকাতা আসিবার পর প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় নয়টা; পিওন একখানি ধূসর বর্ণের খাম চিঠির বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিল। শচীন্দ্র নিকটে আসিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির

করিল। প্রত্যেক মাসের এই দিনটি শচীন্দ্রের ব্যর্থ যায় না। তাহাকে অভিনন্দন করিয়া এই লিপি প্রতিমাসেই একখানি আসিতেছে!

কে এই নারী—এই লিপি-প্রেরিকা?

রমণী যেই হউক, সে যে শচীন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান রাখে তাহাতে আর একটুও সন্দেহ ছিল না। সম্রাটের কোষাগারে রাজস্ব যেমন ঠিক নিয়মিত সময়ে আসিয়া পৌঁছে, এই অযাচিত অভিনন্দন পাইয়া শচীন্দ্রের মনে হইত, এ'ও যেন রাজস্বেরই মত,তাহার এমনই একটি ন্যায্য প্রাপ্য, যাহা ঠিক নিরূপিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিবেই!

বসন্ত সমাগমে পল্লবশীর্ষে নবপত্রোদ্গমের মত, মাসের প্রথমেই এই ধূসরাচ্ছদাবৃত লিপিখানি দেখা দিত! জীবনের অনেক পরীক্ষার মধ্যে, অনেক নিরাশার মধ্যে এই লিপিখানি তাহার কাছে উৎসাহবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। এ যেন তাহার জীবনের সমগ্র সুখ ও দুঃখের সহিত একান্তভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

যখনই সে তাহার প্রাণের মধ্যে দৈন্য অনুভব করিয়াছে. যখনই আঘাত পাইয়া তাহার অন্তরদেশ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই আশায়, বিশ্বাসে, উৎসাহে প্রদীপ্ত এই লিপিখানি তাহার কাছে একটি নিশ্চিত সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিয়াছে!

মাটীর নীচে যে চিরন্তন রসধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, উপরে থাকিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। শচীন্দ্রনাথ জানিত না, কে এই লিপি প্রেরিকা, কিন্তু তবুও এই অনির্দ্দিষ্টা নারীর উদ্দেশ্যে তাহার অন্তরমধ্যে একটি আবেগ-পুলকিত আকর্ষণ-স্রোত অন্যের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূচনায় শচীন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারে নাই,—কি আখ্যায় তাহার এই আকর্ষণকে সে অভিহিত করিবে।

এ কি প্রেম?

যে আকর্ষণের অনুভূতি, স্মরণ, তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে, সতর্ক করিয়া দেয়, অনন্যমনা করিয়া রাখে, কি সে?

সে কি বিশ্ববিপ্লাবী প্রেম?

শচীন্দ্রনাথ সেই লিপিখানি পাঠ করিয়া গেল! একবার পড়িয়া সে আর তৃপ্তি পায় না! সে দিন গিয়াছে, যখন সে এই লিপিখানিকে শুধু একটি মূঢ় ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধাবনত ভক্তি-নিবেদন বলিয়াই মনে করিত।

কোন্ এক নিপুণ শিল্পী, মর্ম্মর প্রতিমা গঠন করিয়া, সেই প্রতিমাকেই তাহার নিষ্ঠ প্রেমাভিসিঞ্চনের দ্বারা প্রাণময়ী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল; এখন আর সে কাহিনী শচীন্দ্রনাথের কাছে কল্পনার মোহিনী সৃষ্টি বলিয়া মনে হইত না। তাহার জীবনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সুখ ও দুঃখের অনুভূতি শুধু এই মুগ্ধ লিপিখানিকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল।

তাহার মর্ম্ম-তন্ত্রীতে একটি অননুভূতপূর্ব্ব পুলকগুঞ্জন নিশিদিনই মৃদুভাবে বাজিতেছিল;—সেই গুঞ্জনকে, সেই অনুভূতিকে সে আর কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না।

[৪]

সেদিন সন্ধ্যায় নীপেশ আসিয়া দেখিল, রাখালবাবু কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন, কল্যাণী খালি বাসায় টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একখানি বহির পাতা উল্‌টাইতেছে; নীপেশ কাছে আসিল, কহিল,—

"বাসায় একা তুমি?"

কথাটা বলিবার সময় নীপেশের কণ্ঠস্বর বুঝি একটু কাঁপিয়াছিল, অন্য-মনস্কা কল্যাণী তাহা লক্ষ্য না করিয়া উত্তর দিল, "বাবা বাহিরে গিয়াছেন।" সাদর অভ্যর্থনার কোনও ভঙ্গিই কল্যাণীর এই সংক্ষেপ উত্তরটির মধ্যে নীপেশ খুঁজিয়া পাইল না! কল্যাণী সম্মুখের পুস্তকখানির পাতাই উল্‌টাইতেছিল, নীপেশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। মুখ দেখিয়া বুঝিল সে অন্যমনস্কা।

আলাপটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নীপেশ কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না; হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—

"কি বই ওখানা?"

"শচীন্দ্রবাবুর 'দীপিকা'!"—

শচীন্দ্রের নামটি উচ্চারণ করিবার সময়ে কল্যাণীর বুকের মধ্যে দ্রুততর তালে একটা রক্তের ঝলক প্রবাহিত হইয়া গেল। স্বর না কাঁপিয়া যায়, তাহার দুর্ব্বলতা ধরা না পড়ে, এজন্য কল্যাণী একটু অতিরিক্ত জোর দিয়াই শচীন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিল! তাহার নিজেরই উচ্চারিত নাম তাহার কাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরে একটি মোহস্বপ্ন রচনা করিয়া তুলিল। মোহস্বপ্নাবিষ্টা কল্যাণী কুণ্ঠাচকিত দৃষ্টিতে নীপেশের দিকে

একবার চাহিল, নীপেশও যে একটু বিস্মিত হইয়াছে, তাহাও সে বুঝিল! কল্যাণী তাহার চক্ষু নত করিয়া লইল।

নীপেশ একটু উদাসভাবে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—

"দেখি, বইখানা"—

কল্যাণী তাহার এই উদাস ভাবটুকু লক্ষ্য করিল, তাহার অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া, বহিখানি নীপেশের সম্মুখে ধরিল।

কল্যাণীর হাত হইতে বহি লইয়া পুষ্ট বহিরাবরণটা উল্‌টাইতেই নীপেশ দেখিল, ভিতরে উজ্জ্বল সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

"শ্রীমতী কল্যাণী দেবীকে দিলাম," নিম্নে শচীন্দ্রের সাঙ্কেতিক নামাক্ষর।

নীপেশের মনে হইল, এই একটি ছত্র আড়ম্বরশূন্য লেখার মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ঠতার সঙ্কেত লুক্কায়িত আছে! এই লেখাটুকুকে সে কোনওমতেই সহজ, সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। কল্যাণীকে এমনভাবে উপহার দিবার কি অধিকার শচীন্দ্রের থাকিতে পারে, এই প্রশ্নটাই বারংবার নীপেশের অন্তর মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়া সাড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই বা নীপেশের কি অধিকার আছে?

এই দীর্ঘ কালের পরিচয়ের মধ্যে যে অধিকার সীমাকে নীপেশ মনে মনে ক্রমাগতই বাড়াইতে দিতেছিল, আজ হঠাৎ শচীন্দ্রের একটি ছত্র লেখা, সম্রাটের আদেশের মত অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িয়া, সেই অধিকার সীমাকে একেবারেই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে চাহিল।

নীপেশ একবার মনে করিল, হয়ত এ সবই তাহার শঙ্কিত সন্দেহাকুল চিত্তের মিথ্যা কল্পনা মাত্র, কোনও সত্যই ইহার মূলে নিহিত নাই। কিন্তু প্রবল শক্তির আক্রমণ কল্পনা করিয়া, বিরাট সংগ্রামের নিষ্ফল আয়োজন প্রত্যেক শক্তিই চিরদিন করিয়া আসিতেছে; নীপেশও বিদ্রোহ করিয়া, সংগ্রাম করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিবে, এমনই একটা আয়োজন করিবার জন্য একেবারে উন্মুখ হইয়া উঠিল।

নীপেশ বহির পাতা উল্‌টাইতেছিল; এবং চিন্তা করিতেছিল। কল্যাণী একটু সরিয়া একটা দেরাজের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। নীপেশ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণী সরিয়া গিয়াছে এবং শচীন্দ্রনাথ ও রাখালবাবু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

"এই যে নীপেশ এখানেই,"—রাখালবাবু প্রশান্তভাবে কহিলেন ।

"আমি প্রায় আধঘণ্টা হইল আসিয়াছি "।—

"নমস্কার নীপেশবাবু"—একটু অগ্রসর হইয়া শচীন্দ্র কহিল। নীপেশ এতক্ষণ কতকটা ইচ্ছা করিয়াই শচীন্দ্রের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু শচীন্দ্র হইতেছে সেই প্রকৃতির লোক, যাহারা নিজেকে কখনই অস্বীকৃত থাকিতে দিতে চাহে না।

নীপেশ প্রতিনমস্কার করিল ।

"কি বহি দেখিতেছ ?"—রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"দীপিকা,—শচীন্দ্রবাবুর"—

"দীপিকা আমার বেশ লাগিয়াছে,—শচীন্দ্রনাথের লেখা ক্রমেই আমাকে মুগ্ধ করিতেছে,"—রাখালবাবু শচীন্দ্রের বিনয়নম্রমুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কথাগুলি বলিলেন।

দেরাজের পাশ হইতে কল্যাণী চক্ষু তুলিয়া শচীন্দ্রের উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিল। তাহার প্রশংসমান চক্ষুর দৃষ্টি নীপেশের চক্ষু এড়াইল না! নীপেশ কেন যে একটা অনির্দ্দিষ্ট তীব্র অন্তর্দ্দাহ অনুভব করিতেছিল, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু তবু একটা কিছু উত্তর করা দরকার, নীপেশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "'বসুন্ধরা' পত্রিকায় দীপিকার যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন কি ?" নীপেশের কথা নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই দেরাজের পাশ হইতে কল্যাণী উত্তর দিল,—

"আমি পড়িয়াছি; সে ধৃষ্টতাপূর্ণ সমালোচনার জন্য 'চাবুক' প্রস্তুত হইতেছে!"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কল্যাণী বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কথাটা বড় বেশী রূঢ় ও শ্লেষপূর্ণ হইয়া গেল।

তীব্র সমালোচনার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে কল্যাণীর বেশ একটু নাম ছিল। নীপেশ বুঝিল, কে চাবুক প্রস্তুত করিতেছে!

'বসুন্ধরায়' সমালোচকের নাম ছিল না, তাই রক্ষা!

"তা' তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়াটা একপ্রকার মন্দ নয়, সহজে বিখ্যাত হইয়া পড়া যায়!"—শচীন্দ্র কথাকয়টি এমন সুন্দরভাবে, হাস্যতরল-কণ্ঠে বলিয়া গেল, যে কল্যাণীর কুণ্ঠা অনেকটা কাটিয়া গেল! এবং যে বিতর্কের সূচনা হইতেছিল, তাহাতেও একটা বাধা পড়িল!

রাখালবাবু ধীরে ধীরে তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "নীপেশ, তুমি কাল একবার আমার সঙ্গে দুপুরের পর দেখা করিলে সুবিধা হয়; সময় হবে ত?"—

"যে আজ্ঞে, দুটার পর আপনার সময় হবে ত?"—

"তা' হবে! বেশী রৌদ্রে আসিও না, কষ্ট হইবে!"

কালকার আসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়া গেলে আজ আর বসিয়া থাকা চলে না, সুতরাং নীপেশ কহিল,—

"তবে আমি এখন উঠি; কাল দুইটার পরই আসিব!"

নীপেশ চলিয়া গেল!

রাখালবাবু একটু ক্লান্তভাবে আরাম কেদারার উপরেই শুইয়া পড়িলেন, কহিলেন, "মা, একটা ছোট গান গাহিবে?"

ঘরের কোণে টেবিলের উপর একটা হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। কল্যাণী সেখানে গিয়া পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

শচীন্ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি তবে বাসায় যাই, আপনারা বিশ্রাম করুন্।"

"না, সে কি, বস বাবা, কল্যাণীর গানটা শুনিয়া যাইতে আপত্তি আছে কি?"—রাখালবাবু সস্নেহে কথাগুলি বলিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে কল্যাণী আর কোনও দিন শচীন্দ্রের সাক্ষাতে গান করে নাই; আজই প্রথম গাহিবে! কল্যাণী সঙ্কোচ বোধ করিবে মনে করিয়া শচীন্দ্র উঠিতে চাহিতেছিল।

এখন অনুরুদ্ধ হইয়া শচীন্দ্র বসিল। কল্যাণী বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মিলনীর সম্মুখে গান গাহিতে কোনও দিন তেমন কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

আজ সে শচীন্দ্রের সম্মুখে গাহিবে!

যদি গনাটা ধরিয়া যায়;—গান তেমন ভাল না হয়! তাহা হইলে কি হইবে?

কিন্তু তাহাকে গাহিতেই হইল।

সংসারে শঙ্কাকুল হৃদয়ে এবং সঙ্কুচিত ভাবে এমন অনেক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, যাহার পরিসমাপ্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ উভয়ই প্রদান করিতে পারে!

কল্যাণী গাইতেছিল! বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি তাহার ললাটে ও কপোলে সঞ্চিত হইয়াছে। উপরের পাখার বাতাসে তাহার চূর্ণ কুন্তলগুলি এক একটু উড়িতেছে। তাহার নীল সাড়ীখানির প্রান্তভাগ, তাহার মাথার উপর দিয়া দোদুল্যমান্ বেণীটি বেষ্টন করিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাকারে নামিয়া আসিয়াছে, চাঁপার কলির মত সুন্দর অঙ্গুলিগুলি হার্ম্মোনিয়মের উপর দিয়া নিপুণভাবে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, আর সর্ব্বোপরি তাহার স্বপ্নময় কণ্ঠস্বরটুকু পুলকোচ্ছ্বাসিত হইয়া সেই কক্ষের মধ্যে উত্থিত হইতেছে!

শচীন্দ্রনাথ একবার মুগ্ধনেত্রে এই সঙ্গীতরতা মহীয়সী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিল;—প্রফুল্ল পঙ্কজের মত তাহার সুগৌর মুখখানি. সঙ্গীত ক্লান্তিতে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল!

কল্যাণী তাহার নতমুখখানি তুলিয়া চাহিতেই শচীন্দ্রের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল! উভয়েই চক্ষু ফিরাইয়া লইল!

গান যখন শেষ হইয়া গেল, রাখালবাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "মা তোমার গানটী আজ বড় সুন্দর লাগিল!"—

শচীন্দ্র ভাবিল, বড় সুন্দর লাগিয়াছে; কল্যাণীও বুঝিয়াছিল বড় সুন্দর হইয়াছে!

কল্যাণীর যেন বারংবারই মনে হইতেছিল, 'কতদিন গান গাহিয়াছি, এমন তৃপ্তি তো আর কোনও দিনই পাই নাই!"—

গানের মধ্য দিয়াই বুঝি প্রাণের সঠিক পরিচয়টী পাওয়া যায়! এই বিদুষী কল্যাণীকে এতদিন পর্য্যন্ত শচীন্দ্রনাথ একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে! আজ এই গানের পর তাহার মনে হইতেছিল, এতদিন পর্য্যন্ত যে একটি ছদ্ম কঠিন আবরণ এই রমণীয় নারীমহিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজি তাহা খসিয়া পড়িয়াছে! আজই সর্ব্বপ্রথম সে যেন কল্যাণীর নির্ম্মল রমণীরূপ দেখিতে পাইল!

পুরুষোচিত যে গরিমা ও স্বাতন্ত্র্য কল্যাণীকে আশ্রয় করিয়াছিল, এবং তাহার যে স্বাতন্ত্র্যটুকুর সহিত শচীন্দ্রনাথ এপর্য্যন্ত আপনাকে বনিবনাও করিয়া লইতে পারে নাই, আজি এই গানের পর যেন তাহা দূরে চলিয়া গিয়াছে!

শচীন্দ্র দেখিল, এ নারী;—কোমলা, স্নেহহৃদয়া নারী! লতিকা যতই দৃঢ় হউক, আশ্রয় পাইলে সে তাহার আশ্রয়স্থানকে বেষ্টন করিয়া ধরিবেই।

পুরুষোচিত গুণের নিম্নে নারীত্বকে অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত, দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হইল!

কোনও অভিনন্দনবাণী শচীন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল না! তবু কল্যাণী বুঝিল, গান শচীন্দ্রকে তৃপ্ত করিয়াছে; —সে তাহার সঙ্গীত শিক্ষাকে আজি সম্পূর্ণ, সার্থক বলিয়া মনে করিল।

ধীরে ধীরে শচীন্দ্র কহিল, "অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন উঠিব!"—

রাখালবাবুকে নমস্কার করিয়া এবং কল্যাণীর দিকে একবার অন্যমনস্ক-ভাবে চাহিয়া শচীন্দ্র রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

[৫]

নদীর জলের মধ্য দিয়া বাষ্পীয় পোত অতিবাহন করিয়া চলিয়া গেলে পরেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরঙ্গের একটী উচ্ছ্বাস দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া থাকে। গান শেষ হইয়া গেল! কিন্তু গানের একটি রেশ্ শচীন্দ্রের অন্তরে রহিয়া গেল।

কে যেন মর্ম্মবীণার তন্ত্রীটি বড় জোর করিয়া টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে; সেই তন্ত্রী নির্গত সুরটুকুর সহিত ঐ গানের সুরের মধুর রেশ্‌টুকু তাহার সমস্ত হৃদয়খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া সমান ভাবে বাজিয়া উঠিতেছিল!

ভোরের সূর্য্য যখন তাহার প্রথম কোমল রশ্মিপাতে শিশির নিষিক্ত পুষ্প-গুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল, তখন শচীন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! নিদ্রা ভঙ্গের পর বুকের মধ্যে সে কেমন একটা অকারণ পুলকাবেগ অনুভব করিতেছিল। এই অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, এবং তাহার চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিল!

আজিকার আকাশে, বাতাসে যে আনন্দ, যে পুলক উছলিয়া উঠিয়াছে, তাহার বুকের মধ্যেও যেন সেই পুলক, আনন্দ ও মাধুর্য্যের তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পিওন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল! সেই চির পরিচিত ধূসরচ্ছদাবৃত লিপিখানি!

শচীন্দ্র চিঠি খুলিয়া পড়িল! সেই চিঠির ভাষা, ভঙ্গি, ভাব ও ছন্দের মধ্য দিয়া কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিতা একখানি মানসীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল!

গত রজনী হইতেই শচীন্দ্রের অন্তর মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছিল। যে নারী অদৃশ্যা থাকিয়াও ধীরে ধীরে তাহার অন্তর মধ্যে একখানি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল, তাহাকে হৃদয় হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া আজি আর শচীন্দ্রাথের পক্ষে সম্ভব নহে! যাহার বেদিকা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ধীরে ধীরে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাকে দূর করা সহজ নহে! সেই বেদিকা নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চাহিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ক্ষেত্রও যে অক্ষত রহিবে না, এটা শচীন্দ্র অতি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল!

কিন্তু কোথায় সে? মাসান্তে তাহার একখানি রহস্যাবৃত লিপি আইসে;—এইতো মাত্র সম্বল! এই সম্বলটুকু লইয়া সে জীবন-পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? আর সেই লিপির মধ্যে এক ভক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধানিবেদন ছাড়া সে কি আর কিছুর নিদর্শন পাইয়াছে?

শুধু সামান্য একখানি চিঠি, তাহার পশ্চাতে এক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই! নিবিড় কল্পনার অন্ধতম আবরণে আবৃতা এক নারীর ছায়া লইয়া সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? কিন্তু এই লিপি-প্রেরিকা, যে তাহার মতকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছে, যে তাহার সাহিত্য-সেবাকে অন্তরের উৎসাহবাণী ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছে, সে কি ধরা দিবে না? সে কি চিরদিনই এমনি করিয়া দূরে দূরে থাকিয়া যাইবে?

শচীন্দ্রনাথের অন্তর বলিতেছিল, তাহাকে আসিতেই হইবে, তাহাকে ধরা দিতেই হইবে। সেই দূর ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট দিনটীর জন্য সে কি আপনার নিষ্ঠ প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না?

যে নারী মাসের মধ্যে অন্ততঃ একটী দিনকেও তাহার নিকট অভিনন্দন প্রেরণের জন্য একান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, সে কি কোনও দিনই কল্পনালোক হইতে বাস্তব রাজ্যে তাহার নয়ন সমক্ষে নামিয়া আসিবে না? না, তাহাকে আসিতেই হইবে।

কিন্তু কল্যাণী? সঙ্গীত-শ্রমকাতরা সেই কিশোরীর প্রশান্ত নয়নদুটী ঐ যে তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু লইয়া যেন তখনও তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই জলভরা চক্ষু দুইটির প্রশান্তদৃষ্টি যেন জীবনের পরপার পর্য্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত!

কি করিবে শচীন্দ্রনাথ ?

কল্পনার পুণ্য বেদিকাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া সে কি তাহার মর্ম্মস্থলে ঐ কল্যাণীর জন্যই প্রেমসিংহাসন পাতিয়া রাখিবে ?

'কল্যাণী' পত্রিকাতে 'বসুন্ধরার' 'দীপিকা' সমালোচনার তীব্র আলোচনা বাহির হইয়াছে।

শচীন্দ্রনাথ যখন জানিল, কল্যাণী স্বয়ংই লেখিকা, তখন তাহার বুকের ভিতর সে কেমন একটা নূতনতর স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল !

আপনার জনের শরীরে আঘাত লাগিলে মানুষ যে ভাবে প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া উঠে, কল্যাণীও ঠিক তেমনি ভাবে হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়া তাহার আক্রমণকে শাণিত ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল !

সে দিনকার সান্ধ্যসভায় তখন পর্য্যন্ত কেহ আসে নাই। রাখালবাবু তাঁহার ঈজিচেয়ারটার উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন ; কল্যাণী পিতার আদেশ মত সেই আলোচনাটিই পাঠ করিতেছিল !

কল্যাণীর কণ্ঠস্বরটা মধ্যে মধ্যে যেন ধরিয়া আসিতেছিল ! প্রবন্ধের মধ্যে যে কয়স্থানে শচীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত ছিল, সেই স্থানগুলি ঠিক সহজভাবে সে পড়িয়া যাইতে পারিতেছিল না ;—তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বর যেন একটু কাঁপিতেছিল ; কর্ণমূলটা একটু যেন বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, আর তাহার গোলাপী কপোলের কাছটা দিয়া শোণিতের একটা দ্রুত উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল !

হঠাৎ রাখালবাবু ডাকিলেন, "মা"—

কল্যাণী পড়া বন্ধ করিয়া উত্তর দিল, "বাবা"—

"একটা কথা বলিব, মনে করিতেছি"—

"কি কথা বাবা ?"—

"আজ যদি তোর মা থাকিতেন,"—

রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণী বুঝিল, পিতা যে কথাটী বলিবেন, বহুক্ষণ হইতে তাহার বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিতেছেন।

কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতা আজ এমন করিয়া কথা বলিতেছেন কেন ? পিতার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া কল্যাণী

তাঁহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন।

শোকের এই নীরবতাটুকু বড় পবিত্র,—বড় করুণ!

গৃহের ও অন্তরের লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেই সাধ্বী রমণী একমাত্র কন্যাকে উপহার দিয়া আজ ষোড়শবর্ষ অতীত হইল চির রহস্যাবৃত লোকে চলিয়া গিয়াছেন;—তবু তাঁহার স্মৃতিটুকু রাখালবাবুর হৃদয়ে নিশিদিন সমান ভাবে জাগিয়া রহিয়াছে। আজ এই মেঘমেদুর বর্ষার সন্ধ্যায় যখন বাহিরে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি কাহার জন্য উন্মুখ অপেক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে, তখনও রাখাল-বাবুর প্রৌঢ় হৃদয় মধ্যে পরলোকবাসিনী পত্নীর প্রীতি নিঃশব্দে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

পার্শ্বে কন্যা কল্যাণী,—তাহার মূর্ত্তিতে সেই প্রিয়মূর্ত্তির ছায়া দিনে দিনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সেই অঙ্গ সৌষ্ঠব, সেই মুখাবয়ব, সেই জলভরা বিষাদ ছায়াচ্ছন্ন চক্ষু দুইটি!

রাখালবাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "মা কাল নীপেশের বন্ধু ক্ষিতীশ আসিয়াছিল। নীপেশ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,"—রাখালবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; কল্যাণীর মুখে বিষাদছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার ললাটে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ আর যে সম্ভব নহে, এই ধারণাটা কেন যেন তাঁহার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল, এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা সত্বর করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।

নীপেশ যে যখন তখন লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করে, তাড়া দেয়, ইহাতেও রাখালবাবু তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। সুতরাং আজই কল্যাণীর মত গ্রহণ করিয়া নীপেশকে কালই কিম্বা দরকার হইলে আজ রাত্রেই ডাকাইয়া আনিয়া একটা শেষ উত্তর দিয়া দিবেন, এই সঙ্কল্প তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন।

নীপেশ বহুগুণসম্পন্ন; শচীন্দ্রনাথ আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাখালবাবু নীপেশকেই ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু শচীন্দ্র আসিবার পর হইতে নীপেশের মধ্যে যে একটা অকারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও

বিদ্বেষের ভাব দেখা যাইতেছিল, তাহাই নীপেশকে রাখালবাবুর চক্ষে অনেকটা খাটো করিয়াদিয়াছিল।

'দীপিকা'র সমালোচনার ব্যাপার লইয়া যখন কল্যাণীকে প্রকাশ্যভাবেই একটু উগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ দেখা গেল, তখনই রাখলবাবু নীপেশের সম্বন্ধে কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কল্যাণীর তীব্র আলোচনা যখন ছত্রে ছত্রে হলাহল উদ্গীরণ করিল, তখন রাখালবাবু আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলেন না; যত শীঘ্র হউক, একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য আজকার সন্ধ্যাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। কল্যাণীর মনগত ভাব বুঝিতে যখন আর বাকী রহিল না, তখন তিনি এ বিষয়ে তাহাকে আর প্রশ্ন করাই সঙ্গত মনে করিলেন না।

এমন সময়ে কক্ষমধ্যে শচীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিল। কল্যাণী পিতার কাছ হইতে একটু সরিয়া টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

রাখলবাবুকে নমস্কার করিয়া শচীন্দ্র একবার কল্যাণীর দিকে চাহিল; কল্যাণীর চক্ষু শচীন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত মুখখানির উপরেই নিবদ্ধ ছিল; শচীন্দ্র চাহিতেই তাহাদের চক্ষু মিলিত হইল! কল্যাণী চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

শচীন্দ্র দেখিল, সেই জলভারাবনত নির্ম্মল চক্ষু দুইটির প্রান্তে একটা বিষাদ কালিমা রেখা পড়িয়াছে; তাহার সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়াছে, চারু দেহলতা যেন সূর্য্যতাপক্লিষ্ট মল্লিকা কুসুমের ন্যায় শুকাইয়া উঠিয়াছে।

রাখালবাবু কহিলেন, "কল্যাণী"তে যে আলোচনা বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছ শচীন্?"

শচীন্দ্র একটু অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, দেখিয়াছি!"—শচীন্দ্র জানিয়াছিল লেখাটা কল্যাণীর;—তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে লিখিয়াছেন? নাম দেওয়া নাইত!"

রাখালবাবু কল্যাণীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"এই বার ত আর চাপা রাখা যায় না, মা!"—

"উনিই লিখিয়াছেন?"—শচীন্দ্রনাথের প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টি বুঝি কল্যাণীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিল!

কল্যাণী একবার তাহার আনত দৃষ্টি ঈষৎ তুলিয়া অপাঙ্গে শচীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। শচীন্দ্র দেখিল, সেই পুলকিত দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে নীপেশ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। নীপেশ প্রবেশ করিবার সময়েই কল্যাণীর সেই অপাঙ্গ দৃষ্টি টুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। সে দৃষ্টি শুধু তাহার দিকেই প্রেরিত হইবে বলিয়া সে এতকাল আশা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা ভিন্ন পাত্রে বিন্যস্ত দেখিয়া, নীপেশের মর্ম্মস্থল বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে একখানি ছোট টুলের উপর আহতের মত বসিয়া পাড়ল! রাখালবাবু চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানা একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা কাতরতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, সে এখনই হয়ত তাহার আসন হইতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যাইবে।

"অসুখ করিয়াছে কি নীপেশ?"—সস্নেহ কণ্ঠে রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

নীপেশ একবার কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল; একজন সাধারণ পীড়িতের জন্য যতটুকু উদ্বেগের লক্ষণ একজন করুণ-হৃদয়া রমণীর মুখে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, তার বেশী একটি সহানুভূতির রেখাও কি নীপেশ সে মুখে দেখিবার আশা করিতে পারে না?

না,—সে দৃষ্টিতে তাহার জন্য উদ্বেগ আছে, কিন্তু সহানুভূতির চিহ্ন এত টুকুও নাই।

নীপেশ বাণাহতের মত আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না—না, অসুখ কিছু করে নাই আমার."—তারপরই পাগলের মত অস্থির পাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[৭]

সেদিন সকালবেলা কল্যাণী একটি অপ্রত্যাশিত দ্রব্য লাভ করিল। পিতার দেরাজ টানিটেই দেখিল, তাহার মধ্যে একখানি ছোট ফটো; ফটো খানি শচীন্দ্রনাথের,—'কল্যাণী'তে ছবি দিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

কল্যাণী দেরাজ টানিয়াই ছবিখানি দেখিল! বুকের মধ্যে একটা রক্তের ঝলক বড় জোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, পায়ের নীচ হইতে হর্ম্ম্যতল যেন সরিয়া যাইতেছিল।

কল্যাণী চকিতের মত একবার এদিকে ওদিকে চাহিল; ছবিখানি

দেখিতে হইবে! সে ত শচীন্দ্রের মুখের দিকে কোনও দিনই একটিবারের জন্যও ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই। আজ এই ছবি খানিকে সে একেবারে নিজস্ব করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছে; সে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

কল্যাণী কম্পিত হস্তে ছবি বাহির করিয়া লইল। সেই দিনই ভাল ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি পাঠাইয়া দিয়া কাপি তুলিয়া লইবে এবং মূল ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া যাইবে, এমনই একটি কল্পনাসে মুহূর্ত্তের চিন্তায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল!

নীলাম্বরীর অঞ্চলতলে ছবিখানি ঢাকিয়া লইয়া কল্যাণী কম্পিত পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে তাহার নিজের পাঠগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছোট একখানি টুলের উপর বসিয়া কল্যাণী অঞ্চলাবরণ হইতে ছবি বাহির করিল। সেই বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, প্রতিভায় দীপ্ত, শান্ত সরল মুখখানি! দৃষ্টিতে তাহার তেমনই প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছে; প্রশস্ত ললাটে গরিমালেখা তেমনই অভ্রান্তভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

কল্যাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল;—সে ছবি দেখিয়া আশা আর মিটে না। সে তাহার অন্তরের প্রেমরাশিকে যাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিয়াছিল, সেই নিষ্ঠুর দেবতা ত এক দিনের জন্যও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। তাহার নিবেদিত নৈবেদ্য অস্পৃষ্ট, অগৃহীত, অস্বীকৃত হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হায় দেবতা, হায় নিষ্ঠুর, কবে তুমি ভক্তের মৌন নিবেদনকে স্বীকার করিয়া তাহাকে সার্থকতা প্রদান করিবে? অসহায়া নারীর ব্যথিত মর্ম্মের অন্তরালে যে মন্ত্র নিশিদিন ধ্বনিত হইতেছে,—কবে সেই মন্ত্র প্রেমকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবে? কবে তাহার প্রসন্ন দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য পার্থিব স্বর্গের দুয়ারে নামিয়া আসিবেন?

আজ এই ব্যথিতা নারীর অন্তর দেশ মথিত করিয়া কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, হে দেবতা, তুমি ত জানিতেও পারিলে না? কল্যাণীর তৃষিত নারী প্রকৃতি আজি অবসর বুঝিয়া তাহাকে একেবারে চাপিয়া ধরিল।

অন্তর দেবতার সেই মোহন প্রতিকৃতিখানি একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আজ তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল।

কিন্তু কল্যাণী ত সে অধিকার পায় নাই! সেই একটিমাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য যতটুকু শক্তির আবশ্যক কল্যাণী তাহা তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করিল; তাহার ব্যথিত অন্তর আরও কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু নারীহৃদয় একটা সম্বল চাহে,—সুখের বা দুঃখের এমন একটা স্মৃতি নারী চাহে, যাহা লইয়া সে জীবনের সুদীর্ঘ পথটি অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারে।

যাহাকে বুকের কাছে পাইবার অধিকার পাওয়া যায় নাই, মাথা নীচু করিয়া তাহার চরণ স্পর্শ টুকুও পাওয়া যায় না কি?

কল্যাণীর অবসন্ন হাত দুইখানি টেবিলের উপর পড়িয়া গেল;—সে তখন প্রতিকৃতিখানির চরণের কাছে তাহার মাথা নীচু করিয়া আনিল। তখন তাহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—অন্তরের মধ্যে একটা অবসন্নতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

"হে দেবতা, তোমাকে বুকের কাছে পাইবার অধিকার ত পাই নাই;—তোমার চরণ স্পর্শ করিব, অপরাধ নিও না!"—কল্যাণীর অন্তর মধ্যে যে কথা নীরবে গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহার অস্ফুট গুঞ্জন আজ নিশ্বাসে, বেদনায়, অশ্রুতে জড়িত হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

কল্যাণী ধীরে ধীরে সেই ছবিখানির চরণে তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। মুখ তুলিতেই সম্মুখের দর্পণে দৃষ্টি পড়িল। সেই সুবৃহৎ দর্পণে এক জীবন্ত মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছে;—কল্যাণী চিনিল, সে ছায়া শচীন্দ্রনাথের।

শচীন্দ্রনাথ অশ্রুমুখী কল্যাণীকে দেখিল। স্রস্ত কুন্তলদাম শৈবালরাজির মত তাহার প্রস্ফুটিত পঙ্কজ তুল্য মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অশ্রুভারাবনত চক্ষু দুইটি ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে।

কল্যাণী দেখিল, তাহার অন্তর দেবতা তাহার প্রণতি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন এমন সময়ে এমন করিয়া কাছে আসিয়াছেন।

তাহার মনে হইল, অতীতের কোন্ যুগে তপঃকৃশা গৌরীর মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দেবাদিদেব শঙ্কর বুঝি এমনই করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ তপস্যাকে সার্থকতা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাহার দেবতা কি তাহাকে সার্থকতা দিবেন না? কল্যাণী তাহার বুকের মধ্যে বড় বেশী অস্থিরতা অনুভব করিতেছিল। সে ধরা দিতে চাহে নাই, তবু আজি সে ধরা পড়িয়াছে। সেই নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে সে যখন

তাহার অন্তরতম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতেছিল, তখনই সেই অন্তর প্রদেশের প্রভু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। আজ মুগ্ধহৃদয়া নারী তাহার দুর্ব্বলতার মাঝখানে ধরা পড়িয়াছে;—সে তাহার দীর্ণ হৃদয়কে আর কোনমতেই শান্ত স্থির রাখিতে পারিল না। সম্মুখের টেবিলের উপর আবার অবসন্নভাবে নত হইয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল। তাহার স্রস্ত কুন্তলরাশি তাহার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আজ তাহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে.—সে যে নারী, সে যে নিতান্ত অসহায়া, তাহা বিশ্ববিজয়ী প্রেম আজি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

কল্যাণীর পাঠাগারে শচীন্দ্রনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু সে ত এমন করিয়া এক মুগ্ধ নারী-হৃদয়ের গোপন তথ্যটি জানিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না! যে প্রেম তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া তাহা জানিবার কি অধিকার তাহার আছে?

তখন শচীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে বাসায় চলিয়া গেল।

বুকের মধ্যে এক বিশ্ববিদাহী জ্বালা লইয়া শচীন্দ্র যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বাহ্যিক সংজ্ঞা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। শয্যার উপর সে নিতান্ত অবলম্বন বিহীনের ন্যায় শুইয়া পড়িল; তাহার বুকের মাঝ খানটায় বড় ফাঁকা বোধ হইতেছিল! শচীন্দ্রনাথের মনে পড়িল, কবে পল্লীর উদ্যানে সে একদিন দেখিয়াছিল, এক পল্লবিনী লতিকা সহকারকে বেষ্টন করিতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না! তখনই সে স্নেহে, আদরে লতিকার উন্মুখ আগ্রহকে সার্থক করিয়া দিয়াছিল!

আর আজ এক কুসুমাধিকপেলবা নারী, তাহারই উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমগ্র প্রেমরাশি নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছে,—তবুও সে তাহা স্বীকার করিবার জন্যও আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না! কোথায় তাহার বাধা? কেমন করিয়া সে তাহা বুঝাইবে?

হায়, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত, কোথায় তুমি শচীন্দ্রনাথের মানসী প্রতিমা? মাসান্তে লিপির মধ্য দিয়া তোমাকে একটিবার কল্পনায় অনুভব করিয়া অভিশপ্ত শচীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বাঁচিবে?

ওগো মানসী, ওগো কল্পনাস্বর্গবাসিনী, তুমি আইস, তুমি আইস!

তোমার বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষপাতে শচীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া যাও!

[৮]

নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত রাখালবাবু নিশ্চিন্ত রহিলেন।

কল্যাণীর হৃদয়ে শচীন্দ্রনাথের জন্য অনুরাগ বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, রাখালবাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহারা পরস্পরের প্রতি আরও একটু বেশী আকৃষ্ট হইলেই তিনি শচীন্দ্রনাথের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন মনে মনে এই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু নারী হৃদয়ে প্রেম কখন প্রথম প্রবেশলাভ করিয়াছে, এবং কখন সেই প্রেম পূর্ণ পরিণত হইয়া উছলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, পুরুষ তাহা কোনও দিনই স্থির করিতে পারে নাই!

কল্যাণীর উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগ শচীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়া গেল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে একটিও তরঙ্গ উঠিয়াছে, এমন কোনও লক্ষণই কল্যাণী শচীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিতে পাইল না।

শচীন্দ্রনাথ যেদিন আপনার বিধ্বস্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল, কল্যাণী সেই দিনই শয্যা গ্রহণ করিল।

তাহার উচ্ছ্বসিত প্রেমকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া, অস্বীকার করিয়া শচীন্দ্রনাথ চলিয়া গেল,—এ ব্যথা অভিমানিনী কল্যাণী আর কোনও মতেই ভুলিতে পারিল না। তাহার বুকখানা লইয়াই যত জ্বালা, যত গোল! এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর সে স্বচ্ছন্দতা, আরাম অনুভব করে না!—সমগ্র বুকখানাই যেন খালি হইয়া গিয়াছে; সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাহার যে কিছুই নাই!—একটুকু স্মৃতিও নাই। সে আর কোন্ সান্ত্বনা নিয়া, কোন্ কল্পনা নিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

কল্যাণী ভাবিল, নিষ্ঠুর শচীন্দ্র যখন কোন পথই দেখাইয়া দিয়া যায় নাই তখন যে পথ খোলা আছে, সেই পথই সে গ্রহণ করিবে! তাহার বুকের মধ্যে যে দহন আরম্ভ হইয়াছে, মৃত্যুর তুষার শীতল স্পর্শই শুধু সেই দহনকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারে, শান্ত করিয়া দিতে পারে।

বুকের মধ্যে একটা বড় করুণ সুর গুমরিয়া উঠিতেছিল;—সে সুর ফিরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছিল "আমি মরিব—আমি

মরিব!"—কল্যাণী সে সুরকে অশ্রু দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া চর্চ্চিত করিয়া দিতেছিল!

কল্যাণী স্থির করিল, "মরিব"—শচীন্দ্রনাথের ছবিখানির দিকে চাহিয়া কল্যাণীর বড় সাধ হইতেছিল, একবার সেখানি বুকের কাছে চাপিয়া ধরে! বুকটা বড় খালি হইয়া গিয়াছে, সেই ছবিখানি চাপিয়া ধরিলে বুঝি শূন্যস্থান কতকটা পূর্ণ হইবে।

তাহার বক্ষ পঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল; কল্যাণী কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না নিষ্ঠুর, তোমার দেওয়া কোনও অধিকারই ত পাই নাই! সব সাধ আমার দীর্ণ বক্ষের মধ্যেই লুণ্ঠিত হউক্!—আমি মরিব!—আমার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াও কি আমাকে কোনও অধিকার দিবে না!"—

তখন কল্যাণী সেই কক্ষের মধ্যে পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল!

[৯]

শচীন্দ্র কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েকদিন পশ্চিমের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর বারাণসীধামে ছোট একটা বাসা ভাড়া লইয়া সেই-খানেই কিছুদিনের জন্য রহিয়া গেল।

বারাণসীতে বাসা করার মধ্যে একটা প্রলোভন ছিল। যে লিপি তাহার জীবনেতিহাসের একপৃষ্ঠা ব্যপিয়া রহিয়াছে, একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় না থাকিলে সেই লিপি তাহার নিকট নিয়মিত না আসিতেও পারে!

শচীন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, সে বারাণসীতে থাকিলে, তাহার ঠিকানা সেই নারীর কাছে অজ্ঞাত রহিবে না। বারাণসীতে আসিয়া শচীন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যবোধে রাখালবাবুর কাছে পত্র লিখিল। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বশতঃই সে যে হঠাৎ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং তাঁহার কাছে বলিয়া আসিতে পারে নাই, এজন্য রাখালবাবুর কাছে ত্রুটি স্বীকারও করিল।

বারাণসীতে আসিয়াও শচীন্দ্রের মন সুস্থির হইল না। তাহার অন্তরে ও বাহিরে যে এক প্রবল সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই ঘাত প্রতিঘাত তাহাকে একান্তভাবে অস্থির করিয়া তুলিল! তাহার অন্তরে এক নারীর

ছায়ামূর্ত্তি, কল্পনার লাস্যলীলায় সে তাহাকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে; আর অন্তরের বাহিরে লীলাময়ী কল্যাণীর বাস্তব প্রতিমা।

সে তাহার বাহুবল্লরী দিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! এক ব্যথিতা নারী এমন করিয়া তাহার প্রেমকে তাহার কাছে নিবেদন করিয়া দিয়াছে,—সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া দুনিয়ার কোন্ নিভৃতকোণে যাইয়া লুকাইবে?

না, সেই অশ্রুপ্লাবিত নয়নের ধ্রুবদৃষ্টিটুকু যে তাহাকে জীবনের পরপার পর্য্যন্তও অনুসরণ করিতে চাহিতেছে!

প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে দেখিতে শচীন্দ্রের মনে হইত,—হায়, যদি তাহার ব্যর্থ জীবনারতির মাঝখানে সে তাহার অস্তিত্বটুকুকে একেবারেই নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত! এই যে একটা বিরাট অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া সে তাহার দুর্ব্বহ জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোথায় ইহার সার্থকতা?—কোথায় ইহার শেষ?

আরতির শেষে সে যখন দেবতার সম্মুখে লুঠাইয়া পড়িত, তখন তাহার বেদনাকাতর মর্ম্ম হইতে শুধু এই প্রার্থনাই বাহির হইয়া আসিত, হে বিশ্বের ঠাকুর, হে দয়াল, এমন একটু কিছু দাও, যাহার স্মৃতি লইয়া জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি!

কয়দিন কাটিয়া গেল; এমাসের লিপিখানি শচীন্দ্রনাথ এখনও পায় নাই! যে সূক্ষ্ম তন্তুটুকুর সহিত সে তাহার জীবনটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, হায়রে, বুঝি তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়! মাসের শেষ দিনটাও আসিল, চলিয়া গেল! কিন্তু সেই ধূসরচ্ছাদাবৃত লিপিখানি আর আসিল না।

পরদিন যখন শচীন্দ্রনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই! দূরে বড় বড় পাথরের বাড়ীগুলার আশে পাশে তখনও একটু একটু অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। শচীন্দ্র তাহার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বহুদূর হইতে নহবতের করুণ রাগিনী ভাসিয়া আসিতেছিল। জাহ্নবী-স্নানার্থীরা যাইতেছে, আসিতেছে! ধীরে ধীরে কর্ম্মকোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের এই কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যে একটা ঐক্য, একটা শৃঙ্খলা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে! এই ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে, শুধু সেই যেন কেমন করিয়া অনাবশ্যকরূপে, অশোভন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে! সে যদি এই কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে

সঙ্গে না চলিতেই পারে, তবে কেন সে তটভূমে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

এমন সময়ে ঘরের কাছে আসিয়া দুয়ার ঠেলিয়া কেহ সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিল, "শচীন্"—

চমকিত শচীন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাখালবাবু!

"আপনি? কবে আসিলেন এখানে?"—বিস্মিত শচীন্দ্রনাথ দেখিল, রাখালবাবুর সদাহাস্য প্রফুল্ল মুখ একটি গাঢ় বিষাদছায়াপাতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে!

"আমি কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছি, কাল আর তোমার কাছে আসিতে পারি নাই, আজ ভোরেই আসিয়াছি, আমাদের বাসায় একবার যাইবে, শচীন্?—"শেষের কয়টী কথা বলিবার সময়ে, শচীন্দ্র দেখিল, রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিল;—চক্ষুতে অশ্রুর একটা ক্ষণিক উচ্ছাস দেখা গেল!

শচীন্দ্র আর সাহস করিয়া কল্যাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। যন্ত্রচালিতের মত বলিল, "চলুন, যাইব!"—

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিলেন। বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাখালবাবু কহিলেন,—

"শচীন্, কল্যাণী পীড়িতা, একবার দেখিবে কি?"—

শচীন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল! কল্যাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া তাহার অন্তরের মধ্যে কোন্ অশরীরী বাণী যেন তাহাকে কেবলই ডাকিয়া বলিতেছিল, "এই রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্যে যে নারী তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে,—সেই তোমার রাণী;—তোমারই মানসী,—তোমারই কল্যাণী!"—

শচীন্দ্রের কেবলই মনে হইতে লাগিল কল্পনা ও বাস্তব যেন আজই এক মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে! আজ যেন এমনই একটা মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িয়াছে, যে মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সে এতদিন কটাইয়াছে! আজ অন্তর ও বাহির তাহার কাছে একই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন চিন্তা কেন যে তাহার প্রাণের ভিতরে জাগিয়া উঠিতেছিল, সে তাহা কোনওমতেই স্থির করিতে পারিল না।

রাখালবাবুর কথার উত্তর না দিয়া সে দুয়ার ঠেলিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল; স্প্রীং এর কবাট আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শচীন্দ্র কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জানালার পাশে ছোট একখানি সোফার উপর কল্যাণী শুইয়া রহিয়াছে। সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশ দেখিতেছিল। শচীন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়া কল্যাণী ফিরিয়া চাহিল!

মুহূর্ত্তমাত্র!—একটা অস্পষ্ট কাতরতাব্যঞ্জক মৃদুধ্বনি কল্যাণীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শচীন্দ্র দেখিল রুক্ষ কুন্তলরাজি সেই পাণ্ডুর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! সেই ইন্দীবরদল তুল্য নয়ন দুইটির কোণে কে বিষাদ কালিমারেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে! সেই লীলা-তরঙ্গায়িত দেহলতা ক্ষীণ হইয়াছে! সেই চারু প্রতিমা তপঃকৃশা গৌরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে!

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল;—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ বড় কাঁপিতেছিল; দিনের আলো যেন নিভিয়া গিয়াছে, চক্ষের সম্মুখে এমনই একটি কালো ছায়া নাচিয়া উঠিল!

কল্যাণী একহাতে বক্ষোবসন চাপিয়া রাখিয়া আর এক হাতে খাটের একটা বাজু ধরিল;—তবু স্থির হইতে না পারিয়া দুইহাতে বাজুটা চাপিয়া ধরিল। তখন কল্যাণীর বক্ষোবসনের মধ্যে কি লুকানো ছিল, তাহা সরিয়া খাটের পাশে কক্ষতলে পড়িয়া গেল।

কি সে?—

শচীন্দ্র দেখিল, একখানি ধূসরবর্ণের খাম;—উপরে সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষরে তাহারই নাম রহিয়াছে!

একটা তড়িৎপ্রবাহ বিপুলবেগে শচীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিল!—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল;—তাহার হৃদ্‌পিণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া এক যাতনাপূর্ণ চীৎকারধ্বনি বাহির হইয়া আসিল।

"কল্যাণী,—কল্যাণী—তুমি! রাক্ষসী, তুমি এখানে, আর দুইবৎসর পর্য্যন্ত কল্পনায় তোমার মূর্ত্তি গঠন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছি!"—

কল্যাণীর মূর্চ্ছার ভাবটা কাটিয়া আসিতেছিল,—সে চাহিয়া দেখিল, তাহার চিঠি শচীন্দ্রনাথের হস্তে রহিয়াছে।

কল্যাণী আবার চক্ষু বুজিল; তাহার চক্ষের গুরুস্পন্দন তাহাকে বড় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল!

পুনরায় তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার মূর্চ্ছাতুর দেহলতা সেই শুভ্র শয্যার উপর লুঠাইয়া পড়িল !

[১০]

কল্যাণীর পীড়া বাড়িয়া চলিয়াছে !

মিলনের প্রথম কলোচ্ছ্বাসের মধ্যেই যে এমন করিয়া অন্তহীন বিরহ সূচিত হইবে, শচীন্দ্রনাথ তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও মনে করে নাই ! কোন্ একদিন নৈরাশ্যের তীব্রতম দহনের মধ্যে সে দেবতার কাছে এতটুকু স্মৃতির চিহ্ন চাহিয়াছিল, যে স্মৃতিচিহ্ন লইয়া সে জীবনকে অবসান করিয়া দিতে পারিবে মনে করিয়াছিল, আজি দেবতা তাহার প্রার্থনা ঠিক্ পরিমাণ করিয়া তত টুকুই পূরণ করিতে যাইতেছেন !

কিন্তু এমন করিয়া মৃত্যুপথযাত্রিণী কল্যাণীর মধ্যেই যে তাহার অমূর্ত্ত কামনারাশিকে মুহূর্ত্তের পরিচয়ান্তেই একেবারে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে, এত শচীন্দ্র স্বপ্নেও কখন মনে করিতে পারে নাই।

তাহার জীবনের মধ্যে এই যে শুভমিলন মুহূর্ত্ত দেবতা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এই মুহূর্ত্তটিকে সে কোনও ক্রমেই অসার্থক হইতে দিতে পারে না। এই মুহূর্ত্তটির মধ্য হইতেই সে এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া লইবে, যাহার স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া সে অবশিষ্ট জীবনভাগ কাটাইয়া দিতে পারে !

সুতরাং শচীন্দ্র, সেই দিন সন্ধ্যার পর রাখালবাবু যখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন, তখনই কল্যাণীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইল, এবং উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিল, "কল্যাণী !"—

কল্যাণী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শচীন্দ্র উত্তর চাহিয়াছিল,—কল্যাণীর দৃষ্টির মধ্যেই সে তাহার উত্তর পাইল। সে দৃষ্টিতে অনন্ত ভাষা, অনন্ত অতৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে !

শচীন্দ্র আবার মৃদুতর কণ্ঠে ডাকিল, "কল্যাণী"—

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথা বলিবার শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল ! এইবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

—"ওখানে,—এখানে নয় !"—

একবিন্দু অশ্রু তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিল।

"কেন কল্যাণী, এখানেই !—এমন একটা কিছু দাও আমাকে, যাহার স্মৃতি নিয়া জীবন কাটাইতে পারি !"—শচীন্দ্র তাহার মুখ নত করিয়া কল্যাণীর মুখের কাছে লইয়া গেল ! কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল,—

—"না, এমন করিয়া তোমার জীবনকে মরুময় করিতে পারি না"—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড়জোরে কল্যাণীর দীর্ণবক্ষ নিষ্পেষিত করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল ; কল্যাণী তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই নিঃশ্বাসটাকে ফিরাইয়া দিল !

শচীন্দ্র একটু ভাবিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য পাইবার অধিকার চাহিতে আসিয়াছি ; কল্যাণী, অনুমতি কর তুমি !"—এবার কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার অশ্রু কপোলদ্বয় প্লাবিত করিয়া উপাধান সিক্ত করিল !

কল্যাণী যে তাহার জীবনকে একান্তভাবেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, একথা রাখালবাবু ও শচীন্দ্র জানিয়াছিলেন। শচীন্দ্র যখন রাখালবাবুর কাছে বিবাহ প্রস্তাব করিল, তখন তিনি স্তম্ভিত হইলেন। সে তাঁহাকে সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছিল, যে জীবনে আর কোনও নারীই তাহার গ্রহণযোগ্যা হইতে পারে না, সুতরাং যে চলিয়া যাইবে, তাহার কাছ হইতেই যতটুকু স্মৃতি রাখা যায় তাই তাহার পক্ষে পরমলাভ হইবে ! যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সে কৃতার্থ হইবে।

এই প্রাণপণ আগ্রহকে রোধ করা রাখালবাবু সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিল না। রাখালবাবুর অভিমত পাইয়াই শচীন্দ্র কল্যাণীর কাছে আসিয়াছিল। কল্যাণীর অশ্রুপ্লাবিত দৃষ্টির মধ্য হইতে সে তাহার অনুমতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

[১১]

সম্প্রদানান্তে রাখালবাবু কল্যাণীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অসিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বেদনার তপ্ত অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল !

তখন ধীরে ধীরে শচীন্দ্রনাথ কল্যাণীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সে তাহাকে এইবার স্পর্শ করিবার অধিকার পাইয়াছে।

উদ্বেলিত কণ্ঠে শচীন্দ্রনাথ ডাকিল,—"কল্যাণী—প্রিয়া আমার !"—

কি সে আহ্বান ! সেই প্রেমাবেগ কম্পিত কণ্ঠের প্রিয় আহ্বানটি

কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া দিল। বুকের মধ্যে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে একটি অননুভূতপূর্ব্ব স্পন্দনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল! সে এই কম্পনকে, আবেগকে আর কোনও মতেই রোধ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত অনুভূতি যেন ধীরে ধীরে তাহার বুকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল।

শচীন্দ্র একটু নীচু হইয়া কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুকণ্ঠে আবার ডাকিল,—"কল্যাণী—প্রিয়তমা আমার!"—

এ কি কণ্ঠস্বর! এ কণ্ঠস্বর শুনিলে যে নয়নপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে! জীবন স্পৃহনীয় হয়। আসন্ন মৃত্যুও বুঝি কিছুকালের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়!

জীবনকে যে একান্তভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাণের কাছে, হায় শচীন্দ্রনাথ, তুমি এমন করিয়া প্রেমাবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কেন ডাকিলে?

তখন কল্যাণী তাহার শীর্ণ দক্ষিণ বাহুদ্বারা শচীন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করিল;—

কিন্তু চোখের কাছে ও কিসের আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে?

শচীন্দ্র তাহার মুখ আরও নত করিয়া আনিল,—কল্যাণীর সূক্ষ্ম পাণ্ডুর অধরে স্বীয় তপ্ত স্ফুরিতাধর স্থাপন করিল।

কল্যাণী একটু শিহরিয়া উঠিল; সর্ব্বাঙ্গ একবার কাঁপিল,—তারপর বক্ষের স্পন্দন হঠাৎ দ্রুত হইয়া থামিয়া গেল। কণ্ঠার্পিত শিথিল বাহু ধীরে ধীরে শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

চকিত শচীন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণীর পাণ্ডুর ওষ্ঠপুট আরও পাণ্ডুর হইয়াছে;—আর সেই প্রাপ্ত প্রথমচুম্বনের গৌরবের মধ্যেই কল্যাণী তাহার মুকুলিত যৌবনের সমগ্র সাধ ও আশা তাহার প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়াছে! তাহার মুখশ্রী কৃতার্থতার গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! *

* বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন প্রণীত এলিস্ ম্যাল্‌ট্রেভাস্ নামক উপন্যাসের ঘটনা বিশেষের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

চোখগেল।

কে তুই ডাকিলি পাখি, বহুদূরে থাকি ?
"চোখগেল" কথা বলে,
প্রাণের দুয়ার খুলে,
কাননের মাঝে তুই কে ডাকিলি পাখি ?
সত্য কি গিয়েছে তোর ক্ষুদ্র দুটি আঁখি ?

এ পাপ সংসার মাঝে কুটিলতা কত,
সদা সার্থ অহঙ্কার,
হেতু লোকে বার বার,
ইচ্ছিতেছে, সাধিতেছে, পাপকার্য্য যত ;
তাই কিরে পাখি, তোর প্রাণে ব্যথা অত ?

স্বাধীনতা সুখে থাকি, ভ্রমি নীলাকাশে,
বনজ সুমিষ্ট ফল,
খাস্ সুনির্ম্মল জল,
পাপের কোনও ছায়া নাই তোর পাশে ;
তাই কি গাহিস্ নরে শিখাবার আশে ?

জীবের সকল দশা সর্ব্বক্ষণ দেখে,
সরল পরাণ তোর
সমবেদনায় ভোর
উড়ে যাস্ বায়ুভরে প্রতিধ্বনি রেখে,
থেকে থেকে "চোখগেল" বলে পাখি ডেকে।

বড় ভাল বাসি আমি "চোখগেল" তোরে।
তোর এ বেদনা দেখে,
মানব কেননা শেখে,—
হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার কেন নাহি ছাড়ে।
বড় ভাল বাসি আমি "চোখগেল" তোরে।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

শার্লক হোম।

বড় ঘরের কথা।

(শেষার্দ্ধ)

লর্ড সেণ্টসাইমন চলিয়া গেলে হোম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখ, লর্ড সেণ্টসাইমন যে তাঁর ও আমার মাথা একশ্রেণীর বলিয়া ধরিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভাল মানুষীই বলিতে হইবে।—এখন একটু সোডা ও হুইস্কি খাইয়া একটা চুরুট টানি। আর দেখ, লর্ড সেণ্টসাইমন এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি এই ব্যাপারের মীমাংসা করিয়াছি।"

আমি বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

হোম আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ঠিক এরকমটি না হইলেও আমি প্রায় এই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা জানি। আমি লর্ড সাইমনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে আমার ধারণা ঠিকই।"

"কিন্তু তুমি যাহা শুনিয়াছ, আমিও ঠিক তাহাই ত শুনিয়াছি!"

"কিন্তু তুমি এই রকম ঘটনার কথা আর শোন নাই—তাই কিছু বুঝিতে পারিতেছ না। আমি শুনিয়াছি, তাই বুঝিতে পারিতেছি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এবারডীনে (Aberdeen) ঠিক এই রকম একটা ঘটনা হইয়াছিল এবং ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান্ যুদ্ধের পর মিউনিকেও প্রায় এই রকম একটা ব্যাপার হইয়াছিল। ইহাও সেই ——"হোম আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় লেষ্ট্রাড্ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। হোম তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে একটি চুরুট দিলেন। লেষ্ট্রাড্ চুরুটটি ধরাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। লেষ্ট্রাডের পরিধানে নাবিকের পোষাক এবং হাতে কাল ক্যান্‌ভ্যাসের একটা ব্যাগ ছিল।

হোম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে অমন খারাপ দেখাইতেছে কেন? কি হইয়াছে?"

"আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। লর্ড সেণ্টসাইমনের এই বিবাহ ব্যাপারটার কোন আগা মাথা আমি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

"বটে! আপনি যে আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন!"

"এমন গোলমেলে ঘটনার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে? আমার সমস্ত প্রমাণই ফাঁসিয়া যাইতেছে। আজ সমস্তটা দিন পরিশ্রম করিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।"

এই কথার পরে হোম তাঁহার জামায় হাত দিয়া বলিলেন, "আপনার জামা যে একেবারে ভিজা!"

"হাঁ! আমি এইমাত্র সারপেনটাইন পুকুরে অনুসন্ধান করিতেছিলাম।"

"সারপেন্‌টাইন পুকুরে কেন?"

"লেডী সেণ্টসাইমনের মৃতদেহের খোঁজে।"

লেস্‌ট্রেডের এই কথা শুনিয়া হোম হাসিয়া উঠিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার জল যেখানে পড়ে,—সেটা খুজিয়াছেন কি?"

"কেন, আপনি কি ভাবিতেছেন?"

"কারণ সারপেন্‌টাইনে লেডী সেণ্টসাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে সেখানেও হইতে পারে।"

লেস্‌ট্রেড হোমের দিকে একটু রাগান্বিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় সব ঘটনা জানেন না।"

"আমি এইমাত্র ব্যাপারটা শুনিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাহা আমি ইতিমধ্যেই স্থির করিয়াছি।"

"বেশ, ভালকথা! তবে আপনার মতে সারপেন্‌টাইনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই"

"আমার ত মনে হয় না।"

"তবে এটা সেখানে কেন পাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি?" এই বলিতে বলিতে লেসট্রেড তাঁহার সেই ব্যাগটি খুলিয়া একটি রেশমী বিবাহ পোষাক, একজোড়া জুতা, বৈবাহিক মালা ও অবগুণ্ঠন মেঝের উপর রাখিলেন। এ সবগুলিই খুব ভিজা ছিল। এইগুলির উপর একটি বিবাহের আংটি রাখিয়া হোমের দিকে চাহিয়া লেষ্ট্রেড একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন।

হোম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তবে এগুলি সারপেন্‌টাইন হইতেই তুলিয়াছেন?"

"না, একজন মালী এগুলিকে পারের কাছে ভাসিতে দেখিয়া তুলিয়াছে এবং এইগুলি লেডী সেন্টসাইমনের জিনিষ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। আমার মনে হয় যখন পোষাকগুলি ওখানে পাওয়া গিয়াছে, তখন মৃতদেহটাও উহার কাছাকাছি আছে।"

"বেশ। তবে কি এই যুক্তিদ্বারা আপনি দেখাইতে চান যে, কাহারও কাপড় চোপড় যেখানে থাকে, তার দেহটাও সেখানে থাকিবে? যাক্, ইহাদ্বারা কি মীমাংসা করিতেছেন?"

"ইহাদ্বারা এই প্রমাণ করিতে চাই যে, এই পলায়ন ব্যাপারে ফ্লোরা মিলান সংসৃষ্ট আছে।"

"সেটা বড় সহজ হইবে না।"

লেস্‌ট্রেড্ একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তবুও আপনি এ কথা বলিবেন! দেখুন, আপনার মন্তব্য ও মীমাংসাগুলি আমার তত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় না। আপনি ইতিমধ্যেই দুইটি ভুল করিয়াছেন। এই পোষাকই প্রামাণ করিতেছে যে এই ব্যাপারে মিস্ ফ্লোরা মিলারের ষড়যন্ত্র আছে।"

"কিসে?"

"এই পোষাকের পকেটে একটা কার্ডকেসে একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেই পত্রখানা এই দেখুন।" এই বলিয়া তিনি টেবিলের উপরে একখানা পত্র রাখিলেন। তারপর বলিলেন, "আমি পত্রখানা পড়িতেছি। আপনি শুনুন,—

'যখন সমস্ত ঠিক পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা করিবে। ইতি F. H. M., অতএব দেখিতে পাইতেছেন যে আমার গোড়াতেই যে ধারণা হইয়াছিল, যে লেডী সেন্টটসাইমনের এই পলায়ন ব্যাপারে মিস্ ফ্লোরা মিলানের হাত আছে, তা ঠিক। আর এই দেখুন, চিঠির নীচে তার স্বাক্ষরও রহিয়াছে। এবং আমার মনে হইতেছে যে, যখন বর ও ক'নে ঘরে প্রবেশ করেন, তখন সে গোপনে এই চিঠি খানা ক'নের হাতে দিয়া দিয়াছে।"

লেস্‌ট্রেডের কথায় হোম হাসিয়া তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া অন্যমনস্কভাবে সেখানি দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁর দৃষ্টি পত্রখানিতে আকৃষ্ট হইল। তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক এখানা বড়ই দরকারী!"

লেস্‌ট্রেড্‌ বলিলেন, "আ! আপনিও তবে তাই মনে করিতেছেন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি আপনাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিতেছি।"

এই কথার পরে লেস্‌ট্রেড্‌ বিজয়ী বীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই চিঠিখানা দেখিবার জন্য একটু ঝুঁকিলেন। কিন্তু তখনই কিছু বিস্মিতভাবে চীৎকারে বলিয়া উঠিলেনে, "একি, আপনি উল্টা দিকে কি দেখিতেছেন?"

হোম উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, এইটাই ঠিক দিক।"

"ঠিক দিক! বলেন কি? আপনি পাগল হইয়াছেন? এই দেখুন এই দিকে পেন্‌সিল দিয়া চিঠিখানা লেখা রহিয়াছে।"

"আর এই দিকে দেখুন একটা হোটেলের বিলের কতক অংশ। এইটাই আমার বিশেষ দরকারী বলিয়া মনে হইতেছে।"

"ওঃ! এটা আর কি এমন? এটা আমিও পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এইত লেখা আছে—৪ঠা অক্টোবর—ঘর ভাড়া ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শিঃ ৬ পেন্স, বৈকালিক খাবার—২ শিঃ ৬ পে, এক গ্লাস সেরি—৮ পেঃ। ইহার মধ্যে যে কি আছে, তা ত আমি বুঝিতে পারি না।"

"আপনি পাইবেনও না। কিন্তু এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আর চিঠি খানাও—অন্ততঃ পক্ষে ঐ নামটাও খুব প্রয়োজনীয়। মহাশয়, আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

এই কথায় লেস্‌ট্রেড্‌ একটু সন্তুষ্ট হইলেন, এবং উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আমি অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি। আগুণের ধারে বসিয়া নানা কল্পনা করা অপেক্ষা বাহিরে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিলেই কাজ বেশী হইবে। দেখা যাক্‌, আমাদের মধ্যে কে প্রথমে এই ব্যাপারের একটা কিনারা করিতে পারে।"

এই বলিয়া তিনি পোষাকগুলি গুছাইয়া আবার সেই ব্যাগে ভরিয়া বাহির হইবার জন্য দরজার দিকে গেলেন। এমন সময় হোম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে এই বিষয়টার একটু আভাস দিয়া দিই। 'লেডী সেন্টসাইমন একটা বাজে কথা মাত্র। এ নামে কেহ নাই এবং কখনও কেহ ছিলও না।"

হোমের এই কথায় লেস্‌ট্রেড্‌ তাঁহার দিকে ক্ষুণ্ণভাবে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া নিজের কপালে তিন বার করাঘাত করিয়া মথাটা একটু নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। তিনি যেমন বহির হইয়াছেন, অমনি হোম উঠিয়া তাঁর ওভারকোটটি গায়ে

দিলেন এবং বলিলেন, "দেখ লোকটা যে বলিয়াছে, 'বাহিরে ঘুরিয়া এ সম্বন্ধে অনেক করিবার আছে,' একথা ঠিক। অতএব আমিও কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে একা ফেলিয়া চলিলাম।"

পাঁচটার পর হোম বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু আমকে বেশীক্ষণ একা থাকিতে হয় নাই। প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যেই এক খাবারওয়ালা মস্ত একটা বাক্স লইয়া আমার কাছে আসিল। আসিয়া অন্য একটি লোকের সাহায্যে সেই বাক্সটি খুলিয়া আমাদের টেবিলের উপর এক বিরাট ভোজের নানা রকম দ্রব্যাদি রাখিতে লাগিল। জিনিষগুলি রাখিয়া তারা আরব্যোপন্যাসের ভূতের মত কোথায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মাত্র বলিয়া গেল যে ইহার দাম দেওয়া হইয়াছে, এবং এই ঠিকানায় এইগুলি পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় ৯ টার সময় শার্লক হোম তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখের ভাব গম্ভীর, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া মনে হইল যে তাঁহার কার্য্যে তিনি ব্যর্থমনোরথ হন নাই।

তিনি ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "তবে তাঁহারা খাবার পৌঁছাইয়া দিয়াছে?"

"পাঁচ জনের খাবার আসিয়াছে। কেহ কি আজ এখানে খাইবেন?"

"হাঁ—বোধ হয় কেহ খাইবেন। লর্ড সেণ্টসাইমন এখনও আসেন নাই দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি—ও! এই যে তাঁর পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে।"

বাস্তবিক হোমের কথা শেষ হইতে না হইতেই লর্ড সেণ্টসাইমন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে একটু অশান্ত দেখাইতেছিল। লর্ড সেণ্ট সাইমনকে দেখিয়া হোম বলিলেন, "আমার লোক তবে আপনার কাছে গিয়াছিল?"

"হাঁ। আপনার চিঠিখানা পড়িয়া আমি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছি। আচ্ছা, আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কি বেশ প্রমাণ আছে?"

"বেশ ভাল প্রমাণই আছে।"

লর্ড সেণ্টসাইমন একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কপালে হাত দিলেন। তারপর হতাশ ভাবে বলিলেন, "হায়! তাঁর পরিবারের লোকের এই অপমানের কথা শুনিয়া ডিউক কি বলিবেন, জানিনা!"

"মহাশয়, ইহাতে বলিবার কিছু নাই। এটা একটা দৈবঘটনা মাত্র। আর ইহাতে অপমানেরও কিছু নাই।"

"ও! আপনি এটাকে অন্যভাবে দেখিতেছেন।"

"ইহাতে যে কাহারও দোষ আছে, এমন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আর ঐ স্ত্রীলোকটি এ অবস্থায় আর কি করিতে পারিতেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। তবে হঠাৎ এরকম করাটা তাঁর ভাল হয় নাই। কিন্তু তিনি মাতৃহীনা, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সে উপদেশ দিবারও আর কেহ নাই।"

লর্ড সেণ্টসাইমন টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এটা একটা অপমান! মস্ত বড় অপমান!"

"মহাশয়, বালিকার পূর্ব্বাপর অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি সুবিচার করা আপনার কর্ত্তব্য।"

"আমি তার প্রতি কোন সুবিচার করিতে পারি না। আমার প্রতি তার এই নিলর্জ্জ ব্যবহারের জন্য আমি তার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি।"

এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হোম বলিলেন, "কেহ নিশ্চয়ই ঘণ্টা টানিতেছে। তাই ত! সিঁড়িতে পায়ের শব্দও হইতেছে।" তারপর লর্ড সেণ্টসাইমনের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে ওই বালিকার প্রতি সদয় বিচার করাইতে সক্ষম না হইলেও যিনি আসিতেছেন তিনি নিশ্চয়ই হইবেন।" এই বলিয়া তিনি দরজাটা খুলিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন হোম লর্ড সেণ্টসাইমনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি মিঃ ফ্রন্সিস্ হে মোণ্টন্ ও তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করাইয়া দিতে পারি কি? আশা করি এই স্ত্রীলোকটিকে আপনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।" তাঁহাদিগকে দেখিয়াই লর্ড সেণ্টসাইমন তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহার মর্য্যাদায় বড় একটা আঘাত লাগিয়াছে। স্ত্রীলোকটি দ্রুত তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তবুও তিনি সে দিকে তাকাইলেন না।

তখন স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "রবার্ট! তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত হইয়াছ? হাঁ, তোমার রাগ করিবার কারণ যথেষ্ট আছে বটে।"

লর্ড সেণ্টসাইমন একটু বিরক্তির ভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয়া, অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে আর কিছু বলিবেন না।"

"হাঁ! আমি তোমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করিয়াছি, সন্দেহ নাই। যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে সব কথা বলিয়া যাওয়া আমার উচিত ছিল। আমি বড় অবোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। ফ্রাঙ্ককে দেখিয়া অবধি আমি কি যে বলিয়াছি, কি যে করিয়াছি, আমিই তা' জানি না। আমি যে বিবাহের সময় কেন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ি নাই, সেইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

এই সময় হোম সেই স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিসেস্ মোলটন্, আপনি যখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছেন, তখন আমি এবং আমার বন্ধুটি বোধ হয় এখান হইতে অন্যত্র যাইতে পারি।"

হোমের কথা শুনিয়া সেই নবাগত ভদ্রলোকটি বলিলেন, "দেখুন, আমাদের সম্বন্ধটা এতদিন গোপন ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় ইউরোপ ও আমেরিকার সকলেই সত্য ঘটনাটা জানিলে ভাল হয়।"

"তবে এখানেই আমি সব কথা খুলিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "১৮৮১ সালে আমেরিকার কোনও স্থানে প্রথম আমার সঙ্গে ফ্রাঙ্কের দেখা হয়। সেখানে আমার পিতা একটা কাজে গিয়াছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গেই ছিলাম। সেখানেই আমরা আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করি। কিন্তু হঠাৎ আমার পিতা একদিন একটা খনি আবিষ্কার করিয়া বড়লোক হইয়া গেলেন. কন্তু ফ্রাঙ্কের কাজের বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। সে যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই রহিল। আমার পিতা ক্রমেই বড়লোক হইতে লাগিলেন, আর অন্যদিকে ফ্রাঙ্ক ক্রমেই দরিদ্র হইতে লাগিল। অবশেষে আমার পিতা আমাদের সম্বন্ধের কথা আর কিছু শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমাকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে লইয়া আসিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক আমাকে অত সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সেও আমাদের সঙ্গে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে আসিল এবং আমার পিতার অগোচরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। পিতা একথা জানিলে নিশ্চয় পাগল হইয়া যাইবেন, এই ভয়ে এ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁকে জানিতে দিলাম না। এই ভাবে আমাদের দিন যাইতেছিল, এমন সময় একদিন ফ্রাঙ্ক বলিলেন, যে তিনি অন্য কোথাও যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন এবং পিতার মত বড় মানুষ না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরিয়াও আসিবেন না, এবং আমাকে বিবাহও করিবেন না।

আমিও, তিনি যতদিনে ফিরিয়া না আসিবেন, ততদিন অপেক্ষা করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতে অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না স্থির করিলাম। এই কথায় ফ্রাঙ্ক বলিলেন, 'তবে এখনই আমাদের বিবাহ হউক না কেন। কারণ তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারি। তবে যতদিন আমি ফিরিয়া না আসিব, ততদিন তোমার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিব না।' এই পরামর্শ ই স্থির করিয়া, আমরা একটি যাজকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া বিবাহিত হইলাম। বিবাহের পর ফ্রাঙ্ক অর্থোপার্জ্জনের জন্য চলিয়া গেলেন, আমি পিতার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

"তারপর ফ্রাঙ্কের সম্বন্ধে এইমাত্র খবর পাইলাম যে তিনি মোনটানায় আছেন এবং সেখান হইতে আবার এরিজোনাতে গিয়াছেন। তারপর খবর পাইলাম যে তিনি নিউ মেক্সিকোতে গিয়াছেন।

"তারপর একটা খবরের কাগজে পড়িলাম যে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ একজন খনিব্যবসায়ীর বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে। সেই আক্রমণের ফলে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে বহুলোক মারা গিয়াছে। যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের নামের মধ্যে দেখিলাম আমার ফ্রাঙ্কেরও নাম রহিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। এবং বহুদিন পর্য্যন্ত বড় অসুস্থ ছিলাম। পিতা আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আশঙ্কা করিয়া আমাকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর প্রায় সমস্ত বড় বড় ডাক্তার দেখাইলেন। ইহার পর ১বৎসর, কি তারও বেশী দিন পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কের কোন খবর পাইলাম না। তখন বুঝিলাম ফ্রাঙ্ক বাস্তবিকই মারা গিয়াছেন। এই সময় লর্ড সেণ্টসাইমন, 'ফ্রিস্‌কোতে আসিলেন। কিছুকাল পরে আমরা লণ্ডনে আসিলাম। এবং আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হইল। এই সম্বন্ধে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝিলাম যে ফ্রাঙ্ককে যে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, সে স্থান এই পৃথিবীর আর কোন লোক অধিকার করিতে পারিবে না। তবে আমি যদি লর্ড সেণ্টসাইমনকে বিবাহ করি, তবে তাঁহার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্যের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইবে না। কোন লোককে জোর করিয়া ভালবাসা যায় না ; কিন্তু মনে বল থাকিলে, যে কোন কাজ করা যায়। লর্ড সেণ্টসাইমনের প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কোন দিন কোন ত্রুটি হইবে না, ইহা ভাবিয়াই আমি তাঁর সঙ্গে সেই দিন গির্জ্জায় গিয়াছিলাম। কিন্তু বেদীর নিকটে আসিবার সময় আমি একবার পিছনের

দিকে তাকাইলাম, এবং দেখিলাম ফ্রাঙ্ক একখানা আসনের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তখন আমার মনের ভাব যে কি হইল, তা' আপনি বোধহয় বেশ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল, এ বুঝি ফ্রাঙ্কের প্রেতাত্মা! আবার ফিরিয়া দেখিলাম—না ফ্রাঙ্কই জীবন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি, না অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যে তখনই কেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাই নাই, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

"তখন আমার মনে হইতেছিল আমার চারিদিগের জিনিষগুলি যেন ঘুরিতেছে। পুরোহিতের কোন কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতে-ছিলাম না। কি করিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এক একবার মনে হইতেছিল, বিবাহ বন্ধ করিয়া দিই। কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া আবার ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাইলাম। তিনি যেন আমার মনের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাই আমাকে ইসারায় চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। তারপর দেখিলাম, তিনি একখণ্ড কাগজের উপর কি লিখিতেছেন। বুঝিলাম, আমাকেই চিঠি লিখিতেছেন। তারপর যখন আমি বাহির হইয়া আসি, তখন আমি আমার তোড়াটি ফেলিয়া দিই, ফ্রাঙ্ক তোড়াটি উঠাইয়া দিবার সময় আমার হাতে চিঠিখানা দিয়া দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল যে যখন তিনি আমাকে সঙ্কেত করিবেন, তখন যেন আমি তাঁর কাছে যাই; তাঁর প্রতিই যে আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা আমি বুঝিয়াই তার কথামত চলিবার জন্য মনে মনে স্থির করিলাম।

"বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আমি আমার চাকরাণীর কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া তাহাকে আমার কিছু জিনিষ পত্র বাঁধিয়া ও অলেষ্টারটা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলাম, এবং এবিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিতে অনুরোধ করিলাম। আমার চাকরাণী কালিফর্ণিয়া থাকিতেই ফ্রাঙ্ককে চিনিত ও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত।"

"লর্ড সেণ্টসাইমনকে আমার সব কথা বলা উচিত ছিল, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তাঁর মা ও এবং অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহা বলা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে ভাবিয়া, আমি পলাইয়া যাইয়া পরে সমস্ত বলিব এই স্থির করিলাম। খাইতে বসিবার ১০ মিনিট আগে আমি জানালা

দিয়া দেখিলাম, যে ফ্রাঙ্ক রাস্তার ওপারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্কেত করিয়া পার্কের দিকে চলিয়া গেলেন। আমি তখনই সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার জিনিষপত্র লইয়া তার পিছনে পিছনে চলিয়া গেলাম। সেই সময় একজন স্ত্রীলোক লর্ড সেণ্টসাইমনের বিষয় কি বলিতে বলিতে আমার কাছে আসিল। তার কথার ভাবে মনে হইল যে বিবাহের পূর্ব্বে তাঁর কোন গুপ্ত রহস্য ছিল। যাহাহউক, আমি তাহাকে শীঘ্র ছাড়াইয়া ফ্রাঙ্কের কাছে গেলাম। তখন আমরা একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া,গর্ডনস্কোয়ারে ফ্রাঙ্ক যে একটা বাড়ী নিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে গেলাম। বহুদিন অপেক্ষার পর সেই আমার প্রকৃত বিবাহ হইল। ফ্রাঙ্ক সেই দস্যুহাতে বন্দী হইয়াছিলেন। কোন রকমে পলাইয়া সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে আসেন। সেখানে আসিয়া শোনেন যে আমি তাঁকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছি এবং ইংলণ্ডে গিয়াছি। তিনি আমার খোঁজে ইংলণ্ডে আসেন এবং লর্ড সেণ্টসাইমনের সঙ্গে আমার বিবাহের দিন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।”

এই সময় ফ্রাঙ্ক বলিলেন, যে তিনি একটা খবরের কাগজে এই বিবাহের খবর জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মিস্ হ্যাটী ডোরান যে কোথায় থাকিতেন তাহা জানিতে পারেন নাই।

মহিলা আবার বলিতে লাগিলেন, “তারপর আমাদের কি করা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিলাম। ফ্রাঙ্ক সরলভাবে সব কথা জানাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আমি আমার এই কাজের জন্য এত লজ্জিত হইয়াছিলাম, যে আমার মনে হইল আমি আর উঁহাদের সঙ্গে দেখা করিব না। তবে বাবার কাছে একখানা চিঠি লিখিব যে তাঁরা যেন জানিতে পারেন, আমি জীবিত আছি। বাস্তবিক সেই বড় বড় লর্ড ও লর্ড পত্নীগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা ভাবিতেও আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম। তাই পাছে কেহ আমার খোঁজ পায়, এই ভয়ে ফ্রাঙ্ক আমার বিবাহের পোষাকগুলি একসঙ্গে জড়াইয়া কেহ দেখিতে না পায় এমন যায়গায় ফেলাইয়া দিলেন। যদি শার্লকহোম আজ বৈকালে আমাদের কাছে না যাইতেন, তবে আমরা আগামী কল্য পেরিসে চলিয়া যাইতাম। কিন্তু তিনি যে কি করিয়া আমাদের খোঁজ পাইলেন, তাহা আমি কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক তিনি

অনুগ্রহ করিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে ফ্রাঙ্ক যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক,—আমিই ভুল করিতেছি। আমরা যদি এখনও এ ব্যাপারটা গোপন রাখি, তবে তাহা আরও অন্যায় হইবে। তারপর তিনি বলিলেন যে লর্ড সেণ্টসাইমনের সঙ্গে যাহাতে আমরা দেখা করিয়া সব বলিতে পারি, তাহার একটা সুবিধা তিনি করিয়া দিবেন। তাই আমরা তাঁর বাড়ীতে আসিয়াছি।—রবার্ট! আমি সমস্ত ঘটনা তোমাকে খুলিয়া বলিলাম, এবং আমার ব্যবহারে তুমি যদি দুঃখ পাইয়া থাক, তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আশা করি, তুমি আমাকে হীন বলিয়া মনে করিবে না।"

লর্ড সেণ্টসাইমনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন,—আমার গোপনীয় কথা এমনভাবে সকলের সম্মুখে বলা আমাদের উচ্চবংশের নিয়মবিরুদ্ধ।"

"তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে না? আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিবে না।"

"আপনি যদি ইহাতে সুখী হন, তবে অবশ্য করিব।" ইহা বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করিলেন।

এই সময় হোম বলিলেন, "আশা করি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে কিছু আহার করিবেন।"

এই কথার উত্তরে লর্ড সেণ্টসাইমন বলিলেন, "মহাশয়, এটা ঠিক এ সময় সম্ভব নয়। এখন আমার আমোদ করিবার সময় নয়" ইহা বলিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া; আমাদের নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তারপর হোম ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাইয়া তাঁহাদের খাইতে অনুরোধ করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে হোম বলিলেন, "ব্যাপারটা বড়ই মজার! আর ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ঘটনা আগে ভয়ানক জটিল বলিয়া মনে হয়, তাও কত সহজ। প্রথমে মনে হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা জটিল আর কি হইতে পারে? আর মহিলাটি যাহা বলিলেন, এ অবস্থায় ইহা

অপেক্ষা আর স্বাভাবিকই বা কি হইতে পারে? লেষ্ট্রেড্‌ যে ভাবে ব্যাপারটি দেখিতেছিলেন, তা-ই বরং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।”

আমি বলিলাম, “তবে ব্যাপারটা বুঝিতে প্রথম হইতেই তোমার ভুল হয় নাই?”

হোম বলিতে লাগিলেন, “দেখ, প্রথম হইতেই দুইটা কথা বেশ পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল। প্রথম কথা এই যে মহিলাটি বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন। আর দ্বিতীয় কথা এই যে বিবাহের পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মিনিট পরেই তিনি বিবাহের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এটা ঠিক সেই দিন সকাল বেলায় এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাঁর মনে এই পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। এখন সেই ঘটনাটি কি? কেহ তাঁহাকে কিছু বলে নাই, কারণ তিনি বরাবরই বরের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তবে কি তিনি কাহাকেও দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। কারণ এদেশে তিনি অল্প দিনই বাস করিয়াছেন এবং এই অল্প দিনেই কাহারও সঙ্গে তাঁর এমন পরিচয় হইতে পারে না যে তাহাকে দেখিয়াই তাঁর মনের এমন একটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অতএব তুমি বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, এই সমস্ত যুক্তিতর্ক দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে আসিলাম যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন আমেরিকানকে দেখিয়াছেন। তারপর চিন্তা হইল, এই আমেরিকানটি কে এবং তাঁর এই মহিলাটির মনের উপরে এত প্রভুত্ব কিরূপে হইল? স্বভাবতঃই আমার ধারণা হইল যে এই লোকটি হয় তাঁর প্রেমিক, না হয় তাঁর স্বামী। আমি আগেই জানিতাম যে তাঁর জীবনের বহুদিন নানারূপ অবস্থার মধ্যে কাটিয়াছে। তারপর লর্ড সেণ্টসাইমন যখন আমাকে গির্জ্জায় বসিবার যায়গায় একটি লোকের কথা, এবং ক'নের মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা, ফুলের তোড়া ফেলিয়া দিবার কথা, বলিলেন, তখন সেই ফুলের তোড়া উঠাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটা কোন চিঠি দিতে পারে, একথা আমি একরকম স্থিরই বুঝিয়াছিলাম। তারপর যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁর বিশ্বাসী চাকরাণীর কাছে গেলেন এবং ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ প্রভৃতি কথা বলিলেন, তখন সমস্ত ঘটনা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। কারণ আমি জানিতাম যে আমেরিকার খনি ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ঐ কথার অর্থ হইতেছে ‘অন্য

কাহারও পূর্ব্বের দাবী থাকা সত্বেও অপর একব্যক্তির কিছু গ্রহণ করা।' আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে ব্যক্তির সঙ্গে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তিনি হয় তাঁর প্রেমিক, না হয় স্বামী। এবং স্বামী হইবারই সম্ভাবনা বেশী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ইহাদের অনুসন্ধান কি করিয়া পাইলে ?"

"এদের খোঁজ পাইতে খুবই কষ্ট হইত, কিন্তু লেষ্ট্রেড্ আমাকে সে খবরটা দিয়াছেন। তবে তিনি কিছুই বুঝিতে বা জানিতে পারেন নাই। সেই চিঠির পিঠের নামটা খুবই দরকারী বটে, কিন্তু সেই চিঠি হইতে আমি যে জানিতে পারিলাম তিনি লণ্ডনের খুব বড় একটা হোটেলে আছেন, তাহা আরও দরকারী।"

"বড় হোটেলে আছেন,—ইহা তুমি বুঝিলে কেমন করিয়া ?"

"কেন, বিলের হিসাব দেখিয়া। একটা বিছানার জন্য ৮ শিং ও এক গ্লাস্ সেরির জন্য ৮ পেঃ দাম খুব বড় হোটেলেই হইয়া থাকে। লণ্ডনের অনেক হোটেলেরই দর এত বেশী নয়।"

নর্দামবারল্যাণ্ড এভিনিউতে একটা হোটেলে যাইয়া তাদের বই খুলিয়া দেখিলাম এক যায়গায় লেখা রহিয়াছে যে ফ্রানসিস্, এইচ, মোল্টন নামে একজন আমেরিকান কাল সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং তিনি হোটেলে থাকিতে কি কি জিনিষ নিয়াছেন দেখিতে গিয়া সেই বিলের একখানা নকল দেখিতে পাইলাম। সেখানে আরও লেখা ছিল, যে তাঁর চিঠিগুলি ২২৬ নং গর্ডন স্কোয়ারে পাঠাইতে হইবে। আমি তখনই সেখানে গেলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে উভয়কেই বাড়ীতে পাইলাম। তারপর তাঁদের একটু উপদেশ দিয়া বলিলাম যে তাঁরা যদি সাধারণের কাছে এবং বিশেষতঃ লর্ড সেণ্টসাইমনের কাছে, বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া দেন তবে বড়ই ভাল হয়। তারপর যাহাতে লর্ড সেণ্টসাইমনের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়, এজন্য তাঁদের এখানে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং দেখাও হইল।"

"তাতে বড় কোন ভাল ফল হয় নাই। তাঁর মেজাজটা তত ভাল ছিল না।"

হোম আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওয়াটসন্, এত করিয়াও তোমার অদৃষ্টে যদি এরকম ঘটিত, তবে তোমার মেজাজটাও যে ইহা

অপেক্ষা ভাল থাকিত, তা নয়। বাস্তবিক লর্ড সেণ্টসাইমনের জন্য দুঃখই হয়। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমাদের এরকম অবস্থায় পড়িতে হইবে না।"

তারপর তাঁর বেহালাটা লইয়া তিনি আমাকে আগুণের কাছে সরিয়া আসিতে বলিয়া বাজাইতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

সখা।

কে গো সদাই সঙ্গে ফেরে
কথা কয়গো হেসে,—
বিপদ কালে দাঁড়ায় পাশে
বিপদ্ বারণ বেশে ?
বজ্রসম বিপদ যে মোর
বক্ষ পাতি লয় ;
আমার পরাণ সখা সেগো
আমার সঙ্গে রয়।
সুখের কালে কেগো আসি
মধুর মোহন বেশে,
জড়িয়ে ধরে গলাটি মোর
মিষ্ট হাসি হেসে ?
প্রাণটি সরল অমল যে তার
মধুর প্রেমময়,
সদানন্দময় সে যে ভাই,
সদানন্দ ময় !
সাধনার ধন হৃদ্-নলিনে
সদাই দেয়গো দেখা ;
আমার প্রিয় সোদর সম
সে যে গো মোর সখা।

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ঘরের লক্ষ্মী।

শ্রীশের পিতার অবস্থা মন্দ নয় এবং সে নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি প্রতিভাবান্ ছাত্র। বরাবর পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সে বৃত্তি পাইয়াছে। তারপর বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে এম্ এ পাশ করিয়া সে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িতে গেল। সেখানেও অতি সুখ্যাতির সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইল। সকলেই বলিত, শ্রীশ এখন সরকারী অথবা শিল্প বিজ্ঞান সমিতির বৃত্তি লইয়া বিলাতে যাইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ যেরূপ পদলাভে সমর্থ হইবে, সেরূপ বাঙ্গালীর ভাগ্যে চরাচর ঘটে না।

শ্রীশের পিতা অভয়বাবু ভাল বনিয়াদী গৃহস্থ। প্রচুর ক্ষেত খামার আছে, কিছু তালুক আছে,—নগদ টাকাও কিছু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছু লাভ করিয়া তিনি বাড়ীতে থাকিয়া নিজের বিষয়-কর্ম্মাদি নিজেই দেখিতেছেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল,প্রখর বিষয়বুদ্ধি ছিল,চরিত্রে বিশেষ একটা দৃঢ়তা ও তেজস্বিতাও ছিল। তাঁহার নিপুণ পরিচালনায় তাঁহার অবস্থারও অনেক উন্নতি হইল। বিষয়কর্ম্মের দক্ষতা, বনিয়াদী সামাজিকতা এবং বিবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রভৃতি গুণে, তাঁহার নাম প্রতিপত্তিও বেশ হইল। গৃহে তিনি পৈতৃক ক্রিয়াকর্ম্ম চালচলনাদি সমস্ত বজায় রাখিলেন। পুত্রেরা সুশিক্ষা লাভ করিয়া বিবিধ উন্নতিকর কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন,—কন্যাদের ভাল ঘরে বরে বিবাহ দিলেন। শ্রীশ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ তাঁহার মৃত্যুর পর পরিবারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বিষয়কর্ম্ম পরিচালনায় আপন সহকারীরূপে তাকে তিনি নিযুক্ত করিলেন। মধ্যম সুরেশকে নিজের জেলার সহরে ওকালতীতে বসাইয়া দিলেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীশ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কেবল বাহির হইল। শ্রীশের ছোট আরও দুইটি পুত্র তাঁহার আছে,—তারা এখনও পড়িতেছে।

ঘর মন্দ নয়, ছেলেও এমন হীরার ধার।

শিক্ষায় সম্পদে এবং পদমর্য্যাদায় উন্নত ব্যক্তিমাত্রেই যে শ্রীশের হাতে কন্যাদান করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেক বড় বড় সম্বন্ধ আসিল, বড় বড় পণযৌতুকের প্রস্তাব হইল। অবশেষে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল সুখেন্দুবাবুর কন্যা নীলিমার সঙ্গে তিনি পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ স্থির করিলেন। উভয় পক্ষ হইতেই এ সম্বন্ধে খুঁৎখুঁতি কিছু ছিল। ভালহউক, মন্দ হউক, আজকাল দেশীয় আচার নিয়ম ও সামাজিক বিধি নিষেধ ইত্যাদি একেবারে অবজ্ঞা করিয়া, যিনি যত সাহেবী ভাব ধরণ, চাল চলন, গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তত উন্নত বলিয়া কথিত হন, এবং নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করেন। সুখেন্দুবাবু এই হিসাবে বিশেষ আলোকিত ও উন্নত। হিন্দু সমাজভুক্ত থাকিয়াও নগরবাসী ধনিজনের পক্ষে এরূপ আলোক ও উন্নতির আনন্দপভোগে এখন বাধা কিছু হয় না। সমজাতীয় সামাজিকগণ এবং সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ যেখানে প্রচুর অর্থ, উন্নত পদগৌরব এবং স-শক্তি প্রতিপত্তি আছে,—সেখানে, প্রাচীন সমাজনীতির বিরোধী হইলেও, এ আলোক ও উন্নতির ক্রিয়া বেশ উপেক্ষা করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। নহিলে চলিবে কেন? সুখেন্দুবাবুর বাড়ীতে বাবুর্চ্চি ছিল, প্রকাশ্য ভাবে সাহেবদের ক্লাবে সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়া তিনি খানা খাইতেন, বড় বড় সাহেবদের বাড়ীতে পার্টি দিতেন। আবার বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কোনও সমাজিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, পুরোহিত আসিয়া যজনাদি করিয়া দক্ষিণালাভে উপকৃত হইতেন,—অধ্যাপক পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়া বিদায় লইতেন। তাঁহার পুত্র ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছে,—কন্যা নীলিমা অথবা 'মিস্ নেলী' ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলেজে আই, এ, পড়িতেছে। উন্নত ও আলোকিত আদবকায়দা শিখিবার জন্য অনেক সময় তিনি কন্যাকে বোর্ডিং এও রাখিতেন। গৃহে যে আলোক বা উন্নতিশীলতার এমন অভাব কিছু ছিল, তা নয়।

কন্যা ও বধূদের নোংরা গৃহ কর্ম্মের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও হইত না। প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সুসজ্জিত গৃহ ছিল,—প্রত্যেকে যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যার যার গৃহ ব্যবহার করিতে পারিত। আবার ইচ্ছামত পরস্পরের প্রমোদ সঙ্গ উপভোগের সুবিধার জন্য একটি সাধারণ বসিবার ঘরও ছিল,—সেখানে সকলের সম্মিলনে সঙ্গীতালাপাদি আমোদ প্রমোদ হইত। গুরু আহার এবং লঘু জলপান ও চাপানাদির বাঁধা সময় ছিল। সপরিবারে স প্রমোদেই সুখেন্দুবাবু সাধারণতঃ এসব সম্পন্ন করিতেন। মোটের

উপর মাজা ঘসা বাঁধাছাঁদা সাহেবী কায়দার যত নির্ঝঞ্ঝাট ও সুশৃঙ্খল আরাম ও প্রমোদ উপভোগে এবং উন্নত ধরণে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব, গৃহে তাঁহার পুত্র কন্যা ও বধূরা তাহার সুযোগ যথেষ্ট পাইত। তবু বোর্ডিংএ আরও উন্নত আদব কায়দা শিক্ষার সুযোগ অবশ্যই আছে,—তাতেই বা তাঁর কন্যারা বঞ্চিত হইবে কেন?

তবে অন্তঃপুর একেবারে বাঙ্গালী ভাব বিবর্জ্জিত ছিল না। সুখেন্দুবাবুর স্ত্রী বিনোদিনী গৃহস্থঘরের কন্যা ছিলেন, উচ্চশিক্ষাও লাভ করেন নাই। স্বামীর সংসর্গে উন্নত আচারে অনেকটা অভ্যস্ত হইলেও, একেবারে দেশীয় সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গৃহে দুই একজন আশ্রিতা আত্মীয়াও ছিলেন। ইনি স্বামীর সঙ্গে চা খাইতেন, কন্যা বধুদের গান বাজনা শুনিতেন, তাহারা শিক্ষিতা ও উন্নতা বলিয়া গৌরব করিতেন, গোপনে একটু একটু ইংরেজী শিখিবার চেষ্টা করিতেন,—আবার পূর্ব্বকথিতা আত্মীয়াদের সাহায্যে গৃহকার্য্যাদিও নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। সরল সহৃদয় ভাবেই তিনি ইঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের গঙ্গাস্নান, দেবালয় দর্শন, পূজা আহ্নিক ব্রত নিয়মাদি যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে নিজেও ইঁহাদের সঙ্গে গিয়া গঙ্গাস্নান ও কালী দর্শন করিয়া আসিতেন। কেবল যে সকে ইহা করিতেন, তা নয়; সংস্কারের প্রভাবও কিছু ছিল। শুনিয়াছি, লুকাইয়া একবার শিবরাত্রির উপবাসও তিনি করেন। তবে পরদিন পারণারম্ভে একেবারে ২।৩ পেয়ালা চা পানে পূর্ব্বদিনের অতৃপ্ত তৃষ্ণাজাত ক্লেশ ও অবসাদ তাঁহাকে দুর করিতে হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার মনে হইয়াছিল, হিন্দুনারীর এমন চা পানের অভ্যাস ভাল নয়। কে জানে, ঈশ্বর না করুন, যদি—বৈধব্য অদৃষ্টে থাকে, তবে কি উপায় হইবে? বিধবা যদি রাত্রি প্রভাতেই চায়ের পেয়ালা লইয়া বসে, তবে ছি—লোকে দেখিয়াই বা কি বলিবে? কিন্তু তাই বলিয়াই যে চা পান তিনি ত্যাগ ফরিলেন, তা নয়। বৈধ্যব্যের সম্ভাবনা আজই দেখা যাইতেছে না। কিন্তু চায়ের তৃষ্ণা এই মুহূর্ত্তেই পীড়ন করিতেছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া উপস্থিত ভোগ্য ত্যাগে এখনই এ পীড়ন কে সহ্য করে, বল? যারা বড় বেশী পান খায়, তারাও ত বৈধব্যের পর গুবাক-লবঙ্গাদি চিবাইয়া জীবন ধারণ করে? তিনি না হয় সকালে স্নান করিয়া পিত্তল পাত্রে চিনি দিয়া একটু জলগরম করিয়া পাথরের বাটিতে ঢালিয়াই

খাইবেন! তাতে ত আর কিছু দোষ নাই? দূরহ'ক ছাই। এসব কি ছাই কথা তাঁর পোড়া মনে উঠিতেছে? তিনি পতিভক্তিতে হীনা নহেন, বৈধব্য কেন হইবে? আর যদি হয়ই, তবে পতিবিরহ যদি সহিতে পারেন, চা-পানাভাব কি সহিতে পারিবেন না? ছিঃ! এমন সব হীন কল্পনাও মনে আসে!

সুখেন্দুবাবুর পারিবারিক জীবন এইরূপ ছিল। আবার ওদিকে অভয় বাবুর বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরে তাঁর পারিবারিক জীবনে একালে সেকালের ধরণ যতটা রক্ষিত হইতে পারে, তা হইত।

সুখেন্দুবাবুর মনে হইয়াছিল, অভয়বাবুর গৃহের চালে তাঁহার কন্যা চলিতে পারিবে না। তবে অমন রত্নের মত ছেলে, অতিশীঘ্রই বড় চাকরী করিয়া সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলেই বাস করিবে। কটাদিন কোনও মতে কাটাইতে পারিলেই আর কোনও অসুবিধা থাকিবে না। শিক্ষিতা কন্যা শীঘ্রই স্বাধীন হইয়া, আপনার উন্নত রুচিমত গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারিবে। সুতরাং নিতান্ত লোভনীয় এ সম্বন্ধ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না।

ওদিকে অভয়বাবুও শুনিলেন, ভাবী বৈবাহিকের চালচলন সাহেবী ধরণের, বধূও কলেজে পড়ে। এ বধূ তাঁহার গৃহস্থালীর যোগ্য নাও হইতে পারে। তবে তাঁর ঘরের কঠোর নিয়মের অধীনে আসিয়া, তাঁর তেজস্বী পুত্রের হাতে পড়িয়া, বধূর বিবিয়ানা অভ্যাস কয়দিন থাকিবে? কন্যাটি অতি সুন্দরী, অমন সুন্দর সচরাচর মিলে না। এরূপ বধূ গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ হইবে। আর লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়া বিবিয়ানা ধরণে যে একটা দৃঢ়পণই হইবে, এমন কি কথা! ছেলে ত তার চেয়ে অনেক বেশী লেখা পড়া শিখিয়াছে। তার যদি বাঙ্গালী গার্হস্থ্যজীবন অসহনীয় না হয়, বধূরই বা কেন হইবে? তারপর তাঁর এবং সুখেন্দুবাবুর উভয়েরই সমান বন্ধু একজন এই সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়া বড় বেশী শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিলেন। আপত্তির কারণ তেমন কঠোর নয়,—সুতরাং বন্ধুর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিজের সম্মতি জানাইয়া তিনি কহিলেন, ছেলের যদি আপত্তি কিছু না থাকে, তবে তিনি এই সম্বন্ধই করিবেন। অভয়বাবু কিছু সুবিবেচক। বয়স্ক পুত্রের বিবাহে তার মতের অপেক্ষা যে একটু করা উচিত, ইহা তিনি বুঝিতেন। স্ত্রী সুখদাসুন্দরীকে সব বুঝাইয়া বলিয়া শ্রীশের মত জানিয়া দিতে তিনি আদেশ করিলেন।

[২]

বাড়ীতে একটি ঘরে শ্রীশ ছোট একটি লেবরিটারী করিয়াছিল। সেখানে বসিয়া সে কি একটি কলের নমুনা আঁকিতেছিল। সুখদাসুন্দরী লেয়া সমেত কিছু ডাবের জল, কিছু দুধের সর ও বাতাসা লইয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ ডাবের জল বড় ভালবাসিত এবং বাতাসা দিয়া পুরু দুধের সরও তার বড় প্রিয় ছিল। কথাটা উপস্থিত করিবার আগে পুত্রের একটু চিত্ত-প্রসাদনের দিকে জননীর লক্ষ্য যে কিছু না ছিল, তা বলা যায় না। সুখদাসুন্দরী খাবারটা শ্রীশের সম্মুখে টেবিলের উপরে রাখিলেন, বড়বধূ একগ্লাস জল ও দুটি পান দিয়া গেল। শ্রীশ মায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "কি মা ?"

মাতা কহিলেন, "এই নে এইটুকু খা, বেলা গেছে,—সেই দুপুরে খেয়ে উঠে অবধি ত ঐ ছাই পাঁশ নিয়েই ব'সে আছিস্,—যা খেয়ে একটু বেড়িয়ে টেরিয়ে আয়গে! খেলারও ত সময় হ'য়ে এল!"

"ওঃ! পাঁচটা যে বাজে! হাঁ,—খেয়ে এখনই বেড়িয়ে পড়ি। মাঠে এতক্ষণ সবাই জড় হ'য়েছে।"

শ্রীশ ডাবের জল খাইয়া কতটুকু সর ও বাতাসা তুলিয়া মুখে দিল।

"ও শ্রীশ! উনি যে তোর বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্চেন!"

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, 'হঁা, তা ত শুন্‌ছি।"

"তা তুই কি বলিস্ ?"

"আমি আর কি বলব মা? আর কিছু দিন পরে হ'লেই ভাল হ'ত। তবে তোমাদের যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয় ত এখনই হ'ক।"

"আমাদের ত ইচ্ছাই। তা এই যে সম্বন্ধ ক'চ্চেন, এতে তুই কি বলিস্ ?"

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "বাবা ত দেখে শুনেই ক'চ্চেন,—আমি আর কি ব'লব? তবে—"

"কি তবে বাবা ?"

"তারা যে সাহেব। মেয়েও ত শুন্‌লুম কলেজে ইংরিজি প'ড়ছে। তা সে মেয়ে কি তোমার গেরস্থ ঘরে মানিয়ে চ'ল্‌তে পার্‌বে ?"

"সে বাবা, তুই যা করবি, তাই হবে। সোয়ামী যদি সোয়ামীর মত হয়, মেয়েমানুষ কি আর তাকে ছাড়িয়ে চ'ল্‌তে পারে? আর বাপের ঘরে যে চালই থাক্, বে হ'লে সবাই শ্বশুর-ঘরের চালেই চলে। বড় বৌমা

ত জমিদারের মেয়ে,—বাপের কত আদরেরও ছিল, তা সে কি আমাদের গেরস্ত ঘরের মত চ'লছে না?"

শ্রীশ হাসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, পৃথিবীর খবর তোমরা বড় কম রাখ। জমিদারের মেয়ে বাপের ঘরে যত বড়মানুষীই করুক, সে দেশী বড়মানুষী। তাতে গেরস্থ ঘরে বড় ঠেকে না। জমিদার হ'লেও সে এদেশেরই গৃহস্থ। আর সাহেবী বড়মানুষী, সে একেবারে একটা আলাদা জিনিষ।"

মাতা কহিলেন, "তা তোর যদি—"

"কিছু না—কিছু না মা! আমার এমন কিছু ঠেক্‌বে না। ঠেকে ত তোমাদেরই ঠেক্‌বে। তোমরা যা ভাল বোঝ, তাই কর। বাবা ত কথা দিয়েছেন?"

"দিয়েছেন,—তবে তোর মতের অপেক্ষাও রেখেছেন।"

শ্রীশ কহিল, "তাঁর মতের উপরে কি আর আমার মত জাহির ক'ত্তে পারি মা?—তিনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। তবে শেষে আমার দোষ দিও না কিন্তু।"

মাতা হাসিয়া কহিলেন, "তোকে আবার কি দোষ দেবরে পাগল! যাই তাঁকে বলিগে।—আর কিছু এনে দেব?"

"না! আর কিছু এখন চাইনে! সন্ধ্যের পরই ভাত খাব এখন।"

শ্রীশ জল খাইয়া পান দুটি মুখে দিয়া খেলিবার মাঠের দিকে গেল।

সুখদাসুন্দরী স্বামীকে গিয়া সব কথা বলিলেন। অভয়বাবু একটু ভাবিলেন, কিন্তু তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখন ফেরাটা ভদ্রতার বিরুদ্ধ হয়। তিনি সুখেন্দুবাবুকে শেষ সম্মতি জানাইলেন; বিবাহের দিন স্থির হইল।

[৩]

মহাসমারোহে শ্রীশের বিবাহ উৎসব চলিল। বহু আত্মীয় কুটুম্বজনের আগমনে আনন্দকোলাহল-মুখরিত গৃহ পরিপূর্ণ—পরিপূর্ণেরও অতিরিক্ত হইল। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ আজ বহু আলো বাদ্য লোকজন সহ শোভাযাত্রা করিয়া বধূসহ গৃহে ফিরিল। উঠান ভরা আলিপনা—মধ্যে সিন্দুরে নীলে অঙ্কিত বিচিত্র পদ্ম। পরিজন সহ সুখদাসুন্দরী সেই পদ্মের উপরে বউ পরিচয় করিয়া পুত্র ও বধূ ঘরে লইয়া গেলেন।

পিতৃগৃহ হইতে নীলিমার সঙ্গে আসিয়াছিল, একটি অতি পরিচ্ছন্ন শুক্লাম্বরা পরিচারিকা এবং একটি বেয়ারা। পরিচারিকাটি বোধহয় কখনও বিধবা হইয়াছিল, কারণ অঙ্গে কোনও অলঙ্কার ছিল না এবং বেশেও কোনও রূপ রঙ্গিন আড়ম্বর ছিল না। প্লেন সাদা সেমিজ জ্যাকেট পেটিকোট ইত্যাদির উপরে বেশ কুচান ফুলান সুধৌত সুচিক্কণ প্লেন সাদা কাপড়—যেন সরল সাদাসিধা পরিমার্জ্জনার আদর্শ সে বেশ!

প্রথমবার শ্বশুরগৃহে নীলিমা হয়ত ৫।৬ দিনের বেশী থাকিবে না। কিন্তু সেই পাঁচ ছয় দিনই কি কম! দৈনিক জীবন যাপন সম্বন্ধে নীলিমা যে সব উন্নত ও পরিমার্জ্জিত নিয়মে অভ্যস্ত হইয়াছিল, একদিনও সে নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু হয় নাই। এই সব নিয়মে যাহারা অভ্যস্ত হয়, তাহারা তাহার ব্যতিক্রম একদিন থাক—এক বেলাও সহিতে পারে না। দৈনিক জীবনের অশন বসন শয়নাদির ব্যবস্থায় অতি উন্নত পরিমার্জ্জনায় লোককে বস্তুতঃই এমন কোমল ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, সুতরাং এই সভ্যতা এবং সভ্যতাসুলভ পরিমার্জ্জিত জীবনযাপন যে একেবারে নিছাঁক ভাল, তাও বলা যায় না।

যাহাহউক অন্ততঃ ৫।৬ দিন নীলিমাকে গ্রাম্য শ্বশুরগৃহে থাকিতেই হইবে। কিছু অসুবিধা তার সহিতেই হইবে, কিন্তু একেবারে যদি দৈনিক নিয়মের অন্যথা হয়,—তবে তার কোমল দেহে তা সহিবে কেন? তাই সুখেন্দুবাবু শ্বশুরগৃহে বাস কালে নীলিমার আরাম ও সুখ সচ্ছন্দতাদি সম্বন্ধীয় দৈনিক নিয়ম যতদুর সম্ভব চলিতে পারে, তার ব্যবস্থা করিয়া— একজন পরিচারিকা ও বেয়ারা সঙ্গে দিলেন। বিনোদিনী গ্রাম্য গৃহস্থজীবনের চালচলন কি, নববধূকে প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিয়া কিরূপ ভাবে চলিতে হয়, না চলিতে পারিলে কিরূপ নিন্দা হয়, তাহা জানিতেন। স্বামীর ব্যবস্থায় তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু সুখেন্দু বাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। মেয়েটা কি মারা যাইবে? আর উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনটা কি, তা সেই গ্রাম্য পরিবারকে একটুখানি আভাস দিয়া আসিলেই বা ক্ষতি কি? তাদের একটু চক্ষু খুলিবে, একটু আলোক পাইবে! প্রাচীনতায় জীর্ণ, ঘোর তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য পারিবারিক জীবনে যে সংস্কার আবশ্যক, তাঁহার শিক্ষিতা আলোকিতা ও উন্নতা কন্যা তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিবে। আর তাহারা ইহাও বুঝিবে, নীলিমা তাদের সঙ্কীর্ণ নোংরা গৃহজীবনের যোগ্যা

নয়, তাকে স্বাধীন ভাবে আপন উন্নত ধরণে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

সুপরিচ্ছন্ন-শুভ্রাম্বরা পরিচারিকাটির নাম ছিল দিগম্বরী। দিগম্বরী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াই আছে। মাগো! এইটুকু বাড়ী তায় লোক জমেছে দেখ না! ঘরে ঘরে, বাক্স পেটরা, কাপড় চোপড়, খাবার, ছেলে পিলে—সব কি বিশ্রী আলু থালু ভাবে পড়িয়া আছে! একটু আরামে বসিবার যায়গা কোথাও নাই। তা এরা গেঁয়ে লোক,—এদের ঘর দরজা লইয়া ইহারা যা খুসী করুক গে। কিন্তু মিস্ নেলীর জন্য যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সজ্জিত গৃহ সে দেখিতে পাইতেছে না! তার জিনিষ পত্রগুলি সে কোথায় নিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবে,—কোথায় তাকে একটু চা করিয়া দিবে? কোথায় বা সে বসিয়া চা টা পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিবে? কোনও ঘরে দুখানা চেয়ার কি একখানা যেমন তেমন তেঠেঙো টেবলও ত দেখা যাইতেছে না! কি বিপদই হইল! আবার ওদিকে মাগীরা তাকে কেমন ঘিরিয়া বসিয়াছে, দেখ না? হাঁফ ছাড়িতে যে পারিতেছে না। কেবল আসিয়াছে, এক পেয়ালা চা দুখানা টোষ্ট্ বিস্কুট কিছু আনিয়া দিবে, তা না— খালি গোলমালই করিতেছে! ওই মোটা মাগীই বুঝি বাড়ীর গিন্নি, উহার কাছেই একবার যাওয়া যাক্!

ফর ফর করিয়া দিগম্বরী সুখদাসুন্দরীর নিকটে গেল। একটু হাত তুলিয়া মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দিগম্বরী কহিল, "হাঁ গা! তুমিই কি বাড়ীর গিন্নী?"

"হাঁ বাছা, আমিই শ্রীশের মা। আহা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে; এস মা, কিছু জলটল খাবে এস! গোলমালে এতক্ষণ তোমার পানে চাইতেও পারিনি,—তা কিছু মনে ক'রো না,—এ তোমার আপনার বাড়ী। ও বড় বৌমা! এই যে——"

গৃহিণীর দীর্ঘ শিষ্টাচারে অধীরা দিগম্বরীর কুঞ্চিত ভ্রূ কুঞ্চিততর হইতেছিল। সে ঈষৎতীব্র দ্রুত নাকী সুরে উত্তর করিল, "না না না! আমার জন্যে কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমার যা হয় হবে এখন! আমি সুধুচ্ছিলুম, মিস্ নেলীর ঘর কোন্‌টা। জিনিষ পত্তরগুলো———"

"কার কথা ব'লছ মা?"

"মিস্ নেলী! মিস্ নেলী! এই যে তোমাদের নতুন বউগো!"

"তার কি ?"

"বলি তার ঘর কোন্‌টা ?"

"তার ঘর !"

"হাঁ হাঁ ! তার ঘর। তার একটা ঘর নেই ? কোনও বন্দোবস্তই ত তার দেখ্‌তে পাচ্চিনি, বেয়ারা জিনিষ পত্তর নিয়ে বাইরে বসে র'য়েছে—"

"ওমা ! নতুন বৌ—সবে এসেছে। তার আবার আলাদা ঘর কি ? কি ব'লছ, বাছা !"

"তবে জিনিষ পত্তর গুলো কোথায় তুলব ?"

"ওমা, তার জন্যে ভাবনা কি ? এই কত ঘর র'য়েছে,—ঘরের বৌ—সবই ত তার। জিনিষ পত্তর যেথায় হয়, তুলুক্ না ! আচ্ছা, আমিই বরং তুলিয়ে দিচ্ছি,—ও বিশু !———"

"না না ! আমিই বেয়ারাকে দিয়ে দেখেশুনে তুলে নিচ্চি এখন। একটা ঘর চাই বই কি ? সাজিয়ে গুছিয়ে সব রাখ্‌তে হবে। মিস্ নেলী হয়রান্ হ'য়ে প'ড়েছে,—একটু বিশ্রাম কর্‌বে, চা টা খাবে—"

সুখদাসুন্দরী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দিগম্বরীর দিকে চাহিলেন। ওমা, একি কথা ! নূতন বৌএর আলাদা ঘর চাই ! আবার চা খাবে ! ওমা, কি লজ্জা ! এমন কথাও ত তিনি বাপের বয়সে শোনেন নাই। পাঁচজন লোক রহিয়াছে,—তারাই বা কি বলিবে !

দিগম্বরী কহিল, "তা যা হয়, একটা বন্দেজ ক'রে দেও—নইলে চ'ল্‌বে কেন ? এই হিড়ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা কি ম্‌রা যাবে ? সাহেব আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন, মিস্ নেলীর যেন কোন কষ্ট কি অসুবিধা কিছু না হয়।"

"সা—হেব !"

"হাঁগো ! আমাদের সাহেব ! মিস্ নেলীর বাপ, তোমাদের ব্যাই গো।"

"ও !"

সুখদাসুন্দরী এদিকে ওদিকে একবার চাহিলেন। গৃহের পরিবার পরিজন ও সমাগতা কুটুম্বিনীগণ অনেকেই আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছে। সকলেই অবাক ! এমন ত কখনও কেহ দেখেও নাই, শোনেও নাই ! তাইত ! এরা কি খাস বিলাতী সাহেব ! এ বউ লইয়া ঘরকন্না কিরূপে চলিবে ! বউ চা খাইবে ! ঘরে পা দিতে না দিতেই তার একটা

আলাদা ঘর চাই! পৃথিবী কি উলটিয়া গেল; কলির শেষ কি এখনই আসিল!

সুখদাসুন্দরীর মুখখানা অপ্রসন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। ছেলে ত ঠিক কথাই বলিয়াছিল! এখন কি উপায় হইবে! যাহাহউক, পরের চিন্তা পরে! এখন এই দাসী—দাসী ত নয় যেন লাট্‌সাহেবের চাপরাসী—যাহা দাবী করিতেছে,—তার ব্যবস্থা করিয়া দিতেই হইবে। নহিলে মাগী হদ্দ কেলেঙ্কারী করিয়া ছাড়িবে। তিনি বড় বধূর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যাও ত মা, বড় বৌ মা! বিশুকে আর বিন্দিকে নিয়ে যাও। সুকুরা যে ঘরটা আছে, সেইটে খালি ক'রে দেওগে। তারা—আমার ঘরেই শোবে এখন,—"

এই বলিয়া দিগম্বরীর দিকে ফিরিয়া তিনি আবার কহিলেন, "তা ঘর খালি ক'রে দিচ্চে, ততক্ষণ তুমি কিছু জল টল খেয়ে নেও।"

দিগম্বরী কহিল "না না! জলটল আর কি এখন খাব? চা ত হচ্চেই, তাই এক কাপ খাব এখন, তারপর,—"

"তারপর?"

"তারপর আর কিছু লাগ্‌বে না। খানকত লুচি,—একটুখানি আলুর দম, আর একটু দুধ আর গোটা কত সন্দেশ হ'লেই হবে এখন। বেশী হাঙ্গামা আমার জন্যে ক'ত্তে হবে না।"

সকলে এ ওর মুখপানে চাহিলেন, মাগী বলে কি!

দিগম্বরী যে মনিবের ঘরে রাত্রিতে লুচি আলুরদম দুধ ও সন্দেশ খাইত, তা নয়। তবে সে কুটুম্ববাড়ী আসিয়াছে,—এখানে সে আপনাকে খাট করিবে কেন? মনিবের মান ত তাকে রাখিতে হইবে! তার মনিব যে কত বড় লোক,—কত বড় একটা সাহেব,—তাই যদি সে তাদের না বুঝাইয়া যাইতে পারিবে—তবে আসিয়াছে কেন? সে যেমন ঘরের চাকরাণী,—তেমন চালে ত তাকে চলিতে হইবে!

ঘর খালি হইল। দিগম্বরী ফর ফর করিয়া বাহির হইল। নাকীসুরে বেয়ারাকে ডাকিয়া আধাহিন্দী আধা বাঙ্গলায় 'মিস্ নেলী'র চিজ উজ্ সব ঘরে তুলিতে আদেশ দিল। 'চিজ্ উজ' সব উঠিল। দিগম্বরী বেয়ারার সাহায্যে ক্ষিপ্র হস্তে তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া নিল। তারপর ষ্টোভ্ ইত্যাদি বাহির করিয়া চায়ের জল তুলিয়া দিল।

ষ্টোভে চায়ের জল গরম হইতে লাগিল, ইত্যবসরে সে গিয়া নীলিমাকে

লইয়া আসিল। নীলিমা দিগম্বরীর সাহায্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিল। ইতিমধ্যে চা'ও হইল। ঘরে টেবল চেয়ার ছিল না, অগত্যা একটি বাক্সের পরে সে নীলিমাকে বসাইয়া, আর একটি বাক্স সম্মুখে টানিয়া আনিয়া তার উপরে একখানি পরিষ্কার তোয়ালে বিছাইয়া, নীলিমাকে চা দিল, আর চায়ের সঙ্গে কিছু মৃদু চর্ব্ব্য একখানা প্লেটে সাজাইয়া দিল। বলাবাহুল্য, এসব সঙ্গেই ছিল। নীলিমাকে সব গুছাইয়া দিয়া, নিজেও আর এক কাপ লইয়া একপাশে পা ছড়াইয়া বসিল।

[৪]

পরদিন সকালে চা খাইতে খাইতে নীলিমা কহিল, "ডিগ্, কাল তুই কিছু বাড়াবাড়ি ক'রেছিলি। অত কি দরকার ছিল? এই কটা দিন ত? একরকম ক'রে কেটে যেতই। আমার ভারি লজ্জা কচ্চে।"

ইংরেজী ধরণে দিগম্বরীর নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া হইয়াছিল, 'ডিগ্' বা 'ডিগী'। দিগম্বরী প্রভুগৃহে সাধারণতঃ এই নামেই অভিহিত হইত। দিগম্বরী কহিল, "বাড়াবাড়িটা কি ক'রেছিগো! একটি ঘর নইলে কি ক'রে চল্‌ত? তবুত বাথ্‌রুম নেই। তাতেই অসুবিধার একশেষ হ'চ্চে। তবু কোনও মতে এই একটুখানি ঘর বন্দেজ ক'রে নিইছি,—চা'টা ক'রে দিচ্চি,—খাবার টাবার যখন যেমন দিতে পার্‌ব, নইলে কি হ'ত? এই কটা দিনই কি বাঁচতে?"

নীলিমা উত্তর করিল, "মানুষ কি অত সহজেই মরে ডিগী? তা যাক্, যা হ'য়েছে, তা হয়েছে। ঘর একটা ত পাওয়া গেছে,—এমন আর কি অসুবিধা হবে? তুই আর কোনও গোল করিস্ নি, আমার ভারি লজ্জা ক'র্‌বে।"

"লজ্জা ত ভারি! এদের একটু আক্কেল থাকলে আর আমার এ সব হাঙ্গামা ক'ত্তে হয়।"

"এ'দের চালচলন আলাদা,—তার কি হবে?"

"তা থাক্‌না আলাদা। এদের চালচলন কে কেড়ে নিচ্চে? তা তোমার চালচলন কি, তার একটুখানি হিসেব কি ক'ত্তে হয় না? কেন জামাই সাহেব কি তোমায় কিছু ব'লেছে?"

"না—না, তিনি কিছু বলেন নি। তা নাই বলুন,—আমি কি ভাল মন্দ কিছু বুঝিনি? আর এই কটা দিন ত? যে ভাবে হয়, কেটে যাবেই। তারপর—"

"তারপর কি ?"

"তারপর ত আর এখানে থাক্‌তে হবে না। যে ক'দিন ওঁর চাকরী বাকরী না হয়, বাবা ব'লেছেন, সেখানেই থাক্‌ব। আর যদি বিলেত যান, ফিরে আসা পর্য্যন্ত—কলেজেই পড়্‌ব,—এখানে আর আস্‌তে হবে না।"

চা পান করিয়া নীলিমা বহির হইল। শাশুড়ী, যা, ননদ এবং অন্যান্য কুটুম্ব কন্যাদের সঙ্গে অনেক মিষ্ট আলাপ করিল। সকলেই দেখিলেন, বৌটির মন মন্দ নয়—বেশ একটা মিষ্ট সরলতা ও সহৃদয়তা আছে,—তবে পিতার ঘরের কুশিক্ষায় কেমন বেয়াড়া বিবিয়ানা ধরণের চাল হইয়াছে। এই গ্রাম্য গৃহস্থ ঘরের বধূরূপে মানাইয়া চলিতে পারিবে কি না, সন্দেহ।

৩।৪ দিন গেল। বউ ভাত হইল। বধূর পিত্রালয়ে যাইবার দিন আসিল। শ্রীশ মাতাকে কহিল, "মা, এখন কি ক'র্‌বে ?"

"কি বাবা ?"

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "বলি বিবি বৌ ত ঘরে আন্‌লে। এখন একে নিয়ে কি ক'রে মানিয়ে চ'লবে ?"

মাতা কহিলেন, "তাইত বাবা! তাইত বাবা! বড় মুস্কিলই হ'ল। তা মেয়েটি এম্‌নি মন্দ নয়। তা তুই একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে—"

শ্রীশ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু হবে না মা। সে চেষ্টা আমি করিনি, ক'রবও না, নিতান্ত নরম কচি খুকিটি আর নেই,—অভ্যাসগুলো বড় শক্ত হ'য়ে গেছে। মনটা—মন্দ—নয়,—তবে চালটা দাঁড়িয়ে গেছে। নিজে দেখে কি বুঝে যদি কখনও ছাড়ে। আমার দুটো মুখের কথায় কিছু হবে না। তাতে ফল উল্টাও হ'তে পারে।"

"তা নিজে কি বুঝ্‌বে না ?"

"সহজে না।"

"তবে কি হবে ?"

"ও ভাব্‌ছে, দুদিন বাদেই ত বড় একটা চাকরী পাব,—ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হব,—তখন আমার সঙ্গে নিজের উচু চালে বেশ সংসার পাতিয়ে সুখে থাক্‌বে। আমাদের ঘরের সেকেলে গেঁয়ে চালে ওর কিছু ঠেক্‌বে না।"

সুখদাসুন্দরী একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন,—কহিলেন, "তবে তাই না হয় হবে। ঘরের বৌ—বিয়ে দিয়ে এনেছি, ফেল্‌তে ত পারব না ?"

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "বৌএর খাতিরে তবে কি ছেলেকে ফেলবে মা?"

"তা তুই কি আর বাড়ীঘর একেবারে ছাড়্‌বি? চাকরী যারা করে, বিদেশেই থাকে;—ছুটি ফুটিতেই বাড়ী আসে।"

"বৌ তখন কোথায় থাক্‌বে?

"তা দুচার দিনের জন্যে, এক রকম চ'লে যাবে। এবার ও ত চ'ল্‌ছে। তবে কিনা—বার মাস এমন চলে না। গেরস্তর ঘরে এক পরিবারে কি একটি বৌ বার মাস আলাদা একটা সাহেবী চাল ধ'রে থাক্‌তে পারে? আর বৌরা তা সইবে কেন? সংসার তাহ'লে থাক্‌বে না। আর লোকেই বা কি ব'ল্‌বে?"

শ্রীশ কহিল, "তা যেন হ'ল—তোমাদের কাজ তোমরা কল্লে,—বৌএর খাতিরে ছেলে ছেড়ে দিলে। কিন্তু আমি ত আমায় ছেড়ে দিতে পাচ্চিনি মা? এ ত সামান্য একটা বৌ—দশটা রূপকথার রূপসী রাজকন্যে এলেও নয়।"

"সে কিরে! তুই আবার তোকে ছেড়ে দিবি কিরে?"

"তোমরা বিবি বৌ দিয়েছ, ঠেকেছ,—তাই ব'লছ, বৌ নিয়ে সাহেবী ক'রে, বিদেশে থাক গিয়ে। কিন্তু আমি ত বৌএর খাতিরে সাহেব হ'তে পাচ্চিনি? বৌকে সাহেবী চালে রাখ্‌তে হবে ব'লেই যে অমনি চাক্‌রী ক'ত্তে ছুটে যাব,—তা ত হবে না মা?"

"বলি চাক্‌রী ত ক'র্‌বিই?"

"কে ব'ল্লে?"

"তবে কি ক'র্‌বি?"

"একটা কারখানা ক'র্‌ব,—এই ত বরাবর মতলব র'য়েছে, এখন বৌয়ের খাতিরে সেটা ত ছাড়্‌তে পাচ্চিনি।"

"তা, যাই করিস্ রোজগার ত হবে, যেখানে কারখানা ক'র্‌বি, সেখানেই বৌ নিয়ে থাক্‌বি।"

"কারখানা করাটা মা, অমন মুখের কথা নয়, ব'ল্লেই হয় না। এখনও ঢের দিন আমায় আর কোনও কারখানায় কাজ শিখ্‌তে হবে। তাতে ঝাঁ করে বড় একটা আয় হ'বে না। আর হ'লেই বা কি? তোমরা সাধ ক'রে বিবি বৌ বে দিয়েছ ব'লে, আমি মা বাপ, ভাই বোন্ সব ছেড়ে তাকে নিয়ে আলাদা সাহেব হ'য়ে থাক্‌ব, এমনটা ত হ'তে পারে না? আমি তা চাই-ই না, কখনও তা ক'র্‌বও না।"

"তবে কি হবে বাবা ?"

"তাই ত ভাব্‌ছি। ও যদি আপনা থেকে এখানে মানিয়ে থাক্‌তে না পারে—"

"তবে ?"

"বাপের বাড়ীই যাক্।"

"সে কি কথা বাবা ! বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছিস্,—এখন কি বৌ ত্যাগ ক'র্‌বি ?"

শ্রীশ কহিল, "ত্যাগ কেন ক'রব ? দেখাশুনো কর্‌ব, খরচপত্তর দেব। সে যেখানে সুখে থাকে থাক্।"

মাতা কহিলেন, "সেটা—কি—ভাল হবে— শ্রীশ ?"

"মন্দ হ'লে আর কি ক'র্‌ব ? আর ত উপায় দেখ্‌ছি না মা !"

সুখদাসুন্দরী কহিলেন, "বাপের ঘরে যত সুখই থাক্, সোয়ামীর ঘর ছেড়ে মেয়েমানুষ কি চিরকাল সেখানে সুখে থাকৃতে পারে ? দুদিন বাদে সবারই বাপের ঘরই হয় পরের ঘর,—আর এই পরের ঘরই আপনার ঘর হয়। আপনার ঘর ছেড়ে পরের ঘরে কে কতদিন থাকৃতে পারে বাবা ?"

শ্রীশ কহিল, "তা—সে রকম যখন্ মনে ক'র্‌বে,—আমার ঘর ত র'য়েছেই। তার দোর ত আর জন্মের মত তোমরা বন্ধ ক'রে দিচ্চ না ? এ ঘর যদি আপনার বলে কখনও মনে ক'রে,—তোমার আর আর বৌদের মত এ ঘরের চালে যদি আপনাকে কখনও মানিয়ে নিতে পারে, এখানে আস্‌তে ত তখন বাধা হবে না ?"

"সে—কতদিনে—কি হবে—তার ঠিক্ কি ?"

"ততদিন না হয় সেখানেই থাক্‌বে।"

"তাই ত বাবা !—তাই ত বাবা !—তোর কপালে—শেষ এই বিড়ম্বনা হ'ল !"

"আমার বিড়ম্বনা কিছু হবে না মা ! আমার বেশ চ'লে যাবে। তবে তার কেমন চ'লবে, তা বল্‌তে পারিনে।"

সুখদাসুন্দরী আর কি বলিবেন ? একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন নীলিমা পিতৃগৃহে গেল।

[৫]

স্ত্রীর সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে শ্রীশ পিতার সঙ্গে কোনওরূপ আলোচনা করিল না,—মাতাকেই যাহা বলিবার বলিল। মাতা পিতাকে বলিলেন, পিতার কাছে শ্রীশের কোনও কথা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

শিক্ষিত বয়োপ্রাপ্ত পুত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেও তিনি সাধারণতঃ চলিতেন না। তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পুত্রদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে তাঁহার অভিপ্রায়ের বিশেষ বিরোধ এপর্য্যন্ত কখনও হয় নাই।

কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীশের কি লক্ষ্য তাহা সে পিতাকে জানাইয়া তাঁহার অনুমোদন প্রার্থনা করিল। শ্রীশ বড় একটা চাকরী করিয়া দশজনের এক জন হইবে, উচ্চপদস্থ বলিয়া আর পাঁচজনে তাহাকে বেশ সম্ভ্রম করিবে, পিতার এরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ের দিকে পুত্রের এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া, তিনি বিশেষ আপত্তি করিলেন না। ইহাও ভাবিলেন, মন্দই বা কি? নূতন একটা দিকে যদি উন্নতি করিতে পারে, অর্থ, নাম ও যশ সবই হইবে।

শ্রীশ কলিকাতায় গিয়া কোনও বড় ইঞ্জিনিয়ারী কারখানায় শিক্ষানবীশ সহকারীরূপে প্রবেশ করিল। সেই কারখানাতেই একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে রহিল। ইতিমধ্যে সে বড় সরকারী চাকরা পাইয়াছিল, কিন্তু সবিনয়ে শ্রীশ বিভাগীয় রাজপুরুষকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইল, বড় সরকারী চাকরী করিতে পারা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনও রূপ ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবেশকরাই তার আন্তরিক ইচ্ছা। সেই অভিপ্রায়েই সে ইঞ্জিনীয়ারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, এখন সেইরূপ চেষ্টাই করিতেছে। অতএব সে প্রার্থনা করে যে রাজপুরুষ তাহাকে সেইরূপ অনুমতি দিবেন।

বড় সরকারী চাকরীর প্রতি এরূপ বিতৃষ্ণা শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গীয় যুবাদের মধ্যে দেখা যায় না বলিলেই হয়। রাজপুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশের বিশেষ প্রশংসা এবং তাহার চেষ্টার সফলতা কামনা করিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন।

শ্রীশ স্ত্রীকে এবং শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল, সে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং অবসর হইলেই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবে। কিছু অবসর পাইবামাত্রই কোনও শনিবারে শ্রীশ শ্বশুরালয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর শ্যালিকা ও শ্যালক বধূদের সঙ্গে হাসিগল্পে গানবাজনায় শ্রীশের সময়টা কাটিল না মন্দ। ইহাদের সাহেবী আদবকায়দায় শ্রীশের

অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না,—কিন্তু তাহাতে শ্রীশের বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠার লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। তার সরল স্বাধীন অকুণ্ঠিত ভাবে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকোচিত নিঃসঙ্কোচে শিষ্ট সামাজিকতায়, তাহাদের প্রশংসা লাভের আশায় আপনাকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করিয়া আপনারই বিশেষত্বে একটা সগৌরব দৃঢ়তায়, তাহারাই বরং কুণ্ঠিত হইতেছিল। নীলিমাও সেখানে উপস্থিত ছিল। শ্রীশ সরল সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসি গল্প করিতেছে,— অথচ তার আলাপে ভাবে ও ব্যবহারে আপনার খাঁটি বাঙ্গালী শিষ্টাচারের মহিমা, তাহাদের সাহেবী শিষ্টাচারের উপরে এমনই ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতেছে,—যে নীলিমা যেন তার প্রভাবে একেবারে এতটুকু হইয়া যাইতেছিল,—তার প্রাণের সকল শ্রদ্ধা যেন স্বামীর সরল নির্ভীক্ তেজোময় বাঙ্গালীত্বের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। স্বভাবতঃই এমন একটা নূতন দীনতায় ও লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হইতেছিল,—যাহা আর কখনও সে অনুভব করে নাই। তেমন করিয়া মুখ তুলিয়া সে শ্রীশের পানে চাহিতে পারিতেছিল না,—তেমন মুখ ফুটিয়া তার সঙ্গে কথাও বলিতে পারিতেছিল না।

আহারের সময় হইল। সকলে মিলিয়া টেবিলে তাহাকে লইয়া বসিয়া খাইবে, ইচ্ছাসত্ত্বেও এরূপ প্রস্তাব করিতে কাহারও ভরসা হইল না। অন্তঃপুরে শ্রীশের আহারের স্থান হইল,—শাশুড়ী নিজে তাহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিয়া দিলেন। শ্যালিকা ও শ্যালকবধূরা কাছে মাটিতে বসিয়া দেখিল,—নীলিমা সলজ্জভাবে দ্বারের বাহিরে একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীশ কাহাকেও কিছু বলে নাই,—এগৃহের কোনও চালচলনে কোনওরূপ অসন্তোষের ভাবও দেখায় নাই। তাহার ব্যবহারে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইতেছিল, যেন সে ভাবিতেছে,—তোমাদের চালচলন ধরণ যেমন আছে থাক, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার চালচলন ধরণ আমার—আমার তাই বেশ। তোমাদের খাতিরে তা আমি এতটুকু খাট করিব না। এতটাও সে ভাবিয়াছে, কি না, কে জানে! ভাবুক আর নাই ভাবুক, তার ব্যবহার হইতে ইহার বেশী কিছুই প্রকাশ পায় নাই। যাহাই হউক, একটি দিন একটু কালের তরেও সাহেব সুখেন্দু-বাবুর ঘরে—যেন বাঙ্গালীর গৃহস্থঘরে বাঙ্গালী জামাই আসিয়াছে—এমন বোধ হইল।

[৬]

"তুমি চাকরীটা ছেড়ে দিলে ?"

বিনীতভাবে শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ বলিল, "আজ্ঞে হা।"

পরদিন সকালে শ্বশুরের লাইব্রেরী ঘরে, শ্বশুর জামাতায় আলাপ হইতেছিল।

শ্বশুর কহিলেন, "এটা কি ভাল হ'ল ? নিশ্চিত একটা উচ্চপদ আর উচ্চ আয় এতে হ'ত। ব্যবসা ট্যাবসা—ওকি ভদ্রলোকের ছেলের হয় ?"

শ্রীশ সলজ্জভাবে একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তেমন চেষ্টা না ক'রে কি ক'রে বলা যায় যে হয় না, কি হবে না ?"

শ্বশুর একটু ভাবিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "হঁা—ভাল ইঞ্জিনিয়ারী ফার্ম্ম—যদি হয়—বেশ আয় হ'তে পারে, আর পদমর্য্যাদাও মন্দ হবে না। কিন্তু যদি না হয়,—"

শ্বশুর একটি সিগারেট ধরাইয়া কেস্‌ ও দিয়াশলাই শ্রীশের দিকে সরাইয়া দিলেন। শ্রীশ বড় সঙ্কুচিত বোধ করিল।

"বেশ্‌! খাওনা! এতে আর লজ্জার কি ? যদি খাও, আমার সাম্‌নেই বা কেন খাবে না ?"

শ্রীশ লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিল, "আমি খাই না।"

"হুঁ!—তা যদি ব্যবসায়ে সুবিধে না হয়, তবে কি ক'র্‌বে ? নিশ্চিত ছেড়ে এমন অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া কি ভাল হ'ল ?"

শ্রীশ কহিল, "এটা এমন অনিশ্চিত মনে করি না। তবে ব্যবসার কথা কিছুই বলা যায় না। যদি বড় রকম কিছু না হয়, ক'ত্তে না-ই পারি, যে ভাবে হয়, খাট্‌তে পাল্লে কিছু ক'রে খেতে পারবই।"

"তা কি এই সরকারীর চাইতে ভাল হবে ?"

"আয়ের হিসাবে না হওয়ারই সম্ভব।"

"তবে ?"

"তবে—ক্ষতিই বা কি এমন ? মোটা ভাত কাপড়ের ত অভাব হবে না ?"

মোটা ভাত কাপড়! ছেলেটা বলে কি ? তাঁর মেয়ের জন্যে শেষে মোটা ভাত কাপড়! সুখেন্দুবাবু একটু ভ্রূকুটি করিলেন। তিনি আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ধীরে ধীরে তা টানিতে টানিতে বলিলেন;

"তা—তোমার বিলেত গেলেও ত বেশ হ'ত! চেষ্টা ক'ল্লে সরকারী বৃত্তিও পেতে পার। নাই যদি পাও, তাতেও আট্‌কাবে না, আমি———"

শ্রীশ কহিল, "আজ্ঞে, এখনই বিলেত যাবার ত কোনও দরকার দেখিনে। মিছে একরাশি টাকা নষ্ট ক'রে কি হবে?"

"এখনই—দরকার—দেখ না! সে কি! এর পর আর কবে যাবে? তখন গিয়েই বা কি হবে?"

শ্রীশ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, এখানে যতটা শিখেছি,—তার দ্বারা কি করা যেতে পারে, আগে তাই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। যদি ঠেকি, বুঝ্‌তে পারব, বিলেতে কোনও কলেজে বা কারখানায় ঢুকে, ঠিক কি শিখে কোন্‌ অভাবটা পূরণ ক'রে আস্‌তে হবে। সেটা ত এখনই গেলে বুঝতে পারব না, মিছে টাকা খরচ ক'রে লাভ কি?"

সুখেন্দুবাবু কহিলেন, "হাঁ, খাঁটি ব্যবসার হিসাবে একথা সত্য বটে। কিন্তু—যাক্‌, তবে ব্যবসাই ক'রবে, এই কি একেবারেই স্থির ক'রেছ? আর ব্যবসার সুবিধের জন্যে দরকার না হ'লে বিলেতে পড়্‌তে যাবে না?"

"আজ্ঞে, আপাততঃ তাই সংকল্প বটে।"

"কতদিনে এতে বেশ ভদ্রলোকের মত আয় হ'তে পারবে মনে কর, যাতে 'ডিসেণ্ট ষ্টাইলে' থাকৃতে পার?"

"আজ্ঞে, তা ব'লতে পারি না। আপনি যাকে 'ডিসেণ্ট' মনে করেন, তা হয়ত নাও হ'তে পারে।"

"নাও—হ'তে পারে? হুঁ!—"

সুখেন্দুবাবু একটা চুরুট ধরাইলেন। ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটে নীরবে কিছুকাল চুরুট টানিয়া কহিলেন,—"নীলিমাকে তবে কি ক'র্‌বে?"

"কি ক'রব! আপনি কি বলেন?"

"সে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, উচ্চ পরিমার্জ্জিত ধরণে প্রতিপালিত হ'য়েছে। সে ত যেমন তেমন ভাবে সাধারণ মেয়েদের মত থাকৃতে পার্‌বে না? তার শিক্ষার ও অভ্যাসের উপযোগী ধরণের জীবনেই ত তাকে তোমার রাখ্‌তে হবে। তোমার গৃহস্থালী সেইভাবেই গ'ড়ে নিতে হবে!"

শ্রীশ বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, তা কি ক'রে সম্ভব হয়? আমাদের বাড়ীর চালচলন একরকম আছে,—তা বদলাতে পারি, এমন সাধ্যও আমার নাই, এমন ইচ্ছাও বোধহয় কখনও হবে না।"

শ্বশুর ঈষৎ রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "তোমাদের বাড়ীর চালচলন বদলাতে কে বল্‌ছে গো! বাড়ীর লোকজন সব যে ভাবে আছে, থাক্‌না! তোমার নিজের আলাদা একটা গৃহস্থালীর কথা বল্‌ছি। তা ত তোমার ক'রেই নিতে হবে! তুমি কখনও এটা মনে ক'ত্তে পার না যে, নীলিমা তোমাদের ওই সেকেলে চালের গ্রাম্য ঘরে গিয়ে থাক্‌তে পারে!"

"যতটা দেখেছি, তাতে তা মনে করা কঠিন বটে!"

"তবে?"

"তবে আমি তার জন্য—আজ থেকে মাসে হাজার টাকা আয় হলেও—নিজের বাড়ীঘর মা বাপ ভাই সব ছেড়ে, বড় চালের একটা আলাদা সংসার পাতিয়ে নিতে পারি না।"

"কেন?"

"সেরূপ আমার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয় না,—প্রয়োজনও মনে করি না।"

"বটে! তবে নীলিমার কি ক'রে চ'লবে? তার মতই ত তাকে তোমার রাখ্‌তে হবে?"

"আজ্ঞে, আমি তাও মনে করি না। আমি মনে করি স্ত্রীকেই স্বামীর চালে স্বামীর ঘরে থাক্‌তে হয়। স্বামীকে যে স্ত্রীর খাতিরে, নিজের চাল ছেড়ে তার বাপের ঘরে চালর ধ'র্‌তে হবে—এমন নিয়ম এ দেশে ত নাই?"

সুখেন্দুবাবু উত্তর করিলেন, "এদেশে মেয়েদের জন্য কি সুনিয়মই বা আছে? তা নীলিমা যদি তোমার চালে আপনাকে খাট ক'রে নিতে না পারে?"

"না পারে—তাকে আমি জোর ক'রে বাধ্য ক'ত্তে চাই না।"

"ভাল! তবে সে কোথায় কি ভাবে থাকবে?"

"আমার ঘরে আমি যে ভাবে থাকি, তা যদি তাঁর না পোষায়, তিনি এখানেই থাক্‌তে পারেন।"

সুখেন্দুবাবু বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, "বিবাহ ক'রে স্ত্রীকে শ্বশুরের ঘাড়ে ফেলে রাখবে, এটা তোমার মত শিক্ষিত পুরুষের যোগ্য কথা বটে!"

শ্রীশেরও একটু রাগ হইল,—সে কহিল, "আমি তা চাইনে। স্ত্রীলোকের একা থাকা চলে না, তাই এখানে রাখ্‌তে চাই। আর প্রতিপালনের ব্যয় আমিই বহন ক'র্‌ব।"

সুখেন্দুবাবু মুখের চুরুট হাতে ধরিয়া বিস্মিতভাবে জামাতার দিকে

চাহিলেন,—চাহিয়া কহিলেন, "তাতে যে ব্যয় প'ড়বে, তা কোত্থেকে আস্‌বে?"

শ্রীশ উত্তর করিল "সেটা আমার বুঝ, আমি বুঝ্‌ব।"

"হুঃ—বলি তাতে ব্যয় কম প'ড়বে না,—তার চাইতে দুজনে একত্র থাকলে ভাল হয় না?"

শ্রীশ উত্তর করিল, "আজ্ঞে ব্যয়ের হিসাব আমি ক'চ্চি না। এতে আমার আপত্তির কারণ আলাদা।"

সুখেন্দুবাবু দেখিলেন, ইহার সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা বাক্যব্যয়। নীলিমার ভাগ্যে দুঃখ আছে, নহিলে ছেলের চরিত্র ও মতিগতির অনুসন্ধান না করিয়া,—কেবল বাহিরের শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া এমন হতভাগা ঘরের হতভাগা ছেলের হাতে তিনি সোণার নীলিমাকে সঁপিয়া দিবেন কেন? মনে মনে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

[৭]

স্বামীর সঙ্গে পিতার যে আলোচনা হইল, নীলিমা পাশের ঘর হইতে সব শুনিল। পিতা যখন স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, নীলিমার আপনা হইতেই মনে হইল, তারই সম্বন্ধে কিছু কথার জন্যই তিনি ডাকিয়াছেন। কি কথা হয়, শুনিবার জন্য তার অদম্য একটা কৌতুহল হইল। সে গৃহের পাশের দরজায় একটা পরদার আড়ালে গিয়া বসিল। স্বামীতে ও পিতাতে সমস্ত আলোচনা শুনিল।

প্রথম হইতেই স্বামীর প্রতি নীলিমার চিত্ত হইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতেছিল। যতই সে শ্রীশকে দেখিতেছিল, ততই তার সহজ ও সতেজ পুরুষোচিত দৃঢ়তার নিকট তার কোমল নারী-স্বভাব নত হইয়া আসিতেছিল,—যেন তাহাতেই আশ্রিত হইয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, তার নারী-জীবনের একটা তৃপ্তি হইতে পারে এমনও তার মধ্যে মধ্যে মনে হইত। বিবাহের পরেই স্বামীর গৃহে গিয়া নীলিমা যেভাবে চলিয়াছে, দিগম্বরী তার পক্ষে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যে নিতান্তই অশোভন ও অশিষ্ট হইয়াছে, তাহা নীলিমা বুঝিয়াছিল। কিন্তু স্বামী এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু বলেন নাই,—কোনও রূপ অসন্তোষের চিহ্নও সে স্বামীর ব্যবহারে লক্ষ্য করে নাই। প্রথম দিন হইতেই সমান একটা সস্নেহ সরস প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার

সে স্বামীর নিকট পাইতেছে,—অথচ তার মধ্যে স্ত্রীর মন রাখিতে একটা অতিরিক্ত ব্যগ্রতা, স্ত্রীর রুচিমত আপনার চালচলন কোনও ভাবে একটু পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা, নিজগৃহের গ্রাম্যতা ও প্রাচীনতার জন্য কখনও কোনও রূপ একটু সঙ্কোচভাব, সে স্বামীতে দেখে নাই। স্বামী যেন আপন গৌরবে আপনভাবে আপন গৃহে অধিষ্ঠিত। স্ত্রীর মত যেমন হউক, তার জন্য তাঁর গৃহের, তাঁর ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। স্বাধীন শক্তিমান্ কোন রাজা বিদেশিনী কোনও রূপসীকে বিবাহ করিয়া আনিয়া তার বিদেশী চালচলন যে ভাবে যে চোকে দেখেন, শ্রীশ যেন নীলিমার সাহেবী ধরণের চালচলন সেই ভাবে সেই চোকেই দেখিত। তার বেশী কিছু নয়। আপনার গৃহের উপযোগী তাহাকে করিয়া লইবার জন্য ইহার পরিবর্ত্তনে বিশেষ একটা আয়াস স্বীকার করিবার প্রয়োজনও যেন সে বোধ করে না। নীলিমা আপনা হইতে যদি করে ভাল, না করে ক্ষতি নাই,—সে যেন এই রকমই মনে করিত। নীলিমাকে সে ভালবাসিবে, স্নেহ করিবে—তার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য আছে তাহাও পালন করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া একমাত্র নীলিমার সুখ, নীলিমার সেবার জন্যই সে তার জীবনধারণ করে না, সংসারে তাহাই তার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করি না। নীলিমা বিবাহের আগে ভাবিয়াছিল,—তার উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত রুচির মত করিয়াই স্বামী আপনার জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া নিবেন। সবাই ত তাই করে। কিন্তু এখন সে অনুভব করিল, তারই মনের গতি যেন তারই জীবনটাকে স্বামীর মতানুবর্ত্তী করিবার দিকে ধাইতেছে। স্বামীর মনোভাব—নিজের আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, স্বাধীন সগৌরব একটা পুরুষোচিত তেজস্বিতা—নীলিমা পূর্ব্ব হইতেই অস্পষ্ট অনুভব করিতেছিল। এখন স্পষ্ট ভাবেই স্বামীর মতপ্রকাশ সে শুনিল। শ্রীশ যদি নীলিমার দোষ ধরিত, যদি সদম্ভে স্বামীর দাবীতে বলিত, নীলিমাকে তার গৃহে তাদেরই চালচলনের অনুবর্ত্তী হইয়াই থাকিতে হইবে, তবে হয় ত নীলিমার হৃদয়ে একটা বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হইত। কিন্তু শ্রীশ সেরূপ কোনও কথা ইঙ্গিতেও বলে নাই। নীলিমা যেরূপ জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেইরূপ জীবনেই তাহাকে প্রতিপালন করিতে সে প্রস্তুত। কেবল স্ত্রীর জন্য সে নিজের জীবনের ধরণ পরিবর্ত্তন করিতে চায় না। আর তাই কি ঠিক্? এমন একটা দাবী করিবার কি অধিকার নীলিমার আছে? আজ প্রথম নীলিমার

মনে হইল, পুরুষ কখনও স্ত্রীর জন্য আপন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। স্ত্রীকেই স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে হয়। স্বামী স্বামীই থাকিবেন, স্বামিত্বেই তাঁকে শোভা পায়। স্বামী কখনও স্ত্রীর স্ত্রী হইতে পারে না,—স্ত্রীকেও স্বামীর স্বামী হইলে মানায় না। সে বুঝিল, যদি স্বামীর সঙ্গ তার অভিপ্রেত হয়, তবে তাকে স্বামীর ঘরে স্বামীর স্ত্রী হইয়া, শ্বশুরের ঘরে শ্বশুরের বধূ হইয়াই, থাকিতে হইবে। সে চক্ষু বুজিয়া নিজের প্রাণের দিকে চাহিল, দেখিল প্রাণ ভরিয়া তার স্বামীর মূর্ত্তিই বিরাজ করিতেছে! ছি, কোন্ ছার সুখের আশায় স্বামী ছাড়িয়া সে পিতার ঘরে রহিবে? কি এমন অসুবিধা তার সেখানে হইবে? তার যায়েরা ত বেশ সুখেই আছে, তাদের সঙ্গে সে কি সুখে থাকিতে পারিবে না? অভ্যাস কিছু ছাড়িতে হইবে,—যা ছাড়িতে হইবে, তা সব বাজে বাবুয়ানা অভ্যাস,—শিক্ষায় তার উন্নতির চেষ্টায় স্বামী কখনও বাদী হইবেন না। স্বামীর জন্য, স্বামীর সংসারে সুখে থাকিবার জন্য, ওসব বাজে বাবুয়ানা অভ্যাস কি সে ছাড়িতে পারিবে না? যদি না পারিবে, বৃথাই সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। স্বামী যে ভাবে জীবন যাপন করিতে চান, তা বাঙ্গালী গৃহস্থজীবন, সাহেবী ধরণের বাবুয়ানা জীবনের চাইতে বাঙ্গালী গৃহস্থের অন্যের সেবায় নিয়ত কর্ম্মময়, বিলাস ও আড়ম্বর বিহীন জীবন এমন মন্দই বা হইবে কেন? হয় ত জীবনে অধিকতর সার্থকতা তাহাতেই পাওয়া যাইবে। উন্নত শিক্ষার সঙ্গে সে জীবনের অসামঞ্জস্যই বা হইবে কেন? তার স্বামী ত তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তাঁর তুলনায় সে আর কতটুকু কি ছাই শিখিয়াছে! তিনি যদি বাঙ্গালী গৃহস্থজীবনে সুখে চলিতে পারেন, সে কেন গৃহস্থবধূ হইয়া চলিতে পারিবে না? নীলিমা স্থির করিল, সে পিতৃগৃহে থাকিবে না—স্বামীর সঙ্গে স্বামীর গৃহে যাইবে; সেখানে যে ভাবে চলিলে স্বামী সুখী হইবেন, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি সকলে তাহার বধূ জীবনে আনন্দিত হইবেন, সে তাহাই করিবে।

[৮]

রাত্রিতে আহারাদির পর শ্রীশ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একখানা পুস্তক দেখিতেছিল। নীলিমা ঘরে আসিল। শ্রীশ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রীত ও প্রফুল্ল নয়নে একটু বড় মধুর হাসিয়া তাকে সম্ভাষণ করিল। নীলিমা সলজ্জ দৃষ্টি নত করিয়া শ্রীশের পায়ের কাছে শয্যার প্রান্তে বসিল। শ্রীশ উঠিয়া স্নেহে নীলিমার হাত ধরিয়া কাছে সরাইয়া বসাইল।

নীলিমা কহিল, "একটা কথা তোমায় ব'লব।"

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "মোটে একটা কথা! একটা কথা ত এক কথাতেই ফুরিয়ে যাবে, তারপর রাতটা কাটাব কি ক'রে তবে?"

নীলিমা আরক্ত মুখখানি নত করিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "না—না! ঠাট্টা নয়—সত্যি একটি কথা ব'লব!"

"আর বাকী কি সব তবে মিথ্যে ব'লবে?"

"তুমি কেবল ঠাট্টাই ক'র্‌বে,—আমার কথা তবে শুন্‌বে না?"

"শুন্‌বনা! বল কি? তোমার কথা শুন্‌ব ব'লেই না এসেছি। ঠাট্টা—ওটা আমার স্বভাব! বল, কি কথা।"

নীলিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বাবার সঙ্গে সকালে তোমার যে কথা হ'চ্ছিল———"

"হুঁ—তার কি?"

"আমি তা সব শুনেছি।"

"আড়ালে দাঁড়িয়ে বুঝি!"

"হাঁ।"

"সেটা ত ভাল হয় নি নীলু!"

"কেন?"

শ্রীশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আড়ালে দাঁড়িয়ে পরের কথা শোনা যে খুব দোষ ব'লে পুস্তকে লেখে!"

"তুমি আবার ঠাট্টা ক'চ্চ! তা পুস্তকে যাই লিখুক,—আমার সে কথা শোনায় কোনও দোষ হয় নাই।"

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। শ্রীশ অতি মধুর চটুল হাস্যময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীলিমার মুখপানে চাহিয়া আছে। নীলিমা আবার লজ্জায় মুখ নত করিল। শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

নীলিমা কহিল, "আমি এখানে থাক্‌ব না!"

"কোথায় যাবে।"

"তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে।"

শ্রীশের মুখ হইতে সেই লঘু ও চটুল হাসির ভাব দূর হইল। কেমন একটা আনন্দের উজ্জ্বল গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিল। শ্রীশ নীলিমার মুখপানে চাহিয়া রহিল

ঘরের লক্ষ্মী।

নীলিমা কহিল, "আমায় কি নিয়ে যাবে না ?"

"নীলিমা !"

"উঁ !"

"আমার সব কথা শুনেছ ?"

'হাঁ !"

"সব ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ ?"

"হাঁ, দেখেছি।"

"থাক্‌তে পার্‌বে ত ?"

"পারব, যদি ভুল করি, আমায় কি শিখিয়ে নেবে না ?"

নীলিমা ছলছল চোকে শ্রীশের পানে চাহিল। শ্রীশ নীলিমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল,—আনন্দের আবেগে কহিল, "নীলিমা,—এর চাইতে সুখ সংসারী জীবনে আর কিছু আমি মনে ক'ত্তে পারি না। নীলিমা, রাগ ক'রোনা, এতদিন তোমায় কতকটা—যেন খেলার পুতুলের মত মনে হ'য়েছে। কিন্তু আজ সত্য সত্যই আমার স্ত্রী ব'লে, সহধর্ম্মিণী ব'লে, তোমাকে আমার সারা বুক ভ'রে পাচ্চি।"

শ্রীশ আরও আবেগে নীলিমাকে ব'ক্ষে চাপিয়া ধরিল,—নীলিমার আনন্দাশ্রুতে শ্রীশের আনন্দোৎফুল্ল বক্ষ প্লাবিত হইল।

* * * * *

পর সপ্তাহের শনিবারে শ্রীশ নীলিমাকে লইয়া গৃহে গেল। মাতাকে শ্রীশ পূর্ব্বেই সব লিখিয়াছিল। গৃহে পৌঁছিয়াই মাতাকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ কহিল, "মা, এই নেও—তোমার গেরস্ত ঘরে গেরস্ত বউ ফিরে এল।"

সুখদাসুন্দরী প্রণতা বধূকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "এস মা—আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস !—আমার আর আর লক্ষ্মীদের সঙ্গে মিলে লক্ষ্মীতে আমার ঘর ভ'রে রাখ !"

নীলিমা সলজ্জ মৃদুস্বরে কহিল, "মা ! আমার কোনও দোষ মনে রেখ না। পদে পদে আরও কত দোষ হবে,—আমি কিছুই জানিনি মা, আমায় শিখিয়ে তোমার দাসীর মত ক'রে নিও।"

শাশুড়ী অতি স্নেহে বধূর মুখখানি ধরিয়া তার ললাটে চুম্বন করিলেন।

ডাক্তারের দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।]

এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলাম। যে কার্য্যেই আমি হস্তক্ষেপ করি, তাহাই নিষ্ফল হইয়া যায়। সময় সময় যে সৌভাগ্যের ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহাও যেন শুধু মরিচীকাবৎ নৈরাশ্য উৎপাদন ও দুর্দ্দশার কঠোরতা বৃদ্ধির জন্যই ঘটিয়া থাকে। আমার তহবিল অবশেষে তিন হাজার পাউণ্ড হইতে নগদ পঁচিশ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। খুচরা দেনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল এক শত পাউণ্ডেরও অধিক—তাহা ছাড়া ছয় মাস পরে বৃদ্ধ ল—কে দিতে হইবে আরও দুই শত পঁচিশ পাউণ্ড! এদিকে আবার আমার পত্নীর ও নবপ্রসূতা কন্যার অসুস্থতা বশতঃ নূতন একটি ব্যয়ের আবির্ভাবও হইল। আমাদের দারিদ্র্য ও হীনাবস্থা লক্ষ্য করিয়া, দৈহিক অসুস্থতা সত্বেও আমার বুদ্ধিমতী সুশীলা পত্নী, আমাদের একমাত্র দাসীটিকে অবসর প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। অসহ্য যাতনায় প্রবল বেগে আমার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি বাহু পাশে পত্নীর শীর্ণ দেহ আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে, এইরূপ পুণ্যময় সদ্‌গুণ-রাশি বিভূষিত জীবন কখনই ভগবান্ দাসত্বের হীনতা দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে দিবেন না। মুখে আমি ঐরূপ বলিলাম বটে, কিন্তু অন্তরে আমার দারুণ সন্দেহ হইতেছিল—না জানি ইহা অপেক্ষাও কতদূর শোচনীয় পরিণাম তাঁহার অলক্ষ্যে ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আমার ক্ষুদ্র বৈঠকখানার অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া প্রায়ই আমি আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতাম—এবং চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে হৃদয়ের আবেগের প্রবাল্যে প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিতাম। আর কাহার দিকে আমি সাহায্যের জন্য তাকাইব? এই সংসারে ইহার প্রতিকারের কি উপায় আছে? হা ভগবান, তুমিই মাত্র জান, আমি আমার নিজের জন্য চিন্তিত নহি, আমার সর্ব্বনাশের সহিত আমার পত্নী ও শিশু

বালিকার সর্ব্বনাশ চিন্তা করিয়াই এই দুর্ব্বল হৃদয়ে অশেষ যাতনা অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান বিপদে এখন কর্ত্তব্য কি—ইহাই আমার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইল; খ্রীষ্টমাস সমাগত প্রায়, ল—তাহার সুদের জন্য এবং অন্যান্য পাওনাদারগণ তাহাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাগাদায় আসিবে, তখন আমি কি করিব? এই সকল ভাবিয়া যখন আমি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম, তখনই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ঘোর বিষাদময় কুজ্ঝটিকার আবির্ভাব হইত। আমার হিতৈষী, দয়ালু বন্ধু লর্ড— তখন পর্য্যন্ত বিদেশেই ছিলেন। তিনি কোথায় রহিয়াছেন—কোন ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র দিলে তিনি পাইবেন, তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার ভৃত্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা জানে না বলিয়া আমার নিকট সত্য গোপন করিত। অগত্যা তাঁহার অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত পাঠাইবার জন্য আমি বহুবার তাঁহার সহরের বাটীতে পত্র রাখিয়া আসিতাম, কিন্তু তাহার এক খানিরও উত্তর পাই নাই। বোধ হয় আমার পত্রগুলি খুলিয়া দেখা হইত, এবং ভিক্ষার্থীর যাচ্ঞা-পত্র বলিয়া পোড়াইয়া ফেলা হইত।

আমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম আমাদের ব্যারনেট উপাধি প্রাপ্ত অর্থশালী এক দুর সম্পর্কিয় জ্ঞাতি কে ছিলেন এবং তিনি শুধু রূপ দেখিয়া আমাদের এক দূরসম্পর্কিতা আত্মীয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়া ছিলাম, তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং আমাদের সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না। একবার আমার পিতার সহিতও তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিয়াছিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার অদৃষ্টেও ঐ দশা ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনার পরেও, আমার সঞ্চিত দুর্ভাগ্যসমূহের ভীষণ পীড়নে ইহাঁর নিকট আমার নিরতিশয় দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া, পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য সহস্রবার আমার হৃদয়ে প্রবলাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। স্বভাবতঃই মনে হইত, আমাদের এই অপরিসীম দুর্গতির কাহিনী অবগত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দ্রব হইবে। কিন্তু তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেই আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত এবং আমাদের দুরবস্থা সম্যক্ রূপে জ্ঞাপন ও তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, এইরূপ উপযুক্ত ভাষা আমি বহু চেষ্টাতেও জুটাইতে পারিতাম না। তথাপি অতিশয় অনিচ্ছা স্বত্বেও, ঐরূপ একখানি পত্র আমি তাঁহার পত্নী লেডি—র

সমীপে লিখিলাম। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রকৃতিও তাঁহার স্বামীরই অনুরূপ ছিল। তিনি তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক সৌখীন সহরে গ্রীষ্মাতিবাহিত করিতে গিয়াছিলেন।—তথা হইতে নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন ;—

"লেডি—ডাক্তার—কে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন পূর্ব্বক জানাইতেছেন যে তিনি ডাক্তার——র পত্র পাইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ডাক্তার——কে এই পত্রাভ্যন্তরে আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ পাঠাইতেছেন। সার—র আর্থিক ব্যাপারে সাময়িক অসুবিধা নিবন্ধন ইহা প্রেরণে কতকটা ক্লেশানুভব করিতে হইয়াছে ; অতএব তিনি ডাক্তার——কে দুঃখের সহিত অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছেন যে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রার্থনা করিতে ডাক্তার মহাশয় যেন বিরত হন। সহরে অবস্থান কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা লেডি——প্রত্যাখ্যান করিতে প্রার্থনা করিতেছেন ; কারণ, যে পারিবারিক চিকিৎসক বহুকাল অবধি পরিবারবর্গের চিকিৎসা করিতেছেন, লেডি—অথবা সার—তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।"

পত্রাভ্যন্তরে দশ পাউণ্ডের নোট ছিল। এইরূপ সহানুভূতিশূন্য পত্র পাইয়া ঘৃণা ও বিরক্তিতে তৎক্ষণাৎ আমি উহা একখানি খামে পূরিয়া ফেরৎ পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার পত্নীর রক্তশূণ্য, শীর্ণ পাণ্ডু মুখ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমার অভিমান দূর হইয়া গেল,—আমি উহা রাখিলাম। যাহা হউক আমার এই প্রার্থনাপত্রের পরিণাম দেখিয়া এবং ইতিপূর্ব্বে সার——র সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া যেরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া পুনরায় ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার চিন্তাও মনে স্থান দিতে আমার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের তাড়নায় মানুষ কোন্ কার্য্যই বা করিতে বাধ্য না হয়? আমারও তাহাই হইল। অবশেষে আমি সার——র সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। একদিন আমার পত্নীর নিকট আমার ইচ্ছা গোপন করিয়া এতদুদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তখন মধ্যাহ্ন সমাগত প্রায়। সূর্য্যের কিরণে দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। আমি যে জনসঙ্ঘ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম, তাহাদের সকলেই যেন প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট। মেঘমুক্ত আকাশ দর্শনে সকলেই যেন নবজীবন প্রাপ্ত এবং তাহাদের স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাহারা সকলেই স্ব স্ব ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিযুক্ত। এদিকে আমার

হৃদয় কিন্তু ভাবী নৈরাশ্যের আশঙ্কায় বিকম্পিত। আমি আশা শূন্য হইয়াও শুধু আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য -এই দ্বারও যে আমার নিকট অবরুদ্ধ, তাহাই শুধু ভালরূপে জানিবার জন্য—স্থিরসংকল্প হইয়া যাইতেছিলাম। যখন আমি—প্লেসে প্রবেশ করিলাম, তখন আমার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল! দেখিলাম বহু অট্টালিকা দ্বারে সুসজ্জিত শকটশ্রেণী অপেক্ষা করিতেছে। এই সকল বিলাসনিকেতন হইতে আমার ন্যায় হীন দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিব ক্রোধব্যঞ্জক বিকট ভ্রূভঙ্গি লাভ করিয়াই অপসৃত হইতে হয়! এই অবস্থায় আমি কোন্ সাহসেই বা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভৃত্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য দরজায় আঘাত করি? শুনিলে পাঠক বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না যে তথা হইতে ফিরিয়া আমি পার্শ্বস্থ একটি গলিতে প্রবেশ করিয়া মনের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য ছোট এক গ্লাস বলকারক পানীয় পান না করিয়া পরিলাম না। তারপর পুনরায় আমি সাহস পূর্ব্বক,—প্লেসে প্রবেশ করিলাম এবং রাস্তার অপর পার্শ্বে সার—র বাটী দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, কয়েকজন ভৃত্য পোষাক খুলিয়া ভোজনাগারের গবাক্ষে হেলান দিয়া অলস ভাবে দাঁড়াইয়া পথিকদিগের সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। অপর কোন লোকই দৃষ্টিগোচর হইল না। এই লোকগুলিকে আমি তাহাদের প্রভুর মতই ভয় করিতাম। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং বৃথা চিন্তায় কালকর্ত্তনে ফল নাই মনে করিয়া আমি রাস্তা পার হইয়া দ্বারে সবলে আঘাত করিলাম, এবং দ্বারস্থ ঘণ্টাটি সহসা বাজাইয়া দিলাম। অমনি অতি স্থূলকায় এক দ্বাররক্ষক দরজা খুলিয়া দিল; কিন্তু আমাকে সামান্য একটি পথিকের ন্যায় দেখিয়া দরজাটি অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া দরজার থামে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া আমার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করিল। "সার—বাটীতে আছেন?"

গর্ব্বিত স্বরে উত্তর হইল "হাঁ, আছেন।"

"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

"আমার বোধ হয় না। তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, আজ প্রাতে ছয়টার সময় ডাচেস্ অব—র বাড়ী হইতে ফিরিয়াছেন।"

"আমি অপেক্ষা করিব,—আর এই কার্ডখানি তাঁহাকে দিবে কি?" কার্ডখানি তার হাতে দিয়া আমি আবার বলিলাম, "তাঁহাকে বলিও আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

সে পূর্ব্বের ন্যায় তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল,—"আপনি চারিটার সময় আসিতে পারেন না কি?"

বিরক্তি ও ঘৃণায় আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম না, "বাপু, আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে, আমি অপেক্ষাই করিব।"

একটা হাই তুলিয়া সে দরজা খুলিয়া দিয়া একটি চাকরকে ডাকিয়া আমাকে বসিবার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল, এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যে সার—এই মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন; প্রাতর্ভোজনে তাঁহার অন্ততঃ একঘণ্টা সময় লাগিবে; সুতরাং আমাকে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহাহউক, আমার কার্ড সে তাহার প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্তকুলের বরফাবৃত দুর্গম দ্বীপের পথ এইটুকু অতিক্রম করিতেই আমার উৎসাহ উদ্যম অনেকটা দমিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি আমি দৃঢ়সংকল্প হইয়া সার—র সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কত গাড়ী দ্বারে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের আরোহীগণ দ্বিতলে অবিলম্বে নীত হইতে লাগিলেন, আমি সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি তখন ঘণ্টা বাজাইয়া একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; আমাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করান হইতেছে কেন? সার—কে ত এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাঁর ত অবসরই রহিয়াছে।

"শপথ করিয়া বলিতে পারি মহাশয়, আমি কিছুই জানি না।" এই বলিয়া সে ধীরে দরজাটি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। ক্রোধে ও ক্ষোভে আমার শরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল! আমি আসনে উপবেশন করিলাম—আবার উঠিয়া কক্ষের ইতঃস্তত পাদচারণা করিলাম—অবশেষে পুনরায় আসন গ্রহণ করিলাম। কিয়ৎকাল পরেই ফরাসী পরিচারকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত করিতে সে আদেশ করিল। আমি অধীর হইয়া পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। পূর্ব্বের সেই ভৃত্যই আবার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কতই যেন ঘনিষ্ঠতার ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি দরকার। আমি কঠোর ভাবে বলিলাম "আমাকে উপরে সার—র নিকট লইয়া চল। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

সে একটু মুচকী হাসিয়া বলিল "সেটি কিছুতেই পারিব না, মহাশয়।"

কথা শুনিয়াই আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; আমি কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার কার্ড সার—কে দেখান হইয়াছিল ?"

সে উত্তর করিল, "আমি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব সে সার—র পরিচারককে কার্ড দিয়াছিল কি না ?" এই কথা বলিয়াই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া সে চলিয়া গেল।

প্রায় দশ মিনিট পরে একখানি গাড়ী আসিবার শব্দ পাইলাম! সিঁড়ি ও হল ঘরে খস্ খস্ মস্ মস্ শব্দ হইল। কে যেন বলিল "লর্ড—এখানে আসিলে বলিও, আমি তাঁহার বাড়ীতেই যাইতেছি।" কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গাড়ীর পাদান বন্ধ করিবার শব্দ হইল এবং গাড়ীখানা চলিয়া গেল। সব নিস্তব্ধ হইল। আমি পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। আবার সেই ভৃত্যই আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "সার—এখন অবসর হইয়াছেন কি ?"

সে বলিল, "তিনি যে বাহির হইয়া গেলেন, মহাশয়!"

সেই সময়ে ফরাসী পরিচারক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল,—ক্রোধে তখন আমার ওষ্ঠদ্বয় বিকম্পিত হইতেছিল; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সার—র সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না কেন ? দারোয়ান আমার নামের কার্ড তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল শুনিয়াছি, তবে এইরূপ হইবার কারণ কি ?"

সে বলিল "ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার সময় নাই' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

"আমাকে দরজা দেখাইয়া দাও", বলিয়া আমি উঠিলাম। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি অনাহারে প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়, তবু আর ইহার নিকট দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিব না। এই স্থলে পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ দূর ভবিষ্যতের একটি বিবরণ না দিয়া পারিলাম না। সার—জুয়াখেলায় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন এবং এই ঘটনার প্রায় দশবৎসর পরে উহাতেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যান। একদিন ক্রোধের প্রবল উত্তেজনায় সহসা মৃগীরোগগ্রস্থ হইয়া ইঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান এই স্বার্থপর, হৃদয়হীন ব্যক্তির উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

বিক্রমোর্ব্বশী

(শেষাংশ)

নিপুণিকা দেবী ঔশীনরীকে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। দেবী কহিলেন, "রাজা এখন কোথায় আছেন, দেখিয়া আয় ত ?"

নিপুণিকা বাহিরে গিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া আসিয়া জানাইল, রাজা মানবকের সঙ্গে প্রমোদবনে লতাগৃহে বসিয়া আছেন। দেবী নিপুণিকাকে লইয়া সেই দিকে গেলেন। লতাগৃহের নিকটে আসিয়া ঔশীনরী কহিলেন, "চল, লতাগৃহের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনি, উঁহারা কি বলিতেছেন ?"

সেই ভূর্জ্জপত্রখানি বাতাসে উড়িতে উড়িতে আসিয়া রাণীর নূপুরের উপরে পড়িল,—রাণী কহিলেন, "কি এটা নিপুণিকা ?" নিপুণিকা দেখিয়া কহিল, "এ যে একটা ভূর্জ্জপত্র !—কি আবার লেখাও রহিয়াছে।"

নিপুণিকা ভূর্জ্জপত্রখানি তুলিয়া নিয়া রাণীর হাতে দিয়া কহিল, "দেখুন ত পড়িয়া ইহাতে কি লেখা আছে ?"

"তুই আগে পড় ?"

নিপুণিকা পত্র পড়িয়া কহিল, "ওমা তাই ত ! এ যে উর্ব্বশীর পত্র ! শ্লোকে রাজাকে প্রেমপত্র লিখিয়াছে। মানবক ঠাকুরের অনবধানতায় বুঝি বাতাসে উড়িয়া আমাদেরই হাতে আসিয়া পড়িল !"

"বটে ! উর্ব্বশীর প্রেমপত্র ! আচ্ছা, তবে পড় ত পত্রখানা, কি লিখিয়াছে শুনি।"

নিপুণিকা পত্রখানি পড়িল। রাণী ক্রোধে ভ্রূকুটি করিলেন,—কহিলেন, "বটে ! আচ্ছা, চল্ তবে, এই উপহার লইয়া সেই অপ্সরা প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করি গিয়া।"

দুই জনে লতাগৃহের সম্মুখে আসিলেন। গৌতম পত্রখানির অন্বেষণ করিতেছিল, রাজা তার জন্য বিলাপ করিতেছিলেন।

ঔশীনরী রাজার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ! কেন এত ব্যাকুল হইতেছ ? এই নেও সেই ভূর্জ্জপত্র।"

রাজা লজ্জায় কোনদিকে যাইবেন, কি করিবেন, কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বিদূষক চুপি চুপি কহিল, "হায় হায় ! বামাল শুদ্ধ এবার চোর ধরা পড়িল। এখন আর বলিবেনই বা কি ?"

রাজা উঠিয়া রাণীর পদতলে পড়িয়া কহিলেন, "দেবী ! আমি তোমার নিকট চির অপরাধী। কিন্তু আমি আর কি বলিব,—প্রসন্ন হও, ক্রোধ সম্বরণ কর ! তুমি সেব্যা, আমি সেবক,—তুমি যদি কুপিত হও, নির্দ্দোষ হইলেও যে আমি দোষী !"

রাণী মনে মনে কহিলেন, "ধিক্ কপট ! আমি এমন লঘুহৃদয় নই যে তোমার এই অনুনয়ই আমি বড় মান বলিয়া মনে করিব। তবে এই ভয় পাই যে তোমার প্রতি এখন এই অকরুণ ভাব দেখাইয়া তার জন্য পাছে শেষে অনুতপ্ত হই।"

যাহা হউক মুখে তিনি বলিলেন, "তোমার অপরাধ কি মহারাজ ? আমিই অপরাধী—সম্মুখে থাকিয়া তোমার বিরক্তিই উৎপাদন করিতেছি, আমি যাই।—"

এই বলিয়া ঔশীনরী নিপুণিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদূষক কহিল, "তাই ত ! বর্ষার নদীর মত অপ্রসন্ন অবস্থাতেই যে দেবী চলিয়া গেলেন !"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দেবী ত অপ্রসন্ন হইবেনই ! এরূপ ব্যবহার এ স্থানে অসঙ্গত নয়। প্রেমশূন্য হৃদয়ে প্রিয়জন যতই কেন প্রিয়বচন বলুক না, রমণীর হৃদয় তা কখনও স্পর্শ করে না। মণিবেত্তা যেমন মণির কৃত্রিমরাগ ধরিয়া ফেলে,—অপ্রেমিকের প্রিয়বচনের কৃত্রিমতাও তেমনই প্রেমিকা নারীর নিকট ধরা পড়ে।"

বিদূষক কহিল, "যাই হক্, দেবী যে এখন চলিয়া গেলেন,—তোমার পক্ষে তা ভালই হইল। চক্ষুরোগ যার হইয়াছে, তার দীপশিখা সহে না।"

রাজা কহিলেন, "না-না,—অমন কথা কহিও না সখা ! উর্ব্বশীগত-প্রাণ হইলেও দেবী আমার বহু মানের পাত্রী। তবে দেবী আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়াই চলিয়া গেলেন,—আমিও ধৈর্য্য ধরিয়াই থাকিব,—দেখি, দেবী কি করেন।"

বিদূষক বলিয়া উঠিল, "থাক্ এখন তোমার ধৈর্য্য ! বুভুক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবনটা এখন একটু ধর ! স্নানভোজন সেবার সময় যে হইল !"

রাজা ঊর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন, "তাই ত ! দ্বিপ্রহর যে অতীত হইল। চল !"

উভয়ে উঠিলেন।

[৫]

ইন্দ্রপুরীতে অভিনয় হইতেছে। নাট্যগুরু ভরতমুনি সরস্বতীকৃত 'লক্ষ্মী স্বয়ম্বর 'কাব্য নাট্যকারে রচনা করিয়া অপ্সরাদের শিখাইয়াছিলেন। সেই নাটকের অভিনয় হইতেছে, ইন্দ্রসহ লোকপালগণ আনন্দে অভিনয় দেখিতেছেন। উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মেনকা তাঁহার সখী বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বয়ং নাট্যগুরু ভরতমুনি শিক্ষক, নৃত্যগীতাভিনয়নিপুণা অপ্সরারা অভিনেত্রী,—বড় সুন্দর অভিনয় হইতেছে! বারুণীরূপা মেনকা লক্ষ্মীরূপা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী! কেশবের সঙ্গে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ লোকপালগণ ঐ দেখ বসিয়া আছেন। বল ত কার প্রতি তোমার হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে?"

তখনও পুরুরবার মূর্ত্তিই উর্ব্বশীর হৃদয় ভরিয়া বিরাজ করিতেছে। অভিনয়ের শিক্ষায় উর্ব্বশীর উত্তর ছিল, পুরুষোত্তমের প্রতি। কিন্তু পুরুরবায় পূর্ণ হৃদয়া উর্ব্বশী বলিয়া ফেলিলেন, "পুরুরবার প্রতি!"

সহসা এই রসভঙ্গে ভরতমুনি বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি এই বলিয়া উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন, "আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিলি, এই দিব্যলোকে তোর স্থান হইবে না!"

যাহাহউক, আর কোনও বিঘ্ন ব্যতীত অভিনয় সমাপ্ত হইল। ইন্দ্রের চিত্তে উর্ব্বশীর প্রতি করুণাই হইয়াছিল। তিনি লজ্জাবনতমুখী উর্ব্বশীকে কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তুমি যাঁর প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি আমার রণসহায় পরম উপকারী মিত্র। আমারও কিছু উপকার তাঁর করা উচিত। ভরতমুনির অভিশাপে তোমাকে কিছুকাল এই দিব্যলোক ছাড়িয়া ভূলোকে থাকিতে হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি যাও, সেই রাজর্ষির স্ত্রী হইয়া তাঁর সঙ্গে বাস কর; যতদিন রাজর্ষি পুত্রমুখ দর্শন না করেন, ততদিন তাঁর কাছেই থাক।"

উর্ব্বশীর শাপে বর হইল। কৃতার্থ হইয়া তিনি বাসবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

[৬]

অন্যের প্রণয়লুব্ধ হইলেও রাজা স্বামী,—লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া স্বামী সানুনয়ে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া আসিলেন। ইহাতে দেবী ঔশীনরীর মনে বড় পরিতাপ হইল। তিনি

নিপুণিকার দ্বারা রাজার কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া পাঠাইলেন। তারপর কঞ্চুকীর দ্বারা আবার বলিয়া পাঠাইলেন, আমি একটা ব্রত করিতেছি,—আজ যখন চাঁদ উঠিবে, তখন মণিপ্রাসাদের ছাদে যেন আর্য্যপুত্রের দেখা পাই। তাঁর সঙ্গে বসিয়া আমি দেখিব কখন চাঁদে রোহিণীতে মিলন হয়।"

রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, দেবীর যেরূপ ইচ্ছা, তাই হইবে। তাঁকে গিয়া বল।"

সন্ধ্যা হইল,—রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া, বিদূষকের সঙ্গে গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় মনোহর স্ফটিকমণিশিলার সোপান অতিক্রম করিয়া মণিপ্রাসাদের ছাদে গিয়া উঠিলেন। তখন চাঁদ উঠিতেছিল, রাজা যুক্তকরে পিতামহ ভগবান্ চন্দ্রমাকে * নমস্কার করিলেন।

রাজা চন্দ্রালোকে ছাদে বসিয়া বিদূষকের সঙ্গে উর্ব্বশী-বিরহ-কাতর হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ব্রতের উপচারাদি হস্তে পরিজনসহ ব্রতবেশ-ধারিণী দেবী ঔশনরী আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা উঠিয়া সমাদরে দেবীকে কাছে বসাইলেন।

রাজা কহিলেন, "কিসের এ ব্রত করিতেছ দেবী ?"

রাণীর ইঙ্গিতে নিপুণিকা উত্তর করিল, "মহারাজ এব্রতের নাম 'প্রিয়-প্রসাদন।" রাজা রাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তার জন্য কোমলদেহে কেন এ ব্রতের ক্লেশ পাইতেছ দেবী ? তোমার প্রসাদের জন্যই যে আমি সতত উৎসুক,—আর কি 'প্রসাদন' তুমি করিবে ?"

ঔশীনরী হাসিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজ যে এমন মিষ্টকথা তুমি বলিতেছ, তাহা আমার ব্রতের প্রভাবই বলিতে হইবে।"

এই বলিয়া ঔশীনরী পরিচারিকাকে কহিলেন, "ব্রতের উপকরণ সব এদিকে লইয়া এস। এইখানে যে এই চন্দ্রকিরণ পড়িতেছে, আগে তার অর্চ্চনা করি।"

পরিচারিকা উপকরণাদি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। দেবী গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা চন্দ্রকিরণের পূজা করিয়া পূজার প্রসাদ স্বরূপ মোদকগুলি বিদূষককে দিতে আদেশ করিলেন। তারপর রাজাকে গন্ধ-পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবী কহিলেন, "আকাশে

* চন্দ্রের পুত্র বুধ সূর্য্য তনয় বৈবস্বৎমনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। বুধ ও ইলার পুত্র পুরুরবা, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আছে।

ওই চন্দ্র রোহিণীর মিলন হইয়াছে, আজ ওই দেবতামিথুন রোহিণী-মৃগলাঞ্ছনকে সাক্ষী করিয়া আমি আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতেছি। আজ হইতে আর্য্যপুত্র যে রমণীকে কামনা করিবেন, যে রমণী আর্য্যপুত্রেরও সমাগম ইচ্ছা করিবেন,—তাহার সহিত প্রীতিবন্ধনে আর্য্যপুত্র অবস্থান করুন।”

বিদূষক কহিল, “দেবী! মহারাজের প্রতি আপনার এ উদাসীনতা কেন?”

দেবী কহিলেন, “মূঢ়! নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আমি আর্য্যপুত্রের সুখ কামনা করিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আর্য্যপুত্র ইহাতে সুখী হইলেন কি না?”

রাজা কহিলেন, “দেবী! অন্যকে বিলাইয়া দেও, কি তোমার দাস করিয়া আমাকে রাখ,—যাহা ইচ্ছা তুমি করিতে পার। কিন্তু জানিও, আমি তোমার প্রতি উদাসীন নই।”

দেবী কহিলেন, “মহারাজ, তুমি তা হও, বা না হও, আমি আমার ‘প্রিয়প্রসাদন’ ব্রতপালন করিলাম,—চল্, আমরা যাই।”

এই বলিয়া ঔশীনরী পরিজনদের লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

রাজা উঠিয়া কহিলেন, “দেবী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি যাইবে, তবে আমার ‘প্রসাদন’ কি করিলে?”

ঔশীনরী কহিলেন, “আর্য্যপুত্র, আমি কখনও কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই,—আজও করিব না। আর এখানে থাকিলে আমার ব্রতপালন হইবে না।”

এই বলিয়া পরিজনসহ দেবী ঔশীনরী প্রস্থান করিলেন।

ভরতমুনির অভিশাপ উর্ব্বশীর নিকটে আশীর্ব্বাদেরও বড় হইয়াছিল। ইন্দ্রের আদেশে যারপরনাই হৃষ্টচিত্তে উর্ব্বশী মনোহর বেশ ভূষায় সাজিয়া চিত্রলেখার সঙ্গে আকাশ পথে নামিয়া আসিলেন। মণিপ্রাসাদের ছাদে পুরুরবা ও বিদূষককে দেখিয়া দুজনে সেখানেই নামিলেন। তিরস্কারণীবিদ্যার প্রভাবে এতক্ষণ নিকটেই অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তাঁরা সব দেখিতেছিলেন। দেবী ঔশীনরীর মহানুভবতায় এবং মহান্ ত্যাগে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ চিত্তে উর্ব্বশী মনে মনে তাঁহাকে সহস্র প্রশংসা করিলেন। দেবী রাজার প্রণয় তাঁহাকেই দান করিয়া গেলেন। এখন প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষার একমাত্র লক্ষ্য সেই দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়া কি তিনি আপনাকে কৃতার্থ করিবেন

না? উর্ব্বশী রাজাকে দেখা দিলেন। চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

ব্রতপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ কেহ যেমন শ্রদ্ধায় সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বস্ব দান করে, দেবী ঔশীনরী তেমনই আজ আপনার সকল সুখের অবলম্বন সর্ব্বস্বধন স্বামীকে একেবারে স্বামীর প্রণয়িণী উর্ব্বশীর হাতে দান করিয়া গেলেন। আপনাকে তিনি একেবারে যেন বিলুপ্ত করিয়া রাজান্তঃপুরে রহিলেন। উর্ব্বশী ও রাজার মধ্যে আর কখনও তিনি কোনও অধিকারের দাবীতে আপনাকে উপস্থিত করিলেন না।

[৭]

মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া পুরুরবা প্রমোদ বিহারের জন্য উর্ব্বশীকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গেলেন। সেখানে কিছু দিন দুজনের বড় সুখে, বড় আনন্দে কাটিল।

একদিন সেখানে মন্দাকিনী তীরে উদয়বতী নাম্নী একটি সুন্দরী বিদ্যাধরী বালিকা বালির পাহাড়ের উপরে খেলা করিতেছিল। রাজা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। ইহাতে উর্ব্বশীর বড় রাগ হইল। ক্রোধে ও অভিমানভরে উর্ব্বশী নিকটে একটি বনে প্রবেশ করিলেন। রাজাও দ্রুত উর্ব্বশীর পশ্চাতে বনের মধ্যে গেলেন, কিন্তু উর্ব্বশীকে আর দেখিতে পাইলেন না। কি হইল! ইহার মধ্যে কোথায় তিনি লুকাইলেন? সমস্ত বন রাজা খুঁজিলেন,—উর্ব্বশী নাই! বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, পার্ব্বত্য নদীর তীরে তীরে, উন্মত্তের ন্যায়—কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজা উর্ব্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোথাও ত উর্ব্বশী নাই রাজা যেমন উর্ব্বশীতে অনুরক্ত, উর্ব্বশীও তেমনই রাজাতে অনুরক্তা। উর্ব্বশী দেবযোনি-সম্ভূতা, ইচ্ছা করিলে মানবের অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু ক্ষণিকের অভিমানে তিনি কি এমনই নিষ্ঠুর হইবেন? রাজা যে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেনে—এমন কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন,—ইহা দেখিয়া কি জানিয়াও তিনি কি আপনাকে লুকাইয়া রাখিবেন? তাহা যে একেবারেই অসম্ভব! তবে কি হইল? কোথায় গেলেন তিনি? তবে কি কোনও মায়াবী রাক্ষস কি দানব তাঁহাকে হরণ করিল? বনের তরুলতা, পাহাড়ের চূড়া ও গুহা, কাকলী-মুখর কুঞ্জবনের পাখী, মধুরতরঙ্গায়িত নদী, সলিলবিহারী রাজহংস, কমলবিলাসী মধুকর, অম্বরতলে শ্যামল জলধর, বনচারী মৃগযুথ,

যাহা কিছু যখন রাজার চক্ষে পড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া তাহাকে ডাকিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'ওগো! তোমরা কেহ আমার উর্ব্বশীকে দেখিয়াছ? বল—বল তবে—কোথায় তিনি?—কোন দিকে গিয়েছেন? বল—কোথায় গেলে তাঁকে পাইব?"

কিন্তু কেহই রাজার আকুল প্রার্থনায় কোনও সাড়া দিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা অশোক গুচ্ছের মত রক্তবরণ অতি উজ্জ্বল কি একটা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। রাজা সেটা তুলিয়া নিয়া দেখিয়া কহিলেন, "এ যে অতি সুন্দর মহামূল্য মণি! আহা, মন্দারকুসুম-বাসে সুবাসিত উর্ব্বশীর শিরে কি সুন্দর অলঙ্কার আজ এই মণিখানি হইত! কিন্তু কোথায় আমার উর্ব্বশী?"

সহসা রাজা শুনিলেন, অদৃশ্যে কার কণ্ঠ হইতে ধ্বনি হইল, "বৎস! গৌরীর পাদ-পদ্ম-রাগ হইতে সঞ্জাত এই সঙ্গমন মণি ধারণ কর। যে ইহা ধারণ করে, প্রিয়জনের সঙ্গে তার মিলন হয়!"

রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে সঙ্গমন মণিটি শিরে ধারণ করিলেন। কিছুদূর গিয়াই রাজা দেখিলেন, সম্মুখে কুসুমহীন একটি লতাপল্লবগুচ্ছ হইতে বিন্দু বিন্দু মেঘ-বারি ঝরিতেছে,—আহা যেন অভিমানিনী উর্ব্বশীই লতারূপে অশ্রুপাত করিতেছেন! লতার অঙ্গে কোনও কুসুম-ভূষণ নাই, আহা যেন অভিমানিনী উর্ব্বশীই নিরাভরণা হইয়া ওই দাঁড়াইয়া! আত্ম-হারা রাজা ছুটিয়া গিয়া লতাটিকে আলিঙ্গন করিলেন। আবেগভরে রাজার নয়ন মুদিয়া আসিল,—সহসা তাঁর মনে হইল, আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ উর্ব্বশীরই সুখস্পর্শ তিনি অনুভব করিতেছেন! একি স্বপ্নের মোহ না সত্যই উর্ব্বশী! যদি নয়ন মেলিয়া দেখিতে পান উর্ব্বশী নয়, স্বপ্ন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কি হইবে? রাজা অনেকক্ষণ ভরসা করিয়া নয়ন উন্মীলন করিতে পারিলেন না। কিন্তু এ সন্দেহের দ্বিধা লইয়া অধিকক্ষণ থাকাও অসম্ভব। রাজা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—আহা এ যে সত্যই উর্ব্বশী! তাঁহারই উর্ব্বশী তাঁহার আলিঙ্গনপাশে জড়িত!—তাঁহারই বক্ষলগ্ন হইয়া বক্ষের ধন উর্ব্বশী প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন!

উর্ব্বশী কহিলেন, "মহারাজ! রাগ করিয়া চলিয়া গিয়া তোমাকে যে দুঃখ দিয়াছি, তার জন্য আমাকে মার্জ্জনা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও!"

রাজা উত্তর করিলেন, "আর ওকথা কেন উর্ব্বশী? তোমাকে পাইলাম,

আমার মন প্রাণ অন্তরাত্মা তাতেই প্রসন্ন হইয়াছে। আমাকে ছাড়িয়া কোথায় ছিলে এতদিন ? তোমার জন্য এতদিন কোথায় না ঘুরিয়াছি,—এই বনস্থলে ময়ূর, চক্রবাক্, অলি, হংস, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, সরিৎ, পর্ব্বত—কাহাকে না কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ?"

উর্ব্বশী অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "অন্তরাত্মায় সবই আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু কি করিব ? উপায় ত ছিল না ?"

"সেকি প্রিয়তমে! অন্তরাত্মায় জানিতে পারিয়াছ ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কি হইয়াছিল তবে তোমার ?"

উর্ব্বশী কহিলেন, "শোন তবে মহারাজ! পুরাকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় শাশ্বত কুমার ব্রত গ্রহণ করিয়া অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তদেশে আসিয়া বাস করেন। তখন তিনি এই নিয়ম করেন যে, কোনও স্ত্রী এইস্থানে প্রবেশ করিবে, তখনই সে লতারূপে পরিণত হইবে। গৌরীচরণ-প্রসূত মণি ভিন্ন তার আর উদ্ধার হইবে না। ক্রোধবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি এই 'কুমারবনে' প্রবেশ করি। করিয়াই বসন্ত লতায় পরিণত হই। সেই সঙ্গমন মণি লইয়া লতারূপিনী আমায় তুমি আলিঙ্গন করিতেই আপনার রূপ আমি ফিরিয়া পাইলাম।"

রাজা এখন সবই বুঝিতে পারিলেন। উর্ব্বশী সেই মণিটি লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। উর্ব্বশীর মাধুরোজ্জ্বল রূপপ্রভায় বালাতপে রক্তকমলের ন্যায় উর্ব্বশীর ললাটে সেই মণিটি শোভা পাইল।

বেশীদিন আর রাজা সেখানে রহিলেন না। উর্ব্বশীকে লইয়া রাজা প্রতিষ্ঠান নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

[৮]

রাজা ফিরিয়া আসিয়া যথারীতি রাজ কার্য্যাদি আরম্ভ করিলেন। প্রজারা সাক্ষাৎভাবে রাজার স্নেহকরুণাময় পরিরক্ষাধীনে আসিয়া বড় আনন্দিত হইল। রাজারও দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। রাজা এখনও কোনও পুত্র লাভ করেন নাই, ইহা ব্যতীত আর কোনও দুঃখের কারণ তাঁহার বা তাঁহার পরিজনবর্গের ছিল না।

একটি বড় শুভ তিথি আসিল, রাজা উর্ব্বশীকে লইয়া গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া গৃহে আসিলেন। হেমসূত্রে গাঁথিয়া সেই মণিটি বড় আদরে উর্ব্বশী মাথায় পরিতেন। স্নান করিতে হইবে বলিয়া মণিটি খুলিয়া তিনি

একটি পরিচারিকার হাতে দিয়াছিলেন। পরিচারিকা একটি তালপাতার ঠোঙায় মণিটি রাখিয়া এক খণ্ড রক্তবস্ত্রে তাহা মুড়িয়া লইয়া আসিতেছিল। মাংসখণ্ড মনে করিয়া একটা শকুনি ছোঁ দিয়া তাহা লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।

রাজা সংবাদ পাইবামাত্র ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিরাত সারথি প্রভৃতি রাজার মৃগয়া সহচরগণও ছুটিয়া আসিল। রাজা উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঊর্দ্ধ আকাশে মণিটি মুখে লইয়া শকুনিটা উড়িয়া বেড়াইতেছে।

"ধনু! ধনু!" বলিয়া রাজা চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

একজন পরিচারক ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল। ধনুর্দ্ধারিণী যবনী * পরিচারিকা ধনুর্ব্বাণ আনিয়া রাজার হাতে দিল। কিন্তু শকুনি ততক্ষণ উড়িয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাজা আদেশ দিলেন, চারিদিকে নগররক্ষীরা শকুনির অনুসন্ধানে ছুটিল।

[৯]

রাজা বিদূষকের সঙ্গে উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন। কঞ্চুকী একটি বাণ সহ সেই মণিটি লইয়া আসিলেন।

কঞ্চুকী † কহিলেন, "মহারাজ! এই বাণে বিদ্ধ হইয়া মণিটি সহ শকুনি আকাশ হইতে পড়িয়াছে।"

বিস্ময়ে ও আনন্দে রাজা কহিলেন, "বটে! কার এ বাণ? কে সে ধনুর্দ্ধর—এমন অব্যর্থ সন্ধানে যে আমার এই অমূল্য মণিটি উদ্ধার করিয়া দিল?"

*. সেকালে বলিষ্ঠা অস্ত্রধারিণী নারীরা রাজাদের অঙ্গ-রক্ষায় নিযুক্ত হইত। নারী প্রতিহারীরাই সাধারণতঃ দ্বারে থাকিয়া সংবাদাদি বহন করিত। মৃগয়ার সময় সশস্ত্র নারী সেনাদল রাজাদের সঙ্গে যাইত। এই নাটকে এই সব কার্য্যে নিযুক্তা একজন যবনীর উল্লেখ দেখা যায়। ম্লেচ্ছ গ্রীক্‌রাই যবন বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিলেন।

† বাহিরের কাজের সঙ্গে অন্তঃপুরেও সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পারেন, এই জন্য বৃদ্ধ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণ রাজ গৃহে নিযুক্ত হইতেন। ইঁহারাই কঞ্চুকী। ইঁহারা ঢিলা লম্বা এক রকম আঙ্গ-রাখা পরিতেন,—তার নাম ছিল কঞ্চুক। তাহা হইতেই ইঁহাদের 'কঞ্চুকী' নাম হইয়াছে।

কঞ্চুকী কহিলেন, "এই বাণে তার নাম লেখা আছে। কিন্তু আমি বৃদ্ধ চক্ষুতে ভাল দৃষ্টি নাই, পড়িতে পারিতেছি না। এই দেখুন।"

কঞ্চুকী এই বলিয়া বাণটি রাজার হাতে দিলেন। রাজা পড়িয়া দেখিলেন, বাণে ছোট অক্ষরে শ্লোকে গাঁথা এই কথাগুলি লেখা আছে,—

'উর্ব্বশীর গর্ভজাত, ইলাসুত পুরুরবার পুত্র, শত্রু কুলের আয়ুসংহর্ত্তা আয়ুর এই বাণ।'

রাজা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁর পুত্র! উর্ব্বশীর গর্ভজাত! সে কি! এক কুমার বনে সেই দুর্ঘটনার কাল ব্যতীত উর্ব্বশী ত বরাবর তাঁর সঙ্গেই আছেন। তখন ত উর্ব্বশী লতারূপেই ছিলেন। কবে তবে পুত্র হইল? গর্ভ লক্ষণও কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁর তেমন মনে পড়ে না। তবে এ কি ব্যাপার!

বিদূষক কহিল, "হইবে তা আশ্চর্য্য কি? উর্ব্বশী দেবযোনিসম্ভূতা, মানুষের ধর্ম্ম সবই যে তাঁহাতে দেখা যাইবে, এমন নাও হইতে পারে। দৈব প্রভাব বলে তাঁহাদের সব কার্য্যই তাঁহারা মানবীর জ্ঞানের অগোচরে রাখিতে পারেন।

রাজা কহিলেন, "তা পারেন বটে! কিন্তু পুত্র হইলে, তাকে এমন গোপন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কি হইতে পারে!"

বিদূষক হাসিয়া কহিল, "কি জানি,—পুত্র যদি হইল ত বুড়াই হইলাম। রাজা যদি এখন ত্যাগই করেন, এই ভয়ে বুঝি!"

রাজা কহিলেন, "পরিহাসের কথা নয় সখা,—ভাবিবার কথা।"

বিদূষক উত্তর করিল, "ভাবিবই বা আর কি? দেবরহস্য মানুষ আমরা কি বুঝিব?"

কঞ্চুকী আসিয়া জানাইলেন, চ্যবন ঋষির আশ্রম হইতে একটি বালককে লইয়া একজন তাপসী আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের সম্মুখে আনিতে আদেশ দিলেন। কঞ্চুকী সেই বালক সহ তাপসীকে লইয়া আসিলেন।

বালককে দেখিবামাত্র রাজার চিত্ত বাৎসল্য-রসে আর্দ্র হইল। তিনি উঠিয়া সম্ভ্রমে তাপসীকে প্রণাম করিলেন।

"চন্দ্রবংশের বিস্তারকারী হও!" এই বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাপসী বালকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "বাছা! এই তোমার পিতা, ইঁহাকে প্রণাম কর!"

বালক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া পিতার দিকে চাহিল। আহা ইনিই কি তার পিতা! ইঁহার কোলে বসিতে পাইলে না জানি কত ভালই তার লাগিবে!

"আয়ুষ্মান্ হও!" এই বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজা তাপসীর নিকট এই রহস্যের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন।

তাপসী কহিলেন, "জন্মিবামাত্র উর্ব্বশী কুমারকে আমার কাছে রাখিয়া আসেন। ভগবান্ চ্যবন ঋষি ক্ষত্রিয়োচিত নিয়মে কুমারের জাতকর্ম্মাদি সব সম্পন্ন করিয়াছেন। তারপর যেমন বড় হইতে লাগিল, কুমারকে তিনি শাস্ত্র বিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদেও শিক্ষাদান করিলেন। কিন্তু আজ সে একটি আশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে।"

"কি করিয়াছে ভগবতী?"

"ঋষিবালকদের সঙ্গে কুমার পুষ্পসমিৎ আহরণ করিতে গিয়াছিল। শুনিলাম গাছের ডালে একটা শকুনি একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া বসিয়াছিল। কুমারের হাতে তার ধনুর্ব্বাণ ছিল,—সেই শকুনিকে বাণবিদ্ধ করিয়া কুমার নিহত করিয়াছে।"

"তারপর?"

"ভগবান্ চ্যবন এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, 'ইহাকে ইহার পিতার নিকট রাখিয়া এস। বীর্য্যবান ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয়কুমারের আশ্রমে বাস আর শোভা পায় না।' তাই আমি ইহাকে লইয়া আসিয়াছি। উর্ব্বশী কোথায় মহারাজ? তার ন্যস্তধন তারই হাতে দিয়া যাইব।"

উর্ব্বশীকে লইয়া আসিবার জন্য কঞ্চুকীকে আদেশ দিয়া রাজা উঠিয়া আনন্দের আবেগ ভরে পুত্রকে কোলে করিলেন। স্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার পিতার প্রিয় সুহৃৎ এই ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর!"

কুমার বিদুষেকের দিকে চাহিল। বিদুষক হাসিয়া কহিল, "ভয় কি? এস—আশ্রমে ত অনেক বানর দেখিয়াছ,—আমিও তাদেরই মত একজন!"

কুমার হাসিয়া কহিল, "তাত! প্রণাম করি!"

"কল্যাণ হ'ক্!"

বিদুষক স্নেহে কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিল।

কঞ্চুকীর সঙ্গে উর্ব্বশী আসিলেন। তাপসীকে দেখিয়া উর্ব্বশী

কহিলেন, "ওমা! এ যে সত্যবতী! তবে কি ওই আমার পুত্র 'আয়ু! আহা!"

"বাছা! ওই তোমার মাতা, ওঁকে প্রণাম কর!"

আয়ু ছুটিয়া গিয়া মাতার চরণে প্রণিপাত করিল। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন করিয়া উর্ব্বশী তাপসী সত্যবতীকে প্রণাম করিলেন।

"এস পুত্রবতী—এস!" এই বলিয়া আদরে রাজা উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া আপন আসনের পাশে তাঁহাকে বসাইলেন।

সত্যবতী কহিলেন, "উর্ব্বশী! তোমার পুত্র এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কবচ * ধারণেরও যোগ্য হইয়াছে। আজ তোমার পতির সমক্ষেই তোমার হাতে তাকে ফিরাইয়া দিলাম। আমি তবে এখন বিদায় হই। আমার আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে।"

উর্ব্বশী ও রাজা তাপসীকে প্রণাম করিলেন। কুমার কহিল, "তুমি যাইতেছ? আমিও তবে তোমার সঙ্গে যাইব।"

তাপসী কুমারকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইয়া কহিলেন, "বাছা! তোমার পিতার গৃহে এখন থাক। আশ্রমে বাস তোমার শেষ হইয়াছে, এখন ঘরেই থাকিতে হয়।"

আয়ু কহিল, "আচ্ছা, তবে আমার ময়ুরের ছানা 'মণিকণ্ঠ' যে আছে,—তাকে বড় ভালবাসিতাম, আমার কোলে সে ঘুমাইয়া পড়িত,—তার লেজ উঠিলে এখানে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও!"

"আচ্ছা তাই করিব," এই বলিয়া হাসিয়া আয়ুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাপসী চলিয়া গেলেন।

রাজা কহিলেন "আহা উর্ব্বশী! পৌলমী-সম্ভব পুত্র জয়ন্তকে পাইয়া ইন্দ্র যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, তোমার গর্ভজাত পুত্র আয়ুকে পাইয়া আজ আমি তেমনই ধন্য হইলাম।"

ইন্দ্রের কথা এবং তাঁর প্রসঙ্গে পুত্রের কথা শুনিয়া উর্ব্বশী চমকিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব কথা তাঁর মনে পড়িল,—মনে পড়িল ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'যতদিন পুরুরবা তোমার পুত্র মুখ না দেখেন, ততদিন তার সঙ্গে থাকিবে। তারপর তোমার শাপ-মুক্তি হইবে।' এ শাপ-মুক্তি ত উর্ব্বশী চান না!

* বর্ম্ম।

মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্য এ মানবের গৃহ যে তাঁর স্বর্গেরও স্বর্গ। পাছে রাজা পুত্রমুখ দেখেন, পাছে তাঁর সঙ্গে চিরতরে বিচ্ছেদ হয়, এই ভয়েই না তিনি গর্ভ গোপনে রাখিয়াছিলেন, গোপনে প্রসব করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে তাপসী সত্যবতীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন! এতক্ষণ পুত্র মুখ দর্শনের আনন্দে একথা তাঁর মনে পড়ে নাই। এখন উপায়! কি করিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবেন! স্বর্গ যে তাঁহার নরকাধিক যাতনার স্থান হইবে! উর্ব্বশীর উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখকমল বিষাদের ছায়ায় মলিন হইল, দারুণ যাতনার ক্লেশভারে বিষাদমলিন মুখখানি নত হইয়া পড়িল। দর দর ধারে দুটি নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিল।

রাজা কহিলেন, "একি! সহসা এ আনন্দে তোমার এ বিষাদ কেন প্রিয়ে?"

উর্ব্বশী কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা রাজাকে বলিলেন। রাজা যেন বজ্রাহত হইলেন! উর্ব্বশীই যদি চলিয়া গেলেন, তবে সংসারে তাঁর কি প্রয়োজন! রাজ্যভোগে কি সুখ! পুত্র আয়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তপস্যায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইবেন, এইরূপ তিনি সংকল্প করিলেন।

সহসা একটা দিব্যভাতি আকাশ হইতে নামিয়া আসিল।

উর্ব্বশী কহিলেন, "একি! ওমা এই যে দেবর্ষি নারদ আসিতেছেন! রাজা দেখিয়া কহিলেন,—"তাই ত! ভগবান্ নারদ যে! অর্ঘ্য! অর্ঘ্য! অর্ঘ্য কই!"

উর্ব্বশী দ্রুত গিয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি লইয়া আসিলেন। নারদ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন, "মধ্যমলোকপাল মহারাজ পুরুরবার জয় হউক!" রাজা ও উর্ব্বশী অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়া নারদের চরণ বন্দনা করিয়া অভিবাদন করিলেন।

নারদ কহিলেন, "অবিরহিত দম্পতি হও!"

রাজা মনে মনে কহিলেন "আহা, তাই যেন হয়।"

নারদ কহিলেন,—"মহারাজ! দেবেন্দ্রের আদেশ লইয়া আমি আসিয়াছি।"

পুরুরবা কহিলেন, "দেবেন্দ্রের কি আদেশ দেবর্ষি?"

নারদ কহিলেন, "উর্ব্বশীর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তুমি বানপ্রস্থ

অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছ, আপন দৈব প্রভাবে দেবরাজ ইহা জানিতে পারিয়াছেন।"

"তারপর ?"

"ত্রিকালদর্শী মুনিরা বলিয়াছেন, 'অচিরে ভীষণ দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। দেবগণের বড় একজন সহায় তুমি, এ সময়ে শস্ত্র ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন তুমি করিতে পার না। তবে—"

"কি তবে দেবর্ষি ?"

"তবে উর্ব্বশী-বিরহ তোমার দুঃসহনীয় যাতনার কারণ হইতে পারে। তাই দেবরাজ—"

"কি আদেশ করিয়াছেন দেবরাজ ?"

নারদ হাসিয়া কহিলেন, "দেবরাজ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, উর্ব্বশী তোমার সহধর্ম্মচারিণীই থাকিবেন।"

রাজা ও উর্ব্বশী আনন্দে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কৃতজ্ঞ-চিত্তে দুজনে দেবরাজকে ধন্যবাদ দিয়া দেবর্ষির চরণতলে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন।

দেবর্ষি আকাশের দিকে চাহিয়া অপ্সরা রম্ভাকে ডাকিলেন। কুমার আয়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার আয়োজন ইন্দ্র নিজেই করিয়াছিলেন। রম্ভা অভিষেক সামগ্রী লইয়া নামিয়া আসিলেন। মঙ্গলপীঠে বসাইয়া নারদ নিজেই মঙ্গলবারি ঢালিয়া কুমারকে অভিষিঞ্চিত করিলেন। রম্ভা অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। চারিদিকে জয় জয়কার উঠিল; মঙ্গলবাদ্য বাজিল; বৈতালিকগণ আশীষ-স্তুতি গাহিল!

নারদ কহিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ আর তোমার কি প্রিয় সাধন করিবেন বল।"

পুরূরবা কহিলেন,—"দেবরাজ যে আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, ইহাই যথেষ্ট। আর কি প্রিয় সাধন তিনি করিবেন! তবু এই একটি প্রার্থনা আমার আছে। 'লক্ষ্মী আর সরস্বতী একাধারে সম্মিলিত বড় হন না। সাধু জনের মঙ্গলের তরে দেবরাজের কৃপায় যেন তাঁহাদের সর্ব্বথা মিলন হয়। আর——

সকলে যেন দুস্তর যাহা কিছু—তাহা তরিতে পায়, ভাল যাহা কিছু—তাহা দেখিতে পায়। সকলের সকল কামনা যেন পূর্ণ হয়, সকলে সর্ব্বত্র যেন আনন্দে থাকে'!"

সম্পূর্ণ।

পাগল মন।

আধ ফোটা সে পদ্ম কলির সুবাসভরা বুকে
তরুণ অরুণ কিরণ পড়ে শিশির হাসে সুখে।
জ্যোস্না-রাণীর পরশ স্নাত ফুল্ল কুমুদ ফুল,
বর্ষাভেজা সবুজ পাতায় ঝুম্‌কা ফুলের দুল।
প্রভাতকালে দোয়েল-শিশে যে সুখ ওঠে ফুটে,
সেই সুখেতে পাগল এ মন তার চরণে লুটে।
ঘন কাল মেঘের কোলে বিজলী রাণীর খেলা,
ঝড়ের আগে নদীর বুকে শুভ্র ঢেউয়ের মেলা।
কাল বোশেখে যে আনন্দে ঝঞ্ঝা ওঠে জেগে,
সিন্ধুর বুক ফুলে ওঠে পূর্ণ বিধু দেখে।
সেই গরবে সেই আনন্দে পরাণ আমার ধায়,
সকল-দেওয়া সকল-পাওয়া তাহার রাঙ্গা পায়।
নির্ঝরিণী পুলকভরে যে লীলাতে চলে,
শুভ্র ফেণের সজল হাসি যে কথাটি বলে,
হাসির মত কান্নার মত ভাষার অতীত স্বর —
(যেমন) মেঘে রোদে ফলিয়ে তোলে রাম ধনুকের স্তর।
তেমনি তর কি যে সে ভাব সুখ দুঃখের বাড়া
হৃদয় আমার ভরে ওঠে তাঁহার পেলে সাড়া॥

শ্রীবিনোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

ক্ষমা।

ক্ষমাময়! সেই ক্ষমা দিওনা আমায়,
যাহা লভি খর্ব্ব করি তব ক্ষমতায়;
সেই ক্ষমা দিও মোরে—যে মহা ক্ষমায়
তোমার মহিমা নিত্য চিত্তে জেগে রয়।

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র।

বিজ্ঞাপনের জন্য খালি।

১৩২১ সালের মালঞ্চের—মাত্র কয়েকখানা অবশিষ্ট আছে, কেহ উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে সত্বর আবেদন করিলে প্রেরণ করিতে পারিব।

মালঞ্চ কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্বিতীয় অংশ।

আলোচনা সংগ্রহ ইত্যাদি।

স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।)

তমিস্রময়ী রজনীর অবসানে প্রাচী-ললাট রক্ত-রাগে রঞ্জিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় অরুণদেব ভাস্কর-ভাতিতে বিশ্ব-জগৎ আলোকিত করেন। সে জ্যোতির্ম্ময় আলোকচ্ছটা মুঞ্জরিত তরু-শাখে, পুষ্পিত লতা-বিতানে, তরঙ্গায়িত সাগর-সলিলে, বিহগ-কুজিত কুঞ্জ-কাননে প্রতিফলিত হইয়া রমনীয় রূপ-রাশির সৃষ্টি করে। তারপর দিবাশেষে গোধূলির আগমনী বার্ত্তা লইয়া নৈশ-সমীরণ যখন মৃদু-মন্দ-হিল্লোলে বৃক্ষ-পত্র বিধূত করিয়া কুসুম সৌরভ ছড়াইয়া কল্লোলিনীর বক্ষঃ উচ্ছ্বসিত করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন দিবাকর হীন-প্রভ হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে অস্তমিত হন। কিন্তু সূর্য্যাস্তের পরে রজনীর তমোময় গর্ভে নিপাতিত হইয়াও মানব যেমন রজত-শুভ্রা তিমির-নাশিনী ময়ুখ-মালার হীরকোজ্জ্বল-দীপ্তি বিস্মৃত হইতে পারে না—সুপ্তি-ঘোরেও যেমন লোক-লোচনে সে প্রখর তেজঃপুঞ্জ রবিরশ্মি প্রতিফলিত হইতে থাকে—সাহিত্য জগতেও তেমনই কবির মহা-প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় প্রতিভা-প্রভা কখনই ম্লান হইয়া যায় না। কবির জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাঁহার স্থূলদেহ বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাঁহার "কোমল-কান্ত-পদাবলী," তাঁহার প্রীতি-মধুর স্নেহ-সরস ভাব, স্ফটিক-স্বচ্ছ অনাবিল ভাষা, চিরদিন মানব মনে কমনীয়-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের মধুর মূর্চ্ছনার ন্যায় অপূর্ব্ব সুখাবেশের সঞ্চার করে।

* * * * * * *

কাব্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, হাস্য-কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার যে অপূর্ব্ব স্ফুরণ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ই আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের মায়াময়ী কল্পনা হইতে যে সমুদয় চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং পীযূষ-বর্ষী লেখনী হইতে যে অমৃত-মধুর রচনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয় সম্পদরূপে চিরদিন আদৃত হইবে। যতদিন মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকিবে, ততদিন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী

দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট চন্দন-চর্চ্চিত সুরভি কুসুমের ন্যায় বাগ্‌দেবীর রত্নবেদিকা-তলে চিরদিন সগৌরবে স্থান পাইবে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চভাবের প্রচারক ছিলেন। তিনি বীরত্বের সমাদর করিতে জানিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যেন ধর্ম্ম ও দেশ তাঁহার সাহিত্য সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা 'দুর্গাদাস' 'মেবার পতন' 'রাণাপ্রতাপ' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতির ন্যায় উচ্চভাব-দ্যোতক ও শিক্ষাপ্রদ নাট্যকাব্যের সৃষ্টি হইত কিনা সন্দেহ। রাজপুত-কুলতিলক বীর-কেশরী মহারাণা প্রতাপ ও প্রভুভক্ত দেব-চরিত্র ক্ষত্রিয়বীর দুর্গাদাসের বীর চরিত্র তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেশ-বৈরীর পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ও স্বদেশ প্রেমের মন্দাকিনী স্রোতে বিধৌত হইয়া যায়। 'সাজাহানে' যশোবন্ত সিংহের বীরভার্য্যা মহামায়া, পতিব্রতা নাদীরা ও মাতৃভক্ত সিপারের চরিত্র তাঁহার বিচিত্র তুলিকা-স্পর্শে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে মোহিত হইতে হয়। 'চন্দ্রগুপ্তে' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বন্ধুবৎসল চন্দ্রকেতুর দেবোপম চরিত্রে ত্যাগের ও প্রেমময়ী কিশোরী ও দেবীরূপিনী ছায়ার চরিত্রে প্রেমের যে আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা প্রচারিত হইলে বাস্তবিকই সমাজের যে মহদুপকার সাধিত হইবে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যে সুনিপুণ শিল্পীর তুলিকা-স্পর্শে এ প্রকার দেবোপম চরিত্র-রাজির সৃষ্টি হইতে পারে, তিনি যে জগদ্বরেণ্য কবিকুলের পার্শ্বে আসন পাইবার উপযুক্ত তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

* * * *

তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও সমাজের কল্যাণ কামনায় রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমাজ সংস্কার কল্পে উচ্চাঙ্গের নাটক উপন্যাসের যেমন প্রচার আবশ্যক, তেমনই ব্যঙ্গকাব্য বা প্রহসনেরও প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে "মাইকেল মধুসূদন দত্তের" জীবন চরিত প্রণেতা প্রবীণ সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল সমালোচক শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই :—"প্রহসন সামাজিক উপপ্লব এবং অশান্তির পরিচায়ক। যখনই কোন সমাজ, কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই সেখানে প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিউরিটানিজ্‌ম প্রপীড়িত ইংলণ্ডে "হিউডিব্রাসের" (Hudibrus)এবং

নাইট্ এরাণ্ট্রির প্রাদুর্ভাবে অস্থির স্পেনে ডন্‌কুই-জোটের আবির্ভাব ইহার উদাহরণ। রাবেলার (Rabelais) গ্রন্থ, ভ্রষ্টাচারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল অভিজাতদিগের দণ্ডের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, গ্রন্থকারগণ সমাজের শিক্ষক। যখন সমাজে শান্তি এবং নিরুপদ্রবতা বিরাজ করে, তখন তাঁহারা শান্তমূর্ত্তিতে অবস্থান করেন; কিন্তু যখন দুষ্ক্রিয়া এবং কদাচারের প্রাবল্যে সমাজ উপদ্রুত হয়, তখন তাঁহাদিগকে অপরাধীদিগের দণ্ডের জন্য সুতীক্ষ্ণ কশা হস্তে গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতেই প্রহসন এবং ব্যঙ্গ কাব্যের সৃষ্টি। রাজপুত কবি 'চাঁদ' যথার্থই বলিয়াছেন, "শত্রুর করবালাপেক্ষা কবির বাক্য-শেল সহস্র গুণ তীক্ষ্ণ।"

স্বদেশ-নির্ব্বাসিত, কুটীরবাসী ভল্টেয়ারের মুখের এক একটি কথায় য়ুরোপের অনেক মুকুটধারীরও অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত। বাস্তবিকও দেখিতে পাওয়া যায়, কবির অন্তর্ভেদী বাক্যবাণের ভয়ে শত শত ক্ষমতাবান্ পাষণ্ড, আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি সংযত বা গোপনে চারিতার্থ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যেমন প্রকৃত বলবান্ পুরুষগণই মহাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কেবল প্রতিভাবান্ পুরুষদিগের প্রযুক্ত ব্যঙ্গাস্ত্রই কার্য্যকারী হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তাহা ত্বক ভেদ করে মাত্র, মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না।

*   *   *   *

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কাব্যগুলির মধ্যে "হাসির গান" ও "আষাঢ়ে" সমধিক প্রসিদ্ধ। "হাসির গানের" Reformed Hindusএর যে বাস্তব চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্রূপবাণ নয়—পরন্তু ঐ সমুদয় বিকৃত-মস্তিষ্ক তথা-কথিত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন সাহেবী হিন্দুর সংশোধনার্থ তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার "নন্দলালে" তিনি ভণ্ড দেশ-হিতৈষীকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন এবং "বাঙ্গালী মহিমায়" ভীরু বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

*   *   *   *

যখন "বিলাত ফের্ত্তা ক'ভাই" "বিলাতি ধরণে" হাসিবে, "ফরাসী ধরণে" কাশিবে এবং "পা ফাঁক" করিয়া সিগারেট্ খাইবে,তখনই কবির স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ মাত্রায় জাগরূক হইয়া উঠিবে। যখন ময়রার দোকানের পাশ দিয়া যাওয়ার কালে "সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সর পুরিয়া"র প্রতি আমাদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রসনাগ্রে বারি-

বিন্দুর সঞ্চার হইবে তখন কবির কথা কার না মনে উদিত হইবে? আর যখন কবির রচিত মধুর সঙ্গীতাবলী "মুরজ মন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তানের" ন্যায় আমাদের কর্ণকুহরে মধুর ঝঙ্কার করিবে,—যখন "ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"র মাঝে "আমার জন্মভূমি"তে "ধানের উপর বাতাস ঢেউ খেলে" যাবে,—যখন "কালমেঘে তড়িৎ" খেল্‌বে– তখন আমাদের হৃদয়-মুকুরে বঙ্গের অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে না কি?

* * * * *

কবিবর নবীনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক;
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ, সত্য যুগের সকল;
কে শুনিত রাম-সীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল;—
সাম্রাজ্য,ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য জগত নশ্বর;—
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।" *

শিক্ষা ও সাধনা।

জ্ঞানলাভ ও সাধনা শিক্ষার দুইটি অঙ্গ। মনুষ্যত্বের যাহা আদর্শ, সেই আদর্শ চিনিয়া সেই আদর্শের অভিমুখে যাইতে হইলে,—সংসারে ও সমাজে যাহার যাহা কিছু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে,—জীবনে যে লক্ষ্য সাধনের জন্য যে শক্তি সে লইয়া আসিয়াছে, সেই শক্তির ব্যবহারে সেই লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে,বালককে যে সব কর্ম্মের অভ্যাস করিতে হইবে, সেই সব কর্ম্মের অভ্যাসই সাধনা। বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস হইতে বালক যে সব জ্ঞান লাভ করে, সেই জ্ঞান হইতে তাহার মনে যে সব শক্তির বিকাশ হয়, সেই জ্ঞান ও শক্তির সাধনা করিতে হইবে। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনার আবশ্যক। নহিলে তার মনের বিকাশ হইতে পারে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না।

* (১৩২০ সন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের শোক-সভায় পঠিত।)

যিনি সংযতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, ন্যায়ানুগত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ—যিনি পরহিতে আত্মত্যাগী, সুখে অপ্রমত্ত, বিপদে ধীরচিত্ত, সৌভাগ্যে নিরহঙ্কার, জীবন-সংগ্রামে অটল,—পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী পরিজন প্রতিবেশী প্রভৃতি যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার জীবনের নিত্য অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে যিনি অকুণ্ঠিত,—তাঁর ব্যক্তিজীবন যে সমাজজীবনের অধীন সেই সমাজের কল্যাণে যিনি সকল করণীয়ই করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, মোহমুক্ত আত্মদৃষ্টিলাভে বলীয়ান্ হইয়া বিধিদত্ত সকল শক্তি দ্বারা যিনি বিধি-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে যত্নবান্, তিনিই আদর্শ মানব; তাঁহারই জীবন মনুষ্যত্বের আদর্শ।

এই আদর্শ মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের এই সব গুণ ও শক্তি যাঁহার মধ্যে আছে, তিনি চির পরিধান করিয়া শাকান্ন খাইয়া, তৃণশয্যায় শুইয়া দীন কুটীরেই থাকুন,—দশের কাছে ছোট হইয়া নিত্য সহস্রদুঃখ, সহস্র লাঞ্ছনা, সহস্র বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন, তিনিই মানুষের রাজা, মানবদেহে দেবতা, দেবতারও পূজ্য। যাঁহার ধনমান পদগৌরব খ্যাতিপ্রতিপত্তি আছে, পৃথিবীতে তিনি সৌভাগ্যবান ইন্দ্রতুল্য পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, কিন্তু মানবের ইহ পরকালের দেবতা, কর্ম্মফলদাতা, জন্ম জন্ম শত জীবন-নিয়ন্তা বিধাতা যিনি, তিনি খাঁটি মালই চিনেন,—খাঁটি মাল বাছিয়াই মানুষের ভাগ্য গড়েন, তাঁর রাজ্যে তার স্থান নির্দ্দেশ করেন,—শুধু জাঁকাল সাজ দেখিয়াই ভূষা মাটি হাতে তুলিয়া নেন না।

মনুষ্যত্বের ও মহত্বের এই আদর্শ ধরিয়াই আমাদিগকে মানুষ গড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে সাধনায় এমন মানুষ গড়িবার সহায়তা করে, বালকগণকে সেই সাধনাই করাইতে হইবে।

বালকগণকে যে আদর্শের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, সকলের আগে সেই আদর্শটি তাহাদের ভাল করিয়া বুঝা চাই। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরের পর স্তর খুলিয়া সেই আদর্শটি তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। বালক ও যুবকগণের চিত্ত এই আদর্শের উজ্জ্বল ভাতিতে মুগ্ধ হইলে, গৌরবের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলে, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি সেই দিকে ধাবিত হইতে চাহিবে। যদি তা চায়, তাহার পক্ষে সাধনার অন্যান্য কর্ম্মাভ্যাস সহজসাধ্য হইবে।

এ দেশে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভাব নাই; ব্যক্তিগত জীবনের,পারিবারিক জীবনের, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের, ধর্ম্মপালনে কঠোর আত্মত্যাগের

দৃষ্টান্তে ভারতের ইতিহাস পরিপূর্ণ। ভীষ্ম, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, প্রতাপসিংহ,শিবাজি প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবন মানবত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুলির এক একটি জীবন্ত আদর্শ। যাহার অর্থ শিখিতে হইবে, ব্যাখ্যা করিতে হইবে, সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে, এমন পাঠ্যবিষয়রূপে নয়,—মানবজীবনের কর্ম্ম কি, কোন্ অবস্থায় কোন্ কাজ করিলে মানবজীবন ধন্য হইবে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে হইলে কখন তাহাদিগকে কি করিতে হইবে, এই ভাবে যদি ঐ সব মহৎজীবনের পুণ্য-কাহিনী আমরা বালকগণকে শিখাই,—সর্ব্বদা যদি এই আদর্শগুলি আমরা তাহাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া রাখি, তবে তাহাদের চিত্ত এ দিকে আকৃষ্ট না হইয়াই পারে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে যদি এইটুকু দেখাইতে পারি যে, যে দেশে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনের জন্য হস্তগতপ্রায় রাজ্য সামান্য মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় হেলায় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে গিয়াছিলেন, ভীষ্ম পিতার সুখের জন্য রাজ্যভোগ ও সাংসারিক সুখের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কঠোর কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—সেই দেশেরই ছেলেরা এখন আধ ঘণ্টার জন্য খেলা ছাড়িয়া পিতার আদেশে একটু বাজারে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় ;—যে দেশের লক্ষ্মণ অনায়াসে ভ্রাতার বনবাসের সঙ্গী হইয়াছিলেন, ভরত প্রাপ্ত রাজসিংহাসনে ভ্রাতার পাদুকা রাখিয়া ভ্রাতার নামে পিতৃদত্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন,—সেই দেশে একখানা মাছ ভাজা বা একখানি কাপড়ের জন্য তাহারা ভ্রাতার সঙ্গে নিত্য কলহে প্রবৃত্ত হয়। যে দেশে সত্য পালন করিতে হরিশ্চন্দ্র পত্নীপুত্র বিক্রয় করিয়া শ্মশান-চণ্ডালের ঘৃণিত বৃত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে লোকে অতি ক্ষুদ্র অন্যায় সহস্রবার আর করিব না বলিয়া ক্ষণিক সুখের প্রলোভনে আবার তাহা করিতেছে ;—যদি এমন আদর্শের সঙ্গে নিত্যকার অবস্থায় সকলের এত বড় পার্থক্যটা তেমন করিয়া দেখান যায়, তবে লজ্জায় অধোবদন হইয়া, আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া, এই সকল মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণে আপনা হইতেই অন্তরের সঙ্গে যত্নবান্ হইবে না, এমন বালক কে আছে ?

অবশ্য সকল বালকই যে ভীষ্ম হইবে কি রামচন্দ্র হইবে, এরূপ আশা করা দুরাশা। কিন্তু মনুষ্যত্বের যে আদর্শ তাহাকে আমরা দেখাইব, সেই আদর্শ যত উচ্চ, যত শ্রেষ্ঠ হইবে আদর্শের প্রতি চিত্তাকর্ষণ তার তত প্রবল আদর্শের অনুকরণ-চেষ্টা তার তত বলবতী হইবে। চেষ্টার ফলে মনুষ্যত্বের

বিকাশও তার মধ্যে তত বেশী হইবে। যে লক্ষ্যের দিকে ঢিল ছুড়িব, সেই লক্ষ্য যত বেশী দুরে, তত বেশী জোরে আমি ঢিলটি ছুড়িব, ঢিলও আমা হইতে তত বেশী দুরে—লক্ষ্যের তত বেশী নিকটে গিয়া পড়িবে। এ জীবনে যত দুর যে পারে আর না পারে, পূর্ণতার দিকেই তার জীবনের কর্ম্মের প্রবাহ ধাবিত করিতে হইবে।

এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। এই সব আদর্শ যাঁহারা বালকগণকে দেখাইবেন, তাঁহাদিগকেও যথাসাধ্য এই সব আদর্শের অনুবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। দূরস্থ বিষয়ের বর্ণিত চিত্র অপেক্ষা সম্মুখের বাস্তব চিত্রের আকর্ষণী শক্তি যে অনেক বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। শক্তির বর্ণনা অপেক্ষা শক্তির ক্রিয়া-শক্তির উন্মেষে অনেক বেশী সহায়তা করে। আমরা যাহা বলি, কাজেও যদি তাহার যথাশক্তি দৃষ্টান্ত না দেখাই, তবে যাহাদের কাছে তাহা বলি, তাহারা তাহা করণীয় ও সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে করিবে কেন? করিতে তাহাদের সহজ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন? আমরাও যেমন কেবল বলিব, তাহারাও তেমনই সব মানবশক্তির অতীত দেবলীলার ন্যায় কেবল শুনিবে, শুনিয়া মুগ্ধ হইবে, মনে মনে স্তুতি ও প্রণতি করিয়া উঠিয়া যাইবে।

বালকগণ আদর্শ কি তাহা দেখিল, আদর্শ কি তাহা বুঝিল, আদর্শের প্রতি তাহার চিত্তের আকর্ষণ জন্মিল; আদর্শের দিকে সে যাইতেও চাহিল। কিন্তু আদর্শের অভিমুখে যাইবার পথ এত সহজ নয় যে, যাইতে চাহিলেই তারা যাইতে পারিবে। বহুবিধ আত্মসুখের প্রলোভন, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল ঘটনা, সময়ে সময়ে মানসিক অবসাদ,কর্ম্মবিমুখতা প্রভৃতি পদে পদে তাহাদের সে পথে বাধা উপস্থিত করে। আদর্শের অভিমুখে যাইবার অপেক্ষা এই সব বাধার শক্তি অনেক সময় প্রবলতর হইয়া থাকে। ইচ্ছাবলে যদি বালক এক পদ অগ্রসর হয়, এই সব বাধা আসিয়া তাহাকে তিন পদ পিছাইয়া দিতে চায়। অনেক বালকের পক্ষে আদর্শ চিনিয়াও—আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও – তাই আদর্শ লাভ বড় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

তবে উপায় কি? উপায় নিয়মানুবর্ত্তিতা। মেয়েরা যেমন কোন ব্রত গ্রহণ করিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার সকল দাবী দুরে ঠেলিয়া দিয়া ব্রত পালন করে, তেমনই দৈনন্দিন জীবনে বালকগণকে আদর্শানুরূপ চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিতে পারে, এমন কতকগুলি নিয়ম গ্রহণ করিয়া, সকল প্রলোভন,—

সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। একেবারে বহু-নিয়মের অনুবর্ত্তিতা কষ্টসাধ্য হইতে পারে। সুতরাং যাঁহাদের উপরে বালক-গণের চরিত্রগঠনের ভার, তাঁহারা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, বালকগণকে এক একটি করিয়া নিয়ম ধরাইয়া চালাইবেন। ক্রমে অভ্যাস হইয়া আসিলে, তাহারা আপনা হইতেই এই সব নিয়মে চলিবে,—না চলিয়া পারিবে না। চলিতে চলিতে এক একটি নিয়ম এক একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় শক্তি-শালী হইয়া উঠিবে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি যেমন মানবকে নিজ নিজ পথে চালায়, কোন বাধায় যেমন তাহারা সহজে ফিরিতে চায় না, অভ্যস্ত এক একটি নিয়মে বালকগণ তেমনি চলিবে,—কোন প্রলোভন, কোন বাধা সহজে তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিবে না।

এই নিয়মানুবর্ত্তিতায় বহু সংগুণ অভ্যস্ত হইয়া বালকগণ যে কেবল আদর্শ-চরিত্র-গঠনে সমর্থ হইবে, তাহা নয়, এই নিয়মানুবর্ত্তিতাই তাহাদের একটি বিশেষ অভ্যস্তগুণে পরিণত হইবে। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা হইতে চিরজীবন সকল কাজে তাহাদের একটি শৃঙ্খলা আসিবে। জীবনের সিদ্ধিলাভে এই শৃঙ্খলা যে কতদূর সহায়তা করে, তাহার সিদ্ধি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন,তাঁহারাই জানেন।

এই নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সাধনার অন্য একটি প্রধান অঙ্গের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই অঙ্গটি সংযম। সংযম ব্যতীত নিয়মানুবর্ত্তিতা সফল হইতে পারে না। এই নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে যত প্রকার বাধা আছে, আশু সুখের প্রলোভন ও প্রতিকূল প্রবৃত্তির উত্তেজনা তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল। ক্রোধ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনা ক্ষমার নিয়মে বাধা দেয়, ত্যাগের নিয়মে লোভ বাধা দেয়, সৌহার্দ্দের নিয়মে অসূয়া বাধা দেয়, পরহিতের নিয়মে স্বার্থ বাধা দেয়, কৃচ্ছের নিয়মে বিলাসভোগেচ্ছা বাধা দেয়, শ্রমশীলতার নিয়মে আলস্য ও আরামপ্রিয়তা বাধা দেয়, আদেশ পালনের নিয়মে স্বেচ্ছা-চার-প্রবৃত্তি বাধা দেয়, শৃঙ্খলার নিয়মে উচ্ছৃঙ্খল ভাবপ্রবণতা বাধা দেয়। সুতরাং পদে পদে বালকদের ক্রোধ, লোভ, স্বার্থচিন্তা,আলস্য বিলাসভোগেচ্ছা প্রভৃতি সংযমের প্রয়োজন হয়। এইগুলি যে কেবল নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিকূল তাহা নহে। নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, আপনাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই ইহারা সর্ব্বদা মানবকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতে চায়। প্রথম হইতে সংযমের অভ্যাসই অধঃপতন নিবারণ করিবার প্রধান উপায়।

তারপর মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ন্যায্যই হউক আর অন্যায্যই হউক, যাহা পাইতে বা করিতে তার ইচ্ছা হইবে,—যাহা পাইতে বা করিতে সে আপনাকে অধিকারী মনে করিবে—তাহা পাইতে বা করিতে তার মনে প্রবল একটা আগ্রহ জন্মে—সকল বাধা ঠেলিয়া সে তাহা পাইতে বা করিতে চায়। না পাইলে না করিতে পারিলে, সে আপনাকে যারপরনাই অসুখী মনে করে, কিছুতেই শান্তি পায় না। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা যতই সাধু হউক, কার্য্য যতই সাধে হউক, আশা যতই যুক্তিযুক্ত হউক, আর অধিকারসম্ভোগে যতই তার ন্যায্য দাবী থাকে, জীবনে সকল ইচ্ছা, সকল আকাঙ্ক্ষা কাহারও পূর্ণ হয় না, সকল কার্য্য কেহ লাভ করিতে পারে না, সকল আশা কাহারও ফলবতী হয় না, সকল অধিকারলাভে কেহ ধন্য হয় না। মানুষকে জীবন-সংগ্রামে অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক আশাভঙ্গের আঘাত, অনেক অধিকারচ্যুতির বেদনা সহিতে হয়। ধীরচিত্তে বীরের ন্যায় এই সব সহিবার শক্তি, সহিয়াও অদম্য উৎসাহে জীবনের পথে অগ্রসর হইবার শক্তি যার আছে—সে-ই মনুষ্যত্বের অধিকারী। পরিণামে এই মনুষ্যত্বই জয়যুক্ত হয়, সিদ্ধির গৌরবে ধন্য হয়, অসিদ্ধিতেও আত্মার তুষ্টিতে সান্ত্বনা পায়। বাল্য-বয়স হইতেই যে সংযমী, জীবন সংগ্রামে এই মহতী শক্তি তাহাতেই সম্ভব।

ছোট ছোট কার্য্যে যাহারা সংযমের অভ্যাস করে, দৈনিক জীবনের ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট আরাম বিরাম ও আমোদ-প্রমোদের ইচ্ছা—ছোট ছোট বিলাস-বাসনা, ছোট ছোট আশাভঙ্গের আঘাত, ইচ্ছার প্রতিকূলতা, অধিকারচ্যুতির বেদনা, যাহারা সংযম করিতে শেখে,—সংযমে তাহাদের এমন একটা প্রবল সাধারণ শক্তি জন্মে যে, প্রয়োজন মত বড় রিপুর উত্তেজনা, ভাবের আবেশ, দুঃখের তাড়না সব তারা সংযত করিয়া রাখিতে পারে।

বাল্য বয়স হইতে ইচ্ছায় যে কখনই বাধা পায় নাই, বাধার ব্যথা শেখে নাই, যাহা করিতে চাহিয়াছে তাহাই করিয়াছে, কর্ম্মে সংযত হইবার প্রয়োজন যার কখনও হয় নাই, ত্যাগ যে কখনও অভ্যাস করে নাই, সে জীবন সংগ্রামে অগ্নিমধ্যে শুষ্ক তৃণের ন্যায়, জল মধ্যে কাঁচা ঘটের ন্যায়, ঝটিকা তাড়িত তরঙ্গাঘাতে বালির বাঁধের ন্যায় শক্তিহীন। তার মত দুর্ভাগ্য জগতে কে?

বালকগণ এইরূপে আদর্শ বুঝিয়া আদর্শ অনুবর্ত্তনের চেষ্টায়,নিয়মে ও সংযমে ব্যষ্টি জীবনে মনুষ্যত্বের শক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এক ব্যষ্টি জীবনেই মানবজীবনের পূর্ণতা হয় না, ব্যষ্টিজীবনের কর্ত্তব্য পালন শেষ হয় না,ব্যষ্টিজীবনের উন্নতিতেই উন্নতির মত উন্নতি কেহ লাভ করিতে পারে না। সমাজের মধ্যে,জাতির সঙ্গে,মানবের ব্যষ্টিজীবন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক মানবের জীবন তার সমাজজীবনের ও জাতীয়জীবনের অধীন। সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের উপর প্রত্যেক মানবের ব্যষ্টি জীবনের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করে। সমাজ ও জাতি সকলকে লইয়া,—সমাজেরও জাতিরও কাজ যাহা, যাহার উপর সমাজের ও জাতির মঙ্গল নির্ভর করে, তাহা সকলের কাজ, সকলকে একত্র হইয়া তাহা করিতে হয়। যে সমাজে ও যে জাতিতে অধিক লোক সমবেত চেষ্টায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জনে সমাজের হিত সাধনে তৎপর, সেই সমাজ তত শক্তিশালী, তত উন্নত,—সেই সমাজে ব্যক্তিগত মানবশক্তি তত বিকশিত হইবে, ব্যক্তিগত মানবজীবনও তত উন্নত হইবে। মানবজীবনে যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, সমবেত চেষ্টায় সকলের হিতসাধন তার মধ্যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে যে অশক্ত তার জীবন অপূর্ণ—জীবনের ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবনের পূর্ণ শিক্ষা সে কখনও পায় নাই, পূর্ণ সাধনায় তার জীবন গঠিত হয় নাই।

বালকগণের ব্যষ্টিজীবন গঠনে আমাদিগকে যেরূপ যত্ন নিতে হইবে, তাহাদের সামাজিক জীবন গঠনেও আমাদের সেইরূপ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। একদিকে যেমন তাহাদিগকে তাহাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝাইতে হইবে,—অপরদিকে কর্ম্মসাধনায় এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ সমবেত চেষ্টায় জাতির ও সমাজেরও হিতকর যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে, তাহা তাহাদের দ্বারা করাইতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ছাত্রজীবন বিদ্যাভ্যাসের কাল। তখন অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ছাত্রগণ কেবল বিদ্যাভ্যাসই করিবে,বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এমন সকল কার্য্য হইতেই সাবধানে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে। কিন্তু ইঁহারা এই স্থলে বড় একটি ভুল করেন। প্রকৃত পক্ষে ছাত্র-জীবন জীবন গঠনের কাল। আত্ম-জীবনে পারিবারিক জীবনে,সামাজিক ও জাতীয় জীবনে, মানবের যাহা কিছু ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম পূর্ণভাবে পালন করিবার

যোগ্যতা ছাত্রজীবনে মানবকে লাভ করিতে হইবে। বিদ্যাভ্যাস জীবন-গঠনে সহায়তা করে, জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য বুঝিতে ও পালন করিতে অনেক পরিমাণে মানবকে শক্তিদান করে, তাই ছাত্রকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু কেবল বিদ্যাভ্যাসেই কেহ মানুষ হয় না। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা অর্থাৎ কর্ম্মের অভ্যাসও চাই। ব্যক্তিজীবনগঠনেও যেমন সাধনা চাই, সাধনা ব্যতীত কেবল পড়িয়া শুনিয়াই যেমন ব্যক্তিজীবনের ধর্ম্ম পালনে কেহ সহজে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও সাধনার প্রয়োজন, সাধনা ব্যতীত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম-পালনেও কেহ সমর্থ হয় না। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের ছাত্রজীবন সাধারণতঃ সাধনা-বিহীন, বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রজীবনে যে আর কিছু করিবার আছে, শিখিবার আছে, সহজে এরূপ আমরা বড় মনে করি না; মনে না করাই আমাদের একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রজীবনের আর কোন কর্ত্তব্যের কথা উঠিলেই আমাদের মনে হয়, এটা যেন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের বহির্ভূত ও বিরুদ্ধ।

আবার আমরা ইহাও দেখি যে, যে সব বালক বড় বেশী পড়ুয়ে,—যারা কেবল পড়ে, আর কিছু করে না, তারা বড় হইয়া যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন সাংসারিক সামান্য কার্য্যে পর্য্যন্ত শিশুর ন্যায় অনভিজ্ঞতা দেখায়। বস্তুতঃ এক বই পড়া আর বইএর কথা বলা ব্যতীত আর কোন কিছুই তাহারা করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কি সংসারে কি সমাজে কোন যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কর্ম্মানভিজ্ঞতা এরূপ বিদ্বান কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই শেষে অপদার্থ বলিয়া অবজ্ঞা করেন—সকল দায়িত্বের কার্য্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। এ পৃথিবী মানবের কর্ম্মক্ষেত্র, এই পার্থিব মানবজীবন কর্ম্মময়, কর্ম্মেই জীবনের পরিণতি, কর্ম্মেই শক্তি, কর্ম্মেই জীবনের সার্থকতা,—সাধনা ব্যতীত সেই কর্ম্মে যাহার সামর্থ্য না হইল তার শিক্ষা বৃথা।

সামাজিক ও জাতীয় জীবনের যে কাজ, পাঁচজনে মিলিয়া তাহা করিতে হইবে, করিতে শিখিতে হইবে। পাঁচজনের যে কাজ তাহা একা নিজের কাজ অপেক্ষা করা কঠিন। তাহা কি কেহ না শিখিয়া করিতে পারিবে? পাঁচজনে মিলিয়া পাঁচজনের কাজ করিয়া সমাজ রক্ষা ও জাতীয় উন্নতি সাধন যদি মানবজীবনে প্রয়োজন হয়, তবে তার উপযোগী শিক্ষার ও সাধনারও প্রয়োজন হইবে।

সকল মানবজাতির চরম উন্নতিতে জগতে ও মানব সমাজে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার পরিপূর্ণতা। মানবজাতিকে এই উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য বিধাতা বিভিন্ন মানবকে বিভিন্ন শক্তি দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। সেই শক্তি দ্বারা যেটুকু পারে, মানবজাতির উন্নতিসাধন করিবে, ইহাই প্রত্যেক মানবের জীবনের বিধিনির্দ্দিষ্ট চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনে জীবনে বিধাতার ইচ্ছাপূরণ, চরম ধর্ম্ম সাধন. জীবনের এই লক্ষ্য কি,—বিধাতার কোন্ ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে কোন্ শক্তি সে লইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রত্যেক বালককে জানিতে হইবে। লক্ষ্য চিনিয়া ও বুঝিয়া, সেই লক্ষ্যের অভিমুখে যে কর্ম্মের গতি, সেই কর্ম্মে তাহাকে সেই শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। এই অনুশীলনেই সেই শক্তির সাধনা, এই সাধনাতেই সেই শক্তির পুষ্টি ও বিকাশ। এই সাধনাও অন্যান্য সাধনার ন্যায় শিক্ষার অঙ্গ।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ মানবের সকল শক্তির আদিম উৎস, চরম পরিণতি। যত মানব আপনাকে ও আপনার সঙ্গে বিশ্বদেবতার সম্বন্ধ চিনিতে ও বুঝিতে থাকিবে, জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য তার তত পরিস্ফুট হইতে থাকিবে,—সেই আদর্শলাভের, লক্ষ্যসাধনের পথে তত সে স্বাভাবিক শক্তিতে চলিতে থাকিবে। যে আদর্শ, যে লক্ষ্য আজ আমরা তাহাদিগকে শিক্ষার এমন দীপালোক প্রতিভাত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির স্বাভাবিক দীপ্ত সূর্য্যালোকে সে তাহা কালে আপনিই দেখিবে,—রোগীর তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় যে নিয়ম ও সংযমের অভ্যাস আমরা আজ বালকগণকে শিখাইব, কালে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ স্বাস্থ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জলের ন্যায় সেই নিয়ম ও সংযমের অধীনতা সে গ্রহণ করিবে। সুতরাং এই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ যে সাধনায় হইতে পারে, তাহা সাধনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। আত্মচিন্তা, ভগবদ্‌চিন্তা, ভগবদুপাসনা, ভগবানে আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ—ইহাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও শক্তি জাগরণের উপায়। সুতরাং অন্যান্য সকল কর্ম্মাভ্যাসের সঙ্গে, যে ভাবে যতটুকই হউক, এই সকল কর্ম্মের সার কর্ম্মে, সকল সাধনার সার সাধনায়, বালকগণকে দীক্ষিত করিতে হইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম এ, বি এল।

সুশ্রুত সংহিতায় ভোজনের প্রারম্ভেই মিষ্টদ্রব্য খাইবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এদেশে ভোজনশেষে মিষ্টভক্ষণই চিরন্তন প্রথা। তন্ত্রেও বলে—"মধুরেণ সমাপয়েৎ।" এখন যেমন আমরা সুক্তা, শাকের ঘণ্ট প্রভৃতি নিরামিষ ব্যঞ্জন সর্ব্বপ্রথমেই আস্বাদন করিয়া তৎপরে আমিষ ও অম্ল ভক্ষণ করি এবং সর্ব্বশেষে পায়স পিষ্টকাদি বিবিধ মিষ্টান্ন খাইয়া ভোজন সমাপন করি, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাও ঠিক তাহাই করিতেন। কালক্রমে অনেক প্রকার নূতন মিষ্টান্নের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মিষ্টান্ন পাকও সেকালের অপেক্ষা সম্ভবতঃ অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু বিশুদ্ধ উপকরণের অভাবে অধুনা-প্রস্তুত মিষ্টান্ন সেকালের মিষ্টান্ন অপেক্ষা বিশেষ স্বাস্থ্যজনক বলিয়া মনে হয় না। এখন আমরা প্রতি বৎসর পৌষ পার্ব্বণে আলু ও কড়াই শুঁটির দৌলতে নানাবিধ উপাদেয় পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়া সেকালের গুড়পিঠা, লবণঠিকরি, সিদ্ধপুলি বা আসিকাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি; মুগসাউলি, ভাজাপুলি, নারিকেল-পুলি, সরুচাকুলি প্রভৃতিরও এখন আর সে আদর নাই। কিন্তু আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন প্রত্যেক সামাজিক ভোজে নানাবিধ পিঠাপুলি ও বড়া প্রস্তুত হইত।

পায়স ও মোদক অতি প্রাচীনকালেও প্রস্তুত হইত। বাল্মীকির রামায়ণে পায়সের উল্লেখ আছে এবং কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী"তে পরমান্নের ও খণ্ড-মোদকের অর্থাৎ খাঁড়গুড়ে প্রস্তুত মোয়া বা লাড্ডুর উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে জানা যায় যে, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে "সুরস পায়স" ও ইক্ষুরস-সম্ভূত গুড়ে ভিয়ান করা মোদক ব্যবহৃত হইত। আমার ধারণা যে ক্ষীরখণ্ড বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন সন্দেশ, ছানাবড়া প্রভৃতি ছানার মিষ্টান্ন অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে একটি প্রাচীন

ছেলে-ঘুম-পাড়ানী গীতিকা আছে; উহার একটি ছত্র এই মতের পোষক বলিয়া মনে হয়।

"খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাথাব চুয়া।"

সন্দেশের জন্মভূমি যে বঙ্গদেশ তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের আর কোনও প্রদেশে পূর্ব্বে সন্দেশ প্রস্তুত হইত না; এখন যদি কোথাও হয়, তাহা বঙ্গের আমদানী। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যে এতদ্দেশে নানাবিধ সন্দেশ প্রস্তুত হইত তাহার কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে আধুনিক সন্দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই; বৃন্দাবন দাসের সময়ে সন্দেশে চিনি মাথান হইত—

"বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা ম্রক্ষিত।"

কৃত্তিবাস ভরদ্বাজের আশ্রমে বানরভোজ বর্ণনচ্ছলে তৎকাল-প্রচলিত অনেক প্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদির নাম করিয়াছেন; যথা মতিচুর, নিখুতি, মণ্ডা, রসকরা, মনোহরা, সরুচাকুলি, লবণঠিকরি, গুড়পিঠা, রুটি, লুচি, খুরমা, কচুরি, ক্ষীর, ক্ষীরসা, ক্ষীরের লাড়ু, মুগসাউলি, অমৃতা, চিতুইপুলি, নারিকেলপুলি, কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া, ছানাভাজা, থাজা, গজা, জিলিপি, পাঁপড়।

মতিচুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমি ভুবনেশ্বরে গণেশের মতিচুর ভক্ষণের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রুটি, লুচি, কচুরি, জিলিপি ও পাঁপড় যে পশ্চিমাঞ্চলের আমদানী তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এদেশে লুচির অনেক পূর্ব্বে রুটি প্রচলিত হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা গোপাল-মন্দিরের অন্নকূট বর্ণনায় রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লুচির কোনও উল্লেখ করেন নাই—

"নব বস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটী-রাশি উপ-পর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥"

কবিকঙ্কণও পরটার * উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লুচির কথা লিখেন নাই।

"বিকালে ব্যঞ্জন দশ প্ররেটি টাবার রস
ভোজন করিল কলাবতী।"

ভারতচন্দ্র লুচির যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে, সে সময়েও উহা জনসাধারণের দুর্ল্লভ খাদ্য ছিল—

"সুধারুচি মুচ মুচি লুচি কত গুলি।"

"জিলিপি" একটি আরবী শব্দের অপভ্রংশ, মুসলমানেরাই ভারতে এই মিষ্টান্ন প্রচলিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। "পাঁপড়" শব্দের অর্থ পাপ্‌ড়ি; 'বর্গী'রা পাঁপড়ের বড় ভক্ত ছিল, কিন্তু তাহারা পাঁপড়ে খুব ঝাল দিত। কবিকঙ্কণ পিষ্টকাদির অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"কলাবড়া মুগসাউলী ক্ষীর-মোননা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।"

তিনি মিঠা দধির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন—

"মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স।"

কিন্তু তখন চিনিপাতা দধির সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা ঠিক বলা যায় না, বোধ হয় দধিতে বাতাসা ফেলিয়া মিঠা করা হইত; ধনপতির দধিভোজন সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"দধি খায় ফেণী তথি করে মটমটী।"

সেকালে পিঠা প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ ছিল পিঠালি, আটা, গুড় ও নারিকেল। পিঠার ভিতর নানাবিধ পূর দেওয়া হইত; ঘনরাম চক্রবর্ত্তী সুরিক্ষার রন্ধন বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পূর দিয়া মিঠা॥"

তখন নানা প্রকার বড়া প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে কলাবড়া, তালবড়া, মুগবড়া, মাষবড়া, দধিবড়া ও কাঞ্জিবড়া বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেকালে তিলাখাজা এবং হরেক রকম লাড়ুও খুব প্রচলিত ছিল; ঝাল লাড়ু বা মরিচা-লাড়ুর উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি; 'গঙ্গাজলী' লাড়ুর কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, কবিকঙ্কণ ও কবি বংশীদাস বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন; চৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকপ্রকার লাড়ু প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে—

"শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥

কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া লাড়ু কৈল॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে যে সকল মিষ্টান্নের নাম পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অনেক প্রকার মিষ্টান্নের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"মনোহর লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃত মণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূর কুলি।
রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়া কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥"

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে খেচরান্নের উল্লেখ আছে—

"পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।"

কিন্তু তৎপূর্ব্বের কোনও গ্রন্থে খেচরান্নের নাম পাওয়া যায় না; বস্তুতঃ উহা নবাবী খাদ্য। কথিত আছে যে শাহজাহান বাদশাহ খেচরান্ন খাইতে বড় ভালবাসিতেন; এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ বিবরণে একটি কৌতুকাবহ গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—একদা পারস্যের রাজদূত বাদশাহের সহিত একত্র আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বাদশাহ খিচুড়ি খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; রাজদূত খিচুড়ি স্পর্শ করিলেন না, কিন্তু অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য বুভুক্ষিতের ন্যায় উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বাদশাহ রাজদূতকে ব্যঙ্গের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কুক্কুরের জন্য কি রাখিলেন?" রাজদূত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"খিচুড়ি!"

পূর্ব্বে অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনের সঙ্গে ফলাহারেরও আয়োজন হইত; ফলাহারের অয়োজন কিরূপ হইত তাহা কবি বংশীদাস সুচারু রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি করিল প্রচুর।
ফলাহারের দ্রব্য কৈল মুগের অঙ্কুর॥
আদা চাকি চাকি আর ভুনা কলাই।
ঘৃতেতে দুভাজা চিড়া গন্ধে আমোদিত॥
খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত॥
উত্তম ক্ষীরসা দিয়া গঙ্গাজলী লাড়ু।
ইক্ষুরস রাখিলেক ভরি লোটা গাড়ু॥"

রন্ধন সমাপ্ত হইবার অনতিপূর্ব্বে স্নানের আয়োজন হইত। বংশীদাস চাঁদ সওদাগরের বাটীতে জ্ঞাতিভোজ বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন—

"এই মত ভক্ষ্য দ্রব্য করিল বিস্তর।
হেথা আসি জানাইল চান্দর গোচর॥
হইলেক রন্ধন বিলম্ব নাহি আর।
স্নান করিবারে সাধু হৈল আগুসার॥
স্নান করি শিরে শিক্ষা বন্ধন করিল।
নাম গোত্র উচ্চারিয়া সূর্য্যে অর্ঘ দিল॥
করযোড়ে শ্রীসূর্য্যের স্তব পাঠ করি।
ধ্যানে মগ্ন হইয়া চান্দ পূজে হরগৌরী॥

*   *   *   *   *

ধুতি বস্ত্র জ্ঞাতি জনে দিলেক স্নাতে।
থাল গাড়ু পীড়ি দিল ভোজন করিতে॥"

সে সময়ে জলের ঘটীর পরিবর্ত্তে "গাড়ু" ব্যবহৃত হইত। বিশেষ সম্মানার্থ বা ভক্তিভাজন অতিথির জন্য পীড়ির উপর বসন পাতা হইত।

ব্রাহ্মণেতর জাতীয়েরাও স্তব পাঠ ও পূজা সাঙ্গ না করিয়া আহার করিতেন না। ধনপতি সওদাগরের গৃহে জ্ঞাতি ভোজন বর্ণনায় কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
শীঘ্র জানাইল দুয়া সাধুর সদন॥
আইস আইস বলি ডাকয়ে দুর্ব্বলা।
বিদগধ সদাগর কিছু করে খেলা॥
চারি দণ্ড মোর আছয়ে স্তব পাঠ।
রন্ধন ভুঞ্জাও যারা যাবে র বাট॥
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন।
তার বোলে দুর্ব্বলা ভুঞ্জায় বন্ধুজন॥
* * * *
সন্ধ্যাকাল দুর হৈল সাঙ্গ হৈল স্তুতি।
সালগ্রাম শিলাজল নিল ধনপতি॥
লহনা যোগায় জল পাখালিল পা।
ভোজন মন্দিরে সাধু তুলিলেন গা॥
শিব সোঙরিয়া কৈল দুই আচমন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটীতে দুর্ব্বলা দিল ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
সোঙরিল জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুরনদী জলে সাধু করিল গণ্ডুষ॥"

সেকালে ভোজনের পূর্ব্বে "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া গণ্ডুষ করার প্রথা ছিল। বংশীদাস লিখিয়ায়ছন—

"জলহস্তে লক্ষ্মীধর শ্রীবিষ্ণু বলিয়া।
পঞ্চগ্রাসী কৈল অন্ন গণ্ডুষ করিয়া॥"

ভোজন শেষ হইলে আচমনান্তেও লোক "শ্রীবিষ্ণু" * বলিয়া পান মুখে দিত। মুখশুদ্ধির জন্য পানের সহিত কর্পূর ব্যবহৃত হইত; বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা হরিতকী ব্যবহার করিতেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ধাতুময় পাত্র ব্যবহার

* রামেশ্বরের সময়ে গুরুভোজনান্তে লোকে সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের নাম করিত।

করিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য "বত্রিশ আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে" ভাত বাড়া হইত এবং কেয়াপত্র বা কলার খোলার ডোঙ্গায় ব্যঞ্জন রাখা হইত; পায়স ও দুগ্ধাদি নূতন মৃৎকুণ্ডিকায় (মাটির ভাঁড়ে) ভরা হইত। বিষ্ণুর ভোগে ও বৈষ্ণবের অন্নের শীর্ষদেশে তুলসী মঞ্জরী সন্নিবেশিত হইত। সেকালে ভাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘি ঢালা হইত; কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন—

"পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥"

কোনও ব্যক্তিকে বিশেষ সমাদর দেখাইতে হইলে তাঁহার অন্নের শিরোভাগে ঘৃতের বাটী বসাইয়া দেওয়া হইত; এ প্রথা এখনও প্রচলিত।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের জন সাধারণের মধ্য তামাক খাওয়া কি নস্য গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে কি পুরুষ কি স্ত্রী "দোখণ্ডী (অর্থাৎ দ্বিখণ্ডি) সরস গুয়া" অষ্ট প্রহর চর্ব্বণ করিতে ভাল বাসিতেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

মরণ গান।

আমি দেখেছি জগতে অনেক নূতন
অনেক শুনেছি গান,
ওগো দেখেছি তড়াগে ফুটিতে নলিন
এবে দিবা অবসান;
এবে যেতে হ'বে মোরে মরণের পারে
ছাড়ি এ জীবন-যান,
তাই রেখেদিয়ে আশা দূরে বহুদূরে
গাহি গো করুণ গান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপের কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রোমাণে ও জর্ম্মাণে জাতীয় সংমিশ্রণ—নবযুগের আরম্ভ।

ক। রোমাণ ও জর্ম্মাণ—নূতন রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ।

পশ্চিম রোমসাম্রাজ্য ভরিয়া নূতন সব জর্ম্মাণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন প্রাচীন রোমাণের সঙ্গে নবীন জর্ম্মাণ কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, প্রাচীন রোমীয় শাসনতন্ত্রের অবশেষ বা স্মৃতি যাহা ছিল, তাহার সম্বন্ধে জর্ম্মাণ রাজনীতি কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার কিছু মোট আলোচনা আবশ্যক।

গথগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন। নিজ নিজ দলপতির অধীনে সম্রাটের সহায়তায় প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিবেন, এই নিয়মে সম্রাট্ প্রদত্ত ভূমি ইহারা ভোগ করিতে থাকেন। রোম সাম্রাজ্যের প্রজা ইঁহারা হইলেন, রোমীয় সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং চারিদিকে বহু রোমাণের সঙ্গে মিলিতে মিশিতেও আরম্ভ করিলেন। অচিরেই গথগণ আপনাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া বিরাট রোমীয় প্রজাসঙ্ঘের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবেন, এইরূপ লক্ষণ দেখা গেল। এমন সময় মহাবীর এলারিকের আবির্ভাব হইল। গথগণের জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীর্ণ রোমসাম্রাজ্যের মধ্যে নূতন একটি স্বাধীন গথ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই এলারিকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য লইয়াই তিনি ইটালী ও রোম আক্রমণ করেন। এলারিকের প্রভাবে গথগণ অতি প্রবল এক জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আপনাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, আপনাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় শক্তির বলে যে রোমীয় অঞ্চলে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা গথরাই অন্যান্য জর্ম্মাণদের

প্রথমে দেখান। জাতীয়ত্ব হারাইয়া একেবারে রোমাণদের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া রোমাণদের উপরেই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, মহাবীর এলারিক সর্ব্ব প্রথমে এই নীতি নির্দ্দিষ্ট করেন। এলারিকের পর আথলূফ পশ্চিমগথদের আধিপত্য গ্রহণ করেন। আথলূফও প্রথমে এই নীতির অনু-সরণ করেন। রোমসাম্রাজ্য এবং রোমাণ নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়া তাহার স্থানে গথ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আথলূফের প্রথম অভিপ্রায় এইরূপ ছিল। কিন্তু বিচক্ষণ আথলূফ অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইলে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির যতদুর বিকাশ আবশ্যক, বর্ব্বর গথগণের মধ্যে এখনও তাহা হয় নাই। গথগণের সহায়তায় বড় কোনও রাজ্য জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও রূপ শাসনশৃঙ্খলার অধীনে আনিয়া তাহা স্থায়ীভাবে রক্ষা করা অসম্ভব। বৃহৎ রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব করিতে হইলে রোমের নাম ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব রোমীয় শাসনতন্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এলারিক যে নীতি নির্দ্দিষ্ট করেন, আথলূফ তাহা অবস্থা অনুসারে এই ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নানা কারণে সম্রাট্ হনোরিয়াসের সঙ্গে মিত্রতাব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া তিনি ইটালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমগথদের লইয়া স্পেন অঞ্চলে গিয়া নূতন একটি রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইটালীতে ও রোমে তাঁহার এই নূতন নীতির কোনওরূপ পরীক্ষা হইল না।

ইহার পরে পূর্ব্বগথরাজ মহাবীর থিওডোরিক—ইটালীর প্রথম গথরাজা—আথলূফের এই সমীচীন নীতিই অবলম্বন করেন। রোমীয় শাসনতন্ত্র রক্ষা করিয়া শিক্ষিত ও সুসভ্য রোমাণ্ রাজপুরুষদের দ্বারাই তিনি ইটালী শাসন আরম্ভ করিলেন। রোমীয় সভ্যতা এবং শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তবে তিনি ইহাও বুঝিয়া ছিলেন যে রোমীয় সভ্যতার তৎকালীন প্রভাবে পুরুষের চরিত্র দুর্ব্বল ও কোমল করিয়া ফেলে। যে যোদ্ধ গথদের বাহুবল সাম্রাজ্যরক্ষার পক্ষে তাঁহার প্রধান সহায়, সেই গথগণ রোমীয় সভ্যতার সংস্পর্শে দুর্ব্বল ও পুরুষত্বহীন না হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন, দুর্ব্বল পুরুষত্বহীন রোমা-ণের প্রভুত্বের দিন গিয়াছে,—ভবিষ্যতের জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের প্রভুত্ব সমরবিলাসী বীর জর্ম্মাণের হাতেই আসিল। কিন্তু এই প্রভুত্ব করিতে হইলে

রোমকে একেবারে বিলুপ্ত করিলে চলিবে না। রোমীয় তন্ত্র বিলোপ করিয়া তাহার স্থানে একেবারে নূতন কোনও জর্ম্মাণ্ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, বর্ব্বর জর্ম্মাণ্ জ্ঞানে সভ্যতায় ও সামাজিক দায়িত্ব বোধে এখনও এরূপ উন্নত হয় নাই। রোমীয় রাজপুরুষগণের উন্নতবুদ্ধির সহায়তায় রোমীয় শাসনতন্ত্র চালাইয়া বাহুবলে জর্ম্মাণ তাহার উপরে প্রভুত্ব করিবে, ইহাই জর্ম্মাণের হাতে যে বৃহৎ রাজ্য আসিয়া পড়িয়াছে তাহা স্থায়ী ভাবে হাতে রাখিবার প্রধান উপায়।

পরবর্ত্তী যুগে গথদের প্রাধান্য থাকিল না,—গথগণ আপনাদের একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোনও দেশ বা জাতির সম্পর্কে 'গথ' নামও ইহার পরে বিলুপ্ত হইল,—কিন্তু গথবীর এলারিক, আথল্‌ফ এবং থিওডোরিক যে নীতি নির্দ্দিষ্ট করেন, ভবিষ্যতে রোমাণ মুলুকে জর্ম্মাণের স্থান এবং রোমাণে ও জর্ম্মাণে নূতন সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে সেই নীতির অনুসরণেই স্থির হয়।

এলারিক, আথল্‌ফ এবং থিওডোরিকের ন্যায় উন্নত-ধী জর্ম্মাণ অধিনায়ক কেহ ইঁহাদের পরে শীঘ্র আবির্ভূত হন নাই। ইটালীতেও নবাগত লম্বার্ডগণের মধ্যে এমন কোনও অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন না, যিনি সকল লম্বার্ডদলকে আপনার অধীনে আনিয়া সমস্ত ইটালী ভরিয়া একটি লম্বার্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। রোমকে কেন্দ্র করিয়া রোমীয় রাজ্যতন্ত্র অব্যাহত রাখিয়া, তাহার উপর প্রভুত্ব করা পরবর্ত্তী জর্ম্মাণদের পক্ষে সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু রোমীয় শক্তির মান ও গৌরবের স্মৃতি কেহ লোপ করিবার চেষ্টা আর করেন নাই। রোমীয় রাষ্ট্র ও সভ্যতার মহিমার প্রতি নূতন জর্ম্মাণ রাজা ও দলপতিগণের যে বহু পূর্ব্ব হইতে একটা সম্ভ্রমের ভাব ছিল, তাহাও একেবারে বিলুপ্ত হইল না। পাশ্চাত্য প্রদেশগুলি তাঁহাদের অধিকৃত হইলেও রোম সাম্রাজ্য এখনও রহিয়াছে,—কন্‌ষ্টাণ্টাইনের নূতন রোমে মহামহিম সম্রাটগণ এখনও রাজত্ব করিতেছেন। পাশ্চাত্য অঞ্চলের জর্ম্মাণ্ রাজগণ প্রায় সকলেই প্রাচ্য সম্রাটগণকে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইতেন। অনেকে নামতঃ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই 'পেট্রিসিয়ান' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সম্রাটের নিকট হইতে উপাধি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে পারিলেই, রাজ্যশাসনে তাঁহাদের অধিকার ন্যায়তঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচ্য রোমের সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেও, পাশ্চাত্য রোমরাজ্যে বিজিত রোমাণদের উপরে নূতন জর্ম্মাণ্ রাজগণ আপনাদের প্রভুত্বই রক্ষা করিয়া চলিলেন। হীনবীর্য্য বলিয়া রোমাণদের ইহারা অবজ্ঞা করিতেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসনে রোমাণদের সহায়তাও গ্রহণ করিতেন। জর্ম্মাণের প্রভুত্বের অধীনে আসিলেও, শিক্ষিত এবং সুসভ্যআচারে অভ্যস্ত রোমাণরাও বর্ব্বর বলিয়া জর্ম্মাণদের অনেকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে প্রথম প্রথম রোমাণে ও জর্ম্মাণে সামাজিক সংমিশ্রণে কিছু বাধা ঘটিয়াছিল।

খ। জাতীয় সংমিশ্রণ।

কিন্তু এ বাধা অনেক দিন রহিল না। রোমের রাষ্ট্রীয়শক্তির পতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটি নূতন শক্তি রোমে গঠিত হইতেছিল, যাহার আশ্রয়ে প্রাচীন রোমীয় সভ্যতার যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু কল্যাণ-কর,—তাহা সব রক্ষা পাইল, যাহার প্রভাবে বিজেতা জর্ম্মাণ বিজিত রোমাণের সভ্যতার বশীভূত হইল। এই শক্তি রোমীয় ধর্ম্মমহামণ্ডলের শক্তি।

খৃষ্টীয় এবং রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলের অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। এস্থলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে জর্ম্মাণ বিপ্লবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়, তখন পশ্চিম ইয়োরোপের রোমীয় প্রজাবর্গ সকলেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মশাসন সম্বন্ধে সকলেই রাজধানী রোমের প্রধান যাজক বা পোপের একটা প্রাধান্য স্বীকার করি-তেন। যে সব ধর্ম্মযাজক গণের হস্তে পাশ্চাত্য রোমীয়প্রদেশগুলির প্রজাবর্গের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের ভার ছিল, তাঁহারাও রোমের পোপকে আপনাদের প্রভু বলিয়া মানিতেন।

জর্ম্মাণরাজগণ সাধারণতঃ রোমীয় যাজকমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং ইহাঁদের প্রতি কোনওরূপ বিরুদ্ধভাবও কখনও দেখান নাই। জর্ম্মাণ-দের আক্রমণে রোমীয় রাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত হইল বটে, রোমীয় রাষ্ট্রের উপরে জর্ম্মাণদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলের উপরে ইহাঁরা কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিলেন না।

প্রাচীন রোমাণ্ গণের ন্যায় প্রাচীন জর্ম্মাণরাও বহু দেবদেবীর পূজা করিতেন। অন্যান্য আর্য্যজাতির পূজিত দেবদেবীর ন্যায় জর্ম্মাণদের দেব-দেবীরও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দেবরূপ কল্পনা। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যখন রোম

সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইল, তখন গথ ও অন্যান্য বহু জর্ম্মাণজাতি এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে খৃষ্টান্‌দের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্ম মত এবং সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জর্ম্মাণগণ যে মতের খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সে মত রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলের মত হইতে বিভিন্ন ছিল। সুতরাং খৃষ্টান্ জর্ম্মাণরাও, রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলের অধীন ছিলেন না।

কিন্তু রোমীয় ধর্ম্মমতের যাজকগণ যেমন পোপের নেতৃত্বাধীনে এক সুগঠিত ও শক্তিশালী মণ্ডলীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন,—জর্ম্মাণদের ধর্ম্মমতের আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ সেরূপ কোনও মণ্ডলী ছিল না। সুতরাং পোপ-গণ সহজেই জর্ম্মাণরাজগণকে আপনাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মমণ্ডলের অধীনে আনিতে সমর্থ হইলেন।

জর্ম্মাণগণ রোমাণদের সঙ্গে এক ধর্ম্মমণ্ডলীভূক্ত হইয়া,এক যাজকসম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাসনের অধীনে আসিলেন। রোমীয় ধর্ম্মশাসনের অধীনে আসায় ক্রমে রোমীয় সভ্যতা ও শিক্ষাও ইহাঁদের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ইহার ফলে রোমাণে ও জর্ম্মাণে বড় দ্রুত সামাজিক সম্মিলন ও জাতীয় সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল।

স্পেনে, গলে এবং উত্তর ইটালীতে, রোমীয় শাসনকালে, এই সব অঞ্চলের আদিম অধিবাসী কেল্টে এবং রোমাণে বহুপূর্ব্বেই জাতীয় সংমিশ্রণ হইয়া-ছিল। রোমের প্রজার অধিকারে এই সংমিশ্রিত জাতি রোমাণনামেই পরিচিত হইয়াছিলেন, এখন এই রোমাণের সঙ্গে আবার জর্ম্মাণের নূতন জাতীয় সংমিশ্রণ হইল। জর্ম্মাণ যাঁহারা এই অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন, সংখ্যায় তাঁহারা রোমাণদের অপেক্ষা অনেক অল্প এবং সভ্যতায়ও হীনতর। সুতরাং এই মিশ্রণে জর্ম্মাণরাই রোমীয় ভাবাপন্ন হইলেন। রোমীয় ধর্ম্মে তাঁহারা দীক্ষিত হইলেন, রোমীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন, রোমীয় আচার নিয়ম বিধিব্যবস্থাদিও গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আপনাদের জর্ম্মাণ ভাষা ত্যাগ করিয়া রোমীর ভাষা পর্য্যন্ত ইঁহারা গ্রহণ করিলেন।

বর্ত্তমান স্পেন ফ্রান্স এবং ইটালীর ভাষা প্রাচীন রোমীয় ভাষা লাটিন হইতে জাত এবং জর্ম্মাণ ভাষা হইতে পৃথক্। স্পেন ফ্রান্স এবং ইটালীর বর্ত্তমান অধিবাসীরাও প্রাচীন রোমাণে কেল্টে এবং জর্ম্মাণে মিশ্রিত জাতি।

একদিকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে যেমন জর্ম্মাণ রোমাণকে জয় করিলেন, অন্য-দিকে সামাজিক হিসাবে আবার সেই বিজিত রোমাণ জেতা জর্ম্মাণকে

জয় করিয়া আপনার উন্নত সভ্যতার অধীনে তাঁহাকে আনিলেন—ধর্ম্মে, আচারে এবং ভাষায় জর্ম্মাণকে অনেক পরিমাণে রোমাণ্ করিয়া ফেলিলেন। যে কারণে পাশ্চাত্য অঞ্চলে কেণ্টগণ রোমাণ হইয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে রোমাণগণও গ্রীক্ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই কারণেই জর্ম্মাণগণ এখন রোমীয় ভাবাপন্ন হইলেন। ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিতে বিশেষ একটা বলবৎ পার্থক্য যদি না থাকে, এবং তাহার জন্য যদি সামাজিক সম্মিলনে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা না উপস্থিত হয়, তবে দুইটি জাতি পরস্পরের সঙ্গে একদেশে এরূপ নিকট সম্পর্কে আসিলে, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও সভ্যতায় হীনতর জাতি, উন্নততর জাতির সভ্যতার অধীনে আসিয়া পড়েন। জর্ম্মাণের রোমীয় সভ্যতার অধীনে আসায় এই ঐতিহাসিক সত্যই প্রমাণিত হইল।

কিন্তু এখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। প্রাচীন কেণ্টগণ যেমন রোমীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীন হওয়ায়, রোমীয় রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া একেবারে রোমাণে পরিণত হইয়াছিলেন, জর্ম্মাণদের পক্ষে সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। জর্ম্মাণরাই রাজা, জর্ম্মাণরাই প্রভু,—আপনাদের রাজত্ব এবং প্রভুত্ব রক্ষা করিতেও তাঁহারা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সুতরাং রোমীয় সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ইহাঁদের জাতীয় বিশেষত্ব বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইল না। প্রচণ্ড রণোন্মত্ততা, অত্যুগ্র উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, দুর্দ্দমণীয় শক্তি ও তেজ, নবীন সজীবতা, স্বতন্ত্র প্রভুত্বপ্রিয়তা, প্রভৃতি যে সব ধর্ম্ম জর্ম্মাণদের প্রকৃতিগত ছিল, রোমীয় সভ্যতার প্রভাবে সে সব কিছু নিয়মিত হইতে থাকিলেও, লুপ্ত বা শিথিল হইল না।

এই যে একটা নবীন ও সজীব শক্তি ও তেজ লইয়া জর্ম্মাণগণ রোমাণদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, এই যে সভ্য অথচ প্রাচীনতায় জীর্ণ ও দুর্ব্বল রোমাণে এবং বর্ব্বর হইলেও সতেজ ও সবল নবীন জর্ম্মাণে জাতীয় সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল,—ইহাতে প্রাচীন ও ক্ষীণ রোমীয় প্রাণ যেন জর্ম্মাণের নবীন দেহে নূতন এক জন্ম লাভ করিল। এই যে মিলন, এই যে প্রাচীন মৃত রোমের জর্ম্মাণ দেহ ধরিয়া নূতন জন্ম,—ইহা হইতেই ইয়োরোপে নূতন নূতন শক্তিমান্ জাতির উদ্ভবে এক নবযুগের সূচনা হইল। বর্ত্তমান ইয়োরোপ এই সূচনারই পরিণতি।

গ। ইংরেজের স্বাতন্ত্র্য।

এক ইংরেজ ব্যতীত আর যত জর্ম্মাণজাতি রোমীয় অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন, সকলেই রোমাণদের সঙ্গে মিশিয়া রোমীয় ভাষা, নীতি ও

আচার গ্রহণ করিয়া রোমীয় সভ্যতার অধীনে আসিলেন। আদিম ইংরেজ জাতি রোম সাম্রাজ্য হইতে দূরে বাস করিতেন। রোমীয় সভ্যতার সঙ্গে কোনওরূপ পরিচয় না থাকায় অন্যান্য জর্ম্মাণদের ন্যায় তাহার প্রতি কোনও রূপ শ্রদ্ধার ভাবও তাঁহারা পোষণ করিতেন না। রোমীয় তন্ত্র যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া বৃটেনের রোমীয় প্রজাবর্গের উপরে প্রভুত্ব করিবেন, এরূপ কোনও ভাবও তাঁহাদের মনে আসে নাই। আপনাদের আদিভূমি অপেক্ষা বৃটেন দেশটি ভাল, সুতরাং বৃটেন দখল করিয়া এখানেই তাঁহারা বাস করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৃটেন জয় করিলেন। রোমাণ প্রভাবও বৃটেনে অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল,—রোমীয় শাসনপাটও উঠিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদিগকে রোমীয় সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে আনিতে পারে এমন কোনওরূপ রোমীয় শক্তি বৃটেনে ছিল না। বৃটনদের সঙ্গে কোনওরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে না আসিয়া ইংরেজেরা তাঁহাদের একেবারে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিলেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম, রোমীয় সভ্যতা, রোমীয় নীতি, সব একেবারে বৃটেনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে দূরীভূত হইল। বিনাশ হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজদের দাসত্ব স্বীকার করিলেন,—অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যত জর্ম্মাণজাতি রোমীয় প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজজাতিই আপনাদের জর্ম্মাণ-স্বাতন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। জর্ম্মাণ ভাষা, জর্ম্মাণ নীতি, জর্ম্মাণ বিধিব্যবস্থাদি একমাত্র ইংলণ্ডেই রক্ষিত হইল।

জর্ম্মাণ বিপ্লবে পশ্চিম ইয়োরোপে যতগুলি নূতন জাতির উদ্ভব হইল, তাহাদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজের ভাষাই আদি জর্ম্মাণ ভাষা সম্ভূত,—ইংরেজের নীতিশাস্ত্র ও বিধিব্যবস্থাদির মূল উৎসও আদিম জর্ম্মাণ নীতি।

পরে ইংরেজ জাতি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রোমীয় ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হন। ইহাতে ক্রমে ইয়োরোপ-ভূখণ্ডের রোমীয় ভাবাপন্ন অন্যান্য জাতি সমূহের সংস্পর্শে আসিয়া, ইয়োরোপের নবযুগের নূতন সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজের পরিচয় হইল,—নবীন ইয়োরোপের জাতীয় মহাসঙ্ঘের মধ্যে ক্রমে ইংরেজ আপনার স্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। (ক্রমশঃ)

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুত শশীকান্ত সেন গুপ্ত।

ভারত তীর্থাভিমুখে জাপানী যাত্রী।

জাপানীরা যতই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন, যতই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী জানিতে পারিলেন, ততই ঐ মহাধর্ম্মের মূল উৎস-স্থান দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ের তৃষ্ণা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। "তেনজিকু!"—জাপভাষায় বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, দেবভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ, জাপবাসীদের নিকট তখন স্বর্গরাজ্য, পূজার পীঠ-স্থান। * এই পীঠস্থান দর্শন করিবার জন্য তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় জাপান! দুই দেশের মধ্যে সাগর ভূধরের দুরতিক্রম্য বাধা বিঘ্ন। এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—বিশেষ সেকালে—জাপান হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছা যে কতদূর কষ্টকর এবং বিপজ্জনক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রচীন জাপানবাসীদের মধ্যে যাহারা ভারতাগমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা তন্মধ্যে মাত্র দুই এক জনের বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। †

হোতেন জাপানবাসী, তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল, তিনি ভারত-তীর্থ দর্শন করিবেন। এই পুণ্য ইচ্ছায় সম্যক সফলতা লাভের জন্য তিনি ব্যগ্র হৃদয়ে নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে

* The ancient civilization of Japan owed a great deal to India, particularly the influence of India struck root so deeply into this country (Japan) that until quite recently we regarded Tenjiku, the birth place of Buddha, as a sort of heaven with a sense of homage.

—Count Shegenobu Okuma in the Journal of the Indo Japanese Association. September, 1909.

† Indo-Japanese Association পত্রিকায়, ১৯০৯ অব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় Rev. Daito Shimaji লিখিত "India and Japan in Ancient Times" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লাগিলেন,মানচিত্র দৃষ্টে পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোথা হইতে এমন কতকগুলি বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তিনি আর ভারত দর্শনের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না (৭৩৮ খৃঃঅব্দ)।

ঈছৈ জাপানে রিনজৈ (ধ্যান?) সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, বুদ্ধদেবের শরীরাংশ রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত অষ্টচৈত্য দর্শন করিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি ১১৮৭ খৃঃঅব্দে জাপান হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া চীনের লিলন সহরে পৌঁছিলেন। হুয়েনসাঙ্ ভারতবর্ষে বাধা-হীন পর্য্যটনের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই পাঠ করিয়া থাকিবেন ; কিন্তু 'ছাড়পত্র' ব্যতিরেকে চীন-পর্য্যটন অসম্ভব। ঈছৈ ছাড়-পত্রের জন্য স্থানায় রাজকর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালে উত্তর দেশীয় অসভ্য জাতিদের আক্রমণে চীনের পশ্চিম প্রদেশ অশান্তিপূর্ণ ছিল ; সে প্রদেশে প্রতিমুহূর্ত্তে যাত্রীদের জীবননাশের ভয় বর্ত্তমান। এমন দুঃসময়ে স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারী কাহারও জীবনরক্ষার ভার নিতে অক্ষম বলিয়া ঈছৈকে ছাড়-পত্র দিতে অস্বীকার করিলেন। চীনের প্রবল রাজশক্তি এবং তাহার সতর্ক প্রহরীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া চীনের সীমা লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষ, সে সময়ে শত্রুর আক্রমণের সুযোগ ব্যর্থ করিবার জন্য নিঃসন্দেহে পাহারার বন্দোবস্ত অধিকতর কঠিন করা হইয়াছিল। কাজেই ঈছৈকে বাধ্য হইয়া ভারতাগমন অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তিনি রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিলেন না, পবিত্র বোধিদ্রুম লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রথম এই বৃক্ষ তোদৈজা মন্দিরের পার্শ্বে রোপিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতে কেন্নিজি মন্দিরে, অবশেষে সমগ্র দেশে বোধিদ্রুম ছড়াইয়া পড়ে।

হোতেনকে স্বদেশে থাকিতেই মনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঈছৈ চীন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন,—কিন্তু দুঃসময়ে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। যিনি ভারতবর্ষাভিমুখে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম শিন্ন্যো।

শিন্ন্যো রাজকুমার, সম্রাট হেইয়োর তৃতীয় পুত্র। শিন্নোকে সম্রাট কনিনের যুবরাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুই দিনের এই পার্থিব সম্মানের প্রলোভন তাহাকে রাজপ্রাসাদে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। যাহার

বিকৃতি নাই, যাহার সহিত কোন দুঃখের মিশ্রণ নাই, প্রকৃতির শক্তি যাহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তিনি সেই শাশ্বত নির্ব্বানানন্দের খোঁজে বাহির হইয়া শ্রমণ হইলেন। শিন্নোর পূর্ব্ব আশ্রমের নাম কুমার তকেওক। কুকেই জাপানে শিনগণ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক (মৃত্যু ৩৮৫ খৃঃঅব্দ)। * তিনি চীন এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শিন্নো কুকেইর শিষ্য। কুকেই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের শিন্-গণ-শূ সম্প্রদায় এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শাখা সন-রং-শূ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিন্নো আজীবন ছাত্র; জাপানে যতদূর শিক্ষা লাভ করা সম্ভব, তিনি তাহা শিখিয়াছেন। কিন্তু জাপানের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াও শিন্নোর পরিতৃপ্তি হইল না। তিনি অধিকতর জ্ঞান লাভের আশায় ৮৬৩ অব্দে জাপান পরিত্যাগ করিয়া চীনে যাত্রা করিলেন। সুদীর্ঘ বিংশ বর্ষ চীনের চোগান নামক স্থানে থাকিয়া তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু তবুও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল না। এমন কোন দেশ আছে, যেখানে গেলে শিন্নো তাহার এই অপরিসীম জ্ঞান লাভ স্পৃহায় চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? শিন্নো জানিতেন, একটি দেশ আছে—"প্রচারিত যার বন-ভবনে জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী," সেই ভারতবর্ষ। † ৮৮১ খৃঃঅব্দে তিনি ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়, শিন্নো তখন বৃদ্ধ—তাঁহার বয়স আশী বৎসর।

শিন্নো যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাতে সম্ভবতঃ পূর্ব্বভারতে পৌঁছিতে পারিতেন। কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধ পর্ব্বত পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, এমন যুব-জনোচিত শারীরিক সামর্থ্য তাঁহার কোথায়! আজ তাঁহার অবসন্ন দেহ হৃদয়ের বল ধারণ করিতে

* পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

† "—In the ninth century we are told that Kukai (died, 835), the founder of the Shingoun Sect in Japan, was not only a good Chinese, but a good Sanskrit scholar also. Nay, one of his disciples, Shinnye, in order to perfect his knowledge of Buddhist literature, undertook a journey, not only to China, but to India, but died before he reached that country."—Max Muller প্রণীত Selected Essays,

Sanskrit Mss in Japan প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পারিল না, চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, ভগ্নদেহ আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, যাত্রার অবসান হইল—লেয়স প্রদেশে, স্বদেশ হইতে বহুদূরে, ভারততীর্থের সন্নিকটে শিন্নোর মৃত্যু হইল!

যে তিনটি যাত্রীর কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে জাপানীরা ভারতবর্ষকে যে কিরূপ প্রীতি-ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, ইহা হইতে আমরা তাহা বুঝিতেছি। এই যাত্রীরা সর্ব্বাগ্রে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন—আজ বহু যাত্রী সে পথের অনুসরণ করিতেছেন। সাধু প্রচেষ্টার ক্ষণ-ব্যর্থতা কদাচই নিষ্ফল নহে; আজও বুদ্ধগয়া, বারাণসী, সারনাথ প্রভৃতি পুণ্যস্থান জাপান সন্তানের তীর্থভূমি; আজও জাপান হইতে আগত যাত্রিগণদ্বারা ঐ স্থানগুলি পূজিত। কিন্তু এই যে উঁহারা মরণ-পণ চেষ্টায় ভারতদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন, ভারত কোন যাদুমন্ত্রে উঁহাদিগকে সেই প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ হইতে আপনার শান্তিমণ্ডিত ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়াছিল?—

"যে ধনে হইয়া ধনী, ধনেরা মগনা ধনি,
তাহার ধানিক"

দানে ভারতবর্ষ সে দিন সমগ্র এসিয়ার নিকট ভক্তি-অর্ঘ্য লাভ করিয়াছিল, আপনিও ধন্য হইয়াছিল—অন্যকেও ধন্য করিয়াছিল।

প্রাচীন জাপানে ভারতবাসী।

২০১ খৃষ্টাব্দে জনৈক জাপসম্রাজ্ঞী যুদ্ধার্থে কোরিয়া গমন করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধহয় এই সময় হইতেই জাপানের সহিত বিদেশের সংস্রব আরম্ভ হয়। প্রথম কোরিয়া, পরে চীনের সহিত জাপানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে জাপান সম্বন্ধে য়ুরোপবাসীদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজেরা প্রথম জাপানে পৌঁছিতে আরম্ভ করেন। ১৬১০ অব্দে দিনেমারেরা, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উইলিয়ম এডেম নামক একব্যক্তি ইংরেজদের মধ্যে প্রথম জাপানে গমন করিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষ হইতে কে সর্ব্বাগ্রে জাপানে পৌঁছিয়াছিলেন?

নানাকার্য্য ব্যপদেশে বহুসংখ্যক ভারতবাসী তিব্বতে ও চীনে গমন করিয়াছিলেন,—ঐ দুই দেশের সাহিত্যে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কোন ভারতবাসী পুরাকালে জাপানে গিয়াছিলেন কি ?

দক্ষিণ ভারতের বোধিধর্ম্ম (৫৭৩—৬২১ খৃঃঅব্দ) এবং মধ্যভারতের সুব্‌ক-কার (Subkakara, ৭১৬-৭৩৫) চীনে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে জাপানে গমন করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু বোধিসেন নামক জনৈক জ্ঞানী ভিক্ষুর জাপানে গমন, স্বীয় পাণ্ডিত্যে এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে জাপানবাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ—ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। *

বোধিসেন ঃ—দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণ-বংশে ৭০৩ খৃঃঅব্দে বোধিসেনের জন্ম হয়। তাঁহার স্বভাব চরিত্র অতি মধুর ছিল, তাই স্বদেশবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইবেন—বোধিসেনের এই একটি উচ্চাভিলাষ ছিল। মঞ্জুশ্রী নামক জনৈক চীনবাসী তাঁহার সমসাময়িক। বোধিসেন স্বদেশে থাকিয়াই মঞ্জুশ্রীর যশঃগাথা শুনিতে পান। জ্ঞান-তৃষ্ণা কি প্রবল! এই জ্ঞানীর সাক্ষাৎ কামনায় বোধিসেন একদিন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চীনে যাত্রা করিলেন। সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া জাহাজ য়ংসেকিয়ঙের মোহানায় আসিয়া পৌঁছিল। এস্থান হইতে বোধিসেন বু-তই পর্ব্বতে উপস্থিত হন, কিন্তু পর্ব্বতোপরিস্থ বিহারে গিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, মঞ্জুশ্রী তখন চীনে নাই, জাপানে গিয়াছেন। হায়! বোধিসেনের এই সুদূরাগমনের উদ্দেশ্য কি তবে ব্যর্থ হইবে ?

এই সময়ে জাপানের জনৈক রাজদূত চীন-রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন, ইহার নাম তজিহি-নো মওহিরনরি। রিক্যো নামক আর একজন জাপানী শ্রমণ শিক্ষালাভার্থে তৎকালে চীনে বাস করিতেছিলেন। এই জাপানীদ্বয় মহাজ্ঞানী বোধিসেনের চীনাগমনের বার্ত্তা শুনিতে পান; এবং সৌভাগ্য ক্রমে বোধিসেনের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। জাপানীদ্বয় এই ভারতীয় ভিক্ষুকে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনকল্পে জাপানে প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের আগ্রহে বোধিসেন জাপানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

* পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রিকায় টোকিও রাজকলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক Jyun Takakusu M. A., D, (litt) লিখিত "What Japan owes to India" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চীন দেশীয় দোশেন, চম্পের সঙ্গীতপ্রিয় বুত্তেষু এবং এইরূপ আরও দুই একটি ভিক্ষু সমভিব্যহারে ৭৩৬ খৃঃঅব্দে জুলাই মাসের অষ্টমদিবসে বোধিসেন ননিব (বর্ত্তমান ওসাকা) নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। বোধিসেনকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নারা-সম্রাট সুপ্রসিদ্ধ পুরোহিত জ্যোজিকে এইস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাপানী ও ভারতবাসী এই দুই পণ্ডিতের প্রথম আলাপ পরিচয় মিশ্র জাপ-সংস্কৃত ভাষায় সম্পাদিত হইয়াছিল। এই কথোপকথন হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উভয়ের মনের ভাব ও আদর্শ ঠিক একই প্রকারের।

নারার যুগবর মন্দিরে বোধিসেনের বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। জ্যোজি এই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। বোধিসেন জ্যোজিকে মঞ্জুশ্রী বলিয়াই মনে করিতেন। জ্যোজির আতিথ্যে বোধিসেন এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অভ্যর্থনাকালে তিনি নাচিয়া নাচিয়া গান করিয়াছিলেন এরূপ কথিত আছে। যুগবর মন্দির হইতে বোধিসেনের বাসস্থান পরিবর্ত্তিত হয়। এখন হইতে তিনি দৈয়নজী মন্দিরে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি জাপ-পুরোহিতদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন; তদ্ব্যতীত গন্ধ-বূহ্-সূত্রের অধ্যাপনা, এবং অমিতাভ বুদ্ধের ধর্ম্মমত প্রচার করা তাঁহার কার্য্য ছিল। বোধিসেনের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার শিষ্য শূ-যেই গুরুর একখানি জীবনী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তৎপাঠে জানা যায়, বোধিসেন যাহাতে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন, রাজসভা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বোধিসেন লোকসাধারণের এত ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন যে, ৭৫০ খৃঃঅব্দে তাহাকে সোজো বা ধর্ম্মাচার্য্যের পদ (Sojo or Bishop) প্রদান করা হয়। তিনি সম্রাট সোমু এবং সম্রাজ্ঞী কোকেনের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে এক প্রস্ত পোষাক উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ৭৬৪ অব্দে বুদ্ধ বৈরোচনের (দৈবৎসু) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে ধর্ম্মসভা হয়, বোধিসেনই তাহার অধ্যক্ষ পদে বরিত হন, ফলে সম্রাট সোমু, জ্যোজি এবং রোবেন প্রভৃতি তোদৈজি মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে বোধিসেনও অন্যতম বলিয়া অভিহিত হ'ন।*

* "A Brahmin monk, named Bodhi, arrived in Japan and being hailed more by the dying Geogi as one come from the Sacred land, and therefore more worthy than himself, was invested with the conduct of inaugural ceremony"—**Ideals of the East by Kakuza Okakura.**

বোধিসেন "মহাবৈপুল্য বুদ্ধাবতংসক" মতবাদকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; পরে ইহার স্থানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে।

অধ্যাপক তকাকসু বলেন,—বোধিসেনের শিক্ষা দানের ফলেই নিঃসন্দেহে জাপভাষার ৫০টি অক্ষর সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপে গ্রথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি নিজেই গোজুয়ন (জাপ-বর্ণমালা) শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যান। শোকু-নিহন কি নামক একখানি জাপানী ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ধর্ম্মাচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পরিচালনেও বোধিসেনের হাত ছিল।

শেষ জীবনে তিনি র‍্যোমেনজি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শিষ্যদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী তারিখে ৫৭ বৎসর বয়সে অমিতাভ বুদ্ধের পুণ্যনাম উচ্চারণ করিতে করিতে, জাপানের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত মহাত্মা বোধিসেনের কর্ম্মময় জীবনের পরি-সমাপ্তি হয়। তমিময় নামক স্থানে এখনও তাঁহার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে।

"ফুশিমির বুড়া"।

প্রাচীন জাপান প্রবাসী আরও একটি ভারতবাসীর বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাপানী পুরোহিত জ্যোজির আপ্যায়নে মুগ্ধ বোধিসেন নৃত্যসহকারে গান করিরাছিলেন। ঐ সময়ে সুগবর মন্দিরের পশ্চাতের বনখণ্ডে একটি লোক বাস করিতেছিলেন; এই লোকটিকে কেহ কোন দিন একটি মাত্র কথা কহিতে শুনে নাই। সে সর্ব্বদা পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া প্রসারিত দেহে পড়িয়া থাকিত। কেহ তাহার নাম জানে না, সকলে তাহাকে "ফুশিম্মির বুড়া" বলিয়াই ডাকিত। আজ এই মৌনী বোধিসেনের নর্ত্তনে, তাঁহার ভারতীয় সঙ্গীত শ্রবণে মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বোধিসেনের সন্নিকটে পৌছিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"সময় হয়েছে রে, সময় হয়েছে!"—তাহার মুখনিঃসৃত ইহাই প্রথম বাণী জাপানীরা শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কিসের সময় হইয়াছে?

এই ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই মৌনাবলম্বী বৃদ্ধটিও ভারত-বাসী। হয়ত তিনিও ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে জাপানে গিয়াছিলেন, কিন্তু অনুকূল অবস্থা না পাইয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানীর আগমন অপেক্ষায় নির্ব্বাক

হইয়া স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। স্বদেশী ভাষার মধুর ধ্বনি আজ তাঁহার তৃষিত অবসন্ন হৃদয় নাচাইয়া জাগাইয়া তুলিল, তাই তিনি পর্ব্বত হইতে ঝটিতি নামিয়া আসিয়া সমগ্র হৃদয়ের আবেগ ঢালিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সময় হয়েছে রে, সময় হয়েছে!" কিন্তু কিসের সময় হইয়াছে? বুদ্ধদেব ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করিবে। বোধিসেনের জাপান আগমনে, তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় ঐ ধর্ম্ম তথায় বিস্তৃত, সংস্কৃত এবং বদ্ধমূল হইয়াছিল সন্দেহ নাই,—তাই কি "বুড়া" ঐ কথা বলিয়াছিলেন? তবে "ফুশিমি বুড়ার" বাণী সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

জাপানে "তেন-জিকু" প্রবাসী

আর একজন।

নিহন-কো-কি নামক রাজ্য-বিবরণীর ৮ম ভাগে উল্লিখিত আছে যে, ৭৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাত্যাতাড়িত একখানি ছোট নৌকা জাপানে মিকবা প্রদেশের দক্ষিণ তীরভূমে আসিয়া পড়িয়াছিল। নৌকারোহীর পরিচ্ছদ যৎসামান্য, জীর্ণ। সে যুবক, বয়স বিংশ; আকার ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু তাহার ভাষা সম্পূর্ণ অবোধ্য; সে যে কোন্ দেশীয় লোক প্রথমতঃ তাহা নির্ণয় করিবার কোন যো-ই ছিল না। কিছুকাল পরে যখন এই বায়ুতাড়িত বিদেশীটি জাপানী ভাষায় আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হইল তখন জানা গেল যে, সে তেন-জিকু বাসী। তেন-জিকু জাপভাষায় বুদ্ধদেবের জন্মভূমি আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভারতবাসীর জিনিষ পত্রের মধ্যে কতকগুলি শস্যবীজ পাওয়া গিয়াছিল, শেষে জানা যায় ঐ গুলি কার্পাস বীজ। স্বীয় অনুরোধ ক্রমে সে কবরদের মন্দিরে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। লোকটি নারা রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তে একখানি গৃহ-নির্ম্মণ করিয়া, আবশ্যক দ্রব্যাদি জোগাইয়া পথিক ও যাত্রীদিগকে নানারূপে সাহায্য করিত। পরে সে ওমি প্রদেশের কোকুবান-জি মন্দিরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। জাপান প্রবাসী আমাদের এই ভারতবাসীর একটি একতারা ছিল। সে অবিরাম তাহার এই একতারাটি বাজাইতে ভালবাসিত, তাহার রাগিনী যেন কাঁদিয়া উঠিয়া কোন এক করুণ স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত।

রুইজু-ককুশি নামক আর একখানি রাজবিবরণীর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, ৮০০ খৃঃঅব্দে, এপ্রিল মাসে আর একটি লোক কুয়েনলাঙ্ (কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত) হইতে জাপানের উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহার দ্বারা আনিত কার্পাস বীজ কু, অবজি, সন্নুকি, ইয়ো, তোষ এবং ক্যগু প্রদেশে রোপিত হয়। অধ্যাপক তকাকমু বলেন—ভারতবাসী দ্বারাই যে জাপানে সর্ব্বপ্রথম কার্পাস চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, এই দুই ঘটনাই তাহার প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। *

জাপানে ভারতের প্রভাব।

ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক প্রচারক জাপানে গমন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জাপানের সভ্যতাবিকাশে ভারতের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলে তদ্দেশবাসীরা ঐ ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কোরিয়া হইতেই প্রথম জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। চীন ভিক্ষুরাও প্রথমে কোরিয়া হইয়াই জাপানে গমন করিতেন। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীন ভিক্ষুরা সোজাসুজি চীন হইতে জাপানে পৌঁছিতে আরম্ভ করেন। চীন ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আসিয়াই জাপানী বৌদ্ধেরা নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের শিক্ষা প্রভাবেই জাপানবাসীর হৃদয়ে জ্ঞান-স্পৃহা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে। এই সময় হইতে বহু সংখ্যক জাপ-ভিক্ষু জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত চীনে গমন করিতে আরম্ভ করেন। হুয়েন্‌সাঙের তিনজন জাপ শিষ্য জাপানী ভাষায় গ্রন্থানুবাদ করিয়াছিলেন এবং বোধিসেনকে জাপানে পাঠাইতে যে দুইজন জাপানবাসী উদ্যোগী ছিলেন, তন্মধ্যে একজন চীনে ধর্ম্মশিক্ষা লাভে ব্যাপৃত ছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যে কয়েকজন ছাত্রের চীন গমন-সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত আরও অধিক সংখ্যক জাপানী ছাত্র যে চীনে জ্ঞান-ধর্ম্ম, বিদ্যানুশীলনার্থ গমন করিতন, তাহা বলাই বাহুল্য। জাপ ছাত্রেরা চীনে আসিয়া যে কেবল মাত্র চীন দেশীয় আচার্য্যদের নিকট শিক্ষালাভ করিত তাহা নহে। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক ভারতীয় ভিক্ষু চীনে ধর্ম্মশিক্ষা দান এবং বৌদ্ধগ্রন্থানুবাদ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা চীন সম্রাটদের দ্বারা সাদরে সসম্মানে সে দেশে নীত হইয়াছিলেন।

* "The cotton-plant introduced from India 799 also thrives."
—Encyclopædia Britannica 9 th Ed. Vol. XIII 'Japan শব্দ' দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে সে দেশে গমন করিতেন। চীনে এই সকল ভারতীয় আচার্য্যের সংখ্যা অগণিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। উদ্যমশীল জাপানী ভিক্ষুরা জ্ঞানধর্ম্মশিক্ষার্থ চীনে আসিয়া যেমন চীন পণ্ডিতদের—তেমনই ভারতীয় আচার্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন এবং এই সকল ভিক্ষু ছাত্ররাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং ধর্ম্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেন। একে ত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধসাহিত্য ভারতের নিজস্ব, তদুপরি জাপ-ছাত্রদের চীন-বাস কালে তথায় ভারতীয় আচার্য্যদের নিকট শিক্ষালাভের ফলে জাপ-সভ্যতায় ভারতের প্রভাব অতি দ্রুত প্রসারিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। *

জাপ-ভিক্ষুরা যেমন চীন ভাষা শিক্ষা করিতেন,তেমনই আদর যত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। অধ্যাপক উইলসন, সার জে, বাউরিং এবং ডাক্তার এডকিন্স প্রভৃতি য়ুরোপীয় মনীষিবৃন্দ চীন এবং জাপানে বৌদ্ধ গ্রন্থানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। একবার এড্‌কিন্স সাহেব আচার্য্য ম্যাক্সমুলারকে একখানি গ্রন্থ দেখান। গ্রন্থখানি একখানি অভিধান। চীন ভাষার শব্দাবলী, তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ এবং তাহার জাপানী অর্থ উহাতে লিপিবদ্ধ। †

* What was, then, the attitude the native Buddhist in Japan took towards India? Their spiritual demands seemed to be so fully satisfied, on one hand by introducing from China and propagating in Japan the Buddhism assimilated by the chinese, who resemble the Japanese in many ways, and on the other hand by sending many priests of promise over to China for the study of Buddhism under India priests there as well as Chinese.—Rev. Daito Shimaji in the Journal of the Inidc-Japanes Association. Vol. 1, p. 18.

† Dr. Edkins, who had taken an active part in search instituted by Professor Wilson and Sir D. Bowring, showed me a book which he had brought from Japan, and which contained a Chinese vocabulary with Sanskrit equivalents and translitaration in Japanese, the Sanskrit is written in that peculiar alphabet which we find of in old Mss, of Nepal, and which in China has been further modified, so as to give it an almost chinese appearance.—Selected Essays, P. 338, by Max Muler.

জাপানীরা প্রথমে চীন ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ ভাষার সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিতেন। জাপানী ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থানুবাদও প্রায়শঃ চীনে অনূদিত গ্রন্থাদি অনুসারেই সম্পাদিত হইত। গ্রন্থাদি জাপ-ছাত্রগণ কর্ত্তৃক চীন হইতে জাপানে প্রেরিত হইত। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে সুখাবতীব্যূহ-মহাযান-সূত্র জাপ-ভাষায় অনূদিত হয়। কো-সো-গেই নামক জনৈক তিব্বতবাসী ঐ গ্রন্থখানি চীন ভাষায় অনুবাদ করেন, তিনি ২৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন। এই একখানি গ্রন্থের বারখানি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়। *

দোসো হুয়েনসাঙের অনূদিত বসুবন্ধুর গ্রন্থ জাপভাষায় অনূদিত করেন। ছিচ্ এবং ছিতমু নামক হুয়েনসাঙের অন্য দুই জন শিষ্য গুরুর অনূদিত, বসুবন্ধু লিখিত "অভিধর্ম্মকোষ শাস্ত্র" জাপানে প্রচার করেন—এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধভদ্রের "বুদ্ধাবতংসক বৈপুল সূত্র" এবং কুমারজীবের "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক" গ্রন্থের জাপ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। †

জাপানে সিন্‌গণ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কুকেই (মৃত্যু ৮৩৫) চীন এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য বৌদ্ধসাহিত্য অধ্যয়নের নিমিত্ত ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ভিক্ষু বোধিসেন জাপানে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন এবং তৎকর্ত্তৃকই জাপবর্ণমালা সুসংস্কৃত হয়—পূর্ব্বেই আমরা এসকল কথার আলোচনা করিয়াছি। একবার জাপান হইতে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংশোধনার্থ পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। অবসরকালে সেই পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিনি প্রথমেই দেখিলেন—"এবম্ ময়া শ্রুতম্!" বৌদ্ধ শ্রুতিগ্রন্থের সর্ব্বথা যেরূপ আরম্ভ হয়, এক্ষেত্রেও সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যধিক

† This is the title of the Sanskrit text now sent to me from Japan. The translation had been made by Ko-So-gai (in Chinese khang-sang-khai), a native of Tibet, though living in india, 252 A D. and we are told that there had been eleven other translations of the same text and of these 5 were introduced into Japanese, while others seem to have been lost in China.—Selected Essays by Max Muller,

* Beals' 'catalogue.' P. 9.

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন—"জাপানে প্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে চীনে, চীন হইতে জাপানে নীত, নেপালী অক্ষরে লিখিত, চীন ভাষায় তাহার অনুবাদ, আবার উহারই জাপানী ভাষান্তর—এমনই একখানি গ্রন্থ পাইবার আশায় আমি বহুদিন আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলাম।" এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সেই জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহার বহুদিন পোষিত একটি আশা পূর্ণ হইল ভাবিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। *

উক্ত রূপে ভারতবর্ষের কাব্য-দর্শন, শিল্প-সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাহার বিবিধ বিচিত্র চিন্তা-প্রবাহ, সংস্কৃত এবং পালী সাহিত্যের মধ্য দিয়া নানা দেশে নানারূপে প্রবেশ করিয়াছে—প্রচারিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে জ্ঞানধর্ম্ম-পিপাসু ছাত্রেরা এদেশে আসিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষা স্বদেশে বিস্তার করিয়াছেন। ভারতের ভিক্ষু সন্তানেরা স্বদেশের প্রভাব নানারূপে অন্য দেশে বিস্তার করিয়াছেন। কেবল জাপানের চিন্তারাজ্যে নহে, এখনও পর্য্যটকেরা জাপানের নানাস্থানে ভারতবর্ষের ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এখনও জাপানে ধর্ম্ম মন্দিরে "যাজকগণ যে ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন, উহাতে নাকি পালি শব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া মিশ্রিত হইয়াছে। দেব-মন্দিরে ছোট ছোট কাষ্ঠ ফলকে কিম্বা বস্ত্রখণ্ডে লিখিত অনেক মূল্যবান উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়,উহা অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়। জাপানের কোন কোন মন্দিরে এবং এক জায়গায় শাক্যমুনির মূর্ত্তির উপরে "ওঁ" লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।" * স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"আমি উহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃতমন্ত্র

---

* I did not see at once the importance of the book. But when I came to read the introductory formula, Evam maya Srutan, "thus by me it has been heard," the typical beginning of the Buddhist Sutras, my eyes were opened. Here, then was what I had so long been looking forward to—a Sanskrit text, carried from India to china, from China to Japan, written in the peculiar Nepalese alphabet with a Chinese translation and a translitaration in Japanese......of course it is a copy only, not an original M S. but copies hresuppose originals at some time or other.—Selected Essays.

* জাপানের ধর্ম্ম—যদুনাথ সরকার, ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৮।

প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে।" * জাপানে প্রবর্ত্তিত দেববাদ, পূজানুষ্ঠানপদ্ধতি ভারতবর্ষীয় দেববাদ ও পূজাপদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিশিষ্ট। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ওকাকুরা বলেন, এ সকলই জাপানের সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ও সংস্রবের ফল। †

সংস্কৃত শিক্ষালাভে, বৌদ্ধগ্রন্থের নিয়মিত অধ্যয়নে, চীনে ভারতীয় ভিক্ষুদের সঙ্গলাভে জাপানীদের হৃদয় ভারতবর্ষীয় ভাবে বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষের প্রভাবে জাপানের সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্যই জাপ-সন্তানেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষকে তীর্থভূমি, পূজার পীঠস্থান বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। মানুষের চিন্তা পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের বাহিরের তত্ত্ব আবিস্কার করিতে স্বতঃই ধাবিত হয়। মানুষের এই প্রচেষ্টাকে যদি আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাজাত বলিতে পারি, তবে জাপানীদের সেই তৃষ্ণা, ভারতবর্ষ তাহার মহামূল্য ধর্ম্ম দান করিয়া মিটাইয়াছিল। ‡ এ নিমিত্ত জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্ম-কাল ৫৫২—খৃষ্টাব্দকে—মাহেন্দ্র-ক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করে। একজন জাপসন্তান সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া জাপান ভারতবর্ষের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই পবিত্র বন্ধনের সূত্রটি কি ?—ধর্ম্ম !

আবার কবে দেশে দেশে বিশ্ব-মানব প্রীতি ও মৈত্রীর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইবে ?

* পত্রাবলী, পৃঃ ১৪।
"—Are these suggest the direct adoption of Hindu deities."
—Ideals of the East by Kakuzo Okakura.

† বলা বাহুল্য যে এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্ব প্রকাশিত কোন কোন অংশের পুনরুল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

‡ Their spiritual demands seemed to be......fully satisfied......by introducing from China and propagating in Japan the Buddhism assimilated by the Chinese.......Japan owes a great deal to India and more particularlv to Buddhism for her civilization in ancient times. The introduction of Buddhism in 552......was the first Khana, that gave so deep an impression of India into Japanese minds that it has never been blotted out from them for over thirteen centuries. The Japanese were spiritually united with Indians 1350 years age.—Rev. Daito shimaji in the Journal of the Indo-Japanese Association.

P. 18, Sep 1909.

প্রাচীন ভারতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর এস।)

অনেকের ধারণা আছে যে, ভারতবাসী চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি সুতরাং তাহারা কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চাই করিতেন। এই সমুদয় লোকের বিশ্বাস যে, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যজ্ঞের অগ্নি ও বেদের মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর হইত না, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত লোক বাস করিত তাহারা হয় অস্থিচর্ম্মসার সন্ন্যাসী অথবা বেদাধ্যয়ন নিরত গৃহী ছিলেন,—অর্থাৎ পরকালের তথ্যগুলি ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আলোচিত হইত, ইহকালের কঠোর সত্যগুলি ঠিক সেই পরিমাণেই অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতবাসী যে আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া আর কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র শক্তি নিয়োগ করিতেন, ইহার কল্পনামাত্র তাঁহাদিগকে পীড়িত করে,—অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষের যেটুকু ইতিহাস জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কেবল যে বেদ পড়িতেন আর যজ্ঞ করিতেন তাহা নহে—তাঁহারা স্বাভাবিক মানুষের মতনই ছিলেন, মানুষের যে সমুদয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—সে সকলই তাহাদের জীবনে আচরিত হইত। তাঁহারা আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, ঐহিক সম্পদের জন্যও লালায়িত হইতেন, এবং অনেকটা আমাদেরই মত সুখে দুঃখে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহারা গুরুগৃহে বেদ পাঠ করিতেন, আবার সস্ত্রীক 'ক্লাবে' বা 'গার্ডেন পার্টি'তে যাইয়া আমোদ প্রমোদও করিতেন (ক)। তাঁহারা যজ্ঞ করিয়া পরকালে মুক্তি কামনা করিতেন,—আবার জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া অর্থ সংগ্রহ দ্বারা ইহকালের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টাও করিতেন। তাঁহাদের নগর প্রান্তে মুনি ঋষির আশ্রম ছিল, আবার নগরমধ্যে ও মদ্য বিক্রেতা বা জুয়ার আড্ডার অভাব ছিল না (খ) (গ)। নলিনী-দলগত জলের ন্যায় জীবন চঞ্চল এবং জীর্ণ বাসের ন্যায় দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এ সমস্ত জানিয়াও কিন্তু ঐ

(ক) বাৎস্যায়ন কামসূত্র।

(খ) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র।

(গ) ঋগ্বেদ।

ক্ষণভঙ্গুর দেহ সাজাইবার জন্যই তাঁহারা সুচিক্কণ মস্‌লিন বস্ত্র (ঘ), স্বর্ণ রৌপ, মণি মুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কার (ঙ) লোধ্রচূর্ণ (চ) প্রভৃতি সুগন্ধি 'পাউডার, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বিরত হইতেন না। সম্পদ ঐশ্বর্য্য সকলই অসার ক্ষণস্থায়ী, তথাপি দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে স্বীকৃত হন নাই, এবং পুরু হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত সকল নরপতিই স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র' জানিয়াও শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বই জন কান্তা পুত্র লইয়া সংসার ধর্ম্মই নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন আর্য্যগণ সৃষ্টি ছাড়া অতি-মানুষ গোছের একটা কিছু ছিলেন না, কথাটা যত সহজ মনে হয় বাস্তবিক কিন্তু তত সহজ নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ণাঙ্গ-পরিপুষ্ট মানুষিকতা যে সর্ব্বতোভাবেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ কথাটা বুঝা বা বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। অথচ এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হইলে আমরা অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না। প্রাচীন ভারতবাসিগণের জীবনযাত্রার এক একটা দিক লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাণিজ্য ও ব্যবসায় ইউরোপের জাতীয় জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সকলেই জানেন। বস্তুতঃ এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ব্যবসায় বাণিজ্যই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যে এত বড় ভীষণ যুদ্ধ আজ ইউরোপ ছারখার করিতেছে, ইহারও মূলে সেই একই কথা—বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আজ ইউরোপে সে সমুদয় জাতি উন্নতিশীল, বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভই তাহাদের উন্নত হইবার একটি প্রধান কারণ—যেমন ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী প্রভৃতি। আবার অন্যদিকে যে স্পেন এককালে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল, তাহারও বর্ত্তমান অবনতির মূল কারণ বাণিজ্যের অবনতি। এইরূপে পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতীয় ঐহিক সম্পদ অনেক পরিমাণে বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করে।

(ঘ) **Periplus of the Erythræan Sea.**

(ঙ) **Megasthenes.**

(চ) মেঘদূত।

সুতরাং স্বভাবতই জানিতে কৌতূহল হয়, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল। প্রাচীন ভারতবাসীরা যে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপ আফ্রিকায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন, ইহা অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, কিন্তু কথাটি খুব সত্য এবং এ সম্বন্ধে এত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে নিতান্ত সংশয়বাদীরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কত প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসীরা এরূপে বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা করিতেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। যে সময়ে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, সেই সময়েই যে তাঁহারা সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন, তাহার প্রমাণ ঐ ঋগ্বেদেরই "দ্বিষোনো" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়। ইহা হইল অন্যূন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যদেশ মিশরের সহিত এই সময়ে ভারতবর্ষের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, তাহারও কতক কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরদেশে মৃতদেহ অবিকৃত রাখিবার জন্য একরূপ অদ্ভুত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। এই প্রক্রিয়ার গুণে ৩।৪ হাজার বৎসরের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই মৃতদেহগুলিকে 'মামি' বলে। কতকগুলি 'মামির' আচ্ছাদন বস্ত্রের রংয়ের মধ্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভারতজাত 'নীল' দেখা গিয়াছে (ক)। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে (Speke) স্পিক সাহেব যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন (খ)। তাঁহার মতে প্রাচীন হিন্দু পুরাণকারগণই সভ্য জগতের মধ্যে প্রথমে 'নাইল' নদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করেন, এই উৎপত্তিস্থানকে পুরাণে 'অমরদেশ' বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এখনও নাইল নদের উৎপত্তিস্থান, ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ তদ্দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক 'অমর' নামে কথিত হয়। স্পিক সাহেব বলেন যে, যখন তিনি নাইল নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন উইলফোর্ড সাহেব কর্ত্তৃক পুরাণের বর্ণনা অনুসারে বিরচিত একটি মানচিত্রই তাহার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। স্পিক সাহেবের মতে ভারতবাসীরা জাহাজে করিয়া সোমালিল্যাণ্ডে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন; তথা হইতে স্থলপথে আবিসিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে ঐ সমুদয় দ্রব্য নীত হইত।

প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে মিশরবাসিগণের পরেই ফিনিসিয়ানদের

(ক) Royle Essay on the antiquity of Hindu Medicine.

(খ) Discovery of the source of the Nile.

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফিনিসিয়ানদের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, বার্ডউড্ সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন (ক)। এখন যাহাকে আমরা টিন বলি, সংস্কৃতে তাহার নাম ছিল কষ্টর। এই টিন ভারতবর্ষ হইতে ফিনিসিয়ানদের দেশে যাইত এবং সংস্কৃত নামটি পর্য্যন্ত তাহাদের দেশে প্রচলিত ছিল। গ্রীকজাতি ফিনিসিয়ান-দের নিকট হইতে টিন ক্রয় করিত, তাহারাও টিনের ঐ সংস্কৃত নামই ব্যবহার করিত। এতদ্ব্যতীত গজদন্ত, কিংখাব প্রভৃতিও ভারতবর্ষ হইতে সিরিয়া প্রদেশে রপ্তানি হইত।

ইহুদী জাতির সহিতও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। সুবর্ণপ্রসূ 'অফিরের' সহিত ইহুদী রাজা সোলোমানের বাণিজ্যের কথা অনেকেই অবগত আছেন। কানিংহাম সাহেবের মতে এই অফির সংস্কৃত সৌবীরেরই নামান্তর (খ)। (Old Testment) ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে (প্রাচীন বাইবেলে) দেখা যায় যে, অফির হইতে গজদন্ত, বানর ও ময়ুর ইহুদিদের দেশে যাইত। শব্দবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে হিব্রুভাষায় এই সমুদয়ের যে নাম প্রচলিত, তাহা সংস্কৃত নামের অনুরূপ (গ)।

প্রাচীন সভ্যজগতে ব্যাবিলন একটি অতি সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এই ব্যাবিলনের ভাসমান উদ্যান পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। কেনেডি সাহেব বিশিষ্ট প্রমাণ সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসিগণ নিয়মিতভাবে এই ব্যাবিলনের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন (ঘ)। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে 'বভেরু জাতকে' নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ) হইতে সমুদ্রপথে বভেরুতে যাতায়াতের কথা আছে। এই বভেরু ও ব্যাবিলন অভিন্ন—ইহাই পণ্ডিতগণের মত। কেনেডি আরও বলেন যে এই বাণিজ্য উপলক্ষে বহু ভারতবাসী আরব, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল ও ব্যাবিলোনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রীক ও রোমান্ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্য সম্বন্ধের ভুরি

(ক) Industrial Arts of India—Sir George Birdwood.

(খ) Cunningham's Ancient Geography of India.

(গ) Max Mullar's Science of Language Sixth Edi. Vol 1.

(ঘ) Journal of the Royal Asiatic Society 1898—(P. 248-287.

ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ড্রিয়া তৎকালে সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল ; বহু ভারতবাসী বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য উপলক্ষে এইখানে বাস করিতেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা একজন গ্রীক সওদাগর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের জলপথের বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য একখানি গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম "Periplus of the Erythræan Sea" "পেরিপ্লাস অব্ দি এরিথ্রিয়ান সি" অর্থাৎ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের বিবরণ"। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতবাসীরা তাহাদের পশ্চিম উপকূলে জাহাজাদি প্রস্তুত করিয়া নিয়মিতভাবে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে বাণিজ্য করিতেন। আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী (Socotra) সকোট্রা দ্বীপে তিনি অনেক ভারতবাসী দেখিতে পান—বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া সেইখানে বসবাস করিতেছিলেন। এখন যে স্থান সুপ্রসিদ্ধ এডেন বন্দর নামে পরিচিত, সেই স্থান সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"খুব প্রাচীনকালে যখন মিশরবাসীরা ভারত সাগর পার হইতে সাহস করিতেন না, তখনও ভারতবাসীরা জাহাজে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়া বাণিজ্য করিতেন।..."যে স্থানে ইউফ্রেটিস্ নদী পারস্য সাগরে পড়িয়াছে সেই স্থান সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এখানে নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া তাম্র, চন্দন, সেগুণকাঠ ও অন্যান্য কাঠ আইসে।" এই গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ভরুকচ্ছ, মুজিরিন (ক্রাঙ্গানোর) নেলকিণ্ডা (কোট্টয়ম্) প্রভৃতির বাণিজ্যসমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও ১৫।১৬টি বন্দরের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—সুতরাং তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই (ক)।

এই সময় বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষ হইতে রোমে দৌত্য (Embassy) প্রেরিত হইত। ২১ খৃঃ পূঃ রোম সম্রাট অগষ্টাস যখন (Samos) স্যামস্ নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন ভারতবর্ষীয় দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পুনরায় ৪১ খৃঃঅব্দে সিংহল দ্বীপ হইতে সম্রাট ক্লডিয়াসের নিকট দূত প্রেরিত হয়। ১০৭ খৃঃঅব্দে সম্রাট ট্রাজানের নিকটও এইরূপ

(ক) **Periplus of the Erythræan Sea, Translated by Schoff.**

দূত প্রেরিত হয়। এইরূপে সম্রাট "অ্যাণ্টোনিনাস্ পিয়াস, কনষ্ট্যানটাইন জুলিয়ান প্রভৃতির নিকটও দূত প্রেরিত হয় (ক)।

ভারতবাসীরা যে জাহাজে চড়িয়া উত্তর সাগর (North Sea) অবধি যাইতেন, তাহার প্রমাণ এই গ্রীক গ্রন্থকারগণের লেখা হইতে পাওয়া যায়।

রোমের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমদেশীয় গ্রন্থকার প্লিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রোমাণ্‌রা এতদূর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে যে, কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যের নিমিত্তই প্রতিবৎসর রোম হইতে দশ কোটি সেষ্টার্স (প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা) ভারতবর্ষে চলিয়া যায়। প্লিনির কথার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান কালেও বহুসহস্র রোমদেশীয় মুদ্রা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে যে কেবল সমুদ্রপথেই বাণিজ্য হইত, তাহা নহে। স্থলপথে পারস্য সিরিয়া এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চলিত। চীন ও আরব দেশের সহিত জলপথে ও স্থলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ বহু প্রাচীন কাল হইতেই বর্ত্তমান ছিল। জাভা প্রভৃতি দ্বীপেও ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যএশিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানেও তাঁহাদের বাণিজ্যদ্রব্য উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা অন্যবিধ যানে প্রেরিত হইত। জাপানেও যে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল, হরিউজি মন্দিরের পুঁথিই তাহার প্রমাণ। এই পুঁথিগুলি ভারতবর্ষীয় অক্ষরেই লিখিত।

(ক) "Indian Travels of Apollonius of Tyana and the Indian Embassies to Rome from the reign of Augustus to the death of Justinian by Priaulx.

"Relations politiques et commerciales de l'Empire Romain avec l'Asie orientale" Par Reinaude—Journal Asiatique—6 e Series

সংগ্রহ।

ভারত বাণী

(উপনিষদ হইতে সংগৃহীত।)

এতৈরেষোঽপৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগেবেতিলক্ষিতঃ।
এবং যো বেদতত্ত্বেন কল্পয়েৎ সোঽবিশঙ্কিতঃ॥

প্রাণাদি সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে আত্মা অপৃথক্ হইয়াও অজ্ঞ জনের নিকট পৃথক বলিয়া লক্ষিত হন। যিনি যথাযথরূপে আত্মার এই অপৃথক্ ভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই নিঃশঙ্কচিত্তে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন।

স্বপ্নমায়ে যথাদৃষ্টে গন্ধর্ব্ব নগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥

স্বপ্ন ও মায়া যেরূপ (মিথ্যা হইয়াও সত্যবং) দেখা যায়, গন্ধর্ব্বনগর যেমন (মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায়) অনুভূত হয়, বেদান্তজ্ঞানে পণ্ডিতগণও এই বিশ্বকে সেইরূপ দেখেন।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধোন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষাপরমার্থতা॥

যাঁহার এই অদ্বৈত জ্ঞান হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারেন প্রকৃত পক্ষে প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই,—সংসারী নাই, সাধক নাই,—মুমুক্ষুও কেহ নাই, মুক্তও কেহ নাই,—এই সকল রূপ বিশেষত্বের অতীত ভাবই পরমার্থতা।

নাত্মভাবেন নানেদং নস্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্‌নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥

নানারূপে প্রতীতিগোচর এই জগৎ ব্রহ্মরূপেও সৎ নহে, স্বরূপতঃও সৎ নহে। কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে পৃথকও নহে, আবার অপৃথকও নহে— তত্ত্ববিৎগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন।

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥

রাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, দ্বৈতবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন।

ইয়োরোপের রাষ্ট্রনীতি।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-তন্ত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লর্ড-সভা।

ইংলণ্ডের অভিজাত মণ্ডলীর সভার নাম 'লর্ড-সভা'। ইহা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাপক সভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্যতম শাখা। ইহার বর্ত্তমান সভ্যগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের সকলেরই উপাধি লর্ড বটে, তবে শ্রেণীগুলির মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ বংশানুক্রমে এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ লর্ডবংশীয় সকলেরই এই অধিকার হয় না। বংশের মধ্যে কেবল একজন মাত্র এই সম্মানের অধিকারী। সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী লর্ডের জ্যেষ্ঠপুত্রই তাঁহার পদমর্য্যাদার ও উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার স্থানে লর্ডসভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন লর্ডের পুত্র না থাকিলে আইন অনুসারে তাঁহার পদমর্য্যাদার ও উপাধির নিকটতম উত্তরাধিকারী এই সভায় আসনগ্রহণের অধিকারী হন। যুক্তরাজ্যের অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন ও আয়রল্যাণ্ডের অভিজাত বংশীয় লর্ড উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ "পিয়ার" (Peer) নামে অভিহিত। ইঁহাদের কতকগুলি বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে। লর্ডসভার অধিকাংশ সভ্যই এই "পিয়ার" শ্রেণীভুক্ত। তবে সকল "পিয়ার"ই এই সভার সভ্য নহেন। ১৭০৭ সাল হইতে লর্ডসভার বংশানুক্রমিক পিয়ার সভ্যগণকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১৭০৭ সালে স্কটলণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সম্মিলন হয়। ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা ইংলণ্ডের পিয়ার ছিলেন, তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমিক পিয়ার শ্রেণীর প্রথম বিভাগ বলা যাইতে পারে। ১৮০১ সালে গ্রেটবৃটেন ও আয়রল্যাণ্ড সম্মিলিত হইয়া যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়।

১৭০৭ সাল হইতে ১৮০১ সালের মধ্যে যাঁহারা গ্রেটবৃটেনের পিয়ার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বংশানুক্রমিক পিয়ার শ্রেণীর দ্বিতীয় বিভাগ এবং যাঁহারা ১৮০১ সালের পর যুক্তরাজ্যের পিয়ার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশানুক্রমিক পিয়ার শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত পিয়ার (Representative peer) বলা হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের মধ্যে ১৬ জন স্কট্ পিয়ারদের এবং ২৮ জন আইরিস পিয়ারদের প্রতিনিধি। ইহাঁরা প্রত্যেক পার্লামেণ্টের অধিবেশনের পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হন।

লর্ডসভার ধর্ম্মাধক্ষ্য সভ্যগণকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যাইতে পারে। ইয়র্ক (York) এবং ক্যাণ্টারবেরীর (Canterbury) আর্চ্-বিশপদ্বয় ও ২৪ জন ইংলণ্ডীয় বিশপ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থশ্রেণীর সভ্যগণ লাইফ পিয়ার (Life peer) অর্থাৎ জীবিতকালের জন্য অভিজাত সভার সভ্য। ইহারা সকলেই ব্যবহার (আইন) বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং সভার বিচার সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের ভারই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

বলা বাহুল্য শেষোক্ত দুইটি শ্রেণীতে পুরুষানুক্রমিক প্রথার কোনও সম্পর্ক নাই। বিশপ্ ও আর্চবিশপগণ এবং লাইফ পিয়ারগণ যোগ্যতা অনুসারেই নিযুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সভ্যেরা বংশে পিয়ার হইলেও বংশানুক্রমিক ভাবে লর্ড-সভার সভ্য নন। ইঁহাদের সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য পিয়ারগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে ইঁহারা লর্ডসভায় আসেন।

এই চারিটি শ্রেণী লইয়া লর্ডসভায় সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০০শত সভ্য আছেন। ইঁহাদের তিনজন মাত্র সভায় উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য হইতে পারে। সাধারণতঃ, সভায় ২০।২৫ জনের অধিক সভ্য উপস্থিত থাকেন না। তবে কোন গুরুতর ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার সময় উপস্থিতি-সংখ্যা অনেক অধিক হইয়া থাকে।

এই সভা অতি প্রাচীন। স্যাক্সন (Saxon) 'বিজ্ঞ-সভা' (Witan) ও নর্ম্ম্যান্ (Norman) 'প্রধান-সভা' (Great Council) ইহার মূল উৎস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নর্ম্ম্যান্ 'প্রধান' সভায় রাজারা আর্চ্-বিশপ, বিশপ, আর্ল ও প্রধান প্রধান ব্যারন্ প্রভৃতি রাজার খাসপ্রজাদিগের মধ্যে প্রধানগণের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যারণেরা সাধারণ ভাবে সভায় উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইতেন। ব্যয়বাহুল্যভয়ে ইহাঁদের অনেকে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। এই সব প্রতিনিধিগুলি এবং জনসাধারণের অন্যান্য প্রতিনিধিদের লইয়া ক্রমে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি

সভার উৎপত্তি হয়। ১২৯৫ খৃঃ প্রথম এডওয়ার্ডের (Edward I) সময় হইতে প্রধান সভা হইতে প্রতিনিধি সভা পৃথক হইয়া যায়। তখন হইতে বিশপ, আর্ক বিশপ, আর্ল. প্রভৃতি প্রধান সভার অবশিষ্ট সভ্যগণ মিলিয়া লর্ড-সভা আরম্ভ হয়।

কিন্তু লর্ড-সভা একেবারেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করে নাই। প্রথমে ইহার সভ্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। আবার তাহার মধ্যে যাজকমণ্ডলীর অন্তর্গত ধর্ম্মাধ্যক্ষ্যগণই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। ইঁহাদের পদগুলি বংশানুক্রমিক না থাকায় লর্ড-সভাও অনেকটা বংশানুক্রমিক ছিলেন না। তৎকালে ইহা রাজার অধীনে থাকিলেও ইহার ক্ষমতা কমন্স্ সভার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল; এবং রাজ-ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনেই এই সভার সভ্যগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন।

অষ্টম হেনরীর সময় এই সভার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় যাজকমণ্ডলীর অনেকেই পদচ্যুত হন এবং তাহাতে ইহার যাজকপ্রধান ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় ও এই সভা ক্রমশঃ বর্ত্তমান পুরুষানুক্রমিক সভ্যপ্রধান আকার ধারণ করিতে থাকে।

প্রথম চার্লসের সময় গৃহযুদ্ধকালে লর্ডদিগের মধ্যে জন কত রাজার পক্ষে এবং জন কত রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। রাজার দল পরাস্ত হইল। ১৬৪৯ সালের মার্চ্চমাসে সাধারণতন্ত্রবাদীরা লর্ড-সভা উঠাইয়া দেয়। দ্বিতীয় চার্লসের সময় রাজার পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ১৬৬০ সালে লর্ড-সভাও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৮৮ সালে রাষ্ট্রবিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়া জনকতক 'হুইগ' লর্ড নিজেদের ক্ষমতা এত দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, যে ঐ সময় হইতে ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত লর্ড-সভাই দেশের প্রধান শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কারণ, নামে কমন্স্ সভায় ক্ষমতা অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, তাহার অধিকাংশ সভ্যই লর্ডদিগের আদেশানুসারে নির্ব্বাচিত হইতেন। ইহারা ফলে কমন্স্ সভার নির্ব্বাচন প্রণালীর পরিবর্ত্তন জন্য দেশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। লর্ডগণ ক্রমাগত বাধা দিয়াও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ১৮৩২, ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইনগুলি দ্বারা (Reform Acts) কমন্স্ সভার সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী সংস্কৃত হইলে লর্ডদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। ১৯১১ সালের 'পার্লামেণ্ট আইন' (Parliament Act)

দ্বারা লর্ড-সভার ক্ষমতা সমূলে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটি এরূপ স্থির হইয়াছে যে রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারে লর্ড-সভার হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার থাকিবে না এবং অন্যান্য আইন কমন্স্ সভা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পাস করিয়া দিলে লর্ড-সভার আপত্তি সত্বেও তাহা গ্রাহ্য হইবে।

লর্ড-সভার কার্য্যগুলিকে মোটের উপর দুইটি সাধারণভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, একটি বিচার সংক্রান্ত, অপরটি ব্যবস্থা (আইন) প্রনয়ণ সংক্রান্ত। বিচার সম্বন্ধে লর্ড-সভা সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত। তবে এ আপীল আদালতের কার্য্যকালে লর্ড চান্সেলর এবং তাঁহার চারিজন বিশেষজ্ঞ ব্যবহারবিৎ সহকারী ব্যতীত আর কোন সভ্যই উপস্থিত থাকেন না। অবশ্য ইহার দ্বারা তাঁহাদের এই আদালতে উপস্থিত থাকিবার অধিকার লোপ পাইয়াছে কি না, কেহই বলিতে পারেন না। আপীল মোকদ্দমা ব্যতীত লর্ড-সভা, কমন্স্ সভা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত বড় বড় লোকদিগের, এবং রাজদ্রোহ ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত পিয়ারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মূল মোকদ্দমারও বিচার করিতে পারেন। লর্ড সভার ব্যবস্থা-প্রণয়ণের ক্ষমতা ১৯১১ সালে 'পার্লামেণ্ট আইন' দ্বারা অনেকটা হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এই সভা প্রতিনিধি সভার মতের বিরুদ্ধে অন্ততঃ দুই বৎসর রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় আইন পাস বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে দেশের একটি বিশেষ উপকার আছে। জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশ এই জন্য তাড়াতাড়ি যে কোন আইন পাস করিয়া নিতে পারেন না। লর্ড-সভার মত লইবার জন্য খানিকটা বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাদিগের অমত হইলে অন্ততঃ দুইবৎসর দেশের সকলে এইরূপ আইন আবশ্যক কি না তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় পান।

বিচার ও আইন প্রণয়ণ ব্যতীত লর্ড সভার দ্বারা আরও দুইটি কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ অনেক সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আইন প্রণয়ণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সেগুলি এই সভায় বিবেচিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ কমন্স্ সভার প্রচণ্ড তর্ক বিতর্কে নিয়মিত রূপে যোগদানের ভার সহনে অক্ষম, সুবিজ্ঞ রাজনৈতিকগণ এই সভার সভ্য হইয়া মন্ত্রিসভায় অবস্থান করিতে পারেন।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ।

বসন্তে।

[বসন্ত-বিমুগ্ধা সুরমা ও তৎসখী বামা।]

সুরমা।—আহা! নবীন বসন্তে সই
কি শোভে প্রকৃতি ওই
কি রস পরশে প্রাণ
উঠিল মাতিয়া!

বামা।—সত্যি, সকালে উঠিয়া সই
কাজ সেরে নাই ধুই,—
শীত যম গেছে যেন,
উঠেছি বাঁচিয়া!

সু—হের, নবীন মুকুলে ওই,
নব কিশলয়ে সই,
শোভিছে কি তরুলতা
আহা মরে যাই!

বা—আহা, গাবগাছে ওই হোথা
বেরিয়েছে রাঙা পাতা,
সাধ হয় তুলে এনে
শাক রেঁধে খাই!

সু—ওই মুকুলিত সহকারে
পুষ্পিতা মাধবী হেরে,
কোকিল পাপিয়া মুগ্ধ
গাইছে মিলন!

বা—আহা, যে দুটো বা বো'ল ছিল,
তা-ও রোদে ঝ'রে গেল,
এবার আমটা তবে
হবে না তেমন।

সু—ওকি! সরোবর তীরে ওই,
ফুল্ল ফুল বনে সই,
গুঞ্জরে ভ্রমর মত্ত
মধুপানে কিলো?

বা—কোথা! ব্যাঙাচিতে কিলকিলে
তোদের ডোবার কুলে
ডাকে ও গুবুরে পোকা
ঘেঁটুবনে যে লো?

সু—বহে উড়াইয়া পুরাতনে
নবীন পল্লব সনে
নাচিয়া বসন্তে নব
নবীন মলয়!

বা—মর্! সে পুরাণো পাতাগুলি
ঝাঁটিয়ে কুড়িয়ে তুলি
ভিখারী মাগীরা দেখ
ডালা ভ'রে লয়!

সু—আহা, কোথা কি মাধুরী পেয়ে,
কি মাধুরী ছড়াইয়ে—
বসন্ত মধুর সব
করিল ধরায়!

বা—কিন্তু লাউ ও বেগুণ শিম
মিঠে ছিল এতদিন,—
এখন হিঞ্চে ও নিম
কেবল সহায়।

সু—সখী! মাধুরীতে মাতোয়ারা
বিবশা আপন হারা
ঢুলু ঢুলু সদা যেন
পড়িছি ঢুলিয়া!

বা—ঠিক্! দুপুরে হাওয়াটা গায়
লাগে আর ঘুম পায়,—
মাটিতে আঁচল পেতে
পড়ি লো শুইয়া!

সু—কভু শয়নে পড়িলো লুঠি
কভু চমকিয়া উঠি
যেন প্রাণ কেঁদে উঠে
কি যেন কি বিনে।

বা—তা, চমক হবেনা কি গা?
কলেরা দিয়েছে দেখা,—
শ্যামা পিসী শশী কাল
ম'ল একদিনে!

সু—ওই, শূন্যপ্রাণে চেয়ে থাকি,
শূন্য পানে কভু সখী
সদাই কেমন যেন
পরাণ উদাসী!

বা—তা এ গরম কালের ধর্ম্ম—
সারা হ'লে কাজ কর্ম্ম,—
খালি খালি লাগে বড়
বেলা থাকে বেশী।

সু—কভু কি যেন কিভাবে প্রাণ
আকুলিত আন্ ছান্,—
কি যেন কি ভাবি ব'সে
বোঝে নাক মন।

বা—তা ভাবনারি কথা সই—
পুকুরে যে জল নাই,—
কোথা বল নাব ধোব
মাজিব বাসন!

সু—হায়, উদাস অশান্ত প্রাণে
কেবা সই শান্তি আনে,
বিনা সে প্রাণেশ,—সে ত
এলনা, এলনা!

বা—তা চিঠি ত আসিছে বেশ,—
পরীক্ষাও হ'ল শেষ,—
প্রাণেশো আসিল ব'লে—
ভেবনা ভেবনা!

সু—হায়! ধিক্ নিরমম তায়!
মজিল যে পরীক্ষায়,
এ মধু বসন্তে সই
জ্বালাতে অবলা!

বা—তা পরীক্ষায় পাশ হ'লে
তবে ত চাকুরী মিলে,—
নহিলে উদরে অন্ন
যোটে কি দুবেলা?

সু—আহা, সে মধুর প্রেম সুধা
মিটায় লো সব ক্ষুধা!
প্রেমিকা কি চাহে অন্ন
প্রাণেশে পাইলে?

বা—যদি সারাদিন খেটে পিটে
অন্ন না জুটিত পেটে,
সুধাটুদা যাই বল,
গাটা যেন জ্বলে!

সু—সখী,　বসন্তে প্রাণেশ ঘরে,
বিরহে না প্রাণ পোড়ে,—
বুঝিবে কেমনে কি যে
সহিলো সে বিনে?

বা—হু!　বার কত ফেল ক'রে,
নিশ্চিন্তি র'য়েছে ঘরে,
ভাসুর না খেতে দিলে
কি হবে জানিনে।

(নেপথ্যে কোকিলের ডাক)

সু—(চমকিয়া)
ও কি!　সখিলো বকুল ডালে,
কোকিল লহর তুলে,
উঠাইছে কুহুতান
উহু প্রাণ গেল।।

বা—(ঢিল ছুড়িয়া)
আমর!　দুর দুর পোড়া পাখী,
অলক্ষুণে ডাকাডাকি!
হাঁ ভাই, পাখীর ডাকে
এমন কি হ'ল?

সু—কই!　বিঁধাইয়া কুহুতানে
বাণ বিরহিণী প্রাণে,
কোথা সে বসন্তসখা
লুকাইল এবে?

বা—ওই　গেছে উড়ে ভয় নাই—
বেলা গেল, যাই ভাই,—
আবার দিদি যে বাঘ—
মুখ নাড়া দেবে।
[প্রস্থান।

নাপিত।

হে নরশ্রেষ্ঠ নরসুন্দর! তুমি সমাজের একটি জটিল সমস্যা। মাসিক পত্রে প্রকাশিত বহু সমস্যার সমাধান করিয়াছি, অনেক উদ্ভট কবিতার পাদ পূরণ করিয়াছি, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্যাতত্ত্ব অধ্যয়ন দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছি, এমন কি দিবসত্রয়ব্যাপিণী চিন্তার পর বার্ডলর্ড সাহেবের স্নেলের অঙ্কেরও সমাধান করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে সমাধান করিতে পারিলাম না। যাত্রাকালে তোমাকে দর্শন করিলে নাকি সকল কার্য্য পণ্ড হয়, প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করিলে নাকি সে দিবস আহার নামক নিত্যকৃত্যেরও বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অশুভ দর্শন হইয়াও আমাদের সকল শুভ কার্য্যেই তোমার একান্ত প্রয়োজন। তোমার দৃষ্টি অশুভ, কিন্তু তুমি না হইলে হিন্দুর পরম পবিত্র বিবাহে শুভদৃষ্টি করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই। কন্যার পিতা পড়িয়া রহিলেন,

সমাগত ভদ্রমণ্ডলী পড়িয়া রহিলেন, এমন কি ধর্ম্মযাজক পুরোহিতও পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইলে কি না তুমি তোমাকে বুঝিব কি করিয়া? ব্যবসার হিসাবে তোমাকে অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান বরং চর্ম্মকারবৃত্তি অবলম্বন করেন তথাপি ক্ষৌরকারবৃত্তি অবলম্বন করেন না; অনেকে বিদ্রূপস্থলে অপরকে 'নাপিত' বলিয়া সম্বোধন করেন,—কিন্তু জাতিমর্য্যাদায় তোমার স্থান অনেক উচ্চ। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও তোমার স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ করিলে পতিত বা কলুষিত হন না, অথচ সুবর্ণবণিকের জল গ্রহণ করিলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। এই সকল পরস্পর বিরোধী ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলে যথার্থই তোমাকে একটি নরাকৃতি বিরাট সমস্যা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার কারণ কি? পণ্ডিতকুল আমার অপরাধ লইবেন না—কিন্তু আমার মনে হয় যে পূর্ব্বকালে একদিন কোন নাপিত কুলতিলক কোন মহামান্য প্রচণ্ডতেজা ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকার্য্যে অবহেলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিম্বা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তাঁহার গণ্ডে রুধির প্রবাহের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই প্রচণ্ডতেজা ব্রাহ্মণ ক্রোধপরায়ণ হইয়া, তাহার আর মুখদর্শন করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, এবং নাপিতের মুখদর্শনই যে অমঙ্গলজনক ইহাও সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করেন। নাপিতপ্রবর ইহাতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা প্রাপ্ত হইলেন সত্য, কিন্তু কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণীয় নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে আপনার সুবর্দ্ধিত কেশপুঞ্জ ও কণ্ডূয়নশীল শ্মশ্রুরাজির সংস্কারের জন্য, তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইল। চতুর নরসুন্দর এইবার সুযোগ বুঝিয়া স্বজাতির সুবিধাজনক কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং এই নিমিত্তই বোধ হয় হিন্দুর সর্ব্ববিধ শুভাশুভ-কার্য্যে নাপিতের উপস্থিতি অপরিহার্য্য।

নাপিতদত্ত পানীয় পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ছিল না বলিয়াই মনে হয়: কি প্রকারে তাহা বিশুদ্ধতা লাভ করিল, সে সম্বন্ধেও একটি আখ্যায়িকা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে। মনে করুন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ তনয় একদিন দূরদেশে যাইবার জন্য একখানি নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হন। অবিলম্বে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিবার আবশ্যকতাবশতঃ তাঁহাকে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে পদব্রজেই নাপিতালয়ে গমন করিতে হইল। তৃষ্ণাতুর হইয়া তিনি নাপিতের নিকট পানীয় প্রার্থনা করেন। নাপিতদত্ত পানীয় যে অস্পৃশ্য

তাহা দারুণ তৃষ্ণাতে তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জল পান করিবামাত্র নাপিত তাঁহাকে আর একবার চাপিয়া ধরিল এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শাস্ত্রের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে হইল।

যাহাহউক, হে নরসুন্দর, তুমি অশেষগুণসম্পন্ন; সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত। তোমার অস্ত্রটিও তোমার বুদ্ধির আদর্শে নির্ম্মিত, অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার! ধারের তুলনায় ক্ষুরের ভার নাই বলিলেই হয়। তোমার বুদ্ধিও অতিশয় তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিকের গভীর পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রকারের প্রগাঢ় অনুশীলন নয়। তাহা সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাযুক্ত কিন্তু বজ্রের ন্যায় গুরুভার নয়। তোমার বুদ্ধি ও দেহ উভয়ই ক্ষুরের ন্যায় লঘু ও ক্ষিপ্র। ব্যঙ্গকৌতুকে যে তোমরা স্বভাবতঃই পারদর্শী, রসিক চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তোমার ক্ষুরখানি মনুষ্য-ত্বকের উপরিভাগে সাধারণতঃ বিচরণ করিলেও,অতি অনায়াসে মনুষ্য-ত্বকের নিম্নতম প্রদেশেও প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেইরূপ তোমরাও মনুষ্য সমাজের উপর উপর ভাসিয়া বেড়াও বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলে মনুষ্য হৃদয়ের অন্তস্থলেও প্রবেশ করিতে পার।

তোমার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণধার হইল কিসে? ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা প্রস্তরে ঘর্ষিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তোমরে তীক্ষ্ণতাও প্রচুর মনুষ্যসংঘর্ষের ফল। তোমাকে সকল প্রকার মনুষ্য চরিত্রের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে হয় ও সকল প্রকার ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। প্রতিদিন বহুবিধ মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াই বুঝি তোমার বুদ্ধি এত প্রখর হইয়াছে।

দ্বিজাতির উপনয়ন কার্য্যে যখন নবোপবীতধারীর কর্ণবেধ হয়, তখন সে চিরাগত প্রথানুসারে তোমার প্রতি সজোরে কদলীফল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পার যে, ইহাতে তোমাকে কি বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়, কিন্তু তুমি ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং হাস্য করিয়া থাক। ইহা তোমার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। যাহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই, তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া কেবল মূর্খেরই কার্য্য। একদিন আমি আমার কোন বিদগ্ধ বন্ধুকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে একটি লাঙ্গুল সংযোগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “লাঙ্গুল দিয়া দাও, তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু লাঙ্গুলটি যেন সুবর্ণের হয়।”

তোমরা বুদ্ধিমান না হইলে তোমাদের বংশীয় কেহ কখন মগধের সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিতেন না। পশুদিগের মধ্যে যেরূপ শৃগাল, পক্ষিদিগের মধ্যে যেরূপ বায়স, মনুষ্যদিগের মধ্যে সেইরূপ তুমি। কিন্তু তাই বলিয়া কাক ও শৃগালের সহিত তোমার নাম একত্র গ্রথিত করা কবির উচিত হয় নাই। মহর্ষি পাণিনি যদি কুকুর যুবক ও দেবরাজকে (শ্বন্, যুবন্, মঘবন্) একসূত্রে গ্রথিত করিয়া শ্লেষভাজন হইয়া থাকেন, তবে যে কবি তোমাকে শৃগাল ও বায়সের সহিত একশ্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। আমার মনে হয় ঐ শ্লোক রচনা করিবার পর সে কবিকে আজীবন কেশশ্মশ্রু ভার বহন করিতে হইয়াছিল।

হে নরসুন্দর ! তুমি নরকুলে ধন্য ; যেহেতু অমর কবি মধুসূদনই লিখিয়াছেন "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজনে"। যতদিন সভ্য-সমাজে বাস করিব, ততদিন তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিব না। বরং রজককে ভুলিতে পারি কিন্তু তোমাকে ভোলা অসম্ভব। অর্থ থাকিলে মলিন বস্ত্র একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পড়িতে পারি কিন্তু আমাদিগের মস্তকে ও গণ্ডক্ষেত্রে যে জান্তব উদ্ভিদ্ গজাইয়া উঠে, তাহার ছেদনের নিমিত্ত তোমায় চিন্তা করা ব্যতীত উপায় কি আছে ?

তুমি অগাধ বিশ্বাসের পাত্র। কয়জন বন্ধুর হস্তে আমরা অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু তোমার হস্তে আমরা জীবন দিয়াও বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদিগের কণ্ঠনালীর উপর তোমার সুভীষণ অস্ত্রটিকে আমরা অবাধে চালাইতে দিয়া থাকি। তুমি ইচ্ছা করিলে তদ্দণ্ডেই আমাদিগের জীবনগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিতে পার, কিন্তু আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রফুল্লচিত্তে বসিয়া থাকি।

তোমার দুরধিগম্য স্থান অতি অল্পই আছে। যিনি যতই ধন্য হউন, উচ্চপদস্থ হউন, বা আভিজাত্যসম্পন্ন হউন, তোমার নিকট তাঁহার দ্বার অবারিত। অপর লোকে যাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হয়, তুমি অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমন কর, এবং অবলীলাক্রমে তাঁহার কর্ণমূল আকর্ষণ করিয়া তোমার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া থাক !

তুমি একখানি সংবংদপত্র বিশেষ। তুমি প্রত্যহ নূতন নূতন সংবাদে সকলকে

চমকিত করিয়া থাক। যখন তুমি তোমার প্রাতঃকালীন পর্য্যটনে বাহির হও, তখন তোমার মানস পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভগুলি অপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তুমি যাহার নিকট গমন কর, তাহার নিকট হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাক, এবং সেই সংবাদ যখন তুমি অপরের নিকট আবৃত্তি কর, তমন তাহাতে স্বকপোলকল্পিত দুই একটি ঘটনা সংযোগ করিয়া দিতে ভুলিয়া যাও না অর্থাৎ এক কথায় সম্পাদকের সমস্ত গুণগুলি তোমাতেও বর্ত্তমান।

তুমি বহুভাষী। প্রায়ই দেখিতে পাই ক্ষৌরকার্য্য করিতে করিতে তুমি অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছ। তোমার শ্রোতা বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, মনোযোগীই হউন, আর অমনোযোগীই হউন, শ্রবণশক্তিসম্পন্নই হউন, আর বধিরই হউন তাহাতে তোমার বিশেষ আসে যায় না। চেষ্টা করিলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বার্ক বা ডিমস্থানিসের মত বাগ্মী হইতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হে নরসুন্দর, তুমি নরকে সুন্দর কর তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বন্যপূর্ব্বপুরুষগণ এক্ষণ আমাদিগের চক্ষে অসুন্দর। যখনই আমরা নৈসর্গিক নিয়মে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তখনই তুমি আসিয়া আমাদিগের গতিরোধ কর এবং নখলোমাদি সাদৃশ্যগুলিকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত কর।

কিন্তু তোমাদিগের নিকট আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। তোমরা আমাদিগকে সুন্দর কর বটে, কিন্তু তোমাদিগের অনেকেই আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে "নহি সুখংদুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। তোমাদের ক্ষৌরকার্য্য যে একটি বিদ্যা এবং ঐ বিদ্যা যে কেবল সংস্কারগত নয় এইটুকু তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ। যেরূপভাবে তোমরা সংস্কারের উপর নির্ভর করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হয় যে কিছুকাল পরে ক্ষৌরকার্য্যের নিমিত্ত আর জলের আবশ্যক হইবে না, চক্ষের জলেই সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। এটা তোমাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে নয়, এইটুকু কেবল মনে রাখিও!

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক, এম্ এ, বি এল্।

সুধীবচন।

বেপথুর্ম্মলিনং বক্ত্রং দীনা বাগ্‌গদ্গদঃ স্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচকে ॥

কম্প, মলিন মুখ, দীনবাক্য, গদ্গদস্বর প্রভৃতি মরণের যে সব চিহ্ন, যাচকেরও সেই সব চিহ্ন।

গতের্ভঙ্গঃ স্বরোহীনো গাত্রে স্বেদোমহদ্ভয়ম্।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচকে ॥

গতির ভঙ্গ, হীনস্বর, গাত্রে স্বেদ এবং মহৎ ভয়,—মরণের এই যে সব চিহ্ন, যাচকেরও সেই সব চিহ্ন।

বিদ্যাবতঃ কুলীনস্য ধনং যাচিতুমিচ্ছতঃ।
কণ্ঠে পারাবতস্যেব বাক্করোতি গতাগতম্ ॥

বিদ্যাবান্ কুলীন যখন ধন যাচনা করেন, তাঁর কণ্ঠে তখন বাক্য গতায়াত করে যেন পায়রা 'বক্‌বকম্' করিতেছে।

তৃণাদপি লঘুস্তুলস্তুলাদপিহি যাচকঃ।
বায়ুনা কিং ন নীতোঽসৌ মাময়ং প্রার্থয়িষ্যতি ॥

যাচক তৃণ অপেক্ষাও লঘু, তুলার অপেক্ষাও অসার,—পাছে আমার কাছেও কিছু চাহিয়া বসে, বায়ু কেবল এই ভয়েই তাকে উড়াইয়া নেন না।

দেহীতি বচনং শ্রুত্বা দেহস্থা পঞ্চদেবতাঃ।
মুখান্নির্গত্য গচ্ছন্তি শ্রী-হ্রী-ধী-ধৃতি-কীর্ত্তয়ঃ ॥

'দেহি' (দেও) এই বচন শুনিয়াই দেহস্থ পঞ্চদেবতা—শ্রী, লজ্জা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং কীর্ত্তি—মুখ হইতে নির্গত হইয়া চলিয়া যান।

কাক আহ্বয়তে কাকান্ যাচকো নতু যাচকান্।
কাকযাচকয়োর্মধ্যে বরং কাকো ন যাচকঃ ॥

কাকও অন্য কাককে ডাকে, কিন্তু যাচক অন্য যাচককে ডাকে না। কাক ও যাচকের মধ্যে কাকই ভাল।

তীক্ষ্ণ ধারেণ খড়্গেন বরং জিহ্বা দ্বিধাকৃতা।
ন তু মানং পরিত্যজ্য দেহিদেহীতি ভাষিতম্ ॥

তীক্ষ্ণধার খড়্গে বরং জিহ্বা দুই খানা করিয়া কাটিবে, তবু মান ছাড়িয়া 'দেহি' 'দেহি' বাক্য উচ্চারণ করিবে না।

যাচনাহি পুরুষস্য মহত্বম্
নাশয়ত্যখিলমেবতথাহি।
সদ্য এব ভগবানপি বিষ্ণু
র্বামনোভবতি যাচিতুমিচ্ছন্॥

যাচনা পুরুষের সকল মহত্ব বিনাশ করে। স্বয়ং ভগবান্ যে বিষ্ণু, তিনিও যাচনার ইচ্ছা করিয়া বামন হইয়াছিলেন।

চাটু নি।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অর্থলাভের পরিবর্ত্তে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয়। কিছুদিন পরে নিরুপায় ব্রাহ্মণ আবার সেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তোমার কি লজ্জা নাই? আবার আসিয়াছ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—

'হৃদি লজ্জোদরে বহ্নিঃ স্বভাবাদগ্নিরুৎশিখঃ।
তেন মে দগ্ধলজ্জস্য পুনরাগমনং নৃপ॥'

মহারাজ! আমার বুকে লজ্জা, উদরে অগ্নি। অগ্নির শিখা স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধে ওঠে। বুকের লজ্জা তায় পুড়িয়া গিয়াছে, তাই আবার আসিয়াছি।"

রাজা লজ্জিত হইয়া এবার ধনদানে ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিলেন।

চিতাং প্রজ্বলিতাং দৃষ্ট্বা বৈদ্যো বিস্ময়মাগতঃ।
নাহং গতো ন মে ভ্রাতা কস্যেদং হস্তলাঘবম্॥

শ্মশানে প্রজ্বলিত চিতা দেখিয়া এক বৈদ্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমিও যাই নাই, আমার ভাইও যায় নাই। তবে এ হস্তলঘুতা (ওস্তাদী) কার?"

শিক্ষক। তাপে সবই প্রসারিত এবং শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়। আচ্ছা, ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পার?

ছাত্র। তা পারিব না? এই ত—গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয় আর শীত কালে কত ছোট হয়।

রাজা। আত্মহত্যা নিবারণের উপায় কি?

মন্ত্রী। এই অপরাধ যে করিবে, সরাসরি বিচারে তার ফাঁসি হইবে, এই আইন করুন মহারাজ! আর কোনও উপায় দেখিতে পাই না।

বেকনকে রাজমন্ত্রীর পদ দিয়া রাণী এলিজাবেথ একদিন তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে যান। বাড়ী দেখিয়া রাণী কহিলেন, "এ বাড়ী যে তোমার পক্ষে বড় ছোট।"

বেকন উত্তর করিলেন, "তার জন্য মহারাণীই দায়ী। তিনিই আমাকে আমার বাড়ীর পক্ষে বড় করিয়াছেন।"

মহাকবি মিল্টন শেষ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন এবং এক মুখরা নারীকে তখন বিবাহ করেন। একজন বন্ধু একদিন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "আহা, আপনার স্ত্রী যেন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ!"

মিল্টন উত্তর করিলেন, "চক্ষু নাই, গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। তবে কাঁটার খোঁচা যথেষ্ট পাই বটে।"

১৩২১ সনের মালঞ্চের বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী।

PRINTED BY H. P. GHOSH, at the
ABASAR PRESS.
92, Kaliprosad Dutt's Street, CALCUTTA.

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃতসালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ—সুতরাং যে কোন প্রকারেই রক্ত দূষিত হউক না কেন, রক্ত পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা—তোপচিনি অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা, অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন। দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পরে পুনর্ব্বার দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; সাতদিন মাত্র এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৷৷৵০, ৬ শিশি ৪৷৷০, মাশুল ১৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত

কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা।

এই পুস্তকে রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, সমস্ত ঔষধের আয়, মুষ্টিযোগ চিকিৎসা, পাচন চিকিৎসা,—প্রত্যেক রোগেব নাড়ীর গতি, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, বঙ্গ প্রভৃতি জারিত ঔষধের জারণ মারণ বিধি সমস্ত সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। এই বৃহৎ পুস্তকের মূল্য সর্ব্বসাধারণের প্রচারের নিমিত্ত সম্প্রতি ৷৷০ আট আনা মাত্র, মাশুল ৵০ দুই আনা।

কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবিরত্ন।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক মালঞ্চের নাম উল্লেখ করিবেন

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি।

প্রথম অংশ।

বর্ষারাণী।
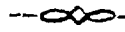
এসো অগণন-জনগণ-মনোহরণী
বাহি ছল ছল কল কল জলে তরণী
এসো সুস্বপন শিহরিত নীপ ফুল পুঞ্জে
শিখিকেকা মুখরিত কেতকীর কুঞ্জে
চাতকেরা বিহরিয়া প্রাণে সুধা ভুঞ্জে
এসো মনোহর মরকত শ্যাম বরণী॥
এসো খরতর নীর ধারা ঝরণারি হর্ষে
ভুবনে জীবন রস অবিরল বর্ষে
শোভি শ্যাম শুভ সুখে চরণেরি স্পর্শে
এসো অমল কমল কূলে ভরি' ধরণী॥
এসো হরষিত কৃষাণীর সুবিমল আস্যে
পুলকিত কৃষিকুল খল খল হাস্যে,
চপলায় চমকিত আলোকিত লাস্যে
ঐ ঘন ঘন মুখরিত তব সরণী

শ্রীকালিদাস রায়।

সেবার ডাকে।

অস্তগিরি আড়াল থেকে যখন নিপুণ করে
সূয্যিমামায় জড়িয়ে নিয়ে রাঙ্গা মেঘের জালে
লুকাল ধ'রে ত্বরা ;
যখন সন্ধ্যারাণী তার মতির কাজ করা
শ্যামল সাটীর আঁচল খানা ছড়িয়ে দিয়ে
ঢাকিলেন এ ধরা ;
তখন কে ঐ নদীর ধারে ঐ গাছটির তলে,
কি এক অতি মধুর সুরে আবেগময় প্রাণে,
বাজাল তার বাঁশী।
এখনো তার সুরটি যেন ঘুরে শূন্যে স্থলে,
বাজে 'কাণের ভিতর দিয়ে এ মরমের মাঝে'
মনের ব্যাথা নাশি'।
মনে হয় এমনি সময় সেই যমুনা কূলে,—
বাজাত' সে মোহন বাঁশী মদনমোহন হরি,
কেলী-কদম মূলে।
ডাকত' বাঁশী সাধাসুরে রাধা রাধা ব'লে ;
আসত ছুটে উধাও হ'য়ে সেই গোপিনী রাধা
লাজের বাঁধ খুলে।
বৃন্দাবনের বিপিন মাঝে মধুর সেই গান
মোহন কালার বাঁশী থেকে মন মাতান সুরে
আর ত নাহি বাজে ;
আর ত নাহি ছোটে রাধা গোপীগণের সনে,
লোকনিন্দা কলঙ্কেরে মাথার মণি করি,
ভুলে আপন কাজে।
(কিন্তু) আজিকার এ বাঁশীর ডাকে আয়রে ছুটে আয় !
বিশ্বসেবার বিশ্বপ্রেম ডাক্‌ছেরে আজ সবে,
বিশ্ব নদের কূলে ;
আয়রে আয় এ পূত সন্ধ্যায় আয় সবাই আয়
মনুর ছেলে ! ঘর ছেড়ে আয়, আত্মপর ভুলে—
এক পতাকা মূলে ॥

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

বিন্দু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

চুণী যে দিন জীবনের হালটাকে একটু বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, একটি বক্রপথে আপনাকে উঠাইয়া দিল, সেদিন সে মনে করিয়াছিল, বাঁকটা একটু ঘুরিয়া যাইয়াই আবার জীবনগতির যথানির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন পথটিই অবলম্বন করিবে। কিন্তু পথটি এতই বক্র, এবং তাহার এতই অপরিচিত, যে, সে কোনও মতেই আর সেই চির পুরাতন পথটির সন্ধান পাইল না, এবং কিছু-কালের মধ্যেই এমন একটা সময় আসিয়া পড়িল, যখন প্রতিকূল স্রোত ও তরঙ্গের মুখে সে আর কিছুতেই ফিরিতে পারিল না।

মানুষের নাকি চিন্তা ও কল্পনা করিবার অধিকারই আছে, কিন্তু সেই চিন্তা ও কল্পনাকে নিশ্চিত সার্থকতা প্রদান করিবার অধিকার ত তাহার নাই; এবং সেজন্য মানুষকে চিরদিনই এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া আসিতে হইতেছে।

ঊর্ণনাভের মত চুণী যখন নিজের চারিদিকে একটা জাল রচনা করিতেছিল, তখন সে একবারটিও মনে করে নাই, যে, তাহার ঐ স্বহস্তে রচিত জাল তাহার পক্ষে একদিন একান্তই দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিবে, এবং একদিন সে বিস্ময়-শঙ্কা-চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিবে, যে, নির্ম্মম নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে সেই জালবেষ্টনীর মধ্যে এমনই নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে, যে সেই জাল-বেষ্টনী ছিন্ন করিয়া তাহার বাহির হইয়া আসিবার এতটুকু উপায়ও আর বর্ত্তমান নাই।

চুণীর অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া সবজজ উপেন্দ্রবাবু যে দিন তাহার কন্যা পদ্মাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন, সেদিন কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের দিনে অবিবাহিত বলিয়া যে মিথ্যাটাকে চুণী মৌনসম্মতি দ্বারা প্রচারিত হইতে অবসর প্রদান করিয়াছিল, তাহার বিষাক্ত প্রথম ফলটি সে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সেদিনও, তাহার বিবেক-বুদ্ধি যতটাই রূঢ় আঘাত প্রাপ্ত হউক না কেন, সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই, যে এই ফলটিই অদূর ভবিষ্যতে তাহার পক্ষে কতখানি তীব্র বিষ-

পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমুদ্রমন্থনের পর যখন চুণীর অদৃষ্টে লক্ষ্মীলাভই ঘটিল, তখন সে একেবারেই ভুলিয়া গেল, যে, এই সমুদ্রমন্থনকালেই, এক অশুভ মুহূর্ত্তে হলাহল উত্থিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। সেই হলাহল যে তাহাকেই একদিন নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠপান করিতে হইবে, তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই!

পদ্মার স্পর্শ, পদ্মার প্রেম চুণীর প্রাণের মধ্যে একটা উন্মাদবন্যার প্রবাহ জাগাইয়া তুলিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত পঙ্কিল দৈন্যকে ডুবাইয়া দিয়াছিল!

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি প্রথমটাই মানুষের হৃদয়ে একটা গভীর দাগ কাটে এবং দিনের আলোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দাগটা যেমন ধীরে ধীরে মিশাইয়া যায়, তেমনই বিন্দুর স্মৃতিটি চুণীর হৃদয়ে কিছুদিনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্টস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিল, তারপর পদ্মার প্রখর প্রেমালোকে সেই স্মৃতিটুকু কখন মিলাইয়া গেল!

পদ্মাকে পাইয়া চুণীর মনে হইল, এতদিনে তাহার কল্পনা সার্থক হইয়াছে; কমলা কখন তাহার মায়াস্পর্শ দিয়া চুণীর রসশূন্য মরুপ্রায় জীবনটাকে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, পান করিবার জন্য তাহারই মুখের কাছে স্বহস্তে সুধাভাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। চুণী আকণ্ঠ পান করিয়া জগৎসংসার ভুলিয়া রহিল!

সেদিন যখন মুহূর্ত্তের জন্য চুণী চলন্ত গাড়ীর পাদানির উপর হইতে বিন্দুর রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি প্রত্যক্ষ করিল, তখন বহুদিনের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিটা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিল। যাহাকে সে একদিন অতি নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার রোগশীর্ণ, পাণ্ডুর মুখখানি ক্রমাগতই তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই ছায়াকে অপসারিত করা গেল না; কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে সেই সন্ত্রস্ত, মূর্চ্ছাতুর দৃষ্টিটুকুকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না! আজ পদ্মার সুধাভাণ্ডে এমন অমৃত পাওয়া গেল না, যাহা দুর্ভাগ্য চুণীর কাছে সেই মুহূর্ত্তদৃষ্টা বেপথুমতী বিন্দুর স্মৃতিটুকুকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে! চুণী ভাবিল, যাহাকে একদিন সে বিসর্জ্জন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অদৃষ্টের কোন্ নিষ্ঠুর সঙ্কেতে আবার সে তাহার জীবন-পথের উপর এমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িল?

মুহূর্ত্তের পরিচয়ে পদ্মা যাহাকে সখীত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে, সে যে পদ্মার কি, হায়, পদ্মা যদি তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত! কিন্তু বিন্দু

ত জানিয়াছে!—বিন্দু ত জানিয়াছে, তাহাকে গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া তাহার স্বামী নিজের সুখ ও তৃপ্তিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য এমন একটি সংসার রচনা করিয়া তুলিয়াছেন, যেখানে তাহার প্রবেশ করিবার এতটুকু অধিকারও নাই।

আজ চুণীর হঠাৎ মনে হইল, এ সে কি ভুলই করিয়া বসিয়াছে!

যে নারী লতিকাটির মত তাহাকেই বেষ্টন করিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে পথের ধুলায় মিশাইয়া দিয়াছে; যাহাকে সে ইচ্ছা করিলেই সুখী করিতে পারিত, তাহার মুখের হাসিটুকু সে চিরদিনের জন্য নিভাইয়া দিয়াছে! আজ সে তাহাকে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটির মতই পরিম্লান দেখিয়া আসিল,—কেন দেখিল?

এই যে স্বপ্নের ছায়ার মত সংসারের দুঃসহ জীবনালোকের সম্মুখে সে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে,—কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য চুণী নিজের অন্তরের দিকে চাহিল, দেখিল, সেখানে দারুণ দৈন্যপূর্ণ চকিত শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে!

(৮)

পুরী যাইয়াই বিন্দু ষোড়শীকে চিঠি লিখিল, "ঠাকুরঝি, বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে একদিনও মনে কর্ত্তে পারিনি, যে আমার জীবনেও এমন একটা দিন আসতে পাবে, যেদিন আমি মরণকে অসুন্দর বলে মনে করব, এবং তাকে দূরে রাখ্‌তে চাইব। কিন্তু সত্যি ভাই, আজ যে আর আমার মরবার ইচ্ছা এতটুকুও নাই; এ কথাটা বল্‌লে তুই হয়ত খুব বিস্মিত হয়ে যাবি! কিন্তু এ অভাগীর জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত এসে পড়েছে, যখন সেও আর কিছুদিন সংসারে থেকে যেতে চায়; পুরী আস্‌বার পথে, গাড়ীতে এমন একজন আমাকে সখীত্বে বরণ করেছে, তার পরিচয় নিয়ে জান্‌তে পেরেছি, যে, সে শুধু আমার সখীই নয়, তা' ছাড়া এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার রয়েছে, যে সম্পর্কটাকে নারীজাতিটা সাধারণতঃ বড় ঈর্ষার চক্ষেই দেখে থাকে!

পদ্মা যে আমার 'সতীন্' একথা যখন প্রথম বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তখন সহস্র চেষ্টা করেও যে আমি নিজেকে স্থির রাখ্‌তে পারি নাই, এজন্য আজ সত্যিই আমার ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছে। প্রথম অস্থিরতাটা কেটে গেলে যখন পদ্মার দিকে চাইলাম, তখন দেখ্‌লাম কোলের শিশুটি আমার দিকে তার শান্ত

দৃষ্টি তুলে চেয়ে আছে! তাকে পদ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লাম; সেই মুহূর্ত্তে আমার অন্তরের সমস্ত দৈন্য কেটে গেল, আমার হারাণ গর্ব্ব ও অধিকার আমি ফিরে পেলাম! সেই শিশুর একদিনকার সেই মুহূর্ত্তের স্পর্শ আমার কাছে আমার কাম্য মৃত্যুকেও অসুন্দর করে তুলেছে! আজ সেই ক্ষুদ্র অবোধ শিশুটিই আমার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার ধন হয়ে উঠেছে! তাকে আবার কবে এবং কি কৌশলে দেখ্‌তে পাব এইটেই এখন আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হয়েছে।

পদ্মাকে আমি আমার পরিচয় ত দিই নাই,—কিন্তু এটা ঠিক, যখনই তার কাছে যাব তখনই সে আমাকে তার সখী বলে সাদরে ডেকে নেবে! তবে কোনও দিন ছেলের উপর দাবী করে তার কাছে দাঁড়াব কিনা, তা' আমি আজও ভাল করে ভেবে দেখিনি! কয়েক দণ্ডের মধ্যে তার হৃদয়ের যে একটি পরিচয় আমি পেয়েছি, তাহাতে পদ্মার কাছে হয়ত কিছুই পাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে! আর আমি ত ছেলেই চাই,—ছেলে ছাড়া আমি কোনও দিনই যে তার কাছ থেকে আর কিছু ভাগ করে নিতে চাইব না, তা ঠাকুরঝি, আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তুমি অন্ততঃ নিশ্চয়ই করবে।

পদ্মা যা ঠিকানা দিয়াছে, সে ত তোমাদেরই এক সহরের ঠিকানা। তাকে তুমি, লক্ষ্মীটি আমার, খুঁজে বের কর, এবং আমাকে জানাও আমি একেবারে তোমার কাছেই যেয়ে পড়্‌ব, এবং ওখানেই আমার মরা বাঁচা যে হউক একটা স্থির হয়ে যাবে।"

ষোড়শী বিন্দুর চিঠি পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! শিশিরকে চিঠি দেখাইল। শিশির চিঠি পড়িয়া কহিল, 'তোমার চুণীদা'র দুর্ভাগ্য যে তিনি এ রত্ন চিন্‌তে পারেন নাই।"

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যে কথাটা এতদিন তার কাছে গোপন ছিল, এমন করে হঠাৎ যে সে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে তা' একবারটিও মনে করিনি!"

শিশির একটু হাসিয়া কহিল, "সংসারে অনেক গোপন তথ্যই এমনই করে প্রকাশ হয়ে পড়ে থাকে, তা'তে বিস্ময়ের কিছু নেই, রাণী!"—

"সে ত মর্ত্তেই চলেছিল,—কিন্তু এই দুঃসহ বেদনাকে সহ্য কর্‌বার মত শক্তি তার আছে বলেই বোধহয় ঠাকুর তা'কে ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেই এমন করে সব জানিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন করে বুক পেতে যে সে এই আঘাতটাকে

গ্রহণ করতে পার্‌বে, তা' আমি কোনও দিনই মনে করিনি!"—ষোড়শীর দৃষ্টি অশ্রুম্লান হইয়া আসিল! শিশির একটু হাসিয়া কহিল, "তা' এমনটা হ'লে তুমি সহ্য কর্‌তে পারতে?"

"ইঃ,—আমার এমনটা হবেই কেন?"

—"বটে!—এত জোর!" শিশির ছুটি অঙ্গুলি দ্বারা ষোড়শীর সূক্ষ্ম অধর পুট একটু টিপিয়া ধরিয়া নাড়িয়া দিল!

ষোড়শী শিশিরের কাছে সরিয়া আসিল এবং দুই বাহুতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল!

শিশির তাহার কপোল টিপিয়া দিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "ভারি দুষ্ট!"—

পরদিন ষোড়শী বিন্দুকে চিঠি লিখিল—"বৌঠান্‌, যে খবর তুই সেদিন হঠাৎ জেনেছিস্‌ তা' আমরা দু'বছর পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলাম। কিন্তু কোনও দিনই মনে কর্ত্তে পারি নাই, যে, তুই এই দারুণ আঘাতটাকে এমন করে বুক পেতে গ্রহণ কর্ত্তে পার্‌বি! তাই সাহস করে তোকে সব কথা বল্‌বার কল্পনাও কর্ত্তে পারি নাই, তুই এমন, তা' ত জান্‌তাম না, বিন্দু! আজ বড় গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেছে! তোকে দেবীর আসনে বসিয়েও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না!

তুই এখানেই চলে আয়, লক্ষ্মী! আর কিছু না হোক্‌ তোর খোকাকে তুই দিনান্তেও একটিবার দেখ্‌তে পাস্‌ সে সুবিধা ত করা যাবে। তারপর যিনি এত ব্যাপার ঘটিয়ে তুল্‌তে পারেন, তাঁর মনে যা আছে, তাই হবে!"

বিন্দু ষোড়শীর চিঠি যেদিন পাইল তার পর দিনই পদ্মার একখানি চিঠিও পাইল। চিঠি খানাতে সংক্ষেপে কয়েকটি লাইন মাত্র লিখিত ছিল।

"তোমাকে অমন অবস্থায় সেদিন গাড়ীতে রেখে এসে মনটা বড়ই অশান্ত হয়ে উঠেছে, তার উপর এখানে এসেই খোকার অসুখ হয়ে পড়াতে আরও উদ্বেগ ভোগ কর্‌ছি। যদিও কয়েক দণ্ডের দেখা, তবুও মনে হয়, তুমি যেন আমার কত আপনার জন;—বোধহয় পূর্ব্ব জন্মে মায়ের পেটের বোন্‌ ছিলে! তোমার খবর দিও, বিন্দু! খোকার অসুখটা একটু বেশীই হয়ে পড়েছে, একটু কম্‌লেই তোমাকে বিস্তারিত লিখ্‌ব!"

পদ্মার চিঠি পাইয়া বিন্দু বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল! একটা নূতনতর উদ্বেগের অনুভূতি তাহাকে সমস্ত দিনটা ধরিয়াই আকুল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার শঙ্কাচঞ্চল বক্ষের মধ্যে শুধু ছুটি কথাই রহিয়া রহিয়া বাজিতেছিল, "খোকার

অসুখ—খোকার অসুখ!"—একি দুঃসহ উদ্বেগ,—খোকাকে দেখিবার জন্য একি আকুল আগ্রহ, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে! বিন্দু কতবার পদ্মার চিঠি পড়িল,—কতবার ষোড়শীর চিঠি পড়িল; আজ আর তাহার মন যেন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না! বিন্দু অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, ষোড়শীর কাছেই যাইবে। তাহার মনে হইতেছিল, খোকাকে দিনান্তে একটিবার করিয়া দেখিতে পারিলেও সেইটাই তাহার পক্ষে পরম ও চরম লাভ হইবে!

(৯)

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে বিন্দু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিয়াছে!

ঘরের পাশেই একটা কামিনীফুলের গাছ ছিল। মৃদু বায়ু স্পর্শে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব দিনকার প্রস্ফুটিত ফুল গুলির কতক দল ঝরিয়া পড়িয়াছে, কতক তখনও গাছে আছে। তবে সেগুলি কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। একটা কালো রংএর প্রজাপতি তখনও ফুলের কাছে কাছে উড়িতেছিল!

বিন্দু প্রজাপতিটার চঞ্চল নৃত্য লক্ষ্য করিতেছিল কি না ঠিক বুঝা যাইতেছিল না, তবে তাহার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল!

এমন সময়ে ষোড়শী আসিয়া ডাকিল, "বৌঠান্—"

বিন্দু একটু চমকিয়া উঠিয়া ষোড়শীর দিকে ফিরিয়া চাহিল।

—"তোর হয়েছে কি বল্ ত? আজ আর ও বাসায় গেলিনা, কেন লা?"—

বিন্দু একটু ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, "তা সব দিন যে যেতেই হবে এমন ত কোনও কথা নাই, ঠাকুরঝি!"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষোড়শী কহিল, "তা যেন বুঝ্লাম, আসল কথাটা কি খুলে বল্ ত"—

"আসল কথাটা ছেলে আরাম হয়ে উঠেছে, এখন অত বেশী না গেলে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই ত!"—

বিন্দুর উত্তর শুনিয়া ষোড়শী তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "হুঁ, তা বুঝ্লাম, ছেলে দেখ্বার জন্যেই মরণ ফেলে ছুটে এলি,—এখন 'ক্ষতি বৃদ্ধি' নেই,—সে কি রকম?"

বিন্দু একটু জোর করিয়া একবার গলা ঝাড়িয়া লইয়া জবাব দিল, "এর আর রকম কি বাপু? কোনও কথা ত সোজা ভাবে নেওয়া তোর কোষ্ঠিতে লেখেনি!"

ষোড়শী হাসিল। সে হাসিটুকু কৌতূহলে, বেদনায়, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ;—হাসির নিম্নেই বুঝি অশ্রু চাপা দেওয়া ছিল। তাই ষোড়শীর মুখে সেই হাসিটুকু বড় সুন্দর মানাইল।

ষোড়শী কহিল,—"দেখ্ বোঠান্, তোর নিজের বুদ্ধির দোষেই তুই মর্‌লি—"

বিন্দু হাসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "মর্‌তে না পেরেই ত তোর কাছে ছুটে এলাম, ঠাকুরঝি—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি"—বিন্দু চুপ করিল, একবার মুখ তুলিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর আবার বাহিরের কামিনী ফুলগাছটার দিকে চাহিল; তখন তার কৃষ্ণায়ত চক্ষু দুইটা জলসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, একটা নিবিড় ক্রন্দনের বেগ কণ্ঠ নিপীড়িত করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল; বিন্দু দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া সে বেগটাকে রোধ করিতে চাহিতেছিল। ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি দেখ্‌লি বিন্দু?"—

—"বুঝি না আসাই ভাল ছিল,—"

—"এতদিন ত এ কথা বলিস নাই, আজ এমন কথা বল্‌লি কেন?"

"একটা পাতান সুখের সংসার,—আমি তা' কোন্ অধিকারে ভাঙ্গ্‌তে আস্‌লাম, ঠাকুরঝি?"

"কেন, তুই ত ধরা দিস্ নাই, দিতেও চাস্ না, তবে ভাঙ্গ্‌তে এলি কেমন করে?"—

"ধরা দিতে আসিনি সত্যি, কিন্তু ধরা পড়্‌তে কতক্ষণ? আর—আর—" বিন্দুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

—"আর কি?"—

"ধরা পড়েছিও বোধহয়;—ধরা পড়্‌লে কে বিশ্বাস কর্‌বে, যে, আমি এমন হীনভাবে ধরা দিতে আসি নি? আমি পুরী ছেড়ে এসে ভাল করিনি, ঠাকুরঝি,—আমার সেখানে পড়ে মরাই বোধহয় সব চেয়ে ভাল ছিল। পদ্মা সুখের সংসার সাজিয়ে তুলেছে,—আমি একটা অভিশাপের মত সেই সংসারের মাঝখানে কেন এসে পড়্‌লাম? ছেলে দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম, এতটা ত কোনও সময়েই ভাবিনি, ঠাকুরঝি!"

—"সত্যি ত আর ধরা পড়িস্ নি, তবে এত ভেবে মরিস্ কেন?—পদ্মা তোকে কেমন করে চিন্‌বে?—ছেলের অসুখ, আর তুই তার সই, সেই ভাবেই না রোজ যাচ্ছিস্!"

—"কিন্তু কাল ব্যাপারটা যা' দাঁড়িয়েছে, তা'তে আর আমার সেখানে

যাওয়া ত চল্‌বেই না, বেশীর ভাগে কেউ যদি মনে করে, যে, আমি শুধু সংসারটাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যেই এসেছিলাম, তা'হলে, একথা যে মনে কর্‌বে তাকে একটুও দোষী করা যাবে না ত! সোজা কথায় অর্থটা ঠিক্ ঐ রকমই দাঁড়ায় কি না, আমার দিকে না টেনে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখ্‌ত, লক্ষ্মীটি!"—

—"রাখ্ তোর বিচার,—কি হয়েছে ছাই, খুলেই বল্ না, তোর একটা মহৎ দোষ এই যে, তুই কিছুতেই পেটের কথা বার কর্‌তে চাস্‌নে!"—বিন্দু একটু ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, "অন্ততঃ তুই ত সে দোষটা আমার উপর চাপাতে পারিস্ নে! তোর কাছে ত আমার কিছুই গোপন নেই, ঠাকুরঝি!—"

বিন্দু আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই খোকার অসুখ অনেকটা আরাম হইয়া গিয়াছিল।

খোকা ঘুমাইতেছিল; জাগরণ ক্লান্ত পদ্মাও ছেলের পার্শ্বে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, চুণী কয়েকদিন পরে কাছারী গিয়াছে। হঠাৎ অতর্কিত চরণশব্দে পদ্মার তন্দ্রা ভাঙ্গিল; সে তাহার ঈষৎ নিদ্রাবেশ-স্ফীত চক্ষু দুইটি তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি নারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে খোকার শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুসিক্তনেত্রে তাহার রোগপীড়িত মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, পদ্মা তাহাকে চিনিল, সে বিন্দু! ষোড়শীকে সে কোনও দিন দেখে নাই; ষোড়শী পদ্মার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মুখখানিতে এমন একটা কিছু ছিল যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই স্নেহ আকর্ষণ করে। তখনও নিদ্রার মৃদু আবেশ ছিল বলিয়া পদ্মার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। বিন্দু কখনও এমন করিয়া তাহার কাছে আসিয়া পড়িতে পারে, ইহা পদ্মার কল্পনারও অতীত। কিন্তু পদ্মার নিবিড় আলিঙ্গন পদ্মাকে তন্মুহূর্ত্তেই বুঝাইয়া দিল যে ইহা স্বপ্ন নহে, মায়া নহে! সত্যই বিন্দু আসিয়াছে!

তারপর প্রত্যহ চুণী কাছারী চলিয়া গেলে, দুপুরে বিন্দু আসিত; প্রথমেই বিন্দু পদ্মাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল, সে যে আসে তাহা পদ্মা চুণীর কাছে বিন্দুর সম্মতি না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারিবে না। বিস্মিতা পদ্মা, কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, বিন্দুর আগ্রহাতিশয্যে স্বীকৃতা হইল।

কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইঙ্গিতে চলে, তিনি বিন্দুর এই সাবধানতার মধ্যেও একটা ফাঁক রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই ফাঁকটার মধ্য দিয়া

অদৃষ্ট একদিন যে মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখা দিল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিন্দু মনে করিল তাহারই বুদ্ধি ও বিবেচনার ত্রুটিতে এমনটা ঘটিল।

সেদিন একজন রাজপুরুষের পরলোক প্রয়াণ উপলক্ষে সরকারী আফিস আদালত বন্ধ হইয়া গেল। চুণী কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার সঙ্গে সেই কথারই আলোচনা করিতেছিল। কখন দুয়ারে বিন্দুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কা পদ্মা তাহা জানিল না। অন্যদিনের মতই পরম নিশ্চিন্তমনে বিন্দু সিঁড়ি অতিবাহন করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। পদ্মার ঘরের দুয়ারটা ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে; পরদা এক হাতে সরাইয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে সহাস্য মুখে বিন্দু ডাকিল, "পদ্মা,"—

স্বামীর বাহুমূলে মাথা রাখিয়া পদ্মা কথা শুনিতেছিল। বিন্দুর আহ্বান শুনিয়া চকিতা পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। চুণী দুয়ারের দিকে চাহিল।

চুণী দেখিল, মৃদুস্মিতাননা নারী কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়াই সেই নারীর স্মিতহাস্য নিভিয়া গিয়াছে; কে যেন চকিত হস্তে সেই চারু নারী প্রতিমার মুখপঙ্কজের অপূর্ব্ব বর্ণসুষমার উপর নিবিড় কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। ব্যাধতাড়িতা অসহায়া কুরঙ্গিণীর মতই বিন্দু, দুই হাতে পরদা সরাইয়া ফেলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া সিঁড়ির দিকে দ্রুত কম্পিত চরণে নামিয়া আসিল।

পদ্মা একটা অস্ফুটশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, দারুণ উত্তেজনায় চুণীর চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকরূপে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সমস্ত মুখখানা, মরণাহতের মুখের মতই রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

বিস্মিতা পদ্মার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেই চুণীর মূর্চ্ছাতুর দেহ পর্য্যঙ্কের উপর লুটাইয়া পড়িল!

বিন্দুর কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া ষোড়শী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ্ বৌ'ঠান, আমার মনে হয় তোর দুঃখের দিন কেটে এসেছে, এবার তোর ম্লান মুখে হাসি ফুটবেই, নইলে কখনই এমনটা ঘটত না; তোর মত সতী লক্ষ্মী সারা জীবনটাই কষ্ট পেয়ে যাবে, এমন অবিচার হতেই পারে না।"

বিন্দু একটু হাসিয়া কহিল,—"যেহেতু তোমার গরজ কিছু বেশী,—এই ত?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দু কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—"ঐ কামিনী

ফুলের দলগুলি দেখ্‌ছিস্‌?—গাছ থেকে ঝরে পড়েছে? ও ঝরা দলগুলি কুড়িয়ে গাছে লাগিয়ে দেওয়া চলে কি? ঐ দলগুলিই শুকিয়ে ম্লান হয়েছে, কিন্তু চেয়ে দেখ্‌, ঠাকুরঝি, গাছ ছেয়ে নূতন ফুল ফুটেছে! তোরা ঝরা দলগুলির জন্য কোনও বিচারের আবশ্যক আছে বলে মনে করিস্‌ কি?"—ষোড়শী কহিল, "দেখ্‌ তোর এ সব কথার উত্তর যে একেবারে না দেওয়া যায় এমন নয়। মানুষগুলি একেবারে পশুই সব সময়ে থাকে না এবং মাঝে মাঝে ঝরা ফুল কুড়িয়ে আদর করে তুলে নেয় এমনও ত দেখা যায়। যখন তুই মরণ-কামনা করে পুরী যাচ্ছিলি, সেই শেষ মুহূর্ত্তে, খোকাকে দেখিয়ে যিনি তোকে এখানে টেনে আনতে পেরেছেন, মনে হয়, তিনি বুঝি সবই কর্ত্তে পারেন।"—

ষোড়শীর কথা শুনিয়া বিন্দু এবার আর হাসিল না, অশ্রুজড়িতকণ্ঠে কহিল, "আমি শুধু ছেলে দেখ্‌তেই এসেছি. ঠাকুরঝি। আর কিছু কামনা আমি করি নাই, নারী বুদ্ধি নিয়ে বুঝ্‌তে পারিনি, যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ঠিক্‌ ততটা সহজ নয়। ধরা পড়্‌লে যে একটা অনর্থ ঘট্‌বে, এ হিসাব কর্ত্তে পারিনি! মা হয়েছি, তখন সেই গর্ব্বেই আমার বুক ভরে উঠেছিল;—এ যে কি এক নূতনতর স্পন্দন, অনুভূতি বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে, তা' ঠাকুরঝি তোকে বুঝাতে পারব না!—ছেলের মা হতে পারি, কিন্তু সংসার ত ছেলের নয়, সেখানে আমার কি দাবী আছে?—কিছু না! ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক্‌, সে যদি আমার দাবী, আমার অধিকার না বোঝে, তবুও তার কাছে এসে আমি অসঙ্কোচে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু যিনি আমাকে আমার সকল অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছেন, আমার অপমান হলে সেটা যে তাঁরই গায়ে বাধবে, এটুকুও যিনি বিবেচনা করেন নি,—তাঁর কাছে আর কখনই আমি দাঁড়াব না! তাতে মনে হয়, স্ত্রীজাতিটারই অপমান করা হবে।"—

—"তা' তিনিই যদি তোকে ডাকেন।"

—"না, তা' হলেও না! আর সে ডাক্‌বার পথ ত তিনি নিজেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন!"—

ষোড়শী তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি একটু কুঞ্চিত করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলখানি তুলিয়া লইতে লইতে কহিল,—"কেন, পদ্মাকে এনেছেন বলেই কি তোকে ডাক্‌বার অধিকার হারালেন?"—বিন্দু ব্যথিত স্বরে কহিল, "না ঠাকুরঝি!

একটা দাসীর অধিকার দিয়েও আমাকে তাঁর সংসারের এক কোণে ফেলে রেখে, যদি তিনি সহস্র পদ্মা ঘরে আন্‌তেন, সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি, তা হলেও আমার এতটুকু ক্ষোভও থাকৃত না। কিন্তু আমার সম্মান রক্ষার ভার ত তাঁর উপরেই, তাঁর সংসারের বাইরে যে আশ্রয়েই, যত আদরেই থাকি না কেন, সে আশ্রয় ত আমাকে সম্মান দিতে পারে না, আমাকে অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি যদি আমার মান অপমান একবারটি ও হিসাব করে না দেখ্‌লেন,"—বিন্দুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে তাহার অশ্রুপরিপ্লুত চক্ষু দুইটি একবার অঞ্চলে মার্জ্জনা করিল, তারপর দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। ষোড়শী তাহার দুই বাহু দ্বারা বিন্দুর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বিন্দু ষোড়শীর স্নেহপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় পাইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভারটা লাঘব করিতে চাহিল। ষোড়শীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বিন্দুর চুলের রাশির মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল।

ষোড়শী কহিল, "ওঠ বো'ঠান্‌, চোখের জলে সত্যিই যখন দুঃখের আগুন নেভে না, তখন কেঁদে ফল কি? যা ঠাকুর কর্ব্বেন, তাই হবে; ভেবে কিছু ফল আছে মনে হয় না!—ওঠ্‌, তোর চুলগুলি ভারি রুখু হয়ে গেছে, আয় বেঁধে দি'।"

বিন্দু সে কথায় কাণ না দিয়া কহিল,—"যে আগুন নিভাতে জানে না, শুধু জ্বাল্‌তেই জানে, সে যে একটা মস্ত অভিশাপ! তা'কে দূরে সরে যেতেই হবে! তুই আমাকে পুরীই পাঠিয়ে দে, ঠাকুরঝি।"—

"ষোড়শী ধীরে ধীরে কহিল, "তা তিনি ডাক্‌বেন না এটা যদি নিশ্চিত বুঝে থাকিস্‌, তা'হলে তুই অত ভয় পাচ্ছিস্‌ কেন,—আর এত ব্যস্তই বা হয়ে উঠেছিস্‌ কেন?"

বিন্দু উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তিনি ডাক্‌বেন না সত্যি, কিন্তু আমি পক্ষকাল পদ্মার সঙ্গে থেকে তাকে যদি একটুও চিনে থাকি, তা'হলে আমি ঠিক্‌ বল্‌ছি, যে মুহূর্ত্তে, পদ্মা সব জান্‌তে পার্‌বে, সে ছুটে আস্‌বে ;—আমাকে ডাকৃবে! কিন্তু তেজস্বিনী পদ্মা তাঁকে ক্ষমা কর্‌বে না;—অন্ততঃ ক্ষমা কর্ত্তে চাইলেও, পারবে না!—ঠাকুরঝি, এ আমি কি কর্‌লাম?—কেন পদ্মার সুখের হাট ভেঙ্গে দিতে পুরী থেকে ছুটে এলাম? এ যে কি ধিক্কার, কি জ্বালা,

আমি ভোগ করছি, তা'ত আমি বলতেও পারিনে! পদ্মা এসে পড়বার পূর্ব্বেই যা'তে আমি পুরী চলে যেতে পারি, তারই একটা বন্দোবস্ত কর, লক্ষ্মী দিদিমণিটি আমার!"—

ষোড়শী তাহার বিস্ময় বিস্ফারিত বিশাল চক্ষু দুইটার নিবিড়দৃষ্টি বিন্দুর অশ্রুম্লান মুখের উপর স্থাপন করিয়া কিছু কাল অভিভূতের মত বসিয়া রহিল তারপর গাঢ়স্বরে কহিল,—"তোকে ভুলে যাওয়া আর তোকে না চিনতে পারার চেয়ে দুর্ভাগ্য বেশী যে আর কি হতে পারে, তা' সত্যি আমি ভেবে পাই না, বিন্দু!"

বিন্দু কোন কথা কহিল না।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। একটা উদ্দাম পবন প্রবাহ কামিনী ফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিয়া বিন্দু ও ষোড়শীর অঞ্চল ছুঁইয়া, চূর্ণ কুন্তল উড়াইয়া কক্ষ মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল।

দুইটি ব্যথিতা নারী সেই বিরলান্ধকার কক্ষ মধ্যে পরস্পরেরকণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনভাবে বসিয়া রহিল।

[আগামী বারে সমাপ্য।]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

জয়া ঠাকুরাণী। *

পতিব্রতা চলিয়াছ
কোন্ মহাপথে
উজ্জল পবিত্র ভরা
স্বর্ণ ময় রথে।
চরণ ধুলার তলে
লুটাইয়া শির
পরাণে জাগিয়া উঠে
কি ভাব গভীর!
আদর্শ রমণী তুমি
জগতে অতুল।

হেথায় উপমা কিছু
নাহি সমতুল।
'মানিকে' রাখিয়া একা.
পবিত্র অন্তরে
চলিয়াছ শ্রেষ্ঠ তীর্থে
জনমের তরে।
জগতে শিখায়ে দাও
পতিব্রতা নারী,
কোমল হৃদয়ে সবি
সহিবারে পারি।

শ্রীশান্তি দেবী।

---

* 'ঋণপরিশোধ' পাঠে লিখিত।

বাদলা-পোকা।

(একটি ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।)

অনেকদিন পরে দেখা ;—বন্ধুবর 'মিষ্টর' অনিল চন্দ্র রায় তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, চাকরীর সন্ধানে যখন পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন, তখন আমাকেও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। সে প্রায় দশ বৎসরের কথা।

এই দীর্ঘকাল পরে, শিমলা শৈলে, আজ অভাবনীয় রূপে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল। পূর্ব্বে আর্থিক হিসাবে অনিলের সাংসারিক অবস্থা বড় মন্দ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম অনিল তাহার প্রাণপণ যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়াছে। সহরের বাহিরে, বাটীখানিও অতি সুন্দর হইয়াছে; পাহাড়ের গায়ে, খানিকটা সমতল ভূমির উপর, সেই সবুজ শ্যামল উদ্যানে ঘেরা, লালরঙের সজ্জিত, পরিচ্ছন্ন 'বাংলো' খানি দর্শক মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করে, নামটিও তেমনই,—"শান্তিকুঞ্জ।" এই "শান্তিকুঞ্জে"র অধিকারী অনিলের স্বভাবগত পরিবর্ত্তন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনিল আমাকে দেখিবামাত্র ঠিক পূর্ব্বকালের মতই ছুটিয়া আসিয়া, অধীর আবেগে, আনন্দভরে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। বাস্তবিক, সেই সুদূর প্রবাসে বন্ধুর আলয়ে অতিথিরূপে, কয়দিন যে অকপট স্নেহ, সৌজন্য ও সমাদর লাভ করিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন আমার মনে অঙ্কিত থাকিবে!

যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণ এবং পর্য্যাপ্ত ভোজনে আপ্যায়িত করিয়া অনিল আমাকে তাহার রত্নখচিত বাগান, বাড়ী প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। আমি তখন বন্ধুর অধ্যবসায় ও রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অনিল পুলকিত হইয়া বলিল, "বাড়ীখানি তোমার পছন্দ হয়েছে তাহলে?"

"নিশ্চয়ই! 'শান্তিকুঞ্জ' নাম রাখা তোমার সার্থক হয়েছে। কিন্তু ভাই, এ স্থানটা বড় নির্জ্জন, আর শুধু চাকর বাকর ছাড়া তোমার বাড়ীতে আর কাকেও দেখ্‌ছি না ত?"

অনিল একটু হাসিয়া বলিল, "নির্জ্জন বলেই বাড়ীখানি আমি পছন্দ করে কিনেছি। আমার বাড়ীতে চাকর বাকর ছাড়া আর কাকে দেখবার প্রত্যাশা কর তুমি?"

আমি বিস্মিত ভাবে কহিলাম "কেন ?—মিসেস্ রায় কি——"

আমায় আর বলিতে না দিয়া অনিল তাড়াতাড়ি "আমার খাস কাম্‌রাটা এখনও তোমায় দেখান হয় নাই,—" এই বলিয়া হাত ধরিয়া আমায় তা'র শয়ন কক্ষে লইয়া গেল।

অন্যান্য ঘরের তুলনায় এ কাম্‌রাটিতে সাজসজ্জার আড়ম্বর এবং আস্‌বাব-পত্রের বাহুল্য একেবারে নাই বলিলেই হয়। সে ঘরে চারিদিককার দেয়ালে চারিখানি বড় ফটোগ্রাফ ও তৈলচিত্র দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্কা তরুণীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি, চারিখানি চিত্রতেই বিভিন্ন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

সে কক্ষে আর একটি অদ্ভুত আশ্চর্য্য জিনিশ দেখিয়া আমার মনে বিস্ময় ও কৌতূহল এক সঙ্গেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনিলের শয্যার শিয়রে, একটি ছোট মার্ব্বেল টেবিলের উপর, সুন্দর গ্লাসকেসের মধ্যে, একখানি মণিমুক্তা খচিত, স্বর্ণময় ফটোষ্ট্যাণ্ড্, তাহাতে ফটোর বদলে, একটি অর্দ্ধদগ্ধ বাদ্‌লা-পোকা পিনের সাহায্যে সযত্নে আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার চারিদিকে সুগন্ধি ফুলের মালা স্তবকে স্তবকে সজ্জিত, যত্নের আর সীমা নাই! একটা আধ্‌পোড়া বাদ্‌লাপোকার জন্য এত কাণ্ড!

আমি বিস্ময় ও কৌতূহল দমনে অক্ষম হইয়া অনিলকে বাদ্‌লাপোকাটি দেখাইয়া সোৎসুক্যে জিজ্ঞাসিলাম, "একি ব্যাপার ভাই?"

অনিলের হাস্যময় প্রফুল্ল মুখকান্তি তরল বিষাদ ছায়ায় দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া গেল। "এই বাদ্‌লাপোকার দুঃখময় ইতিহাস তুমি শুনিতে চাও অতুল?"

বিষণ্ণ ভগ্ন কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া অনিল শ্রান্তভাবে, সোফার উপর বসিয়া পড়িল। আমি তাহার পাশে বসিয়া কহিলাম "হাঁ ভাই, অবশ্য বলিতে যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তবে। বাস্তবিক অনিল, তুমি আমাকে বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ করিয়া তুলিয়াছ!"

অনিল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদাস স্বরে বলিল "ঘটনাটা শুনিলে আরও অবাক্ হইয়া যাইবে। অতুল, তুমি জান না এই বাদ্‌লা পোকাই এখন আমার এ নিঃসঙ্গ বিরস জীবনের সুখ শান্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, আত্মীয় বন্ধু সকলই! ইহার মত প্রিয় ভালবাসার বস্তু জগতে আমার আর কিছুই নাই।"

আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল! অনিল বলে কি? তাহার মস্তিষ্ক ও বিবেক বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ আছে ত?

অনিল তখন বিষাদগম্ভীর মুখে বলিতে আরম্ভ করিল "তবে শোন ভাই, আমার জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আশ্চর্য্য ও গোপনীয় ঘটনা আজ তোমায় কাছে প্রকাশ করিয়া আমার অবসাদগ্রস্ত দুর্ব্বহ হৃদয়ের ভার একটু হালকা করিয়া লইব।

তুমি ত জানই, বাবার মৃত্যুর পর নিতান্ত অভাবে পড়িয়া কিছু উপার্জ্জনের আশায় আমি পশ্চিমে আগমন করি, তারপর এদেশে আসিয়া একটি চাকরীর প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে আফিসে আফিসে বিস্তর ঘুরিয়াও যখন কোনও উপায় করিতে পারিলাম না, তখন আমার দুর্গতি ও লাঞ্ছনা দেখিয়া করুণাময় ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন, আমি অল্প আয়াসেই কাল্‌কা শিমলা মেলে, ড্রাইভারের পদে নিযুক্ত হইয়া গেলাম। কাজটা ভদ্রলোকের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নহে, কিন্তু সে অবস্থায় আর ভাল মন্দ বিবেচনার সময় ছিল না।

তারপর কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া না সুখ, না দুঃখ, এমনই ভাবে দিন কাল কাটিয়া যাইতেছিল।

এমন সময় বেলা, আমারই মত সহায় সঙ্গিহীন, আত্মীয়স্বজন বঞ্চিত, সরলা বালিকা বেলা, একদিন কোথা হইতে আসিয়া আমার সেই একটানা জীবন স্রোত ভিন্ন পথে ফিরাইয়া দিল। সেই সর্ব্বগুণময়ী স্নেহশীলা নারীর সুমধুর কোমল পরশে আমার শুষ্ক কঠোর জীবন তখন বড় সরস, বড় মধুময় হইয়া উঠিল।"

অনিল সহসা নীরব হইয়া, সম্মুখে চিত্রাঙ্কিত তরুণী মূর্ত্তির পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

অতীতের সুখোজ্জ্বল, প্রীতিমাখা, মধুর স্মৃতিটুকুর প্রভাবে তাহার মলিন পাংশুমুখ ক্ষণেকের জন্য যেন উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি মিসেস্ রায়ের কথা বলিতেছ কি?"

অনিল গাঢ় স্বরে, আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "হাঁ, বেলাকে সহধর্ম্মিণী রূপে লাভ করিয়া বাস্তবিক আমার সুখের সীমা ছিল না। তখন ড্রাইভারি করিয়া আমি যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতাম, একটি ভদ্রপরিবারের পক্ষে তাহা যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু বেলার গুণে আমার সে অসচ্ছল দরিদ্র সংসারেও স্বর্গের সুখ উথলিয়া পড়িত।

সে শান্তি, সে তৃপ্তি, বুঝি বিধাতার পোড়া প্রাণে সহিল না, তাই কয়েক বৎসর পরেই দুরারোগ্য বিষম ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া বেলা আমার দুর্ভাগ্য জীবনের সেই প্রথম ও শেষ সুখের কালটুকুকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কাল্‌কা ষ্টেশনের নিকটে, একখানি ছোট খাট বাংলা ভাড়া করিয়া আমরা থাকিলাম। বেশী চাকর বাকর রাখা সামর্থ্যে কুলাইবে না, সুতরাং একটি ঠিকা দাসী মাত্র আমাদের ভরসা ছিল। দিন রাত্রির অধিকাংশ সময়ই আমাকে ট্রেণে কাটাইতে হইবে। সে অবস্থায়ও পীড়িতা বেলার সেবা ও চিকিৎসা—যত-দূর সম্ভব—হইতে লাগিল, কিন্তু সকলই বৃথা! বেলা তাহার শক্তিহীন অবসন্ন দেহ লইয়া ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিল।"

হায় রে অভাগা! অনিলের অবসাদক্লিষ্ট করুণ মুখপানে চাহিয়া আমি ব্যথিত প্রাণে কহিলাম "তাঁহাকে সেই বিপন্ন অবস্থায় একাটি ঘরে রাখিয়া তোমায় স্বকার্য্যে যাইতে হইত বোধ হয়?" "নিশ্চয়ই"—

একটী গভীর কাতর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "ড্রাই-ভারের কাযে ছুটির প্রত্যাশা বড়ই কম। তখন চাকরী যদি ছাড়িয়া দিই, বেলা আমার ঔষধ ও পথ্যাভাবে মারা যায়। সুতরাং রোগীর কাছে দুদণ্ড বসিবার বা সেবা শুশ্রূষা করিবার অবকাশ আমায় একেবারেই মিলিত না।

পূর্ব্বে, দিনে কি রাত্রিতে, যখন যে মুহূর্ত্তে গৃহে ফিরিতাম, স্নেহময়ী বেলা তাহার প্রাণভরা প্রেম ও হৃদয়ভরা আগ্রহ লইয়া হাসিমুখে আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; সে মুখ একবার দেখিলে আমার সকল শ্রম, সমস্ত কষ্ট যেন সার্থক জ্ঞান করিতাম।

এখন অবস্থাটা ঠিক বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। এখন দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর দুদণ্ডের জন্য ঘরে আসিয়া রুগ্না বেলার ঔষধ পথ্য প্রভৃতির সাধ্যমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই আমাকে আবার ছুটিতে হইত।

বিশ্রামের অবসর আমার ত ছিলই না, তার পর মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। দুর্ভাগ্য জীবনের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া আমি ক্রমেই শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। সে সময় আমার চিরসঙ্গী, সচল গৃহস্বরূপ, অগ্নিতপ্ত এঞ্জিনটই একমাত্র আরাম ও সান্ত্বনার স্থল ছিল। সেই দৃঢ়বপু লৌহময় বাষ্পরথ তাহার কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড দেহ দুলাইয়া, বিকট হুঙ্কারে বিজন পার্ব্বত্য ভূমির প্রত্যেক কন্দর আলোড়িত করিয়া, রাশীকৃত ধূম ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে করিতে ক্রোধোন্মত্ত দানবের মত সবেগে, সদম্ভে যখন ছুটিয়া চলিত, তখন আসন্ন বিপদের দুর্নিবার আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা আমি সমস্তই যেন ভুলিয়া যাইতাম।"

বন্ধুর দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার ব্যথিত প্রাণ সমবেদনায়

ভরিয়া উঠিতেছিল, তবু কৌতূহলের অদম্য প্রভাবে আরও শুনিবার জন্য আমি উন্মুখ হইয়া বলিলাম, "তারপর ?"

অনিল বলিল, "বর্ষার সময় এ দেশেও জলবায়ু দূষিত হইয়া উঠে, সেই সময় বেলার ব্যাধিও অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। তখনও আমার কাজের কিন্তু বিরাম ছিল না। হায় অর্থ! তোমার অভাব যাহাকে পোহাইতে হয়, তাহার জীবন ধারণই বিড়ম্বনা। শ্রাবণ মাসের শেষে, একদিন বেলার অবস্থা বড় ভয়ানক বোধ হইল, আমার জীবন সর্ব্বস্ব বেলা, বুঝি এইবার আমায় জন্মের মত ছাড়িয়া যায়! আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে সেইদিন আমার রাত্রির ডিউটী পড়িয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া যাই? সম্মুখে বর্ষার বিভীষিকাময়ী করাল রাত্রি, গৃহে একাকী মুমূর্ষু প্রায় মরণাপন্ন রোগী! আশঙ্কায়, উদ্বেগে যেন পাগলের মত হইয়া আমি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলাম, কিন্তু আমার আবেদন নিষ্ফল হইল, এত সাধ্যসাধনাতেও একদিনের ছুটি পাইলাম না।

নিরাশায়, ক্ষোভে, আমার অন্তরাত্মা তখন যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চাকরী! আর কিসের জন্য? আমার সংসারের সার রত্ন, সর্ব্বস্বধন বেলা আজ মৃত্যুশয্যায়, সে যদি না রক্ষা পায়, তবে আমার অর্থের আর আবশ্যকতা কি? আমি বেলার বিরহে যদি বাঁচিয়াই থাকি, দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়াও ত দিনান্তের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ বেলার জীবনের অমূল্য শেষ মুহূর্ত্তটুকু, সে ত আর ফিরিয়া পাইব না!

আমি তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের মত বলিলাম "চাকরী করিতে আর আমি চাই না, দয়া করিয়া আমায় এখন রেহাই দিন।"

"তুমি চাকরী করিতে না চাও করিও না, কিন্তু আজ আমরা তোমায় কোনও মতেই ছাড়িতে পারিব না। তুমি কি জানন আজিকার মেলে পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের সেক্রেটরী মহাশয়কে সিম্‌লায় পঁহুছাইয়া দিতে হইবে? নূতন ড্রাইভার রাখিলে, এই বর্ষার ভয়ানক রাত্রিতে অপরিচিত, বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে, যদি কোনও বিভ্রাট ঘটে, তখন তাহার জন্য কে দায়ী হইবে?"

কর্ত্তৃপক্ষীয়দের তরফ হইতে এই বজ্রাঘাত তুল্য কঠোর আদেশ পাইয়া আমি হতাশ ভগ্নচিত্তে বেলার কাছে একবার জন্মশোধ বিদায় লইবার জন্য বাড়ীতে ফিরিলাম। আমার বক্ষের ভিতর তখন যেন রাবণের চিতা জ্বলিতেছিল, উত্ত্যক্ত, বেদনার্ত্ত প্রাণ, অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বেলার অবস্থা তখন আরও মন্দ,—তাহার সঙ্কটাপন্ন জীবন তৈলহীন দীপের মত ক্রমেই স্তিমিত নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল, তবু সেই ধৈর্য্যময়ী সহিষ্ণুতার প্রতিমা আমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে মধুর শান্তস্বরে কহিল "ভয় কি ? সমুখে এই রাত্রিটুকু বই ত নয় ? সকাল হ'লেই আবার আস্‌বে তুমি। এত শীঘ্র আমি মরছি না !" একটু আশ্বস্ত হইয়া আমি বলিলাম "ভগবান তাই করুন ! বেলা, ফিরে এসে তোমায় যেন আবার দেখ্‌তে পাই !"

তারপর, বেলার রোগের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ঔষধ পত্র, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতির যথা সম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বেলা তখন শ্রাবণের মেঘভরা আঁধার গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া বড় উদ্বিগ্নভাবে ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল "এই বিষম দুর্য্যোগ, বর্ষার অন্ধকার রাত্রি মাথায় করিয়া তুমি যাইতেছ, আজ জানিনা আমার অদৃষ্টে আরও কি আছে !"

এবার বড় কষ্টে, বড় বেদনায় বেলার রোগ-বিবর্ণ পাণ্ডুর কপোলে অশ্রুধারা বহিল। তাহার চক্ষের জল মুছাইতে গিয়া আমি নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইলাম। বেলার রোগ শীতল ঘর্ম্মাক্ত হাত দুখানি ধরিয়া আমি আবেগ ভরে উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলাম "আমার জন্য তুমি ভাবিও না বেলা ! এমন ত কতবার আসিয়াছি গিয়াছি, আর বিপদ যদিই হয় তাহাতেই বা কি ক্ষতি ? তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয় ?"

বেলা উত্তেজিত ভাবে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "না, না, ও কথা বলিও না ! ঈশ্বর না করুন, আজ যদিই তোমার কিছু অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে আমার ইহকালের প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তখন আমি যে অবস্থায় যেখানেই থাকিনা কেন, আমার অন্তরাত্মা তোমায় নিশ্চয়, নিশ্চয় রক্ষা করিবে !"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনিল আর পারিল না, উদ্বেলিত অশ্রুজলে তাহার কম্পিত কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। রুমালে মুখ ঢাকিয়া সে তখন মূর্চ্ছাতুরের মত সোফার উপর ঢলিয়া পড়িল।

আমার সমস্ত হৃদয় অনুতাপের বেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল, হায় ! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয় বন্ধু অনিলকে আমি কেন এমন নির্ম্মম ভাবে, স্মৃতির ব্যথায় ব্যথিত করিলাম !

বন্ধুর লুণ্ঠিত মস্তক সযত্নে তুলিয়া আমি কাতর হৃদয়ে, ব্যাকুল স্বরে বলিলাম

"অনিল! অনিল! আমাকে ক্ষমা কর ভাই! আজ না বুঝিয়া তোমায় বড় আঘাত দিলাম।"

অনিল অবিলম্বে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "তুমি কি আঘাত দিবে ভাই? যে বেদনা, যে যাতনা আমি এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নীরবে সহিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় এ আঘাত যে কিছুই নহে। এখন শোন, আমার, আসল কথা এখনও বলা হয় নাই।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম "না ভাই! আর বলিয়া কাজ নাই, তুমি একটু স্থির হও, তোমার চেহারা বড় খারাপ দেখাইতেছে।"

"অস্থির আবার কখন দেখিলে?" ম্লান মুখে একটু হাসি আনিয়া অনিল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "তারপর শোন; সেইদিন, সেই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে আমার প্রেমপ্রতিমা বেলাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া আমি আবার সেই চির পরিচিত এঞ্জিনটিতে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

সে কালরাত্রি আবার যে কখন ও প্রভাত হইবে, বাড়ী ফিরিয়া আর যে আমার বেলাকে জীবিতাবস্থায় পাইব, সে আশা, সে ভরসা তখন মনে আর ছিল না।

কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধু এঞ্জিনটি আমার সে শোচনীয় দুরবস্থায় দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, সেই কালিমাময়ী তমিস্রা যামিনীর গাঢ় অভেদ্য অন্ধকার বাশি সবলে বিদীর্ণ করিয়া, নির্জ্জন পার্ব্বত্য ভূমির সুপ্ত, গভীর নিস্তব্ধতাকে জাগাইয়া তুলিয়া, রক্তচক্ষু রাক্ষসের মত বিদ্যুত বেগে, গম্ গম্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। দ্রুতগামী এঞ্জিনের ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্প হইতে সমুজ্জ্বল তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া, তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে পতিত হইয়া, ক্ষণপ্রভার মত ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল।

অতিরিক্ত দুর্ভাবনায়, আশঙ্কায়, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমার সহকারী জন আমার বড় বাধ্য ও অনুগত ছিল, সে বেচারা আমার দুর্দ্দশায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার কাজের ভার অধিকাংশই স্বয়ং গ্রহণ করিল। আমি ক্লান্ত দেহে, শ্রান্ত মনে, এঞ্জিনের একধারে জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরে, নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকারময় আকাশের পানে চাহিয়াছিলাম। বেলার বিদায়ক্ষণের সেই অশ্রুভাসিত কাতর করুণ মুখচ্ছবি, আমার ব্যথিত বেদনাতুর প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া আমাকে আকুল অধীর করিয়া তুলিতেছিল। বাহির হইতে, বর্ষার উতলা দম্‌কা বাতাস, টিপি টিপি বৃষ্টির শীতল

বারিকণা লইয়া আমার চিন্তাক্লিষ্ট উষ্ণ মস্তকের উপর বার বার আছড়াইয়া পড়িতেছিল। এখন সময় তখন কত রাত্রি হইবে, ঠিক মনে হইতেছে না, আমাদের ট্রেণ সোলন ষ্টেশন ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন দূরে যেখানে তমসাবৃত ঘনায়মান মেঘস্তূপের নীচে এঞ্জিনের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো গিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়াছে, সেইখানে আমি ওকি দেখিলাম! তাই ত! ওকি!

সেখানে পুঞ্জীকৃত গাঢ় মেঘরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি ছায়ামূর্ত্তি তাহার প্রসারিত বাহু যুগল আন্দোলিত করিয়া যেন কি ইঙ্গিত করিতেছে। মূর্ত্তিটি রমণীর। জগদীশ্বর! একি দেখাইলে? এই কি বেলার প্রেতাত্মা? বেলা, আমার জীবন সর্ব্বস্ব বেলা তবে কি আর জীবিত নাই? ওঃ! ভগবান্! তবে কি আমার সবই শেষ হইয়া গিয়াছে!

না, না, হয় ত আমার চক্ষের ভ্রম! দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া আমি আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই আলোকমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী অনৈসর্গিক রমণী মূর্ত্তি, সেই তা'র ছায়াময় হস্ত বিস্তার করিয়া আবার সেইরূপ ইঙ্গিত করিতেছে——যেন বলিতেছে "থাম! থাম! থাম!"

তখন বেলার সেই শপথের কথা চকিতের মত আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি তখন বিভ্রান্ত বিহ্বলচিত্তে জনের কাছে ছুটিয়া গেলাম, পাগলের মত বলিলাম "জন্! জন্, টেণ থামাও দোহাই তোমার! সম্মুখে বড়ই বিপদ!"

জন্ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া ছিল, সে বলিল "কি হইয়াছ মিঃ রায়? তুমি পাগল হইলে নাকি?"

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি বিবৃত করিয়া অধীর ভাবে বলিলাম "আর দেরি করিও না, এঞ্জিন ব্রেক কর জন্! শীঘ্র, শীঘ্র! বিলম্বে বিভ্রাট ঘটিবে।"

জন্ কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য করিল না, সে কহিল, "অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় আজ তোমার মাথা খারাপ হইয়া গেছে, নয় ত 'ডোজ্' কিছু বেশী করিয়া ফেলিয়াছ, মিঃ রায়। তাই এমন সব অদ্ভুত খেয়াল দেখিতেছ!"

আমি বড় হতাশ হইয়া শঙ্কিত ব্যাকুল চিত্তে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার সেই অত্যদ্ভুত, আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টি পথে পড়িল। সেই ছায়াময়ী রমণী মূর্ত্তি! এবার যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সে তার বাহু দুটি বারম্বার নাড়িয়া গাড়ী স্থগিত রাখিতে বলিতেছে।

"জন্! তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলেনা, এখন নিজে আসিয়া দেখ একবার!" আমি জনকে জোর করিয়া জানালার কাছে টানিয়া আনিলাম।

জন্ সেই ছায়ামূর্ত্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ত্রাসে আমার হাত ধরিয়া সে কম্পিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল "তাই ত! ও কার মূর্ত্তি, মিঃ রায়? স্ত্রীলোকের না? কে এ?"

আমার মাথা ঝন্ ঝন্ করিতেছিল, সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। আমি দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিলাম "এ আমার স্ত্রীর স্বর্গীয় আত্মা! নিশ্চয়ই তাই! সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আমাকে বিপদের মুখে রক্ষা করিবে, তাই এখন সতর্ক করিতে আসিয়াছে!"

আর বেলার কথা রাখিয়া পারি না, না জন্! জানিয়া শুনিয়া এতগুলি আরোহীর জীবন বিপন্ন করিব কেন?"

আমি ছুটিয়া এঞ্জিন ব্রেক্ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু জন্ আমাকে জড়াইয়া ধরিল, সে বড় বিপন্ন কাতরভাবে কহিল "রক্ষা কর, মিঃ রায়! গাড়ীতে যে সেক্রেটারী মহাশয় যাইতেছেন, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ কি? আজ তোমার অনুমান যদি মিথ্যা হয়, আমাদের তন্দ্রাতুর ভ্রান্ত চক্ষু যদি প্রতারিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তখন মিঃ রায়"—

জনের বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই ছায়ামূর্ত্তি আবার দেখা গেল। আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম সে মূর্ত্তিটি এবার বড় অধীর ভাবে সম্মুখে, আর অগ্রসর হইতে ক্রমাগত নিষেধ করিতেছে! প্রসারিত হস্ত সবেগে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, যেন মুহুর্মুহু বলিতেছে "থাম! থাম! থাম!"

কি সর্ব্বনাশ! আমি আর কোনও মতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না। জন্‌কে সবলে ঠেলিয়া দিয়া, ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া গিয়া এঞ্জিনের ষ্টিম্ ছাড়িয়া দিলাম, ব্রেক্ পড়িয়া গেল। ট্রেণ থামিতে না থামিতে আমি এঞ্জিন হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িলাম। জনও নামিল।

গভীর রাত্রিতে, বর্ষার দুর্য্যোগে, জনশূন্য পথিমধ্যে গাড়ী দাঁড়াইতে দেখিয়া গাড়ীর আরোহিবর্গের মধ্যে একটা কলরব পড়িয়া গেল। ট্রেণের ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ব্যাপার জানিবার জন্য লণ্ঠন হস্তে ছুটিয়া আসিলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম!

এখন যদি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করি তাহা হইলে এক্ষেত্রেও আমাকে মাতাল অথবা পাগল বলিতে হয়, কিন্তু না বলিলেও ত নিস্তার পাইব না। অগত্যা আমি বলিলাম, "সম্মুখে বড় বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছি, গাড়ী আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পথটা একবার দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিলেন। "মিথ্যা কথা! আমি বেশ জানি এ পথে অন্ততঃ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত কোথাও কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। এ সব উদ্ভট খেয়াল তোমাদের অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল মাত্র। এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে, পথের মধ্যে গাড়ী রাখিয়া অনর্থক সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ!"

সাহেব আমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং তন্মুহূর্ত্তে পুরাদমে ট্রেণ ছাড়িয়া শিমলায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ী পঁহুছাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু আমি তখন মরিয়া উঠিয়াছি, তাঁহার অযথা তিরস্কার ও তর্জ্জন বাক্যে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া আমি জনের সহিত সম্মুখের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবও অগত্যা দায়ে পড়িয়াই জনের হস্তে লণ্ঠন দিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন।

সেই পথে. ট্রেণ হইতে প্রায় একশত গজ দূরে, একটি বহুদিনের পুরাতন, অনতি গভীর খাল ছিল। খালে শীতকালে জল থাকিত না, কিন্তু এখন বর্ষার প্রাদুর্ভাবে খালের কূলে কূলে জল ছাপাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। স্রোতের টান ও ভয়ানক প্রবল ছিল। খালের উপর সেতু বাঁধিয়া রেলের লাইন বসান হইয়াছে। ইনস্পেক্টর সাহেব আলো লইয়া সেই পোল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আমরা ও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে আশঙ্কার কোনই কারণ পাওয়া গেল না।

ইন্‌স্পেক্টর তখন দ্বিগুণ ক্রোধে আমাদের গালি দিতে দিতে ফিরিলেন, বলিলেন "এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়, আমি কালই তোমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দুইজনকেই একসঙ্গে ডিস্‌মিশ্‌ করিয়া দিব।"

জন্‌ বেচারা তাঁহার কঠিন শাসনবাক্যে বড় কাতর হইয়া বড় করুণ নয়নে আমার দিকে চাহিল. কিন্তু আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, সাহেবের ভৎর্সনা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিও আমার সে সময় ছিল না।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদের সহিত আমি ফিরিবার উপক্রম করিলাম,—এমন সময় ও কি? ও কিসের শব্দ! আমরা চকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, খালের অন্ধকার গর্ত্তে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় সোঁ সোঁ ধ্বনি উঠিয়াছে।

পরক্ষণেই, চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, কোথা হইতে একটা উচ্ছ্বসিত, উদ্দাম প্রবাহ, একটা প্রকাণ্ডকায় মত্তহস্তীর মত সবেগে

আসিয়া সেতুর উপর মহাবলে আছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় মড়্ মড়্ শব্দে, ভীষণ রবে, সেতু খণ্ড খণ্ড হইয়া খালের গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

নিমেষের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ওঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! এখনই কি সর্ব্বনাশই হইতেছিল!

যুগপৎ হর্ষে, বিষাদে, রোমাঞ্চিত হইয়া, আমি সজল নেত্রে, যুক্ত করে, যাঁহার অসীম করুণায় আজ এই দুর্নিবার মৃত্যুর করাল কবল হইতে এতগুলি লোকের বিপন্ন জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি, সেই কল্যাণকারিণী দেবীকে কৃতজ্ঞ, ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে শত সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।"

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে অনিলের এই বিচিত্র বিষাদ কাহিনী শুনিতেছিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষু মাঝে মাঝে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। আহা! বেচারা অনিল! এই বয়সে সে কত কষ্টই না পাইয়াছে! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তারপর! তোমরা আবার ফিরিয়া আসিলে?"

অনিল একটি কাতর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "অবশ্য, তখন আর উপায় কি ছিল?

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, আমার প্রাণের প্রাণ বেলা, আমার গৃহসংসার শ্মশান করিয়া, কোন্ অজানা অদৃশ্য লোকে পলাইয়া গিয়াছে! তারপর, আমি যে আশ্চর্য্যরূপে অদ্ভুত উপায়ে শত শত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছি, তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও আমি প্রচুর পুরস্কার লাভ করিলাম।

কিন্তু হায়! যখন দাঁত পড়িয়া গেল, তখন আমার সম্মুখে রাশীকৃত মাংস আসিয়া উপস্থিত! দুদিন আগে, ইহার অর্দ্ধেক অর্থ পাইলেও বেলা আমায় এমন করিয়া নির্জ্জন গৃহে, একাকিনী অনাথার মত মরিত না!"

আমি সাগ্রহে কহিলাম, "আর সেই ছায়া মূর্ত্তি? সে রহস্য কিছু ভেদ করিতে পারিয়াছিলে কি?" অনিল বলিল "হাঁ, অনেক অনুসন্ধানের পর এঞ্জিনের আলোর ভিতর একটি 'বাদ্‌লা পোকা' দেখিতে পাইলাম"—

আমি সম্মুখে গ্লাস কেশের মধ্যস্থ বাদ্‌লা পোকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "ওই সেই বাদ্‌লা পোকা?—ওঃ! এতক্ষণে সমস্তই বুঝিলাম।"

অনিল সবিষাদে বিষন্ন ভগ্নস্বরে বলিল "হাঁ, ল্যাম্পের ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের ভিতর দিয়া এই বাদ্‌লা পোকার ছায়াই বৃহৎ আকারে, নারী মূর্ত্তিতে আমাদের চক্ষে পড়িয়াছিল, সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ, আমার মৃতা পত্নীর মুক্ত আত্মাই যে সেই ভয়ানক বিপদের মুখে আমায় রক্ষা করিতে গিয়াছিল, এ বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাহউক, এখন এই অর্দ্ধদগ্ধ বাদ্‌লা পোকাটিই আমার অসার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সেই ঘটনার পর আর চাকরী করিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না! কিন্তু যে অর্থের অভাবে আমার প্রাণাধিকা বেলার অন্তিম মুহূর্ত্তে, তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মরণযাতনাক্লিষ্ট, শুষ্ক অধরে একবিন্দু জলদান করিতে পারি নাই, যে মুখের শেষ কথাটি পর্য্যন্ত একবার শুনিতে পাই নাই, সেই অর্থের উপার্জ্জন-ব্রতেই আমার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলাম। সেই জন্যই আজ তুমি আমার এই ভাগ্যোন্নতি দেখিতে পাইতেছ।

তুমি আমার এই আশ্চর্য্য কাহিনী বিশ্বাস করিবে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু অতুল, আমি জানি, আমার স্নেহময়ী সাধ্বী সতী বেলা, মরণের পরও তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।"

আমি শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ণ সজল নয়নে সেই নির্জীব বাদ্‌লাপোকাটির পানে চাহিয়া রহিলাম; হায় প্রেম! ধন্য তোমার শক্তি! চির বিস্মৃতিময় মরণের পরপারে গিয়াও মানুষ তোমার মায়া কাটাইতে পারে না! তোমায় ভুলিতে পারে না!

সম্পূর্ণ।

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী।

উজানি গাঠে।*

(১)

কুমুদরঞ্জন!

তোমার জ্যোছনা রাশি অমরার সুধা হাসি
অমিয় কবিত্ব ধারা মধু প্রস্রবন—

* উজানির "পল্লীকবি" সোদর প্রতিম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত "উজানি" পাঠে লিখিত।

ভাসায়ে পল্লীর বুক,　　　হেরিতেও কত সুখ
　　প্লাবিত করিয়া দেহে' প্রান্তর কানন ;
ওগো পল্লীতীর্থযাত্রি !　　　যদিও এ দুখরাত্রি
　　রেখেছে ঘেরিয়া মোর পল্লীনিকেতন,
তবু এ দুখের পাছে　　　এই এক সুখ আছে—
　　তোমার শীতল শান্ত কর পরশন।
দিবার 'রবির' কর　　　"উজল প্রখরতর
　　পশে নাই পল্লীমাঝে, তমো আবরণ—
কি গাঢ় কুহেলিকায়　　　ছেয়ে রেখেছিল তায়
　　নিরাশায় পল্লীভূমি ছিল নিমগন !
আজি তুমি এলে কবি　　　করুনার হেমছবি
　　লয়ে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি অমরার ধন।
দূরে গেছে অন্ধকার　　　হৌক নিশি, তবু আর
　　নাহি দুঃখ, এ নিশির আছে প্রয়োজন।
"মঙ্গলার" পদে মোর　　　এ প্রার্থনা, যেন ভোর—
　　না হয় এ নিশি ; পল্লী অদৃষ্ট গগন—
করি চির সমুজ্জ্বল　　　নিষ্কলঙ্ক পূর্ণকল
　　থাকুক পল্লীর হৃদি কুমুদরঞ্জন !

(২)

কুমুদরঞ্জন !

যেই তুলি করে ধরি　　　"ফুল্লরা" চিত্রিত করি
　　অমর হইল বঙ্গে "শ্রীকবিকঙ্কন"
খুল্লনা শ্রীমন্ত কথা　　　আজো আঁকা যথাতথা
　　"চণ্ডীর মঙ্গল গাথা" হৃদি-রসায়ন।
"উজানি"—অজয়তীরে　　　সেই তুলি ল'য়ে কি রে
　　স্বর্ণ মরালীরে তোর করিলি অঙ্কন ?
বড় প্রাণ কাঁদে ভাই　　　শুধাইতে চাহি তাই
　　ফেরে নিকি চন্দ্রকান্ত হেরি বৃন্দাবন ?
দুইটি হাঁসের লাগি　　　সেই যে গেছে অভাগী—
　　"আদুরি," আজো কি তোর ফেরেনি এখন ?

আঁখি দুটি ছল ছল আজো কিরে ঢালে জল
"কাটা তরুমূলে" সেই বালক দুজন ?
হৃদয় "কুনুর" কোলে আজিও কি তোর জ্বলে—
সেই আলো—"জননীর উজল নয়ন" ?
কোথায় "চণ্ডালী" তোর কোথা "কাপালিক" ঘোর ?
আছে কি এখনও সেই মস্‌জেদ ভবন ?
শত নয়নের জল কলকলে কি বিকল
মাঝে যার নদী হ'য়ে রহিছে বেদন !
আমি পল্লীবাসী দীন এ অপরিশোধ্য ঋণ—
চিরদিন মনে মনে রহিবে স্মরণ।
স্মরিব এ উপকার দেখা ভাই একবার—
করি পল্লীজননীর স্বরূপ দর্শন।
দেরে সেই দিয়া আঁখি একবার মাকে দেখি—
সার্থক জনম—হৌক সফল জীবন।
বঙ্গে পল্লী আছে যত সবাই তোর উজানি ত'
তুই যে—সবার চিত্র কুমুদরঞ্জন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অনুতপ্ত।

(গল্প)

(১)

প্রথম যৌবনে অভিভাবক হীন অমরনাথ কুসংসর্গে পড়িয়া একদম্ বিগড়াইয়া গেল।

সে বাল্যকালেই পিতৃহীন। তাহার পিতা নিশানাথ রায় একজন আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন। অমন উদার, নির্ভীক, সরল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় মহানুভব ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। অমরের প্রকৃতিতে পিতার সদ্‌গুণরাজি অনেক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। একজন উন্নতচরিত্র, সৎপরামর্শ দাতা পাইলে সে

উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহার যত বন্ধু জুটিয়াছিল সকলেই পাপপথের পথিক্। তিলে তিলে তাহারা অমরকে পাপের পথে টানিয়া নিল। সরল অমর প্রথম প্রথম তাহা বুঝিতে পারিল না,—যখন বুঝিল—তখন সে পাপের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, আর ফেরা অসম্ভব।

বন্ধুদের নিয়ত সংসর্গ ও কূট যুক্তির প্রভাবে, অমরের মনে প্রথম প্রথম পাপ সম্বন্ধে যে সংস্কার ছিল, পাপের পথে চলিতে চলিতে সেই সংস্কার বদ্‌লাইয়া গেল। এখন তাহার মনে হইত "ইহাতে কি পাপ? আমি নিজের অর্থে একটু আমোদ প্রমোদ করি, ইহাতে ত অন্যের কোনও অনিষ্ঠ হয় না।"

বন্ধুবর্গ তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিত, "হাঁ, হাঁ—তাই ত! জীবন ক'দিনের? এই আজ বাঁচিয়া আছ, হয়ত কালই চক্ষু মুদিত করিবে। কাজেই যে ক'দিন বাঁচিয়া আছ—হরদম্ স্ফূর্ত্তি কর। আত্মাই নারায়ণ,—আত্মার তৃপ্তিতে নারায়ণ তৃপ্ত! কাজেই আত্মা যাহা চায়, তাহাই কর। ইহজীবনে আত্মার তৃপ্তি হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।—" ইত্যাদি।

কেহ কেহ নানা পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিল, "দেখ,—'Eat, drink and be merry'—অর্থাৎ 'কিনা খাও, দাও স্ফূর্ত্তি কর'—ইহাই সাহেবদের জীবনের motto। কেন, ইহাতে যদি পাপ থাকিবে তাহা হইলে এত বড় একটা জাতি কি পৃথিবীতে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিত? পাপের পতন অবশ্যম্ভাবী, তা' ত জানই। আর আমাদের কবিরাও ত বলেন—

'হেসে নাও দু'দিন বই ত নয়,—
কি জানি কার বা কখন সন্ধ্যা হয়।—"

(২)

অমরনাথের সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা জননী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তিনি পুত্রের এবম্বিধ অধঃপতনে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। অমরকে নানারূপ সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু তখন সে উপদেশের গণ্ডীর বাহিরে গিয়াছিল। অগত্যা পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলাদিগের পরামর্শানুক্রমে একটি টুক্‌টুকে সুন্দরী বৌ ঘরে আনিলেন। আশা, সুন্দরী বধূ যদি ছেলেকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। আশা কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইল। অমর সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রীর আকর্ষণে দিনের বেলা গৃহে থাকিত। কিন্তু রাত্রিবেলা কিছুতেই ঘরে তিষ্ঠিতে পারিত না। একটু অধিক রাত্রি হইলেই—তাহার চোখের সাম্‌নে একটা স্থানের চিত্র ভাসিয়া

উঠিত। কাণের কাছে একটা মন মাতান কণ্ঠধ্বনি, নূপুরের রিণি রিণি, বন্ধু-বর্গের জড়িত কণ্ঠের রহস্যালাপ ও তব্লার ঠুং ঠাং শব্দ জাগিয়া উঠিত। অমনি সে পাগল হইয়া উঠিত। দীর্ঘকালের কু-অভ্যাস কি সহজেই ছাড়া যায়?

পত্নী নির্ম্মলা কাঁদিত, মিনতি করিত, পায়ে পড়িয়া থাকিত,—কিন্তু অমরকে রাখিতে পারিত না। তখন তাহার মনের ভিতর তীব্র বেদনা ও অভিমান জাগিয়া উঠিত। অভাগিনী সারারাত্রি মাটিতে পড়িয়া শরবিদ্ধা হরিণীর মত ছটফট করিত।

(৩)

মানুষ নিদারুণ দুঃখ সহিয়াও একটা আশা লইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকে। আশাকে কুহকিনী বা মরীচিকা যে যাহাই বলুক না কেন, পারাপারশূন্য সংসার সাগরে মজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে আশাই একমাত্র অবলম্বন। যতদিন এই অবলম্বন থাকে, ততদিনই মানুষ জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এই অবলম্বন হারাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না।

বহুদিন নির্ম্মলা, স্বামীর মতিগতি ফিরিবে, তার ঘৃণাহীন, বিরাগবিহীন একান্ত প্রেমের আকর্ষণে, তিনি পাপপথ ত্যাগ করিবেন—এই আশা বুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষে আর পারিল না। সংসারের উপর, পৃথিবীর উপর, নিজের জীবনের উপর তার দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিল। অবিরত তার মনে হইতে লাগিল, কেন আর বৃথা এ জীবন ভার সে বহিতেছে। নারী জীবনের কি লক্ষ্য আর তার আছে? হায়, একান্ত পতিপ্রাণা অভাগী জানিত না, পতির স্নেহে বঞ্চিতা হইলেও বহু এমন কর্ম্মের লক্ষ্য থাকিতে পারে, যাহার অবলম্বনে নারী-জীবনও সার্থকতার গৌরবে ধন্য হয়। এরূপ শিক্ষা সে পায় নাই, এরূপ উপদেশ দিবারও কেহ তাহার ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নির্ম্মলা নদীর ঘাটে একাকিনী গা ধুইতে গিয়াছিল। তাহাদের গৃহের পশ্চাতেই নদী। তখনও ছোট নদীটির ঐ পারে সারিবাঁধা বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কনক তপন ডুবিয়া যায় নাই। অস্তাচলচূড়াবলম্বী স্বর্ণরবির কনক কিরণে নভোপট রক্তাভ, নিম্নে কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর বুকে সুবর্ণতরঙ্গ নাচিতেছিল। এই পারে একটা তমাল বৃক্ষের ডালে বসিয়া দুটা কপোত কপোতী প্রেমালাপ করিতেছিল। কপোত কপোতী একে অন্যের গায় সোহাগভরে ঢলিয়া পড়িতেছে, চঞ্চুদ্বারা একে অন্যের চঞ্চুতে চুম্বন করিতেছে,—আবার পুলকের আতিশয্যে 'বাকুম, বাকুম' করিয়া উঠিতেছে। নির্ম্মলা গাত্রমার্জ্জনা

ফেলিয়া একমনে কপোতকপোতীর প্রেম সম্ভাষণ দেখিতে লাগিল। হায়! নিকৃষ্ট পশু পক্ষীর ভিতরও এমন মধুর দাম্পত্য প্রেম! ঐ ত কপোতী—স্বামী-সোহাগিনী কপোতী, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কেমন 'বাকুম্ বাকুম্' করিয়া উঠিতেছে! আর সে?—হায়! তার মত হতভাগিনী আর কে আছে?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নির্ম্মলা তীরে উঠিল! তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে নদীর সিকতাময় পুলিনে বসিল। তখন তাহার হৃদয়ে দুঃখের প্রলয় ঝড় বহিতেছিল। বড় বড় অশ্রুফোটা গড়াইয়া গড়াইয়া বালুকারাশির উপর পড়িতে লাগিল। একাকিনী নদীপুলিনে বসিয়া বহুক্ষণ সে কাঁদিল, তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। হায়! পৃথিবীতে প্রেমের কি একটুকুও প্রতিদান নাই? একাগ্রতার, স্বামীভক্তির কি এতটুকুও পুরস্কার নাই?

অভাগিনী বহুক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে যখন অশ্রুজল ফুরাইয়া গেল তখন তাহার মনে অন্য একটি কল্পনা জাগিল,—"কেন আমি তুষানলে দগ্ধ হইয়া মরিতেছি? ভগবান এ জন্মে আমার কপালে সুখ লিখেন নাই। এপারে যে সুখ পাইলাম না, দেখি ওপারে আমার জন্য সে সুখ সঞ্চিত আছে কি না। ভগবান্ এত নিষ্ঠুর ন'ন। তিনি এপারে আমাকে কাঁদাইলেন, ওপারে কাঁদাইবেন না।"—নির্ম্মলার বদনমণ্ডলে অস্বাভাবিক উল্লাসরেখা প্রকটিত হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া উদাস নয়নে একবার রক্তরঞ্জিত পশ্চিম-আকাশের দিকে তাকাইল, তারপর ধীরপাদবিক্ষেপে গৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

(৪)

সেদিনও রাত্রিতে অমর বাহিরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা কিছু বলিল না, একবার স্থির শান্ত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল,—যুক্ত করে পশ্চাৎ হইতে নমস্কার করিল। চক্ষে তখন একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। নির্ম্মলা একটি নিশ্বাস ছাড়িল! তারপর ধীরে ধীরে অঞ্চল প্রান্তে অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া—বড় কঠোর প্রয়াসে হৃদয়ের আবেগ দমন করিয়া স্থির প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

রাত্রিতে কাছে বসিয়া নির্ম্মলা শাশুড়ীকে জল খাওয়াইল। শাশুড়ী শুইতে যাইবেন;—নির্ম্মলা প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। প্রণাম নির্ম্মলা প্রত্যহই করিত, কিন্তু এরূপ আশীর্ব্বাদ কখনও প্রার্থনা করে নাই। শাশুড়ী চমকিয়া নির্ম্মলার দিকে চাহিলেন। ঈষৎ অশ্রুসিক্ত নয়নে তার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর একটী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া শুইতে গেলেন। নির্ম্মলা দুই হাতে অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঢাকিয়া শয়ন-গৃহে গেল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। কিছুকাল বসিয়া ভাবিল আর কাঁদিল। তারপর সংকল্প স্থির করিয়া দৃঢ়চিত্তে ধীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্‌মারী খুলিয়া টক্‌টকে লালপেড়ে একখানা পরিষ্কার সাড়ী বাহির করিয়া পরিল। সীমন্ত সিন্দুর রঞ্জিত করিল, ওষ্ঠদ্বয় তাম্বূল রসসিক্ত করিল। তৎপর বাক্স হইতে স্বামীর ফটো বাহির করিয়া তৎসম্মুখে নতজানু হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুমোচন করিল। স্বামীর ফটোপূজা শেষ হইলে একবার ঊর্দ্ধে তাকাইয়া সে বলিল, "প্রভো! অন্তর্য্যামিন্‌! অল্পবুদ্ধি অবলা আমি, আজ যা করিতেছি, না করিয়া আর পারি না—ক্ষমা করিও। শুনিয়াছি, তোমার ইচ্ছায় সব হয়। অভাগীর অদৃষ্ট কি তোমারই ইচ্ছা ঠাকুর? যদি তা হয়, আজ যা করিতেছি, তাও বুঝি তোমারই ইচ্ছা! ঠাকুর! ঠাকুর! আমায় পায়ে স্থান দিও। ওঁকে সুমতি দিও! সুখী করিও! আমার এ নিয়তির জন্য অপরাধী তাঁকে করিও না! আবার যদি জন্ম হয়, তাঁকেই যেন পাই—পাইয়া যেন সুখী হই।"

প্রার্থনা অন্তে নির্ম্মলা কাপড়ের আল্‌না হইতে স্বামীর একটা কাপড় বাছিয়া লইল। কাপড়টা পাকাইয়া, কক্ষস্থিত টুল ও টেবিলের সাহায্যে কক্ষের ছাদের নীচে একটা কড়ার সহিত বাঁধিল এবং টুলের উপর দাঁড়াইয়া কাপড় গলায় জড়াইয়া ফেলিল। এই কাপড়ের স্পর্শে তাহার সমস্ত দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এই কাপড় তাহার স্বামীর দেহ স্পর্শ করিয়াছে, কাপড়ে তাহার স্বামীর দেহের গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। আহা! অন্তিম সময়ে স্বামীর দেহের আঘ্রাণ লইতে পারিবে। কি সুখ, কি আনন্দ! নির্ম্মলা বহুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া সেই আঘ্রাণ, সেই স্পর্শসুখ অনুভব করিল। মনের ভিতর আবার একটু মধুর স্মৃতি, বড় একটু মধুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। চক্ষু হইতে দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর বাঁধন,—স্বামীগৃহের আকর্ষণ কি সহজেই ছেঁড়া যায়? নির্ম্মলা দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল; তারপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখের একটু লাঘব হইলে পর সহসা তাহার মনে হইল—"আমি এ কি করিতেছি? শুনিয়াছি আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মঘাতিনীর নরকেও স্থান নাই। তাহা হইলে, এ জন্মে তাঁহাকে পাইলাম না, আরজন্মেও ত পাইব না। আর, যাই কেন ভাবি না, আমার এ পাপের অমঙ্গল ত তাঁহাকেও স্পর্শিবে।

না না। আমি মরিব না। তিনি ত্যাগ করুন, তার গৃহে থাকিয়া, তার সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। তিনি ত একেবারে অভাগীর প্রতি স্নেহহীন নন,—তবে——"

সহসা দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কে ডাকিল "নির্ম্মলা, নির্ম্মলা!" নির্ম্মলা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—তাহার স্বামীর কণ্ঠস্বর। মুহূর্ত্তের জন্য সে আত্ম-বিস্মৃত হইল। পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য টুল হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সে গোঁ গোঁ করিতে লাগিল,—কাপড়ের ফাঁস যে গলায় আট্‌কান ছিল, অভাগিনীর তাহা স্মরণ ছিল না!

(৫)

অমরের সেদিন আর প্রমোদগৃহের নৃত্যগীতাদি, বন্ধুদের রঙ্গরহস্য কিছুই তেমন ভাল লাগিতেছিল না। মনটা কেমন হুহু করিতেছিল। নির্ম্মলার কথা কেবলই মনে হইতেছিল। কতক্ষণ পরে সে আর থাকিতে পারিল না,—ফিরিয়া আসিল। কে জানে সূক্ষ্ম প্রাণ জগতের মধ্য দিয়া নির্ম্মলার প্রাণের বেদনার কোন্ তরঙ্গ তার প্রাণে গিয়া আঘাত করিতেছিল, সমস্ত প্রমোদলালসা তার ভাঙ্গিয়া দিতেছিল!

অমর পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল। কিন্তু দ্বার খোলে না কেন? আজ কি নির্ম্মলার এত বড়ই অভিমান হইল? কৈ, সে ত কখনও এমন অভিমান করে না! আজ এ কি হইল! অমরের প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিল। আজ তার প্রথম কেমন মনে হইল, নির্ম্মলার প্রতি সে নিতান্ত পশুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। ছি! আর সে বাহিরে যাইবে না। গৃহেই নির্ম্মলাকে লইয়া সুখে থাকিবে। বাহিরের সেই প্রমোদ লালসা আজ প্রথম তার বড় ঘৃণ্য, বিশ্রী ন্যক্কারজনক বলিয়া মনে হইল।

অমর স্নেহসিক্তস্বরে ডাকিল,—"নির্ম্মলা! মালা! দুয়ার খোল;—আমি আসিয়াছি।" ভিতর হইতে কেমন একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ হইল। অমর কাণ পাতিয়া শুনিল। আবার আবার সেই কাতর ধ্বনি, যেন কে কি বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু দম আট্‌কাইয়া যাওয়াতে বলিতে পারিতেছে না। অমরের প্রাণে একটা দারুণ ভয় জাগিয়া উঠিল। সে সবল পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং যাহা দেখিল তাহাতে তাহার দেহের সমস্ত শোণিত বরফের মতই জমাট হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তেকের জন্য নিজকে সাম্‌লাইয়া অমর একলাফে টুলের উপর উঠিয়া দুইহাতে নির্ম্মলাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিল এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। অমরের মাতা ও অন্যান্য পরিজন সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। বাঁধন খুলিয়া নির্ম্মলাকে নামান হইল। তখন দেহে আর প্রাণ ছিল না। অমর একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

* * * * *

যখন ভোরের পাণ্ডুররেখা বিধবার বিবর্ণমুখের ম্লান হাসির মত পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিল, তখন অমরের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। অমর ডাকিল, "নির্ম্মলা!" মাতার আকুল রোদনধ্বনি অমরের কাণে প্রবেশ করিল! অমর চমকিয়া চারিদিকে চাহিল, গৃহ রোদন মুখরিত, শয্যায় সে একা শায়িত। কে শিয়রে বসিয়া তার মাথায় বাতাস করিতেছিল। হায়, সে ত নির্ম্মলা নয়? ওঃ! নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! কোথায় এখন তুমি? আবার বিকট চিৎকার করিয়া অমর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

(৬)

পরদিন গভীর রাত্রিতে অমর একা তার ঘরে বসিয়া আছে। সেই গৃহ, সেই সাজসরঞ্জাম,—সেই টেবিল তাহার উপর তাহারই হাতের কার্পেটে বুনান ঢাকনী, ফুলদানি, কাগজে কাটা ফুল, ফুলতোলা রুমাল, দেওয়ালে মখমলের উপর জরির লতা ছবি, নানাবিধ অঙ্কিত মূর্ত্তি,—সুসজ্জিত পুস্তকের আল্‌মারী, কাপড়ের আল্‌না—সকলই তাহার নিপুণতা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতেছে। হায়! সবই তেম্নিভাবে রহিয়াছে,—কেবল সে নাই—সে নাই। সে কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে? আর আসিবে না? নিশ্চয় আসিবে। তাকে ছাড়িয়া সে যে কোথাও থাকিতে পারে না! অমর উঠিয়া গৃহের ভিতর পদচারণা করিতে লাগিল।

"সে কি এমনই নিষ্ঠুর, এমনই পাষাণ? সে কি আমার হৃদয় বুঝিবে না? আমার হৃদয় ত এখন সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমি আর আগেকার মত পশু নই,—আজ আমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ওগো! তুমি ত এখন দিব্যধামে; সেখান হইতে ত সবই দেখা যায়, বোঝা যায়,—তুমি সকলই দেখিতেছ, বুঝিতেছ! একটিবারের জন্য ফিরিয়া এস,—কেবল এইটুকু আমার কাছে আসিয়া বুঝিয়া যাও—এখন আমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—আমি তোমায় আদর করিতে শিখিয়াছি।" অমর মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কতক্ষণ গেল। অমর উঠিয়া বসিল। চুপ করিয়া কি ভাবিয়া তারপর ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে গেল। সেখানে পত্নীর চিতাভস্মের নিকট বসিয়া বহুক্ষণ অশ্রুমোচন করিল। তখন অমাবস্যার জমাট অন্ধকার সমস্ত শ্মশান ছাইয়া ফেলিয়াছিল। চতুর্দ্দিকের গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা শবের চুল্লী জ্বলিয়া প্রেতের হাস্যচ্ছটার ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। বিস্তৃত সৈকতভূমি—নীরব নিস্তব্ধ,—কেবল মাঝে মাঝে নরমাংসভোজী শিবা ও কুকুরগুলি বিকট আনন্দকলরব করিয়া উঠিতেছিল।

অমর আপন মনে পাগলের মত বলিতে লাগিল, "এই চিতাগ্নি অপেক্ষাও হৃদয়ের অনুতাপাগ্নি কত বেশী ভয়ঙ্কর! ইহা তিল তিল করিয়া হৃদয়কে পোড়াইয়া শ্মশানে পরিণত করে। তবু মানুষ সময় থাকিতে বোঝে না।.........ওগো সতি! এখানে তোমার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, দেহভস্ম পড়িয়া আছে, তোমার ওই দেহাবশেষে কি আমার দেহে মিলাইয়া দিবে না। দেও—দেও! সে মিলনের আনন্দ আমাকে দেও! এই দারুণ জ্বালা নিভাইয়া দেও!" বলিতে বলিতে অমর সেই চিতাভস্মের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল কতক্ষণ পরে উঠিয়া পরে আবার উঠিল! উঠিয়া উর্দ্ধমুখে পাগলের মত কহিল, "এস—এস! তুমি আজ এস, একবার দেখা দাও। ওগো মুক্ত জীব, ওগো অমরাব প্রাণী!—এস, দেখ, আজ আমি দেওয়ানা সাজিয়াছি, তোমার জন্য দেওয়ানা সাজিয়াছি।" ইহা বলিয়া আরও চিতাভস্ম গায়ে মাখিতে মাখিতে সে বিকটস্বরে গান ধরিল—

"মেরা দিল্ ত দেওয়ানা জান্ তেরে লিয়ে!"

* * * * *

তারপর বহুদিন স্থানীয় লোকেরা ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত শুনিত—গভীর নিশীথে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজন শ্মশানে কে গাহিতেছে——

"মেরা দিল্ ত দেওয়ানা জান্ তেরে লিয়ে!"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

বীণা।

আয় বীণা, বাছনি আমার!
আয় মাগো আয় বুকে, কেন দূরে ম্লান মুখে
দাঁড়ায়ে আছিস্ তুই? সহে নাত আর!
তুই মোর প্রাণ জোড়া ধন,

জীবনের সুখের স্বপন—
ভেঙ্গে চূড়ে সব আজ, কে মাগো হানিল বাজ,
সুকুমার কলি হায়, ধূলিতে লুটায় !
বুঝি নারে কোন্ জন, এমন পাষাণ মন,
চাঁদিমার চারু হাসি ঢাকে বাদলায় !
ওরে বীণা, বাছনি আমার !
আয় মাগো, আয় বুকে, কেন দূরে ম্লান-মুখে
দাঁড়ায়ে আছিস্ তুই ?—সহে নাত আর !

২

কারে কব, যাদুরে আমার !
না ফুরাতে দু'টি মাস, একি হ'ল সর্ব্বনাশ !
মাধবী আসার আগে দাহ সবিতার !
একা তুই, খেলিবার তরে
সাথী তোর এনেছিনু ঘরে,—
করেছিনু "গৌরীদান" এ শূন্য হৃদয় খান
মা, তোদের কলরবে জুড়াবে বলে !
ঊষার কপোলে মম, দিয়েছিনু নিরুপম,
বাল-অরুণের টীপ কত কুতূহলে !
কারে কব, যাদুরে আমার !
কত স্নেহে বুকে টানি লাজে নত মুখখানি
চুমেছিনু বার বার রোধি' আঁখি-ধার !

৩

আজ একি মরীচিকা সব !
হা বাছা ! নয়ন-মণি ! পিতা আমি তোর শনি !
খেলা-ছলে কেড়ে নিনু মায়ের বৈভব !
আজ আমি কোন্ প্রাণে হায়,
আমার এ দুধের বাছায়,
সন্ন্যাসিনী সাজাইব, শ্বেত-বাস পরাইব,
সিঁথির সিঁদুর মুছি' কাড়ি' আভরণ।
হায়রে সাধের বীণা, তুই ত নহিস্ দীনা,
বিশ্বের সুষমা তোর বন্দিছে চরণ।
আজ একি মরীচিকা সব।
হা বাছা ! নয়ন-মণি। পিতা আমি তোর শনি।
খেলা-ছলে কেড়ে নিনু মায়ের বৈভব।
ওরে বীণা। বাছনি আমার।
আয় যাদু, বুকে আয়, এ বুক যে ফেটে যায়।
মা আমার, মাতৃহীনা। কাঁদিস নে আর।

সে যে সতী সরল বিশ্বাসে
গিয়েছিল স'পি' মোর পাশে,—
তার শেষ-উপহার,　　মাগো তুই, মা আমার।
আটটি বরষ ধ'রি' বুকের শোনিতে,
পালিয়াছি আমি তোরে. শেষে কি মা, মোহ-ঘোরে
বুকের শোণিত তোর এমনি শুষিতে৷
ওরে বীণা, বাছনি আমার।
আয় যাদু, বুকে আয়। এ বুক যে ফেটে যায়।
কাঁদিস্ নে অভাগিনি! কাঁদিস্ নে আর।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

সংসার ও সন্ন্যাস।

(বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ রীড্ প্রণীত 'ক্লইষ্টার এণ্ড দি হার্থ' নামক ইংরেজি উপন্যাস হইতে অনূদিত।)

নবম পরিচ্ছেদ।

সেদিন নানা ঘটনায় গেরাডের বিলম্ব হইয়া গেল। কাজেই সে বিদায় লইয়া দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। সহরের নিকটে পৌঁছিয়া দূরে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে একটি বৃক্ষতলে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হইল। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই সে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া যখন দেখিল, তাহারই পিতামাতা দাঁড়াইয়া, তখন অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! এত রাত্রিতে ইঁহারা এখানে কেন? তবে কি তাহারই উদ্দেশে ইঁহারা এখানে অপেক্ষা করিতেছেন?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিল। উভয়েই নীরব, মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ। সে তখন কোনও প্রকারে ইঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

পিতা বলিলেন, "কারণ আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমিই জান।"

মাতা কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "গেরাড! বাপ আমার!"

গেরাডের হৃদয় দমিয়া গেল, সে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ'লিস্ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "যাক্! নীচুমুখে চুপ করিয়া থাকিবার কারণ কিছু নাই। একখানি গোলাপী মুখ ও দুইটি নীল চোখের মোহে তোমার মত বয়সে অনেক নির্ব্বোধই ইতিপূর্ব্বে অনেক রকম ভুল করিয়াছে, তুমি এ বিষয়ে প্রথম নও।"

কেথেরিণ্ কহিলেন, "না না, আমার বাছাকে তারা যাদু করিয়াছে, পিটার যে যাদুকর তা সকলেই জানে।"

এলিস্ কঠোর স্বরে কহিলেন, "শোন ব্রহ্মচারীঠাকুর! তুমি ত জান, স্ত্রী-লোকের সহিত তোমার মিশিতে নাই। অতএব এখন ভাল ছেলেটির মত শপথ কর আর কখনও সেভেনবাগে যাইবে না, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়! তোমার এই প্রথম অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম, এজন্য কোনও তিরস্কারও করিব না।"

গেরাড নতমুখে ধীর স্বরে উত্তর করিল, "আমি যে শপথ করিতে পারিব না।"

"বটে! ভণ্ড বকধার্ম্মিক! তুমি এ শপথ করিবে না?"

গেরাড উত্তর করিল, "আমি ভণ্ডামী করিতে চাহি না। আপনি বিরক্ত হইবেন, এই ভয়ে এ কথা এতদিন বলিতে সাহস হয় নাই। আজ এ সংবাদ যিনি আপনাদিগকে দিয়াছেন, তিনি যে-ই হউন আমার বন্ধুর কাজই করিয়াছেন। আমার বুকের একটা বোঝা আজ নামিয়া গেল। আর আমাকে ব্রহ্মচারী বলিবেন না,—আমি ব্রহ্মচারী হইতে পারিব না,—তার চে'য়ে মৃত্যুও আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। আমি মার্গারেটকে ভালবাসি।"

"বটে! এতদূর! হুঁ—তা—বেশ এখন বাড়ী চল। পিতার আদেশ অমান্য করিও না—তাঁর পরিণাম শুভ হইবে না।"

গেরাড কোনও প্রত্যুত্তর করিল না। তিন জনে নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই সময় হইতে ক্ষুদ্র বণিক পরিবারের সুখ শান্তি সকলই অন্তর্হিত হইল। পরদিন সকলের সাক্ষাতেই গেরাডের কথা পুনরায় উঠিল! সকলেই গেরাডের বিরুদ্ধে নানারূপ তিরস্কার ও অনুযোগ করিতে লাগিল। কেবল ভগ্নী কিটি নীরব—সে কিছু বলিল না,—আর বামন গাইল্‌ও তাহার দেখাদেখি নীরবে থাকিল। সে বেচারী সকল বিষয়েই—বুঝিয়া হউক না বুঝিয়া হউক—দিদি যাহা করিত তাহারই অনুকরণ করিত। সব চেয়ে—পিতার অপেক্ষাও বেশী—রাগ হইল কর্নেলিস ও সিবরণের। চতুর্দ্দিকের নানারূপ ভর্ৎসনা ও

গ্লানিতে গেরাড অস্থির হইয়া উঠিল,—মধ্যে মধ্যে উৎসুক নেত্রে এক একবার ভগ্নী কিটির দিকে চাহিত। কিন্তু সে দিকেও মার্জ্জনার কোনও চিহ্ন দেখিত পাইত না। গেরাড চাহিতেই কিটি অন্যদিকে মুখ ফিরাইত। অবশেষে কিটিও একদিন বলিল, "ঈশ্বর করুন তোমার এ ভুল যেন সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়!"

গেরাড নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিল, "কিটি! তুমিও আমার বিপক্ষে?"

গেরাড উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং ভাবিতে ভাবিতে সেভেনবাগে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মার্গারেটকে বাড়ীর কথা কিছুই বলিল না। অল্পক্ষণ পরেই গেবাড আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু বিরোধের কোনও মীমাংসা হইল না। মত ও স্বার্থের বিরোধ লইয়া যখন আপনার জনের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, প্রথম প্রথম তাহা সামান্য আকারেই থাকে এবং উভয় পক্ষই হয়ত ন্যায় পথেই চলেন। এই সময়ে যদি কোনও ধীর সুবিবেচক সুহৃদ্ মধ্যে পড়িয়া বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন, সহজেই গোল মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইয়া ব্যাপার যদি ক্রমশঃ অনেকদূর গড়াইয়া পড়ে, তবে মানুষের চরিত্রই এইরূপ যে ক্রমেই উভয় পক্ষের জিদ ও আক্রোশ বাড়িতে থাকে,—কোনও পক্ষেরই আর উচিত অনুচিত বিবেচনার শক্তি থাকে না। তারপর অপরিহার্য্য পরিণাম যাহা তাহাই হয়—প্রত্যেকেই নিজ নিজ জিদ রক্ষার জন্য গুরুতর ভুল করিয়া বসেন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গেরাডের বিরুদ্ধ পক্ষ বিশেষ প্রবল—পরিবারস্থ সকলেই তাহার বিপক্ষে—পিতা এলিস্ পুত্রের অবাধ্যতাচরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ, ভ্রাতা কনেলিস্ ও সিবরণ ঈর্ষাবশে ও স্বার্থহানির আশঙ্কায় নিতান্ত রুষ্ট। গেরাড শিক্ষিত ও মার্জ্জিত চরিত্রের অধিকারী। সে এ সকলই বুঝিত,—কাজেই তাহার রাগ হইল না। কিন্তু কি যে কর্ত্তব্য, তাহাও স্থির করিতে পারিল না। গেরাড একাকী ও অসহায়, এমন বন্ধু কেহ নাই যাহার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিতে পারে। মার্গারেটের নিকট এ কথা উত্থাপন করিতেও তাহার সাহস হইল না। কারণ, মার্গারেটের চরিত্রের দৃঢ়তার বিষয় সে ভাল করিয়াই জানিত। তাহাকে ভাল বাসিয়া গেরাড পিতা মাতার বিরাগভাজন হইয়াছে শুনিলে মার্গারেট হয়ত বলিবে—তাহার চির জীবনের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে হইলেও হয়ত বলিবে—কেন আমার জন্য তুমি আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ

করিবে? তুমি তাহাদিগের কথা শুনিয়াই চল—আমার সহিত আর দেখা করিও না। আর একজন—যিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন—সেই ভানিক ঠাকুরাণীর কাছেই বা গেরাড কোন মুখে এ কথা বলিবে? তিনি নিজে শিল্প-সাধনার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া যৌবনে কত জনের প্রেমের প্রার্থনা প্রত্যাখান করিয়া চিরকুমারীই রহিয়াছেন। গেরাড কাহারও সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতেও পারিল না,—অথচ নিজেও কোনও মীমাংসা করিতে পারিল না। চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইয়া দিন দিন গেরাড বিষণ্ণ ও ক্ষীণ হইতে লাগিল।

সময়ে সময়ে গেরাড নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িত। কিন্তু বিপক্ষদলের মধ্যে একজনের আচরণে কখনও কখনও আবার হৃদয়ে বল হইত। মাতা কেথেরিণ অশিক্ষিত প্রাচীন ধরণের স্ত্রীলোক। তিনি কন্যার মত স্থির বুদ্ধিতে, নির্দ্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য ধরিয়া কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। সময় সময় গেরাডকে খুবই তিরস্কার করিতেন, তাহাতে গেরাডের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইত। আবার সময় সময় তিনি স্বপক্ষীয়দিগের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতেন, তাহাতেও গেরাডের সাহায্য হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক দিনের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকলেই একদিন বসিয়া আছে, কর্নেলিস্ নিতান্ত বিদ্রূপের স্বরে বলিতে লাগিল, "বারে, বাঃ! গেরাড বিবাহ করিবে মার্গারেট ব্রাণকে—দুই ভিখারীতে মিলিবে ভাল। এক জনের এক টুকরা রুটি জোটে না—আর একজনের আবার একটু জলের সংস্থানও নাই। বেশ রাজযোটক বটে! যেন ক্ষুধার সহিত তৃষ্ণার মিলন।"

এই বিদ্রূপ কেথেরিণের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। তিনি বড় রাগ করিয়া বলিলেন, "আর তুমি কি? তুমি বিবাহ করিলে কি রকম হইবে বল ত?' গেরাড তবু চিত্র করিতে জানে, পুঁথি লিখিতে জানে। এ সকল গুণে কিছু রোজগার করিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইতে পারিবে। কিন্তু তোমার কোন্ গুণটা আছে বল দেখি? তোমার প্রত্যাশা ত বুড়া বাপ কবে মরিবে, আর তার পুঁজিপাটা লইয়া তুমি বাবুগিরি করিবে—এই ত? তোমার আর সিবরণের যে বেচারীর উপর এত রাগ কেন তা আর আমার বুঝিতে বাকী নাই। তোমাদের ত ভয় পাছে গেরাড বিবাহ করিয়া আমাদের স্কন্ধে আরও বোঝা চাপায় এবং তোমাদের ভাগ কমিয়া যায়—নয়? যদি তাই হয়—আমরা যদি তাঁর খরচই যোগাই—তাতে তোমাদের কি? তোমাদের রোজগারের

ভাগ ত আর তাকে দিতেছি না? আর তোমরা যে একটি পয়সা রোজগার করিবে, তাঁর লক্ষণও ত কিছু দেখি না।"

এইরূপ ঘটনা হইলেই গেরাডের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত,—তাহার হৃদয়ের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইত এবং কেথেরিণের স্বপক্ষীয়েরা অন্তর্ব্বিরোধে দুর্ব্বল হইয়া পড়িত।

ক্রমে ক্রমে এই ভাবে ছয়টি মাস অতিবাহিত হইল,—তখন একদিন সঙ্কট বনাইয়া আসিল। বণিক এলিস্ সকলের সাক্ষাতে গেরাডকে জানাইলেন—তিনি নগরপালের নিকট অভিযোগ করিয়া আসিয়াছেন গেরাড মার্গারেটকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে অচিরেই কারারুদ্ধ হইবে। পিতা উপসংহারে বলিলেন, "অতএব ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, ব্রহ্মচারী তোমাকে হইতেই হইবে।"

গেরাড এই সংবাদে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আপনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? তবে তোমরা সকলেই শোন—আমিও ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, মার্গারেট জীবিত থাকিতে আমি কখনই ব্রহ্মচারী হইব না। যখন স্নেহ ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আপনি বলপ্রকাশ করিতেই উদ্যত হইয়াছেন, তাই হউক। কিন্তু বলপ্রয়োগে আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। যেদিন নগরপালের লোক আমাকে ধরিতে আসিবে, সে দিনই আমি এই সহর পরিত্যাগ করিব এবং এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য বিদেশবাসী হইব। পিতৃগৃহের জন্য আর মমতা করিব না। যেখানে আমার সুখ শান্তির দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, সকলেই আমাদ্বারা নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য উদ্‌গ্রীব—সে গৃহের সহিত আর আমি কোনও সম্বন্ধ রাখিব না।"

গেরাড এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে বাহিরে চলিয়া গেল। কেথেরিণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বয়সের ছেলেকে অত কড়াশাসন করিতে গেলে ফল এই রূপই হয়। নিজের সন্তানের প্রতি মানুষ যে বাঘের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। দোহাই ঈশ্বর। বিবাহ করুক আর নাই করুক, গেরাড যেন আমার বিদেশী হয় না।"

গেরাড যখন বাড়ীর বাহিরে আসিল তখন তাহার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে তাহার মুখ বিবর্ণ। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ভানিক ঠাকুরাণীর পরিচারিকা রিকি হেইনের সহিত তাহার দেখা হইল। সে তাহারই সন্ধানে আসিতেছিল। নীরবে গেরাড তাহার সহিত ভানিক ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া উপস্থিত

হইল। ঠাকুরাণী গেরাডকে দেখিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের সহিত তিনি বলিলেন, "আমার একটা ভুল বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমাকে স্নেহ কর।"

গেরাড হতবুদ্ধি হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রিকি গেরাডের অবস্থা দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া বলিল, "তা বাবু, তুমি একজনকে ভাল বাসিয়াছ—সহরশুদ্ধ সকলেই জানে,—আর এ কথাটা একবার ঠাকুরাণীকে বলিতে নাই?" ভানিক ঠাকুরাণী ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ কর, রিকি! আমরা ত আর কেউ নাই! পরের ছেলে আমাদিগকে আর সে কথা কেন বলিতে আসিবে?"

গেরাড বলিল, "সে কি কথা? আপনি যে আমার ধর্ম্মের মা! আমি নির্ব্বোধের ন্যায় যাহা করিয়া বসিয়াছি, আপনাকে তাহা বলিতে সাহস পাই নাই।"

ভানিক ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "নির্ব্বোধের কাজটা কি করিয়াছ? ভালবাসা কি নির্ব্বোধের কাজ?"

"সকলেই ত তাই বলিতেছে!"

রিকি এই সময়ে বলিল, "তা ঠাকুরাণীকে আপনি বলিলেন না কেন? ঠাকুরাণী প্রকৃত প্রেমিকদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন।"

গেরাড কহিল, "ঠাকুরাণী! রিকি! আমার একটা ভয় ছিল। কেননা লোকে বলে———"

"লোকে কি বলে গেরাড?"

"লোকে বলে যে আপনি যৌবনে প্রণয় অতি তুচ্ছ জিনিশ বলিয়াই মনে করিতেন। শিল্প সাধনাই আপনার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল।"

ভানিক ঠাকুরাণী কহিলেন, "গেরাড, এ কথা ঠিক! কিন্তু তার পরিণাম কি হইয়াছে? আমি একা একটি নিরানন্দ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় আজ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি,—আর আমার যৌবনের সঙ্গিনী যাহারা ছিল—তাহারা পুত্র কন্যায় পরিবেষ্টিত,—নাতিনাতিনীগণের আনন্দ কালরবে তাহাদের গৃহ আজ মুখরিত। পত্নী ও মাতৃজীবনের সকল প্রকার সুখ আমি কিসের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম? সুনিপুণ চিত্রশিল্পী ভ্রাতাদের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সাহায্য পাইবার জন্য। কিন্তু বহুকাল হইল, তাঁহারাও একে একে আমাকে ফেলিয়া কোন অজানা লোকে চলিয়া গিয়াছেন। আর শিল্প-নিপুণতা—তা'ও একপ্রকার আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে! জ্ঞান

থাকিলে কি হইবে? বৃদ্ধ বয়সে হাত ঠিক থাকে না। বর্ণ তুলিকা আর আমার আজ্ঞাকারী নাই।—শোন গেরাড! আমি তোমাকে পুত্রবৎ ভালবাসি। তুমিও একজন সুদক্ষ চিত্রকর হইয়াছ, কিন্তু তোমা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট চিত্রকর আমি কয়েকজন দেখিয়াছি। তোমার এমন সুন্দর রূপ—সুন্দর স্বভাব, আমি ইচ্ছা করিনা যে তুমিও আমার মত যৌবন হেলায় কাটাইয়া দাও। তুমি মার্গারেটকে খুবই ভালবাস তা'ও আমি জানি। তুমি মার্গারেটকে বিবাহ কর। আমি যতদূর সন্ধান নিয়াছি, মার্গারেটকে বেশ ভাল মেয়ে বলিয়াই ধারণা হয়। আমার এই রিকি হেইনকে যে দেখিতেছ—যত রাজ্যের খবর ও রাখে। সে যা হ'ক, তুমি নিজে একবার বল দেখি মার্গারেট কেমন?"

অকস্মাৎ প্রচুর বারিবর্ষণে বহুকাল যাবৎ নিদাঘতাপে তপ্ত মেদিনীর যেরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত হয়, গেরাডেরও তাহাই হইল। তাহার হৃদয় শান্ত, স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া উঠিল। ভানিক ঠাকুরাণীর মত গুণগ্রাহী শ্রোতার নিকটে মার্গারেটের রূপ গুণ বর্ণনার সুযোগ পাইয়া গেরাড তাঁহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া লইল।

গেরাডের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃযুগলের নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, সহানুভূতির প্রভাবে গেরাডের চক্ষেও জল আসিল।

নারীজাতি স্বভাবতঃ ভীরু বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু নারীরও যথেষ্ট সাহস আছে,—তবে পুরুষের সাহসিকতা অপেক্ষা ইহা অন্য প্রকারের। ভিন্ন রকমের বলিয়াই রক্ষা,—নচেৎ পুরুষের প্রভুত্ব আর চলিত না—গৃহে গৃহে ঘোরতর অন্তর্ব্বিরোধ উপস্থিত হইত—জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। স্ত্রীলোক-দিগের যে সাহস, অপরকে দুষ্কর কার্য্যে নিয়োজিত করাতেই তাহার সার্থকতা। প্রিয়জনের সঙ্কটকালে ইহার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়। সকল দেশের কাব্যে ও ইতিহাসে ইহার নানাবিধ উজ্জ্বল নিদর্শন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেরূপ তেজস্বিতার সহিত কত নারী আপনাদিগের নিতান্ত প্রিয়জনকে জীবনান্তকর সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না? এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াই একজন ফরাসী লেখক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—"নারী জাতির সাহস ভারি, পরের চামড়ার উপর দিয়া বিপদ যদি যায়!"

তবে গেরাড এই বর্ত্তমান সঙ্কটে নারীসুলভ এই সাহসের জন্য যথেষ্ট উপকৃত হইল। ভানিক ঠাকুরাণী ও রিকি হেইন উভয়েই স্থির করিলেন, পুরুষের পক্ষে বিপদ দেখিয়া ভয় পাওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। অতএব মার্গারেটকে

অবিলম্বে বিবাহ করাই গেরাডের উচিত। তারপর বিবাহ যদি একবার হইয়া গেল, বৃদ্ধ পিতামাতা অবশ্যই—না হয় কিছু বিলম্বে—পুত্রকে ক্ষমা করিবেন। বরং এ কার্য্যে বিলম্ব হইলে ক্রমশঃই পরস্পরের মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইবে এবং নানাবিধ অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবে।

পিতা তাহাকে জেলে পাঠাইবেন এইরূপ ভয়প্রদর্শন করায় যদিও গেরাডের মন নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইতে চাহিতেছিল, তথাপি পিতামাতার বিরুদ্ধে এইরূপ চরম অবাধ্যতার কার্য্যে অগ্রসর হইতে গেরাডের দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। গেরাড নীরবে হিতৈষিণীদ্বয়ের এই পরামর্শ শুনিয়া ক্ষণকাল বিলম্বে বলিল,—"পিতা ভয় দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কি আর বাস্তবিকই আমাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন? আমি সে ভয় করি না। যদি আমার মনে স্থির বিশ্বাস হইত যে বাস্তবিকই তিনি এতদূর অগ্রসর হইবেন, তবে আমি নিশ্চয় এখনই মার্গারেটকে বিবাহ করিতাম। আমার আশঙ্কা এই যে আমি বিবাহ করিলে তিনি কখনও আমাকে মার্জ্জনা করিবেন না। চিরদিনের জন্যই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। পিতৃশাপভার স্কন্ধে বহন করিয়া জীবনে কি কখনও আমি উন্নতিলাভ করিতে পারিব? আর এই পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত, দরিদ্র নিরুপায় স্বামীকে বিবাহ করিয়া মার্গারেটই বা কিরূপে সুখী হইবে? তবে আমার মনে হয়, যদি মার্গারেটকে গোপনে বিবাহ করিয়া উভয়ে এমন কোনও দূরদেশে যাইতে পারি যেখানে চিত্রবিদ্যার আদর আছে, তাহা হইলে ২।৪ বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিলে হয়ত পিতা ক্ষমা করিতে পারেন।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে ভানিক ঠাকুরাণীর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তোমার এই ধীর বুদ্ধির কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার যদি সেরূপ সাহস থাকে এ কল্পনা বাস্তবে পরিণত করাও অসম্ভব নয়। তুমি যেরূপ দেশের কথা বলিতেছ, সেরূপ দেশও আছে। সেখানে তুমি অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী ও ধনী হইতে পারিবে। এ দেশে শিল্পকলা অনাদৃত ও উপেক্ষিত,—যেন শীতকালের প্রকৃতির শোভার ন্যায় ইহা ম্লান। কিন্তু সে দেশে সর্ব্ববিধ শিল্পকলার প্রভূত আদরে যেন চির বসন্ত বিরাজমান!"

গেরাড অধীরকণ্ঠে বলিল, "ইটালী! ইটালী! আপনি ইটালী দেশের কথা বলিতেছেন!"

ভানিক ঠাকুরাণী বলিলেন, "হাঁ, ইটালীর কথাই বলিতেছি। সেখানে চিত্রবিদ্যা-বিশারদেরা রাজকুমারদের ন্যায় সম্মান পায়। একখানি পুঁথি নকল করিয়া ৪০০ শত মুদ্রা পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। অসভ্য তুর্কীরা পূর্ব্ব রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল নগর দখল করিবার পর হইতে শত শত বহুমূল্যবান্ গ্রন্থাদি ইটালীতে স্থানান্তরিত হইতেছে এবং এই সকল গ্রন্থাদির নকল করিতে বহু সংখ্যক সুদক্ষ লিপিকরের প্রয়োজন। তাই মহাচার্য্য পোপ দেশে দেশে এই শ্রেণীর লোক চাহিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন, এ কথা কি তুমি শোন নাই ?"

গেরাড বলিল, "না, আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তবে সকল শিল্পের রাণী ইটালী একবার দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমি বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি।—কিন্তু ঠাকুরাণী, এ আলোচনায় আর ফল কি ? আমার যে সম্বল কিছুই নাই। অত দূরদেশে যাইবার মত অর্থ কোথায় পাইব ?"

ভানিকঠাকুরাণী ভরসা দিয়া বলিলেন, "তা'র জন্য ভাবনা নাই। যদি যাইবার সঙ্কল্প তুমি স্থির করিতে পার, তবে টাকা আমি যেরূপে হয় যোগাড় করিয়া দিব।"

তারপর প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি নানাবিধ পরামর্শ চলিতে লাগিল। সেইদিনের পর হইতে গেরাডের মুখে যেন পুনরায় দীপ্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল—তাহার হৃদয়ে যেন নূতন বল আসিল—যেন কোনও যাদুমন্ত্র প্রভাবে গৃহের সকলের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও তিরস্কারের মধ্যেও তাহার দিন এক প্রকার সচ্ছন্দেই কাটিতে লাগিল।

এদিকে ভানিকঠাকুরাণীর নিকট প্রত্যহ যাতায়াত চলিতে লাগিল। তিনিও বিশেষ অগ্রহ সহকারে তাঁহার বিখ্যাত চিত্রকর ভ্রাতৃযুগলের নানাবিধ শিল্প-কৌশল গেরাডকে শিখাইতে লাগিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "আমি এমন সকল শিল্পকৌশল তোমাকে শিখাইব, যাহা ইটালীর বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীরাও জানেন না। এই ক্ষুদ্র টরগো সহরে যাহা শিখিয়া যাইবে, ইটালীতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল এবং ইটালী যাত্রার প্রায় সর্ব্ববিধ আয়োজন ঠিক হইয়া আসিল। মাত্র বাকী রহিল, এ বিষয়ে মার্গারেটের সম্মতি লওয়া। কারণ, এ সকল ঘটনা গেরাড এ যাবৎ তাহাকে কিছুই জানায় নাই।

গেরাড তাই একদিন সেভেনবাগে অন্য দিন অপেক্ষা আগে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং সংক্ষেপে অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিয়া বিস্তারিতভাবে ইটালী যাত্রায় আয়োজন ও ভানিকঠাকুরাণীর সহৃদয়তার কথা সব মার্গারেটকে বলিল। এখন মার্গারেট সম্মত হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

কিন্তু মার্গারেটের উত্তর শুনিয়া গেরাড নিতান্ত বিস্মিত হইল। মার্গারেট বলিল, "তা হয় না গেরাড! এ যাবৎ তোমার পিতামাতার সম্বন্ধে কোনও কথা কোনও দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু বিবাহের কথা যদি বল—" মার্গারেট বাক্য সম্পূর্ণ না করিয়াই নীরব হইল। ক্ষণকাল পরে পুনরায় বলিল, "ব্যক্তিগত হিসাবে আমার সম্বন্ধে তোমার পিতার বিশেষ আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না,—পিটার বিস্‌কিনও আমাকে এই কথাই বলিল। তবে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা যে তুমি ব্রহ্মচারী আচার্য্য হও।—একথা এতদিন তোমারই আমাকে বলা উচিত ছিল। আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি সত্য; কিন্তু যতদিন তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না।"

গেরাড নানারূপ চেষ্টা করিয়াও মার্গারেটের এই মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। গেরাড অনুরোধ উপরোধ এবং অবশেষে নানাবিধ অনুযোগ করিতে লাগিল,—মার্গারেট কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু তবুও নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইল না।

অবশেষে নিরাশার তীব্র তাড়নায় গেরাড যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল এবং পরুষকণ্ঠে বলিল, "তবে তুমিও তাহাদের দলে? হয় তোমাকে পাইব, না হয় ব্রহ্মচারী হইব, একথা জানিয়াও তুমি আমাকে ব্রহ্মচারী আচার্য্য হইবার পথেই বিদায় দিতেছ? এতদিনে বুঝিলাম, তোমার ভালবাসা ছলনা মাত্র। পিতা-মাতার ক্রোধ বাস্তবিকই আন্তরিক,—কিন্তু তোমার ভালবাসা নিতান্তই মৌখিক।"

মার্গারেট অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গেরাড উন্মত্তবৎ বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

প্রণয়ী কোনও গুরুতর অন্যায় আচরণ করিলে রমণীহৃদয়ে একরূপ করুণার উদ্রেক হয়—ইহা স্ত্রী চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। আমরা পুরুষজাতি ইহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাই না; কিন্তু সে দোষ আমাদেরই। নারী-হৃদয়ের ভাব হয়ত এইরূপ, "আহা বেচারী অমুক এমন ভালমানুষটি, সে কেন এরূপ কাজ করিল? না জানি কত দুঃখে, কত অশান্তিতে পড়িয়াই এরূপ করিয়াছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

গেরাডের আচরণে মার্গারেটের হৃদয়েও ধীরে ধীরে এইরূপ একটা করুণার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। গেরাড চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ মার্গারেট তদবস্থায় বসিয়া বসিয়া গেরাডের কথাই ভাবিতে লাগিল। অকস্মাৎ বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, গেরাড দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিতেছে, হাতে একখানি ছবির কয়েকখণ্ড ছিন্ন অংশ,—ক্রোধে ও ক্ষোভে তাহার মুখ বিবর্ণ, যেন কথা বলিবার শক্তি নাই।

মার্গারেটকে ছবির ছিন্ন অংশগুলি দেখাইয়া গেরাড রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "দেখ দেখ, দুর্বৃত্তদের আচরণ একবার দেখ! কি নীচ প্রবৃত্তি তাদের—তোমার ছবিখানি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে।"

গেরাডের অবস্থা ও ছবিখানির দুরবস্থা দেখিয়া মার্গারেটেরও হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এমন করিয়াছে?"

গেরাড বলিল, "তা আমি জানি না—বাড়ীর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি জানিতেও চাহি না—কারণ যে এ কাজ করিয়াছে তাকে আমি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত কখনই ক্ষমা করিতে পারিব না! এরূপ ঘৃণিত কাজ যে করিতে পারে, সে কসাই অপেক্ষাও অধম। তোমার ওই সুন্দর মুখখানি একবার দেখিলে কেহ ভাল না বাসিয়া পারে না—ছাবতে সেই মুখখানি কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে দেখ! ওঃ! মার্গারেট! মার্গারেট! আজ আমি নিতান্তই নিঃস্ব—প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যে সৌন্দর্য্যের ছবি আমি ছয়টি মাস পরিশ্রম করিয়া সমূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম, হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা এক মুহূর্ত্তেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদ্বারা আর ইহার নষ্টোদ্ধার হইবে না! আজ আর সে প্রেমের মোহন স্বপ্ন নাই—হৃদয়ে সে তীব্র আনন্দের অনুভূতিও নাই। আজ আমি সকল রকমেই কাঙ্গাল হইলাম।"

মার্গারেট অধীরভাবে বলিল, "গেরাড! গেরাড! স্থির হও।—আমার জন্য তোমার প্রতি তাহারা এতদূর নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছে? এত নীচ অন্তঃকরণ তাহাদের? তবে শোন, আজ যাহারা তোমার ছবিখানি নষ্ট করিয়াছে, তাহারা অচিরেই দেখিতে পাইবে, ছবির জীবন্ত আদর্শ তোমারই হইয়াছে।"

গেরাড বিস্মিত হইয়া বলিল, "মার্গারেট! এ কথা কি সত্য?"

মার্গারেট বলিল, "তারা যখন এত নিষ্ঠুর; আর তাহাদিগের দিকে চাহিয়া কেন তোমাকে অসুখী করিব? পূর্ব্বে যা বলিয়াছিলাম, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। এখন তুমি যা বলিবে, আমি তাতেই প্রস্তুত।"

গেরাড আনন্দে অধীর হইয়া মার্গারেটকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পিটার ও মার্টিনকে গেরাড এই শুভসংবাদ জানাইল। সেইদিনই বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়া গেল,—বাগ্‌দান ক্রিয়াও হইল। মধ্যযুগে এই অনুষ্ঠানটি বিবাহের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

বসন্তে বাসন্তী।

(১)

(যে দিন) দানব দলনে ত্রিদিব হইতে সৃষ্ট হইলে জননী,
বাজিল স্বরগে দেবদুন্দুভি স্তবস্তুতি হর্ষ ধ্বনি,
নিধন হইল মহিষাসুর, সেই সে রণে সন্ধিক্ষণে,
পুরুষে তুষ্ট করিলে প্রকৃতি অভীষ্ট বর প্রহারণে।

(২)

দিব্য ভূষণে ভূষিতা মাতা, সিংহাসুর বাহিনী,
চরণযুগলে সুনীল সরোজ স্নিগ্ধকান্তি ধারিণী,
আল্‌তা ননীর বদনখানি, কৃষ্ণতার নয়নী,
দশভূজা মহাতেজা চণ্ডী চণ্ডা ঈশানী।

(৩)

মর্ত্ত্যবাসীর রুগ্না ধরা সাজিয়েছে বেশ স্ব-আগার,
আকাশ গায়ে নীল চাঁদোয়া সবুজগাছের তোরণ দ্বার,
দুর্ব্বাতৃণের কোমল বেদী, আগম গাছে পাখীর দল,
সাদা ফুলে সাজিভরা, অর্ঘ্যদিতে গঙ্গাজল।

(৪)

জল্‌বে দিনে ভানুর আলো, রাতে চাঁদের স্নিগ্ধবাতি,
ধীর সমীরণ কর্‌বে ব্যজন, মৃদুমন্দ হর্ষগতি ;
হরিৎ ক্ষেত্রের ধান্য শস্য ধূপ ধুনার গন্ধ বায়,
ভক্ত পূজক কর্‌ছে স্তুতি, আয় মা দেবী আয় মা আয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্রস্য ঃ

রত্ন-বিনিময়।

(১)

"ধিক্ বিচিত্রা! কেন বিধাতা আমাকে এত রূপ দিয়াছিলেন? আরও ধিক্, কেন এত সম্পদের অধিকারিণী আমায় করিয়াছিলেন?"

বিচিত্রা উত্তর করিল, "হায় সুমিত্রা! পৃথিবীতে যার বড় কাম্য নাই, তারই অধিকারের জন্য বিধাতাকে ধিক্কার দিতেছ?"

"কার কাম্য বিচিত্রা?"

"নরনারী সকলেরই।"

সুমিত্রা কহিল, "পুরুষের চরিত্র যতদূর বুঝিয়াছি,—ধন তাদের বড় কাম্যই বটে। আর রূপ—তাই বা কম কাম্য কি? সুরূপ পুরুষও রঞ্জন ও বেশভূষার পারিপাট্যে রূপের শোভা বৃদ্ধি করিতে ব্যগ্র কম নয়। তবে নিজেদের রূপ যতই কাম্য হউক, নারীর রূপ তাদের আরও বেশী কাম্য।"

"কেবল পুরুষের দোষ এত দিতেছ কেন? এ দুটি ভাগ্য কি নারীরই কাম্য নহে?"

সুমিত্রা কহিল, "রূপ নারীরা কামনা করিয়া থাকে,—কিন্তু সে বড় হীন কামনা। নারী রূপ চায় পুরুষের নয়ন মুগ্ধ করিতে, পুরুষের চিত্তে সুধু ভোগের লালসা জাগাইতে।"

"ভোগের লালসা না ভালবাসা?"

"নারী তার রূপের মোহে পুরুষের চিত্তে যে ভাবটি জাগায়, তার নাম ভোগের লালসাই, ভালবাসা নয়। ভালবাসা রূপের মোহে পাইবার জিনিশ নয়। তাই বলিতেছিলাম, রূপের কামনা নারীর বড় হীন কামনা, নারী চিত্তের হীনতা ও দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। নারীকে হীন ভোগের পাত্রীর মতই দেখে, তাই পুরুষও নারীতে রূপই শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলিয়া মনে করে।"

"আর ধন?"

"ধন যদি নারীর কাম্য হয়, তবে সে নারী বুঝি আরও হীন। ধনের বিনিময়ে সে দাস পাইতে পারে, স্নেহময় প্রেমময় স্বামী কখনও পায় না।"

বিচিত্রা কহিল, "ধনের কথা যা বলিতেছ, তা সত্য। কিন্তু রূপ কি কেবলই লালসার বস্তু? জগতে যা কিছু সুন্দর, তাই মানবের চিত্তকে নন্দিত

করে। মানবকে আনন্দ দিবার জন্যই বিধাতা জগৎকে এত সব সুন্দরে ভরিয়া রাখিয়াছেন। এত সব সুন্দরের এত যে সৌন্দর্য্য—সবই ত লোকে ভোগ করে, ভোগ করিয়া আনন্দ পায়। এই সব ভোগই কি নিন্দনীয়? ঘৃণার জিনিশ? তা যদি হয়, স্বয়ং বিধাতাই নিন্দনীয়, বিধাতাই সাধু জনের ঘৃণার পাত্র।"

সুমিত্রা একটু ভাবিল, একটু মধুর হাসিল,—তারপর কহিল, "সে সৌন্দর্য্য আর সৌন্দর্য্যের ভোগ এক কথা,—আর নারীর রূপ, আর সেই রূপে পুরুষের চিত্তে যে লালসা জাগায়, সে আর এক কথা। দুইয়ের তুলনাই হয় না।"

"নারীও বিধাতার বড় সুন্দর সৃষ্টি,—জগতে যত সৌন্দর্য্য আছে, তার মধ্যে প্রধান একটি।"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "যদি তা হইত বিচিত্রা, সব নারীই সুন্দর হইত,—যেমন সব ফুলই সুন্দর হয়। বিধাতার এ জগৎ কেবল বাহিরের রূপ লইয়া নয়,—জগতের বড় একটা অন্তর আছে, তার মধ্যেও সুন্দর কম নাই। মানবজীবনে বাহিরের চেয়ে এই অন্তরটাই বড়—অনেক বড়। নারী যদি বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি হয়, সে সুন্দর সে বাহিরের রূপে তত নয়, যত নাকি অন্তরের মাধুর্য্যে। কত নারী আছে, বাহিরে তার রূপ নাই, কিন্তু অন্তরে সে বড় মধুর, বড় সুন্দর,—যার সেই অন্তরের সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্যই এক একটি গৃহের গৃহধর্ম্মের প্রাণ, আশ্রয়। কিন্তু সে নারীকে কোনও পুরুষ আদর করে কি?"

"অন্তরের সৌন্দর্য্য যে সহজে কেহ দেখিতে পায় না।"

"দেখিতে কেহ চায় না, তাই পায় না। চাহিলে দেখা এমন কঠিন নয়।"

বিচিত্রা একটু হাসিয়া কহিল, "তা বাহিরের রূপ যার আছে, তার কি অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিতে নাই? রূপবতীকে যে পুরুষ কামনা করে, তার যে অন্তরের সৌন্দর্য্যের দিকে কোনও আকর্ষণ নাই, কেবল রূপভোগের লালসাতেই সে মত্ত, তা কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"তা যে সে নয়, তাই বা কেমন করিয়া বুঝিব?"

"মনে মনে যদি নিজে না বোঝ, তবে ত আর উপায়ই দেখি না। তা এইজন্য যদি বিবাহ না কর, দেখিতেছি, তোমার বিবাহই হইবে না। তুমি রূপবতী, নগরের প্রায় সকল যুবকই ত তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। রূপের মোহ সকলেরই আছে সন্দেহ নাই, ধনের লোভও অনেকের আছে, তবে তোমার অন্তরের গুণে যে কেহ আকৃষ্ট হয় নাই,—তা কে বলিতে পারে?"

"হইয়াছে যে তাই বা কে সত্য করিয়া বলিবে? আমিই বা কি প্রকারে

তা বুঝিব? রূপ আছে, এই ত এক বড় দুর্ভাগ্য, তার সঙ্গে আরও বড় দুর্ভাগ্য, অপুত্রক পিতা এত বড় সম্পদ এই অভাগীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। নগরে কত কুমারী আছে, সুন্দরীও তাদের মধ্যে কত আছে,—কৈ, নগরবাসী এত লোক ত আর কাহাকেও বিবাহ করিবার জন্য এমন পাগল হইয়া উঠে নাই? পিতার মৃত্যুর পর হইতে—কৈ, আর কাহারও ত বিবাহের প্রার্থী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না? মনে হয়, আমার বিবাহ বা মৃত্যু একটা কিছু না হইলে বুঝি আর কোনও কন্যার বিবাহই হইবে না। বিচিত্রা, ইহার পরেও কি মনে করিব, কেহ ভালবাসিয়া আমাকে চাহিতেছে? যদি কখনও আমার ধন যায়, আমার রূপ কোন কঠিন পীড়ায় বিনষ্ট হয়, আমার স্বামী যিনি হইবেন, পুরুষের মত আমাকে তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে তিনি রক্ষা করিবেন?"

বিচিত্রা কহিল, "অবশ্য রূপে আর ধনে তোমাতে একেবারে সোণায় সোহাগা হইয়াছে। সব অলঙ্কারের চেয়ে ধনের অলঙ্কারে রূপ বুঝি অনেক বেশী মোহন হইয়া উঠে। যা বলিয়াছ, পুরুষের বড় দুটি কাম্যই একাধারে তোমাতে মিলিয়াছে। তাই সকলে এত আগ্রহে তোমাকে কামনা করিতেছে। এ কামনার মূলে তোমার রূপের মোহ কি ধনের লোভ কোনটা বড়, হয়ত তা বিশ্লেষণ করাও সহজ নয়। দুইটা মিলিয়া সমস্যাটা বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যই কি এ নগরে এমন কেহ নাই, যে তোমাকে ভালবাসে মনে মনে স্নেহ করে,—যে তোমাকে চায়, সুধু তোমার রূপ আর ধন চায় না? এ নগরের যুবকগণ কি—ধিক্—সবাই এমন হীন? খাঁটি পুরুষত্বের অধিকারী একটি পুরুষও কি নাই?"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে কহিলেন, "সবাই হীন এমন কথা বলিতে পারি না। তবে আমার রূপের আর ধনের আকর্ষণ এত বড় যে, যে স্নেহসঞ্চারের অবসরই কাহারও চিত্তে সহজে হইবার নহে। যদিই হয়, তবে তাহা ধরিবার কি বুঝিবার উপায় কিছু নাই।"

"তবে কি বিবাহই করিবে না?"

"তাই ভাবিতেছি, কি করি? এত কুমারী নগরে থাকিতে, একা আমাকেই সকলে এমন আগ্রহে কামনা করিতেছে, ধিক্! বড় ঘৃণা বোধ হইতেছে। পুরুষ জাতির উপরেই কেমন দারুণ একটা বিরাগ আমার চিত্তে জন্মিতেছে! বিচিত্রা, পুরুষত্বের গৌরবে উন্নত স্বামীর স্নেহ ও ভালবাসা, স্নেহময় তেজস্বী স্বামীর আশ্রয়, নারীজীবনে বুঝি সব চেয়ে বড় কাম্য বড় সৌভাগ্য। আমার

রূপে আর ধনে সে কাম্য, সে সৌভাগ্য আমার পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। তাই ত বিধাতার প্রতিই অন্তর হইতে এমন ধিক্কার উঠিতেছিল।"

বিচিত্রা কহিল, "তা বরং দেখ না, নিজে কাহাকেও ভালবাসিয়া ফেলিতে পার কি না। তা যদি পার, সে যেমনই হউক, তার পায়ে পড়িয়া থাকিয়াও কৃতার্থ হইবে। কে জানে ভালবাসার টানে, সেও হয়ত শেষে ভালই বাসিবে,— ভাল বাসিয়া স্বামীর মতই স্নেহ করিবে।"

সুমিত্রা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "ঘৃণায় ও বিরাগে চিত্ত এমন বিষে ভরা হইয়া রহিয়াছে যে ভালবাসার অমৃত উৎস তার মধ্যে আর উঠিতে পারে না, উঠিতে চাহিলেও পারে না,—বিষের স্পর্শে সে অমৃতও বিষ হইয়া যায়।"

বিচিত্রা কহিল, "তবে এই বিষেই বরং তাদের একটুখানি জ্বালাইয়া দেখ না, কেমন শাস্তি তাদের হয়! কেবল নিজেই জ্বলিবে,—সেটা কি ভাল? যারা এত হীন, পুরুষের দেহ ধরিয়াও যারা পুরুষত্ববিহীন, তাদের একটু লাঞ্ছনাই হউক্! হয়ত, তাতেই এমন সুযোগ আসিবে, যাতে বুঝিতে পারিবে, কেউ তোমায় সত্য একটু ভালবাসে কিনা,—দুই একটি অন্ততঃ পুরুষের মত পুরুষ এ নগরে আছে কিনা, যে তোমার রূপের কামনা করিলেও ধনের কামনা করে না। রূপের কামনা পুরুষের পক্ষে এমন দোষের বলা যায় না,—তবে স্ত্রী হইতে যে ধনের কামনা করে, সে কাপুরুষ নারী মাত্রেরই নিতান্ত ঘৃণার পাত্র।"

সুমিত্রা কহিল, "এ বিষ আমার অন্তরে থাকিয়া আমাকেই দগ্ধ করিতেছে, অপরকে কি প্রকারে জ্বালাইবে? কাহাকেও বিবাহ করিব না, এতে যেটুকু হয়। কিন্তু যদি কেহ সত্য আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকে, কিছুকাল ক্ষোভ কাহারও কিছু তাহাতে হইতে পারে,—এমন বিষের জ্বালায় কেহ জ্বলিবে না।"

"এক কাজ কর না? ঘোষণা কর, এতজন পাণিপ্রার্থী আছে, কাহাকেও তুমি মনোনীত করিতে পারিতেছ না, তবে যে তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার দিতে পারিবে, তাকেই তুমি বরণ করিবে।"

"তাহাতে কি হইবে?"

"দেখই না? যুবকদের মধ্যে একটা বড় হুড়াহুড়ি ত পড়িয়া যাইবে? হতভাগাদের কিছু আয়াস ত পাইতে হইবে? ধনের ক্ষতিও ত কিছু হইবে? আর কিছু না হক্, বেশ একটা রঙ্গ ত হইবে? বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছ,—ইহাতে একটু প্রমোদ হইলেই বা মন্দ কি? তারপর কে জানে, কারও দেওয়া কোনও রত্ন যদি মনোমতই হয়,———"

"যে রত্ন আমার মনোমত হইবে,—তা কি কেউ আমায় দিতে পারিবে ?"

"কি সে রত্ন, সুমিত্রা ?"

"যদি পাই, তখন দেখিবে। এখন থাক্।"

সুমিত্রা পাটলীপুত্রের কোনও ধনীবণিকের একমাত্র দুহিতা, একমাত্র সন্তান। রূপবতী বলিয়া সুমিত্রার খ্যাতি ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বিপুল সম্পদেরও উত্তরাধিকারিণী সে হইল। একে এমন রূপবতী, তায় আবার প্রচুর বিত্তের অধিকারিণী, পাটলীপুত্রের শ্রেষ্ঠী সমাজের যুবকগণ প্রায় সকালেই সুমিত্রার বিবাহার্থী হইল। অভিভাবক কেহ ছিল না—সুমিত্রা নিজেই নিজের কর্ত্রী। সুতরাং বিবাহার্থী সকলে প্রেমিকরূপেই সুমিত্রার সম্মুখে উপস্থিত হইত। কারণ স্বাধীনা সুন্দরী যুবতীকে লাভ করিতে হইলে, প্রেমিক হইয়া আকুল প্রেমের কথা বলিয়া, আগে তাহার প্রেম আকর্ষণ করাই প্রয়োজন। পিতা জীবিত থাকিতেও বিবাহের সম্বন্ধ আসিত, অবশ্য ধনীর একমাত্র দুহিতা বলিয়া সম্বন্ধ কিছু বেশীই আসিত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সহসা এতগুলি প্রেমিকের আবির্ভাব, সুমিত্রার পক্ষে যারপরনাই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। সুমিত্রা বুদ্ধিমতী, উচ্চপ্রাণা ও সুশিক্ষিতা,—সে সহজেই বুঝিতে পারিল, এই প্রেমিকগণের প্রেমের মূল্য কি ? পুরুষ যদি পুরুষত্বের মহিমায় উন্নত হয়, নারী আপনা হইতেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার উপরে সে যদি তার পুরুষ-হৃদয়ের প্রেম ও স্নেহ লইয়া কোনও নারীর নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি চিত্তের প্রবল আকর্ষণ অল্প নারীই সম্বরণ করিতে পারে। রূপের মোহও যদি এই প্রেমের মূলে থাকে, নারীর চিত্তে তাহাতে বিরাগ সঞ্চার দূরে থাক্,—নারীমর্য্যাদার বোধে উন্নতপ্রাণা নারীও রূপের মোহন শোভা পরিমার্জ্জনায় ও বেশভূষায় আরও মোহন করিয়া, প্রেমাস্পদের চরণে তাহা অর্পণ করিতে চায়, পূজায় ভক্ত যেমন পুষ্পসম্ভার পূত সলিলে ধৌত করিয়া চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া,—দেবতার চরণে দেয়। কিন্তু এ স্থলে এই পুরুষত্বের মহিমা প্রেমিকবর্গের কাহারও মধ্যে সুমিত্রা অনুভব করে নাই। তার রূপের আকর্ষণ যাহাই থাকুক, তার সম্পদের প্রতি ইঁহাদের লিপ্সার প্রাবল্য স্পষ্টভাবে এত বেশীই দেখা গিয়াছে যে সম্পদের ত কথাই নাই, নিজের রূপের প্রতিও দারুণ বেদনাময় একটা ধিক্কার তার মন ভরিয়া উঠিতেছে। পুরুষজাতির প্রতি সকল শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হইয়া একটা বিষম ঘৃণা ও বিরাগে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। রূপের মোহ ও ধনের লিপ্সা হইতে বিযুক্ত এমন কেহ সে পাকিতে

পারে, যে তাকেই ভালবাসিবে, সকল অবস্থায় তাকে তার স্নেহময় বক্ষের আশ্রয়ে ধরিয়া রাখিবে, এ কথা সুমিত্রার মনেও কখন হইত না। বিবাহার্থী হইয়া যে কেহ উপস্থিত হইত, সুমিত্রা তাহাকে হীনচেতা কাপুরুষ বই উন্নতচেতা পুরুষ বলিয়া কখনও মনে করিতে পারিত না। দেখিতে সে যেমনই হউক্, প্রথম সাক্ষাতেই ঘৃণা বই তাহার প্রতি কোনওরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক তার চিত্তে কখনও হইত না।

তাঁহার নিতান্ত বিরাগের পাত্র এই সব যুবকদের কিছু লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা হইলে, সুমিত্রার তাহাতে পরিতাপের কারণ ছিল না। তারপর, ইহারাও ত তাহাকে কম জ্বালাতন করিতছে না। বিচিত্রার প্রস্তাব সুমিত্রা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিল। ঘোষণা প্রচারিত হইল, প্রেমকবর্গ বহু অর্থব্যয়ে বহু মূল্যবান্ রত্ন নিচয় সুমিত্রাকে উপহার পাঠাইতে লাগিল। কোনও কোনও হতভাগ্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সুমিত্রার অনুগ্রহ প্রত্যাশায় রত্ন-উপহার ক্রয় করিল। আহা, যদি তার সকল সম্পদসহ এই রূপবতীকে পাওয়া যায়,—ছার ক্ষুদ্র সম্পদ গেলেই বা ক্ষতি কি? সুমিত্রা যে যাহা পাঠাইত, তাহার নামীয় পত্রসহ সাবধানে তুলিয়া রাখিত। তাহার অভিপ্রায় ছিল, পরে এ সব উপহার দাতৃগণকে প্রত্যর্পণ করিবে।

(২)

"বিক্রম সেন! তুমি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি আসিয়াছ আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া! হাঃ হাঃ হাঃ!"

বিক্রমসেন পাটলীপুত্র-নিবাসী জনৈক দরিদ্র যুবক। কিছুকাল সুমিত্রার পিতার অধীনে কোনও ক্ষুদ্রকর্ম্মে সে নিযুক্ত ছিল। বৎসরাধিক কাল সে কার্য্যত্যাগ করিয়া রাজসৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছে। বাল্যাবধিই সে ব্যায়ামপটু ও অস্ত্রকুশল ছিল। যোদ্ধার বৃত্তির দিকেই তার চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইত। কিন্তু সে বিধবা বৃদ্ধা মাতার একমাত্র সন্তান। সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে মাতার সম্মতি ছিল না। রাজাও এই কারণে তাহাকে গ্রহণ করিতে চান নাই। বৎসরাধিক হইল, মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। বাধা দূর হইল, বণিকের ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর পদ ত্যাগ করিয়া বিক্রমসেন অবিলম্বে রাজসৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইল।

সৈনিকরূপে বিক্রমসেনের আয় সামান্তই ছিল। কোনও মতে নিজের

সুমিত্রার পাণি গ্রহণের আশায় পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য রত্ন উপহার পাঠাইতেছিল, পিতার ভূতপূর্ব্ব দীনসেবক দরিদ্র বিক্রমসেন যে তাহারই বিবাহার্থী রূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ কথা সুমিত্রা স্বপ্নেও কখনও মনে করিতে পারে নাই। কি এমন মূল্যবান্ রত্ন সে আনিতে পারে? হতভাগ্য কি তার ধনের আকাঙ্ক্ষায় একেবারে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে? সুমিত্রা নিষ্ঠুর ছিল না, কিন্তু বিক্রমসেনের পক্ষে তার বিবাহার্থী হইয়া আগমন এত বড় একটা বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া তার মনে হইল, যে সে কোনও মতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

সুমিত্রার গর্ব্বময় অবজ্ঞার কথায় ও বিদ্রূপের হাসিতে বিক্রমসেন বিন্দুমাত্র ভীত বা অপ্রতিভ হইল না। দৃঢ় ও ঋজুভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্ভীক্ দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া সে কহিল, "হাঁ সুমিত্রা! তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়াই আসিয়াছি। কিন্তু তাহাতে তোমার এত বিদ্রূপ করিবার কি আছে, জানি না।"

সুমিত্রা একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিছু না। আমি নিতান্ত অজ্ঞা ও অশিষ্টা বলিয়াই বিদ্রূপ করিয়াছি। তা এতদিন ত তোমাকে দেখি নাই। আজ সহসা এই অবলার প্রতি এত অনুগ্রহ কিসে হইল?"

বিক্রমসেন সংক্ষেপে উত্তর করিল, "এতদিন ভরসা পাই নাই।"

সুমিত্রা আবার তেমনই বিদ্রূপের মৃদুহাসি হাসিয়া কহিল, "আজ কিসে এত ভরসা হইল? কি এমন অমূল্যরত্ন সহসা লাভ করিলে যার বিনিময়ে এই অভাগীর রূপ ও ধন ক্রয় করিতে আসিয়াছ?"

বিক্রমসেন কহিল, "তোমার রূপ কিম্বা ধন আমি ক্রয় করিতে আসি নাই। তার যোগ্য কোনও রত্নও আমার নাই।"

"তবে আসিয়াছ কেন?"

"আসিয়াছি তোমার প্রেমলাভে কৃতার্থ হইতে—তাহা পার্থিব কোনও রত্নে কিনিবার জিনিশ নয়।"

সুমিত্রা আবার একটু হাসিল,—হাসিয়া কহিল, "তবে অপার্থিব কি এমন রত্নই বা লইয়া আসিয়াছ, যাহার বিনিময়ে নারীর প্রেম কিনিতে পার?"

বিক্রমসেন ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমার পুরুষহৃদয়ের প্রেম,—যে প্রেম তার বাঞ্ছিতা নারীকে যেন অক্ষয় কবচাবৃত করিয়া আপন আশ্রয়ে রক্ষা করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে বিক্রমসেনের চক্ষু ও মুখ কেমন একটা অপার্থিব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমিত্রা সে উজ্জ্বল আভা লক্ষ্য করিল,—পুষ্পপেলব কপোল যুগল যেন ঊষার রক্তিম কিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দর্পে উন্নত মুখখানি কেমন একটা নূতন সঙ্কোচে যেন আনত হইয়া পড়িল!

মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া সুমিত্রা আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। আবার তেমনই একটু হাসিয়া কহিল, "এ প্রেম লইয়া এতদিন তবে দূরে ছিলে কেমন করিয়া? আজই বা কি মনে করিয়া আসিলে? এত বড় রত্নই যদি ছিল, তবে ভরসাই বা পাও নাই কেন? এতদিন যদি পাও নাই, তবে আজই বা পাইলে কিসে?"

"এতদিন তুমি রত্ন কিছু চাও নাই,—তাই আসিতে ভরসা পাই নাই। আজ চাহিতেছ, তাই ভরসা করিয়া আসিয়াছি। সুমিত্রা! এ রত্নের বিনিময়ে যে রত্নের আকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছি, তা আমায় দিবে কি?"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "আপন ধন সকলেই বড় দেখে। তোমার ও রত্ন তোমার পক্ষে যতই গর্ব্বের হউক,—আমি যে তা বিনিময়ের যোগ্য মনে করিব, এতবড় একটা ভরসা—তোমার পক্ষে বড় বেশী দুর্ভরসা নয় কি বিক্রমসেন?"

বিক্রমসেন উত্তর করিল, "সুমিত্রা! তুমি হয় ত মনে করিতেছ, তোমার পিতার জনৈক দীন সেবকের পক্ষে আজ তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসা বড়ই ধৃষ্টতার কথা। কিন্তু আমি অর্থের বিনিময়ে কর্ম্ম তাঁহাকে দিতাম, তাঁহার অন্নদাস ছিলাম না,—অপর কোনও অনুগ্রহও কখনও প্রার্থনা করি নাই। পুরুষকে কর্ম্ম করিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি কাহারও অনুগ্রহজীবী সে না হয়, কর্ম্ম সে যাহাই করুক, যৎসামান্য যাহাই সে তাহাতে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হউক, তার পুরুষের মর্য্যাদা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। পুরুষের প্রাণ যার আছে, যে কোনও নারীরই প্রেম সে কামনা করিতে পারে। ধনবতী বলিয়া তুমি আমায় অবজ্ঞা করিতেছ,—কিন্তু জানিও, তুমি ত নারী, পৈতৃকধনে ধনবান্ কোনও পুরুষকেও আমি কোনও অংশে আমা অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মনে করি না। তুমি রূপবতী,—আমিও কুরূপ নাই। আর—যদি আমি পুরুষত্বের অধিকারী হই, তবে রূপবতী নারীকে পত্নীরূপে কামনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা নয়।"

বিক্রমসেনের এই পৌরুষ গর্ব্বের সম্মুখে নারী সুমিত্রা এবার বাস্তবিকই যেন পরাভূত হইল। ইহার কি উত্তর সে দিবে? লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না। যতই সে বিক্রমসেনকে বিরাগভরে অবজ্ঞা করিতে চাহিতে লাগিল, ততই কেমন

সুমিত্রা ও বিক্রমসেন। (রত্নবিনিময়)

কমলা প্রেস,—বাগবাজার, কলিকাতা।

একটা শ্রদ্ধায় তার চিত্ত ইহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িতে লাগিল। পুরুষজাতির প্রতি এমন শ্রদ্ধা যে সে বহুদিন অনুভব করে নাই! যাহা হউক, পরাভূত হইয়াও পরাভব স্বীকার করিবে, এরূপ দুর্ব্বল চিত্ত সুমিত্রার ছিল না। একটু কাল নীরবে থাকিয়া সে চিত্ত দমন করিল। তারপর তেমনই অবজ্ঞার বিদ্রূপ-মিশ্রিত স্বরে কহিল, "বিক্রমসেন, যে ধনের পরিচয় লোকে জানে না, সহজে জানিবারও সম্ভাবনা নাই, সে ধনের গর্ব্ব সকলেই এমন করিতে পারে না কি? তা, তোমার সে অপার্থিব রত্ন, তোমারই হৃদয়ে ভরিয়া আছে, থাক্,—অভাগিনী তার পার্থিব নয়নে এখনও তা দেখিতে পাইতেছে না।"

"সত্যই কি দেখিতে পাইতেছ না সুমিত্রা?"

"কি করিয়া পাইব? তুমি কি বাহির করিয়া তা দেখাইয়াছ?"

"ইঁহার কি উত্তর দিব জানি না।"

"আমিই বা কি করিব বল? রত্ন দেখিতে না পাইলে, কেমন করিয়া তাহা গ্রহণ করিব? তার মূল্যই বা কিসে বুঝিব?"

"যদি কখনও দেখাইতে পারি, সুমিত্রা?"

"পার, দেখিব।"

"তখন বিনিময়ে কিছু পাইব কি?"

"বিনিময়ের কিছু যদি ততদিন থাকে, আর মূল্য যদি বিনিময়ের যোগ্য হয়, কেনই বা পাইবে না?"

বিক্রমসেনের মুখখানি ভরিয়া বড় একটা যাতনার ক্লিষ্টতা ব্যক্ত হইল। ধীরে ধীরে বড় দীর্ঘ বড় গভীর একটি বেদনাময় নিশ্বাস সে ত্যাগ করিল; তারপর সে কহিল,—"তবে বিদায় হই সুমিত্রা! তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিব, এমন কোনও অধিকার আমার নাই, কিন্তু যদি অপেক্ষা করিতে হয়, আর যদি আমি রত্ন আনিয়া দেখাইতে পারি—"

"তখন—তার বিনিময়ে আমার এ রত্ন তোমাকে দিতে হইবে! কেমন?"

তার সেই আকুল আবেদনের উত্তরে কি এ নিষ্ঠুর শ্লেষ! বড় তীব্র ভাবে এই শ্লেষের বাণ বিক্রমসেনের অন্তরে গিয়া বিঁধিল। বিক্রমসেন কোন উত্তর করিতে পারিল না। নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুমিত্রার চিত্তে একটা করুণার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সহসা চিত্তের এরূপ দুর্ব্বলতায় সে আপনার উপরেই আপনি বড় ক্রুদ্ধ হইতেছিল। কঠোর আয়াসে অতিরিক্ত একটা কঠোর ভাব আনিয়া সে আপন চিত্তের নূতন এই

করুণ দুর্ব্বলতা যেন দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিল। চিত্তে করুণা হইলে, ব্যবহারে যদি কেহ কঠোরতা দেখাইতে চায়, সে কঠোরতা সাধারণ শিষ্টতার সীমাও ছাড়াইয়া যায়,—বড় বেশী কটু হইয়া পড়ে। সুমিত্রারও তাই হইল।—বড় নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সে কহিল, "ভাল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিক্রমসেন! যে অপার্থিব মহারত্নের লোভ দেখাইলে, তাহাতে তোমার স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে ত? তাও ত আবার আমাকেই দিতে আসিয়াছ? বিনিময়ে স্ত্রী হইতে যে রত্ন পাইতে আশা কর, তার সাহায্যেই বুঝি তাকে প্রতিপালন করিবে স্থির করিয়াছ?"

বিক্রমসেনের চক্ষু মুখ যেন জ্বলন্ত অগ্নির আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্ফীত বক্ষে উন্নত শিরে আহত পৌরুষদর্পে সে সুমিত্রার দিকে চাহিল। কটিতে অসি ছিল,—কোষমুক্ত করিয়া দৃঢ়হস্তে সেই অসি সম্মুখের দিকে ধরিয়া সে কহিল, "সুমিত্রা! আমি পুরুষ। পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল এই অসি আমার করে। এই অসির সাহায্যে রাজাধিরাজ দুহিতাকেও প্রতিপালন করিতে আমি সমর্থ। স্ত্রীর প্রেমরত্ন পুরুষের সংসারজীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ,—তার দ্বারা স্ত্রীকে কেহ প্রতিপালন করে না।"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "অবলা নারীর সমক্ষে অসি আস্ফালন করা বিশেষ পৌরুষের পরিচায়ক নহে। বৃথা আস্ফালন না করিয়া, এই অসির বলে বাস্তবিক সামর্থ্য তোমার কতদূর হইতে পারে, দেখাও। তারপর আসিও, এখন বিদায় হও!"

লজ্জায় বিক্রমসেনের বিবর্ণ মুখ আবার নত হইল। আর কিছু না বলিয়া সে ধীর পাদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

অজ্ঞাতে একটি নিশ্বাস সুমিত্রার বক্ষ ও নাসিকা স্পন্দিত করিয়া বাহির হইল। সখী বিচিত্রা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "বড় ভুল করিলে সুমিত্রা। যে রত্ন কামনা করিতেছিলে, হাতে পাইয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে।"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "কি ছাড়িলাম বিচিত্রা? কিছু কি দেখিলাম?"

"যে চক্ষুতে দেখিবে, সাধ করিয়া যদি তা বুজিয়া থাক, তবে কে দেখাইতে পারে?"

"কোথায় সে চক্ষু বিচিত্রা?"

বিচিত্রা উত্তর করিল,—"ফুটিয়াছিল, ফুটিতেছিল। কিন্তু ফুটিতে ফুটিতেই যে চাপিয়া ঢাকিয়া দিলে সখী?"

"যদি চাপিয়া ঢাকিয়াই থাকি, জোরে যদি আবার তা কেহ খুলিয়া দিতে পারে, তখন ফুটিবে।"

"সে জোর লইয়া যদি কেহ আর না আসে ?"

"সে চক্ষু আর তবে নাই ফুটিল !"

(৩)

বড় ক্ষুব্ধ—বড় অবমানিত হইয়া বিক্রমসেন ফিরিয়া আসিল। অভিমানের উষ্ণ অশ্রু তার দুটি গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে কখনও সে কাঁদে নাই,—আজ কাঁদিল। ধনগর্ব্বিতা রূপবতী নারীর অবজ্ঞায় আজ যে তাকে কাঁদিতে হইল, মনে মনে ইহাতে বড় সে লজ্জিত হইল, কিন্তু তবু কাঁদিল,—না কাঁদিয়া পারিল না। বহুক্ষণ সে কাঁদিল,—অশ্রুর অভিষেকে চিত্তের আগুণ ক্রমে কিছু শমিত হইয়া আসিল। সহসা সেই কটিবদ্ধ অসিতে তার হাত পড়িল। ধিক্ ! বীরের অসি যার কটিতে, তার চক্ষে জল ! ধনগর্ব্বিতা রূপবতী নারীর অবজ্ঞা-শক্তি কি এতই প্রবল যে তার পুরুষহৃদয়কেও এমন করিয়া অভিভূত করিল ? ধিক ! কেন সে পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিল ? কেন বীরের অসি সে কটিতে ধরিয়াছিল ? নগরপ্রান্তে নদীতীরে বসিয়া সে কাঁদিতেছিল। নিকটেই মহাদেবের মন্দির। অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া বিক্রমসেন উঠিয়া দাঁড়াইল,—মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে কটির অসি রাখিয়া প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিল,— "দেবদেব মহাদেব! ত্রিশূলপাণি ভৈরব! তেজোময় মহারুদ্র! অধমকে দয়া কর। তোমার রৌদ্রতেজ তার আহত প্রাণে সঞ্চারিত কর। তার এই অসি তোমার ত্রিশূলের অগ্নিতে অগ্নিময় হউক! এই অসির বলে যেন সে দেখাইতে পারে—না—না—মহাদেব! তাকে আশীর্ব্বাদ কর! ধনগর্ব্বজাত ভ্রান্ত দৃষ্টি তার দূর কর। অধমের যে নিয়তিই তোমার ইচ্ছা হউক,—সে যেন ধন-গর্ব্বের ও রূপগর্ব্বের দুর্ভাগ্য হইতে মুক্ত হইয়া পৌরুষের আশ্রয়ে সুখী হয়। নারীর পরমসৌভাগ্যে নারীজীবন যেন তার সার্থক হয়!"

ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বিক্রমসেন সেনানিবাসে ফিরিয়া গেল।

শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র তখন মগধের অধীশ্বর। সেই দিনই সংবাদ আসিল, বাহ্লীকের যবনভূপতি মিলিন্দ * বিপুল যবনসেনা লইয়া পশ্চিমভারতের বহুদূর

* ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বাহিরে কাবুলের উত্তরে বাহ্লীক বা বাক্ট্রিয়া রাজ্য। এই অঞ্চল তখন গ্রীক বা যবনগণের অধীনে ছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিখ্যাত অভিযানের পর এই সব গ্রীক্ বা যবনরাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্যমিত্রের শাসনকালে মিলিন্দ বা মিনাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন।

করুণ দুর্ব্বলতা যেন দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিল। চিত্তে করুণা হইলে, ব্যবহারে যদি কেহ কঠোরতা দেখাইতে চায়, সে কঠোরতা সাধারণ শিষ্টতার সীমাও ছাড়াইয়া যায়,—বড় বেশী কটু হইয়া পড়ে। সুমিত্রারও তাই হইল।—বড় নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সে কহিল, "ভাল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিক্রমসেন! যে অপার্থিব মহারত্নের লোভ দেখাইলে, তাহাতে তোমার স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে ত? তাও ত আবার আমাকেই দিতে আসিয়াছ? বিনিময়ে স্ত্রী হইতে যে রত্ন পাইতে আশা কর, তার সাহায্যেই বুঝি তাকে প্রতিপালন করিবে স্থির করিয়াছ?"

বিক্রমসেনের চক্ষু মুখ যেন জ্বলন্ত অগ্নির আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্ফীত বক্ষে উন্নত শিরে আহত পৌরুষদর্পে সে সুমিত্রার দিকে চাহিল। কটিতে অসি ছিল,—কোষমুক্ত করিয়া দৃঢ়হস্তে সেই অসি সম্মুখের দিকে ধরিয়া সে কহিল, "সুমিত্রা! আমি পুরুষ। পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল এই অসি আমার করে। এই অসির সাহায্যে রাজাধিরাজ দুহিতাকেও প্রতিপালন করিতে আমি সমর্থ। স্ত্রীর প্রেমরত্ন পুরুষের সংসারজীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ,—তার দ্বারা স্ত্রীকে কেহ প্রতিপালন করে না।"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "অবলা নারীর সমক্ষে অসি আস্ফালন করা বিশেষ পৌরুষের পরিচায়ক নহে। বৃথা আস্ফালন না করিয়া, এই অসির বলে বাস্তবিক সামর্থ্য তোমার কতদূর হইতে পারে, দেখাও। তারপর আসিও, এখন বিদায় হও!"

লজ্জায় বিক্রমসেনের বিবর্ণ মুখ আবার নত হইল। আর কিছু না বলিয়া সে ধীর পাদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

অজ্ঞাতে একটি নিশ্বাস সুমিত্রার বক্ষ ও নাসিকা স্পন্দিত করিয়া বাহির হইল। সখী বিচিত্রা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "বড় ভুল করিলে সুমিত্রা। যে রত্ন কামনা করিতেছিলে, হাতে পাইয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে।"

সুমিত্রা উত্তর করিল, "কি ছাড়িলাম বিচিত্রা? কিছু কি দেখিলাম?"

"যে চক্ষুতে দেখিবে, সাধ করিয়া যদি তা বুজিয়া থাক, তবে কে দেখাইতে পারে?"

"কোথায় সে চক্ষু বিচিত্রা?"

বিচিত্রা উত্তর করিল,—"ফুটিয়াছিল, ফুটিতেছিল। কিন্তু ফুটিতে ফুটিতেই যে চাপিয়া ঢাকিয়া দিলে সখী?"

"যদি চাপিয়া ঢাকিয়াই থাকি, জোরে যদি আবার তা কেহ খুলিয়া দিতে পারে, তখন ফুটিবে।"

"সে জোর লইয়া যদি কেহ আর না আসে?"

"সে চক্ষু আর তবে নাই ফুটিল!"

(৩)

বড় ক্ষুব্ধ—বড় অবমানিত হইয়া বিক্রমসেন ফিরিয়া আসিল। অভিমানের উষ্ণ অশ্রু তার দুটি গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে কখনও সে কাঁদে নাই,—আজ কাঁদিল। ধনগর্ব্বিতা রূপবতী নারীর অবজ্ঞায় আজ যে তাকে কাঁদিতে হইল, মনে মনে ইহাতে বড় সে লজ্জিত হইল, কিন্তু তবু কাঁদিল,—না কাঁদিয়া পারিল না। বহুক্ষণ সে কাঁদিল,—অশ্রুর অভিষেকে চিত্তের আগুণ ক্রমে কিছু শমিত হইয়া আসিল। সহসা সেই কটিবদ্ধ অসিতে তার হাত পড়িল। ধিক্! বীরের অসি যার কটিতে, তার চক্ষে জল! ধনগর্ব্বিতা রূপবতী নারীর অবজ্ঞা-শক্তি কি এতই প্রবল যে তার পুরুষহৃদয়কেও এমন করিয়া অভিভূত করিল? ধিক! কেন সে পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিল? কেন বীরের অসি সে কটিতে ধরিয়াছিল? নগরপ্রান্তে নদীতীরে বসিয়া সে কাঁদিতেছিল। নিকটেই মহাদেবের মন্দির। অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া বিক্রমসেন উঠিয়া দাঁড়াইল,—মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে কটির অসি রাখিয়া প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিল,—"দেবদেব মহাদেব! ত্রিশূলপাণি ভৈরব! তেজোময় মহারুদ্র! অধমকে দয়া কর। তোমার রৌদ্রতেজ তার আহত প্রাণে সঞ্চারিত কর। তার এই অসি তোমার ত্রিশূলের অগ্নিতে অগ্নিময় হউক! এই অসির বলে যেন সে দেখাইতে পারে—না—না—মহাদেব! তাকে আশীর্ব্বাদ কর! ধনগর্ব্বজাত ভ্রান্ত দৃষ্টি তার দূর কর। অধমের যে নিয়তিই তোমার ইচ্ছা হউক,—সে যেন ধন-গর্ব্বের ও রূপগর্ব্বের দুর্ভাগ্য হইতে মুক্ত হইয়া পৌরুষের আশ্রয়ে সুখী হয়। নারীর পরমসৌভাগ্যে নারীজীবন যেন তার সার্থক হয়!"

ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বিক্রমসেন সেনানিবাসে ফিরিয়া গেল।

শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র তখন মগধের অধীশ্বর। সেই দিনই সংবাদ আসিল, বাহ্লীকের যবনভূপতি মিলিন্দ * বিপুল যবনসেনা লইয়া পশ্চিমভারতের বহুদূর

* ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বাহিরে কাবুলের উত্তরে বাহ্লীক বা বাক্ট্রিয়া রাজ্য। এই অঞ্চল তখন গ্রীক বা যবনগণের অধীনে ছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিখ্যাত অভিযানের পর এই সব গ্রীক্ বা যবনরাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্যমিত্রের শাসনকালে মিলিন্দ বা মিনাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন।

অধিকার করিয়া পাটলীপুত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পুষ্যমিত্র তাঁহার সৈন্য সহ অবিলম্বে যবনরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিক্রমসেন সানন্দ উৎসাহে যুদ্ধযাত্রা করিল।

অসিতে তার কত বল আছে, অসির বলে তার পুরুষোচিত সমর্থ্যও যে কত বড় হইতে পারে, তাহা দেখাইবার বহু অবসর এই যুদ্ধে বিক্রমসেন পাইল।

সামান্য সৈনিক হইতে অচিরেই অন্যতম সেনানায়কের পদে সে উন্নীত হইল। রাজসম্মানে ও বহু পুরস্কারে সে গৌরবান্বিত হইল। তাহার খ্যাতি পাটলীপুত্রেও প্রচারিত হইল। উচ্চপদে উঠিয়া সামরিক প্রতিভা দেখাইবার আরও অবসর বিক্রমসেন পাইল,—আরও উচ্চপদে সে উঠিল। মহারাজ তাহাকে তাঁহার প্রধান একজন সমরসহায় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যবনরাজ মিলিন্দ পরাভূত হইয়া বাহ্লীকে পলায়ন করিলেন। উত্তরপশ্চিমের সীমান্তপ্রদেশের রক্ষার ভার বিক্রম-সেনের উপরেই অর্পণ করিয়া পুষ্যমিত্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিভা ছিল, প্রতিভা প্রকাশেরও সুযোগ বিধাতা মিলাইলেন। বৎসরাধিক কালের মধ্যেই বিক্রমসেনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। অপরিচিত দীন সৈনিক আজ সাম্রাজ্য মধ্যেএকজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিল। আরও একবৎসর গেল। শত্রু বিধ্বস্ত প্রদেশে সম্পূর্ণ শান্তিস্থাপন করিয়া বিক্রমসেন সম্রাটের অনুমতি লইয়া কিছুদিনের জন্য পাটলীপুত্রে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় আজ সে রত্ন, যাহার লাভে তার পৌরুষের, তার শৌর্য্যের, তার প্রতিভার পুরস্কার আজ পূর্ণ হইবে? বিক্রমসেন শুনিল, তার সম্পত্তি দেবসেবায় দান করিয়া সুমিত্রা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম আঘাতের তীব্র বেদনা কথঞ্চিৎ শমিত হইল। মহারাজার আদেশ লইয়া দুই বৎসরের জন্য বিক্রমসেন তীর্থভ্রমণে বাহির হইল। হায়, ভারতের কোনও তীর্থেও কি সুমিত্রার সন্ধান মিলিবে না?

(৪)

"বিক্রমসেন! তোমার এ করুণায় আজ কৃতার্থ হইলাম। তোমার রত্ন তুমি আজি বড় উজ্জ্বল করিয়া লইয়া আসিয়াছ। কিন্তু বিনিময়ে আমি কি দিব? কিছুই যে আজ আমার সম্বল নাই।"

"সুমিত্রা! যে রত্ন আমার কাম্য ছিল,—যে রত্নের আশায় বৎসরাধিককাল বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়া মহাদেবের কৃপায় আজ এই পুণ্য পুষ্করে তোমার সাক্ষাৎ

পাইলাম,—সে রত্ন তোমার মলিন হয় নাই, বরং অনেক বেশী উজ্জ্বল হইয়াছে।"

"না—না—বিক্রমসেন! আর ওকথা বলিয়া আমাকে ব্যথা দিওনা,—লজ্জা দিওনা। যখন চাহিয়াছিলে, রত্ন আমার কিছু ছিল না। তুমি চলিয়া গেলে বুঝি পাইয়াছিলাম। কিন্তু আজ এ মলিন বিকৃত আধারে তা বড় মলিন, বড় বিকৃত হইয়াছে। তোমার ও রত্নের বিনিময়ে আর তা তোমাকে দিতে পারি না।"

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া সুমিত্রা দুইহাতে মুখ ঢাকিল।

বিক্রমসেন ধীরে তার হাত দুটি সরাইয়া স্নেহে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিল, "সুমিত্রা! তোমার সম্পদ আমি কখনও চাই নাই, তোমার রূপমোহে নয়ন মুগ্ধ হইলেও আমার প্রাণের কাম্য সেই রূপের সম্ভোগও ছিল না। রোগে আজ তোমার রূপ বিকৃত হইয়াছে,—কিন্তু যে রত্ন আমি কামনা করিয়াছিলাম, এখনও যা বড় আগ্রহে কামনা করি, যার আশায় আমার বড় সাধের অসি ছাড়িয়াও বৎসরাধিক তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছি,—বিকৃত আধারেও তা আজ আমার চক্ষে অনেক বেশী উজ্জ্বল হইয়াছে। আধারের সকল বিকার সে উজ্জ্বলতায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সুমিত্রা, আমার যে রত্ন, তা আজ তোমার পায়ে ফেলিয়া দিতেছি। না দিতে চাও, বলে তার বিনিময়ে তোমার রত্ন আমি গ্রহণ করিব। আমার অসিতে আজ সে বল আছে। না দিয়া রাখিতে পারিবে কি?"

বলিতে বলিতে বিক্রমসেন, প্রাণভরা আবেগে সুমিত্রাকে তার বিশাল বক্ষে চাপিয়া ধরিল। সুমিত্রাও অশ্রুসিক্ত মুখখানি সেই প্রেমময় বক্ষের আশ্রয়ে রাখিয়া ক্রন্দনজড়িত অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে কহিল, "বলে যদি গ্রহণ কর বিক্রমসেন, রাখিতে আমি পারিব না। কিন্তু দেবতার যোগ্য নিষ্কলঙ্ক কুসুমাঞ্জলি আজ দেবতার পায়ে দিতে পারিলাম না,—পূজা আমার ব্যর্থ হইল।"

বিক্রমসেন স্নেহে সুমিত্রার বিকৃত বিবর্ণ কপোলে চুম্বন করিয়া কহিল, "যদি তাই বল সুমিত্রা,—তবে তার উত্তর এই,—ভক্তের দেওয়া কীটদষ্ট শুষ্ক কুসুমাঞ্জলি, অপ্সরার হাতে গাঁথা পারিজাতমালার চেয়েও অধিক আদরে দেবতারা শিরে ধরেন।"

কলহান্তরিতা।

কোথায় তোমার শান্ত দিঠি
কোন আলোকে পদ্ম ফুটায়?
দেখে চলন ভঙ্গী তব
কোন লতিকা পথে লুটায়?
মুখের মারুত গন্ধ দিয়ে
কোন বাতাসে যুঁইকে হারায়,
শতেক বীণা ঝঙ্কৃত হয়
কর্ণে কাহার কথার সাড়ায়?
তোমার দরশ ভাগ্যবানে
পেয়ে জীবন ধন্য মানে,
আভাগী হায় আমিই ওগো
আমি চেয়ে পথের পানে।
তোমার শুচিস্মিতের স্মৃতি
মোর পরাণে সায়ক হানে
পুণ্য দেশের ধন্য তারা
হাস্য চুমে কথার তানে।
গোময় লেপা আঙ্গিনাতে
তব চরণ চিহ্ন মাগি,
কালো কাক চক্ষু জ্বলে
অঙ্গ পরশ থাকুক লাগি,—
বিষাক্ত বাণ বাক্য তব
আমার হৃদে বহুক জাগি,
চাই না সুখ শান্তি তব
দিও হতে দুখের ভাগী।

শ্রীএককড়ি দে।

আলোকে ও আঁধারে।

সামাজিক নাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—গুপ্ত সাহেবের গৃহ।

মহিম ও নীলিমা।

নীলি। মিষ্টার গ্যাপ্ট্।

মহি। কি নেলী?

নীলি। এ সব কি শুন্‌তে পাচ্চি?

মহি। কি শুন্‌তে পাচ্চ নেলী?

নীলি। তুমি বড় বেশী দেনা ক'রেছ?

মহি। তা কি তুমি আজ নূতন শুনলে নেলী? আয় আমার অতি কম, খরচ এত বেশী। প্রায় ত সব দেনা ক'রেই চালাচ্চি।

নীলি। আয় কম, সে কার দোষ? কেন, আয় ক'ত্তে পার না কেন? কত লোক যে রোজ হাজার টাকা ক'রে আয় ক'চ্চে। নিতান্ত অপদার্থ তুমি, তাই এই সামান্য খরচটাও নিজের আয়ে চালাতে পার না।

মহি। কি ক'র্‌ব? যা আছি,—তা আছি। এর চাইতে বেশী পদার্থ বিধাতা আমাকে দেন নি!

নীলি। এ কথা আগে কেন বিবেচনা কর নি? বিলেত গিয়ে পরের এত গুলি নষ্ট ক'রে এসেছ,—এখন ব'লছ রোজগার ক'ত্তে পারি না। ধিক্ তোমাকে! একটু লজ্জা হয় না তোমার?

মহি। হ'লেই বা এখন উপায় কি? তুমি ধিকার দিচ্ছ—দেও! যত খুসী ধিক্কার দেও! কিছু ব'ল্‌ছিও না,—ব'লবও না।

নীলি। ব'ল্‌তে বড় বাকী রাখ্‌ছ কি না? আবার কি ব'ল্‌বে? যে ভাবে তুমি কথা গুলি নিচ্চ আর তার উত্তর দিচ্চ—স্পষ্ট কথায় না ব'ল্লেও তোমার মনের ভাব, যা তুমি ব'ল্‌তে চাও, স্পষ্ট সব বোঝা যাচ্চে। একটু শিক্ষার

শিষ্টতার ভাণ যারা করে, তারা এর চাইতে স্পষ্ট ক'রে কোনও নিষ্ঠুর কাউকে বলে না। স্পষ্ট কথা বরং ভাল, চাষার খোলা গালাগাল তবুও যায়,—কিন্তু এ সব নিষ্ঠুর ইঙ্গিত, শিষ্টতার আবরণে ঢাকা এই যে হৃদয়হীন ব্যবহার,—অন্ধকারে কাপুরুষ শত্রুর বিষের ছুরীর আঘাতের মতই সহ্য।

মহি। তুমিও বড় বাড়াবাড়ি ব'লছ নেলী! কি এমন নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আমি চ? তুমি গাল দিচ্ছ, ধিক্কার দিচ্ছ, শ্লেষ কচ্ছ,—আমি ত সয়েই যাচ্ছি, কিছুই ব'লছি না।

নীলি। আমি গাল দিচ্ছি! ধিক্কার দিচ্ছি! শ্লেষ ক'চ্ছি! এই সব কঠোর অভিযোগ ক'চ্ছ তুমি! কি গাল দিইছি আমি? কি এমন ধিক্কার দিইছি? শ্লেষই কি ক'ল্লুম? আর যদি করেই থাকি, অন্যায় ক'রেছি কিছু?

মহি। আমি কি ব'লছি যে অন্যায় ক'রেছ?

নীলি। ব'লছ না ত তুমি কিছুই। অথচ না ব'লছ যে কি, তা ত দেখতে পাচ্ছি।

মহি। কি ব'লছি নেলী?

নীলি। কি না ব'লছ? বাকী কি রাখছ? এ ত সামান্য কথা,—সকল ব্যবহারে, বহু ইঙ্গিতে, এই কথাটাই তুমি অবিরত আমাকে বুঝতে দিচ্ছ, যেন আমার জন্যই তোমার বড় বেশী খরচ হ'চ্ছে, আমার জন্যই তুমি দেনায় প'ড়েছ, আমার জন্যই তোমার আজ এই শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত,—যে দুর্ভাগ্যের কথা মনে ক'ত্তেও আমি শিউরে উঠছি, আমার কোমল দুর্ব্বল অবসন্ন স্নায়ুতে একেবারে মরণের আঘাত এসে লাগছে!

মহি। ব'ল্লে আর কি ক'র্‌ব? আমি নাচার!

নীলি। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জর ক'রে এখন নাচার ব'লে এড়াতে চাও! তোমাদেরই রকমই ওই! যেন কত উৎপীড়ন নিরুপায় হয়ে নীরবে সহ্য কচ্ছ! খরচ! খরচ! কেবলই ঐ এক কথা—এক ইঙ্গিত! কি এমন খরচ ক'রেছি আমি? যে শিক্ষা পেয়ে, সম্পন্ন পিতার ঘরে শিক্ষার উপযোগী যে পরিমার্জ্জিত জীবনে আমি অভ্যস্ত হয়েছিলুম, তার মত কিছু কি আমায় দিতে পেরেছ? সেই রকম পরিমার্জ্জনার সুখে আমায় রাখবে ব'লেই বাবা এত টাকা খরচ ক'রে তোমায় বিলেত পাঠিয়েছিলেন, তোমার সক মেটাতে নয়। সে টাকার বিনিময়ে কি তুমি আমায় দিয়েছ? ম'রে

যাই, তাতেও দুদিনের জন্য কোন হিলে পর্য্যন্ত আমায় পাঠাতে পাল্লে না। আবার খরচ করি ব'লে মনে মনে গাল দিচ্ছ? সে টাকা আজ আমার থাক্‌লে এর চাইতে অনেক বেশী খরচ ক'রে অনেক বেশী সুখে আমি থাকতে পাত্তুম!

মহি। আজ আর এ কথা কেন নেলী? সে উপদেশ তখন তাঁকে দিলেই পাত্তে?

নীলি। বড় অপরাধ হয়েছিল আমার! সে উপদেশ যদি কেউ তখন তাঁকে দিত, কোথায় আজ থাক্‌তে? কে তোমায় আজ চিন্‌ত? যে বুনো মায়ের ঘরে জন্মেছ, ঠিক তেমনি বুনো হ'য়ে পাড়াগেঁয়ে জঙ্গলে পড়ে থাক্‌তে আজ হ'ত।

মহি। নেলী, আর যা বল সহ্য ক'র্‌ব। কিন্তু আমার মার কথা কিছু অমন রূঢ় ভাবে ব'লো না। তোমার খাতিরে তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার আমি ক'রেছি, তাই যথেষ্ট। আর নয়। তাঁকে উল্লেখ ক'রে ও সব কথা যদি বল, আমি আর সহ্য কর্‌ব না।

নীলি! সহ্য ক'র্‌বে না! কি করবে তবে? ইস্! তবু যদি এই অভিমানের মূলে আপনার ক্ষমতা কিছু থাক্‌ত! যাক্, আমারও আর সে কথা উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন নাই। সে দারুণ লজ্জার কথা যত ভুল্‌তে পারি, ততই ভাল। যাক্, এ সব বাজে কথা এখন থাক্! যা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলুম, তার উত্তর দাও।

মহি। কিসের উত্তর? কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলে নেলী?

নেলী। তোমার দেনার কথা, শুন্‌তে পেলুম সর্ব্বনেশে রকম দেনা ক'রেছ!

মহি। নেলী, দেনা যে আমার খুব বেশী, তাতে যে, যে কোনও সময় আমাকে পথে ব'স্‌তে হ'তে পারে, এতদিন বুঝ্‌তে না পেরে এটা যদি তুমি কেবল আজই শুনে থাক, তোমার বুদ্ধির তেমন প্রশংসা ক'ত্তে পারি না।

নীলি। কি! অসভ্য বর্ব্বর! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! আমার শিক্ষা দীক্ষার, আমার উন্নত ভাব রুচি ও চিন্তার, আমার উন্নত সামাজিক মর্য্যাদার— যতদূর হ'তে পারে অবমাননা তুমি ক'রেছ,—এখন আমার মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত অবমাননা ক'চ্চ? সাবধান মিষ্টার গ্যাপ্ট! সব সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আমার মস্তিষ্কের অবমাননা, শিক্ষিতা উন্নতিশীলা মহিলা আমি—আমার মস্তিষ্কের এই অবমাননা—কখনও আমি সহ্য ক'র্‌ব না! জেনো, তুমি যে মস্তিষ্ক পেয়েছিলে, তার চেয়ে অনেক উঁচুদরের মস্তিষ্ক জন্মের সময় আমি পেয়েছিলুম।

ও গড্! গড্! এই নিষ্ঠুর রাক্ষসের হাতে কত আর পীড়িত আমায় ক'র্‌বে! ওঃ! (রোদন)

(মহিমের প্রস্থানোদ্যম)

ও কি! অসহায় নারীকে এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত ক'রে এখন কাপুরুষের মত পালিয়ে যাচ্চ? মিষ্টার গ্যাপ্ট! বাঃ! মিষ্টার গ্যাপ্ট! যেও না, শোন! আমি মিনতি ক'চ্চি, প্রার্থনা ক'চ্চি, শোন! আমার সব কথা এখনও শেষ হয় নি।

মহি। (ফিরিয়া) আর কি বাকী আছে নেলী?

নীলি। বাকী! কথা ত হ'লই না কিছু। ব'লবার অবসরই ত পাচ্চিনি। যা ব'ল্‌তে যাচ্চি, অম্‌নি আগুণ হ'য়ে উঠ্‌ছ!

মহি। কি, বল। কাজের কথা যদি কিছু থাকে, সংক্ষেপেই ব'ল্‌তে অনুরোধ করি।

নীলি। সংক্ষেপেই ব'ল্‌ছি। তোমার সঙ্গে সুদীর্ঘ কথোপকথন আমার পক্ষে এখন বড় সুখকর নয়—জান্‌বে!

মহি। তা—বল।

নীলি। শুন্‌তে পেলুম, দেনা শুধ্‌তে পাচ্চ না, নালিশ হ'চ্চে,—নিজের খরচ চালাতে কি দেনার কিছু শুধ্‌তে অর্থ সংগ্রহ ক'ত্তে আর কোথাও তুমি পার্‌বে না। ক্রেডিট্ (credit) তোমার কোথাও কিছুই নেই! সব সত্যি?

মহি। হাঁ, নেলী।

নীলি। আমাকে ত নির্ব্বোধ ব'ল্‌ছিলে। 'আয়ের চাইতে ব্যয় যে বেশী ক'রে, যেদিনই হ'ক্, দেউলে তাকে হ'তেই হবে',—এই সহজ কথাটাও মাথায় তোমার ঢোকেনি? লেখাপড়া শিখেছ, কোন বইতেও একথাটা পড়নি?

মহি। বইয়ে আমরা অনেক কথাই প'ড়ে থাকি নেলী! হায়, তার হাজার কথার মধ্যে একটিও যদি পালন ক'ত্তে পাত্তুম!

নীলি। থাম! এখন অসময়ে তোমার মত লোকের মুখে ও অনুতাপের ছাঁদুনি ভাল শোনায় না। তা এখন কি হবে?

মহি। এ অবস্থায় যা হ'য়ে থাকে, তাই হবে!

নীলি। হবে ত এই যে আমাদের বসতি (establishment) ভেঙ্গে দিতে হবে,—জিনিশ পত্র সব নিলেম করে নিয়ে যাবে,—তোমাকে হয় জেলে যেতে হবে, না হয় 'দেউলে' ব'লে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে?

মহি। হাঁ, সব ঠিক নেলী।

নীলি। বড় উচুমুখ ক'রে তাই এখন ব'লছ! একটু লজ্জা হয় না তোমার?

মহি। উচুমুখের কিছুই নেই নেলী। লজ্জায় মুখ বড় নীচু ক'রেই ব'লছি।

নীলি। যেন আমারই সে দোষ!

মহি। তোমার ত কিছু দোষ দিচ্চিনি নেলী?

নীলি। দোষ দিলে ত ভালই ছিল,—তা সহ্য ক'ত্তে পাত্তুম। কিন্তু আমার যে একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রেছ তুমি! নিজে ত ডুবেছই,—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পর্য্যন্ত বেঁধে রেখেছ, অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছ!

মহি। আমি ডুবেছি, ডুবছি। তোমার ইচ্ছা হয়, বাঁধন খুলে উপরে ভেসে উঠ্‌তে পার।

নীলি। কি ক'রে তা হ'তে পারে?

মহি। জানি না। তোমার আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে উপদেশ নিয়ে যা ভাল হয় ক'ত্তে পার।

নীলি। যদি মানুষ হও, বুদ্ধির দোষে নিজের যে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছ, তাতে আমিও জড়িয়ে মারা না যাই, তার একটা ব্যবস্থা তোমারই ক'রে দেওয়া উচিত।

মহি। কি ক'ত্তে বল?

নীলি। আমি ব'লব? তুমি পুরুষ, তুমি স্বামী, স্ত্রীকে বিপদ থেকে রক্ষা ক'ত্তে হ'লে কি ক'ত্তে হয়, তা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব? ধিক্! বিবাহ যখন ক'রেছিলে, তখন কি এটা মনে মনে হিসেব করনি যে বিপদে তোমার স্ত্রীকে তোমার রক্ষা ক'ত্তে হবে?

মহি। নেলী, আমাকে দেউলে হ'তে হবে, না হয় জেলে যেতে হবে। শীঘ্র তোমাকে প্রতিপালন করবার ভার নিতে পারব, এমন সম্ভাবনা দেখি না—তা ছাড়া——

নীলি। তোমার প্রতিপালনের ভরসা আমি কিছু রাখি না। আমার নিজের যা সম্পত্তি আছে, তাতেই দরিদ্র স্ত্রীলোকের মত কোনও মতে আমার দিন চলে যেতে পারে। না হয় কাজকর্ম্মই কিছু করব। এখন তোমার দেনার দায়ে আমার সামান্য সম্পত্তি যা আছে, তা নষ্ট না হয়, তার একটা ব্যবস্থা তোমার ক'রে দেওয়া উচিত কিনা, তা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে পার।

মহি। তোমার সম্পত্তি তোমার। তোমারই মামার হাতে তা আছে। আমার পাওনাদার কেউ তাতে হাতও দিতে পারবে না।

নীলি। কিন্তু আমার যা সব জিনিশপত্র তোমার বাড়ীতে আছে? যদি কালই আদালতের লোক এসে তা ক্রোক করে?

মহি। জিনিশপত্র বাড়ীতে যা কিছু আছে, সব নিয়ে তুমি আজই কোথাও চ'লে যেতে পার। সবই তোমার। আমার কিছুই নাই।

নীলি। তাতে সব নিরাপদ হবে ত নেলী?

মহি। আর ত কিছু ক'রবার নাই।

নীলি। আমি স্ত্রীলোক, আইন ভাল জানিনি। আমার মনে হয়, আমার সব সম্পত্তি পৃথক ক'রে judicial separation * এর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেই সব চেয়ে ভাল হয়। আজ সম্পত্তির জন্য কেবল নয়, তোমার সঙ্গে স্বামী স্ত্রী ভাবে একত্র এক বাড়ীতে বাস করা এ জীবনে আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মহি। তার কিছু দরকার নেই। সে দাবী আমি কখনও আর ক'রব না, ক'রবার সামর্থ্য কি ইচ্ছাও আর হবে না।

নীলি। তোমার কথার উপরে নির্ভর ক'ত্তে পারি, এমন কিছু প্রমাণ আমি এ পর্য্যন্ত পাইনি। আমি চাই, এর একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা এখনই হ'য়ে যাক্।

মহি। তা ক'ত্তে চাও, তোমার আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় কর।

নীলি। তুমি ক'রে দেবে না? পিতৃহীনা এই অবলা নারীর প্রতি যে অন্যায় ক'রেছ, তার শেষ প্রতিকার যা একটু হ'তে পারে, তারও ব্যবস্থা আজ ক'রবে না? কাপুরুষ! স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে বিপদে রক্ষা ক'ত্তে হাতের একটি আঙ্গুলও তুলবে না?

মহি। নেলী! judicial separation যে চায়, তাকেই তার জন্য আদালতের সাহায্য নিতে হয়।

নীলি। তুমি কি চাও না?

মহি। না!—আজ আমার বিপদে তোমার সম্পত্তির ক্ষতি কিছু হবে না। ভবিষ্যতেও আমা হ'তে তোমার কোনও অসুবিধা হবে, তার সম্ভাবনা কিছু

* আদালতের ব্যবস্থায় স্বামীর স্ত্রীর পৃথক ভাবে বাস।

নাই। আমার স্ত্রীর সকল দায়িত্ব থেকে আজ তোমাকে সম্পূর্ণ মুক্তি আমি দিচ্চি। তুমি যদি সন্তুষ্ট এতে না হও, পৃথক ভাবে আমার সকল দাবী হ'তে মুক্ত থাকতে আদালতের ব্যবস্থাই চাও,—তোমার আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাদের সাহায্য নিয়ে তার চেষ্টা দেখ্‌তে পার। আমার আর কিছু করবার নাই। (প্রস্থান)

নীলি। ও গড! গড! শেষে আমার এই হ'ল? আমার স্বামী পর্য্যন্ত বিপদে আমায় ত্যাগ করল! (রোদন)

ক্রমশঃ।

ভরাসাঁঝ।

আঁধার আসে আকাশ ছেয়ে বাতাস বহে ধীর
নিকষ কালো নদীর নীরে সন্ধ্যা নামে থির।
অস্ত-অচল-অলস-পারে সেরে দিনের কাজ
রক্ত রবির রঙিন রেখা ঘুমাতে চায় আজ।
নীরব নিশার নিবিড় নেশা ঘনায় বিশ্ব-চোখে,
আকুল গানের গভীর তালে শ্রান্ত দিনের শোকে।
মাঠের পথে "পল্লী-বধূ" সন্ধ্যা-প্রদীপ হাতে,
সভয় সলাজ দ্রুত-চরণ, চলে মন্দির-বাটে
বিশ্বের ওই "আরাধনা," সাথে ল'য়ে ভক্তিরে,
চ'লেছে আজ পূজন যেথা বিশ্বের সে মন্দিরে।
প'ড়্‌ছে মনে, "এখনও যে প'ড়ে অনেক কাজ
মাথার ওপর গ'র্জ্জে আসে এমন ভরা-সাঁঝ!"
ভ্রূক্ষেপ নেই ব'সে আছি গভীর-শান্তি-সুখে,
সুন্দর সে শোভন ছবি বিস্তৃত ওই সম্মুখে।

শ্রীসুহৃৎকুমার বসু।

পূজা-উপহার।

মানস কাননে সরলতা ফুলে
ধৌত করিয়া নয়ন সলিলে,
ভক্তি-চন্দন মাখা'য়ে তাহায়,
পারিলে, জননি, দিতে উপহার
তোমার চরণে, পারিতে কি আর
রাখিতে বঞ্চিত তোমার দয়ায়?

শ্রীপাগলচন্দ্র সেন।

বুড়াবুড়ী।

ওরা এসে দাঁড়িয়েছে আজ
নায়ের লাগি ভবের কূলে,
রসানচৌকী বাজাক টোড়ি
হুলু দিতে যাসনে ভুলে।
সেদিন বিয়ের পালকী এলো
মহোল্লাসে গ্রামটি ঘুরি,
দাঁড়াল হায় ছালনাতলায়
স্নিগ্ধ দুটি ফুলের কুঁড়ি;
পা ডুবায়ে আলতা দুধে
বক্ষে লয়ে আশার আলো
সে দিনের সে বর ও বধূ
কেমন করে বদলে গেল?

সলাজ আঁখি, বদনবিধু
স্নিগ্ধ আরো ঘোমটা ঘামে,
শিউরে উঠে লজ্জাবতী
শুচিস্মিতা পতির নামে।
নূতনতর নিতুই খোঁপা
ছিল আকর সৌরভেরই
কপোল তলে তিলটি ছোট
ছিল কতই গৌরবেরই,
আঁংটা ও মল ঝুমঝুমিয়ে
ফুটাইত পদ্ম ঘরে
সে দিনের সে নূতন বধূ
বদলে গেল কেমন করে?

তার পরে সেই খোকায় লয়ে
কতই সোহাগ মনেই আছে।
ধীরে ধীরে ঘোমটা ওগো
উঠলো গিয়ে মাথার কাছে।
বধূত্ব হায় ডুবলো যেন
মাতৃত্বেরি অহঙ্কারে,
খুলে গেল স্নেহের নিঝর
স্তন্যধারার পুণ্যধারে।
ব্যস্ত সদাই নিয়ে খোকার
ঝিণুক এবং 'কাজলপাতা'
কেমন করে বদলে গেল
সে দিনের সে খোকার মাতা?

গাঁটছালা ত তেমনি বাঁধা
সিঁথীর সিঁদুর যাচ্ছে দেখা,
সাঁজের রবির লোহিত আলো
নয় কি ওগো অরুণ রেখা?
কই সে আলো গন্ধ মধু
কই প্রভাতের মুক্তাধারা?
ধরার বাসি কুসুম ওকি
গন্ধ এবং বৃন্ত হারা?
না, না, ধরা তারাই বটে
বৃথা তোমার নয়ন ঝরে,
যাচ্ছে তোমার কন্যা জামাই
বাসর জেগে আপন ঘরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শ্রেষ্ঠতা।

শোভিছে রজনী ল'য়ে সহস্র লোচন,
দিবসের আছে শুধু একটি নয়ন;—
সহসা মুদিলে সেই এক আঁখি তার,
নিখিল সংসার হয় ঘোর অন্ধকার।

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

সাময়িক ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

নূতন সমরসচিব।

লর্ডকিচেনারের শোচনীয় মৃত্যুর পর মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ ইংলণ্ডের সমর সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজনৈতিক উচ্চ প্রতিভায় ইনিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদিন ইনি সমরবিভাগেই কার্য্য করিতেছিলেন। যুদ্ধের জন্য গোলাবারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত ও সরবরাহাদি কার্য্যের বিশেষ ব্যবস্থার জন্য সমরবিভাগে একটি নূতন শাখা খোলা হয়। লয়েড জর্জ্জ সাহেবের উপর এই বিভাগের কর্তৃত্বভার দেওয়া হইয়াছিল। এই দায়িত্ব যে তিনি যথাযোগ্য ভাবেই পালন করিতেছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিচেনার স্মৃতি।

ভারতের রাজগণ লর্ড কিচেনার বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। ঢোলপুরের মহারাজার প্রস্তাবে, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, কাশ্মীর, জয়পুর, বিকানীর, কোটা, পান্না, জিন্দ এবং কচ্ছ রাজ্যের রাজগণ এবং ভূপালের বেগম সাহেবা, চাঁদা প্রার্থনা করিয়া অন্যান্য রাজগণের নিকট পত্র দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজারের অধিক চাঁদা উঠিয়াছে। যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোনও স্থায়ী হিতকর অনুষ্ঠানে এই অর্থ সমর্পণ করা হইবে। সেই অনুষ্ঠান যে কি হইবে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুর তাহা স্থির করিবেন।

লর্ড কিচেনার উচ্চ প্রতিভাবান্ রণকুশল বীরপুরুষ ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতেরই প্রধান সেনাপতি তিনি ছিলেন। বলা বাহুল্য, ভারতের রাজগণের উদ্যোগে ভারতে এইরূপ কোনও অনুষ্ঠানে তাঁহার স্মৃতির যথাযোগ্য সম্মানই হইবে।

মহারাজার দান।

মহামান্য কাশী নরেশ বাহাদুর সৈনিক হাঁসপাতালের জন্য একটা বড় বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন। দেড়শত সৈনিকের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা এখানে হইবে,—ব্যয় মহারাজাই বহন করিবেন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য একখানি প্রেট্রল লঞ্চও তিনি দান করিয়াছেন। ভারতের রাজপ্রতিনিধি এই দান গ্রহণ করিয়া মহারাজকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

নারীর দান।

সম্প্রতি স্বর্গীয় বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের বিধবাপত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। এই মহাপ্রাণা হিন্দু মহিলা তাঁহার সমস্ত স্ত্রীধন তাঁহার জমিদারীর মধ্যে একটি বিদ্যালয় ও চিকিৎসালায় স্থাপন করিবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদের সম্পদ আছে, মৃত্যুকালে ইহা অপেক্ষা বড় দান আর কি হইতে পারে? দয়ার দেবতারা ইঁহাদেরই জন্য দিব্যধামে উচ্চ আসন রাখিয়াছেন

হিন্দুর দান।

কলিকাতার অন্যতম ধনী মহাজন ও জমিদার শুকলাল করনাম গত পাঁচ বৎসরে লোক হিতকর অনুষ্ঠানে চারিলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সম্রাটের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে বিপন্ন অধমর্ণগণকে লক্ষাধিক টাকার ঋণ হইতে তিনি মুক্তি দিয়াছিলেন।

শিক্ষিত বাবু সমাজের বাহিরে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর মধ্যে এরূপ উচ্চনিনাদ-বিহীন নীরব দান বিরল নহে।

শিক্ষিতের দান।

সম্প্রতি পুরীধামে অবসর প্রাপ্ত সব জজ রায় দুর্গাদাস বসু বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। উইল করিয়া তিনি ৫৫০০০৲ টাকা বহুলোক হিতকর অনুষ্ঠানে দান করিয়াছেন। প্রধান প্রধান দান গুলি নিম্নে দেওয়া হইল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট্ ২০০০০৲, বিজ্ঞান-সমিতি (Science Asscciation) ৫০০০৲, রামমোহন লাইব্রেরী ২৫০০৲, চৈতন্য লাইব্রেরী ২৫০০৲, মহাকালী পাঠশালা ১০০০৲, রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি ১১০০০৲, শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতি ১০০০০৲।

উদারপ্রাণ উন্নতবুদ্ধি স্বদেশহিতৈষী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির যোগ্য দান ইহাই। এইরূপ দান যাঁহারা করিতে পারেন, উচ্চশিক্ষা তাঁহাদেরই সার্থক।

কারামুক্তির উপায়।

শোনা যায়, নোয়াখালি জেলের কতকগুলি কয়েদীকে ঝাড়ুদার ও মেথরের কাজ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইবে। ফিরিয়া আসিলে তাহারা কারামুক্ত হইবে।

তীর্থে দেবসেবায় পাপক্ষয় হয়। আমাদের মা রণরঙ্গিণী, সুতরাং রণক্ষেত্র আমাদের বড় তীর্থ। আবার সমরমৃত্যুতে উত্তম গতিলাভ হয় এরূপ কথা প্রাচীন শাস্ত্রাদি গ্রন্থে অনেক স্থলে দেখা যায়। রণক্ষেত্র যদি এত বড় তীর্থ, তবে তথাকার দেবসেবায় জেলের কয়েদীর পাপক্ষয় কেন না হইবে? রাজপুরুষগণ সুবিবেচনার কার্য্যই করিতেছেন।

কোরোসিনের পাপ!

আবার কলিকাতা-নিবাসিনী কোনও ভদ্রমহিলা সম্প্রতি কোরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। ইঁহার বয়স ২৫ বৎসর হইবে,—পাঁচটি সন্তান বর্ত্তমান। কারণ নাকি যায়ের সঙ্গে কলহ। ননদ যা সর্ব্বত্রই আছেন, এঁদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিও অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই হয়। ইহাও যদি আত্মহত্যার কারণ হয় তবে বোধহয় হিন্দুনারী মাত্রকেই আত্মহত্যা করিতে হয়।

আবার নারায়ণগঞ্জের কোনও ডাক্তারের পত্নীও এই উপায়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহার বয়স নাকি ৪০ বৎসর হইবে। স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্ম্মস্থলে যাইতে চান,—স্বামী নিতে চান না। এই অভিমানই এই ঘটনার কারণ।

কতিপয় কুমারী পিতার কন্যাদায় পীড়ন দেখিয়া এবং কতিপয় বিধবা পতি-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া কেরোসিনের সাহায্যে অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করেন। স্বভাবতঃই সংবাদপত্রাদিতে ইঁহাদের যশ কীর্ত্তিত হয়। ইঁহাদের এই আত্মদানের অবশ্য একথা উচ্চতর দিক আছে, যাহাতে লোকে ইঁহাদের শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। কিন্তু তাহার পর হইতে অতি সামান্য কারণে কত নারী যে এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজিতে যাহাকে Sensation বলে অর্থাৎ যাহা লইয়া একটা হৈচৈ পড়িয়া যায়, তাহার দিকে নারীচিত্তের একটা প্রবল আকর্ষণ বুঝি আছে,—ইহাই কি অবিরত এরূপ ঘটনার মূল কারণ নহে? যাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ তাঁহারাই এ সম্বন্ধে ঠিক তথ্য নিরূপণ করিতে পারেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে সকলেরই চিন্তা করা উচিত, আবার নূতন কি বিপরীত একটা Sensation সৃষ্টি করা যায়, যাহার দিকে নারীচিত্তের আকর্ষণে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। নতুবা এই কেরোসিনের পাপ হইতে আমাদের পারিবারিক জীবনকে মুক্ত করিবার আর ত কোনও সহজ উপায় দেখি না। তবে, ইহাতে সমাজের একটা হিতও হইতেছে, বলিতে হইবে। বিপত্নীক যুবক বর রূপে অপেক্ষাকৃত সুলভ। দরিদ্রের কন্যাদায়ের কিছু প্রতিকার তাই হইতেছে। এই হিসাবে এই অভিমানিনীদের আত্মহত্যাকে আত্মদান নাম দেওয়া যাইতে পারে বটে।

ভাসুর ভাদ্রবধূর মামলা।

গত মাসের মালঞ্চে আমরা এক ভাসুর ভাদ্রবধূর মামলার কথা লিখিয়াছিলাম। অদৃশ্য অস্পৃশ্যা ভাদ্রবধূকে প্রহার করিবার অভিযোগে ভাসুরের বিরুদ্ধে এই মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। ভাসুরের ৩০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আদালতে আইন চলে, শাস্ত্র চলে না। তাই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কিছু হইল না, হইল জরিমানার। দরিদ্র যাজকব্রাহ্মণের পাওনাটা সরকার-বাহাদুর গ্রহণ করিলেন,—এটা কি ভাল হইল?

আদালতে ঘুষ।

শ্রীরামপুরে সাবজজ শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের আদালতে কি এক মোকদ্দমা হইতেছিল। উকিলের মোহরের পিয়নের হাতে একখানি দরখাস্ত এবং সঙ্গে দক্ষিণাস্বরূপ একটি গুপ্ত সিকি দিতেছিলেন। সাবজজ বাবুর চক্ষে তাহা পড়িল। বিচার করিয়া তিনি ঘুষের দাতা ও গৃহীতা উভয়ের ১০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। পেয়াদার এমন অনেক পাওনা হইয়া হইয়া থাকে, এবার কিছু দিতে হইল, ক্ষতি কি? কিন্তু মোহরেরের জরিমানাটা অবশ্য মক্কেলই দিবে। বেচারার পেঁয়াজ পয়জার দুই হইল। আদালতে এমন কত হয়, কিন্তু কয়টা আর হাকিমের চোকে পড়ে? আদালতে যারা মামলা করিতে চায়, ডান হাতে বাঁহাতে খরচ কি তাদের কম হয়? হাকিমরা যদি তেমন একটু চাহিয়া দেখেন, বাঁহাতী খরচটা অনেক কমে। তবে জরিমানার টাকা এ ক্ষেত্রে হাকিম বাবু মক্কেলকে দিলেও পারিতেন।

জলের উপরে হাঁটা।

শুনিয়াছি, যোগবলে কোনও কোনও সন্ন্যাসী খড়ম পায় দিয়া জলের উপর হাঁটিয়া নদীপার হইতেন। সম্প্রতি সিনিয়র রিছো নামক একজন ইটালীয় ইঞ্জিনিয়ার এক রকম কলের খড়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে জলের উপর দিয়া বেশ চলিয়া যাওয়া যায়। জলে বেশ ভাসে এখন দুখানা পাদুকার মত যন্ত্র দুই পায়ে বাঁধিতে হয়, দুটি পাদুকার মধ্যে কতকটা ষ্টীমারের চাকার মত এক রকম ছোট চাকা লাগান,—যন্ত্রটি অনেকটা এইরূপ। আবার ছোট একটি হালের মত যন্ত্রও সঙ্গে আছে, যাহার সাহায্যে ফেরা ঘোরা যায়। ফরাসীদেশের কোনও হ্রদে সম্প্রতি এই যন্ত্রের সফল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

এরূপ সব আবিষ্কার যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারাও একরূপ যোগী,—বিজ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে ইঁহাদের আত্মার যোগ ব্যতীত এ সব আবিষ্কার সম্ভব নয়। এ সব যন্ত্রকেও তাই আমরা যোগবলেরই ফল বলিব।

পাটের জুড়ী।

বাঙ্গালাতেই পাট জন্মে,—বাঙ্গলার পাটই সর্ব্বত্র চালান হয়। বহুদিন অবধি অনুসন্ধান হইতেছিল, এমন কোনও ওষধি কোথাও আছে কিনা, যার আঁশ পাটের বদলে চলিতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার কিউবা দ্বীপে এইরূপ এক ওষধি বাহির হইয়াছে, তার নাম 'মাল্‌ভা ব্লাঙ্কা।' এখনও উৎপাদনের ও আঁশ প্রস্তুত করিবার তেমন উত্তম প্রণালী স্থির হয় নাই। তাহাতেই তিন পয়সা সেরে প্রচুর মাল্‌ভা ব্লাঙ্কার আঁশ বিদেশে চালান হইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে পারিলে, দর আরও সস্তা হয়। আন্দাজ একসের ওজনের এক একটি চিনির থলে এক আনা দরে বিক্রীত হইতে পারে, ইহার ব্যবসায়ীরা এতটা ভরসাও করেন। বাঙ্গলার পাটের থলে অপেক্ষা এ সব থলে কম টেকসই হইবে না। ইহার চিক্কণতা পাট ও শণের মাঝামাঝি।

পাটের দরুণ বাঙ্গালার কৃষিতে এবং কৃষিজাত ব্যবসায়ে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পাটের বদলে যদি এই মাল্‌ভা ব্লাঙ্কা পৃথিবীর বাজারে চলে, তবে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা তখন কিরূপ হইবে, কে জানে?

তন্ত্রের আদর।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের পূজা অনুষ্ঠানাদিতে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বৈদিক ক্রিয়া বৈদিক মন্ত্রাদিও অবশ্য আছে, কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়া ও মন্ত্রাদিরই প্রাধান্য পূজা পদ্ধতির মধ্যে অধিক। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি সকলই এক সময়ে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকটে নিন্দনীয় ছিল, নাম শুনিলেই বিরাগে ইঁহাদের মুখ বক্র ও ন্যাসিকা কুঞ্চিত হইত। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিবার পর হইতে, এই সমাজে বেদের কিছু আদর হইয়াছিল। কিন্তু তন্ত্রের নাম শুনিলেই সকলে শিহরিয়া উঠিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতদিন তন্ত্রের নিন্দা করিতেন,—সুতরাং শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ তন্ত্রকে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের জঞ্জাল বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ সার জন উড্‌ফ সাহেব, তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া প্রচার করিতেছেন, যে তন্ত্রের মন্ত্র ও রহস্যাদি ধর্ম্মতত্ত্বের অতি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ। সম্প্রতি ঢাকার সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ইনি ঢাকায় গিয়া এক সভায় 'জড় ও চৈতন্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তান্ত্রিক মতই যে ইঁহার আলোচনার ভিত্তি, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বি কে দাস মহাশয় সভায় সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতায় বক্তা দেখাইয়াছেন, অনেকগুলি আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুমতেই সমর্থন করিতেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের যত মিল আছে, এত মিল আর কোনও ধর্ম্মতত্ত্বের নাই। তান্ত্রিক মত ব্যাখ্যা করিয়া, তান্ত্রিক মতের সহিত বৈদান্তিক মতের প্রভেদ কি, তাহাও তিনি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

এবার দেখিতেছি তন্ত্রের কদর বড় বাড়িয়া যাইবে,—তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনাই শিক্ষিতসমাজের মধ্যে একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইবে। পরে না দেখাইয়া দিলে নিজেরা যখন আমরা কিছু দেখিবই না, তখন পরে যত এ সব দেখায়, ততই ভাল। কিন্তু হায়, পরের মুখে ঝাল আমরা কতকাল আর এমন খাইব?

স্কুলে কুইনাইন।

ইস্কুলের শিক্ষকেরা পড়াইতেন, ইনেস্পেক্টররাও পড়া কেমন হয়, তার পরীক্ষাদি করিতেন। সম্প্রতি ইঁহাদের একটি নূতন কাজ হইতেছে, ছাত্রদের মধ্যে কুইনাইন-মাহাত্ম্য প্রচার করা। দানাপুরে নাকি ইস্কুলে ইস্কুলে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদানের সঙ্গে কিছু কিছু কুইনাইনও খাওয়ান হইত। এই ব্যবস্থার সুফল দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলাতেও ইহার প্রচলন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। হুগলী-জেলার ইস্কুল সমূহে আগে ইহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর ছাত্রদের মধ্যে কুইনাইল বিতরণ কিরূপে হইতে পারে, তার ব্যবস্থা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

এখন যদি দেশের ম্যালেরিয়া দূর হয়!

ভারতের ও ফিলিপাইনের শিক্ষার তুলনা।

'গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯০৯ হইতে ১৯১৪—এই পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০॥০ লক্ষ বেশী লোক শিক্ষা পাইয়াছে। নিউইণ্ডিয়া পত্র বলেন, অবশ্য সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে মনে হইবে বাস্তবিকই এ উন্নতি অত্যন্ত আশা-প্রদ; কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে আমাদের ধারণা ভুল। ইস্কুলে যাইবার উপযুক্ত ছাত্রের সংখ্যা আমাদের দেশে ৩৮০ লক্ষ।' এই অনুপাতে যদি আমাদের উন্নতি হইতে থাকে তবে ১১০ বৎসর বাদে আমাদের দেশের সমস্ত লোক শিক্ষিত হইবে। আমাদের এই অবস্থার সহিত যদি ফিলিপাইনের অবস্থা তুলনা করা যায় তবে আমাদের শিক্ষার প্রশ্ন আরও পরিষ্কার হইবে। গত ৮ই জুলাই তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে ডিসেম্বর মাসের Far Eastern Review পত্রে ফিলিপাইনের শিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে আমে-

রিকানরা ইতিমধ্যেই উক্ত দ্বীপে শিক্ষার এত উন্নতিবিধান করিয়াছেন যে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতি একেবারে নগণ্য।

উক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৯১৩।১৭ সালে ফিলিপাইনে ১২০০১০০ বালকবালিকার—মধ্যে ৬২১০৩০ জন বালকবালিকা শিক্ষা পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাসিটি বৎসরে ৬৬০৫০০ পাউণ্ড মুদ্রা এই শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছেন। ৯০০০ হাজারের বেশী শিক্ষক এই শিক্ষাদান কার্য্য নিযুক্ত। অন্যদিকে ভারতগবর্ণমেণ্টের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে ১৯১৩-১৪ সালে আমাদের দেশে ৭৫০৮১৪৭ জন বালকবালিকা স্কুলে শিক্ষা পাইয়াছে এবং ইহার ব্যয় ৬৬৮১৫৯১ পর্য্যন্ত মুর্দ্রা লাগিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্কুলে যাইবার উপযুক্ত ছাত্রের সংখ্যা ৩৭৭৫০০০০ জন।

আবার ফিলিপাইনে প্রায় ৩০০০০০ ছাত্র ইংরাজীতে শিক্ষা পাইতেছে। অপর দিকে আমাদের সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে মোটের উপরে ১৫০০০০০ জন লোক ইংরেজি শিক্ষিত। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩৩ কোটী, আর ফিলিপাইলে মাত্র ৭৩৩৫৪২৬ জনের বাস!

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব।

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে শ্রীমান কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেটস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঈশান বৃত্তিলাভ করিয়া বিলাত যাইয়া এই যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইনিই প্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী মিরতারা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র।

রেলযাত্রীর সুবিধাবিধানের চেষ্টা।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বোম্বেতে এদেশীয় তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীগণের সুবিধার জন্য একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। যাত্রীদিগের সঙ্গে চলিয়া তাহাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখাই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতি এই কেবলমাত্র সংগঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সমিতি যাত্রীদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন এবং ভদ্র ও ধনী পরিবার হইতে বহুলোক এই সমিতিতে যোগ দিতেছেন। সমিতি স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলিবারও ব্যবস্থা করিতেছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের দুর্দ্দশার কথা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। যিনি রেলগাড়ী দেখিয়াছেন, তিনিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। যে গাড়ীতে ৪০ জনের বসিবার বন্দোবস্ত সেই গাড়ীতে অনেক সময় ৮০ জন লোকও বসিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, একবিন্দু জল পাইবার আশা নাই। বোম্বের এই সমিতি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুবিধার দিকে তাকাইয়া দেশের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশাকরি, কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরের

সহৃদয় ব্যক্তিগণও এইরূপ সমিতি বদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্রযাত্রীর এই বিরাট অসুবিধা দূর করিবেন।

বাঙ্গালী বীর।

চন্দননগর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ সেন সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের গতি-লাভ করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় ইঁহার সংক্ষিপ্ত যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

যোগেন্দ্রনাথ ফরাসী চন্দননগরের শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে বিলাতে গিয়া ১৯১৩ সালে লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি, এস সি উপাধি পান। তারপর কিছুদিন লীড্‌স নগরেই সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করেন। ১৯১৩ সালে লীড্‌সে একটা ভয়ঙ্কর ধর্ম্মঘট হয়, যোগেন্দ্র নাথ নিজের জীবনের আশঙ্কা আছে জানিয়াও এই গোলমাল মিটাইতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। যুদ্ধের আরম্ভে তিনি সৈন্য বিভাগে কর্ম্মচারীর পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হইল। তারপর তিনি সাধারণ সৈনিক হইবার অধি-কার প্রার্থনা করিলেন। যোগেন্দ্রনাথের এ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি অবিলম্বে পঞ্চদশ ওয়েষ্ট ইয়র্কসিয়ারের "ডি" দলে সাধারণ সৈনিক ভাবে প্রবেশ করিলেন। নয়মাস শিক্ষার পর এই সৈন্যদল মিসরে প্রেরিত হইল। সেখানে কয়েকমাস থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সে আসিলেন। সেই সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ফ্রেঞ্চেই ছিলেন। ১৬ই মে তিনি তাঁর ভাই, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁর শেষ পত্র। যোগেন্দ্রনাথ গত ২৩শে মে রাত্রিতে নিহত হইয়াছেন। ইঁহার বৃদ্ধা মাতা ও কয়েক-জন ভাই ও ভগ্নী জীবিত আছেন। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে যথারীতি সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্র পাইয়াছেন। নিম্নে আমরা কয়েকজন কর্ম্মচারীর পত্রের মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

১। ক্যাপ্টেনের পত্র——

২৭.৫.১৬
ফ্রান্স।

প্রিয় মহাশয়,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনার ভাই, ১৫-৭৯৫ নম্বর প্রাইভেট জে, সেন ২৩শে রাত্রে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দলের সমস্ত লোক তাঁর অভাবে অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসিত। মিঃ সেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান্ সৈনিক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের খুব উচ্চধারণা ছিল। সামরিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার কবরের উপরে একটা "ক্রসে" তাঁহার নাম ও তাঁহার দলের নাম লিখিত হইয়াছে। ঠিক কোথায় তাঁর সমাধি হইয়াছে ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই জানাইব। আর কিছু যদি জানিতে চান তবে জানাইতে চেষ্টা করিব। ইতি

এফ্, হারউড্ বওাল, ক্যাপ্টেন।

২। মিঃ সি, ডিউপর্ষ্টের পত্র।

প্রিয় মহাশয়,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনার ভাই ২৩শে মে রাত্রে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ সেন অত্যন্ত উচ্চদরের সৈনিক ছিলেন এবং সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মিঃ সেন প্রকৃত সৈন্যের মত তাঁর কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া আশাকরি আপনি একটু সান্ত্বনা পাইবেন। ইতি—

সি, ডিউপার্ষ্ট।

৩। লেফ্‌টেনাণ্ট জে, এস, পোপ স্মিথের পত্র।

প্রিয় ডাঃ সেন,

.................তাঁকে আমাদের দলের সকলে খুব ভাল বলিয়া জানিতাম এবং সকলেই আপনার এই দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ইতি

জে, এস, পোপ স্মিথ।

মিঃ সেনের নাম বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ হইয়াছে। যুদ্ধে বীরের মত দেহপাত করিয়া মিঃ সেন বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

চন্দননগরের বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ার।

গত জুন মাসের শেষভাগে প্রথমদলের বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ারগণ পণ্ডীচেরী হইতে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহাদের একজনের একখানি পত্র সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"গত মঙ্গলবার রাত্রি ১২টায় পণ্ডীচেরী ছাড়িয়া বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টায়, ৪৮ ঘণ্টা পরে, আমরা কলম্বতে পৌঁছিলাম। সকালে ও সন্ধ্যায় আমরা স্বর্গীয় ডি এল রায়ের অমর গীতি 'আমার জন্ম ভূমি' গাহিয়া আমারা আমাদের প্রাণ আনন্দিত ও উৎসাহময় করিয়া রাখিতাম। যখন ভারতের শেষ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও আলোকমঞ্চ ক্রমে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল,—তখন একদিকে আমাদের মাতৃভূমির কথা অপরদিকে যে মহৎ দায়িত্ব ও পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কথা মনে পড়িল; আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইলাম। আমাদের বন্ধু যাঁহারা দেশে আছেন, মনে মনে তাঁহাদেরই হাতে তাহার মঙ্গল সাধনের ভার সমর্পণ করিলাম। মনে হইতে লাগিল, মাতৃভূমির জন্য কত কাজ করিবার আছে,—কিন্তু আমরা তার কতটুকুই আর করিয়াছি! আমাদের মনে হইতে লাগিল, এই পুণ্যদেশে কি ছিল, এখনও ভবিষ্যতে কি হইতে পারে! আবার আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। যখন বাঙ্গলা ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তখন মন বেশ প্রফুল্ল ছিল,—যখন পণ্ডীচেরী ছাড়িলাম, তখনও মন বেশ প্রফুল্ল ছিল, কিন্তু যখন প্রিয় মাতৃভূমির শেষ পাহাড়ের চূড়াটি ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল,—তখন না কাঁদিয়া পারিলাম না।"

নারীশিল্পশ্রম—সঙ্গীত শাখা।

গত সংখ্যায় আমরা নারী শিল্পাশ্রমের কার্য্য ও উদ্দেশ্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলাম। এই শিল্পাশ্রম ৮২ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত এবং জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুতা মনোরমা মজুমদার মহোদয়া এই আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শুনিলাম কয়েকজন শিক্ষার্থিনী এই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইঁহাদের সমস্ত ব্যয়ভার ইঁহারাই চালাইতেছেন। সহৃদয় কেহ কেহ কিছু চাঁদা দেন,—বাকী যা লাগে ইঁহারাই চালাইয়া নেন। কিন্তু সাধারণের প্রচুর সাহায্য ব্যতীত ইঁহারা কতদিন এই কঠিন দায়িত্ব ভার বহন করিতে পারিবেন, কে জানে? যাঁহারা তাঁহাদের আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা যে সকলেই নিতান্ত নিঃসহায়া একথা বলাই বাহুল্য, এইরূপ নিঃসহায়া নারীদের জীবনোপায়ের জন্য এই উদারপ্রাণ মহৎব্রত-পরায়ণ দম্পতি যাহা করিতেছেন, তেমন কাজ দেশে কমই হইতেছে। দেশে এখন মহৎকার্য্যে দাতার অভাব নাই। হয়ত ইঁহাদের এই অনুষ্ঠানের কথা অনেকেই জানেন না। যাঁহারা দেশহিতে ও সমাজহিতে দান করিতে সততই মুক্ত হস্ত, তাঁহারা যদি একটু অনুসন্ধানে নেন, তবে দানের এমন ক্ষেত্র তাঁহারা অতি কমই পাইবেন।

স্থানে ও অর্থ সামর্থ্যে যতদূর কুলায়, নিঃসহায়া নারীদিগকে ইঁহারা এই আশ্রমে রাখিয়াই শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। তা ছাড়া, যাঁহারা আশ্রমে গিয়া শিখিয়া আসিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও ইঁহারা বিনা বেতনে শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সব দরিদ্র ভদ্র পরিবারের কর্ত্তারা মনে করেন, যে পরিবারস্থা নারীরা অবসর সময়ে শিল্পচালনা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিলে ভাল হয়, তাঁহারাও অনুসন্ধান নিয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি ইহারা এই আশ্রমে একটি সঙ্গীত শাখাও খুলিয়াছেন। প্রাচীনকালে এদেশের কুলরমনীরা যে সঙ্গীতকলার অনুশীলন করিতেন, প্রাচীনসাহিত্যে তাহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি, প্রবীনা ঠাকুরাণীরা বিবাহে ব্রতে ও পূজায় মুক্তকণ্ঠে গান করিতেন। সাধারণতঃ, এ সব গানে অবশ্য সঙ্গীতবিদ্যার তেমন পরিচয় পাওয়া যাইত না। তবে মধ্যে মাঝে এক একজন বড় নিপুণা গায়িকাও দেখা যাইত। আমরা বাল্যকালে একজন বৃদ্ধা গায়িকাকে দেখিয়াছি, বড় মিষ্ট গায়িতেন তিনি। বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে তাঁহার গানের আড্ডা বসিত। তবে গান সব কীর্ত্তন বা যাত্রার গান, থিয়েটারের রসাল গান নহে। আর হারমোনিয়ম কি পিয়ানো যে বাজিত না, তাহাই বলাবাহুল্য। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনা ঠাকুরাণীদের এসব সেকেলে গ্রাম্য গান হইয়াছে। আধুনিক হিন্দুর ঘরের মেয়েদের পক্ষে সঙ্গীতানুশীলন নিন্দনীয়

বলিয়াই এতদিন বিবেচিত হইত। কিন্তু আজকার যেন স্রোতটা একটু ফিরিয়াছে। মেয়েরা যেমন লেখাপড়া শিখিতেছে, অনেকে চান একটু গান-বাজনাও তারা শেখে। শিখিলে ঘরের আনন্দ বাড়িবে বই, কমিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার স্থান বড় অল্প। গৃহে সঙ্গীতশিক্ষক রাখা অতি অল্পের পক্ষেই সম্ভব। এই অভাব দূর করিবার জন্যই মজুমদার দম্পতি ইঁহাদের শিল্পাশ্রমে একটি সঙ্গীতশাখা খুলিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় শিক্ষাদান কার্য্যের ভার নিয়াছেন। শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার মহোদয়া নিজে উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিবেন। সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিল্পশিক্ষায় দরিদ্র নারীর অন্নসংস্থান হইবে, তাই বেতন না লইয়া সে বিদ্যা ইঁহারা দানের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। সঙ্গীত সুকুমার কলা বিদ্যা, কলাবিদ্যা মাত্রই কিছু না কিছু সকের,—যদিও যার চলে তার পক্ষে এ সক নিন্দনীয় নহে। (অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলেই মানুষ চায় ঘরে একটু আনন্দে থাকে। মানবচরিত্রের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা যে মানুষের নির্ম্মল আনন্দোপভোগের প্রধান উপায়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কলানুশীলন তাই নিন্দনীয় হইতে পারে না।) তারপর ইহার সুব্যবস্থা করিতে ব্যয়েরও আবশ্যক কম নয়। তাই সঙ্গীতশিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগকে মাসে তিন টাকা করিয়া বেতন দিতে হইবে, এই নিয়ম ইঁহারা করিরাছেন। সপ্তাহে দুইদিন দুই ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে,—শিক্ষকও শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ। যাঁহারা কন্যাদের সঙ্গীত শিখাইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এ ব্যয় কিছুই নয়।

সমর-সংবাদ।

বিগত মাসের মধ্যে ইউরোপের প্রায় সকল রণক্ষেত্রেই যুদ্ধের বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং নূতন নূতন অভিযান ও আক্রমন সংঘটিত হইয়াছে। গত বৎসরও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যুদ্ধের বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবৎসরও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। আলোচ্য ঘটনার মধ্যে প্রথম ইটালীর ট্রেণ্টিনো প্রদেশে অষ্ট্রিয়ার নূতন অভিযান। অষ্ট্রিয়ান আক্রমণের ভীষণ বেগে ইটালীয় বাহিনী হটিয়া প্রায় ২০ মাইল লাইনে—অষ্ট্রিয়ান সীমান্ত পার হইয়া নিজ দেশে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান এডিজ ও ব্রেণ্টা নামক নদাদ্বয়ের মধ্যে আল্‌পস্ পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অষ্ট্রিয়ানবাহিনী যেরূপ বেগে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে গুরুতর আশঙ্কা হইয়াছিল যে হয়ত তাহারা পার্ব্বত্যদেশ অতিক্রম করিয়া ইটালীর সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ান আক্রমণের বেগ প্রতিহত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ইটালীয়বাহিনী অগ্রসর হইয়া নষ্টোদ্ধার করিতেও সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা মিত্র পক্ষের বিশেষ আশাপ্রদ।

তারপর বিশেষ ঘটনা রুষিয়ার নূতন অভিযান। অষ্ট্রিয়ার গেলিসিয়া প্রদেশের পূর্ব্বোত্তর দিকে রুষিয়ার ভলিনিয়া প্রদেশে এবং দক্ষিণে অষ্ট্রিয়ার

বুকোভিনা প্রদেশ। একটি রুষবাহিনী ভলেনিয়া প্রদেশস্থ লাজকো দুর্গের উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল লাইনে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়া সম্মুখস্থ অষ্ট্রিয়ান বাহিনীকে পরাভূত করিয়া প্রায় ৪০ মাইল হটাইয়া লইয়া যায়। তবে ইহার দক্ষিণে প্রায় ১২৫ মাইল লাইনে অষ্ট্রিয়ান বাহিনী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া পূর্ব্ব-স্থানেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু তাহার দক্ষিণে নিষ্টার নদীর সন্নিকটে প্রায় ৪০ মাইল লাইনে অপর একটি রুষবাহিনী সম্মুখস্থ অষ্ট্রিয়ানবাহিনী হটাইয়া লইয়া ক্রমে জারনোভীজ ও তৎপর কলোনিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে লাজ্কো দুর্গের দিক দিয়া রুষবাহিনী অগ্রসর হওয়ায়, গুরুতর সঙ্কট বিবেচনা করিয়া জার্ম্মাণসেনাপতি ম্যাকেন্সেন একটি জার্ম্মাণবাহিনীসহ অষ্ট্রিয়ানসেনা-পতির সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। যতদূর বোঝা যায়, ম্যাকেন্সনের চেষ্টায় রুষবাহিনীর অগ্রসর হওয়া স্থগিত হইয়াছে এবং রুষবাহিনী কিছুদূর হটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রুষবাহিনীর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এই নব অভিযানে বহু-সংখ্যক অষ্ট্রিয়ান সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে এবং ইটালীর বিরুদ্ধে আক্রমণের বেগও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে।

ইহার পর বিশেষ ঘটনা পশ্চিমরণক্ষেত্রে নূতন ব্রিটিশ অভিযান। গত ১লা জুলাই হইতে ফরাসী দেশের উত্তরাংশে সোম নদী হইতে উত্তরে প্রায় ১৬ মাইল ব্যাপী লাইনে ব্রিটিশবাহিনী ভীষণবেগে সম্মুখস্থ জার্ম্মাণ লাইন আক্রমণ করিয়াছে। জার্ম্মাণগণ গত এক বৎসর যাবৎ এই লাইনে অবস্থিতি করিতে থাকায় নানা কৌশলে এই স্থান বিশেষরূপে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই ব্রিটিশবাহিনী বিশেষ দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ আক্রমণের বেগ সমান ভাবেই চলিতেছে এবং স্থানে স্থানে ব্রিটিশবাহিনী প্রায় ৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশবাহিনীর দক্ষিণভাগে ফরাসীবাহিনীও প্রায় ৯ মাইল লাইনে একযোগে অগ্রসর হইতেছে। এই অভিযানের ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই জনসাধারণ বিশেষ আশার সহিত এই নব অভিযানের সফলতার জন্য উধগ্রীব হইয়া আছেন।

পশ্চিম রণক্ষেত্রে ভার্ড্ন দুর্গ দখল করিবার জন্য এখনও জার্ম্মাণসেনাপতিগণ পূর্ব্ববৎ ভীষণবেগে আক্রমণ করিতেছেন। প্রায় চারিমাস যাবৎ ভার্ড্নের যুদ্ধ চলিতেছে। বিগত মাসে অজস্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া জার্ম্মাণবাহিনী সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও পূর্ব্বদিক হইতে ভার্ড্ন পৌছিতে দুর্গশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত দুইটি লাইন ফরাসী সৈন্য অমিত বিক্রমে রক্ষা করিতেছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে ভার্ড্ন আক্রমণের বেগ প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশবাহিনী বর্ত্তমানে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। এইবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম রণক্ষেত্রের বহু স্থানেই জার্ম্মাণবাহিনী আক্রান্ত হইয়াছে এবং মনে হয় অচিরেই এই আক্রমণের বেগ ও প্রসার আরও বর্দ্ধিত হইবে।

অভয়া।

নয়নে তোমার ঝলিছে আগুন,
আননে মুখর দীপ্তি ;
তব বক্ষে দুলিছে অক্ষ-মালিকা,
হৃদয়ে প্রসন্ন তৃপ্তি !
বরাভয় করে দানিছ অভয়
বাহুতে স্ফুরিছে শক্তি ;
চরণালক্তে অশিব নাশিয়া
হৃদয়ে এনেছ ভক্তি।
রুদ্রাণী তবুও বিশ্বের কল্যাণ,
চির কল্যাণময়ী মা !
সন্তান জননী, সন্তান পালিনী,
অয়ি শুভে, বিশ্বরমা !
জননি, আজিকে দেহগো দীক্ষা
তোমারি অভয় মন্ত্রে ;
কোটি জীবনে নবীন স্পন্দন
জাগিবে গম্ভীর মন্ত্রে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।*

ভূমিকা।

আফিংখোর বলিয়া চীনা বিশ্ববিশ্রুত,—জুতাওয়ালা বলিয়া চীনা বাঙ্গালায় বিখ্যাত। চীনেরা আবার সুদক্ষ কারিকর, চীনামিস্ত্রীর আদর জগতে কোথায় নাই ? অনেক বিষয়ে চীনের বিশেষত্ব অদ্ভূত। সর্ব্বমানবের প্রিয়খাদ্য দুগ্ধ চীনবাসীর

---

* ১৩১৭ সনের পৌষমাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রশাখার একটি অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত এবং সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রথম পুরস্কৃত প্রবন্ধরূপে নির্ব্বাচিত।

Rev. J. Edkins D. D প্রণীত Chinese "Buddhism" এবং রায় শ্রীযুক্ত শরৎচ[illegible] দাশ C. I. E. বাহাদুর প্রণীত "Indian Pandits in the Land of Snow" পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থান সঙ্কলিত হইয়াছে। আমি আর যে সকল গ্রন্থকারদের নিকট ঋ[illegible] যথাস্থানে তাঁহাদের গ্রন্থের নামের উল্লেখ করিয়াছি।

স্পর্শও করে না। অথচ ইন্দুর তেলাপোকা সাদরে ভক্ষণ করে। কেঁচো-জাতীয় একরূপ বিশ্রী প্রাণী তাঁহাদের উপাদেয় খাদ্য। চীন-রমণীরা কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করিয়া পদদ্বয় অস্বাভাবিক রকম খাট করিয়া ফেলে; ফলে সেই বিকল অঙ্গ লইয়া যখন তাহারা হাঁটে, তখন মনে হয় প্রতিপাদবিক্ষেপে তাহারা হুচোট খাইতেছে। চীনাদের মাথার বেণী বটবৃক্ষের জটার মত মৃত্তিকা চুম্বন করিতে উদ্যত; আবার গুটাইয়া রাখিলে তাহাই কৃষ্ণচূড়ার শোভা ধারণ করে!—চীনের কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে এই কথাগুলিই আমাদের মনে উদিত হয়।

কিন্তু ইহাই চীনের চীনত্ব নহে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে চীন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। চীনারা অতি প্রাচীন জাতি। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিসহস্র বৎসরের বহু পূর্ব্ব হইতে তাহাদের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। সুদূর অতীত কাল হইতে দেশে শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবিধানাদি প্রবর্ত্তিত ছিল,—জমি বিভাগ এবং রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা চিকিৎসা-বিদ্যা জানিত; উদ্ভিদের শক্তি প্রয়োগে কিরূপে রোগ যাতনার উপশম করিতে হয়, সে বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা ছিল। দেশের উন্নতি অবনতি, অভাব অভিযোগের বিষয় রাজসভায় আলোচিত হইত। যুদ্ধ-বিদ্যাভিজ্ঞ সৈন্যসামন্ত আত্মকলহ এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিত। দেশে পাঠযোগ্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তথায় দেশবাসীর দ্বারা সমাদৃত দুইটি ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল,—একটি লওজু প্রবর্ত্তিত তৌবাদ (ব্রহ্মবাদ), অপরটি কনফুসাস প্রবর্ত্তিত সমূহবাদ (Communism)।* সুতরাং চীনবাসীরা নীতিজ্ঞানে অনুন্নত এবং আধ্যাত্ম ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিল না।

* লওজু এবং কনফুসাস একরূপ সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। লওজু ছিলেন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, অধ্যাত্মবাদী, ঈশ্বর বিশ্বাসী, অতীন্দ্রিয় জগৎবিহারী—ঋষি। কনফুসাস ছিলেন ইহকাল সর্ব্বস্ব, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কদাচ ভোগবিলাসের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি বলিতেন, যে জগতে আমরা বিচরণ করি, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জানিতে আমরা অক্ষম। কাজেই পরলোকের বিষয়ে কিছু অবগত হইবার চেষ্টা করা বৃথা। যে জীবন আমরা লাভ করিয়াছি তাহাই সুনিয়ন্ত্রিত করা আমাদের কর্ত্তব্য; তাহার বেশী কিছু করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। সমাজ ও রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি সেই কথাই প্রচার করিয়াছেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ জনকে মান্য করা, রাজবিধি অবিচলিত চিত্তে পালন করা তাঁহার প্রধান উপদেশ। সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিত্বের বিনাশ করিয়া সমষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করা—তৎপ্রবর্ত্তিত মতের সার কথা।

এই উন্নত সুসভ্য চীন চিররক্ষণশীল, সর্ব্বপ্রযত্নে বৈদেশিক সংস্পর্শ বর্জ্জন করিয়া চলিতে চায়। ভারতবাসী এ হেন চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন,—চীনকে ভারতবর্ষের সহিত একধর্ম্ম-সূত্রে বাঁধিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা শাক্যমুনির ধর্ম্মমত, ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ ঋষিলব্ধ নানা তত্ত্ব চীনে প্রচার করিয়া সে দেশের সভ্যতাকে উন্নততর, মহত্তর করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন সমগ্র এসিয়ায় জ্ঞানধর্ম্মালোক বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ বহু রাজ্য নানা সূত্রে চীনের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রাচ্য এ'সয়া আজ যাহা হইয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষের জ্ঞানধর্ম্ম লাভ করিতে না পারিলে তাহা কোন নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিত— কে বলিবে! কিন্তু ভিক্ষুরা বড় সহজে এ কার্য্যে সাধন করিতে পারেন নাই। এই উন্নত চীনা জাতির একদল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী তীক্ষ্ণধী লোক এই বৈদেশিক ভারতীয় ধর্ম্মকে,প্রচার কার্য্যের প্রারম্ভ হইতেই স্বদেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; ছল বল, যুক্তি তর্ক—নানা উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রোধাগ্নিতে অনেককে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতীয় প্রচারকেরা চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সুদীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া চীনে সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান সময়েও বৌদ্ধ বলিয়া যে সকল চীনবাসীরা আত্মপরিচয় দেন না, এমন শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত চীন বাসীদেরও জ্ঞান ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস বৌদ্ধমত ও সংস্কারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।* বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, মৃত্যুপণ করিয়া যে সকল ভারতবাসী এই মহাকার্য্য সাধন করিয়াছিল তাহাদের ইতিহাসের কথা, গৌরবগাথা আমাদের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে কি?

* "—Though the Confucianists in successive centuries persecuted Buddhism with fire and sword and put forth their best literary efforts to nublify its influence, they not only failed to stop the progress of Bhddhism, but got themselves so imbued with Buddhistic ideas, and so impressed with its pretences of magic power, that to the present day the most thorough-paced confucianist goes without any scruple through Buddhistic ceremonies, on the occasion of weddings or funerals, or in case of illness, epidemic or drought. It was only the other day that a Chinese gentleman, a confucianist to the backbone, expressed in a conversation with me his utmost contempt for Buddhism, but at

যতদূর জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচারকদের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। চীনের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে কয়েকটি স্বপ্নই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মূল কারণ। অবশ্য চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মত একটা বিরাট ব্যাপারের আদি কারণ কেবল মাত্র দুই একটি স্বপ্ন—কোন ঐতিহাসিক এ কথায় কোনরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তাই আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব—চীনবাসীরা খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বেই ভারতবর্ষের পরিচয় লাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল। এই পরিচয় হইতে তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, এবং এই জ্ঞান লাভের ফলে তাহারা ঐ ধর্ম্মলাভ করিতেও লালায়িত হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিকান্ত সেন।

মসী ও লেখনী।

মসী বলে হে লেখনী, কিসে বড় তুই ?
নরের হিসাব পত্র—যত রাখি মুই।
রাগিয়া লেখনী কহে, বৃথা গর্ব্ব ওরে,
ঠোঁটে করি না তুলিলে কিসে লাগে তোরে ?
ঝগড়া করিয়া দোহে স্থির করি পাছে ;
বিচার যাচিল গিয়া লেখকের কাছে।
হাসিয়া লেখক বলে, শুন বলি তবে—
"কেউ বিনা কোন কাজ নাহি হয় ভবে।"

শ্রীরমণীকান্ত সেন গুপ্ত

the same time, when I happened to show him a certain Buddehistic Sutra he acknowledged to have learned it by heart. When I asked him how he came to study a Buddhistic book, he assured me with the greatest seriousness that it was univesally known, and proved, by his own experience, that the reading of this volume was a never-failing panacea for stomach ache".

—Buddhism etc., P. 27.
by J. Eitel M. A., PH, D.

"আমোদ" এর কবি।

কথায় রস না থাকিলে সে কথা লইয়া সাহিত্য হয় না। সাহিত্যে সকল রকম কথারই স্থান আছে। শাস্ত্রকারেরা যে বীরকরুণাদি নবরসের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'হাস্য'ও একটি প্রধান রস। সুতরাং হাস্য রসের কথা বাদ দিলে সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইতে পারে না। সেই জন্য সকল সাহিত্যেই হাস্য-রসের কথা আছে—আমাদের বাঙ্গালাসাহিত্যেও আছে। গদ্য সাহিত্যে—কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমে, বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরে, দীনবন্ধুর নাটকে, অমৃতলালের প্রহসনে, ললিতকুমারের সন্দর্ভে, হাস্যরসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং পদ্য সাহিত্যেও সেকালের রসরাজ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ও কবিওয়ালা-দিগের গান হইতে আরম্ভ করিয়া একালের হেমচন্দ্রের ও ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতায় এবং অপরাপর অনেকানেক গণ্য ও নগণ্য রচনায় হাস্যপরিহাসের রঙ্গরস আছে। কিন্তু এই সকল কবিতায় ও গানে যে হাস্যরসের অভিব্যক্তি আছে, তাহা যে অনাবিল সে কথা বলা যায় না; বস্তুতঃ অনেকস্থলে উহা ব্যক্তিগত গালাগালি, রুচিবিগর্হিত শ্লেষ বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের ব্যপদেশে বিষাক্ত দংশন মাত্র। নির্দ্দোষ ও শুচিশুভ্র পরিহাস রসিকতার চূড়ান্ত রচনা আমরা দেখিতে পাই বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অতুলনীয় হাসির গানে। এবং সেইরূপ সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল হাস্যরসের আস্বাদ পাইয়া থাকি আমরা কান্তকবি রজনী কান্তের পরিহাস সঙ্গীতে এবং সমালোচ্য পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত রসময় লাহার হাসির কবিতায়। দ্বিজেন্দ্র লালের হাসির গান শুনিয়া বা "আষাঢ়ে" পড়িয়া আমরা যেমন অসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া থাকি, "সার্থক নামা কবি" রসময়ের কবিতা পড়িলেও সেইরূপ আমাদের মনে হাস্যের বিমল আনন্দোচ্ছ্বাস স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

হাস্য পরিহাসকে প্রাচীনেরা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সঙ্গীত-কলায় যেমন টপ্পা, যাত্রায় যেমন সং, থিয়েটারে যেমন প্রহসন, ভোজে যেমন চাটনি, জীবন-যাত্রার মধ্যেও তেমনি হাস্যকৌতুক একটা নিম্নশ্রেণীর জিনিশ স্থির করিয়া তাঁহারা ভাঁড় বা বিদূষকের মুখেই পরিহাস রসিকতার কথা দিয়াছেন। আধুনিককালেও 'হাসি' কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত উচ্চ আসন পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না;—'হাসি' ও 'খেলা' একাসনেই স্থান পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও এই মতেরই সমর্থন করিয়া একজন মহামনস্বী

(অধ্যাপক Blackie) লিখিয়া গিয়াছেন "Life is an earnest business and no man was ever made great or good by a diet of broad grins."। কিন্তু হাসিকে আমরা যত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি, বাস্তবিক কিন্তু হাসি তত অবহেলার বস্তু নহে। হাসি না থাকিলে যে এই মানবজীবন কত 'একঘেয়ে', নীরস ও নিরানন্দ হইত, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। জীবনকে সরস করা ছাড়া হাসির আর একটা উচ্চতর প্রয়োগও আছে। হাসাইতে বা হাসিতে জানিলে গম্ভীর মুখে উপদেশ-বাক্যে যে কাজ হয় না, অনেক সময়ে হাসিতে তাহার দশগুণ কায হয়। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে হাস্য ও করুণ রসের মধ্যে একটি ধাপ মাত্র ব্যবধান—অনেক স্থলে হাস্য প্রচ্ছন্ন ক্রন্দন মাত্র। রসময় বাবুর "ছাইভস্ম" ও "আরাম" পাঠ করিয়া মনীষী কবিবর বরদাচরণ মিত্র মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য বিসদৃশ জনিত ব্যঙ্গের উচ্ছ্বাস, রসময় বাবুর হাস্য অশ্রুর রূপান্তর।" রসময় বাবুর 'সুখের সংসার' 'পূজায় শঙ্কর', 'আলবোলা', 'হিসাব' প্রভৃতি "আরাম"এর কবিতাগুলির সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'তানসেন' 'বিস্ম্যুৎবারের বারবেলা' প্রভৃতি গানগুলির তুলনা করিলে উভয় কবির হাস্যের মধ্যে ঐ রকম একটি পার্থক্য আছে বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাধে কি বাবা বলি', 'পাঁচশ বছর সয়ে আছি' প্রভৃতি গীতের সঙ্গে রসময় বাবুর "আমোদ"এর হাস্যরসসিক্ত কবিতাগুলির তুলনা করিলে যে উক্ত মন্তব্যের বিপরীত প্রয়োগও উভয় কবির পক্ষে খাটে, বরদাচরণ বাবু "আমোদ"এর ভূমিকায় তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উচ্চ অঙ্গের হাস্যরসের উভয়বিধ উপাদানই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মত রসময় বাবুর পরিহাস কবিতায় বিদ্যমান। রসময় বাবুর কতক গুলি কবিতা পড়িয়া আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না, আবার কতকগুলি কবিতা পড়িয়া আমরা হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি।

সকল হাস্যেরই মূলে কোনও না কোনও প্রকার বৈপরীত্য বৈসাদৃশ্য বা অসামঞ্জস্য আছে। সেই বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য যদি এমন কোনও বিষয়ে হয় যাহা দেশ কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে—প্রত্যুতঃ যে অসামঞ্জস্যের অনুভূতি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক,—তাহা হইলে সেই অসামঞ্জস্য-জনিত হাস্যের কথা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করে। গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের

সহিত গুপ্ত কবির লড়ায়ের কবিতার বা হেমচন্দ্রের "বাজিমাৎ"এর হাস্যরস সমসাময়িক ব্যক্তিরা যে পরিমাণে উপভোগ করিতেন, বর্ত্তমানকালের পাঠকেরা সেরূপ করেন না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'তানসেন' গান শুনিয়া বা রসময় বাবুর "জব্দ কে" কবিতা পড়িয়া আমরা যেরূপ হাসিতেছি, আমাদের পরবর্ত্তী কালের লোকেরাও সেইরূপ হাসিবেন। রসময় বাবুর অধিকাংশ পরিহাস কবিতাতেই হাস্যরসের নিত্যবস্তু বিরাজমান, সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস তাঁহার হাসির কবিতা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী হইবে। একথা বলা বোধ হয় বাহুল্য যে অসামঞ্জস্যের সমাবেশ করিয়া হাসাইবারও একটা Art বা কলা-নৈপুণ্য আছে এবং সেই Art আয়ত্ত করা সকলের শক্তিসাধ্য নহে। অরসিকের হাসাইবার চেষ্টায় অনেক সময় হাস্যরসের উদ্রেক না করিয়া বীভৎসাদি ভিন্ন রসের উৎপত্তি হয়। রসময় বাবুর হাসাইবার স্বাভাবিক শক্তি এবং কলানৈপুণ্য উভয় গুণই যে আছে, তাহা তাঁহার অধিকাংশ কবিতাতেই দেদীপ্যমান। অধ্যাপক প্রবর সুরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'আমোদ'এর কবিকে তাঁহার "অনুপ্রাস" এ "রহস্য-রসিক, রসরাজ, রসিকরাজ, রসরত্নাকর রসময় লাহা" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

হাস্যরসের উদ্দীপন করিবার জন্য রসময় বাবু বাঙ্গালা কবিতায় কয়েকটি অভিনব কৌশলের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানেও আমরা দেখিতে পাই না। 'জন্মতিথি', 'মৌখিক আলাপ' প্রভৃতি কবিতায় আন্তরিক ও মৌখিক উক্তির বৈপরীত্য দেখাইবার কৌশলটি উপাদেয়। 'নাপিত', 'অনুতাপ', 'বাজিরাখা', 'কবির প্রতিভা,' 'বিপদ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা ছদ্মবেশের ছলনায় পাঠককে গম্ভীর করিয়া তুলিয়া শেষে নিজমূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ হইয়া পাঠককে হাস্যরসে অভিভূত করে। ভাবুক কীর্ত্তনীয়া যেমন কোনও মহাজনী পদ "আখর দিয়া" গাহিতে গাহিতে শেষে এমন একটি 'আখর' দিয়া দেন, যাহাতে পদটির অর্থ যেন এক নূতন মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব রসমাধুরীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিতারও প্রচ্ছন্ন হাস্যও তেমনি শেষের দুই একটি পংক্তিতে যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

'ছাই ভস্মে'র 'উপহার' এ, 'আমার'এর 'শেষোক্তি' এবং "আমোদ"এর 'মুখবন্ধ' কবিতায় কবি নিজেই বলিয়াছেন যে টমাস হুড্ ও অপরাপর পাশ্চাত্য কবিগণের আদর্শে তিনি কোনও কোনও কবিতা রচনা করিয়াছেন।

সুতরাং কবি সর্ব্বত্র মৌলিক নহেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কোনও সমালোচক যে আত্মপ্রীতিতে স্ফীত হইয়া উঠিবেন, সে উপায় কবি রাখেন নাই। আমরা কিন্তু কবির আদর্শ কয়েকটি কবিতার সহিত তাঁহার নিজের রচনা মিলাইয়া দেখিয়াছি এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি যে কবি তাঁহার আদর্শের ছায়াকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়া কি সুন্দর নূতন মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কবি নিজে মৌলিকতার দাবী না করিলেও আমরা অসঙ্কোচে একথা বলিতে পারি যে তাঁহার কবিতা 'রসময়ী' ছাপ মারা তাঁহার নিজস্ব বস্তু এবং তাঁহার পরিহাস রসিকতা স্বভাবদত্ত, তাহার জন্য তিনি ভগবানের নিকট ঋণী আর কাহারও নিকট নহেন।

বিদেশী আদর্শের ছায়া পাইলেই যাঁহারা "মৌলিক নয়" বলিয়া চিৎকার করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত মৌলিক হইলেই উৎকৃষ্ট হয় না এবং যে হিসাবে রসময় বাবু মৌলিক নহেন সে হিসাবে কালিদাস সেক্সপীয়রও মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। আমাদের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল Ingoldsby Legends এর কবিতার অনুকরণে যে 'আষাঢ়ে' লিখিয়াছেন এবং ইংরাজি গানের আদর্শে যে তাঁহার "হাসির গান" বাঁধিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? যে লেখক অপকৃষ্ট রচনা লিখিয়া গর্ব্ব করেন যে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট শিক্ষা বা আদর্শের কোনও ধারই ধারেন না, তাঁহাকে পাশ্চাত্য মহাকবি গেটের উক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়া রসময়ী ভাষায় বলিতে হয়, "তুমিই—আদি—অকৃত্রিম—নিরেট্।"

রসময় বাবু হাস্যরসিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করাতে তিনি যে ভিন্ন রসের কবিতা লিখিয়াও যশস্বী হইয়াছেন সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার প্রথম হাসির কবিতা পুস্তক 'ছাই ভস্ম' প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে তিনি বঙ্গবাণীর চরণে যে প্রথম "পুষ্পাঞ্জলি" অর্পণ করেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় না যে সেই খণ্ড কাব্যখানি ও "ছাইভস্ম" এক কবির লেখা। 'পুষ্পাঞ্জলি' স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর কথায় "শান্ত সৌন্দর্য্যদর্শী, পবিত্রচেতা ভাবুক" কবিরই যোগ্য নির্ম্মাল্য। নবীন কবির লিখিত সেই প্রথম পুস্তকে যুবজনসুলভ-প্রেম বিষয়ক কবিতা একটিও না থাকিয়াও যে উহা মনোহারী তাহাও কবির প্রকৃতির একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব। কবিকুল চূড়ামণি রবীন্দ্রনাথও সেই 'পুষ্পাঞ্জলি'র সমালোচনায় বলেন, "এই পেলব কাব্যখণ্ড গুলির

মধ্যে একটি সুকুমার মৃদু সৌরভ আছে। লেখকের ভাষায় যে একটি মিষ্ট সুর পাওয়া যায় তাহা সরল, সংযত ও গম্ভীর এবং তাহাতে চেষ্টার লক্ষণ নাই।" সেই সংযত মিষ্টসুর যে এখনও রসময়ের কণ্ঠে অক্ষুণ্ণ আছে তাহা তাঁহার গম্ভীর-করুণাদি (serious) রসের যে সকল কবিতা 'আরাম' ও 'আমোদ'এ স্থান পাইয়াছে এবং মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এবং সেই সুরেরই 'রেশ' তাঁহার হাসির কবিতাতেও ধ্বনিত হইয়াছে।

"আমোদ"এর কবিতা সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সুধী ও প্রবীণ রসজ্ঞের কর্ণে "সরল ও সুমিষ্ট এবং নির্ম্মল আনন্দপ্রদ" লাগিয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন "কবির "ছাইভস্ম" অন্যের মণিমুক্তা অপেক্ষাও মূল্যবান্।" রসময় বাবুর পরিহাস কবিতায় এই "নির্ম্মল" গুণ থাকাতে উহা আত্মীয়-বন্ধু সকলেরই নিকট অকুণ্ঠিতচিত্তে পাঠ করিয়া সামাজিক আমোদ আহ্লাদ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পাঁচজনে মিলিয়া পাঠ করিলে "আমোদ"এর কবিতা অধিকতর আনন্দপ্রদ হয়। আজকাল ছাত্রসমাজে যে আবৃত্তির (Recitation) আদর বাড়িয়াছে, সেই আবৃত্তির পক্ষে রসময় বাবুর হাসির কবিতা বিশেষ উপযোগী। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাহিলে যেমন মজ্‌লিস জমিয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস রসময় বাবুর পরিহাস কবিতা সভা-সমিতিতে আবৃত্তি করিলেও শ্রোতাগণ যথেষ্ট আমোদ পাইবেন।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নিকট রসময় বাবুর কবিতা আদর পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "ত্রিবেণী" কাব্য রসময় বাবুকে উপহার দিয়া তাঁহাকে যে "অনুজপ্রতিম কবিবর" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু যে রসময় বাবুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তাহা নহে, স্নেহাস্পদ কবির কবিত্বের উপরেও প্রগাঢ় অবস্থা ছিল। কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা" কাব্যে রসময় বাবুর নামে "উৎসর্গ" পত্রে লিখিয়াছেন, রসময় বাবুর "হৃদয় হাস্যরস ও করুণরস উভয় রসেরই অপূর্ব্ব উৎস।"

রসময় বাবুর 'আমোদ' পাঠ করিয়া মনস্বী সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এই দুঃখদৈন্য পূর্ণ জগতে যিনি আমোদের হাসি হাসাইতে পারেন, তিনি ধন্য। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এইরূপ হাসি হাসাইতেন। তিনি নাই, আপনি সেই হাসি হাসাইতেছেন। অতএব ধন্যবাদ আপনার

প্রাপ্য। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।" হিতবাদী বলিয়াছিলেন—"এই গ্রন্থের (আমোদের) কোন কোন কবিতা পাঠ করিয়া আমাদের আশা হইয়াছে যে রসময় বাবু আমাদিগকে কবি দ্বিজেন্দ্র লালের অকাল মৃত্যুর শোক ভুলাইতে পারিবেন।" মহামহোপাধ্যায় কবি সম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "আমোদে" হাসিলাম "ছাইভস্মে" হাসিলাম, এখন 'পুষ্পাঞ্জলি' লইয়া কি করিয়া বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করি? যে লোক হাসাইতে পারে, সে কাঁদাইতে পারে, ভাব দিতে পারে, ভক্তি উছালিয়া হৃদয়ে সাজাইতে পারে এটুকু আগে জানিতাম না। এখন দেখিলাম নিশ্চয়ই পারে—নিশ্চয়ই পারে। আপনার "পুষ্পাঞ্জলির" ফুল গুলির সৌরভ মনোহর। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই ভাবে বাণীর সেবা করিতে থাকুন। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কবিকে আশীস্ করিয়াছেন "বাঙ্গালার পরিহাস রস শুকাইয়া যাইতেছে, রসময় রস রক্ষা করিলে আমরা চরিতার্থ হইব!" আমরাও সেই কামনার সর্ব্বান্তঃকরণে পোষকতা করি। এবার যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহারা অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, "'আরাম' ও 'আমোদ' প্রভৃতি প্রণেতা সুকবি রসময় লাহার কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া পাঠকগণ হাস্য রসের মধুর আস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন।"

শ্রীনব কৃষ্ণ ঘোষ।

কখন।

কুচ্ছ মাখান তুচ্ছ বিভবে যখন আমরা মাতিয়া থাকি,
বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি তোমার হৃদয় হইতে সরায়ে রাখি। ১।
মত্ত হইয়া চিত্ত যখন বিত্ত বিষয়ে মাতিয়া যায়,
ভক্তিমাখান শক্তি তোমার তুচ্ছ করিয়া উড়াতে চায়। ২।
পূর্ণ কামনা চূর্ণ হইলে জীর্ণ জীব কাঁদিতে থাকি,
পুণ্য তখনি চরণ তোমার পুণ্য হৃদয়ে তোমারে ডাকি। ৩।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ।

মহাবলিপুর।

(The wave-covered city of Bali.)

মহাবলিপুরের সপ্তমন্দির হিন্দু-স্থাপত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইকথা বিশেষজ্ঞ বন্ধুদিগের মুখে শুনিয়া বহুদিন হইতেই উহা দেখিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিগত শারদীয় অবকাশে আমি মান্দ্রাজে ছিলাম। সেই সময় কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব মহাতীর্থ দেখিতে যাইবার আয়োজন করা গেল। মহাবলিপুরের পথ একটু দুর্গম, এই ত্বরিতগতির যুগে ইহার অর্থ এই যে সমস্ত পথটাই রেলে চড়িয়া চক্ষুর নিমেষে যাওয়া যায় না। কতক পথ জট্‌কা নামক একপ্রকার অশ্বচালিত যানে চাপিয়া যাইতে হয়। মহাবলিপুর মান্দ্রাজের চিঙ্গল্‌পাট্ জেলায় অবস্থিত। চিঙ্গল্‌পাট্ মান্দ্রাজ হইতে ৩৮ মাইল,—রেলে যাইতে হয়। চিঙ্গল্‌পাট্ হইতে মহাবলিপুর ১৮ কিম্বা ২০ মাইল। জট্‌কায় যাইতে হয়। হিন্দুর মোক্ষদায়ক সপ্ততীর্থের অন্যতম কাঞ্চী-পুরও এই চিঙ্গল্‌পাট্ জেলাতেই অবস্থিত। বেলা ১২টার গাড়ীতে রওনা হইবার জন্য পোঁট্‌লা পুঁটুলি বাঁধিয়া, ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম এবং জট্‌কা—তিনরকমের তিনখানি গাড়ীতে ছয় রকমের ছয়টি বন্ধু যথাসময়ে 'এগ্‌মোর' ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইলাম। যথাসময় নিরূপণ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর চিরাচরিত শিথিলতা মান্দ্রাজে যাইবার সময়ে যে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া যাই নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে, শেষ মুহূর্ত্তে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ছুটাছুটি করিয়াও সকলে সময়মত ষ্টেসনে পৌঁছিতে পারিলাম না। কাজেই চারঘণ্টা বিলম্বের পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্য ষ্টেসনেই বসিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বন্ধু ছিলাম ছয় রকমের ছয়জন, সুতরাং সময় কাটাইবার মতন একটা ফন্দি ঠাওরাইয়া লইতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে উক্ত ছয় বন্ধুর মধ্যে একজন বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনে বাসায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। অবশিষ্ট আমরা পাঁচবাবু অজ্ঞাতবাসে পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় ষ্টেসনের একপ্রান্তে সতরঞ্চি বিছাইয়া বসিয়া গেলাম।

পঞ্চপাণ্ডবের নামটা কেন এভাবে কলমে আসিয়া পড়িল, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। ও দেশে প্রবাদ যে চিঙ্গল্‌পাট্ এবং মহাবলিপুরের মধ্যবর্ত্তী পক্ষীতীর্থের সুরম্য শৈল শিখরে পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া ছিলেন; কাজেই মহাবলিপুর যাত্রার সময়ে অন্যান্য বহু কল্পিত চিত্রের

সঙ্গে গোপনচারী পাণ্ডববন্ধুদিগের চিত্রও মানসপটে উদিত হইতেছিল। তবে শুনিয়াছি যে পাণ্ডবেরা নাকি তাঁহাদের গুপ্ত প্রবাসের দীর্ঘ অবসর পাশা খেলিয়া কাটাইতেন, কিন্তু আমি নিজে "কচেবারয়" নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া আমাদিগকে অগত্যা 'ছকুড়ি সাতে'ই মনোনিবেশ করিতে হইল। চারিজনে খেলায় বসিলাম। অপর বন্ধু (একজন মালাবারি পোষাকি চাকর) ধূমপায়ী বন্ধুদিগের মুখাগ্নির ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে মান্দ্রাজ-প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুরা প্রায় সকলেই অগ্নিহোত্রী, কারণ তাঁহাদের কলিকা কুণ্ডের যজ্ঞাগ্নি প্রায় কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। কুণ্ডলায়িত-ধূমপ্রদায়িনী, বঙ্কিমসোহাগিনী বাঙ্গলার হুক্কা আঁধারিত (benighted) মান্দ্রাজে উপেক্ষিতা হইলেও, প্রবাসী বাঙ্গালী সেখানেও তার অমর্য্যাদা করে নাই। সুতরাং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে 'কৃষ্ণাগুণবতী'র পরিবর্ত্তে 'হুক্কাধুমাবতী'ই আমাদের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গিনী হইয়াছিল। এই তুলনার জন্য বোধ হয় কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক, কেননা, শ্রীমতী হুক্কা যখন 'কৃষ্ণা'ও বটে, গুণবতীও বটে, বহুভোগ্যাও বটে, আবার দ্রুপদ-নন্দিনীর তণ্ডুলকণার ন্যায় 'এক ছিলিমে'ই যখন বহুজনের ধূমপিপাসা-নিবারণ-সক্ষমা, তখন পাঞ্চালীর সঙ্গে তাহার তুলনা নিতান্ত অমার্জ্জনীয় হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। বিশেষতঃ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তীর ন্যায় শ্রীমতী হুক্কা বাঙ্গালীর প্রাতঃ-স্মরণীয়া ত বটেই।

যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে ৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, ট্রেণ আসিল, আমরাও ইষ্টদেবতার নাম লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেণ যথাসময়ে চিঙ্গলপাট্ পৌঁছিল। যখন আমরা নামিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাঙ্গালী দেখিয়াই পুলিশ আসিল, আমাদের বাপখুড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সম্বন্ধী শ্যালকের নাম ধাম পর্য্যন্ত লিখিয়া লইল। তবে চিঙ্গলপাটে আমাদের একটু জোর ছিল, কারণ নড়ালের মিষ্টার যতীন রায় তখন চিঙ্গলপাটে সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট। আমরা ষ্টেশন হইতে বরাবর সরকারী ধর্ম্মশালায় যাইয়া রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলাম। রাত্রিতেই জট্কা ঠিক করিয়া রাখিলাম। মহাবলিপুর পর্য্যন্ত যাওয়া আসার ভাড়া তিন খানায় ১২৲ বার টাকা স্থির হইল। শেষ রাত্রিতে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি যার যেমন অভিরুচি আহারাদি সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাল হইল না। পুণ্যশ্লোক দানবীর মহারাজ বলির রাজধানীর কল্পিত চিত্র স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম।

চারিটা বাজিতেই জট্কা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। আমরাও নিদ্রা পরিহার-

পূর্ব্বক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। অবশেষে যখন নবরবির প্রথম অলক্ত রেখা প্রাচীমূলের অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই "নিরমল পবিত্র উষাকালে" আমরা চারিজন বাঙ্গালী তামিল তেলিগুর দেশে বাঙ্গালীর বড় আদরের গান "অয়ি সুখময়ী উষে" গাহিতে গাহিতে যাত্রা করিলাম। আমাদের কলিকাতার সাধারণ ভাড়াটে ঘোড়গাড়ীর চেয়ে মান্দ্রাজের জট্কাগুলি চলে ভাল। তবে ঝাঁকিটা একটু বেশি সহিতে হয়। রথ বেশ ছুটিয়া চলিল। তথাপি আমরা আমাদের তামিল ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য "শীঘ্রম্ পো, শীঘ্রম্ পো"—অর্থাৎ 'দ্রুত যাও,' 'দ্রুত যাও' বলিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলাম। অনেকে হয়ত এই 'শীঘ্রম্' হইতে তামিল ভাষাকে আমাদের সংস্কৃতের সহোদরা বলিয়া মনে করিয়া লইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তামিলও অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা। তবে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণেরা দ্রাবিড়ে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে বহু সংস্কৃত শব্দ তদ্দেশীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করে; এখন তাহা তামিলের অঙ্গীভূত হইয়াই গিয়াছে। মহাবলিপুরের পথ বেশ সুগঠিত এবং নৈসর্গিক শোভা সম্পদে চিত্তাকর্ষক। রাস্তার দুইদিকে নারিকেল তরুর সারি, তৎপশ্চাতে গিরিশ্রেণীর ধারাবাহিক অবস্থান সমতল নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীর চক্ষে এক অভিনব দৃশ্য। মহাবলিপুরের অর্দ্ধপথে পঞ্চতীর্থ। আমাদের জট্কা সেখানে যাইয়া থামিল। তখন বেলা প্রায় ৮টা। আমরা জট্কা হইতে নামিয়া পায়চারি করিতে করিতে উচ্চ গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত "ভক্তবৎসলেশ্বর" মহাদেবের প্রাচীন রম্য মন্দিরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। অন্যদিকে পঞ্চতীর্থে আকাশচুম্বী 'গোপুর' পরিবেষ্টিত পরম রমণীয় দেউল দূর হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু ফিরিবার পথে সেখানে থামিবার সঙ্কল্প ছিল বলিয়া আমরা আর অধিক কালক্ষয় না করিয়া গন্তব্য তীর্থের উদ্দেশে জট্কায় আরোহণ করিলাম। বেলা প্রায় ১০॥০ টার সময়ে আমরা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই প্রান্তরের শেষ সীমায় প্রায় এক পোয়া মাইল প্রশস্ত বিলের ন্যায় এক জলাভূমির উভয় প্রান্ত গিয়া মহাসাগরে মিলিয়াছে, এবং উক্ত জলাভূমির অপর পার্শ্বেই জলধি-মেখলা মহাবলিপুর অবস্থিত। এ পার হইতেই সেই বিশ্ববিশ্রুত সপ্তমন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছিল। মহাবলিপুরের অবস্থান সামরিক হিসাবে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। পশ্চাতে বামে এবং দক্ষিণে অনন্ত বারিধি। সম্মুখে সুবিস্তৃত পরিখা। তারপরে বহু সৈন্য সমাবেশোপযোগী বিস্তৃত প্রান্তর। একটু

রথ চতুষ্টয়। (মহাবলিপুর)
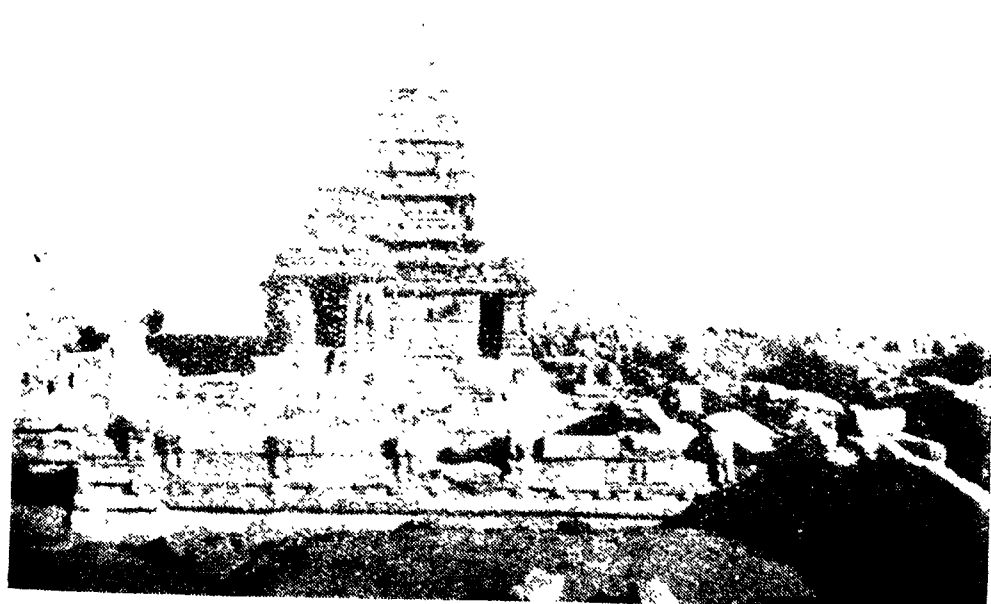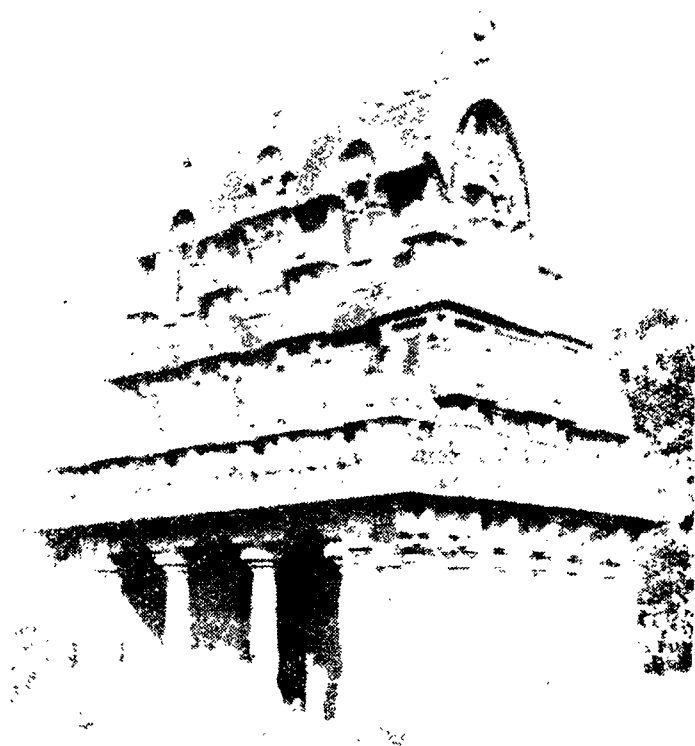
অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মহাবলিপুর কোনকালে হিন্দুর সামরিক শক্তির লীলা নিকেতন ছিল। সম্মুখস্থ জলাভূমির মধ্য দিয়া এখন বক্ল্যাণ্ড কেনাল সাগরে যাইয়া মিলিয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত খাল খননের বহু পূর্ব্বেও যে ওখানে বিশাল পরিখার অস্তিত্ব ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জলাভূমি পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে জল না ভাঙ্গিয়া পার হওয়া অসম্ভব। মহাবলিপুরে অনেকগুলি অনতিউচ্চ পাহাড় আছে এবং তার সবগুলিই কঠিনতম গ্রানিট্ প্রস্তরের। একটি পাহাড়ের উপরে এখন Light house অর্থাৎ সামুদ্রিক আলোকমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে রোমীয়, ফিনিসীয় এবং চৈনিক নাবিকেরা বহুদুর হইতে সপ্তমন্দিরের সূর্য্যকিরণ-ঝলসিত স্বর্ণগম্বুজ দেখিতে পাইত। এই মন্দিরগুলি অদ্যাপি সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি সুকঠিন গ্রানিট্ প্রস্তরের অখণ্ড পাহাড় হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে এই মন্দিরগুলিই প্রাচীনতম আদর্শ। ইলোরা, অজান্তা, নাসিক, কেনারী এবং এলিফাণ্টা প্রভৃতি স্থানে অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া যে সকল অদ্ভূত গুম্ফা রচিত হইয়াছে, মহাবলিপুরের সপ্তরথ তদপেক্ষাও আশ্চর্য্য সৃষ্টি, কারণ পূর্ব্বোক্ত গুম্ফাগুলির পাহাড় অপেক্ষা মহাবলিপুরের গ্রানিট্ প্রস্তর বহুগুণে কঠিনতর। শিল্পীর পরিকল্পনায়ও মহাবলিপুরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সামরিক হিসাবে মহাবলিপুরের অবস্থান যে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। বিরাট স্থাপত্য-প্রচেষ্টার অনুপাতে অনুমান করিতে গেলে ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্য এবং শক্তি কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। স্থানটি যে ভাবে মহাসাগরের উপরে অবস্থিত, এবং ইহার তিনদিক যে ভাবে সাগরের দিকে বিমুক্ত, তাহাতে ইহার আত্মরক্ষার উপযোগী নৌশক্তির অস্তিত্বও মানিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ খননের দ্বারা স্থানে স্থানে ফিনিসীয়, রোমীয় এবং চৈনিক প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায়, একথাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে কোনকালে মহাবলিপুর এসিয়ায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। খননের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব দুই কিম্বা তিন শতাব্দীতে মহাবলিপুর একটি সুগঠিত নগর ছিল। সমুদ্রতীরে বালুস্তর-নিম্নে সময় সময় প্রাচীন চৈনিক মোহর আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তীরভূমির সন্নিকটে নিমজ্জিত চৈনিক বাণিজ্য পোতের গর্ভ হইতে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাগুলি প্রবল জলস্রোতে বাহির হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে তীরদেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত বলিপুত্র অসুরপতি বাণরাজ কর্তৃক প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধের কারারোধ, এবং মহাবলিপুরে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের সমরাভিযান, এ সমস্ত কিম্বদন্তীও যে মহাবলিপুরের নৌশক্তির অস্তিত্বেরই প্রতিপাদক তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাবলিপুরের উৎপত্তি এবং অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ,—ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদপৌত্র মহাযশা দানবীর মহারাজ বলি সর্ব্বপ্রথমে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বলিপুত্র বাণরাজার কন্যা উষা গৌরীর বরে স্বপ্নযোগে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া মোহিত হন। পরে তিনি অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শনে তদাসক্তা হইয়া, সখী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহাকে ছদ্মবেশে মহাবলিপুরে আনয়ন করতঃ গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করেন। এই সূত্রে যে বিবাদের সূচনা হয়, তাহার ফলে অনিরুদ্ধকে মহাবলিপুরে কারারুদ্ধ হইতে হয়। ক্রমে মহাবলিপুর এবং দ্বারকার মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা হইতে আসিয়া সমুদ্রপথে মহাবলিপুর আক্রমণ করেন। বাণরাজার সহস্রভুজার্চ্চিত উপাস্য দেবতা মহাদেব স্বয়ং মহাবলিপুর রক্ষার ভারগ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকটে সরলবুদ্ধি আশুতোষ ভক্তকে অবশেষে হার মানিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে শিবের অনুগৃহীতকে সোজাপথে পরাজিত করা একেবারেই অসম্ভব, তখন তিনি কূটনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ছদ্মবেশে বাণরাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া একেশ্বরবাদের প্রতিকূলে সাংখ্য মত প্রয়োগ করিয়া তাঁহার চিত্তে দ্বৈত ভাবের উন্মেষ করাইয়া দেন, এবং তাহাতে তাঁহার শিবভক্তিচ্যুতি ঘটে। এইরূপে তাঁহাকে শিবানুগ্রহে বঞ্চিত করিয়া পরে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ নিজ পূজার জন্য বাণরাজের মাত্র দুইখানি হস্ত অবশিষ্ট রাখিয়া সহস্রভুজের আর সমস্তই কাটিয়া ফেলেন, এবং আদুরে নাতিটির উদ্ধার সাধন করিয়া স্নেহান্ধ দাদামহাশয় বিজয়গর্ব্বে রাজধানী দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই ভুজচ্ছেদনের কাহিনী হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে এই মহাসংগ্রামের ফলে মহাবলিপুরের অবস্থা নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার পরে বহুকাল পর্য্যন্ত আর এই নগরের নাম শুনা যায় নাই। যুগযুগান্ত পরে পুনরায় এক শক্তিশালী রাজা মহাবলিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একদিন রাজধানীর উপকণ্ঠে ছদ্মবেশে বেড়াইতেছিলেন, তখন একটি পরম রমণীয় নির্ঝরের সুমধুর কলনাদে আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে দুইজন বিদ্যাধরী সেই ঝরণার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিতেছে।

তিনি তাহাদের নগ্ন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাহাদের একজনকে একেবারে ভালবাসিয়াই ফেলিলেন। রাজা রাজোয়াড়ার ভালবাসা বিদ্যাধরীরাও চাহে, কাজেই তাঁহাকে এক্ষেত্রে "উদ্বাহুরিববামনঃ" ব্যর্থকাম হইতে হয় নাই। ভাল-বাসা ক্রমে পাকিতে লাগিল, দেখা সাক্ষাৎও ক্রমেই ঘন ঘন হইতে লাগিল। বিদ্যাধরীদিগের মুখে ইন্দ্রপুরীর শোভা সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া রাজা স্বর্গ দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার প্রেমপাত্রীর নিকটে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে একদিন বিদ্যাধরীদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক পুরুষ দেবতা তাহাদের সঙ্গে আসিয়া মর্ত্ত্যের এই রাজাকে ইন্দ্রপুরী দেখাইবার জন্য গোপনে ছদ্মবেশে স্বর্গে লইয়া গেলেন। রাজা ইন্দ্র-পুরীর শোভা সন্দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং উহারই আদর্শে নিজরাজধানী পুনর্গঠনমানসে নবভাব এবং নব আকাঙ্ক্ষা লইয়া মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ক্রমে মহাবলিপুর শোভা-সম্পদে ইন্দ্রপুরের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। ভূতলে ইহার আর তুলনা রহিল না। স্বর্গের দেবতারা ইহাতে অতিমাত্র ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া জলদেবতা বরুণের নিকটে আরজি করিলেন। মানুষে মানুষে বিবাদ বাধিলে দেবতারা চির-দিনই অপক্ষপাত বিচার করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম,—তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু দেবতায় আর মানুষে বিবাদ বাধিলে, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, দেবতা দেবতার পক্ষেই রায় দিয়া থাকেন; ইহাও তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম,—তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে বরুণ মহাবলিপুরের উপরে ধ্বংসের আদেশই পাস্ করিলেন। অমনি মহাজলধি উত্তাল তরঙ্গে উথলিয়া উঠিয়া "ভূতলে অতুল যার নাম" সেই স্বর্গতুল্য নগরের সকল গৌরব হরণ করিয়া নিল।

সেইদিন হইতে মহাবলিপুর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রের লোলিহান জিহ্বা এখনও বর্ষার সময়ে মহাবলিপুরের বক্ষ লেহন করিতে ছাড়ে না। সবই গিয়াছে, কেবল অবশিষ্ট সাতটি মন্দির এখন বিগত-বৈভবের সাক্ষীরূপে বালুস্তূপের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া এখনও সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করি-তেছে। পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মহাবলিপুর একসময়ে শক্তি এবং সম্পদের চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিল এবং অবশেষে কোন বিষম বিপ্লবের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে। সিন্ধুতীরে অবস্থিত যে মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হইল, উহা এক রকম সাগরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কারণ

দুইদিক হইতে বারিধি উহার ভিত্তিমূল গ্রাস করিয়াছে। নীরনিধির নীলাম্বুরাশি উত্তালতরঙ্গে অদ্যাপি ঐ মন্দিরের মূলে আসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে, ভৈরবগর্জ্জনে আঘাত করিতেছে, কিন্তু প্রতিহত এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া মহাসাগরের তাণ্ডবনৃত্য, অজস্র চীৎকার এবং ফেনোদ্গার এক ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় করিতেছে। মন্দিরের উত্তরে দাঁড়াইয়া সেদিকে দৃষ্টি-পাত করিলে ভয়ে এবং বিস্ময়ে চিত্ত একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। কত যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেবতার শক্তিকে বেদখল করিয়া ফিরাইয়া দিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এমনই সুন্দর আরও কত মন্দির যুগে যুগে সাগরের বিশাল বুভুক্ষা নিবারণ করিতে মহাবলিপুর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ প্রাচীন নাবিকদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে শত শত বর্ষ পূর্ব্বেও বহু নিমজ্জিত মন্দিরের তরঙ্গ-বেষ্টিত স্বর্ণচূড়া মধ্যাহ্নরবির কিরণসম্পাতে সাগরবক্ষে ঝলমল করিত। ইংরাজ-কবি সাদীর (Southey) অমরলেখনী অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সেই শোকাবহ দৃশ্য চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে,——

"Their golden summits in the noon day light
Shone o'er the dark green deep that rolled between,
For domes and pinnacles and spirels were seen
Peering above the sea—a mournful sight!
Well might the sad beholder wean from thence
What works of wonder the devouring wave
Had swallowed there, when monuments so brave
Bore record of their old magnificence."

মহাবলিপুরে সিন্ধুতীরের শোভা যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। ভাষায় এমন শব্দ নাই যাহা প্রয়োগ করিয়া সেই সান্ত এবং অনন্তের মিলন-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায়। যদি মানসপটে অঙ্কিত করা যায় যে—সেই সাগরচুম্বিত সুদীর্ঘ "সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকতে" অবশিষ্টটির মতন আরও বহু মন্দির শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর তাহাদের স্বর্ণমণ্ডিত সুন্দরশীর্ষে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদীয়মান বালরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া—চুণী কাঞ্চনের যোগে মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রভাতারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে এবং অসংখ্য ভক্তের মধুরকণ্ঠ নিঃসৃত ভগবদারাধনা সঙ্গীতের মোহন-

ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া নৃত্যপর সাগর-তরঙ্গ তালে তালে মন্দিরপাদমূলে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে, তাহা হইলেই—প্রাচীন মহাবলিপুরের সিন্ধুতীরের শোভা আংশিকরূপে অনুমিত হইতে পারে।

অপর মন্দিরগুলির কোনটি সিন্ধুতীর হইতে অর্দ্ধ মাইল. কোনটি একমাইল, এইরূপ দূরে দূরে অবস্থিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সপ্তমন্দির ছাড়া ঐ স্থানে আরও কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অখণ্ড পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অর্জ্জুনের তপস্যা. শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ এবং গোচারণ প্রভৃতি পৌরাণিকচিত্র প্রাচীন শিল্পের অসীম ধৈর্য্য এবং অদ্ভুত নৈপুণ্যের নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এসকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। মহাবলিপুরের সপ্তমন্দিরকে তাহাদের আকৃতির বিশেষত্বের জন্য পণ্ডিতেরা "সপ্তরথ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যে রথচতুষ্টয়ের ছবি এইবারে প্রকাশিত হইল, উহাদের অবস্থান হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত চারিটি মন্দিরই একটি অখণ্ড প্রস্তরের পাহাড় কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উহাদের ছবি না দেখিলে মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য এবং অসাধারণত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। মন্দিরগুলির কোনটি দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল, কোনটি চতুস্তল এবং কোনটি পঞ্চতল পর্য্যন্ত উঠিয়া অবশেষে চূড়ায় যাইয়া শেষ হইয়াছে। মন্দিরগুলির বাহিরে শিল্পী যে অসাধারণ নৈপুণ্য এবং সামঞ্জস্য বোধের পরিচয় দিয়াছেন, অভ্যন্তরে তাহা আদবেই লক্ষিত হয় না। পরন্তু ভিতরের প্রাচীর, ছাদ এবং গৃহতল সমস্তই শিল্পীর যেন অবহেলার পরিচায়ক; কারণ উহার কুত্রাপি সমতল, মসৃণ, কিম্বা কোন একটা বিশিষ্ট আকার প্রদানের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তর এবং বাহিরের এই অসামঞ্জস্যের কারণ নিরূপণের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোন বিষম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় এগুলি অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে শিল্পী তাঁহার পরিকল্পনায় ভুল করিয়াছেন। তিনি আগে না বুঝিয়া উপরের ভার বেশি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ভিতরে বেশি কাটিলে ক্ষীণ প্রাচীর উপরের বোঝা বহিতে পারিবে না, তখন অনন্যোপায় হইয়া অভ্যন্তর ভাগ ঐরূপ অসম্পূর্ণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই দুই যুক্তির প্রথমটির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সবগুলি মন্দিরই একই সময়ে আরম্ভ করা হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইলে, একই সময়ে

একই ভাবে, তাহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল, একথা মানিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে! কিন্তু এ প্রকারের এতগুলি বিরাট অনুষ্ঠান সমস্তই একসময়ে প্রারব্ধ হইয়াছিল বলিয়া ভাবিয়া লইতে কেমন একটি দ্বিধা বোধ হয়! তার পরে রথগুলির সমস্তই সমায়তন নহে, সুতরাং তাহাদের গঠনকার্য্য শেষ করিতে কখনই সমসময়ের প্রয়োজন হয় নাই। তবে আকস্মিক বিপ্লববিশেষের দ্বারা সবগুলি মন্দিরই একই ভাবে অসমাপ্ত রহিয়া গেল কেন? এতদ্ব্যতীত মন্দিরদেহে উৎকীর্ণ চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও শিল্পনৈপুণ্যের ক্রম-পরিণতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সবগুলি মন্দির সমসাময়িক হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত কি?

দ্বিতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক্ষেত্রেও মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকার্য্য একই সময়ে আরম্ভ এবং একই সময়ে শেষ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কেন না, সেরূপ না হইলে সবগুলি মন্দিরেই শিল্পী একই ভুল করিয়া বসিতেন না। তারপরে অভ্যন্তর উত্তমরূপে কাটিয়া লওয়ার ফলে একটি মন্দিরও ফাটিয়া বা ধসিয়া গিয়াছে, যদি এরূপ কোন নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিত, অন্ততঃ তাহা হইলেও দ্বিতীয় যুক্তির সারবত্তা কতক পারমাণে স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু সেরূপ কোন নিদর্শন নাই। যুগযুগান্ত ধরিয়া মন্দির-গুলি প্রকৃতির সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াও ফাটে নাই, ভাঙ্গে নাই, ধসে নাই,—যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। সবগুলি মন্দিরের ভিতরের গুম্ফা ঠিক একই ভাবে অসমাপ্ত বা অবহেলিত দেখিতে পাই। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, শিল্পীর ভুলের মধ্যেও একটা পদ্ধতি ছিল? আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ভাল, যদি মানিয়া লওয়াই যায় যে, ভিতরের যতখানি কাটা হইয়াছে, উহার বেশী আর কাটিলেই মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও নিপুণশিল্পী যতখানি কাটিয়া-ছিলেন, অন্ততঃ ততখানি ত উত্তমরূপে সমতল, মসৃণ এবং বিশিষ্ট আকারযুক্ত করিতে পারিতেন? কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। বাহিরে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি দৃষ্ট হয় না, কুত্রাপি অবহেলার চিহ্ন মাত্র নাই। যত ত্রুটি যত অবহেলা সমস্তই ভিতরে রহিয়া গেল; ইহার কারণ কি? এবিষয়ে আমাদের অভিমত নিম্নে বিবৃত করা গেল। আমি ইতিপূর্ব্বে "মাউন্ট আবু" শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে বলিয়াছিলাম যে "দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে শিল্পীর দৃষ্টি বিরাটে কিন্তু বহিরঙ্গে, আর জৈন স্থাপত্যে শিল্পীর দৃষ্টি সুন্দরে কিন্তু অন্তরঙ্গে।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করিয়াছেন যে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম আদর্শ

এই মহাবলিপুরের 'সপ্তরথ।' সুতরাং ময়দানবের স্থাপত্য যে এইখানেই তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাদ্রাজের সর্ব্ব মহাতীর্থে এই একটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় যে, দেবতার সিংহাসন যেখানে অবস্থিত সেখানে শিল্পীর হস্ত স্তব্ধ। যত নৈপুণ্য বাহিরে এবং গোপুরে, কিন্তু দেবতার অধিষ্ঠানগৃহ শিল্পের হিসাবে নিতান্তই দরিদ্র, এমন কি অবহেলিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের এই ধারাটির জন্মও মহাবলিপুরেই হইয়াছিল মনে হয়। প্রাচীন শিল্পী বোধহয় মনে করিতেন যে, মানুষের শিল্পনৈপুণ্য বাহিরের বস্তু, তাহা থাকিবেও বাহিরে; ভিতরে থাকিবেন দেবতা,—যিনি স্বয়ং সিদ্ধ, আপন মহিমায় সমুজ্জল। ভক্ত সেখানে কেবল তাঁহাকেই দেখিবে। মানবের কোন কৃতিত্ব সেখানে তাহার মুগ্ধদৃষ্টিকে কেন্দ্রচ্যুত করিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

প্রার্থনা।

প্রভো,

নরকে যাইব বলে যদি,
　　আমি পূজিগো তোমায়,
প্রার্থনা আমার শুনিও না কভু
　　সে অনলে দহিও আমায়;
যদি আমি চিরশান্তি তরে
　　ভজি ওগো তোমার চরণ,
সে আশা আমার, প্রভু তুমি
　　কভু যেন করোনা পূরণ;
কিন্তু যদি তোমারি উদ্দেশে
　　তোমারেই করিগো অর্চ্চনা,
তখন তোমার কাছে নাথ,
　　আছে মোর একটী কামনা;
তোমার অসীম করুণার কণা
　　দিয়ো হে আমায় দিয়ো,
জীবনের মাঝে তব ও চরণে
　　নিয়ো হে আমায় নিয়ো।

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপাই

রাণী শ্রীতারাদেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

বর্ত্তমান নেপাল যাঁহার হাতে গড়া উন্নতশীল ও পরাক্রান্ত রাজ্য, মূর্ত্তিমান্ পুরুষকার সেই জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ যিনি, তাঁহার ভাগ্য যে অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়াই এক সময়ে বিবেচিত হইত, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিধাতার লীলা বোঝা ভার! শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যেও সহসা এমন শোচনীয় বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় যে তাহা মনে করিতেও একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। এমন কঠোর প্রাণ বোধ হয় এ পৃথিবীতে কাহারও নাই, যার প্রাণ না ইহা দেখিয়া বড় গভীর বেদনায় কাঁদিয়া উঠে। এমনই এক দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় রাণী শ্রীতারাদেবীর জীবনে ঘটিয়াছিল। জীবনের গতিই তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দিকে ফিরাইয়া দিল,—ইহজীবনে নূতন এক নিয়তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। একদিকে এক হিসাবে ইহা যত বড় দুর্ভাগ্যের ফলই হউক, অপর দিকে অন্য হিসাবে, এই গতি এই নিয়তিই নারীশক্তির উন্নত মহিমায় তাঁহার নাম আজ বড় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত শক্তি যদি কাহারও অন্তরে নিহিত থাকে, দুর্ভাগ্যের ও বিপদের কঠোর তাড়নাতেই তাহার ক্রিয়ার বিকাশ ও পরিচয় হয়। সুখ সৌভাগ্যের কোমল বিলাসলীলায় তাহা অনেক সময় সু~ হইয়া থাকে, ক্রমে লুপ্ত হইয়াই যায়।

স্বাধীন নেপালের রাজশক্তি-পরিচালনায় একদিন স্বামী রাণা জগৎ জঙ্গ বাহাদুরের সহযোগিনী হইবেন, ইহাই তারাদেবী তাঁহার জীবনের নিয়তি বলিয়া জানিতেন। সহসা একদিন আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বামী, স্বামীর বংশধর, দেবর, সকলে চক্ষের সমক্ষেই নিহত হইলেন। পার্থিব জীবনে সৌভাগ্য বলিয়া যাহা কিছু কাম্য মানবজীবনে থাকিতে পারে, সব একদিনে এক আঘাতে বিনষ্ট হইল। সর্ব্বস্বহারা বিপন্না রাজবধূ বিজন তেরাই প্রদেশে বহু বৎসর সকল সুখশান্তিহীন, সকল কর্ম্মবিহীন জীবন যাপন করিয়া প্রাচীন বয়সে বৃটিশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যার বড় নাই বিপৎপাতে, জীবনে সুখের যাহা কিছু সব হারাইয়া, প্রাচীন বয়সে কোনও কর্ম্মের প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উৎসাহ প্রায় কাহারও চিত্তে আর থাকে না। জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, জগতের কর্ম্মকোলাহলের বাহিরে কোথাও নির্জ্জনে ও নীরবে পরলোকের চিন্তা এবং পূজা অর্চ্চনাদি লইয়াই বাকী জীবনটুকু কোনও মতে কাটাইয়া দিতেই সকলে চাহেন।

কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি লইয়া যাঁহারা জন্মিয়াছেন, বিপদ যত বড়ই হউক এবং জীবন প্রবাহ যতদূরে—সীমান্তের সেই মহাসিন্ধুর যত কাছেই—গিয়া পৌঁছিয়া থাক, তাঁহাদের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি অভিভূত ও শিথিল হইয়া থাকিতে চায় না, থাকিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের বাধা ও বিরোধের মধ্যেও যে দিকে যতদূর পারে, সেই দিকে ততদূর ব্যাপিয়াই আপনার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতে চায়।

রাণী শ্রীতারাদেবীর বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে যাঁহারই কিছু পরিচয় হইবে,—তিনিই অনুভব করিবেন, ইনি অসাধারণ প্রতিভা ও অদম্য অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির অধিকারিণী। এই প্রতিভা, এই শক্তি কোনওরূপ অবস্থারই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না,—সকল গণ্ডীর সকল বাধা আপন বলে অদম্য উদ্যমে দূর করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় এবং যতদূর সম্ভব প্রকাশ করে। প্রতিভা ও শক্তি যত বড়ই থাক্, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায়—এই বিদেশে প্রাচীন বয়সে নিঃসহায়া নারী যে বিস্তৃত কোনও নূতন কর্ম্মক্ষেত্র আপনার জন্য সৃষ্টি করিয়া লইবেন, তাহা একেবারে সম্ভব নয়।

কিন্তু তাই বলিয়া ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়াও তিনি চুপ করিয়া কোথাও অসহায় অবলার মত নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহেন নাই। কয়েক বৎসর হইল মাত্র তিনি ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহার বয়স এখন ষাট বৎসরের উপরে,—কিন্তু এই বয়সেও ভারতে আসিয়া অবধি তিনি নানাস্থানে অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছেন। উচ্চতম রাজপুরুষগণ, দেশীয় রাজগণ ও জমিদারগণ এবং অন্যান্য বহু কর্ম্মক্ষেত্রের নায়কস্থানীয় বহুজনের সঙ্গে তিনি আলাপ পরিচয় করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াও বক্তৃতাদি করেন। শুধু ইহাই নহে, এই বৃদ্ধ বয়সে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সব দেশের ও জাতিসমূহের শিক্ষা, সভ্যতা, রীতি নীতি, সামাজিক অবস্থা ও রাষ্ট্রশাসন প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিবার প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা ইঁহার আছে। সংকল্পও স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগবিপর্য্যয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সে সংকল্প এখনও ইনি কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলেই যাইবেন, এইরূপ এখন মানস করিয়াছেন।

নিয়ত এই যে পরিভ্রমণ, সর্ব্বদা এই যে বহুস্থানের বিভিন্ন পদের, বিবিধ সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য এমন একটা উদ্যম, এই যে ভবিষ্যতে আরও দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবার বাসনা, এই

সকলের মূলে এই প্রতিভাময়ী রাজবধূর বড় একটা প্রবল জ্ঞানপিপাসা রহিয়াছে তিনি নিজেই বলেন, "নেপালে যে এতদিন ছিলাম, যেন জগতের বাহিরে পড়িয়া-ছিলাম,—কিছুই জানিতাম না, কিছুই এমন শিখি নাই। এখন এই বাহিরের বিস্তৃত জগতে, ইহার বিরাট্ ও বৈচিত্রময় কর্ম্মপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহের সংস্পর্শে আসিয়া, কেবলই এই আকাঙ্ক্ষা হয়, যাহা দেখি নাই তাহা দেখি, যাহা শিখি নাই তাহা শিখি। তাই এত দুঃখের পরেও চুপ করিয়া কোথাও থাকিতে পারি না। সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াই, সকলের সঙ্গে আলাপ করি,—শিখিবার এমন সুযোগ পাইয়া কেন তাহা হেলায় অবহেলা করিব? জীবনের বাকী যে কয়দিন আছে, আর ত কিছু এমন করিবার নাই, দেখিয়া ও শিখিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াই লইয়া যাই।"

এই জ্ঞানপিপাসা ইঁহার এত বলবতী যে নানাস্থানে ভ্রমণকালে যদি কোথাও শুনিতে পান, কাছে কোথাও প্রাচীন কোনও কীর্ত্তির চিহ্ন রহিয়াছে,—পথ যতই দুর্গম হউক, যাত্রা যতই কঠোর ক্লেশবহুল হউক, রাণী তারাদেবী অতি আগ্রহে সেখানে যান, বিশেষ মনোযোগের সহিত—ঠিক প্রত্নতত্ত্ববিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া, প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

নেপালে থাকিতেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন,—এই সাহিত্যের আলোচনা এখনও তাঁহার জীবনের একটি বড় আনন্দ। আর্য্য সঙ্গীতশাস্ত্রেও ইঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ।

এই প্রতিভা, এই পাণ্ডিত্য, এই জ্ঞানপিপাসা, তাহার উপর চিত্তের অসাধারণ ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য, রাজকীয় মহিমা ও মর্য্যাদাবোধের মধ্যেও সুপরিমার্জ্জিত শিষ্ট অমায়িক ব্যবহার, মর্ম্মস্পর্শী কাব্যকথাবৎ জীবনের দুঃখময় কাহিনী—সেই দুঃখেও চিত্তের ও ব্যবহারের এমন একটা প্রশান্ত ধীরতা ও সর্ব্ববিধকর্ম্মে অক্লান্ত উৎসাহের একটা জীবন্ত আত্মপ্রকাশ—তার মধ্যে আবার আদর্শ আর্য্যনারীর সম্ভ্রমের সঙ্কোচ,—মানব জীবনে দুর্লভ এই যে সব গুণ,—এই সব গুণের প্রভাবেই যেখানে যে সমাজে তারাদেবী গমন করিয়াছেন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি-মহিষী স্বর্গীয়া লেডী হার্ডিঞ্জ, প্রধান সেনাপতি সার ও মুর ক্রাগ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স, প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ,—কাশ্মীর, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি প্রধান দেশীয় রাজগণ,—স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে,

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান জননায়কগণ, দ্বারবঙ্গ, বর্দ্ধমান—কাশিমবাজার, নশিপুর, প্রভৃতি জমিদার-রাজগণ,—অনেক প্রধান প্রধান রাজ্যের রাণীগণ, উচ্চপদস্থা উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ, অনেকেই ইহার সঙ্গে সুপরিচিত এবং ইহার বন্ধুস্থানীয়। *

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তরপাড়ার Calcutta Literary Club অর্থাৎ কলিকাতা সাহিত্য সমাজের—উনচত্বা-

* এই কয় বৎসরে তাঁহার পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও নামের একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন,—দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপে ও পরিচয়ে জ্ঞানলাভের দিকে তাঁহার প্রয়াসের বিস্তৃতি কতদূর,

The late lamented Her Excellency Lady Hardinge, Vicereine of India ; Her Excellency Lady Creagh ; His Excellency General Sir O'Moor Creagh, V. C., G. C. B., G. C. S. I., G C. I. E. ; the Commander-in-Chief in India, the Right Reverend Lord Bishop Dr. Copleston the Metropolitan of India ane Lady Copleston ; Hon'ble Sir James DuBouley, K. C. S. I., Private Secretary to His Excellency the Viceroy and Governor General of India ; Hon'ble Justice Si Lawrence Jenkins, KT., K. C., K. C. I. E., the Chief Justice of Bengal r Hon'ble Justice Sir John Woodroffe, KT. ; Hon'ble Justice Mr. and Mrs. A. Chowdhury ; Reverend Canon Dr. E. F. Browen, M.A., D.D (Oxn), Father Superior of the Oxford Mission and Reverend W. R. Holmes ; the late lamented Hon'ble Mr. Gopal Krishna Gokhale, C.I.E. ; the Hon'ble Mr. Surendra Nath Banerjee, Editor Bengalee ; Sir Mirza Davood, K.B.M.G. the Consul-General for Persia ; the Consul-General for Japan ; the Consul for the United States of America ; the Imperial and Royal Consul-General for Austro Hungray ; the Royal Greek Consul-General ; the Consul General for Spain, and the Consul General for Spain ; H.H. the Ruler Holkar and Maharani Sahiba of Indore. ; H.H. the Ruler of Tehri, (Garwhal), ; H.H. the Ruler of Tippera, ; H.H. the Hon'ble Maharaja Sahawggi of Yanghue, K S.M., C.I.E., ; the Shan Chief of Burma ; H.H. the Maharani Sahiba of Sikkim ; the Maharani Sahiba of Hutwa ; the Maharani Sahiba of Bettiah ; the Chakma Chief Raja Bhuban Mohan Roy Bahadur ; Raja Sarat Chandra Roy Chowdhury Bahadur of Chanchal ; the Feuditory Chief of Nilgiri ; the Hon'ble Nawab of Murshidabad, K.C.V-O., K.C.I.E. ; Hon'ble Maharaja Bahadur of Darbhanga, G.C.I,E , K.C.I.E., Hon'ble Maharaja-Dhiraj and Maharani-Adhirani Sahiba of Burdwan, K.C.S.I., K.C.I.E., I.O.M. Hon'ble Maharaja Sir Manindra Chandra Nunby Bahadur of Cossimbazar, K.C.I.E. ; the Hon'ble Raja Bahadur and Rani Sahiba of Kakina ; Hon'ble Maharaja Bahadur of Nashipur ; Prince Mohmed Bukhtiar Sah, C.I.E. ; the Raja Sahib of Paigpur (Oudh) ; Raja Bahadur of Bhaipur (Palamou) Raja Sahib of Deo (Gya) ; of Miss. Cornelsia Sorabjee, Bar-at-Law.

বিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বড় একটি সভা হয়। বহু ইংরেজ ও দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভ্যগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া,—এই সভায় রাণী তারাদেবী সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার কিয়ৎদংশের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পাঠকবর্গ তাঁহার প্রতিভার ও শক্তির, তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বের বিশেষ একটা দিকের পরিচয় পাইবেন।

"আমি এই দেশে আসিয়াছি,—জ্ঞানগৌরবে পূর্ণ এই দেশই এখন আমি আমার স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি,—বাকীজীবন এ দেশেই কাটাইব। যে কয়টি সহজ সরল নীতির শিক্ষা আমার জীবনকে গঠন করিয়াছে, এ দেশের বালকবালিকাদিগকে—হিমাচল হইতে আগতা মাতার ন্যায়—তার সম্বন্ধেই যদি আমি উপদেশ দিয়া জীবন কাটাইতে পারি, তার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত এই বৃদ্ধা হিন্দুবিধবার পক্ষে আর কিছু যে হইতে পারে, এরূপ আমি মনে করি না।"

"আহা, এই ভারতবর্ষ, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি,—যেখানে কত সব মহৎলোক মানবজাতির উন্নতিসাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—সাধুরা ও ঋষিরা যেথানে মানবজাতির মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বড়দিনে উক্ত ক্লাবের প্রযত্নে রাণীসাহেবার কলিকাতার বাসগৃহে আর একটি সভা হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রসঙ্গে রাণী একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। তাহারও কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"যদিও আমি নারী এবং বয়সে প্রাচীনা, তবু আমি ক্ষত্রিয়নারী। ক্ষত্রিয় শোণিত আমার শিরায় শিরায় যেন নাচিয়া উঠিতেছে এবং যখনই আমার মনে হয় বৃটিশ রাজশক্তির সুপরিক্ষিত বন্ধু স্বর্গীয় জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ আমি, এই যুদ্ধে গিয়া বৃটিশশক্তির সহায় হইয়া দাঁড়াইবার অদম্য একটা আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, যেন উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হয়। * * * "কেহ কেহ বলিতে পারেন, যুদ্ধে যাইবার জন্য যদি আমার এত বড়ই আগ্রহ, তবে যাইবার চেষ্টা করিতেছি না কেন? চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম। আমাকে এবং আমার সেক্রেটারী শ্রীযুত হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য রাজপ্রতিনিধি লর্ডহার্ডিঞ্জের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করিবার কোনও উপায় তিনি আপাততঃ দেখিতে পাইতেছেন না।"

তারাদেবীর ১২।১৩ লক্ষ টাকার জহরৎ অলঙ্কার ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের গোল-যোগে অনেক নষ্ট হয়। এখনও ৪।৫ লক্ষ টাকার জহরৎ তাঁহার সঙ্গে আছে। এই জহরতের মূল্য দ্বারা, এবং শ্বশুরকুলের আর যাঁহারা ভারতে আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা, কাশীতে একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন,—তারাদেবীর এইরূপ একটি মহৎ সঙ্কল্প আছে। এই আশ্রমের বিধবারা যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে এবং হিন্দুসঙ্গীতে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

এই আশ্রমে শিক্ষা প্রাপ্তা বিধবারা কেহ কেহ দেশীয় রাজপরিবারসমূহের রাণী ও রাজকুমারীগণের শিক্ষাসঙ্গিনী ও কর্ম্মসহযোগিনী রূপে স্থান গ্রহণ করিবেন, আবার কেহ কেহ সাধারণ হিন্দুসমাজের মধ্যে নারীদের শিক্ষাকার্য্যের ভার নিবেন। তারাদেবীর ইচ্ছা, আশ্রমস্থিত বিধবাদের শিক্ষার এই দুটি প্রধান লক্ষ্য থাকিবে। কতদিনে এই মহৎ সংকল্প রাণীসাহেবা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন জানি না,—তবে যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। কাশীতে যদি এমন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, জীবনের কর্ম্মের লক্ষ্য যাহাই হউক, সংসারে সকল সুখে বঞ্চিতা, উচ্চশিক্ষা ও উচ্চলক্ষ্যবিহীনা, অভাগী বিধবারা যদি শিক্ষার ও সাধনার এমন একটি উন্নত আশ্রমের আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, হিন্দু-সমাজের পক্ষে ইহার বড় মঙ্গল অনুষ্ঠান আর যে কি হইতে পারে জানি না। কাশীতে রাণী সাহেবার অর্থে ও যত্নে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইলে, কাশীতে মা অন্নপূর্ণার মতই তারাদেবীর নাম ভক্তিতে সকলে উচ্চারণ করিবে,—সহস্র অনথার নিয়ত আশীর্ব্বাদ পরলোকে শত পুত্রের প্রদত্ত জলপিণ্ড অপেক্ষাও অনেক বেশী তৃপ্তি তাঁহাকে দিবে!

ইহা ব্যতীত তাঁহার স্বনামধন্য শ্বশুরের একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ এবং কলিকাতার তাঁহার স্মৃতি প্রতিষ্ঠা, এই দুইটি সংকল্পও তাঁহার আছে। জীবনী লেখার ভারও তিনি বঙ্গীয় কোনও লেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

নেপালের আদিম অধিবাসী নেওয়ারগণ মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। চীন তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, তাতার প্রভৃতি দেশে মঙ্গোলীয় জাতির যে বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান আছে, আদিম যুগ হইতে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তাহাদের সভ্যতা ও আচার নিয়মের ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু উপাদান তারাদেবী সংগ্রহ করিতেছেন। এই উপাদানের সাহায্যে মঙ্গোলীয়জাতির একটি বিস্তৃত ইতিহাস কাহারও দ্বারা লেখাইবেন, ইহাও তাঁহার বড় একটি মানস আছে।

বাহিরে বিবিধ দিকে এত বড় কর্ম্মচেষ্টার মধ্যেও গৃহে তারাদেবী আদর্শ হিন্দুনারী, আদর্শ হিন্দু বিধবা। গৃহে দৈনিক জীবন কেমন একটা বাঁধা নিয়মে কি ভাবে তিনি যাপন করেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রত্যূষে উঠিয়া তারাদেবী স্নান—গঙ্গাতীরে থাকিলে গঙ্গাস্নানই—করেন। (কলিকাতায় যখন থাকেন, প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া গঙ্গাস্নান ও মন্দিরে পূজা করেন।)

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পূজা করেন। ১১টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত পরিজনগণের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাহাদের আহারাদি কার্য্যের পরিদর্শন করেন। তারপরে নিজে হবিষ্য করেন।

হবিষ্যের পর ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করেন। তারপর একঘণ্টা কাল মাত্র বিশ্রাম করেন।

বেলা পাঁচ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গৃহে আগত ভদ্রলোকগণের সঙ্গে আলাপ করেন। ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আবার সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। তারপর পরিজনগণের দেখাশুনা প্রভৃতি কার্য্য যা থাকে, তাহা করিয়া, সামান্য কিছু জলযোগান্তে গৃহতলেই কম্বল বা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করেন।

৪০।৫০ জন পরিচারক-পরিচারকাদি লইয়া তারাদেবী তাঁহার গৃহে বাস করেন। ইহারাই তাঁহার পরিবার স্বরূপ। কিন্তু ইহাদের সেবা তাঁহার নিজের আরামবিরামের জন্য অতি কমই প্রয়োজন হয়। নিজেই তারাদেবী ইহাদের সুখসচ্ছন্দতা বিধানে যত্ন করেন, সস্নেহ মিষ্ট ব্যবহারে ইহাদিগকে আনন্দিত রাখেন, ইহাদের শিশুসন্তানদিগকে কোলে নিয়া আদর করেন। ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান গৃহজীবনের আনন্দ।

আহা, ইঁহার জীবনের কাহিনী শুনিয়া প্রাতঃস্মরনীয়া অহল্যাবাই ও রাণী-ভবাণীর কথা মনে পড়ে। আর মনে হয়, আজ যদি ইনি স্বামীর সহযোগিনী হইয়া নেপালের রাষ্ট্রাধিপত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা থাকিতেন, নেপাল না জানি এই মঙ্গলরূপিনী স্নেহময়ী জননীরূপা রাণীর স্নেহবিতরণে কত মঙ্গলেই পূর্ণ হইয়া উঠিত!

সংগ্রহ বৈচিত্র।

কাকের কংগ্রেস।

অনেক সময় দেখা যায়, অসংখ্য কাক কোনও স্থানে একত্র হইয়া কা কা রবে পাড়া মাথায় করিয়া তোলে,—কখনও বা অপেক্ষাকৃত চুপচাপও থাকে, দেখা যায়। কেবল এদেশে নয়, বিলাতেও অনেক স্থলে এইরূপ মহতী কাকসভা দেখা যায়। সে দেশের অনেকে সম্মিলিত কাকবর্গের ডাকাডাকি ও ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিয়া অনেক কৌতুকপূর্ণ তথ্য বাহির করিয়াছেন। কেহ কেহ এই কাকসম্মিলনগুলিকে, কাকের পার্লামেণ্ট, কাকের আদালত, বা কাকের বিবাহ সভা, এই নাম দিয়াছেন। বসন্তে ও শরতেই কাকেদের এই সভা বেশী দেখা যায়, শরৎ অপেক্ষা বসন্তে আরও বেশী। এই সময় প্রেমিক কাকেরা সাধারণের সমক্ষে পত্ন্যর্থে যুবতী কাকী বাছিয়া লয়। প্রবীন কাকেরাও কখনও কখনও যোগ্যে যোগ্যে মিলন ঘটাইয়া দিয়া থাকে। এইরূপে কোনও কাকযুবককে সম্ভাবিত বররূপে কোনও কাকযুবতীর সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে, যুবতী যদি যুবককে অপছন্দ করে, তবে ডানা নাড়িয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়। মনের দুঃখে ব্যর্থ প্রেমিক বিকট কা কা রবে দূরে সরিয়া যায়। এইরূপ একা একটা বিবাহের পর মাসেকের মধ্যেই দেখা যায়, কাকেদের বাসা বাঁধিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

কখনও ইহারা পার্লমেণ্টের মত বহু গোলমাল করিয়া নিজেদের আইন পাশ করিয়া নেয়। কাকেদেরও আইন আছে। কখনও আদালত করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করে, অপরাধীকে শাস্তি দেয়। কোনও কোনও সভায় দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও প্রবীণ কাক হাকিমের মত গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, কেহ কেহ অপরাধীর মত মুখ নত করিয়া আছে, কেহ কেহ বা বড় বেশী লাফালাফি ও কা কা করিতেছে। ইহারা কেহ সাক্ষ্য দিতেছে, কেহ বা ওকালতী করিতেছে, এই রূপই অনেকে অনুমান করেন। এইরূপ দুই একটি কাকসভা ভাঙ্গিয়া গেলে পর, ইহাও দেখা গিয়াছে যে দুইচারিটি মরা কাক পড়িয়া আছে। ইহারা অবশ্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল! একবার বড় একটা কাকের সভায় দেখা গিয়াছিল, শত শত কাক নিশ্চল নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, দুই একটি কেবল ধীর কণ্ঠে কা কা করিতেছে। বোধ হয় গির্জায় যেমন খৃষ্টানেরা ভজনা করে, কাকেরা এখানে তেমনই ভজনা করিতেছিল।

চাট্‌নী।

স্ত্রী।—দেখগা, ছেলের নাম রাখা যাক কমলকুমার, কি বল?

স্বামীর কিন্তু নামটা পছন্দ হইল না। তথাপি তিনি প্রতিবাদ করিলেন না, কারণ জানিতেন প্রতিবাদ করিলেই পত্নীর জেদ বাড়িয়া যাইবে। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—"হাঁ, সেই বেশ হবে; আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিল "কমল," এ নামটা তার কথাই মনে করিয়ে দেবে।"

স্ত্রী আর এ নাম মুখেও আনিলেন না। স্বামীর ইচ্ছায় ছেলের নাম হইল,—হেমন্ত।

বড়বাবু। (জনৈক কেরাণীর প্রতি)—কি হে, তুমি যে আচ্ছা লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। তখন একবার দেরী ক'রে আফিসে এসেছ। আবার এখন এত সকালেই চ'ল্লে যে!

কেরাণী। মন্দ কি মশাই, আস্‌তে দেরী হয়েছে, আবার যেতেও দেরী ক'র্‌ব—দুবারেই কি দেরী করা উচিত?

"হাঁ! মার ধর চাই বই কি? নইলে কি ছেলেপিলে দুরস্ত হয়? এই যে আমাকে দেখ্‌ছ—ছেলেবেলায় কত দোষ ছিল,—মার খেয়েই সব সাম্‌লেছি। কথায় কথায় মার খেতুম। বলব কি? একবার সত্য কথা বলেছিলুম বলেও মার খেতে হয়!"

"তা—সে দোষটা তা হ'লে—সেরেই গেছে?"

বিলাতে কোথাও স্বামী-স্ত্রী একত্রে রঙ্গ তামাসা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। বিবাদ করিয়া, স্বামী কোথায় চলিয়া গেল। স্ত্রী একাই ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। কতদিন পরে স্বামী আবার ফিরিয়া আসিল এবং স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিল। লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য স্ত্রী তখন বিজ্ঞাপন দিল,—"আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আমার রঙ্গ তামাসা এখন অনেক বাড়িয়াছে।"

রাণী একটি পুত্র প্রসব করিয়াই পরলোক গমন করিলেন। প্রজাবর্গকে রাণীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে হইবে, আবার রাজপুত্রের জন্মে আনন্দোৎসবও করিতে হইবে॥ এ সমস্যায় এখন কর্ত্তব্য কি? প্রধান সচিব অনেক বিবেচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। রাজপুত্র আগে জন্মিয়াছেন, তার পরে রাণী মরিয়াছেন। সুতরাং প্রজাবর্গ প্রথমে সাত দিন আনন্দোৎসব করিবে, তার পরে সাতদিন শোকপ্রকাশ করিবে! রাজদেশ এইরূপই বাহির হইল।

৩য় বর্ষ	ভাদ্র।	৫ম সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি।

প্রথম অংশ।

বিন্দু।

(১০)

চুণী বুঝিল, এবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এ দেবতার দণ্ডবিধান, এ বিধান কঠিন, অমোঘ, অপরিহার্য্য। সুতরাং এ দণ্ডকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করা ছাড়া তাহার আর কোনও উপায়ই ছিল না!

স্বামীর অসম্বদ্ধ কথাগুলির মধ্য হইতে নিষ্ঠুর সত্যটিকে খুঁজিয়া পাইতে পদ্মার বেশীক্ষণ লাগিল না।

প্রথমে এই দারুণ সত্যটি একটি গুরুতর আঘাতের মতই পদ্মার অন্তরকে নিষ্পিষ্ট, পীড়িত করিয়া তুলিল!

আঘাতটা প্রথম পাইয়াই পদ্মার মনে হইল, বিশ্বের মুখের উপর হইতে আলোক লেখা মুছিয়া গিয়াছে। একটা কালো যবনিকা টানিয়া দিয়া কোন্ প্রেতের অস্পষ্ট ছায়া সেখানে তাণ্ডব নৃত্য সূচিত করিয়াছে।

বিশ্বের এই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি পদ্মা কোনও দিনই প্রত্যক্ষ করে নাই। নিবিড় নির্ভরতার মধ্যে প্রফুল্ল লতিকাটির মতই সে চুণীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া

উঠিয়াছিল; স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়াছিল, অস্তিত্ব ভুলিয়াছিল, কিন্তু আজিকার এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাহাকে একেবারেই দলিত, বিধ্বস্ত, ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল।

পদ্মা ঘুণাক্ষরেও বুঝে নাই, তাহার স্বামীর অন্তর মধ্যে এমন একটি নিভৃত গোপন অংশ থাকিতে পারে, যেখানে তাহার প্রবেশের অধিকার ছিল না এবং সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসরের সাহচর্য্যের মধ্যেও সে সেই গোপনতম অংশটিকে মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্য করিতে পারে নাই, সন্দেহ করিতে পারে নাই। মুগ্ধা পদ্মা এতদিন প্রেমদেবতা জগন্নাথের মন্দির মধ্যে অবস্থান করিয়া, আজ হঠাৎ মন্দিরের বাহিরে অনন্ত সাগরকূলে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে বিশ্ব-বিপ্লাবী উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ, ঝঞ্ঝা, গর্জ্জন ও বিরাটধ্বংশের লীলা চলিতেছিল। পদ্মা এতকাল মন্দির মধ্যে অবস্থান করিয়া সে সংবাদ জানিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই!

আজ এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে বাস্তবের এই রুদ্র, অকরুণ মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করিয়া পদ্মা শিহরিয়া উঠিল!

স্বামীর নিকট হইতে এতকাল পদ্মা যাহা কিছু পাইয়াছে, সবই আজ তাহার কাছে একটা দারুণ অপমানের বোঝার মত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল!

পদ্মার মনে হইতেছিল, এতকাল বিন্দুকে সে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে,—বিন্দু,—এমন বিন্দু! স্বামী তাহাকে তুচ্ছ করিয়াছেন, পায়ে দলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাহার জীবনটার মধ্যে একটা শুষ্ক রসশূন্য মরু রচনা করিয়াছেন!—তাহার নারীজীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন!

কেন? বিন্দুও ত একদিন পদ্মার মতই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ফুটিয়া উঠিতে প্রয়াস পাইয়াছিল;—স্বামী তাহাকে ফুটিবার অবসরটুকুও প্রদান করেন নাই। ফুটিবার পূর্ব্বেই কুঁড়িটিকে নখরছিন্ন করিয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছেন!

পদ্মার কেবলই মনে হইতেছিল, বিন্দুর কাছে সে যেন কতই অপরাধিনী! সে বিন্দুর চিরন্তন অধিকারকে সংহরণ করিয়াছে,—সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া তাহাকে একান্তই দীন, রিক্ত করিয়া দিয়াছে।

বিন্দুর এই দীনতা শুধু একজনই দূর করিতে পারে, এই রিক্ততা শুধু একজনই পূর্ণ করিয়া দিতে পারে,—কিন্তু সে একজন হইতেও বিন্দুকে পদ্মাই যে এতকাল বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছে!

একটা দুঃখ সব চেয়ে তীব্রভাবে পদ্মার বুকে বাজিতেছিল!

সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরের সহবাসেও কি স্বামী পদ্মাকে চিনিতে পারেন নাই?

সে তাহার অন্তরের কোনও অংশই ত স্বামীর কাছে গোপন রাখে নাই; তবে কেন তিনি এমন করিয়া ঘুণাক্ষরেও তাহাকে একথাটা জানিতে দিলেন না? আজ সে যখন দৈবের নিষ্ঠুর সঙ্কেতে কথাটা জানিতে পারিল, তখন আর এমন একটু অবসরও রহিল না, যে সে বিন্দুর কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। বিন্দুকে ধরিয়া আনিয়া তাহার ন্যায্য অধিকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া দিবে!

আজ শুধু লজ্জা, ধিক্কার ও দুঃসহ অপমানের বেদনাই তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে! কি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত? কেমন করিয়া সে বিন্দুকে বুঝাইবে, যে, সে কিছুই জানিত না। হায়, যদি প্রাণ দিয়াও তাহাকে বুঝান যাইত!

—কিন্তু বুঝানো যাউক আর নাই যাউক, তাহাকে ঐ বিন্দুর কাছে যাইতেই হইবে!

—বিন্দু,—কাঙ্গালিনী বিন্দু,—হৃতসর্ব্বস্বা বিন্দু! আহা, কি অসহনীয় দুঃখেই তাহার জীবন কাটিয়াছে!

দুইহাতে মুখের উপর হইতে উচ্ছৃঙ্খল কুন্তলরাজি সরাইয়া, ভূশয্যা ছাড়িয়া পদ্মা উঠিয়া বসিল! চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, কিন্তু ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে; কপোলের বর্ণসুষমা ম্লান হইয়াছে!

মুহূর্ত্ত চিন্তার পর পদ্মা ছেলেটিকে টানিয়া আনিয়া কোলে তুলিয়া লইল, তারপর দৃঢ়পদে সিঁড়ির ধাপগুলি অতিবাহন করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সে যখন বাড়ীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন পশ্চিমাকাশে যেখানে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, সেখানে খণ্ড লঘু মেঘের গায়ে বিচিত্র বর্ণসমাবেশ চলিতেছিল!

চঞ্চলপদে যোড়শীর ঘরে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পদ্মা কহিল, "আমার দিদি বিন্দু কোথায়?"—যোড়শী এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চকিত দৃষ্টিতে সে পদ্মার দিকে চাহিল!

ছেলে কোলে লইয়াই পদ্মা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, আশা করিয়াছিল যোড়শীর সঙ্গেই বিন্দুকে দেখিবে; না দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল!

যোড়শী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল! পদ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না!

পদ্মা উদ্বেগচঞ্চল দৃষ্টিতে যোড়শীর মুখের দিকে চাহিল এবং নিতান্ত অসহায়

ভাবে কোল হইতে ছেলে নামাইয়া দিতে দিতে আবার কহিল,—"বিন্দু কোথায়,—বিন্দু ?——"

ষোড়শী পদ্মার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল. তারপর মৃদুস্বরে কহিল, "বিন্দু ত পুরী চলে গেছে———"

পদ্মা কাতর দৃষ্টিতে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল ; দেখিল, সেই মুখখানি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ!—করুণায় উচ্ছ্বসিত।

পদ্মা বুঝিল, এ মুখ যাহার, সে অন্যের দুঃখ বুঝে ; ইহার কাছে এত দুঃখের মধ্যেও অসঙ্কোচে আসিয়া দাঁড়ান যায়। এবং আবশ্যক হইলে কথা বলিয়া হৃদয়ের গুরুভারটাকেও বুঝি একটু লাঘব করা চলে!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল! তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে পদ্মা কহিল, "সহস্র অপরাধের ছাপ নিয়েই যখন প্রথম তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আমার পক্ষে লজ্জা করাটা কোন মতেই আর শোভা পায় না। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার ব্যথা বুঝ্‌বে এবং তাই বুঝেই আমাকে যতটুকু অধিকার স্বচ্ছন্দে দিতে পার, তাই দেবে!"

পদ্মা চুপ করিল,—একবার তাহার ম্লানদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল!

ষোড়শী কোনও কথা না কহিয়া দুইহাতে পদ্মার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিল!

অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে পদ্মা কহিল, "না, এত সহজে তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌লে আমার এ গুরু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না! আজ যে দুঃসহ গ্লানিতে আমার বুক ভরে উঠেছে, তাকে নষ্ট করতে হলে, যারা আপনার জন, তাদের কাছ থেকে আঘাত ও অনাদর আমাকে পেতেই হবে!"

"তোমার অপরাধ ত কিছু নাই ; যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই নিজেকে অপরাধী মনে করে ছুটে পালিয়েছে ; তোমার অপরাধ আছে ঘুণাক্ষরেও মনে কর্ত্তে পারেনি ত।"

"আমি তার সর্ব্বস্ব হরণ করেছি, তার নারীজীবনকে ব্যর্থ করেছি,—তবে জানতাম না, কিন্তু করেছি ত সত্যি,—এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকে কর্ত্তেই হবে! সে পালিয়ে গেলে চল্‌বে না,—তাকে যেমন করেই হ'ক্ চাই-ই!"

—"না পদ্মা, তাকে পাওয়া বুঝি খুব সহজ হবেনা, সে মর্‌তে চলেছিল, গাড়ীতে তোমার কোলে ছেলে দেখে তার বাঁচতে সাধ গেল, ছেলের মায়ায়

সে পুরী ছেড়ে, মরণ ফেলে এখানেও ছুটে এল। মা হয়েছে, এই গর্ব্বেই তখন তার বুক ভরে উঠেছিল; ভেবেছিল, কেউ তাকে জান্‌বে না; পদ্মার সখী রূপেই ছেলে বুকে নিয়ে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ মিটিয়ে নেবে; তারপর ধরা পড়ে সে বুঝ্‌ল, যে তার হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেছে;—ধরা পড়লে যে পদ্মার সুখের সংসার ভেঙ্গে যাবে, তা' সে আগে হিসাব কর্ত্তে পারে নি,"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ষোড়শী গাঢ়স্বরে কহিল, "ধরা পড়ে সে যে কি গ্লানি, কি ধিক্কার নিয়েই পালিয়েছে! পদ্মা—পদ্মা, তার সে কাতর মুখখানি যে আমি মনেও কর্‌তে পারি না, পদ্মা! অশ্রুপূর্ণ চোখে কতবার বলে গেল, ঠাকুরঝি, মরণ ফেলে ছেলের মায়ায় ছুটে এসে পদ্মার সাজান সংসার ভেঙ্গে গেলাম!—এ যে কি জ্বালা তা' আমি ত বল্‌তেও পারি না!"—

ষোড়শীর দুই কপোল বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিতেছিল; পদ্মা অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল, "আমার যে কাঁদ্‌বার অধিকার আছে, তা'ও আমার মনে হয়না! কাঁদতে পারলে বুঝি আমার বুকের জ্বালাটা অর্দ্ধেক কমে যেত,—কিন্তু, না এ জ্বালাটাকে আমার জাগিয়ে রাখ্‌তেই হবে,—যদি বিন্দুকে ফিরাতে পারি, তবেই কেঁদে চোখের জলে এ জ্বালা নিভা'তে চেষ্টা কর্‌ব।"

ষোড়শী কি ভাবিল, অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া পদ্মার অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল চক্ষু দুইটার দিকে একবার চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে ডাকিল, "বোঠান্‌"—

অপরাধীকে হঠাৎ মুক্তির আদেশ প্রদান করিলে সে যেমন গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠে, এবং সেই আদেশটাকে সত্য বলিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতেই চাহে না, পদ্মাও ষোড়শীর মুখে এই পরম ঈপ্সিত আহ্বানটি শুনিয়া তেমনই চমকিয়া উঠিল, এবং বিশ্বাস করিতে চাহিল না, যে, সত্যই ষোড়শী তাহাকে একেবারে পরিপূর্ণ রূপেই ক্ষমা করিয়াছে।"—

পদ্মা কহিল, "তোমাকেই একবার ডাক্‌বার অধিকার পাওয়ার জন্য আমার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তুমি যে সত্যই আমাকে এত শীঘ্র এমন করে ক্ষমা কর্ত্তে পার্‌বে, তা' একবারটিও আশা করতে সাহস হয়নি।"

"বিন্দুর কাছে শুনেই তোর উপর আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল, কিন্তু বিন্দুকে ছাড়া আর কাউকে আমি 'বোঠান্‌' বলে ডেকে এমন তৃপ্তি পাব তা আমি স্বপ্নেও মনে কর্ত্তে পারি নি! এ ত তোকে অধিকার দেওয়া নয় বোঠান্‌, তোকে ডাক্‌বার অধিকার পেয়ে যে আমি নিজেই কৃতার্থ হয়েছি,

পদ্মা!" ষোড়শী দুইহাতে পদ্মার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

এবার সত্যই পদ্মার চোখে জল আসিতেছিল,—সে ষোড়শীর স্কন্ধে মুখ রক্ষা করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর গাঢ়স্বরে কহিল, "শ্বশুরকুলের খবরই জান্‌তাম্ না, আজ তোমার ডাক শুনে মনে হচ্ছে আমার নারী জীবনের একটা দিক এতদিন একেবারেই অপূর্ণ রয়েছিল, শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ জ্বেলে যে স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়, তা' আজ সত্যি বলেই মনে হচ্ছে! আজ আর আমি কোনো কথাই বল্‌বনা, ঠাকুরঝি, যদি বিন্দুকে ফিরাতে পারি তবেই,"—পদ্মার নিঃশ্বাস গাঢ় ও গভীর হইয়া আসিল, ওষ্ঠ দুখানি বায়ুতাড়িত বান্ধুলি পুষ্পদলের মতই কাঁপিতেছিল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরঝি, আমি কালই পুরী যাব,—আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তা'কে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি,—তারপর তিন জনে এক সঙ্গে একদিন কেঁদে দেখ্‌ব, এ জ্বালা কমাতে পারি কি না!"—

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ষোড়শী কহিল, "চল্, আমিও তোর সঙ্গে যাব, পদ্মা!"

(১১)

পুরী ফিরিয়া আসিয়াই বিন্দু শয্যাগ্রহণ করিল। একটা নূতন অনুভূতির উদ্দাম চাঞ্চল্য এতদিন তাহাকে অস্থির, উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিল, দীর্ঘকালের সঞ্চিত পীড়াটাকে বাড়িয়া উঠিবার অবসর প্রদান করে নাই; আজ সে যখন তাহার অবসন্ন দেহভার শয্যার উপর ঢালিয়া দিল, তখন তাহার পীড়াটা এত দ্রুত গতিতেই বাড়িয়া চলিল যে বিন্দু নিজেও নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল, এবার মুক্তির আদেশ আসিতেছে।

বিন্দুর বুকের মধ্যে শোণিতের উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে বড় দ্রুততালে নাচিয়া উঠিতেছিল; কোথায় এতটুকু বন্ধনহীন বেদনা ছিল, বিন্দু সেই বেদনাটুকুকে লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিল!

একটা পরম আরামের নিঃশ্বাসপাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া যাইত!

কোথায় বাধা? কেন তাহা পারা যায় না! গাঢ়তম মেঘ জীবনের দুইটি কুল ব্যাপিয়া নামিয়া আসিয়াছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ স্ফুরণ জাগাইয়া তুলিয়া কেন সেই প্রিয় শিশুটির কোমল, তরুণ মুখখানি দেখা দিল?

তাহার লীলা চঞ্চল গতিভঙ্গি, তাহার কোমল স্পর্শ, তাহার অঙ্গসৌরভ, তাহার আহ্বান,—মায়ের বুকের উপর দিয়া মায়া তুলিকা বুলাইয়া, বুলাইয়া, কেন এই অপ্রত্যাশিত নন্দন সৃষ্টি করিয়া তুলিল!

বিন্দু ভাবিল, মরিতেই হইবে,—আর কেন? এ নিষ্ফল মায়ায় লাভ কি? তবু অন্তর বুঝিতে চাহে না কেন? বুকের মধ্যে এ কি তীব্র দহন! কেমন করিয়া এই দহনকে শান্ত করা যায়? এ ব্যর্থ জীবনটা লইয়া কেন পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম?

বিন্দু পাশ ফিরিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল; তারপর ফিরিয়া দুয়ারের দিকে চাহিল! ধীরে ধীরে ডাকিল, "বোঠান"—!

বীণা—বিজয়ের স্ত্রী, ষ্টোভে জল গরম করিতেছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কি ঠাকুরঝি"—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দু কহিল, "একটা কথা বল্‌ব,"—

"কি? এখন কেমন বোধ কর্‌ছ,—ঠাকুরঝি?"—

বিন্দু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "বেশ আছি,—পূর্ণিমা কবে, বোঠান্?"—

—"পরশু, কেন? পূর্ণিমা দিয়ে কি হবে ঠাকুরঝি?"

—"সে অনেক কথা, তা শুনে কি হবে?"

—"তবু শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, বল্‌তে বাধা না থাকে,"—

—"বাধা কেন থাক্‌বে, বোঠান্?—সব কাটিয়ে উঠেছি, আর কিছুতেই আমাকে বাধা দিতে পারবে না,"—বিন্দুর স্বর গভীর হইয়া আসিতেছিল!—

—"ছিঃ অমন কথা বলিসনে, বিন্দু! ডাক্তার বলেছেন তুই সেরে উঠ্‌বি!"—

"উঠি,—ভাল!"—একটা মৃদু হাসিতে বিন্দুর পাণ্ডুর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

—"যা' শুন্‌তে চাচ্ছিলি,—ছেলে বেলায় পূর্ণিমার রাতটা বড় ভাল লাগ্‌ত, ভাব্‌তাম, যদি পূর্ণিমার রাতে মর্‌তে পারি,"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "পরশুকার এই পূর্ণিমাটা যদি আমার জীবনের শেষ পূর্ণিমা হ'ত!"—

বাধা দিয়া বীণা কহিল, "তুই যে কি বলিস্ ঠাকুরঝি!"—

বিন্দু একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "অন্যায় কিছু বলিনি' বোঠান্,—কিন্তু যদি পূর্ণিমার দিনই মরি, একটা সাধ হচ্ছে সেটা অপূর্ণ থেকে যাবে,"—

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বীণা কহিল, "কি ?"—

"ষোড়শীকে একবারটি দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে,—তা' আজ খবর পাঠালেও সে ত এসে পৌছতে পারবে না,"—বীণা বিন্দুর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ্‌, যদি নিজ থেকেই এসে পড়ে"—বিন্দু তাহার শীর্ণ হাত দুখানি দিয়া সাগ্রহে বীণার হাত চাপিয়া ধরিল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বোঠান্‌,"—

"কি ?"

"ষোড়শী তা' হলে এসেছে"—

বীণা ধীরে ধীরে কহিল, "তা যদি এসেই থাকে, তোর কাছেও আস্‌বে এখন।" বিন্দুকে হঠাৎ কোনও প্রকারে উত্তেজিত করা চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। বীণা যথাসম্ভব সাবধানে ষোড়শীর আসার কথাটা বিন্দুর কাছে প্রকাশ করিল। তবু বিন্দুর মুখখানি একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল, কপোলে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিল। সে দুইহাতে ভর করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে গেল, বীণা তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, "ঠাকুরঝি, ক্ষেপ্‌লি নাকি ? তোর ষোড়শীর কোন অযত্ন হবে না!" বিন্দু একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "দূর তা কেন!"—এই হাসি টুকুতে বিন্দুর উত্তেজিত ভাবটা একটু কমিল। এমন সময়ে পাশের দুয়ার খুলিয়া ষোড়শী কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "এই তোর খোকাকে নে' বিন্দু, তুই ত ওকে ফেলে পালিয়ে এলি, আর আমি বেচারী পদ্মার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মারা যাই আর কি ? যে রায় বাঘিনী সতীন্‌ তোর, বাপু!" যেন কোথায়ও মেঘ নাই, ঝঞ্ঝা নাই,—যেন কোথায়ও কিছুই ঘটে নাই, এমনই সহজভাবে কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়া ষোড়শী বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল।

বিন্দুর পাণ্ডুর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য একেবারেই রক্তহীন হইয়া গেল। ললাট আচ্ছন্ন করিয়া অতি দ্রুত ঘর্ম্মবিন্দুগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে একবার অসহায় দৃষ্টিতে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়া, দুইহাত বাড়াইয়া দিল; ষোড়শী বিন্দুর কোলের কাছে খোকাকে রাখিতে রাখিতে কহিল, "তুই যদি পদ্মাকে ক্ষমা না করিস্‌, সে ত তোর কাছে আস্‌তে পারবে না, বোঠান্‌!" বিন্দু খোকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া পদ্মাকে ডাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। অশ্রুমুখী পদ্মা আসিয়া ডাকিল,

—"দিদি!"

বিন্দু তখন খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে; একবার পদ্মার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, কোনও কথা কহিল না!

বীণা ত্রস্তহস্তে পাখা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

* * * *

জ্যোৎস্নাপরিস্নাতা পূর্ণিমা রজনী, নির্মেঘ আকাশপট নক্ষত্রবিরল। গুণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া প্রকৃতি রমণীরূপের পসরা দেখাইতেছে! মানময়ীর মান ভাঙ্গিয়াছে; হাসি ফুটিয়াছে! প্রিয়তম সাগর চরণের কাছে লুঠাইতেছে; উচ্ছ্বসিত বক্ষ রহিয়া রহিয়া দুলিতেছে! সুন্দরের পুষ্পক রথখানি বিশ্বের বুকের উপর দিয়া নৃত্যচঞ্চল গতিতে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে! তাহারই রথের ছায়ায় ছায়ায় অসুন্দর ঢাকা পড়িতেছে,—লুপ্ত হইতেছে!

মৃদু আলোকিত কক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র শুভ্র শয্যাখানির উপর বিন্দু শায়িত রহিয়াছে! পার্শ্বে পদ্মা, বীণা, ষোড়শী; বিন্দুর কোলের কাছে খোকা, বিন্দুর শিথিল হস্তে কোনও মতে তাহাকে আঁকড়িয়া রাখিতে চাহিতেছে!

বিন্দুর মুখের পাণ্ডুর ছায়া আরও পাণ্ডুর হইয়াছে, চক্ষু দুইটি একটু বেশী উজ্জ্বল, কিন্তু চক্ষুর নিম্নে কেহ যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। পাখার বাতাসে রুক্ষ চূর্ণকুন্তলগুলি ললাট চুম্বন করিয়া করিয়া উড়িতেছিল!

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটির মতই বিন্দুর ঋজু দেহযষ্টিখানি পরিম্লান!

একবার স্বপ্নাবিষ্টের দৃষ্টিতে চরিদিকে চাহিয়া বিন্দু ডাকিল, "বোঠান্!"—

বীণা অশ্রু মুছিয়া বিন্দুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া উত্তর দিল "কি, ঠাকুরঝি!"

"আজ পূর্ণিমা ত, ঘরের জানালা দরজাগুলি খুলে দে, বোঠান্!"

বীণা উঠিয়া দরজা জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া আসিল, বিন্দুর শয্যা জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! বিন্দু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বেশ্ জ্যোৎস্না,—দেখিস্—আজকার এ রাত্রিটা যেন না কাটে! তোরা কাঁদছিস্?—তোদের হাসি মুখ দেখ্তে দেখ্তে আমাকে যেতে দে!"——

ষোড়শী বিন্দুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "বিন্দু! বোঠান্!"—

বিন্দু উৎকর্ণ হইয়া সে আহ্বন শুনিল, কহিল—"কি!"

ষোড়শী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তুই কি সত্যি এমনই করে ফাঁকি দিতে পারবি বোঠান্?"—

"ফাঁকি কেন, ঠাকুরঝি! এর চেয়ে বেশী সুখ ত আমি কোন দিন

চাইনি! বুকের কাছে ছেলে রেখে যে মরতে পারে তার চেয়ে সুখী কে, ঠাকুরঝি? তারপর তোর স্নেহের স্মৃতি আমি মরলে পরেও আমার বুক থেকে যাবে না ত? দুর্দ্দিনে শ্বশুরকুলের সঙ্গে তুই ত আমার যোগ রেখেছিলি,—ঠাকুরঝি"—

"এ বুঝি তারি পুরস্কার তুই আমাকে দিতে বসেছিস্, বিন্দু?"—ষোড়শী কাঁদিয়া উঠিয়া গেল, শয্যার অদূরে মাটীর উপরেই লুটাইয়া পড়িয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুরী আসিয়া এ কয়দিন পর্য্যন্ত পদ্মা পাষাণ-প্রতিমাখানির মতই রাত্রি দিন বিন্দুর শয্যা পার্শ্বেই বসিয়াছিল। তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না; শুধু একটা মর্ম্মদাহী জ্বালা দৃষ্টির সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতেছিল! বিন্দুর মরণাহত পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া পদ্মার বুকের স্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

পদ্মা সুস্পষ্টস্বরে কহিল, "দিদি, যদি ক্ষমা চাওয়ার অধিকার আমাকে দিতে পার, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম!"—

বিন্দু তাহার দুর্ব্বল, শীর্ণ হস্তখানি বাড়াইয়া দিয়া কষ্টে পদ্মার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, "পদ্মা! আমি তোর সুখের হাট ভেঙ্গে দিয়েছি, তোর কাছে আমারই ক্ষমা চাওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার আর তা' সাহস হচ্ছে না! পদ্মা, তোর চোখে একটু জল দেখ্‌তে পারলেও আমি বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে ম'র্ত্তে পার্ত্তাম!" বিন্দু চুপ করিল, এত গুলি কথা এক সঙ্গে বলিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বীণা খানিকটা বেদানার রস তাহার মুখে ঢালিয়া দিল।

একটু বিশ্রামের পর জড়িত স্বরে বিন্দু কহিল, "ছেলের অযত্ন করিস্ নে, পদ্মা!—ভুলে যা, আমি যে তোর পথের উপর এসে পড়েছিলাম!"

উন্মুক্ত দ্বার পথে চঞ্চলপদে কেহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, সকলেই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল।

খোকা বলিয়া উঠিল, "বাবা"!—

ফুলটিকে লতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে লতিকাটি যেমন করিয়া মৃদুভাবে কাঁপিয়া উঠে, মৃত্যুর উদ্যত স্পর্শের সম্মুখে বিন্দুর দেহলতা তেমনই করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল!

একবার অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে বিন্দু বুঝি ডাকিল, "ঠাকুরঝি!"——

ষোড়শী ছুটিয়া আসিয়া, বিন্দুর শয্যার উপর বসিয়া পড়িল, ক্রন্দনজড়িতস্বরে কহিল, "বোঠান্—বিন্দু—বোঠান্!—

উচ্ছৃঙ্খল কেশরাশি মুখের উপর হইতে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া পদ্মা উন্মাদিনীর মতই শয্যা ছাড়িয়া দুয়ারের কাছে ছুটিয়া গেল! চুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "এখনও বিন্দুর শেষ নিঃশ্বাস পড়েনি; এ ঘরে তোমার সঙ্গে একত্রে এসে দাঁড়াতে পারি, এমন কোনও অধিকারই তুমি রাখ নাই; চল, বাহিরে যেতেই হবে।"—

পদ্মা আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই চুণীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ কক্ষতল চুম্বন করিল।

সমাপ্ত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

বুড়ার আব্দার *

১

আবার বালক হ'তে চাই যে এক মুহূর্ত্তের তরে
গত তরুণ যৌবন আমার বারেক ফিরিয়ে দাও;
শিশু হয়ে কোঁক্ড়া চুলে হাসব আমোদ ভরে,
বুড়ার মাথার রূপার কেশের মুকুট খুলে নাও।

২

ফেলে দাও এ লোল তনু, চিন্তা-জীর্ণ মাথা,
ভেঙ্গে ফেল উচ্চ চূড়া—জ্ঞান-গরিমায় ভরা;
তত্ত্বময় এ জীবন-পুঁথির পুড়িয়ে ফেল পাতা,
নিবিয়ে দাও এ যশের বাতি, আশার আলো করা।

৩

নিমেষ তরে, করে দাও এ জীবন-স্রোতস্বিনী,
শৈশবের সেই গৌরবভরা উৎসে সমুন্নত
আবার উঠুক্ স্বচ্ছ প্রেমের লীলা-নির্ঝরিণী,
প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়, সুখের স্বপ্ন মত

* রচয়িতার যন্ত্রস্থ কাব্য "মণিমুক্তা" হইতে গৃহীত—সম্পাদক।

৪

এ প্রার্থনা শুনে আমার স্বপ্নে ভাগ্যরাণী,
বল্লেন, ঈষৎ হাস্যাননে, আমার পানে চেয়ে ;—
"তোমার পলিত কেশে যদি ছোঁয়াই আমার পাণি,
মিট্‌বে বটে আশা তোমার শৈশব-দশা পেয়ে।

৫

"কিন্তু তুমি ফেল্‌বে হারিয়ে ভাব্‌ছ কি তা মনে,
এত দিনের অর্জ্জিত যা' তোমার সফল আশা ?—
পিতার স্নেহ, মাতার আদর, দয়া-ধর্ম্ম সনে
বন্ধু-প্রীতি, এ সংসারে জায়ার ভালবাসা।"

৬

শুনে বল্লেম, "ভাগ্যদেবি. একি সত্য কথা,
এ সব আবার লুপ্ত হ'বে শিশু হ'বার পরে ?
দেবতার নির্ম্মাল্য—আমার জীবন-তরুর লতা—
প্রিয়ায় ছেড়ে, একা আমি রইব কেমন করে' ?"

৭

রত্নাক্ষরে লিখ্‌লেন দেবী শুনে আমার কথা,
ইন্দ্রধনুর রেখা যেমন ফোটে সুনীল নভে,—
"বুড়ার শিশু হ'বার এ সাধ, বিচিত্র যে প্রথা,
কারণ, সঙ্গে সঙ্গে যখন পত্নীটিও র'বে।

৮

"তা' হ'বে না, শিশু হ'লে থাক্‌বে না এ সব,
এ সব স্মৃতি মুছে যা'বে, সকল দুঃখ সুখ,—
আতিথ্য, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা. দেবার্চ্চনা, স্তব,
পাবে না আর নাতি-নাত্‌নির দেখ্‌তে হাসিমুখ।"

৯

"সে কি ? আমি ছাড়্‌ব না যে অতীত পুণ্যস্মৃতি,
চিরজীবনব্যাপী আমার দুঃখের মধ্যে সুখ,—
পিতামাতার স্নেহাশিস্, আর পুত্র কন্যার প্রীতি,
ঠাকুর দাদার চখের কাজল—নাতি নাত্‌নির মুখ।"

১০

হেসে বল্লেন ভাগ্যদেবী কলম ফেলে দিয়ে,—
"কেশের সঙ্গে বুড়ার দেখ্‌ছি বুদ্ধি হ'ল সাদা ;
মরি আমার যাদু, তোমার আশার বালাই নিয়ে,
ছোক্‌রা হ'বেন অথচ সেই র'বেন ঠাকুরদাদা।"
হো হো করে হেসে উঠ্‌লেম স্বপ্ন থেকে জেগে,
সে ধ্বনিতে বাড়ী শুদ্ধ জেগে উঠ্‌ল সব ;
"কি হয়েছে ঠাকুরদাদা ?" নাতি নাত্‌নি বেগে
চারি দিকে আমায় ঘিরে তুল্‌লে কলরব।

শ্রীরসময় লাহা

পরীক্ষা-মাত্র।

(গল্প।)

মার্চ্চেণ্ট আফিসে অল্প বেতনের একটি চাকুরি করিতাম। দশদিন পূজাবকাশের পর কলিকাতা আসিয়া জানিলাম, ইয়োরোপের মহাযুদ্ধে ব্যবসায় তত ভাল চলিতেছে না, তাই কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে এবং আরও কয়েকজন কর্ম্মচারীকে জবাব দিয়াছেন। শুনিয়া আমি যেন বজ্রাহত হইলাম। একে ত বিদ্যা বেশী নাই; প্রবেশিকার টেষ্ট্‌ দিয়া পিতৃবিয়োগ হেতু সেই খানেই পাঠ সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল। কাজেই এই দুর্দ্দিনে যে আর একটি চাকুরি জুটিবে এমন ভরসা করিতে পারিলাম না। আর যত দিনে জুটিবে তত দিনই বা চলিবে কি প্রকারে ? বাড়ী হইতে আসিবার সময় খরচের টাকা রাখিয়া আসিতে পারি নাই; পুত্র কন্যাসহ পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর যে কত কষ্ট হইবে ভাবিয়া আকুল হইলাম। আফিসে কয়েকটি মাত্র টাকা প্রাপ্য ছিল; তাহা নিজের খরচের জন্য রাখিব না বাড়ীতে পাঠাইব ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে 'আমার যাহা হইবার হউক' ভাবিয়া যৎকিঞ্চিন্মাত্র বাসাখরচের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। আর অবশিষ্টই বা কত! তাহাতে পরিবারের কোন ক্রমে দশ পনের দিনের বেশী চলিতে পারে না।

যাহা হউক দশ পনের দিনের খরচ পাঠাইয়া মনটা একটু হাল্‌কা বোধ হইল। চাকুরির উদ্দেশে আফিস গুলির দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও 'না' ভিন্ন 'হাঁ' শব্দ শুনিতে পাইলাম না।

এই প্রকারে একটি একটি করিয়া পনরটি দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু চাকুরি জুটিল না। সকাল বেলা ময়লা জামা ও ছিন্ন চাদরখানি গায়ে পরিধান করিয়া বাহির হইতাম। গন্তব্য স্থানের কোনও ঠিক ছিল না, তাই শুধু হাঁটিতাম। পরিচিত কোনও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইতাম। কেহ বা 'ভাই, এখন সময় নাই' বলিয়া দ্রুত চলিয়া যাইত, আর কেহ বা শুনিয়া 'আচ্ছা ভাই, কোন খবর পেলে তোমাকে জানা'ব' বলিয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের জানাইবার মতলব যে কতদূর তাহা তখনই বুঝিতাম, কারণ, তাহারা আমার ঠিকানা কেহই জিজ্ঞাসা করিত না। দেখিয়া শুনিয়া কবির সেই কথা মনে হইত—

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কারো নয়।"

রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিতাম দুই পার্শ্বে দ্বিতল, ত্রিতল সুবৃহৎ অট্টালিকা, বাড়ীর সম্মুখে সুসজ্জিত উদ্যান; নিম্নতলে এক পার্শ্বে মোটর ও জুড়ি গাড়ী; তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া একজন বলবান্ অশ্বের বিপুল শরীর ব্রূস্ করিতেছে। আর একজন উজ্জ্বল মোটরখানি সযত্নে উজ্জ্বলতর করিতেছে, ফটকের সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে।

আবার দেখিতাম বেশ ভূষায় সজ্জিত বাবু জুড়ি গাড়ীতে চলিয়াছেন; কোচ্-ম্যান মূল্যবান্ পোষাক পরিধান করিয়া গাড়ী হাঁকাইতেছে, আর পথযাত্রীদিগকে উচ্চৈঃস্বরে 'ভাগো!' বলিয়া ভাগাইয়া দিতেছে।

কোথাও দেখিতাম বাবু মোটর হইতে নামিয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন, অমনি ভৃত্যগণ আসিয়া কেহ তাহার পায়ের জুতা ও মোজা, কেহ তাহার গায়ের সার্ট ও কোট্ খুলিতে ছুটিয়া আসিল, কেহ বা বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও তালবৃন্তের পাখা লইয়া ব্যজন করিতে ব্যস্ত হইল।

এই সকল দেখিতাম; দেখিতাম আর ভাবিতাম—'ভগবন্! তোমার এ প্রকার বিচার কেন? কাহারও গাড়ী ভিন্ন শত হস্ত পরিমিত স্থান চলিতে হয় না, আর কাহারও বা দুর্ব্বল পাদযষ্টির সাহায্যে দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কাহারও সারমেয় সেবায় প্রত্যহ পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, অন্য বিলাসিতায় শত সহস্র

টাকা উড়িয়া যায়। আর কাহারও বা পরিবার পালন করিতে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। কাহারও পরিশ্রম হয় নাই, তবুও পাঁচজন শ্রান্তিদূর করিতে ব্যস্ত,—আর কেহ বা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু একটু সান্ত্বনা দেয় এমন কেহই নাই। এ কি প্রকার ন্যায় ধর্ম্ম তোমার!'

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম বটে, ভগবানকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিলাম বটে, তবুও কোন কর্ম্মের সুবিধা হইল না। আমি যেই ভবঘুরে সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেলাম।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বিডন স্কোয়ারে চৈতন্য লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইতাম। তথায় বিনা পয়সায় স্বাধীনভাবে সর্ব্বপ্রকার খবরের কাগজ পাঠ করা যায়। কতলোক সেখানে মহাযুদ্ধের কত কি নূতন খবর জানিতে ব্যাকুল হইত,—কিন্তু আমি আমার জীবনযুদ্ধের কোনও কিনারা করিতে পারি কি না তাহাই ভাবিতাম, তাই তন্ন তন্ন করিয়া খবরের কাগজের 'কর্ম্মখালি' গুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত কাজের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া পাইতাম না। বিজ্ঞাপন থাকিত চল্লিশ টাকায় গ্রাজুয়েট্‌দের জন্য নতুবা একসহস্র মুদ্রা ডিপোজিট্‌ রাখিলে সাধারণ ইংরেজি জানাদের জন্য। আমার বি, এ, উপাধি ছিল না, মুদ্রাও ছিল না, তাই কর্ম্ম মিলিল না।

অনেকদিন পূর্ব্বে একখানি যাত্রা গানের বই রচনা করিয়াছিলাম। অবসর মত সেই বইখানা একটু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া একটি যাত্রাদলের অধিকারীর নিকট দিয়া আসিলাম ; মনোনীত হইলে যদি কিছু লাভ হয়—এই আশা। অধিকারী এক সপ্তাহ পরে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এক সপ্তাহ পরে সাক্ষাৎ করায় তিনি আর এক সপ্তাহ পরে যাইতে বলিলেন, আমি পুনরায় তাহার দ্বারস্থ হইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনার আর কোনও বই কোনও দলে কোনও দিন অভিনীত হইয়াছে কি ?

আমি বলিলাম, "না।"

অধিকারী কহিলেন, "নূতন লোকের বইএর কোনও আদর নাই ; উহা অভিনয় চলে না।"

পুরাতন লেখক হইয়া যে জগতে কেহ জন্মায় না এবং জন্মিবার পূর্ব্বে কাহারও যে বই লিখিয়া খ্যাতনামা হওয়া সম্ভব নয় এই উত্তর আমার মনে আসিল, কিন্তু ব্যক্ত করিলাম না—পাছে অধিকারী মহাশয় রাগ করিয়া বইখানি গ্রহণ না করেন।

তাই বিনীত হইয়া বলিলাম, "তা ত বটেই, নূতন লোকের লেখা, অনেক দোষ ও ভুল ত আছেই। তবে তেমন দোষ থাকিলে আপনারা দয়া ক'রে একটু সংশোধন ক'রে নেবেন।"

অধিকারীর মন একটু ভিজিল কি না জানি না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি আর কিছুদিন পরে একবার আস্‌বেন। আমাদের ম্যানেজার ও মোশন মাষ্টার একবার বইখান দেখবেন।"

আমি অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

একদিন প্রত্যূষে চৈতন্য লাইব্রেরীতে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম— একটি দশ বৎসর বয়স্ক ছেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। মনে করিলাম আপাততঃ মন্দ কি। নিজের খরচটা ত চলিয়া যাইবে ? তাই তখনই দুই মাইল হাঁটিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম এক বড়লোকের বাড়ী।

অতি আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। বাবু তখন চা পান করিতেছেন। একবার মাত্র আমার দিকে মুখ তুলিয়া আবার খবরের কাগজ পাঠে তন্ময় হইলেন। আমি কি অভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করিলেন না। আমি প্রায় দুই তিন মিনিট তদবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যতদূর সম্ভব বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি একজন গৃহশিক্ষক রাখিবেন ?"

আমার কথায় তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "আমার শুনিবার অবকাশ নাই। দরখাস্ত করিবেন।"

আমি অধিকতর বিনয়ের সহিত বলিলাম "আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। দয়া ক'রে—"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি যেন বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ ক্লাশ ?"

আমি নম্রভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছি।"

বাবু বলিলেন "প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন! না, না, তাতে ত হবে না।" এই বলিয়া চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি নিজে আরও কিছু পড়াশুনা করেছি, চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ভালরূপ পড়া'তে পারি। পড়াবার অভ্যাসও আছে।"

বাবু ইহার কোনও উত্তর করা আবশ্যক মনে করিলেন না। তাঁহার ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ইনি একজন গ্রাজুয়েট্ চান। আপনি বি, এ, পাশ মনে ক'রে কোন ক্লাশ অনার্স পেয়েছেন, তাই ইনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

তাঁহার কোন্ ক্লাশের অর্থ এখন বুঝিতে পারিলাম। মনে করিয়াছিলাম দশ বৎসরের ছেলে পড়াইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইব। কিন্তু তাহাও না হওয়ায় মনঃক্ষোভে চলিয়া আসিলাম।

সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর একবার অধিকারীর নিকট গেলাম। অধিকারী বলিলেন, "মোশন মাষ্টার এখনও কিছু বলেন নাই, আপনার ঠিকানাটা দিয়া যান। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেই আপনাকে লিখিয়া জানাইব।" আমি হতাশ হইয়া ঠিকানা লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া স্নানাহার সমাপন করিয়া বসিয়া আছি। এমন সময় আমার স্ত্রীর নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানি অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আমার শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল, মাথা ঘুরিয়া গেল। লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

তোমার বিবেচনা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আমি ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করে ম'রে যাচ্চি। আর তুমি একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা ক'রছ না। যদি মাগছেলে খাওয়াতে না পারবে তবে বিয়ে ক'রতে কে ব'লেছিল? পশু-পক্ষীও আপন আপন ছানাগুলিকে খাওয়াতে পারে, আর তুমি মানুষ হ'য়ে পার না? পত্রপাঠ যাহা হয় বন্দোবস্ত করিবে। ইতি

সেবিকা সুভাষিণী।

পত্রখানি আমার স্ত্রীর হস্তাক্ষিত বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু দস্তখতটি তাহার। আমি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে কখনও এমন পত্র পাই নাই, পাইব এমন মনেও করি নাই। একবার অবিশ্বাস হইল, ভাবিলাম সে এমন কথা আমাকে লিখিতে পারে না। সে কি বোঝে না যে আমি ইচ্ছা করিয়া কিছুতেই স্ত্রী পুত্রদিগকে কষ্ট দিই না? আবার ভাবিলাম লিখিতেও পারে। উপবাস করিতে করিতে হয়ত মনের কষ্টে লিখিয়া বসিয়াছে। আর লিখিয়াছেও সত্য কথা। যদি স্ত্রী পুত্র পালন করিতে না পারিব, তবে বিবাহ করিয়াছিলাম কেন? সত্যই আমি পশুপক্ষী হইতেও অধম! হায়, আমার এ জীবন ধারণে ফল কি?

ভাবিতে ভাবিতে অচেতনের মত বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। যখন উঠিলাম,

তখন সন্ধ্যা হইবার অধিক বিলম্ব নাই। উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া গৃহের বাহির হইব এমন সময়ে বোর্ডিংএর ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার নিকট অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে। আর টাকা ফেলে রাখা চলে না।" কথা সত্য, কিন্তু কি করিব? বলিলাম, "আজই যা' হয় একটা কিনারা ক'রব। এই যাচ্চি।" বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া বরাবর গঙ্গার তীরে আসিয়া হাজির হইলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। উত্তরদিক হইতে ধীরে ধীরে বায়ু বহিয়া শীত আনয়ন করিতেছিল। যাহারা গঙ্গার তীরে মুক্ত বায়ু সেবনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তীরে নামিয়া বসিলাম। যেখানে বসিলাম তাহার তিন চারি হস্ত সম্মুখেই ভাগিরথী কূল চুমিয়া বহিয়া যাইতেছিল। আমার গায়ে একখানি স্তার চাদর। অন্য সময়ে বোধ হয় তাহাতে শীত নিবারণ হইত না, কিন্তু সেদিন আমায় অন্তরাগ্নি এরূপ ভাবে দহন করিতেছিল যে শীতল বায়ু আমাকে কিছু মাত্রও শীতল করিতে পারিল না।

সেইখানে সেই চিরদিনের চির নূতন ভাগীরথীর তীরে বসিয়া আমার জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সুধুই নৈরাশ্য! অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছি, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই পিতৃহারা হইয়াছি। উচ্চশিক্ষা, যথেষ্ট অর্থাগম, কিছুই এ জীবনে হয় নাই। তবে এই দুঃখক্লেশের মধ্যেও সমসুখদুঃখভাগিনী স্ত্রী পাইয়া একপ্রকার সুখেই ছিলাম। আজ এই দুর্দ্দিনে সেও আমার অন্তরে দারুণ আঘাত করিল! তাইত, অনুপযুক্ত হইয়াও কেন বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইলাম? আমি পশুপক্ষী হইতেও নিকৃষ্ট! আমার জীবন এ পৃথিবীর কোনও কাজেই লাগিল না, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মরার মত বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কি ভাল নয়? হায়, এ জগতে আমার 'আমার' বলিয়া কেহই নাই! আমার এ কষ্টে এক বিন্দু অশ্রুপাত করে এমন যে কেহই নাই! যদি কেহ না থাকে, তবে আর এ জনপূর্ণ বিজন সংসারে থাকিয়া লাভ কি? মরিব! নিশ্চয় মরিব! মরিয়া দেখা যাউক, এ সংসার হইতে ভাল কোনও জগৎ আছে কি না! সেখানে একের দুঃখে অপরের সহানুভূতি ও অশ্রুবর্ষণ হয় কি না।

মরিব! মরিবই যদি, তবে এই ত শুভ মুহূর্ত্ত! সন্তরণের অভ্যাস নাই। তবে আর বাধা কি? সম্মুখে ঐ যে কল্ কল্ করিয়া ভাগীরথী আমাকে

আহ্বান করিতেছেন! যাই, ছেলে যেমন অপর দুষ্ট ছেলে কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মায়ের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিও তেমনই দুষ্ট সংসারের পীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া মা জাহ্নবীর কোলে আশ্রয় লইব।

দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিলাম। মনে আশা হইতে লাগিল, এ দাবাগ্নি হইতে কোন এক শীতল সরোবরে যাইয়া আশ্রয় লইব! একপা, দুইপা করিয়া জলে নামিয়া ক্রমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলাম। আর একপা সরিলে, ইচ্ছা করিলেও আর উঠিতে পারিব না।

তীরের দিকে একবার নজর পড়িল, পল্লীগ্রামে আমার সেই ক্ষুদ্র কুটিরবাসী স্ত্রীপুত্রের কথা স্মরণ হইল; কিন্তু সে স্মৃতি আমাকে সংকল্প-বিচ্যুত করিতে পারিল না। বলিলাম, "সংসার! তুমি সুখে থাক, আমি তোমার বোঝা হাল্‌কা করিলাম। এখন্ তবে বিদায়!"

এমন সময়ে অদূরে শুনিলাম কে গায়িতেছে। ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা—সেই সময়েও আমার মর্ম্মে সে সঙ্গীতধ্বনি পৌঁছিল। গায়ক গায়িতেছিল—

"চড়াখাড়া উজান ভাঁটি—
তুই ভেবে ছাই হোস্ কেন মাটি!
ভাবার জন আছেরে খাঁটি।"

সঙ্গীতের তেমন ক্রিয়া আমার জীবনের উপরে আর কোনও দিন হয় নাই। কিন্তু আজ হইল। ভাবিলাম—বটে! তবে আমার জন্য একজন চিন্তা করিতেছে! সুখদুঃখে আমার ভাবিয়া ভাবিয়া মাটি হইবার তবে কোনই কারণ নাই!—হঠাৎ আমার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এরূপ কত কথা পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছি। কিন্তু এমন ভাবে ত আর কখনও শুনি নাই।

তীরে উঠিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় আসিলাম। মনটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছিল। বাসায় আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই দেখিলাম, আমার নামে তিনখানি চিঠি। একবারে তিনখানি চিঠি! আমার নিকট একবারে তিনজন লোকের কিছু বলিবার আছে! কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রথমখানি পাঠ করিলাম। সেখানি দেখিলাম স্থানীয়, বন্ধু হরিহর লিখিয়াছে।

আমি যে আফিসে চাকরি করিতাম, হরিহর সেই আফিসেই চাকরি করে। সে আমা হইতে পুরাতন, তাই তাহার চাকরিটি যায় নাই। সে লিখিয়াছে—"ভাই আফিসে সম্প্রতি একজন লোকের দরকার হইয়াছে। এবং যাহাদের কর্ম্ম গিয়াছে তাহাদের মধ্যে তুমিই সকলের পুরাতন বলিয়া তোমাকেই নিযুক্ত করা

হইয়াছে। বড় বাবুর আদেশ ক্রমে চিঠি লিখিলাম। তুমি আগামী কল্য আফিসে যাইবে। ইতি—তোমারই হরিহর।”

দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিয়াছেন দেখিলাম সেই যাত্রাদলের অধিকারী। তিনি লিখিয়াছেন, “মহাশয়! আপনার পুস্তকখানি আমরা গ্রহণ করিলাম। আমরা নগদ ৫০৲ টাকার বেশী দিতে অক্ষম। অভিনয় হইলে আরও ৫০৲ টাকা দিব। আপনি আগামী কল্য প্রত্যূষে আসিয়া লেখাপড়া করিয়া টাকা লইয়া যাইবেন। নিবেদনমিতি। শ্রী————

তৃতীয় পত্রখানি আসিয়াছে আমার স্ত্রী সুভাষিণীর নিকট হইতে। পত্রখানি এইরূপ—

“আমার আরাধ্য দেবতা! আগামী কল্য সকালের ডাকে বোধহয় একখানি চিঠি পাইবে। ভগবান করুন তুমি তাহা যেন না পাও! সে চিঠিখানি আমি লিখি নাই, এবং তাহার মর্ম্মও আমি জানিতাম না। এইমাত্র তাহা জানিলাম। জানিয়া আমার মনে যে কি কষ্ট ও অনুতাপ হইতেছে তাহা জানান অসম্ভব। সত্য বটে আমি অনেকটা অনাটনের মধ্যে আছি, সত্য বটে তোমার ছেলে-পুলের কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহা কি তুমি জাননা, না তোমার সে জন্য চিন্তা নাই যে তাহা লিখিয়া তোমাকে আরও চিন্তিত করিব? আমি জানি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে কোনও কষ্ট দিবে না। আর যদি দেও তাহা হইলেও কি আমি তোমাকে কোনও কড়া কথা লিখিতে পারি? আমি বরং ছেলেপুলে লইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তবুও তোমাকে কষ্ট দিতে পারিব না।

আমাদের পাড়ার কাদম্বিনী ঠাকুরঝি—কাহার নিকট জানি না—আমাদের কষ্টের কথা শুনিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বৌ, তুই এত কষ্ট পাস্ তা তোর স্বামীকে জানাস্ না কেন?” আমি বলিলাম, “তিনি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের কোনও কষ্ট দেন? তিনি সবই জানেন।”

তিনি বলিলেন, “আমি তোর কষ্ট দূর ক’রে দিতে পারি।” এই বলিয়া তিনি আমার নিকট হইতে একখানি কাগজ লইয়া কি লিখিলেন। লিখিয়া বলিলেন, “তুই তোর নাম লিখে দে।”

আমি দেখিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, “না দেখিতে পাইবে না।”

আমি না দেখিয়া নাম দস্তখত করিবনা বলিলে তিনি বলিলেন, “আমি কি তোর অপকারের জন্য অন্য কিছু দলিল লেখাইয়া লইতেছি? বিশ্বাস না হয়, খামে তোর স্বামীর নাম লিখে এখনই তোর ছেলেকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দে।

দেখিস্ শীঘ্রই টাকা আসিবে।” বলিয়া একপ্রকার বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে নাম লেখাইয়া চিঠিখানি তখনই পাঠাইয়া দিলেন। এখন তিনি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বৌ! এই এই লিখিয়াছি শীঘ্রই টাকা আসিবে।”

সেই চিঠিখানা যদি তুমি না পাইয়া থাক, তবেই মঙ্গল। পাইয়া থাকিলেও কিছু মনে করিও না। আমি উহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। আর, আমাদের এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। তুমি সে জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিও না। ভগবান শীঘ্রই আমাদের কষ্ট দূর করিবেন। পত্রপাঠ উত্তর লিখিতে বাধা করিও না। তোমার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি।

তোমার চরণাশ্রিতা দাসী—

সুভাষিণী।

পত্র তিনখানি পাঠ করিয়া মনে কি ভাব হইল তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সেই রাত্রিতে আমার নিদ্রা আসিল না। ভোরবেলা একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ঠাকুর, সংসারে এত দুঃখ দৈন্য কেন?”

তিনি হাসিয়া বলিলেন “ও কিছু নয়; ওসব পরীক্ষামাত্র। শোন নাই কি?—

চড়াখাড়া উজান ভাঁটি,
তুই ভেবে ছাই হোস্ কেন মাটি!
ভাবার জন আছেরে খাঁটি।”

শ্রী শ্রীধর সমাদ্দার।

শোকাশ্রু।

ধরণীর গাত্র হ’তে খসেনি তখন
বিভীষিকা পরিপূর্ণ কৃষ্ণ আবরণ।
ফুটে নাই ধরাতলে অরুণের লেখা,
কোন্ অনন্তের পথে চলেগেলি একা?
শূন্য করি পূর্ণ গৃহ, বক্ষ জননীর
ভেঙ্গেচুরে দিয়ে গেলি, করি শত চির।
বুকে বেজেছিল যাদু কার অনাদর,
কি জ্বালায় জ্বলেছিল পবিত্র অন্তর,
কুসুম কোমল দেহ? পশেছিল কাণে
কার আবাহন গীতি? গেলি কোন্ প্রাণে
জননীর কোল ত্যজি? আঁধারি জীবন
কার কোলে ফিরে গেলে সোণার হিরণ!

* * * *

আজি গৃহ মুখরিত শিশু-কণ্ঠস্বরে,
দীরঘ নিশ্বাস শুধু বহে তোরি তরে।
হাসি আনন্দের মাঝে আসে অশ্রুজল
এ সময়ে যাদু তুই কোথা রলি বল্!

শ্রীবিজনবালা দাসী।

দেবী-প্রতিষ্ঠা।

(১)

সেবার পূজার বন্ধে "মিনার্ভা" মেসের কয়েকজন বন্ধু নিখিলের পল্লীভবনে অনিমন্ত্রিত অতিথি হইল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—হঠাৎ তাহাকে খানিকটা চমকিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ব্যতিব্যস্তও করা।

নিখিল একটু ব্যতিব্যস্ত হইল সত্য—তাহার এই বিশিষ্ট অতিথিগুলির সম্বর্দ্ধনার জন্য,—কিন্তু তবু তাহার মুখে হাসি ধরিতেছিল না।

পরদিন নিখিলদের গ্রামখানা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সকলে বাহির হইয়া পড়িল। নিখিল প্রদর্শক। সে তাহাদের গ্রামের অনেক কথা বন্ধুদের বলিল। নদীর গা দিয়া যে খালটা বহিয়া গিয়াছে, ঐখানে নাকি এক সময় কয়েকটা গোরা চড়ে পাখী মারিতে আসিয়া চাষাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করাতে দস্তর মত প্রহার খাইয়া ফিরিয়াছিল; আর ঐ যেখানে একটা হিজলগাছের নীচে দু একটা বাঁশ পোতা দেখা যাইতেছে—ঐ গ্রাম্য শ্মশানে নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন যিনি হারাণের মার সাত বৎসরের পুরাণ চোখের ছানি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন!

এইরূপ কথায় কথায় কিছু দূর গেলে বনজঙ্গলের ভিতর একটা ভাঙ্গা মন্দির দেখা গেল। সমরেন্দ্র ও সূর্য্যকান্তের একটু প্রত্নতত্ত্বের বাতিক ছিল, তাহারা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ওটা কিহে নিখিল?"

নিখিল বলিল, "ওটা একটা অনেককেলে ভাঙ্গা মন্দির, এখন গোসাপ আর চাম্‌চিকের আড্ডা।"

"হাঁ, তাই ত চাই!" বলিয়া সমরেন্দ্র ও সূর্য্যকান্ত চাম্‌চিকে, ঝুল ও মাকড়সার জাল অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। মন্দিরের ভিতর এইরূপ তর্কবিতর্ক শুনা গেল——

"এটা বুদ্ধদেবের আমলের!"

"নাহে, দেখ্‌ছ না বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেয়ালে খোদা রয়েছে।"

"আরে বৈষ্ণব-যুগের architecture কি এ রকম হয়?"

উহাদের সেই অন্ধকার কূপ থেকে কিছুতেই টানিয়া বাহির করা গেল না।

দূরে সূর্য্যাস্ত হইতেছিল, আর সেই সূর্য্যের রক্তবর্ণ আলোকে চাষারা তখনও হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া বিলের মধ্যে ধান কাটিতেছিল। দার্শনিক শচীন্দ্র

ও কবি প্রকৃতিভূষণ বিলের ধারে বসিয়া পড়িল। তাহাদের নড়াইতে পারা গেল না।

কিছু দূর আসিয়া সম্মুখে একটা বহুকালের প্রকাণ্ড ঝুরিশুদ্ধ বটগাছ দেখা গেল। নানা জাতীয় লতাগুল্মে তার প্রকাণ্ড শরীরখানি বেষ্টিত। যেন লোকটা সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু সকলে তাহাকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। লোকটা কোন কথারই উত্তর দিতেছে না, কেবল গম্ভীরমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ প্রমথ ও দেবেন সেই গাছটার কাছে গিয়া গাছের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিল। লতাগুলির জাতিকুল নির্ণয়ে তাহারা এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িল যে অগত্যা তাহাদিগকেও ঐ স্থানে পরিত্যাগ করিতে হইল।

দলের মধ্যে অবশিষ্ট নগেন ও নিখিল আরও কিছু দূর অগ্রসর হইল। তখন বাঁশঝাড়ের কোলে সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঝুলিতেছে।

নিখিল বলিল, "চল হে ফেরা যাক্।"

নগেন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ঐ যে ঝাউগাছ আর তালগাছের পিছনে একটা আবছায়া বাড়ীর মত কি দেখা যাচ্ছে, ওটা কি হে? চল না ঐ দিকে একটু যাই।"

নিখিল বলিল, "ওরে বাপরে! ওখানে মান্‌ষে যায়!"

"কেন হে? ওখানে কি?"

"ওখানে ভয় আছে।"

"বাঘের নাকি? তা হলে কাল বন্দুক আনা যাবে।"

'বাঘ ত ভাল, ও বাঘের বাবা—ভূত!"

'বটে! চল চল—দেখা যাক্—" বলিয়া নগেন একটু অগ্রসর হইল।

নিখিল বলিল, "নাহে আমি যাব না—প্রাণটা এত সস্তা নয়।"

"ওহে তোমায় কিছু বল্‌বে না, তুমি পাড়ার লোক—যা হয় আমার উপর দে হবে এখন—আচ্ছা তুমি ভূত বিশ্বাস কর?"

"কি রকম! ভূত দেখা গেলে আর কে না বিশ্বাস করে?"

"ও ছুঁয়ে না দেখ্‌লে বাবা বিশ্বাস হয় না।"

এমন সময় দূর মাঠের মধ্য হইতে কে হাঁকিয়া উঠিল, "পে—র—ফু—ল্লো—ও—ও—ও—ও—ও! ও—ও—ও—পে—র—ফু—ল্লো—ও—ও—ও—ও—ও।"

নিখিল চমকিয়া উঠিয়া নগেনকে বলিল, "ওহে শুন্‌ছ! ঐ বাড়ীটার ভিতর থেকেই আওয়াজটা আস্‌ছে না?—তুমি যেতে চাও যাও,—আমি ঐ বাঁশঝাড়ের নীচে—না—ঐ গয়লাদের ওখানে বসে থাক্‌ব।"

এমন সময় দেখা গেল, দূর হইতে কে একটা গরু তাড়াইয়া আনিতেছে।

নগেন বলিল, "ওহে যার আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠেছিলে সে ভূতটা ঐ আস্‌ছে—এই রকম একটা ভূত ঐ বাড়ীটার মধ্যেও আছে।"

চাষা গরু লইয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার সময় বলিল,—"বাবুরা ওদিকে এখন যাবেন না, ভূত বেরিয়েছে,—আমি দেখে এলাম—সাদা কাপড়ে মোড়া—দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে আছে! যান, বাবুরা—এখন বাড়ীতে যান্‌!"

এই বলিয়া সে সরিয়া পড়িল।

নগেন বলিল, "দরকার হলে যদি ঐ বাড়ী থেকে চেঁচিয়ে ডাকি তা হলে তুমি গয়লাদের বাড়ী থেকে শুন্‌তে পাবে না?"

নিখিল বলিল, "দরকার অবিশ্যি হতে পারে, আর চেঁচালেও শোনা যাবে, কিন্তু চেঁচাতে পার্‌বে কিনা সেইটেই হচ্ছে কথা।"

নগেন বলিল, "আচ্ছা চেঁচাতে যদি নাই পারি, তা হলে আধঘণ্টাটাক্‌ পরে লোকজন নিয়ে আমার খোঁজ ক'রো।"

তখন সন্ধ্যার কালো রঙ্গে কে যেন চারিদিক ঘন করিয়া লেপিয়া দিয়াছে। বাঁশঝাড়ের ভিতর পাখীগুলা ঘরোয়া বিবাদ লইয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। নগেন দ্রুতপদে ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে চলিল। তালগাছের সারির নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই তাহাদের একটা ঝাঁকড়া মাথার উপরে 'চড়্‌ চড়্‌' শব্দ হইল। নগেনের হৃৎপিণ্ডের উপর কাঁটা দিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড শকুনী সেই তালগাছটার উপর উড়িয়া বসিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া সে আর দুই চারি পা অগ্রসর হইলেই তাহার পিছন দিকে কে 'খক্‌ খক্‌' করিয়া কাসিয়া উঠিল। এবার নগেন দেখিল একটা ভুঁদো শিয়াল সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে।

একটা ঝাউগাছের নীচে দাঁড়াইয়া নগেন বাড়ীটার দিকে চাহিল। প্রাচীরের উপর সত্যই একটা মূর্ত্তি—যেন আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা। একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ও তাহার উপর ভর দিয়া নগেন প্রাচীরের উপর লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু এ কি! ভূতটা দৌড়াইতেছে কেন? নগেন তাহাকে তাড়া করিল। কিন্তু কই? কোথায় সে অদৃশ্য হইল? নগেনের কপালে বিন্‌ বিন্‌

করিয়া ঘাম বাহির হইল। এমন সময় পিছনে কে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নগেন চাহিয়া দেখে মূর্ত্তিটা পিছনে। নগেনের পা ছুটা থর থর করিতে লাগিল। হায়! কেন সে সাধ করিয়া ভূতের কবলে আসিয়া পড়িল?

পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া সে উহার পিছনে জোরে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু একি? কে যেন হাঁপাইতেছে বলিয়া বোধ হয় না! ভূত যদি হয়, তবে মানুষের মত হাঁপাইবে কেন? নগেন সজোরে লাঠি হাঁকড়াইল। সে "মাগো" বলিয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নগেন লাফাইয়া পড়িয়া—তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কে তুই?"

উত্তর হইল, "উঃ! বড় লেগেছে!"

"অাঁ! তুমি স্ত্রীলোক!"

উত্তর হইল, "আমায় বাড়ীর ভিতর নিয়ে চলুন।"

একটা বড়ঘরে বিছানাপাতা ছিল। জানালা দিয়া জ্যোৎস্না উঁকি মারিতেছিল।

রমণীকে সেই বিছানায় শোয়াইয়া নগেন পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিল। রমণী বলিল, "ঐ কুলুঙ্গীতে প্রদীপ আছে।"

প্রদীপ জ্বালিয়া নগেন দেখিল রমণী দেখিতেও সুন্দরী বটে!

নগেন—"কি ব্যাপার বলুন দিকিন্—না থাক্—আপনার বোধ হয় খুব লেগেছে—আপনি স্ত্রীলোক জান্‌লে মার্‌তুম না।"

রমণী। হাঁ, খুব লেগেছে।

নগেন। এখানে জল আছে?

রমণী একটি কলসী দেখাইয়া দিল।

তাড়াতাড়ি নগেন আপনার পরিধেয় কাপড়খানির খানিকটা ছিঁড়িয়া জলপটি তৈয়ার করিয়া রমণীর আহতস্থানে বাঁধিয়া দিল।

ঘরের কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা টুল টানিয়া লইয়া নগেন বিছানার কাছে বসিল। যুবতীর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া নগেন বলিল, "এ রকম ভূতের অভিনয় করা আপনার বেশ ভাল লাগে?"

রমণী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্নেহকরুণ স্বরে বহু প্রবোধ দিয়া ক্রমে ক্রমে নগেন রমণীর সমস্ত ইতিহাস শুনিল।

সহায় সম্বলহীনা এক বালবিধবা দারিদ্র্যের তাড়নায় ও প্রলোভনের আকর্ষণে কেমন করিয়া ক্রমে পাপের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সব নগেন

শুনিল। আর শুনিল, প্রণয়ীর সঙ্গে সাক্ষাতে কোনও বাধা না ঘটে, তাই সে এই ভূতের অভিনয় করিত। শুনিয়া এই অভাগীর প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় তাহার চিত্ত মথিত হইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে, নগেন করুণ গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল "এই যে ব্যোমকেশের কথা ব'ল্লেন, সে আপনাকে ভালবাসে ?"

রমণী অশ্রুসিক্ত নতমুখে উত্তর করিল, "বাসে—বোধহয়।"

"ব্যোমকেশের স্ত্রী আছেন ?"

রমণী। না, মারা গেছেন।

নগেন। আপনাকে যদি সে ভালবাসে তবে কেন সে আপনাকে বিধবা বিবাহ করুক না ?

রমণী। তা বলে দেখেছিলুম, কিন্তু সে বল্লে বিধবা বিবাহ করলে জাত যাবে।

নগেন। বাঃ! যে একজনের জাত ধর্ম্ম অনায়াসে নিতে পারে সে তার বদলে নিজের জাত দিতে পারে না ? এ কি রকম ভালবাসা ?

রমণী নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কোনও উত্তর করিল না।

নগেন। ভাল, আর একবার কি তাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন ?

রমণী। হাঁ, কর্‌ব।

নগেন। যদি রাজী না হয়, তা হলে——

রমণী। তা হলে আপনি যা কর্‌তে বল্‌বেন কর্‌ব।

নগেন। আমি যেখানে নিয়ে যাব আপনি যাবেন ?

রমণী। যাব।

নগেন। তবে তাই ঠিক হল। যদি ব্যোমকেশ আপনার কথায় রাজী না হয় তা হলে কাল আপনি নিখিলের বাড়ী যাবেন সন্ধ্যার সময়, আমি সেখানে আছি। নিখিলকে জানেন ত ?

রমণী। হাঁ জানি। আপনি যা বল্‌লেন আমি তাই কর্‌ব।

নগেন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নিখিল তখনও গয়লাদের দাওয়ায় তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নগেনকে দেখিয়া নিখিল ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি ব্যাপার ? এতক্ষণ ভূতের বাড়ীতে কি কর্‌ছিলে ? কিছু দেখ্‌লে ? কি হল ? ব্যাপার কি ?"

নগেন। অত ব্যস্ত হয়ো না, চল যাওয়া যাক্ বাড়ীর দিকে—আজ আর কিছু বল্‌ব না। একটা কথা তোমায় বলে রাখি, কাল কেউ আমাদের বাড়ীতে এলে আমি যা বল্‌ব তুমি তাইতে সায় দিয়ে যেও।"

নিখিল। তা হবে, কিন্তু কি ব্যাপারটা হল জান্‌বার জন্য প্রাণটা যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে।

নগেন। আচ্ছা সে শুনো এখন এর পর, এখন চল।

দুইজনে বাড়ী ফিরিল।

(২)

পরদিন সন্ধ্যার সময় সঙ্গীতের সরঞ্জাম হইতেছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগেন নিখিলকে বলিল, "ওহে ইনিই কাল আমাদের কাছে সাহায্য চাইছিলেন।"

নিখিল নগেনের কথায় সায় দিল।

নগেন বলিল "তুমি ত কাল বল্‌ছিলে তোমাদের বাড়ীতে রাঁধুনি আছে; তা এঁকে কোথায় রাখা যায় বল দেখি?"

দেবেন একটু হাসিয়া বলিল "আমাদের মেসে রেখে দিলে হয় না?"

নগেন বলিল, "ঠিক বলেছ, উড়ের রান্না আর খাওয়া যায় না।"

নিখিল। সে কথা ঠিক।

নগেন। তা হলে কাল সকালে আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে—কত মাইনে চান?

স্ত্রীলোক। যা ইচ্ছা দেবেন।

নগেন। আচ্ছা যা সব রাঁধুনীরা পায় তাই পাবেন।

সূর্য্যকান্ত বলিয়া উঠিল "নগেনের আমাদের হাত যশ আছে। মেসের ঝি আর রাঁধুনি নগেন ছাড়া আর কেউই আন্‌তে পারে না।"

রমণী চলিয়া গেলে প্রমথ বলিল "কি হে নগেন কালই যাবে কি রকম?"

নগেন উত্তর করিল, "ভাই, জান ত দেশ থেকে একটা টেলিগ্রাফিক মণি-অর্ডার দু একদিনের মধ্যে আস্‌বার কথা আছে, আর কাজও জমে গেছে।"

সকলে গা টেপাটিপি করিয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা যাও,—কিন্তু দেখে শুনে পথ চ'লো।"

নগেন রমণীকে লইয়া কাশীধামে উপস্থিত হইল। কাশীধামে নগেনের এক আত্মীয় বাস করিতেন। রাস্তায় নগেন রমণীকে বলিল, "যদি আপনার পরিচয় ওরা চায় বল্‌বেন আমি নগেন বাবুর আত্মীয়া, তা হলে আর কোন কষ্ট হবে না। রোজ গঙ্গাস্নান কর্‌বেন, বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ্‌বেন।"

(৩)

এ দিকে সকলে মেসে ফিরিয়া নগেনকে দেখিতে পাইল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া সূর্য্যকান্ত উড়ে বামুনকে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এই, বামুন ঠাকুরুণ কোথায় ?"

উড়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রকৃতিভূষণ সমস্ত প্রণিধান করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল "ওহে সে নির্ঘাৎ ভেগেছে !"

শচীনাথ বলিল "নগেনেরই বা দোষ কি, তার বাপ মার একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার ছিল।"

শচীনাথের কথায় সায় দিয়া দেবেন বলিল, "ও যেবার এল এ, পাশ করে, সেইবার ওর বাবাকে আমি বে দেওয়ার জন্য বলেছিলুম, তা তাঁর বোধ হয় ইচ্ছে এম এ, পাশ না হলে বে দেবেন না। কিন্তু টাকার বস্তা ভারী করতে যেয়ে সেটা যে একেবারেই ফেঁসে গেল !"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় সেখানে নগেন আসিয়া পড়িল। সকলে দেখিল তাহার মাথা রুক্ষ, কিন্তু মুখ প্রফুল্ল ! সমরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি ? কোথায় ছিলে হে ?"

নগেন কহিল, "ব্যাপার আর কিছুই নয়, একটা পাথরের নুড়ী রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, লোকে সেটাকে মাড়িয়ে যেতো, আমি সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে এলুম।"

সকলে বক্র হাসি হাসিয়া উঠিল। তখন আর এ বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য হইল না। কিন্তু নগেনের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সকলে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল।

একদিন নগেনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বন্ধুগণের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল। শচীনাথ বলিল, "ওহে, নগেন যে আজকাল হেঁটে কলেজে যাচ্ছে, সে দিন জিজ্ঞাসা করলুম, বল্লে পয়সাগুলো ট্রাম কোম্পানিকে না দিয়ে গরীব দুঃখীকে দিলে কাজ হয়।"

দেবেন বলিল, "টিফিনের সময় আজকাল আর জল খাবার খায় না।"

প্রকৃতিভূষণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কাল নগেন উড়ে বেয়ারাটাকে দিয়ে একটা মনিঅর্ডার পাঠাচ্ছিল,—দেখ্‌লুম নামটা সুকুমারী আর স্থানটা কাশী !"

সূর্য্যকান্ত এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল "আচ্ছা, এটা কিন্তু

আশ্চর্য্য! সে এখান থেকে টাকাই পাঠাচ্চে, অথচ এই এতদিন কেটে গেল—কই একদিনও সে ত কল্‌কাতা ছাড়া হল না!"

সমস্যাটা খুব গুরুতর বিবেচনা করিয়াই সকলে স্থির করিল, ইহার মীমাংসা অতি সত্বরই হওয়া দরকার।

সৌভাগ্যক্রমে সে দিন নগেন মেসে ছিল না। সকলে এক মত হইয়া নগেনের ড্রয়ার, সেলফ্‌ প্রভৃতি খানাতল্লাস করিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বইয়ের ভিতর একখণ্ড চিঠি পাওয়া গেল, দুই মাস আগের তারিখ। প্রকৃতিভূষণ সকলকে পড়িয়া শুনাইল—

"আপনার দয়া ম'লেও ভুল্‌ব না। কাশী মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ। পরকালে আপনার এ ঋণশোধ কর্‌ব। সুকুমারী।"

পত্র পড়িয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা আশা করিয়াছিল কতকগুলো প্রেমের কথা লেখা থাকিবে।

সমরেন্দ্র বলিল, "কি হে এ আবার কি? যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তা ত নয়? লোকটা বোধহয় একটা কোন ভাল কাজই করেছে।"

শচীনাথ বলিল, "নগেনের দেখ্‌ছি শুধু সাহস নয় মনের বলও যথেষ্ট আছে।"

এমন সময় নগেন আসিয়া পড়িল।

নগেন। কি হে আমার ঘরটা আজ Bombard কর্‌ছ দেখ্‌ছি। কি ব্যাপার?

শচীনাথ। তোমার চরিত্রটাই আমরা অনেকদিন থেকে Bombard কর্‌ছিলুম, কিন্তু শেষে দেখ্‌লুম ভরতপুরের কেল্লা—একটু বালিও খসেনি।

প্রমথ। বরং আরো চূণকাম করা দেখাচ্ছে এখন ব্যাপারটা খুলে বল দেখি?

নগেন। খুলে আর বল্‌ব কি ভাই? আগেই ত বলেছি, একটা নুড়ী রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, লোকে সেটাকে মাড়িয়ে যেত, আমি তাকে দেবী-প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

সমরেন্দ্র বলিল, "তুমি ভাই দেবী-প্রতিষ্ঠা করেছ, হতে পারে,—কিন্তু আমরাও আমাদের মেসে একটা দেবপ্রতিষ্ঠা করেছি!"

সে দিন নগেনের সম্মানের জন্য মেসে একটা প্রকাণ্ড প্রীতিভোজ হইয়া গেল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কে তুমি।

কে তুমি দাঁড়ালে আসি
করমের পথে মোর
লজ্জা নম্রমুখি!
সহস্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ,
ব্যাকুলতা,—তৃষাভরে,
ক্ষুদ্র দুটি আঁখি:
পুলক কটাক্ষ, মৃদু
হাস্যের তরঙ্গ ভরা,
—ক্ষণ প্রভা সম—
অপাঙ্গে লুকায় পুনঃ,
উজলি মধুর তীব্র
ক্ষুব্ধ হৃদি মম।
শশাঙ্ক দীরঘশ্বাস
নিক্ষেপি, গগন প্রান্তে
পশিল সরমে;
স্পর্শিয়াছে সে নিশ্বাস
বিমল ললাটে তব,
বেজেছে মরমে;
তাই,—বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি
ফুটিয়াছে আবরিয়া
বদন মণ্ডল;—
—উষার শিশির সিক্ত,
সদ্যস্ফুট, হাস্যপূর্ণ
যেন শতদল।
প্রাণ হরা ও মাধুরী
হেরি আজি আত্মহারা
বিমুগ্ধ নয়ন,
তৃষিত চকোর সম,
চাহে সদা অনিমেষে
ওই—রূপ সুধা পান
কেন এ বিস্মৃতি আজি,
হেন ঘোর আকুলতা
হৃদয়ের মাঝে,
নবীন প্রভাতে হেরি
অয়ি মনোরমে, তোমা
বিমোহন সাজে?
ঘুরেছি সমগ্র বিশ্ব,
হেরিয়াছি কত দৃশ্য
নয়নরঞ্জন।
কম্পিত হয়নি কভু
এ হেন আবেগ ভরে
উৎসুক পরাণ।
বাজে নাই হৃদিবীণা,
আকুল ঝঙ্কার তুলি,
(কারো)—অঙ্গুলি পর
সহস্র করুণ দৃষ্টি,
আকর্ষিতে হৃদি মোর
ফিরেছে নিরাশে।
আর তুমি, ক্ষণমাত্র
ক্ষুদ্র দুটি আঁখি মেলি
মোহিলে চকিতে!
কে তুমি স্বরগ বালা,
চিতহরা মূর্ত্তিলয়ে
(মম)—জীবন প্রভাতে

শ্রীপঞ্চানন বসু।

তুমি ও আমি।

তুমি গো পূজ্য আমি যে পূজারী
প্রভু তুমি, আমি ভৃত্য;
তুমি জ্যোতির্ম্ময় আমি গো আঁধার,
প্রেমময় তুমি সত্য।
তুমি হিমাচল, শিলা খণ্ড আমি
লুটাই চরণ প্রান্তে;
তুমি হে সিন্ধু গোষ্পদ আমি
শুকাই দিবস অন্তে।

শ্রীমাখনলাল মিত্র

অভিনয়।

(১)

আষাঢ়ের অপরাহ্ণ ; বৈশালী নগরে নিজের বাসগৃহের উচ্চতম চূড়ার পার্শ্ববর্ত্তী একটি অলিন্দে বসিয়া সুরসেন কাদম্বরী পড়িতেছিল। দিনান্ত রবির শেষ কিরণটুকু নগরের প্রতি সৌধচূড়ায় ঈষৎ সোণালীবর্ণের আভা আঁকিয়া দিতেছিল। সুরসেন কাদম্বরী পড়িতেছিল, আর এক একবার দিক্ চক্রবালে রক্ততপনের ক্রমনিমজ্জনের ভঙ্গীটুকু আনমনে লক্ষ্য করিতেছিল ; দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কাদম্বরীতে বর্ণিত কোনও অপরাহ্ণ দৃশ্যের সহিত অদ্যকার এই সূর্য্যাস্তের কোনও সৌসাদৃশ্য আছে কি না, তাহাই সে ভাবিতেছিল। সুরসেন যখন শেষবার মস্তক উত্তোলন করিল, তখন পশ্চিমদিক্চক্রবালে ধূসরমেঘের কোলে একটি সুচিক্কণ সোণালী রেখামাত্র উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। সুরসেন কাদম্বরী হাতে রাখিয়া সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "সখা!"

সুরসেন ফিরিয়া চাহিল.—দেখিল স্মিতমুখী অমৃতা পাশে দাঁড়াইয়া! সুরসেন কহিল, "এস সখী! এস অমৃতা! কখন আসিলে?"

অমৃতা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি ত এই কতক্ষণ আসিয়াছি। তা তোমার মন যে নিকটের সব পদার্থ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর ওই আকাশেই নিবদ্ধ হইয়া আছে। আকাশে কি দেখিতেছিলে সখা? কোনও দেববালা আভির্ভূতা হইয়াছেন কি?"

সুরসেন ঈষৎ আনমনাভাবে উত্তর করিল, "দেববালা! হাঁ দেববালাই বটে! ওই দেখ সখী, তাঁর শেষ রাঙা হাসিটুকুও ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় মিলাইয়া গেল!"

অমৃতা আবার হাসিয়া কহিল, "ইস্! বড় যে কবি হইয়া উঠিলে! এবার কালিদাসেরও যশ বিলুপ্ত হইবে দেখিতেছি।"

"আর তুমি কার যশ বিলুপ্ত করিবার আয়োজন করিতেছি সখী? সংঘমিত্রার না রাজশ্রীর?"

"অত বিদ্রূপ কেন সখা? না হয় সদ্ধর্ম্মশাস্ত্র * কিছু পড়িতেছি,—না হয় দীনা ভিক্ষুণী হইয়া সদ্ধর্ম্মের সাধনায় জীবন কাটাইব একটু ভাবিতেছি। তা

---

* বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মকে 'সদ্ধর্ম্ম' এই নাম দিতেন।

নারী বলিয়া কি এমন কোনও বাসনা আমাদের হইতে নাই? বাহির জগতের যাহা কিছু কর্ম্ম সবই কি পুরুষ তোমাদেরই অধিকারে?"

"কি সর্ব্বনাশ! সখী, তুমি যে বড় বাড়াবাড়ি একটা বক্তৃতা করিয়া ফেলিলে! আর যাহা বলিলে, তার মধ্যে নারীর মত যুক্তিহীন কন্দলের ভাবও বেশ রহিয়াছে!"

"ঐ ত তোমাদের দোষ! সাধে কি সংসার ছাড়িয়া সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চাই? নারীর যুক্তিহীন কন্দল! কন্দলে কি কখনও যুক্তি কিছু থাকে, না যুক্তি কিছু চলে? উচ্চ বাক্‌শক্তি মাত্র কন্দলে জয় পরাজয় নির্দ্দেশ করে, যুক্তি নয়। তারপর, কন্দল কেবল নারীরাই করে না। নারীর অপবাদ যতই দেও, কন্দল তোমরা পুরুষরাও কি কম কর?"

"হার মানিলাম সখী! এবার মাপ কর। কন্দলে বাক্‌শক্তির প্রাবল্য তোমারই অধিক দেখিতেছি!"

"অবলার কোনও বলের প্রাবল্যে হার মানিলে এ কথা বলিতে কি—পুরুষ তুমি সখা—একটু লজ্জা তোমার হইল না?"

সুরসেন কহিল, "সখী, অবলা বাহুবলেই অবলা, বাগ্‌বলে ত নহে!"

অমৃতা উত্তর করিল, "যাক্! আর তর্কে কাজ নাই। যদি বাগ্‌বলেরই প্রাধান্য অবলার মান, তার আর একটু পরিচয় দিতেছি—শুনিলাম তুমি নাকি তোমার মাতার সঙ্গে কন্দল করিয়াছ। অবশ্য কন্দল যে যুক্তিহীন তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।"

"তা বটে! কিন্তু কে বলিল?"

"তিনিই আমার মাতার কাছে এইমাত্র দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন।"

"হুঁ! মা দেখিতেছি এবার গৃহছাড়াই করিবেন!"

"এত বড় মিথ্যা কথাটা কহিলে সখা? তিনি যে তোমাকে গৃহে একেবারে স্থিত করিতে চান!"

"এখনও যে তার সময় হয় নাই সখী?"

"আবার কবে হইবে? বয়স কি কম হইল? আরও যে কাদম্বরী পড়ার ঘটা! আকাশে যে দেববালার হাসির ছটা!"

সুরসেন হাসিয়া কহিল, "সখী! যদি কাব্যানুরাগ আর কবিত্বের অভিযোগই করিলে, তবে এ কথা বলিলেও বোধহয় অন্যায় হইবে না যে কাব্যরসিকের বাঞ্ছনীয়া কোনও আদর্শ নায়িকা যতদিন আমার মনঃপ্রাণ হরণ না করিবে, ততদিন ত বিবাহ সম্ভবই নয়!"

সুরসেন ও অমৃতা—(অভিনয়)

কমলা প্রেস.—বাগবাজার, কলিকাতা।

"কোথায় এমন নায়িকা মিলিবে? ও সব নায়িকা কাব্যেই থাকে, বাস্তব জগতে দেখা যায় না।"

"দেখা যায় বই কি? বৈশালীতে হয়ত নাই, অন্যত্র থাকিতে পারে। তাই ভাবিতেছি, একবার এখন দেশ ভ্রমণে বাহির হইব, দেখিব বিশাল এই ভারতে কোথাও কাদম্বরী কি মহাশ্বেতা—কি অগত্যা একটি পত্রলেখাও মেলে কি না।"

"কল্পিতা নায়িকার অনুসন্ধানে দেশপর্য্যটন কোনও নায়কের পক্ষে নূতন বটে! যদি কবিত্ব কিছু থাকিত, তোমার এই অপূর্ব্বকাহিনী লইয়া একখানি কাব্য লিখিতাম। তা বেশ, তোমার যেমন অভিরুচি করিতে পার। কিন্তু তোমার মাকে কি বলিবে? কবে কোন্ দেশে তোমার নায়িকা মিলিবে, তার জন্য কি তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন?"

"হুঁ———তা সত্য! তাঁকে কিছু একটা ছল করিয়াই ভুলাইতে হইবে।"

"ছলে পরমপূজ্যা জননীকে ভুলাইবে?"

"বড় বিপদে সর্ব্বত্রই ছল চলে। তাঁকে ত একেবারে সত্যই প্রবঞ্চিত করিব না। যখন আমার নায়িকালাভ হইবে, তখনই বধূ পাইবেন, অতি উত্তম বধূই পাইবেন! তখন আমার এ খেলার মত ছল তিনি আনন্দে মার্জ্জনা করিবেন।"

"কি ছল তবে করিবে সখা?"

"একটা—বড় মজার কথাই মনে হইতেছে! কিন্তু তুমি কি মনে করিবে সখী, তাই ভাবিতেছি!"

অমৃতা উত্তর করিল, "আমি কি মনে করিব সখা? আমা হইতে যদি তোমার ভাল কিছু হয়, আমি কি তা করিতে কুণ্ঠিত হইব?"

"সাধারণতঃ তা হইবে না বটে! তবে আমি যা বলিতে চাই, তা যে একান্তই অসাধারণ।"

"তোমার জন্য যদি একটু অসাধারণই কিছু না করিতে পারিব, তবে বৃথাই আমাদের এই সখিত্ব! আমাদের স্নেহ কিছু নাই, বাল্যাবধি একটা অসার অভিনয়ই কেবল করিতেছি।"

"ঠিক বলিয়াছ সখী! আমাদের সখিত্বে অভিনয় কিছু নাই। কিন্তু এখন সেই সখিত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নূতন অভিনয়ই একটা করিতে হইবে।"

"কি অভিনয় সখা?"

সুরসেন কহিল, "সখী, তুমি ত বিবাহ করিবেই না, ভিক্ষুণী হইবে, এই মনে করিয়াছ। নতুবা হয়ত তোমার সঙ্গেই আমার বিবাহ এতদিন হইয়া যাইত। যদিও ভাইবোনের মত শৈশবাবধি খেলা করিয়াছি, আমরা সখা সখী হইয়াছি,—নায়ক নায়িকার মত কোনও প্রেমের সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে যে কখনও সম্ভব হইত, এমনই মনে হয় না। যাই হক্, এখন যদি এমন একটা ভাব আমরা দেখাই, যেন———

অমৃতা হাসিয়া কহিল, "যেন আমরা নায়কনায়িকা বা প্রেমিকপ্রেমিকা হইয়া উঠিতেছি! তোমার আকর্ষণে মঠ হইতে সংসারের দিকে আমার মনটা এখন টানিতেছে—"

"সুতরাং কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে, তোমার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইতে পারে। এ বিবাহ যে তোমার মাতা ও আমার মাতা উভয়েরই অতিশয় প্রীতিকর হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তোমার ভিক্ষুণী হইবার অভিপ্রায়ে তোমার মাতার যে তেমন সম্মতি নাই, এ কথা ত জানই। কেবল তোমার পিতার অনুমোদন ছিল বলিয়াই তোমার মাতা আপত্তি করিতে পারিতেছেন না।"

অমৃতা হাসিয়া কহিল, "হাঁ, এরূপ একটা অভিনয় করিতে পারিলে, তোমার মাতা আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু লোকে আমাকে কি বলিবে সখা?"

"লোকে যাই বলুক, সখার জন্য কি আপাততঃ এটুকু গ্লানি সহ্য করিতে পারিবে না সখী? তারপর যখন লোকে বুঝিবে, আমার হিতার্থে তুমি এই অভিনয় মাত্র করিয়াছ, তখন লোকে তোমার এই সখিত্বের প্রশংসাই করিবে!"

"তারপর? কতদিন এই অভিনয় করিতে হইবে?"

"যতদিন আমার নায়িকালাভ না ঘটে। ইতিমধ্যে আমিও দেশপর্য্যটনে বাহির হই। কারণ, জান ত—বিরহ ব্যতীত প্রেম পরিপক্ক হয় না।"

অমৃতা হাসিয়া উত্তর করিল, "প্রেম ত খুঁজিতেই যাইতেছ। যখন মিলিবে, তখন কি আর বিরহের তাপে তা পাকাইতে চাহিবে?"

"সে ত ঘরের কথা সখী! বাইরের লোকে যা ভাবিতে পারে, তাই না বলিতেছি? যাক্, তবে এই অভিনয়ে সখাকে কৃতার্থ করিবে ত?"

"বেশ, করিব। তা কবে এ অভিনয় আরম্ভ হইবে সখা?"

"বিলম্বে আর কি প্রয়োজন ? এখন হইতেই আরম্ভ হউক।"

"ভাল, তাই তবে হউক্! কোনও নায়িকার সন্ধান যদি মিলে, সখীকে তা জানাইবে ত ?"

"অবশ্য জানাইব। কিন্তু আমারও কথা রহিল, যদি তোমারও কোনও নায়ক-লাভ ঘটে, যদি এমন কেহ আসিয়া জোটে যে নাকি নিরস 'সদ্ধর্ম্ম' হইতে সরস দাম্পত্যধর্ম্মে তোমার মন টানিয়া আনিতে পারে, তখন যেখানেই থাকি, তুমিও অবশ্য আমাকে সব জানাইবে।"

অমৃতা কহিল, "সে সম্ভাবনা আদৌ নাই। ভাবী দাম্পত্যধর্ম্মে তুমি যে রস দেখিতেছ, সদ্ধর্ম্মের অনুশীলনে তার চেয়ে অনেক বেশী রস আমি দেখিতেছি!"

"তবু কি জান সখী,—মানুষের মন কখন কিসে কোন দিকে টানিবে, তার স্থির কি ? যদিই এমন কিছু ঘটে, তখন ————"

"অবশ্য তোমায় জানাইব। তা আমার এমন কিছু ঘটিবার অনেক আগে তোমারই ঘটিবে। তুমি যেন জানাইতে ভুলিও না। আপাততঃ কোথায় যাইবে সখা ?"

"পাটলীপুত্রে!"

"হাঁ, বেশ সংকল্পই করিয়াছ। রাজধানীতে নাগরী নায়িকা সহজেই মিলিতে পারে। তবে এখন আসি সখা ?"

"বিদায়ের কালে একবার প্রেম সম্ভাষণ করিবে না সখী—না না প্রিয়তমে! প্রাণপ্রতিমে!"

"এখানে অন্য লোক নাই,—অভিনয় কাকে দেখাইবে ?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমৃতা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সুরসেন দেখিল না অমৃতার মুখে কেমন একটা মধুর লজ্জার রক্তিম উচ্ছ্বাস উঠিল!

*　　*　　*　　*　　*

পরদিন সুরসেনের এবং অমৃতার মাতা দুজনেই নিজ নিজ পুত্রকন্যার গৃহে দুইখানি প্রেমপত্র কুড়াইয়া পাইলেন। তাঁহারা প্রতিবেশিনী এবং উভয়ের মধ্যে সখ্যও যথেষ্ট ছিল। পত্র পড়িয়া উভয়েই বড় আনন্দিত হইলেন, অবিলম্বে পত্র লইয়া পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। চুপি চুপি অনেক কথা হইল। শেষে আনন্দের আবেগে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সুরসেন দুইদিন পরে জানাইল, সে কিছুদিনের জন্য পাটলীপুত্রে যাইবে। মাতা আপত্তি করিলেন না। বিবাহের কথাও আর উত্থাপন করিলেন না। কন্দর্প আপনিই যে পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন, সে পথে নিজের আর হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন আছে, এরূপ তাঁহার মনে হইল না।

(২)

প্রাণে কেমন একটা মহাশূন্যতা বহন করিয়া যেন সুরসেন পাটলীপুত্রে আসিল। একটা প্রবল স্ফূর্ত্তি লইয়া সে বৈশালী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সে স্ফূর্ত্তি যেন দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সে অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল। পাটলীপুত্রে তাহার কতিপয় বন্ধু ছিল, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় সে বিবিধ প্রমোদে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত,—কিন্তু সর্ব্বদাই অন্তরে যেন কি একটা রুদ্ধ বেদনা গুমরিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা আভাস তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিতেছিল। কিন্তু সেটাকে সে ফাঁকি দিয়া চলিতে চাহিল। ভাবিল এটা শুধু মনের দুর্ব্বলতা। সে জোর করিয়া অমৃতাকে একখানি পত্র লিখিল,—

"সখী, পাটলীপুত্রে আসিয়া দিনগুলা বেশ কাটিতেছে। সুন্দর সুন্দর কত উদ্যান, কত সঙ্গীতশালা, কত নাট্যাশালা—অফুরন্ত প্রমোদে দিনগুলি বেশ যাইতেছে। মনে হয় চিরদিন এইখানেই থাকি। গঙ্গাতীরের দৃশ্য বড়ই মনোরম। যখন নৌকায় গঙ্গাবক্ষে বেড়াই,—আহা সে যে কি স্ফূর্ত্তি সখী! তুমি কেমন আছ? বিরহের দিনগুলা কাটিতেছে কেমন? কৃশতায় ম্লান হইয়া যাইতেছ না ত? শীঘ্র উত্তর দিও। আমার কিন্তু বিরহের তাপে হৃদয়ভরা প্রেম যেন উথলিয়া উঠিতেছে! তাই অবিরত যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। ইতি—

তোমার সখা সুরসেন।

অমৃতা তাহার উত্তরে লিখিল,—

তোমার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম সখা। বিরহে কৃশতা কিছুই হয় নাই। তাপে নাকি আয়তন বৃদ্ধি পায়, আমারও তাই পাইতেছে। মা নূতন করিয়া আমার জন্য অলঙ্কার গড়িতে দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার আগের অলঙ্কার এখন ছোট হইয়া গিয়াছে! তবে পুরাতন এই বৈশালীতে নূতন প্রমোদ কিছুই নাই। নতুবা তোমার মত আমিও নাচিয়া বেড়াইতাম। ইতি—

তোমার সখী অমৃতা।

সুরসেন অমৃতার পত্রখানা পড়িল, তারপর ভাবিল এখন কি উত্তর দিবে; নূতন করিয়া আর কি লিখিবে। অবশ্য রহস্যের ছলে অনেক কথাই লেখা যায়; কিন্তু কতদিন আর এ মিথ্যা রহস্যের আবরণে নিজেকে সে লুকাইয়া রাখিবে? যদি কোনদিন ধরা পড়িয়া যায়? তাহা হইলে লজ্জায় আর তাহাকে এ মুখ সে দেখাইতে পারিবে না। সে ভাবিল, "আর ওদিক্ দিয়াই যাইব না।" সে অমৃতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বোঝার উপর বোঝা চাপাইয়া বিশ্বাসঘাতক হৃদয়ের গুপ্ত কামনাস্ফুলিঙ্গটাকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তিনচারি পৃষ্ঠা শুধু পাটলীপুত্রের গঙ্গাতীরের দৃশ্য এবং প্রমোদশালা সমূহের বর্ণনাতেই ভরিয়া ফেলিল! কিন্তু তবু তাহার তৃপ্তি হইল না। পরিশেষে একটা বড় রকমের মিথ্যা কথা লিখিয়া সুরসেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে লিখিল—

"সখী! তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাই লিখিতেছি। বুঝি আমায় নায়িকা এতদিনে পাইলাম। আমার নায়িকা সত্যই সে বটে। কিন্তু হায়, আমি তার নায়ক কখনও হইব কিনা কে জানে? সেদিন জাহ্নবীতীরে এক দেবমন্দিরে গিয়াছিলাম। আহা, কি দেখিলাম! আহা সখী, কেমন করিয়া বলিব কি দেখিলাম! সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা যেন কোনও দেববালা মন্দিরে করজোড়ে দেবতার স্তোত্রগান করিতেছিলেন! আহা কি সে রূপ! কি সে কণ্ঠের মধুরসুরলহরী! আহা সখী! এক মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রাণ যেন আমার উন্মত্ত হইয়া তার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। শুনিলাম, সে পাটলীপুত্রের কোনও সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের কন্যা। আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া সে একবার আমার দিকে চাহিল। নয়নপথে আমার প্রাণের আবেগ যেন তার প্রাণ গিয়া স্পর্শ করিল। সলজ্জ আরক্তিম মুখখানি সে ফিরাইয়া নিল,—তারপরেই মন্দির ত্যাগ করিল। আহা সখী! এ রত্ন কি আমার ভাগ্যে লাভ হইবে? ইতি—

অভাগা সখা সুরসেন।

একটু বিলম্বে চিঠির উত্তর আসিল। অমৃতা লিখিয়াছে!—

"সখা! তোমার পত্র ঠিক সময়েই পাইয়াছিলাম। কিন্তু উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল, তা রাগ করিও না। অবশ্য বিলম্ব হইবার কারণটা তোমায় বলিতেছি সখা!

মা'র একটি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়পুত্র আমাদের এখানে আসিয়াছেন। বড় সুপুরুষ তিনি, আর সঙ্গীতে যারপরনাই সুকণ্ঠ ও নিপুণ। কাব্যাদিও অনেক পড়িয়াছেন। কয়েক দিন যাবৎ সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত ও কাব্যের

আলোচনায় কাটাইতেছি। কাব্য সঙ্গীতাদিতে আমার তেমন একটা আকর্ষণ ছিল না,—তা ত তুমি জান! কিন্তু ইনি যে কি যাদু জানেন, কদিনেই আমাকে কাব্যামোদে এবং সঙ্গীতপিপাসায় আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। তোমার নায়িকার আরও সংবাদের জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। ভরসা করি এ কয়দিনে তুমি তার নায়ক হইয়া উঠিতে পারিয়াছ। আহা, কবে তার সঙ্গে আমারও পরিচয় হইবে! ইতি—

সখী অমৃতা।

সুরসেন পত্র পড়িল। তাহার হৃদয়ের ধূমায়িত অগ্নি যেন আজ ঈর্ষ্যার বাতাসে সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে শতখণ্ডে চিঠিখানি ছিন্ন করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। পরক্ষণেই ভাবিল, "ছি! আমি কি নির্ব্বোধ! কি দুর্ব্বল চিত্ত! সে যদি দুদিনের সেই চেনা মানুষটির যাদুতে এতই আত্মহারা হইয়া থাকে, তার সঙ্গসুখের জন্য আমাদের এত কালের বন্ধুত্ব, এতকালের ভালবাসা, এমন করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে যে আমার নিকট একখানা পত্র লিখিতেও এত বিলম্ব হয়, ধিক্! তবে সে আমার কে! পুরাতন বন্ধু আমি, আমার সঙ্গে একদিন কাব্য আলোচনা করিল না, সঙ্গীত আলোচনা করিল না—আর দুদিনের এই পরিচিত—ধিক্!—আর কাজ নাই। আমি দূরেই থাকিব। সে আমার কে?"

সুরসেন অতি সংক্ষেপে এবার অমৃতার পত্রের উত্তর দিল। লিখিল, নানা কার্য্যে সে বড় অনবসর আছে। তার কল্পিতা নায়িকার কথা কিছু লিখিল না,—অমৃতার নব পরিচিত পুরুষটির কথাও কিছু জানিতে চাহিল না।

বৈশালী হইতে পাটলীপুত্র ৮।১০ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান হইবে। সুতরাং এরূপ পত্র বিনিময়ে অসুবিধা কিছুই হইল না।

(৩)

রাজধানী পাটলীপুত্রের বিবিধ প্রমোদের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়া সুরসেন অমৃতাকে ভুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়, সব বৃথা, সে যতই চেষ্টা করিয়া তাহার স্মৃতি হইতে অমৃতাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়, ততই যেন তাহার হাসিমাখা মুখখানি তাহার অন্তরে স্পষ্টতর ভাবে জাগিয়া উঠে! কিছুতেই সে শান্তি পাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে একটা আকুল আগ্রহ সুরসেনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; কিন্তু তখনই সে প্রাণপণে সেটাকে দমন করিয়া ফেলে।

প্রায় দিন পনর পরে অকস্মাৎ অমৃতার একখানা পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরসেন কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল।

"সখা, শৈশবের সখা আমার! আজ আমার জীবনে এ কি নূতন দিন উপস্থিত হইল! জীবনে তোমার কাছে কিছুই লুকাই নাই সখা,—অকপটে সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছি। তোমার কাছে আমার লজ্জা নাই—সঙ্কোচ নাই! তাই এত সহজে কথাটা লিখিতে পারিতেছি। সখা, মনে পড়ে সেই সান্ধ্য সাক্ষাতের কথা? মনে পড়ে তুমি কি বলিয়াছিলে? আমার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রের সন্ধান পাইলে তোমাকে জানাইব। তখন বলিয়াছিলাম, ইহা অসম্ভব। কিন্তু আজ সে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। আমার সন্ন্যাস আর হইল না। তাই আজ কম্পিত হৃদয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। সখা আমার! এখন আমাকে অঙ্গীকার মুক্ত কর! তোমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হউক। আমাকেও মুক্তি দাও সখা, আমাকে মুক্তি দাও! ইতি—

তোমার শৈশবসঙ্গিনী অমৃতা।

সুরসেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে সবলে দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিল। হায়! তাহার আশা কি একেবারেই গেল? উঃ—সে বৈশালী ছাড়িয়া আসিয়া কি ভুলই করিয়াছে! যদি সে বৈশালীতে থাকিত, তবে বুঝি এত সহজে অমৃতা তাহার বুকে এই শেলাঘাত করিতে পারিত না! এত সহজে কেহ তাহাকে কাড়িয়া লইতে পারিত না। কিন্তু এখনও কি আশা নাই? এখনও কি বৈশালীতে যাইয়া সে অমৃতার মন ফিরাইতে পারিবে না? সে যাইয়া অমৃতার হাত ধরিয়া বলিবে, "অমৃতা, আর আমি অভিনয় করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই তোকে ভালবাসি—প্রাণের সহিত ভালবাসি।" তবু কি সে শুনিবে না? এত বড় পাষাণী কি সে হইতে পারিবে? সুরসেন চিন্তা করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে সে বলিয়া উঠিল, "হাঁ—আমি যাইব! মনের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিব।" সুরসেন উন্মত্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৪)

মাতা সুরসেনের শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরসেন একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "না মা, অসুখ কিছুই নয়। পথশ্রান্তিতে বড় একটু ক্লান্ত হইয়াছি। তাই শরীরটা কিছু অসুস্থ। একটু ঘুমাইলেই সব সারিয়া যাইবে।"

অপরাহ্নে সুরসেন অমৃতাদের বাড়ীতে যাইবার সংকল্প করিয়া বেশভূষা করিল। একবার শেষ চেষ্টা—তারপর হৃদয়প্রতিমা বিস্মৃতির অতলজলে ইহকালের জন্য বিসর্জ্জন! সে দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সুরসেন কম্পিতহৃদয়ে চঞ্চলচরণে অমৃতাদের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, সৌধশীর্ষে প্রাচীরের উপর মাথা রাখিয়া অমৃতা যেন কি চিন্তা করিতেছে। আকুলকণ্ঠে সুরসেন ডাকিল, "অমৃতা!"

অমৃতা চমকিয়া উঠিল। সুরসেনের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাহার আনন হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া সুরসেনের হাত ধরিল। বলিল, "সখা, এসেছ?"

সুরসেন উত্তর করিল, "হাঁ এসেছি।" 'সখী' কথাটা উচ্চারণ করিতেও তাহার রসনা যেন আজ সরিল না।

সুরসেনের মুখের দিকে অমৃতা চাহিয়া কহিল, "এত রুগ্ন হইয়াছ কেন সখা?"

সুরসেনের স্বর কাঁপিয়া উঠিল,—সে বলিল, "বিশেষ ভাল ছিলাম না।"

অমৃতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন সখা? তোমার নায়িকা কি তোমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে?"

সুরসেন একটু শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ বড় নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানই পাইয়াছি অমৃতা! তবে তুমি যে সুখী হইলে, ইহাই এখন বড় সুখ। কিন্তু অমৃতা, ভাবিয়া বিস্মিত হই, এত সহজেই নূতন কে অপরিচিত লোক আসিয়া তোমাকে এমন করিয়া জয় করিয়া নিল!"

অমৃতা লজ্জায় নতমুখে ধীরে ধীরে কহিল, "কি করিব সখা? বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? তবে সে নিতান্ত নূতন বা অপরিচিত নয়!"

সুরসেন কহিল, "সে কি অমৃতা? যার কথা লিখিয়াছিলে———"

"সে যে কেউ নয় সখা!"

"কেউ নয়! তবে—তবে—কে অমৃতা।" সুরসেন বড় জোরে অমৃতার হাত চাপিয়া ধরিল।

অমৃতার আরক্ত মুখখানি আরও নত হইয়া পড়িল।

সুরসেন অসহনীয় আবেগভরে কম্পিত স্বরে কহিল, "কে সে অমৃতা? বল—বল! আমি যে আর সহিতে পারি না! বল—কে সে?"

অমৃতা একটু হাসিল,—ধীরকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "কেন সহিতে পার না সখা? তোমার সে নায়িকা——"

"মিথ্যা! সব মিথ্যা অমৃতা! সব অভিনয়! কিন্তু আর এ অভিনয় করিতে পারি না।"

"আমিও যে আর পারি না সখা। আমার এ বড় লজ্জা হইতে—আমাকে মুক্ত করিবে কি?"

"অমৃতা! অমৃতা!" এই বলিয়া সুরসেন অমৃতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস মুক্ত হইল।

"সখা! সখা!" বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে এই দুটি কথা মাত্র উচ্চারণ করিয়া—অমৃতাও তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি সুরসেনের বিশাল বক্ষের আশ্রয়ে রক্ষা করিল!

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

বর্ষায়।

মোর চলনলে ঝিঙা খেত গেলরে ভাসি,
গেল ফুলের হাসি,
গেল ফলের রাশি,
সব উলটি পালটি দিল বরষা আসি।

(২)

চাহি অকালে ভাঙানো মোর খেতের পানে,
বাজে বেদনা প্রাণে,
আঁখি বাধা না মানে
এই হিয়া দগ্‌দগি মোর কেহ কি জানে।

(৩)

আহা, কালো কস্‌কসে রুখু ঝিঙার খেতে
পড়ি শিশির প্রাতে
মিশি কিরণ সাথে
শোভিত মুকুতা যেন উষার হাতে।

(৪)

ফুটিত বিকালে ফুল হলুদ মাখি,
হেরি কুটীরে থাকি
মোর জুড়াত আঁখি
আমি ভাবিতাম কত কর কপোলে রাখি।

(৫)

সাঁজে নোয়ায়ে নরম পাতা পথটি করি
বায়ু বহিত মরি,
ফুল পরাগ হরি,
আমি ফিরিতাম গৃহে মোর ঝুড়িট ভরি।

(৬)

যবে—আঁধার নামিত ধীরে আমার খেতে,
পথ আগুলি রেতে
লতা বাহুটি পেতে
পায়ে বাড়ায়ে ধরিত যেন দিতনা যেতে।

(৭)

আজ কেবল রয়েছে জল কুটীর ঘিরে,—
দেখি দাঁড়ায়ে তীরে
ভাসি নয়ন নীরে—
আমি বুকেতে চাপিয়া ব্যাথা আসিগো ফিরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আলোকে ও আঁধারে।

সামাজিক নাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—গড়ের মাঠ।

বিনোদ পায়চারী করিতেছে। মনুর প্রবেশ।

মনু। এই যে বিনোদ! দুদিন তোমাকে খুঁজ্‌ছি। ভাগ্যি আজ এখানে দেখা হল।

বিনো। আমাকে খুঁজছ? কেন?

মনু। বিশেষ কথার দরকার আছে।

বিনো। কথা আছে! আমার সঙ্গে তোমার কি এমন কথা থাক্‌তে পারে? তা কথা কিছু থাকে—বাড়ীতে গেলেই ত ভাল হয়। এখন———

মনু। বাড়ীতে ত দুদিন গিয়ে পাইনি।

বিনো। বাইরে ঢের কাজ থাকে,—তা সময়-মত গেলেই পেতে পার।

মনু। সকালে বিকেলে রেতে—সর্ব্বদাই ত গিয়েছি। কিন্তু দেখা পাইনি।

বিনো। তা—আগে একটা চিঠি লিখে বন্দোবস্ত ক'রে গেলে ত মিছে এত ঘুর্‌তে হ'ত না, নিষ্কর্ম্মা লোকের মত আমার ত রাত দিন বাড়ীতে থাকা চলে না।

মনু। হুঁ!—তা, অতটা ভাবিনি। যাক্‌,—দেখা যদি পেলুম, কথা যা আছে এইখানেই ব'ল্‌তে পারি।

বিনো। এখানে—বেশী কোনও কথার সুবিধা হবে না। আমার কজন বন্ধুর আসবার কথা আছে। তাদের সঙ্গে কোথাও যেতে হবে। বরং কাল—না তাও সুবিধে হবে না।—পরশু—বিকেল সাড়ে চারটায় বাড়ীতে আমি খালি থাক্‌ব। আসি তবে। good evening।

মনু। বিনোদ শোন—শোন! যেও না। আমার কথা বোধ হয় বেশী হবে না, পরশু—কে জানে হয়ত দেখাই পাব না।

(অগ্রসর হইয়া বিনোদের হস্ত ধারণ।)

বিনো। মনু! তুমি আত্মবিস্মৃত হ'চ্চ, বড় বেশী স্বাধীনতা নিচ্চ! ছিঃ! হাত ছেড়ে দেও। তোমার এতটা অযাচিত ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হ'চ্চে না।

মনু। বিনোদ! তুমি আজ এই কথা আমাকে ব'ল্‌ছ? আমরা যে বহুদিনের বন্ধু বিনোদ!—কদিন আগেও যে তুমি আদরে আমার সঙ্গ খুঁজতে।

বিনো। পরিচয় ছিল,—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে জানি না। যাক্‌, মিছে অপ্রীতিকর ব্যবহার কিছু ক'ত্তে চাই না,—কিন্তু তুমি ক'ত্তে বাধ্য ক'চ্চ। হাত ছেড়ে দেও। ব'ল্‌ছি, আমি কজন বন্ধুর প্রতীক্ষা এখানে ক'চ্চি।

মনু। বন্ধুরা আসুন,—তাঁদের সাম্‌নে আমাকে নিয়ে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। ততক্ষণ আমার যা ব'ল্‌বার আছে ব'লে নেব। মিছে টানাটানি ক'রে

এখানে একটা কেলেঙ্কারী ক'রো না। আমি না ছাড়্‌লে তুমি হাত ছাড়িয়ে নেবে, এত বল তোমার দেহে নাই।

বিনো। তুমি কি তবে বলে আমাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাও? জান, পুলিশ ডাক্‌লে তোমাকে———

মনু। বিনোদ! অতটা পাগলামো ক'রো না, তাতে কেলেঙ্কারী তোমারও কম হবে না।

বিনো। কি ব'ল্‌তে চাও তুমি? সংক্ষেপে যদি ব'ল্‌তে পার, শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।

মনু। আজ যে মূর্ত্তি তোমার দেখ্‌ছি বিনোদ, যা আমি ব'ল্‌তে চেয়েছিলুম, তা বলা একরকম মিছে।

বিনো। কেন তবে আমার সময় মিছে নষ্ট ক'চ্চ? জেনো, আমি ভবঘুরে নই, আমার সময়ের মূল্য আছে।

মনু। আজ হঠাৎ তোমার সময়ের এতই মূল্য হ'য়ে উঠেছে বিনোদ? আর যদি হ'য়েই থাকে,—তা এই ভবঘুরে থেকেই হ'য়েছে! নইলে হ'ত না।

বিনো। বটে! তুমি এত বড় একজন মুরুব্বি আমার, তা ত এতদিন জানতুম না।

মনু। যদি জান্‌তেই না,—তবে আজ জান,—এই ভবঘুরে দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে টাকা এনে দিয়েছিল,—তাই আজ বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী ভেক ধ'রে দেশে এসে দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছ। কিন্তু ভিখ মিল্‌তে এখনও ঢের দেরী আছে। সময়টা তাই এখনও তেমন মূল্যবান্ হয়নি।

বিনো। হাঃ হাঃ হাঃ! মনু! সত্যি এবার হাসালে! কাণ্ডজ্ঞান তোমার বরাবরই কম। কিন্তু একেবারে যে কিছু নেই,—তা জান্‌তুম না। যাও—ছেড়ে দেও! আস্ত পাগলের সঙ্গে এখানে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াবার তেমন ইচ্ছা আমার নাই।

মনু। তা যে নাই,—তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি বিনোদ! আজ ত আর পাগল মনুকে দিয়া কোনও কাজ হাসিল ক'রবার গরজ তোমাদের নেই! মস্ত জমিদারীর মালিক হ'তে যাচ্ছ?

বিনো। সাবধান্ মনু! ও সব কোনও কথা তুলোনা ব'ল্‌ছি! আমার ঘরের কথায় তোমার কথা ব'লবার কি অধিকার আছে?

মনু। কিছু নেই। দুদিন আগে খুবই ছিল,—কিন্তু আজ কিছু নেই।

বিনো। বস্! তবে এখন বিদায় হও! ব'ল্‌ছি, তোমার সঙ্গে এখানে এ সাক্ষাৎ আমার মোটেই প্রীতিকর হ'চ্ছে না।

মনু। বিনোদ! তোমার সঙ্গে আজ যে এমন সাক্ষাৎ হবে, দুদিন আগে তা স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। যা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, তা আর ব'ল্‌ব না। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি এখন, মিস্ ভ্যাটাভেলকে যে তুমি ত্যাগ ক'রেছ, এটা তাঁর বড় সৌভাগ্যের কথাই ব'ল্‌তে হবে।

বিনো। মিস্ ভ্যাটাভেল্‌কে আমি গ্রহণ কখনও করিনি, সুতরাং ত্যাগ ক'রেছি, এ কথা কেউ ব'ল্‌তে পারে না।

মনু। না, গ্রহণও করনি, ত্যাগও করনি। তবে সরলা নারীকে প্রেমের ছলনায় ভুলিয়েছিলে, অর্থলোভে আজ তাঁকে ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র বিবাহ ক'ত্তে প্রস্তুত হয়েছ! হয়েছ, বেশ ক'রেছ! তোমার নীচতায় আজ প্রাণে যতই দাগা তিনি পান, তোমার মত পাষণ্ডের হাতে যে একেবারে তাঁকে পড়্‌তে হয়নি, তাই এখন তিনি বড় সৌভাগ্য ব'লেই মনে ক'র্‌বেন। এত বড় একটা দুর্ভাগ্য হতে যে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন,—ব্যথা যতই পান, তাই এখন তাঁর বড় সান্ত্বনা হবে।

বিনো। বস্! তবে আর কি? তাঁর ভাল বই মন্দ ত কিছু করিনি। মিছে দিক্ করো না,—এখন যাও! আর যদি পার—আসন খালি হ'য়েছে, যাও দখল কর গে। তাঁর আরও বেশী সান্ত্বনার কারণ তাতে হবে!

মনু। পশু! নীচ! নরকের কীট! সরলা নারীকে এমন প্রবঞ্চনা ক'রে, আবার এত বড় অবমাননা তাঁর ক'চ্চ! এই নেও তবে—এর উত্তর এই!

(পায়ের জুতা খুলিয়া বিনোদের মুখে প্রহার।)

বিনো। মনু! এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার! পুলিশম্যান! পুলিশম্যান! সারজেণ্ট!

মনু। চুপ—পাজি! ঘুষি দিয়ে তোমার দাঁত ভেঙ্গে দেব! নাক থেঁতলে দেব! নাথি দিয়ে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে ফেলব! ছমাসের মধ্যে উঠ্‌তে পারবে না,—জমিদারী বিয়ে ঘুরে যাবে! না হয়, দু'বছর জেল খাটব, মনু তাতে ডরায় না!

বিনো। বটে! আচ্ছা দেখা যাবে! এখন কিছু ব'লব না। যখন মানহানির নালিশ হবে,—তখন মজা টের পাবে। সাক্ষী—(এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত!)

মনু। সাক্ষী নেই,—দরকারও তার কিছু নেই! নালিশ ক'রবে? করগে, মনু মিছে কথা বলে না,—খোলা জবাব দেবে। মান তাতে তোমার বাড়্‌বে না। আজ এই নমুনো হ'ল। জগদীশবাবু যদি সত্যিই তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন, বিয়ের আসরে পুরোপুরি পাবে! তার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে যেও!

[প্রস্থান।

বিনো। দূরহ! হতভাগা! পাজি! ছোট লোক! যদি তোকে পদে সমান ব'লে মনে ক'ত্তুম,—আইনের বাধা সত্বেও ডুয়েল নড়্‌তুম,—মাথারখুলি এক গুলিতে উড়িয়ে দিতুম! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—চামেলীর গৃহ।

রোরুদ্যমানা চামেলী ও রমা।

রমা। চামেলী! চামেলী! বোন্!

চামে। রমা! রমা! কিছু বলিস্‌নি ভাই। আমায় আর লজ্জা দিস্‌নি, আর দুঃখ দিস্‌নি! যদি ভালবাসিস, তোর ভালবাসার বুকে আমার ভাঙ্গা বুক চেপে রাখ্! উঃ! তাতে কি এ ব্যথা একটু জুড়োবে রমা?

রমা। আয়—আয় বোন্—আমার বুকে আয়! লজ্জা কি চামেলী! আমার কাছে তোর লজ্জা কি? আর এতে লজ্জা কি? দুঃখেরই বা এমন কি? যা হ'য়েছিল, তা ত খেলা! খেলার মতই সে খেলা ভেঙ্গে গেছে। যাক্, ক্ষতি কি? খেলাও হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে দুঃখ একটু হয়। হ'ক্,—আজ হ'চ্চে, কাল আর হবে না! ছি! এ নিয়ে এত কান্না—এত চোকের জল কি তোর হাসির মুখে মানায় চামেলী?

চামে। রমা! বড় ভুল বুঝেছিস্ তুই! প্রাণ আমার খোলা ছবিটির মতই তোর সাম্‌নে খোলা ছিল,—কিন্তু তবু ঠিক চোকে বুঝি তুই তা সব দেখিস্ নি। রমা! খেলা নয়, খেলা নয়! উঃ! যদি সত্যি খেলাই হত! রমা! খেলা নয়—আমার তা খেলা ছিল না। সে খেলা ক'রেছিল, কিন্তু আমার কিছু খেলা ছিল না! রমা! সত্যি সত্যি তাকে ভালবেসেছিলুম,—কত বড়—কত গভীর—কত সত্যি যে সে ভালবাসা—কেমন একেবারেই যে নারীর প্রাণ আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয় ব'লে, আরাধ্য ব'লে, তাকেই

জড়িয়ে ধ'রেছিল—তা আমিও এতদিন তেমন ক'রে বুঝ্‌তে পারি নি। কিন্তু বড় ব্যথা পেয়ে আজ তা বুঝ্‌তে পাচ্চি। রমা! রমা! এ কি হ'ল আমার? কি ক'রে এ ব্যথা সইব?

রমা। চামেলী! চামেলী! সত্যি কি? অভাগী! যা ব'ল্‌ছিস্‌ তা কি সত্যি! না—না! তুই ভুল বুঝেছিস্‌! জীবনে কোনও দুঃখ, কোন অভাবের ক্লেশ তোকে পেতে হয় নি। যা যখন চেয়েছিস্‌, অম্‌নি পেয়েছিস্‌! একটানা অখণ্ড এক আনন্দের আলোকে হেসেখেলে বেড়িয়েছিস্‌—কখনও কোনও আঁধারের ছায়া তাতে পড়েনি। খেলার মত হ'লেও, আজ প্রথম একটা আশাভঙ্গের আঘাত তোর জীবনে এসে প'ড়েছে। প্রথম আজ তোর এমন হ'ল, যে যা চাস্‌ ভেবেছিলি, তাই হাতে হাতে আস্‌তে আস্‌তে স'রে গেল। যারা দুঃখ কখনও জানে না, এতটুকু দুঃখও তারা সইতে পারে না,—সামান্য খেলার জিনিশ হাতছাড়া হ'লেও বড় অধীর হ'য়ে ওঠে। দেখ্‌—ভাল ক'রে মনের দিকে চেয়ে দেখ্‌—তোরও তাই হ'য়েছে। তেমন গভীর একটা দাগ—না না—কখনও সে তোর প্রাণে ফেল্‌তে পারে নি। সে কে যে তোর প্রাণে এতখানি অধিকার সে স্থাপন ক'ত্তে পার্‌বে? কে তুই—কি তুই—আর কি সে?

চামে। না—না রমা! ভুল বুঝি নি। সে যেই হ'ক্‌, যাইহ'ক্‌—অভাগীর প্রাণ সবটুকুই অধিকার ক'রেছে। আমার সাধ্য নাই, সে অধিকার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি। তুই যা ব'লছিস্‌ রমা, আমিও তা ভেবেছি। কাল থেকে অনেকবার প্রাণের দিকে চেয়ে দেখেছি, কিন্তু মিছে দেখা—মিছে চাওয়া—মিছে আশা! প্রাণের সব ঠাঁই জুড়ে বড়শক্ত হ'য়ে—প্রাণের তলের তল পর্য্যন্ত বড় গভীর হ'য়ে,—সেই রয়েছে! আমার প্রাণ ভেঙ্গে যাচ্চে রমা, কিন্তু সে নড়্‌ছে না—বুঝি নড়্‌বেও না। রমা, দাগ বড় গভীর হ'য়েই প'ড়েছে,—ব্যথা মর্ম্মের মর্ম্ম পর্য্যন্ত গিয়ে বিঁধ্‌ছে। সইতে পাচ্চি না, কেঁদে আকুল হচ্চি! মনে কখনও কোনও বল সঞ্চয় করিনি,—তাই বুঝি সইতে পাচ্চি নি। আহা, ছেলেবেলা থেকে যদি দুঃখ কষ্ট পেয়ে বড় হতুম, স'য়ে স'য়ে এত বড় দুঃখও সইবার মত বল মনে আস্‌ত! রমা! এতদিন ভাব্‌তুম, আমি কত সুখী! কিন্তু আজ মনে হ'চ্চে—বড় দুর্ভাগ্যই ছিল আমার, তাই দুঃখের শিক্ষা কিছু পাইনি। আহা, তাহ'লে বুঝি এ ব্যথা আজ এমন বেশী ক'রে লাগ্‌ত না!

রমা। চামেলী! তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌? শ্রদ্ধা যদি না থাকে, তবে কোনও নারী কি পুরুষের প্রতি এমন ভালবাসা তার নারীর বুকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে? সে যা ক'রেছে, যে নীচ প্রকৃতি তার ব্যবহারে সে দেখিয়েছে, তাতে কি কোনও নারীর প্রাণের শ্রদ্ধা আর তার উপরে থাকৃতে পারে? হয়ত ভালবেসেছিলি—যখন ভাল ব'লে তাকে জান্‌তি। কিন্তু আজ! আজ কি ঘৃণায় তার পান থেকে তোর মন ফিরে আস্‌ছে না? এই ঘৃণার মুখে কি ভালবাসা কখনও দাঁড়াতে পারে? ভাল কি একটু লাগ্‌ছে, যে ভাল তাকে এখনও বাস্‌তে পাচ্ছিস্‌? তুই কাঁদ্‌ছিস্‌—কেন কাঁদ্‌ছিস্‌? কিসের দুঃখ? সে যে তোর জীবন থেকে সময় থাকৃতে স'রে গেছে—তার জীবনের দুর্গন্ধ পাঁকে তোকে যে একেবারে নিয়ে সে ডোবায়নি,—এইটে বরং আজ পরম সৌভাগ্য ব'লেই তোর মনে করা উচিত। আজ ফের যদি সে এসে তোকে সত্যি বিবাহ ক'ত্তে চায়,—আর কি তার হাতে তুই আপনাকে স'পে দিতে পারিস্‌?

চামে। না, তা পারিনে রমা,—আর তা পারিনে! সে যে আমার জীবন থেকে স'রে গেছে, এক হিসেবে, তা ভালই হ'য়েছে! রমা! সব বুঝি,—সব ভেবেছি। শ্রদ্ধা নাই,—কিন্তু তবু ঘৃণায় কি বিরাগে তার কথা এখনও ভাব্‌তে পাচ্চি নি। শ্রদ্ধা নাই—কিন্তু মমতা ভুল্‌তে পাচ্চি নি। বড় ভাল—বড় আপন ব'লে যে তার মূর্ত্তি প্রাণে ধ'রেছিলুম। বাইরে আজ সে যাই হ'ক্‌—যাই করুক্‌, প্রাণে যে সে যেমন ছিল, তেমনই আছে। আমার প্রাণে যে প্রাণ ভ'রে রয়েছে,—রমা, সেই যে আমার সে! বাইরের এ যেন আর কেউ, সে নয়! রমা! তুই ভাল বাসিস্‌নি, মনে মনে কাউকে বাস্‌লেও আমার মত বুঝি বাসিস্‌নি,—তাই বুঝতে পাচ্চিসনি, ভাল ব'লে ভালবেসে যাকে প্রাণে ধরেছি,—প্রাণে সে চিরদিনই ভাল, ভাল না হ'লেও ভাল! রমা! সে ভাল আজ আমার কোথায় গেল? যে ভালকে জড়িয়ে ধ'রে, সুখে এ জীবন কাটাব ভেবেছিলুম, সেই ভালর মিছে একটা ছবিই সুধু প্রাণে রইল, সত্যিকার জীবন থেকে সে যে একেবারে চ'লে গেল! জীবনটা যে আমার একেবারে খালি হ'য়ে গেল! অন্তরে যে দেবতা রইল, বাইরে সে যে একেবারেই দানব হ'ল! রমা! অন্তরের সঙ্গে বাইরের এত বড় একটা বিচ্ছেদ—এ যে বড় ব্যথা—বড় যাতনা! কি ক'রে তা সইব রমা! অনেক চেষ্টা ক'রেছি রমা,—বাইরে সে আজ যা অন্তরে তাকে সেই ভাবেই ধ'রে নিতে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু পারি নি! অন্তরে

থেকে সে মূর্ত্তি তুলে ফেল্‌তে পারিনি, অন্তরে সে মূর্ত্তির পায় প্রাণের শ্রদ্ধা এখনও যে লুটিয়ে প'ড়্‌ছে! বাইরেও মমতার টান ছিঁড়ে ফেল্‌তে পাচ্চি নি। পাচ্চিনি—অপাত্র জেনেও মমতা যে ভুল্‌তে পাচ্চিনি—প্রাণের সে শ্রদ্ধা বিরাগে যে ডুবিয়ে দিতে পাচ্চিনি,—দানব জেনেও দেবতার মতই যে প্রাণ তাকে প্রাণে ধ'রে রাখ্‌তে চাচ্চে—রমা, সেই যে আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ রমা! এত যে কাঁদ্‌ছি, সেই দুঃখেই কাঁদ্‌ছি। রমা! এ দারুণ ব্যথা কি ক'রে সইব? কোনও বল যে প্রাণে নাই, কি ধ'রে আজ উঠে দাঁড়াব? নারীর মান আমার কোন্ শক্তির আশ্রয়ে রক্ষা ক'রব?

রমা। চামেলী! আহা, সত্যি তুই তবে আজ বড় অভাগী! নারীজীবনের বড় সম্বল—বড় আশ্রয়—তুই আজ হারিয়েছিস্! সুধু তাই নয়, তোর নারীত্বের মর্য্যাদায়ও বড় অবমাননার আঘাত লেগেছে! কিন্তু যাই হ'ক্,এমন অবসন্ন হ'য়ে—এমন ভেঙ্গে—তুই প'ড়ে থাক্‌তে পারবিনি! ছি! সে যে অবমাননার উপরে আরও অবমাননা হবে। তোকে উঠ্‌তে হবে,—যে মর্য্যাদা তোর আহত হ'য়েছে, সকল ক্ষোভমুক্ত সেই মর্য্যাদার গৌরবেই তোকে আবার মুখ তুলে দাঁড়াতে হবে! সম্বল যা হারিয়েছিস,যতই প্রিয় তা হ'ক,তার চেয়েও বড় সম্বল—শ্রেয় সম্বল—তোর প্রাণের মধ্যেই আছে,—তার দিকে চা, তার আশ্রয় নে! সব অবসাদে বল পাবি, দুঃখে বড় সান্ত্বনা পাবি,—দেখাতে পার্‌বি নারীর প্রাণ কারও খেলার জিনিশ নয়, খেলার জিনিশের মত পথের ধুলোয় ফেলে দিলেও ধুলোয় তা লুটিয়ে পড়ে থাকে না,—আপন মহিমার উন্নত শিখরে সকল অবজ্ঞা তুচ্ছ ক'রে সে উঠে দাঁড়াতে পারে!

চামে। কোথায় সে বল? কোথায় সে শক্তি? প্রাণের মধ্যে? কই, দেখ্‌তে ত পাচ্চি নি? শক্তির যে ক্ষীণ কণাও এ অসার প্রাণে নাই!

রমা। আছে—আছে! নারীর প্রাণ নিয়ে যদি সত্যি এ পৃথিবীতে এসে থাকিস্—প্রাণে সে শক্তি অবশ্য আছে। চামেলী, আমাদের এই দেশে একটি কথা আছে, মহাশক্তির অংশে নারীর জন্ম। অংশে অংশে নারীর প্রাণে প্রাণে তিনি বিরাজ করেন। নারীর প্রাণের দেবতা তিনি, নারীধর্ম্মের আশ্রয় তিনি, নারীর মহিমা তাঁর মহিমাতেই এত উন্নত, এত উজ্জ্বল। প্রাণের দেবতা হ'য়ে প্রাণের অন্তরে তিনি আছেন, তাই নারী এ সংসারে চির কল্যাণময়ী দেবী,—প্রেমে, স্নেহে, ত্যাগে, সেবায়, ধৈর্য্যে তাই নারীর তুলনা কোনও পুরুষে মেলে না,নারীতেই গৃহধর্ম্ম—গৃহের শ্রী—আশ্রিত হ'য়ে আছে। দুঃখ তার যতই আসুক,

নিষ্ঠুর কেউ যত কঠোর আঘাতই তার প্রাণে করুক, নারীর এই শক্তি—নারীর প্রাণের এই দেবতা—যদি তার প্রাণে জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন, সকল দুঃখে সকল পীড়নে আপন ধর্ম্মে সে আপনাকে ধারণ ক'রে রাখতে পারে,—ব্যথা তার সেই জাগ্রত শক্তির সম্মুখে ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়, আঘাত আহত হ'য়ে স্তব্ধ হয়!

চামে। নারীর শক্তি! নারীর প্রাণের দেবতা! রমা কি সে, কে সে? আমার প্রাণে কি তা আছে? আমি যে কিছু না,—চিত্ত যে আমার শুধুই একটা অসার খেলার ঘরের মত। কোনও দেবতা কি তার মধ্যে কখনও থাকৃতে পারেন? দেবতার স্থান মন্দিরে, খেলার ঘরে ত নয় রমা?

রমা। খেলার ঘর ছিল, ভেঙ্গে গেছে,—দেবতা তার তলে লুকিয়ে ছিলেন, আজ সেখানে তিনি জাগ্রত হয়ে উঠ্বেন,—তাঁর মহিমায় তাঁর মন্দির আপনি সেথায় গ'ড়ে উঠ্বে। চামেলী, এরা যতই অবজ্ঞা করুক, নারীর জন্ম যে মহা-শক্তির অংশে, তিনিই যে অংশে অংশে নারীর প্রাণে বিরাজ করেন, এই মহাবাণী এদেশেরই। এদেশেই নারীর শিক্ষা দীক্ষা সব তাই, যাতে এই শক্তিই তার প্রাণে জাগ্রত হ'য়ে থাকে। এই শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবেই ত্যাগে, সেবায়, গৃহের নিত্য কল্যাণব্রতে, ধর্ম্মের তেজোময় মহিমায়, এদেশের নারীজীবনে মহাশক্তির শ্রেষ্ঠ লীলা যত প্রকাশ পেয়েছে, এত বুঝি আর কোনও দেশের নারীজীবনে পায় নাই। এখনও এই শক্তি—এই দেবতা—এ দেশের নারীর প্রাণ ছেড়ে যান নি,—যেতে পারেন না। অবহেলায় কোথাও অন্তর্হিত হ'য়ে থাকৃতে পারেন, কিন্তু আছেন,—ডাক্‌লেই তিনি প্রাণ ভ'রে জেগে উঠ্বেন। চামেলী, বাইরে তুই যতই হেলায় খেলায় চলে থাকিস্,—প্রাণ তোর এ দেশেরই নারীর প্রাণ। সুপ্ত হ'য়ে থাক্‌লেও দেবতা তোর প্রাণেই আছেন। ডাক্—আকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্—তিনি জেগে উঠ্বেন,—দুঃখে তোর বল হবেন, অমঙ্গলে মঙ্গলের আশ্রয় হবেন। চামেলী! আমি আসি এখন,—একা তুই আপন মনে ব'সে তাঁকে ডাক্—প্রাণ ভ'রে তাঁকে ডাক্—ডেকে ডেকে তাঁকে জাগিয়ে তোল্। আবার যখন আসব, যেন দেখতে পাই, জেগে তিনি তোর প্রাণ ভ'রে বিরাজ ক'চ্চেন, তাঁর মহিমায় তোর আঁধার মুখ আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে,—তাঁর শান্ত হাসিতে তোর কাঁদা মুখখানি আবার হাস্‌ছে!— [প্রস্থান।

চামে। কে তুমি মা মহাশক্তি? নারীর প্রাণের দেবতা! কে মা তুমি? সত্যি কি তুমি এ অভাগীর ভাঙ্গা প্রাণে আছ? কই মা, কখনও ত তোমায় প্রাণের মাঝে দেখিনি,—তোমার সাড়া কখনও ত প্রাণে পাইনি! কেউ ত

কখনও তোমার কথা আমার কিছু বলেনি। নারীর প্রাণে তুমি যে কত বড় বল, দুঃখে কত বড় সান্ত্বনার স্থল, বিপদে কত বড় আশ্রয়, কেউ ত কখনও তা আমায় শেখায় নি! শিক্ষার গৌরব ক'রেছি, কিন্তু জীবনের জীবন—প্রাণের প্রাণ—দেবতা যে কেউ তুমি প্রাণের মাঝে র'য়েছ, এ কথা ত কোথাও কখনও শিখি নি! কে মা তুমি? সত্যি কি মা কেউ তুমি আছ? আমার প্রাণেই আছ? প্রাণ যে আমার ভেঙ্গে গেছে—একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে প'ড়েছে—সেই ভাঙ্গার মাঝেও কি তুমি আছ? যদি থাক মা,—মা—মা! যদি থাক মা—ওঠ! জেগে ওঠ! প্রাণে যে খেলার ঘর এরা তুলে দিয়েছিল, ভেঙ্গে তা চুরমার হ'য়ে গেছে,—সব খালি—সুধু আঁধার—আর সুধুই ব্যাথা—আর সব খালি। তার মাঝেও যদি থাক মা—জেগে ওঠ! সেই ভাঙ্গার উপরে তোমার মন্দির গ'ড়ে তুমি সে মন্দির ভ'রে তোমার মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ। মা—মা—বড় আঘাত আজ পেয়েছি—বড় ব্যাথা আজ প্রাণে বাজ্‌ছে। প্রাণের দেবতা যদি তুমি—এ আঘাত কি তোমায় লাগে নি মা? এ ব্যাথা কি তোমার প্রাণে বাজ্‌ছে না মা? নারীর এ অবমাননায়—নারীর দেবতা তুমি—তোমার বুকে কি আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ছে না মা? প্রাণে যদি থাক মা—এই আঘাতে, এই ব্যাথায়, এই আগুনেও কি জেগে উঠ্‌বে না? জাগ—জাগ মা! মহাশক্তি! নারীর শক্তি! নারীর প্রাণের দেবতা! প্রাণ ভ'রে জেগে ওঠ মা!—দুঃখে শান্তি দেও মা—অবলাকে বল দেও মা—ব্যথিতা অবমানিতা অভাগী এ নারীকে তোমার আশ্রয়ে রক্ষা কর মা! প্রাণে তার জাগ্রত শক্তি হ'য়ে বিরাজ কর মা, তোমার প্রসাদে এখনও এ নারী জীবন তার সফল হ'ক্ মা!

(গান।)

আছ কে মা নারীর প্রাণের দেবতা এ প্রাণের মাঝে,—
জাগো ওমা মহাশক্তি—নারীতে যার শক্তি রাজে!
ধরম তুমি নারীর প্রাণে,
তোমারি মান নারীর মানে—
আছ কি মা—আঘাতে আজ জেগে ওঠ আপন তেজে!
খেলার মিছে ঘর ভেঙ্গেছে,
খেলার আলো সব নিভেছে,—
ব্যথায় ভরা আঁধার খালি ভাঙ্গা প্রাণটি ভ'রে আছে!

দীপ্ত আভায় দেবতাগো !—
আঁধারে আজ জাগো জাগো !
ভাঙ্গা প্রাণে—জাগাশক্তির ভরামন্দির উঠুক সেজে !
তোমাতেই প্রাণ পূর্ণ ক'রে—
রও মা জেগে জীবন ভ'রে,—
জনম যদি তোমাতে মা—সফল কর তোমার কাজে !

চতুর্থ অঙ্ক সম্পূর্ণ।

কি দেখিনু।

নন্দনে হেন সুন্দর ফুল মন্দ সমীরে দুলে কি ?
খঞ্জন চোখে অঞ্জন আঁকা রঞ্জন হেন হেরিনি।
কেন আজ তার তরীতে
উঠিনু সবাই ত্বরিতে ?
পারের লাগিয়া লয়না চাহিয়া সে যে গো কিছুই সহজে,
জীবন যৌবন যাহা আছে ধন সাধ হয় তবু দিতে যে !
মুগ্ধ চপল চাহনি তাহার দুগ্ধ ধবল হাসি
সুপ্ত হৃদয় সাগরে ছড়ায় স্নিগ্ধ অমিয়া রাশি।
তার সে মোহন বাঁশী
দেয় যেন প্রাণে ফাঁসি ;
(কোন্) দূর দেশে বসি দোঁহে হাসি হাসি খেলেছিনু মোরা মজিয়া
মুখ দেখে যেন মনে পড়ে হেন চোখে চোখ আসে ছুটিয়া !
(আজি) গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি কুঞ্জ কুসুমে বলে,
সরমের গাঁথা প্রকাশি মলয় মৃদু মৃদু হের চলে !
যমুনাও প্রতি ঘাটে
কলঙ্ক আমার রটে !
পিক্ কুহুতানে গুরুজন স্থানে করিছে কতই লাঞ্ছনা,
এই ব্রজমাঝে রমণী সমাজে পেতেছি কত না গঞ্জনা !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংসার ও সন্ন্যাস।

(বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ রীড্ প্রণীত 'ক্লইষ্টার এণ্ড দি হার্থ' নামক ইংরেজি উপন্যাস হইতে অনূদিত।)

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথাবার্ত্তা সুস্থির হইয়া গেল। বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ান প্রথা অনুসারে সে কালেও হল্যাণ্ড দেশে কোনও বিবাহ সম্বন্ধের ঘোষণা প্রকাশ্য ধর্ম্মমন্দিরে তিনবার প্রচার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু নবীন প্রেমিকযুগলের অনুরোধে সেভেনবার্গের নবাগত ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় দুইদিনের মধ্যেই তিনবার ঘোষণা পাঠ সমাধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রথমবার সোমবার প্রভাতে উপাসনার সময়, দ্বিতীয়বার ঐ দিন সান্ধ্য উপাসনার সময় ঘোষণা পাঠ করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে মন্দিরটি টরগো সহর হইতে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল, এবং ঐ দুই উপাসনার সময়েই টরগোর কোনও উপাসক সেখানে উপস্থিত ছিল না। কাজেই কোন প্রকার বাধাও উপস্থিত হইল না,—এ সংবাদও টরগো সহরে রাষ্ট্র হইল না। পরদিন প্রভাতে গেরাড ও মার্গারেট নিতান্ত কম্পিত হৃদয়ে মন্দিরের একপার্শ্বে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আজ নির্ব্বিঘ্নে ঘোষণা হইলেই তাহাদের মিলনের আর কোন অন্তরায় থাকে না। ধর্ম্মাচার্য্য শেষবার ঘোষণাপাঠ করিলেন—কিন্তু এ কি? একজন অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল—এ বিবাহ হইতে পারে না, পাত্র ও পাত্রী উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাহাদিগের পিতামাতার এ বিবাহে সম্মতি নাই। সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ হইবে।

গেরাড ও মার্গারেট অবসন্ন দেহে কোন প্রকারে মন্দির বাহিরে আসিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। অবশেষে তাহারা যখন হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সেই আপত্তিকারী আগন্তুক তাহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নিতান্ত বিনয় সহকারে জানাইল, তাহাদিগের এই পবিত্র মিলনে বাধা দেওয়া বাস্তবিকই তাহার আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। তবে বিবাহের ঘোষণায় আপত্তি দেওয়াই তাহার একমাত্র পেশা—কিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইলে এখনই সে তাহার আপত্তি প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। গেরাড ও মার্গারেট

যেন অকস্মাৎ হাতে স্বর্গ পাইল! গেরাড তৎক্ষণাৎ একটি মোহর বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। বেচারী বিবাহ-কণ্টক তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মাচার্য্যকে জানাইল—যে সে লোক চিনিতে না পারিয়া ভুল করিয়াছিল—তাহার আপত্তি ভিত্তিহীন। অতএব শেষবারের ঘোষণা পাঠও এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল। পরদিন বেলা দশঘটিকার সময় ঐ মন্দিরে প্রেমিকযুগলের বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে, ধর্ম্মাচার্য্য এইরূপ স্থির করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

বেচারী বিবাহ-কণ্টকের একটি বড় দুর্ব্বলতা ছিল—পেশাদার ভিখারীদের অনেকেরই ওরূপ থাকে—সে হাতে কিছু পাইলেই সুরাদেবীর অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারিত না। আজিকার মত একটি আস্ত মোহর পুরস্কার তাহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। কাজেই অচিরে সে টরগো সহরের একটি ভাল রকম সুরাপানের আড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিতে আরম্ভ করিল। সুরাদেবীর অমোঘ কৃপায় ভক্তের কণ্ঠে দেবী সরস্বতী আসিয়া অধিষ্ঠান হইলেন, তখন সে নানা রূপক সহকারে প্রভাতের ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিল। গেরাডের দ্বিতীয় ভ্রাতা সিবরণ প্রায় সময়ই এই আড্ডায় কাটাইত। সেদিনও সে উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়াই সে ব্যাপার অনুমান করিয়া লইল এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে বাড়ীতে আসিল। আসিয়া যখন শুনিল, পিতা বাড়ীতে নাই, জিনিশপত্রাদি খরিদ করিতে রটারডাম গিয়াছেন,—তখন সে ভাবিল, এ সংবাদ মাতাকে জানাইলে কোনও লাভ হইবে না। কাজেই জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্নোলিসকে ইসারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া সমস্ত জানাইল।

প্রায় পরিবারেই দুই একটি দুর্বৃত্ত থাকে। বণিক পরিবারে ছিল এই দুইটি নির্ম্মম পাষণ্ড। একে অলসতায় দিন কাটাইলেই ক্রমে চরিত্রের অবনতি হয়, তারপর আবার যাহাদিগকে ভালবাসাই কর্ত্তব্য, সৌভাগ্যের অপেক্ষায় যদি তাহাদিগের মৃত্যুর দিন গণিয়া সময় কাটাইতে হয়, তবে চরিত্রের চরম অবনতিই ঘটিয়া থাকে। এই দুইটি নীচাশয় কুকুর পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে সামান্য যে কিছু বিষয় পাইবে, সেই লালসাই অহোরাত্র পোষণ করিত, এবং এই প্রাপ্তির পক্ষে কোনও বাধা দূর করিতে, প্রয়োজন হইলে ভ্রাতার বক্ষে ছুরী বসাইতেও বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিত না। পিতামাতার অর্থলালসা ছিল, সেটি তাঁহাদিগের পক্ষে একরূপ সদ্‌গুণ, কেননা

বৃহৎ পরিবারের জীবিকা-সংস্থানের-চিন্তা তাঁহাদিগকেই করিতে হইত। আর এই দুইটি পাষণ্ডের যে অর্থলালসা ছিল, তাহা নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। হায়, এই কলুষিত অর্থলালসাই মানবচরিত্রে সর্ব্ববিধ পাপের আকর-স্বরূপ!

দুই ভ্রাতায় অনেকক্ষণ পরামর্শ হইয়া এইরূপ স্থির হইল, যে মাতাকে এবিষয়ে কিছু বলা হইবে না, কারণ তিনি এ সংবাদ শুনিলে গেরাডের বিপক্ষতা করিবেন কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে নগরপাল গিস্‌বেট সিটেনকে এ বিষয়ে জানাইলে সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। যে কারণেই হউক, তাঁহার আচরণে বোঝা গিয়াছে যে তিনি গেরাড ও মার্গারেটের বিবাহে বিরোধী। অতএব দুই ভ্রাতা অবিলম্বে নগরপালের নিকটে গিয়া ঘটনা বিস্তারিত রূপে জানাইল।

গিস্‌বেট অতি ধূর্ত্ত লোক; তিনি বুঝিলেন এ দুইটি ভ্রাতাই গেরাডের বিশেষ শত্রু। অতএব আত্মভাব গোপন রাখিয়াও ইহাদিগের দ্বারা কাজ হাসিল করা যাইবে। নিতান্ত গম্ভীরভাবেই তিনি বলিলেন, "তাই ত! এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, অথচ তোমাদের পিতা বাটীতে নাই! তবে—কাজেই—আমি যখন এ সহরের নগরপাল,—আমাকে তোমাদের পিতার প্রতিনিধি স্বরূপে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতেই হইবে। তোমাদের পিতার এ বিবাহে সম্মতি নাই আমি বেশ জানি। তা তোমরা বাড়ীতে যাও। এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যাহা করিতে হয় আমিই করিব। তবে একটা কথা কি জান—স্ত্রীলোকদের কাছে এ কথাটা আর প্রকাশ করিওনা—কোনও কথা গোপন রাখা উহাদের স্বভাব নয়—মুখে মুখে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন হইতে পারে।"

কর্নেলিস ও সিবরণ নগরপালের এইরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল। নগরপালও এই পাষণ্ড দুইটি যাহাতে তাঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য নিতান্ত উপেক্ষার সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে দশটার সময় গেরাড ও মার্গারেট বর ও বধূবেশে সেভেনবার্গের ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত। গেরাডের মুখ আনন্দরশ্মিতে উদ্ভাসিত, মার্গারেটের বদন নবঊষার সুষমা মণ্ডিত লজ্জারাগ-রঞ্জিত। বৃদ্ধ পিটার এবং বৃদ্ধ সৈনিক মার্টিন—মাত্র এই দুইজন বিবাহে উপস্থিত। গোপনে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে বলিয়া বন্ধুবান্ধব আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। বিবাহের পরে নবদম্পতি কিছুদিন ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চলে গিয়া থাকিবে এবং এ দিকের

গোলযোগ মিটিয়া গেলেই ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। গেরাড ইটালী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে—কেননা মার্গারেট তাহার অতি-পণ্ডিত নিতান্ত অসহায় বৃদ্ধ পিতাকে একাকী রাখিয়া দূরদেশে যাইতে অসম্মত।

এ দিকে আচার্য্যঠাকুরও নির্দ্ধারিত সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বেদীর উপরে উঠিয়া বর ও বধূকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বর বধূর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। আহা! এই দুইটি প্রাণীর মত সুখী আজ বোধহয় হল্যাণ্ড দেশে আর কেহ নাই! আচার্য্য বিবাহক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম পুস্তক উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

কিন্তু ও কি? আচার্য্যের মুখ হইতে একটি বাণী নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত মন্দির প্রকম্পিত করিয়া কে ও পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ক্ষান্ত হও।" এ কি! দেখিতে দেখিতে ধর্ম্ম মন্দিরের বেদীর চতুস্পার্শ্ব যে রাজকীয় বেশধারী প্রহরীবর্গ বেষ্টন করিয়া ফেলিল! একজন অগ্রসর হইয়া গেরাডের হাত ধরিয়া বলিল, "এ দেশের আইন অনুসারে তুমি আমার বন্দী।" চক্ষের নিমিষে বৃদ্ধ মার্টিন কোষ হইতে ছোড়া বাহির করিল!

আচার্য্য চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওকি কর! অস্ত্র ব্যবহারে ধর্ম্মমন্দির কলুষিত করিও না।—আর তোমারাই বা কে? কেনই বা তোমরা এই ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিয়া পাপে লিপ্ত হইতেছ?"

নগরপালের অনুচর অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে বলিল, "আচার্য্য মহাশয়! আমরা কোনও পাপকার্য্যে এখানে আসি নাই,—এই যুবক অপ্রাপ্তবয়স্ক—পিতার মতের বিরুদ্ধে এ বিবাহ করিতেছে। ইহার পিতা নগরপালের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। কাজেই দেশের আইন অনুসারে ইহার দণ্ডবিধান হইবে। এ কথা সত্য কিনা ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! এ কথা কি সত্য?"

গেরাড নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

নগরপালের অনুচর পুনরায় বলিল, "আমরা ইহাকে রটারডামে লইয়া যাইতেছি, সেখানে মহারাজের নিকট ইহার বিচার হইবে।"

মার্গারেট মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং ঝাঁপাইয়া গেরাডের বক্ষে পড়িল। নিতান্ত অধীরভাবে সে বিলাপ করিতে লাগিল; গেরাডও তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া নিতান্ত হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিল। এই করুণ দৃশ্যে প্রহরীগণের হৃদয়ও বিচলিত হইল। তাহারা যেন নিজ

কৃতকার্য্যতার জন্য লজ্জিত হইয়াই দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। রক্ষিবর্গের মধ্যে একজন বিশেষ কোমলহৃদয় ব্যক্তি ছিল। সে যেন প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদিগের নিকটে আসিয়া গোপনে মৃদুস্বরে মার্গারেটকে বলিল, "রটারডামে নেওয়ার কথা মিথ্যা, আমরা ইহাকে নগরপালের বাটীতে নিয়া যাইতেছি।"

রক্ষিবর্গ গেরাডকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে রটারডাম যাইবার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর চলিতে চলিতে ইহারা থামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এইরূপ প্রায় ১০।১২ বার বিশ্রাম করিয়া এবং ঐ পথ ঘুরিয়া অপরাহ্নে ইহারা টরগো সহরের অপর পার্শ্বে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে একখানি বস্ত্রাবৃত অশ্বযান অপেক্ষা করিতেছিল। গেরাডকে তাহার মধ্যে বসাইয়া রক্ষিবর্গ গোপনে নগরপালের ভবনসংলগ্ন কারাগৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহাদিগের নির্দ্দেশ মত গেরাড বহুসংখ্যক সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটি নির্জ্জন ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। বাহির হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রহরিবর্গ চলিয়া গেল। গেরাড চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স ব্যতীত অপর কোনও আসবাব নাই, এক পার্শ্বের প্রাচীরে একটি উচ্চ ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে সামান্য মাত্র দিনের আলোক প্রবেশ করিতে পারে এবং গবাক্ষটি মধ্যস্থলে বিলম্বিত একটি লৌহ দণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত।

এই যুগে কারাগার মৃত্যুর প্রবেশদ্বার স্বরূপই ছিল। কারাদণ্ড সর্ব্বাবস্থায়ই অসহনীয় বটে, কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপের কারাগারসমূহে বন্দীদিগকে শীতের ক্লেশ, অনাহার, নির্জ্জনবাস ও নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণা—এ সকলই সহ্য করিতে হইত। আবার আহার্য্যের সহিত মিশ্রিত বিষপানে প্রাণনাশের আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং এই যুগে কারাদণ্ড প্রায় মৃত্যুদণ্ডেরই অনুরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল কারণে গেরাডের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তশত্রুর ষড়যন্ত্রে সে আজ এইরূপ শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে।

পথে পথে প্রহরীদিগের হাবভাব যেরূপ দেখিয়াছিল এবং একজন রক্ষী যেরূপ নির্ম্মম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইতেছিল, তাহা স্মরণ করিয়া গেরাড ভাবিল, শুধুমাত্র পিতার অভিযোগে তাহার এরূপ দণ্ডবিধান হওয়া সম্ভব নয়। এ নিশ্চয়ই কোনও শত্রুর কার্য্য। তাহার প্রাণনাশ

করাই এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। গেরাড দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল, "হায় দিবালোক আর আমি দেখিতে পাইব না—আমার জীবনাঙ্কের পরিসমাপ্তি এখানেই হইবে!" উচ্ছ্বাসিত হৃদয়াবেগে গেরাড অধীর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের একমাত্র উপায় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নতজানু হইয়া অনেকক্ষণ নীরবে প্রার্থনা করিল।

ক্রমে তাহার উদ্বেলিত হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিল। কি এক নবীন আশায় উৎসাহিত হইয়া গেরাড লম্ফ দিয়া গবাক্ষের লৌহদণ্ড ধরিয়া বাহুর উপর ভর করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষণকালের মধ্যেই গেরাড যাহা দেখিয়া হৃষ্ট হইল, তাহার তাৎপর্য্য বন্দী ব্যতীত অপর কাহারও উপলব্ধি হওয়া কঠিন।

গেরাড দেখিল একটি মনুষ্য মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ—সেই মনুষ্যটি আর কেহ নয় বৃদ্ধ সৈনিক মার্টিন।

কারাগারের পিছনে অদূরে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। বৃদ্ধ মার্টিন নিতান্ত মনোযোগের সহিত নীরবে বসিয়া নদীতে ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছিল। গেরাড চাহিবামাত্রই বুঝিতে পারিল, মার্টিন মৎস্যের গতিবিধি অপেক্ষা কারাগারের গবাক্ষপথে কোনও মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিবার অভিলাষেই ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে। অতএব গেরাড গবাক্ষপথে মুখ তুলিবামাত্রই মার্টিন তাহাকে দেখিতে পাইল এবং কি ইঙ্গিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

গেরাড বুঝিল, তাহার হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাহার কারাগারে অবস্থিতির বিষয় জানিতে পারিয়াছে এবং তাহারাও নিশ্চেষ্ট নাই। মার্টিনকে শুধু দেখিয়াই গেরাডের হৃদয়ে নিতান্ত আনন্দের সঞ্চার হইল এবং যতক্ষণ মার্টিন অদৃশ্য হইয়া না গেল, গেরাড এক দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মার্টিন চক্ষের অন্তরাল হইলে গেরাড সবলে সমস্ত শরীরের ভর দিয়া লৌহ দণ্ডটি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই পুরাতন মরিচা ধরা লৌহদণ্ডটি গবাক্ষপথ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িল, এবং গেরাড লৌহদণ্ড হস্তে নীচে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গবাক্ষের দ্বার বাহির হইতে মুক্ত হইল এবং নগরপাল গিস্‌বেট সিটেন নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নগরপাল লৌহদণ্ডটির দিকে একবার চাহিলেন, গবাক্ষের দিকেও চাহিলেন,—কিন্তু কিছুই বলিলেন না। গবাক্ষটি নিম্নস্থ ভূমি হইতে প্রায় সত্তর হাত উচু হইবে।

যদি গেরাড এতদূর উচ্চ গবাক্ষ হইতে উল্লম্ফনে পলায়নের চেষ্টাই করে—করুক, তাহাতে বাধা দিবার তাঁহার আবশ্যকতা কি? তিনি একখণ্ড রুটি ও একপাত্র জল লইয়া আসিয়াছিলেন,—নীরবে তাহা কাঠের বাক্সটির উপর রাখিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গেরাডের প্রথম উত্তেজনায় মনে হইল যে লৌহদণ্ডের এক আঘাতে বৃদ্ধকে অচেতন করিয়া ফেলিয়া উন্মুক্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করে। বৃদ্ধ নগরপাল তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই তাহার অভিপ্রায় কতকটা অনুমান করিয়া লইলেন, এবং একটু কাসিবার মত শব্দ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনটি বলিষ্ঠ সশস্ত্রপ্রহরী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখা দিল।

তখন নগরপাল ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার শৈশব হইতেই তুমি ব্রহ্মচারী আচার্য্য হইবে এইরূপ তোমার পিতা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব মার্গারেট ব্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইবে এই শপথ না করা পর্য্যন্ত তোমাকে এইরূপ বন্দী ভাবেই থাকিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।"

গেরাড উত্তর করিল,—"জীবন থাকিতে পারিব না।"

"তা' বেশ"—এই বলিয়া নগরপাল বিদায় হইলেন, কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

সাদৃশ্য।

আকাশের তারা দেখে
মনে পড়ে কাননের ফুল।
মেঘ দেখে মনে পড়ে—
শ্যাম ছায়া যমুনার কুল।
পাখীর ডাকে মনে পড়ে
যত আছে বিরহের গান।
রঙ্গিনী যামিনী দেখে,
ভাবি সেই তৃষিত বয়ান।
দুর্ব্বাদলে খদ্যোতের স্তর—
মনে পড়ে, স্বর্ণ দীপমালা।
জীবনের রত্ন বেদিকায়,
স্বপ্ন ঘেরা সেই সন্ধ্যাবেলা।

সাদৃশ্যের এ দৃশ্য অঙ্কন
দেখে মোর এই মনে হয়—
চিত্রকর রিক্ত প্রাণে তাঁ'র
চিত্রিল এ বিশ্ব কারুময়।
যেই হাতে তুলিকা সন্ধানে
ফুটে ছিল বিষধর ফণী,
সেই হাতে উঠে ছিল
ফণিনী সে কামিনীর বেণী।
যে ব্রীড়ায় সঙ্কুচিতা,
বন মাঝে লজ্জাবতী লতা—
তাহারি আলেখ্য সেই
গৃহ কোণে নব মুঞ্জরিতা।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সিংহল-রাজ-কুমারী।*

"সোনার হার দিচ্ছি ওরে—পার করে' দে মাঝি!"
"কে ও তুমি?—ক্ষ্যাপা জল, আমরা নহি রাজি!"
"বিজয়-কেতু আমি ওরে—অবন্তীপুর-রাজ,
সিংহল রাজ-কন্যা সাথে—আমার হৃদয়-তাজ!
তিন দিন আজ—পালিয়েছি যে তার সে পুরী হ'তে,
সিপাই-শান্ত্রী সেদিন হ'তে ঘুরছে কত পথে!
ধর্‌তে পেলে রাখবেনাক'; আমার শোণিত-ধার,
কর্‌বে রাঙা রুধির-পায়ী তাহার তলোয়ার!"
—"আমি যাব"—বল্ল জোয়ান একটি মাঝি জোরে,
"নয়কো কিন্তু তুচ্ছ তোমার সোনার হারের তরে!
ওই যে তোমার বাহুর পাশে জমাট জোছনা রাশি—
তারই তরে মরণ বরি হ'য়ে এত খুসী।
রাক্ষসেরি মতন তড়াগ আস্‌ছে হা—হা করি'—
তবুও এস, ছাড়ব আজি—ছাড়ব আমার তরী!"
ছুট্‌ল ডিঙ্গি—উঠ্‌ল কান্না সারা সাগরময়,
তরঙ্গ মালা আকাশ চুমে ওম্নি মনে হয়!
হাজার যুগের অমানিশা ঘনিয়ে এল সব—
একি! আকাশ চিরে' বজ্র পড়ে বৃষ্টি ঝপ্‌ ঝপ!
বাতাস যেন বিশাল ধরা উল্টে দিতে চায়—
আঁধার যেন বৈশ্বানরে ঢেকে রাখতে চায়!
ওম্নি সময় খেয়ার ঘাটে এল সিংহল রাজ,
রাজকন্যা বল্‌ল তখন—"ওরে মাঝি আজ,
ডুবব না হয় মরব মোরা পাগল জলের তলে,
চালাও তরী ফির্‌বনা আর রাক্ষস সিংহলে!"
ঢেউ-সওয়ারী হ'য়ে তরী, গেলো—দূরে গেলো তরি—
তারি মাঝে তড়িৎ-আলোয় কন্যা তাহার হেরি'
কেঁদে-কেঁদে বল্ল—"ওমা, আয়মা ফিরে' আয়—
সঙ্গে নিয়ে বিজয়-কেতু আয়মা—কোলে আয়!
দেখ্‌ এসে মা—পাষাণ পিতা স্নেহে গেছে গলে'—
আয় ফিরে' আয় চুমো দেব তোদের রাঙা গালে।"
—ফিরে আসা, চুমো দেওয়া—সব গিয়েছে চুকে'
প্রেমের ডোরে বদ্ধ পরাণ লুপ্ত সাগর বুকে!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* T. Campbell এর Lord Ullin's Daughter "এর ভাব অবলম্বনে।—লেখক।

সাময়িক ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

৪ঠা আগষ্ট—আমাদের প্রার্থনা ও সাধনা।

১৯১৩ সনের ৪ঠা আগষ্ট বৃটিশ রাজশক্তি জর্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এবার ১৯১৬ সনের ৪ঠা আগষ্ট এই যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। গত বৎসরও হইয়াছিল, এবারও এই তারিখে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বৃটিশ প্রজাবর্গ বৃটিশশক্তির জয় কামনা করিয়া ভগবদুপাসনা করিয়াছেন।

এই যুদ্ধে জয়লাভের উপরেই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী মঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, এ কথা বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণও বলিতেছেন,—আর সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন। ভারতবাসী বৃটিশ রাজশক্তির আশ্রিত হইয়া আছে, সুতরাং বৃটিশ রাজশক্তির মঙ্গলে ভারতবাসীরও মঙ্গল। ভারতবাসীও তাই এইদিনে বৃটিশ রাজশক্তির জয় কামনা করিয়া পূজা অর্চ্চনাদি করিয়াছেন। কিন্তু সাধনাবিহীন নিশ্চেষ্ট প্রার্থীকে ভগবান প্রার্থনার ধন দেননা। ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ আছে, 'যারা নিজে কাজ করিতে চায়, ঈশ্বর তাহাদেরই সহায়তা করেন. (Heaven help those who help themselves.)। "হে ভগবান্! আমাদের রাজাকে জয়যুক্ত কর।"—করজোড়ে কাঁদিয়া যদি কেবল এই কথাই প্রজারা বলে, রাজাকে যুদ্ধে জয়যুক্ত করিতে প্রজার যে সাধনা আবশ্যক, তাহাতে যদি প্রজা বিরত থাকে, তবে হায়, তার সে অসার মুখের মাত্র প্রার্থনা ভগবান্ কাণে তোলেন কি? প্রার্থনায় ভগবানের আশীর্ব্বাদের প্রসাদে চিত্তের বলবৃদ্ধি পায়, সেই বলে কামলাভের উদ্দেশ্যে তার সকল সাধনায়—সকল চেষ্টায় নূতন প্রাণ নূতন শক্তি আসে,—কাম্যে তার সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু হায়, ভারতবাসী জনসাধারণ আমরা শুধু প্রার্থনাই করি। আমাদের রাজাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যে কর্ম্মে—যে সাধনায়—আত্মদান আবশ্যক, তার কি অবসর আমরা পাইতেছি? ভারতীয় রাজগণ কিছু কিছু সহায়তা করিতেছেন, ভারতীয় সৈন্য কিছু কিছু যুদ্ধে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ আমরা যুদ্ধের সংবাদ সংবাদপত্রে পড়িতেছি, কখনও ভয়ে কম্পিত, কখনও বা আশায় কিছু উল্লসিত হইতেছি,—আর দেবতাকে ডাকিতেছি, আমাদের রাজা বিজয়ী হউন, আমাদের এই দারুণ অমঙ্গল দূর হউক। কিন্তু এই যুগবিপর্য্যয়কর মহাসমরে রাজার বিজয়লাভে, রাজার মঙ্গলে আমাদেরও মঙ্গলসাধনে, প্রজার যাহা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা ত কিছুই করিতে পারিতেছি না! রাজার শক্তি ও প্রজার শক্তি, রাজার মঙ্গল ও প্রজার মঙ্গল, পরস্পর সাপেক্ষ। এক হইতে অপরের বিভেদ কিছুই নাই। বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে বৃটিশরাজের ত্রিশকোটির অধিক প্রজা বাস করে। শুনিতে পাই, দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ। আজ যদি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

ভারতবাসী রাজার সহায়তার জন্য অস্ত্রধারণের অধিকার পাইত, জর্ম্মাণী অষ্ট্রীয়ার ত কথাই নাই, সমগ্র জগৎ বিপক্ষে দাঁড়াইলেও বৃটিশশক্তির মহাবিস্তৃত ভিত্তির একটি কোণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইত না,—সাম্রাজ্য রক্ষার উপায়ের জন্য বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণকে আজ এতটুকুও চিন্তান্বিত হইতে হইতনা।

ভারতবাসীরও এই ভগবৎ-কৃপাকামনা সাধনায় ও চেষ্টায় সার্থক হইত। হায়, সে সাধনায়, সে চেষ্টায়, সে সার্থকতা লাভের অবসর ভারতবাসী কি এখনও পাইবে না ?

বাঙ্গালী সেনা—লর্ড কারমাইকেলের কথা।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় একটি সৈন্যদল গঠন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অতি আনন্দে ও উৎসাহে প্রায় সকলেই যে ইঁহার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সহায়তা করিতে প্রস্তুত হন, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সমর বিভাগের প্রধান কোনও রাজপুরুষের সঙ্গেও এই প্রস্তাব লইয়া মল্লিক মহাশয় সাক্ষাৎ করেন। এই রাজ-পুরুষ সেনাপতি ষ্ট্রেঞ্জ। ইনি মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। মল্লিক মহাশয়ের প্রস্তাবের মূল কথা ছিল এই যে সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ বাঙ্গালী—সম্ভব হইলে ভদ্রবংশীয় এইরূপ বাঙ্গালীদের লইয়াই এই সৈন্যদল গঠিত হইবে। ঠিক বেতনভোগী সিপাহীদের মত নয়, বিলাতী টেরিটোরিয়াল সৈন্যদের মতই এই সৈন্যদল গঠিত হইবে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য হইতে সৈন্যদল গঠিত হইবে, বেতন ব্যতীতই ইহারা যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, সেই অঞ্চলের রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ ইহাদের থাকিলেও যে কোনও স্থানে যুদ্ধার্থ ইহারা প্রেরিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রমুখ কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হয়। তারপর এই প্রস্তাব বড়লাট বাহাদুর এবং জঙ্গী লাট বাহাদুর (ভারতের প্রধান সেনাপতি) মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়।

সম্প্রতি ঢাকায় যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বঙ্গলাট লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর এ সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের মত সভ্যগণের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই। বড়লাট বাহাদুর—জঙ্গীলাট বাহাদুর এবং ভারত গবর্ণমেণ্টভুক্ত অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালী সৈন্য কেমন হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আপাততঃ বাঙ্গালীদের মধ্য হইতে দুইটি পদাতিক সৈন্যের কোম্পানী (ক্ষুদ্রতর সৈন্যদল বিশেষ) গঠন করা হইবে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে যে নিয়মে সৈন্যদল গঠন ও পরিচালন করা হয়, ঠিক সেই নিয়মেই এই সৈন্যদল গঠিত ও পরিচালিত হইবে। আপাততঃ এই যুদ্ধ যতদিন থাকে, ততদিনের জন্যই সৈন্য গৃহীত হইবে। সৈন্যদের মধ্যে যদি

কেহ যুদ্ধের পরেও সৈন্য হইয়া থাকিতে চাহেন, তাঁহাকে রাখা হইবে। গঠিত হইলে এই ডুটা সৈন্যদল শিক্ষার জন্য সীমান্তে প্রেরিত হইবে। তার পর শিক্ষা লাভ হইলে যুদ্ধেও পাঠান যাইতে পারে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, তাহারা সামান্য বেতনভোগী সাধারণ সিপাহী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মল্লিক মহাশয় যেরূপ সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করেন, তাহা ভিন্ন রকমের। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাও যে ভাবে অস্ত্রধারণ করিয়া রাজ সরকারকে সাম্রাজ্যরক্ষায় সহায়তা করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিও যে ইহাতে হইবে এরূপ ত মনে হয় না। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণ যে ক্ষুদ্র বেতনভোগী সাধারণ সিপাহীর ন্যায় যুদ্ধে যাইতে তেমন প্রস্তুত হইবেন, এমন ত মনে হয় না। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই এরূপ সিপাহী সংগ্রহ করা সম্ভব। বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক সময়ে যুদ্ধ করিত, যুদ্ধে তাহারা নিপুণও ছিল। কিন্তু বহুকাল তাহারা অস্ত্রবিদ্যার বা যুদ্ধের ধার ধারে না। এ সম্বন্ধে চিন্তাও কিছু তাহারা করে না। এরূপ অধিকার লাভের জন্য কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষাও যে তাহাদের চিত্তে আছে, এরূপ মনে হয় না। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকে এই যে নূতন অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বাঙ্গালী ভদ্রসমাজে—যেখানে এই নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে সেখানে—ইহার সফলতা কিরূপ হইবে, এখনও বোঝা যাইতেছে না। শিক্ষিত ভদ্রসমাজভুক্ত বাঙ্গালী এখন চায় প্রজার অধিকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যরক্ষায় রাজার সহায়তা করিতে। সামান্য জীবিকার জন্য দীন দরিদ্র যেমন সিপাহী হয়—তেমন সিপাহী হইয়া কি তার সে আকাঙ্ক্ষা মিটিবে? কে জানে? দেখা যাক্ কি হয়।

বঙ্গীয় সেনা-সেবক সম্প্রদায়ের প্রত্যাগমন।

আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষাদি কার্য্যের জন্য সে সব বঙ্গীয় যুবক মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, এক বৎসর পরে তাঁহারা সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অসাধারণ নির্ভীকতা, ধীরতা এবং ক্লেশ-সহিষ্ণুতার জন্য তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের অশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গ কেবল নয়, সমগ্র ভারত আজ ইঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত। আমরাও আজ তাই বড় আনন্দে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। টেসিফনের যুদ্ধের সময় তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, "গোলা-গুলির অবিরত অগ্নিবৃষ্টির সম্মুখে ইঁহারা অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন,—আহত সৈন্যগণকে উদ্ধার করিয়া যে ভাবে ইঁহারা নিরাপদে জাহাজে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাও যারপরনাই প্রশংসনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব কঠোরতা এবং অভাবের ক্লেশ সহিতে হয়, তাহা সহিতে ইঁহারা কখনও পশ্চাৎপাদ হন নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং বাহিরে শীতাতপবর্ষায় অবিরত উন্মুক্ত থাকায় ইঁহাদের অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়েন,—কর্ম্মীর সংখ্যা তাহাতে হ্রাস হয়। কিন্তু তাহাতেও ইঁহারা নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে কিছু মাত্র শৈথিল্য করেন নাই।

ইঁহাদের মধ্যে ২৪জন এখনও শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া আছেন। যুদ্ধের অবসান না হইলে তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ ইঁহাদের মঙ্গলে রাখুন।

বাঙ্গলার লাট বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এবং রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স ফোর্ড বাহাদুর প্রশংসাবাদ সহ ইঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

ইঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। মেসোপোটেমিয়ায় পাঠাইবার জন্য নূতন এক দল সেনাসেবক প্রস্তুত করা হইতেছিল। কিন্তু এই দল এক রকম তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যাইতেছে। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক প্রশংসা করিয়া লাট সাহেব বলিয়াছেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং তাঁহার সহযোগীগণ আরও একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। কোনও একস্থানে অবস্থিত হাঁসপাতালে আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষাদি কার্য্যের জন্য নয়, প্রকৃত এম্বুলান্স কার্য্য যাহা তাহার জন্য—যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণকে ডুলীতে বহন করিয়া আনিবার জন্য—ইহারা শীঘ্র প্রেরিত হইবে, এইরূপ তাঁহারা প্রত্যাশাও করিতেছিলেন। তিনি এজন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে বিশেষ নিরাশা ও ক্ষোভের কারণ হইয়াছে যে দলভুক্ত যুবকগণ এই কার্য্যে যাইতে চাহেন নাই। বুঝিবার ভুলেই তাঁহারা যাইতে চাহেন নাই। ইত্যাদি।

বুঝিবার ভুল যাহাই হইয়া থাক্‌, সকল দিকের সকল আপত্তির একটা মীমাংসা হইয়া আবার যদি এই দল পুনর্গঠিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়, তাহা সকলের পক্ষেই সুখের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। নূতন অধিকারে নূতন দায়িত্বে নূতন কর্ত্তব্যে বাঙ্গালী এই কার্য্যে আপনার শক্তি দেখাইবার, আপনার নাম গৌরবান্বিত করিবার, বড় উত্তম সুযোগ পাইয়াছিল। সে সুযোগ হারাণ যে কত বড় দুঃখের কথা তাহা না বলিলেও চলে!

চন্দননগরের বাঙ্গালী সেনা।

চন্দননগরের প্রথম দলের বাঙ্গালী সৈনিকগণ ফ্রান্সে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। ফরাসীরা তাঁহাদিগকে অতি আদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শীঘ্রই ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেন। এই যুদ্ধের এই মহামৃত্যুলীলার মধ্যে বীরোচিত আচরণে ইঁহারা গৌরবান্বিত হউন্ এবং ইঁহাদের গৌরবে বাঙ্গালীর নাম গৌর-বান্বিত হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা এখন এই কামনাই করি।

তিলকের মহানুভবতা।

গত জুলাই মাসে শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলকের বয়ঃক্রম ষাটবৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অভিনন্দন করেন এবং একলক্ষ টাকার তোড়া তাঁহাকে উপহার দেন। তিলক ইহার উত্তরে বলেন,

"কিছু বাধ বাধ ঠেকিলেও আপনাদের এই অভিনন্দন আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এই টাকার তোড়া সম্বন্ধে কথা পৃথক। এই অর্থদ্বারা আমি কি করিব জানিনা। নিজের জন্য ইহার কোনও প্রয়োজনও আমি দেখিতেছিনা, এবং সেজন্য ইহা গ্রহণ করাও আমার পক্ষে উচিত হইবে না। বৈধউপায়ে জাতীয় মঙ্গল সাধন কল্পে ন্যাস স্বরূপ মাত্র আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি, এবং আশা করি আমার এই প্রস্তাব আপনাদের মত বিরোধী হইবে না। ইহার পর যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই নিয়মানুসারে আমার সাধ্যমত এই কার্য্যের জন্য আমি ইহা ব্যয় করিব। যে সর্ত্তে আমি এই অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে যদি আপনাদের ক্ষোভের কারণ কিছু হয়, আশাকরি আমার বর্ত্তমান দৈহিক ও মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়া আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

তিলক যাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ জননায়কের পক্ষে তাহা অসাধারণ নয়। জননায়কের ধর্ম্মই ইহা। এই ধর্ম্মে খাট যিনি, জননায়কত্বের গৌরব তাঁহাতে শোভা পায় না। কিন্তু হায়, এরূপ জননায়ক ভারতে আজ কয়জন? সকলেই যে প্রায় নিজের পুঁটলি বাঁধিতে ব্যগ্র। সভায় তাঁহারা একজন,—ঘরে আর একজন।

মহীশুরে গ্রামোন্নতি।

পল্লীগ্রাম সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য মহীশুরের রাজসরকার হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়। গত বৎসর (১৯১৪-১৫ সালে) রাজসরকারের এই চেষ্টা যে কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যাইবে।

মহীশুর রাজ্যমধ্যে ৭৭৪৫টি গ্রাম্যসমিতি ১৩৩৬০টি গ্রামের উন্নতিকল্পে আপনাদের শক্তি পরিচালনা করেন। এই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা মহীশুর রাজ্যের মোট গ্রামবাসী প্রজার শতকরা প্রায় ৮০ জন। এই গ্রাম্য সমিতিগুলির মধ্যে ২৯৬৬টি সমিতি প্রতি সপ্তাহে সভা করিয়া গ্রামবাসীদের সহায়তায় গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি, গ্রামের রাস্তা সমূহের বিস্তার ও সংস্কার, এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যাদি কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার আলোচনা এবং উপায় বিধান করিতেন। 'মাদ্রাজ মেল' বলেন, যতদূর জানা যায় বৃটিশশাসিত ভারতে গ্রামের উন্নতির জন্য এরূপ কোনও উন্নত প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ সভা আছে বটে, তাঁহারা এইরূপ কার্য্য যদিও কিছু করেন, তাহা ইহার তুলনায় কিছুই নয়।

বাঙ্গলার পল্লী ও পঞ্চায়েৎ।

বাঙ্গলার পল্লীসমূহের কথা যতদূর জানি, প্রধান একটি বিষয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভা এরূপ কিছুই করেন না। স্বাস্থ্যেরও আরামের দিক হইতে দেখিলে, বঙ্গীয় পল্লীসমূহের সর্ব্বপ্রধান ক্লেশ বোধহয় এখন ভাল জলের অভাব। চৈত্র

বৈশাখমাসে পুকুরগুলি শুকাইয়া যায়, পুকুরের জল দুর্গন্ধ তরল কর্দ্দমে মাত্র পরিণত হয়।—উচ্চবঙ্গের নদীনালার জল নামিয়া যায়, নিম্নবঙ্গে অনেকস্থলে তা লোণা হয়। সে যে এক দুঃখের দিন, দারুণ ক্লেশের দিন বাঙ্গলার পল্লী সমূহে আসে, তাহা সেই নীরব অসহায় গ্রামবাসীরা বই আর কেহ অনুভব করিতে পারেন না। এ সময়কার জল কষ্ট দূরকরা বহুব্যয়সাপেক্ষ। হয়ত, পঞ্চায়েৎ সভা অত ব্যয় করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই ত্রুটি কতক মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলার জলকষ্ট কেবল শুক্‌নার দিনের জলের অভাবের কষ্ট নয়। এই ত বর্ষা আসিয়াছে, পল্লীর পুকুর খানা ডোবা প্রভৃতি সব জলে ভরিয়া যাইতেছে। পরিমাণের হিসাবে এখন জলের দুঃখ নাই, কিন্তু এই যে জল তার অবস্থা কি? শুকনার দিনে যখন পুকুরের জল পুকুরে তলায় গিয়া মাত্র কিছু অবশিষ্ট থাকে, তখন পুকুরের ধার ও পাড় ভরিয়া বহু গুল্মাদি জন্মে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন কিছু কিছু বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন এগুলি পরিষ্কার করিবার নামও কেহ করে না। পুকুরের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা এজন্য কিছু ব্যয় বা ক্লেশ স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা অনেক ধনী, অনেক সময়ে সহরে সপরিবারে বাস করেন, সুতরাং এসব জল তাঁহাদিগকে ব্যবহার বড় করিতে হয় না। পরের জন্য আর কে মরে? যাঁহারা গ্রামে থাকেন, তাঁহারাও অজ্ঞতা অথবা শৈথিল্যে এদিকে দৃষ্টি করেন না। ভরা বর্ষায় যখন পুকুরগুলি ভরিয়া উঠে—এই সব গুল্ম পচিয়া জলের যেরূপ রস গন্ধাদি হয়, তাহা অসহনীয়। ইহার উপরে পানা দাম ত আছেই, সূর্য্যকিরণের স্বাস্থ্যকর স্পর্শও পানা দামে আচ্ছন্ন এই জলের ভাগ্যে কখনও ঘটে না। জলের ত এই অবস্থা। ইহা ছাড়া বর্ষার পল্লীগ্রামের পথ, বন, বাগান পাইখানা প্রভৃতির যা অবস্থা, তার কথা আর বলিব কি? এমন নিয়ত ঘৃক্কার-জনক আর কিছু বিশ্ব জগতে কোথাও আছে কি না জানি না। হায়, সোণার বাঙ্গলা! সোণা তুমি সুধুই বিলাসী নগরবাসী কবির গানে—আর তথাবিধ বক্তার বক্তৃতায়!

গ্রামবাসীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য অনেক পরিমাণে যে এই অবস্থার জন্য দায়ী, একথা ঠিক। কিন্তু গ্রাম্যপঞ্চায়েতের হস্তেও গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধনের ভার অনেক পরিমাণে রহিয়াছে।

অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য যতই থাকুক, বাধ্য করিয়া গ্রামবাসীকে এই সব নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারে নিয়োজিত করা তাঁহাদের বড় একটি কর্ত্তব্য। তা যদি না পারেন বা না করেন, কেন তাঁহারা গ্রামে গ্রামে রহিয়াছেন, জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও দরিদ্র ছাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ক্রমেই দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থল। হাজার হাজার ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। যত ছাত্র কলেজে পড়িতে চান, কলেজসমূহে তত স্থান হয় না। এই একটা বড় কঠিন সমস্যা ত আছেই

তারপর কলেজের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বেশী। কলেজের কর্তৃপক্ষ যা দাবী করেন, ছাত্রদের তাহাই পালন করিতে হয়। কারণ ছাত্র কলেজে যত স্থান চায়, কলেজের কর্ত্তারা ছাত্র তত চান না। (বার্ত্তাশাস্ত্রের 'চাওয়া পাওয়া'র কঠোর বিধি এখন সর্ব্বত্রই চলে।) অনেক কলেজে নাকি পড়াশুনারও তেমন সুব্যবস্থা করা হয় না। কারণ তারজন্য কর্তৃপক্ষগণের এমন গরজ কিছু নাই। ভাল পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া ছাত্র আকর্ষণ কাহাকেও এখন করিতে হয় না। কলেজে কোনও মতে নাম লেখাইতে পারিলেই ছাত্রেরা এখন কৃতার্থ হয়। পরীক্ষা দিতে হইলে কলেজে নাম লেখান ছাত্র হওয়া চাই, আর উপস্থিতির নির্দ্দিষ্ট শতকরাটাও ঠিক রাখা চাই। পরীক্ষার পড়া তৈয়ারী করিতে বাজারে নোটবহির অভাব নাই,—কিনিলেই হইল। উপস্থিতির শতকরা সংখ্যার হিসাব ঠিক না থাকিলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না। সুতরাং সেটা রাখাই চাই। ছাত্রেরা কলেজে যে বেতন দেয়, সে যেন মাসে মাসে টাকা দিয়া উপস্থিতির সেই শতকরা কেনে। যেরূপ শুনিতে পাই, কলেজে ও ছাত্রে বর্ত্তমান সম্বন্ধ নাকি অনেক স্থলেই এখন এইরূপ। ইহার উপরে মেসে থাকিবার ব্যয় এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, যে কোনও মতে মাসে ত্রিশটাকার কমে বোধহয় কোনও ছাত্রই মেসে থাকিয়া পড়িতে পারে না।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক বেশীর ভাগই মাসে ৫০।৬০ টাকার অধিক আয় করিতে পারেন না। একটি ছেলেকেও যদি কলেজে পড়াইতে হয়, তবে তার খরচ যোগাইয়া যাহা থাকে, তাহাদ্বারা নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন যে কিরূপে চলে, তাহা বাস্তবিক ভাবিয়াও কুল পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ মাসে যাঁহারা অন্ততঃ ১০০৲ টাকা আয় না করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে একটি ছেলেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দানকরা এখন দুঃসাধ্য।

ছেলেপিলেদের উচ্চশিক্ষার কি হইবে, ভাবিয়া অনেকে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। চারিদিকে যেন একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দরিদ্রের পক্ষে দুর্লভই হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে এত ভয়ের বা এমন একটা হাহাকারের কারণ আমরা তেমন কিছু দেখিতে পাই না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাব্যতীত ভদ্রজনোচিত উচ্চতর বৃত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, ইহাই সকলের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এই শিক্ষাপ্রদত্ত যোগ্যতা ব্যতীত যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে প্রবেশাধিকার কাহারও হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু এই সব বৃত্তি ব্যতীত কি ভদ্র সন্তানের জীবিকার জন্য আর কোনও বৃত্তি নাই? তারপর বর্ত্তমানে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে কয়জনই এই সব বৃত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন? বৃত্তি ত ভাল সরকারী চাকরী, আইন ব্যবসায়, এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। কিন্তু এই সব বৃত্তিতে প্রার্থীর তুলনায় স্থান এখন এত অল্প যে শতকরা ১০।১৫ জনের বেশী ইহাতে এখন জীবিকা অর্জ্জন একরূপ করিতে পারেন না, বলিলেই হয়। এই স্বল্প সুযোগও যে কাহারা পাইতে পারেন, তাও একরূপ ঠিক করিয়া বলা যায়। বড় সরকারী চাকুরের ছেলেপিলে বা নিকট আত্মীয় দুই একজন, অথবা উচ্চ

প্রতিভাবান্ ছাত্র দুই একজন ব্যতীত ভাল সরকারী চাকরী আর কাহারও পক্ষে একেবারেই দুর্লভ। ছোট চাকরী যদি প্রার্থনীয়ও হয়, তবে যাদের বাপ খুড়া দাদা কেহ এইসব চাকরীতে আছেন, তাঁহাদের ব্যতীত আব কাহারও পক্ষে তাহা সুলভ নহে। যাঁদের মুরুব্বি কেহ ভাল উকিল মোক্তার, অথবা যথেষ্ট পয়সা যাঁদের আছে, তাঁহারা ব্যতীত—প্রতিভা যত বড়ই থাক্ আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ যত জনেই করুন, জীবিকা অর্জ্জন এখন তাহাতে অল্পেই করিতে পারেন। এক শিক্ষকতা,—এখানে সকলেরই অল্প বিস্তর সুযোগ আছে। তাই ঠেলাঠেলিও বড় বেশী। শুনিতে পাই কলিকাতার ইস্কুল সমূহে ২০।২৫ টাকায় চাহিলেও গ্রাজুয়েট গণ্ডায় গণ্ডায় মিলে। ৩০।৪০ টাকায় এম এ পাশকরা ছেলেও শিক্ষকতার প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তারপর সুপারিসির জন্য যেরূপ ঘোরাঘুরি হুড়াহুড়ি দেখা যায়, তাহাতে দুঃখে ক্ষোভে ও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। এ সম্বন্ধে মালঞ্চে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। অধিক কিছু লেখা মালঞ্চের পাঠকবর্গের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে এখনও সকলে গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়—কেহ চক্ষু বুজিয়া কেহ মিথ্যা আশায় ভুলিয়া—এই একদিকেই চলিয়াছেন। তাই মনে হয়, মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা মন্দ নয়।

জীবিকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সাধারণ ভদ্রসন্তানগণের পক্ষে একেবারেই নিস্ফল, এ কথা যাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিবেন, একটু চিন্তা করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এ জন্য এতব্যয় একেবারেই বৃথা অপব্যয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সাধারণের পক্ষে এরূপ মহার্ঘ্য ও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, ভদ্রসন্তানগণের জীবিকার পক্ষে তাহাতে এমন দুশ্চিন্তার ও দুঃখের কারণ কিছু নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সকলের জীবিকার সংস্থান হইবার দিন এখন গিয়াছে। জীবিকার জন্য যদি শিক্ষার দরকারই হয়, তবে অন্যরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। যে সব নূতন পথে ভদ্রসন্তানগণের জীবিকা এখন হইতে পারে, সেই সব পথে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই এখন দেশ ভরিয়া হওয়া চাই। সে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও হইতে পারে, সে শিক্ষার বলে জীবিকার যে সব বৃত্তি লভ্য, তাহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সাপেক্ষ নহে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রেই এখন অধিকাংশ বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান-গণকে জীবিকার অন্বেষণ করিতে হইবে। নানা রকম জীবিকার পথ এ সব দিকে এখন উন্মুক্ত হইতেছে, চেষ্টায় ও উদ্যমে আরও হইতে পারে। কেমন করিয়া হইতে পারে, তার বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে এখন নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বলে ও ফলে যে সব পথে শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন সাধারণতঃ জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করেন সে সব পথে এ চেষ্টা এখন বৃথা। ব্যবসায় বাণিজ্যাদি অথবা তৎসক্রান্ত নানাবিধ কার্য্যে প্রবেশ ব্যতীত সাধারণ ভদ্রসন্তানগণের আর উপায়ান্তর

এখন নাই। প্রাণের দায়েই তাঁহাদিগকে এখন এই সব কার্য্যের চেষ্টা করিতে হইবে, কাহারও উপদেশের অপেক্ষা আর থাকিবে না। প্রাণের দায়ে বখন লোক পাগল হইয়া কোনও দিকে ছোটে, পথ সেদিকে বাহির হয়ই।

ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কার্য্যে যদি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণকে এখন প্রবেশ করিতে হয়, তবে দেশের চিন্তাশীল ও শক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গকে এখন ভাবিতে হইবে ব্যবসায় বাণিজ্যের কোন কোন দিকে কি কি কার্য্যে সহজে আমাদের ছেলেপিলেরা প্রবেশ করিতে পারে এবং তারজন্য কি কি বিশেষ বিশেষ বিদ্যার আবশ্যক। তারপর সেই সব বিদ্যালাভ হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মূল কথা, নানাবিধ টেক্‌নিকাল্ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়িক শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়ই এখন দেশের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছে। যদি সরকার বাহাদুর সাহায্য করেন ভাল, নতুবা দেশের লোককে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে, যাহাতে দেশ ভরিয়া টেকনিকাল শিক্ষার বিপুলবিস্তার হয়, এবং ছেলেপিলেরা এই সব বিদ্যালাভের দিকেই প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দুর্লভ হইতেছে হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? বড় লোকের ছেলে যাহারা, অথবা সাধারণ বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভা যাহাদের আছে—যাঁহারা সরকারী চাকরী পাইবে,—ওকালতীতে যাহাদের ভাতকাপড় হইতে পারে,—তারাই সুধু এত খরচ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া পড়ুক, সাধারণের পক্ষে তার এমন প্রয়োজন কিছু নাই।

তবে একটি কথা হইতে পারে এই যে ভদ্রলোকের ছেলেপিলেরা কি উচ্চ-শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? কেবল কি ব্যবসায়বাণিজ্যই শিখিবে আর লেখাপড়ায় মূর্খ হইয়া থাকিবে? তবে আর হইল কি ছাই? ইহার উত্তর আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত যে ভদ্রজনোচিত লেখাপড়া হইতে পারে না, এমন কোনও কথা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়েই বা এমন কি হয়? ছাত্রেরা প্রায়ই ত রাশি রাশি নোট্ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ হন। তাহাতে নোট লেখকগণের এবং পুস্তকব্যবসায়ীগণের অর্থলাভ যতই হউক, ছাত্রগণের বিদ্যালাভ যে বড় বেশী হয় তা বলা যায় না। তারপর যদি হয়ও, এই লব্ধবিদ্যার সার্থকতা কি থাকে? আলোচনা ব্যতীত কোনও বিদ্যা কাহারও মনে বেশী দিন জাগ্রত থাকে না। এক অধ্যাপনা ব্যতীত আর যে বৃত্তিই যিনি অবলম্বন করুন, সেই বৃত্তির উপযোগী যে বিশেষ বিদ্যা—তাই মাত্র তাঁহাকে পরিচালনা করিতে হয়,—তারই মাত্র অধিকার তাঁহার থাকে। উকিল আইনবিদ্যার, বিচারক বিচারবিদ্যার, চিকিৎসক চিকিৎসাবিদ্যার, কেরাণী কেরাণীবিদ্যারই, খবর রাখেন,—এ সবও নিজ নিজ বৃত্তির উপযোগী টেক্‌নিকাল বিদ্যামাত্র। সাধারণ যে বিদ্যা—তাহার পরিচালনা বা উচ্চ অধিকারে এরূপ কয়জনের মধ্যে দেখিতে পাই? এক ইংরেজি বাঙ্গলা উপন্যাসাদি এবং সংবাদপত্র সকলেই কিছু না কিছু পড়িয়া থাকেন। কিন্তু তাহা পড়িতে অধিক বিদ্যার আবশ্যক হয় না।

কতক পরিমাণে সাধারণ বিদ্যা ভদ্রসন্তান মাত্রেরই আবশ্যক। তাহা ব্যতীত ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে বলা যায় না, ভদ্রোচিত পরিমার্জ্জনাও তাঁহাদের হয় না। কিন্তু এই পরিমাণ বিদ্যা টেক্‌নিকাল শিক্ষার সঙ্গেও বেশ দেওয়া যাইতে পারে। সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, রাশি রাশি নোটবহির অনাবশ্যক জঞ্জাল হইতে বিমুক্ত রাখিলে, উচ্চতর টেক্‌নিকাল শিক্ষার সঙ্গে যে উচ্চতর বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, ভদ্রলোকের জীবনের পক্ষে তাহার মূল্যও নিতান্ত কম নহে। পরীক্ষায় পাশের জন্য নয়, কেবল জ্ঞানলাভের জন্য যে শিক্ষা, তার আরও বহু সহজ উপায় আছে। সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সহজবোধ্য পুস্তক প্রকাশ করা যাইতে পারে, লাইব্রারী ও ক্লাব স্থাপন করা যাইতে পারে, নানা বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতে পারে—ইহাতেও সহজে ও আনন্দে লোকে যাহা শিখিতে পারে, সে শিক্ষা ক্লান্ত মস্তিষ্কে নিদ্রালস চক্ষে নীরস নোটবহির ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা লাইন গুলি কণ্ঠস্থ করিবার অবিরত চেষ্টায় হয় না!

জাপানে রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের বাণী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর জাপানের টোকিয়ো ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটিতে সম্প্রতি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। এই সব বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ 'সঞ্জীবনী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম বক্তৃতা।

সাধারণ সভায় আমাকে যখন বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়, আমার মনে স্বভাবতঃই প্রবল অনিচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমি কবিতা রচনায় ব্যয় করিয়াছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কবিত্বরূপী পক্ষী একান্ত লজ্জাশীল, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতেই আপনার নীড় রচনা করিতে ভালবাসে। কিন্তু আমি যখন বুঝিলাম যে আপনাদের রাজ্যে আগন্তুক এই অতিথিটির প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া আপনারা আমাকে সভায় আহ্বান করিয়াছেন, তখন অতিথিরূপে এই অনুরোধে সম্মতি প্রকাশই আমি শোভন বলিয়া মনে করিয়াছি।

সমস্ত এসিয়াবাসীদিগের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার চিন্তাই আমার মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হইতেছে। যে অবসাদ মানবকে নিরাশার জালে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই অবসাদই তাহার নিকৃষ্টতম বন্ধন। আমাদের কর্ণে বারংবার এই কথাই ধ্বনিত হইতেছে যে, এসিয়া এখনো সেই প্রাচীন

যুগেরই মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এসিয়া মহাদেশ মৃতের সমাধিমন্দিরের ঐশ্বর্য্যই বিকাশ করিয়া থাকেন! পশ্চাতের দিকে এই মহাদেশ আপনার মুখ এমনভাবে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন যে উন্নতির পথে এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য ইহার নাই। আমরা এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

আমি জানি ভারতবর্ষের শিক্ষিতদের মধ্যে একদল এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা বৃথা অহঙ্কারের দ্বারা এই অভিযোগ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অহঙ্কারও মুখোসপরা লজ্জা, ইহারও আপনার প্রতি কিছুমাত্র আস্থা নাই।

যখন অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন আমরা এসিয়ার অধিবাসীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত ভাবিতাম, হাঁ সত্য সত্যই আমরা চিরদিনের মত মরিয়াই আছি।

এই সময়ে সহসা জাপানের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বহু শতাব্দীর জড়ত্ব ছুড়িয়া ফেলিয়া জাপান জাগিয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষিপ্রবেগে দৌড়িয়া সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমানের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানের এই জাগরণে আমাদের যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি যে কোন একটা দেশের অধিবাসীকে চিরকাল মরিয়া থাকিতে হইবে, ইহা সত্য নহে।

আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, এই এসিয়া মহাদেশে বৃহৎ শক্তিশালী অনেক রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মহাদেশে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য অসামান্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর বৃহৎ ধর্ম্ম সমূহের মাতৃভূমি এই মহাদেশ। সুতরাং এই মহাদেশের ভূমি ও জলবায়ুর মধ্যে এমন কিছু থাকিতেই পারে না যাহা মানবগণের শক্তি নাশ করিয়া উহাকে নিশ্চেষ্ট ও নির্বীর্য্য করিয়া ফেলে। পশ্চিমদেশ যখন গাঢ় অন্ধকারে নিদ্রিত ছিল, তখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পূর্ব্বদেশই সভ্যতার বর্ত্তিকা ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন স্মৃতি কোনও ক্রমেই মানসিক জড়তা ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন হইতে পারে না।

সেই গৌরবময় যুগের পরে এসিয়া মহাদেশ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সময়ের গতি যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অবরুদ্ধ হইল। তদবধি এসিয়া আর কোন নূতন আহার্য্য গ্রহণ করিতেছে না, পূর্ব্বসঞ্চিত আহার্য্যে তৃপ্ত হইয়া থাকিতেছে। স্তব্ধতাকে অনেক সময়ে মৃত্যু বলিয়াই মনে হয়। যে কণ্ঠ চিরন্তন সত্য ঘোষণা করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে কলুষতা ও বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে সেই মহাকণ্ঠ নীরব হইল। যে সত্য বায়ুমণ্ডলের মত ধরিত্রীর সরসতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা লুক্কাইত হইল।

জীবনের মধ্যে এককালে নিদ্রা ও জড়তা আসিয়া পড়েই। যে প্রাণ নূতন খাদ্য পায় না, ভাণ্ডারের পুরাতন খাদ্য সম্বল করিয়া আছে, সেই প্রাণ গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে। তখন ইহার মাংসপেশী শিথিল হয়, ইহা একান্ত অসহায় হইয়া পড়ে।

জীবন সঙ্গীতের ছন্দে উত্থান ও পতন আছে। সঙ্গীত খাদে নামিয়া আবার

নববলে উচ্চগ্রামে উঠিয়া থাকে। কর্ম্মসংগ্রামের আগুনে জীবন তাহার সমস্ত কাঠ খড় পোড়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এই অমিত ব্যয় সুদীর্ঘকাল চলিতেই পারে না। এইরূপ অবস্থার পরে নিশ্চেষ্টতার যুগ আইসে। তখন ব্যয়ের শক্তি ফুরাইয়া যায়। নূতন তেজসঞ্চয়ের জন্যই সকল প্রকারের কর্ম্মোদ্যম পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

হিসাব করিয়া চলাই আমাদের মনের স্বভাব। অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে আমরা ভালবাসি এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন পথ না খুঁজিয়া অভ্যস্ত রাস্তা দিয়া চলাফিরা করিতে মন ভাল বাসিয়া থাকে। মন ভাবকে চিরন্তন আকার দান করিতে চাহে। ভাবের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া তাহাকে নূতনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে মনের নিত্য প্রয়াস। আংশিকভাবে ইহার আবশ্যকতাও আছে। কারণ ভাবগুলিকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সুযোগ দিতে হইবে, সমস্ত বাধা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতা সমূহ শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের ভাবগুলিকে আকার দান করিয়াছেন। তাহাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অধ্যাত্মিক প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় সমস্যা সুনিশ্চিত আকারে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল ভাব মানবসভ্যতা-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। অবস্থার বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সত্য সমূহ নূতনভাবে পরীক্ষিত হইবে, লোকে সেই সকল সত্য ত্যাগ করিবে এবং বিস্মৃত হইবে। তখন আবার বিস্মৃতির ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে সত্য নববলে উৎসারিত হইবে।

হাঁ, তথাপি আকারপ্রাপ্ত ভাবরাজি মনকে অলস করিয়া ফেলে। মন তখন নূতন চেষ্টার দ্বারা সম্পদ বাড়াইয়া তুলিবার ক্লেশ স্বীকারে ভীত হয়। অভ্যাসের দুর্গ মধ্যে মন তাহার যাবতীয় সম্পদ আট্‌কাইয়া রাখিতে চাহে। এইরূপ করিবার ফলে মন কিন্তু তাহার আত্মসম্পদ সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহাই দৈন্য। জীবন্ত আদর্শ কদাচ জীবনের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনে ভীত হইবে না। সীমাদ্বারা নিরাপদে থাকিবার চেষ্টা করিয়া আদর্শ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। কর্ম্ম চেষ্টার নূতন অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ প্রকাশ্য রাজপথেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে।

এক শুভ প্রাতে সমস্ত পৃথিবী চাহিয়া দেখিল, জাপান এক রাত্রির মধ্যেই তাহার প্রাচীন অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিজয়ীর ন্যায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এমন অল্প সময় মধ্যে ইহা ঘটিল যে এই জাগরণকে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের মত অনায়াস বলিয়া মনে হইল, ইহা ইমারত নির্ম্মাণের মত মন্থর কর্ম্ম বলিয়া অনুভূত হয় নাই। যে মুহূর্ত্তে জাপান জাগিয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ পরিণতি, নবীনতা এবং অসীম প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রত্যক্ষ করা গেল। অনেকের মনে এইরূপ ভয় হইয়াছিল যে এই উত্থান একটা ঐতিহাসিক খেয়ালমাত্র, এই জাগরণ শিশুর খেলা, ইহা সাবানের ফেনার মত অন্তঃসার-শূন্য। জাপান প্রমাণ করিয়াছেন যে

তাহার অভ্যুদয় ক্ষণস্থায়ী বিস্ময়ের বিষয় নহে, অথবা প্রবল ঢেউয়ে ধুইয়া বিলুপ্ত হইবার জন্য অন্ধকারের অতল গর্ভ হইতে তিনি তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়ান নাই।

আসল সত্য কথা এই যে জাপান নূতন ও প্রাচীন দুই-ই। জাপান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচ্য সভ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই সভ্যতা মানুষকে আত্মার ভিতরে সম্পদ ও শক্তির সন্ধান করিতে বলিয়া থাকে। এই সভ্যতা মানুষকে এমন আত্মপ্রতিষ্ঠা দান করিয়া থাকে যে, কোন ক্ষতি কোন বিপদেই তাহাকে টলাইতে পারে না, কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়াই মানুষ আত্মদান করিতে পারে। এই সভ্যতার বলে মানুষ যে দৃষ্টিলাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা সে সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই দৃষ্টি লাভ করিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে সমস্ত বিশ্ব প্রাণে ভরিয়া রহিয়াছে, আত্মা সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। আমরা অনুভব করিয়াছি যে এই বিশ্ব ঘটনাচক্রের বিরাট দানবচালিত কল নহে, অথবা কোন সুদূর স্বর্গবাসী পরমেশ্বর এই বিশ্বের চালক নহেন।

এক কথায় বলিতে হইলে বলিব, সেই অতীত কালের প্রাচ্য সভ্যতার মধ্য হইতে জাপান সহজ-শোভনরূপে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন। যে অতলের গর্ভ হইতেই তিনি জাগিয়াছেন, সেইখানেই তাহার অচল প্রতিষ্ঠা।

জাপান প্রাচীন প্রাচ্য মহাদেশের দুহিতা হইয়াও অকুতোভয়ে বর্ত্তমান-যুগের সকল সম্পদ তাঁহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া, মনের জড়তা পরিহার করিয়া তিনি তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপে তিনি বর্ত্তমান সময়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তিনি বিস্ময়কর আগ্রহের সহিত আধুনিক সভ্যতার সমস্ত ঝুঁকি বরণ করিয়া লইয়াছেন।

জাপানের এই দৃষ্টান্ত সমস্ত এসিয়াবাসীকে অভয় ও উৎসাহ দান করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, প্রাণ ও শক্তি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছে। কেবল উহার উপরে সঞ্চিত ধূলিরাজি উড়াইয়া দিতে হইবে।

আমরা বুঝিয়াছি, মৃতদের মধ্যে আশ্রয় লইলে মৃত্যুই অনিবার্য্য এবং সাহস করিয়া জীবনের যাবতীয় ঝুঁকি পূরাপুরি স্বীকার করিয়া লইলেই জীবন লাভ হইবে।

জাপান আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন, বে আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সেই যুগের মূলমন্ত্র আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। জাপান তাহার এই বাণী সমস্ত এসিয়ায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পুরাতন সজীব বীজ নূতন যুগের মাটিতে বপন করিতে হইবে।

আমি কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, পশ্চিমের অনুকরণ করিয়া জাপানের যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে পারিয়াছেন। জীবন অনুকরণ করার মত জিনিষ নহে, শক্তিও চিরকালের নিমিত্ত সঞ্চয় করা যায় না। অনুকরণ দুর্ব্বলতারই একটা হেতু। আমাদের প্রকৃতির সহিত ইহার বিরোধ আছে, ইহা

সর্ব্বদাই আমাদিগকে বাধা দিয়া থাকে। অনুকরণ ঠিক একটা মরার চামড়ার পোষাকে সজ্জিত করা। এইরূপ সাজাইলে হাড়ের সহিত চামড়ার বিরোধ কোন কালেই মিটিতে পারে না।

আসল সত্য এই যে, বিজ্ঞান আর মানব প্রকৃতি এক জিনিষ নহে। জড় জগতের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি জানিয়া মানবের প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় না। জ্ঞান অন্য জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি ধার করিয়া লইবার জিনিষ নহে।

নূতন জ্ঞান যখন আইসে, তখন আমরা তাহা কেবল শিখি তাহা নহে, অনুকরণও করি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও শিক্ষার সহিত আমরা উক্ত দাতা শিক্ষকদিগেরও অনুকরণ করিবার নিমিত্ত দুঃসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সেই শিক্ষকগণ আমাদিগের ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনের মধ্যে জন্মলাভ করেন নাই। এইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে যাইয়া আমরা তাহাদিগের বাহিরের হাব-ভাব ও ভাবভঙ্গীর নকল করিয়াছি। সেই গুলি উক্ত শিক্ষকদিগের ঐতিহাসিক প্রকাশ বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু যে ভাবগুলি বিশ্বজনীন, ঐতিহাসিক নহে বৈজ্ঞানিক, সেই সকল ভাব এক জাতির নিকট হইতে আর এক জাতি শিখিয়া লইলে কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় বক্তৃতা।

শিক্ষার প্রারম্ভে আমরা যখন অনুকরণে প্রবৃত্ত হই তখন কোনটা মুখ্য, কোন্টা গৌণ, কোন্টা স্থায়ী কোন্টা অস্থায়ী, তাহা নির্ণয় করিয়া লইবার মত বিচার-বুদ্ধি আমাদের থাকে না। নৈসর্গিক পদার্থনিচয়ের যাদুশক্তির উপর আদিম মানবের যেরূপ অন্ধবিশ্বাস ছিল, এই অনুকরণ স্পৃহাও কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ, অবশ্য ইহার মধ্যে সত্য একেবারে নাই, তাহা নহে। ভয় এই যে, পাছে শস্য বাদ দিয়া আমরা ভূষি গলাধঃকরণ করি। যাহা মূল্যবান্ ও সারবান্, তাহাই আমরা বর্জ্জন করি। কিন্তু লোভীর মত পরম ঔৎসুক্য সহকারে আমরা যদি শস্য ও ভূষি সমস্ত গিলিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের পাকযন্ত্র যাহা স্বাস্থ্যকর তাহা হজম করিয়া অসার বর্জ্জন করিবে।

জীবনের লক্ষণ এই যে, সে আপনার প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া থাকে। যাহা গ্রহণ করিবে সে তাহার মত হইয়া উঠিবে এমন নহে, যাহা গ্রহণীয় তাহাকে সে আপনার মত করিয়াই গ্রহণ করিবে। যাহার জীবন আছে সে আপনার ভিতরে আহার্য্য দ্রব্য পুঞ্জীভূত হইতে দেয় না। হজম করিয়া তাহাকে একবারে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয়।

জাপান তাহার সভ্যতার খোরাক পশ্চিম হইতে আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আপনার মূল প্রকৃতি পাশ্চাত্য নহে। জাপান পশ্চিম হইতে ধার করিয়া যে সকল বৈজ্ঞানিক কলকারখানা আমদানী করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া তিনি স্বয়ং কলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেন না। তাহার আপনকার আত্মা আছে, সেই আত্মা বাহিরের সকল উপকরণের উপর আত্ম-

প্রাধান্য স্থাপন করিবেই। জাপান যে বাহিরের সমস্ত জিনিষ আপনার প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহার বিপুল শক্তিই উহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা বিশ্বাস করি যে, বৈদেশিক সভ্যতা অর্জ্জনের গর্ব্বে জাপান কদাচ আত্মশক্তির প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। এমন গর্ব্ব যদি থাকিত তাহা হইলে উহা দৈন্যে ও দুর্ব্বলতায় প্রকাশ পাইত। যে আড়ম্বর-প্রিয় বাবু, সেই তাহার মাথা অপেক্ষা মাথার নূতন টুপীটাকে মূল্যবান করিতে চেষ্টা করে।

জাপানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার এবং জাপান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত গঠন করিবার মত সুযোগ আমার হয় নাই; জাপান কি? তাহার শক্তি কোথায়? তাহার বিপদ কোথায়? পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়া আমার এই সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য স্বাভাবিক কৌতূহল আছে।

আধুনিককালের যাবতীয় সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়া পূর্ব্বদেশের এই মহাজাতি কিরূপ ভাবে সেই সমুদয়ের ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত পৃথিবী জাপানের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আছেন। জাপান যদি পশ্চিমের কোন শক্তিশালী রাজ্যের নূতন সংস্করণ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে পৃথিবীর আশা অপূর্ণ থাকিবে। ব্যক্তির সহিত রাজ্যের, মজুরের সহিত মহাজনের, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষজাতির, বাহ্যসম্পদলোলুপতার সহিত আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভের, সমগ্র মানবজাতির অত্যুচ্চ আদর্শের সহিত শক্তিমান্ জাতিসমূহের ব্যূহবদ্ধ স্বার্থপরতার চিরন্তন বিরোধ চলিতেছে। জাপানকে এই সকলের অচিন্ত্য-পূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, জলস্রোতের দ্বারা আনীত জঞ্জালরাশি সভ্যতা-প্রবাহিনীর গতিশক্তি রোধ করিয়া ফেলে। বিশ্বমৈত্রীর সদর্প অহঙ্কার করিয়াও কখন কখন সভ্যতা এমন বিকৃত হইয়া পড়ে যে তাহা আদিম যাযাবর জাতির বর্ব্বরতা হইতেও অপকৃষ্ট। আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতা স্বাধীনতার গর্ব্ব করিয়াও এমন হইয়া উঠে যে তাহা পুরাতন সমাজের হীন দাসত্ব হইতেও নিকৃষ্ট। কারণ এই দাসত্বের রজ্জু অদৃশ্য বলিয়া ইহা ভাঙ্গিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ, এই দাসত্ব স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার আকারে চলিয়া যাইতেছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে মানুষ হীন স্বার্থপরতার মোহিনী মায়ায় জীবনের উচ্চ আদর্শ বর্জ্জন করিয়া থাকে। আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতির পবিত্র হাওয়া হইতে বিযুক্ত করায় তাহারই চতুর্দ্দিকে যে সকল অপরিচ্ছন্ন বদ্ধ জঞ্জাল জমিয়া উঠে সে তাহার জীবনের আদর্শরাশি সেই গুলির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

এই জন্য আপনারা আধুনিক সভ্যতা তরলচিত্তে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারেন না। এবং ইহাও কল্পনা করিতে পারেন না যে, ঐরূপ গ্রহণ না করিলেই নয়। আপনারা এই সভ্যতাকে প্রাচ্য ধী-শক্তি, আধ্যাত্মিক বল ও সরল জীবনযাত্রার সহিত মিশাইয়া গ্রহণ করুন। কারণ আপনারা সভ্যতার যে দুর্গম রথ চালাইতেছেন, নূতন পথ দিয়া চলিবার সময়ে ঐ রথ

হইতে শ্রবণবিদারী কর্কশ স্বর উত্থিত হইতেছে, ঐ শব্দে অসামঞ্জস্যের বে-সুরই বাজিতেছে। এই রথচক্র চালাইবার জন্য মানুষকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা যতখানি ত্যাগ করিতে হইতেছে, তাহাও যথা সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী আপনারা আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অনুভব করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন, কার্য্য করিয়াছেন, পূজা অর্চ্চনা করিয়াছেন। এই সকল বিশেষত্ব কি জীর্ণবস্ত্রের মত বর্জ্জন করিবেন? এই সকল অভ্যাস আপনাদের রক্তে, মজ্জায়, দেহে ও মস্তকে রহিয়া গিয়াছে। আপনারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাহা কিছু গ্রহণ করিবেন তাহা এই সকলের দ্বারা নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক সময়ে আপনারা জীবনের সকল রহস্যের একরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন, আপনাদের দর্শনশাস্ত্র হইতে জীবনের সকল তত্ত্ব উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল। আপনাদের নূতন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় এই সকলের প্রয়োগ করুন। তাহা হইলে যাহা গঠিত হইবে তাহা এক নূতন সৃষ্টি হইবে।

চতুর্থ বক্তৃতা।

পশ্চিমের উপকরণরাজি আপন প্রয়োজন ও প্রতিভার অনুরূপ করিয়া গ্রহণের স্বাধীনতা এসিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানেরই আছে। সৌভাগ্যক্রমে বাহির হইতে কেহ জাপানকে বাধা দিতে পারেন না। এই জন্যই জাপানীর দায়িত্ব আরও বেশী। কারণ মানবের দরবারে পশ্চিম যে সকল প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন, জাপানেরই মুখ দিয়া সমস্ত এসিয়া মহাদেশ তাহার উত্তর দিবেন। পূর্ব্বদেশ আধুনিক সভ্যতাকে কিরূপ নবীন আকার প্রদান করিতে চাহেন, জাপানকেই তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে। নির্ম্মম ঔচিত্যের বা প্রয়োজনের দোহাই দিয়া কল যেখানে মানুষের হৃদয় দলন করিতেছে—শক্তি ও সফলতার নামে যেখানে সত্য ও সৌন্দর্য্য এবং জীবনের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সামঞ্জস্য উপেক্ষিত হইতেছে—সেই সকল ক্ষেত্রকে প্রাণের রসে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

যখন ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পূর্ব্ব এসিয়া ভারতবর্ষের সহিত স্বাভাবিক প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সেই গৌরবময় যুগের কথা আমি আপনাদিগকে স্মরণ না করাইয়া পারি না। এই প্রীতির যোগই জাতি-সমূহের মধ্যে একমাত্র স্বাভাবিক যোগসূত্র। তখন মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে জীবন্ত যোগ ছিল। মানব হৃদয়ের গভীরতম তত্ত্বগুলি সঞ্চালনের জন্য জাতিসমূহের যেন স্নায়বিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তখন আমরা এক জাতি অন্য জাতির ভয়ে আড়ষ্ট হইতাম না, কোনও জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইবার প্রয়োজন হইত না। তখন জাতিসমূহের মধ্যে তুচ্ছ স্বার্থের বন্ধন ছিল না, একজাতি অন্য জাতির অর্থ শোষণের কথা ভাবিত না; তখন প্রেমের অত্যুচ্চ ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান চলিত। ভাষা ও আচারব্যবহারের বৈষম্য এক জাতিকে অন্য জাতির সম্মুখীন হইতে বাধা প্রদান করিতে পারিত না।

শারীরিক বা মানসিক জাতীয় প্রাধান্যের গর্ব্ব পরস্পরের এই প্রীতির সম্বন্ধ

বিনষ্ট করিত না। সকলের সম্মিলিত হৃদয়ের সূর্য্যালোকে তখন সাহিত্য ও শিল্প পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিত; ভিন্ন দেশবাসী ভিন্নভাষাভাষী জাতি-সমূহ তখন মানবের এই শ্রেষ্ঠতম ঐক্য স্বীকার করিত।

আমাদের ইহা স্মরণ হইতেছে যে শান্তির যুগে যখন মানব প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তখন আপনাদের জাতি অমরতার সৌরভময় ঔষধি সঞ্চয় করিতে-ছিল। তাহারই প্রভাবে এই জাতি নূতন যুগে নব দেহে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আমি ইহা না মনে করিয়াই পারি না যে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া পুরাতন হইতে নবীন, দুর্ব্বল হইতে বলিষ্ঠ আকার প্রাপ্ত হইতে পারে। আপনাদের অন্তরের এই দেবত্ব বর্ত্তমান স্বার্থপরতা, বিকট কলকারখানা, এবং রাষ্ট্রীয় কপটতার মধ্যে জন্মলাভ করে নাই। এই সুসংযমণ্ডিত মনুষ্যত্ব যখন জন্মলাভ করিয়া-ছিল, তখন স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন আপন আত্মার প্রতি মানবের গভীর বিশ্বাস ছিল।

আমরা ভারতবাসী। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র পৃথিবী। ভারতের সমস্যা সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা। ভারতবর্ষ আয়তনে সুবিস্তৃত এবং তথায় নানা বিচিত্র জাতির বাস। একটি মাত্র ভৌগোলিক আধারের মধ্যে বহুদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত, তথায় একটি দেশকে নানা-জাতি ভাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্ত ইউরোপের সভ্যতার বিকাশমধ্যে যেমন বহুর শক্তির সমন্বয় দেখা যায়, তেমনই একের শক্তিও প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য পক্ষে ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ বহু হইয়াও, বৈদেশিক শাসনে এক। এই জন্য ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল হইতে বহুত্বের বিচ্ছিন্নতা এবং একত্বের দৌর্ব্বল্য হইতে ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। প্রকৃত ঐক্য গোলকের মত আপনার সমস্ত বোঝাসহ অনায়াসে আত্মবলে চলিতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই বৈচিত্র্য তাহার আত্মসৃষ্ট নহে, ইতিহাসের প্রারম্ভ কাল হইতেই ইহা এমনি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ তত্রত্য আদিম অধিবাসীমূহের বিনাশসাধন করিয়া সমস্যা সরল করিয়া লইয়াছে। এই বিনাশ-বুদ্ধি কালিফোর্ণিয়া, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় এখনও প্রকারান্তরে বিদ্য-মান আছে; তাহারা এখন আপনাদের রাজ্যে বিসদৃশ জাতিদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না; অথচ যে মাটিতে বাস করিতেছেন তথাকার আদিম অধিবাসীদের নিকটে তাঁহারাই এক সময়ে ভিন্ন জাতি ছিলেন। ভারতবর্ষ চিরকাল এই জাতি-বৈষম্য সহিষ্ণুতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ সহিষ্ণুতা ভারত ইতিহাসে চিরকাল কার্য্য করিয়াছেন।

জাতি-বৈষম্যই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণ। একই শাসন ভিন্ন নানা জাতির স্বাভাবিক ঐক্যানুভূতির আর কোনও বন্ধন ভারতে নাই। পৃথিবীর যে সকল রাজ্য আয়তনে অপরিচালনীয় হইয়া উঠিয়াছে, আজি হউক, আর বিলম্বে হউক, তাহাদিগেরও এইরূপ বিপদ ঘটিবেই।

সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে কখন বহুর উপর একের শাসন প্রচলিত ছিল না। ভারতবর্ষ নানা সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।

পঞ্চম বক্তৃতা।

ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি।

নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনেব চেষ্টা করায় ভারতবর্ষে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার নাম হিন্দুত্ব, কিন্তু কোন সংজ্ঞাদ্বারা ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহার আশ্রয়ে নানা বিরুদ্ধ মত, আচার ও প্রথা স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সমগ্র ভারতব্যাপী একটি অনির্দ্দেশ্য সূক্ষ্ম সত্য প্রসারিত হইয়েছে। উহাকে সন্দেহ বা অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। এই সত্য কোথায় বসতি করে তাহাই জ্ঞাতব্য। এই সত্য ক্রিয়াকাণ্ড বা আচার পদ্ধতির মধ্যে নাই, ইহা ভাবের মধ্যেই রহিয়াছে। এই ভাবের প্রেরণাতেই বাঙ্গালী মান্দ্রাজীকে তাহার হিন্দুভাই বলিয়া গ্রহণ করেন, বাহ্যতঃ বাঙ্গালীর সহিত মান্দ্রাজীর অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

আমার মনে হয়, এইখানে জাতিগত বৈষম্যের সমাধান মানব ইতিহাসের একটি বৃহৎ জটিল প্রশ্ন। জাতি ও সম্প্রদায়গত বিচিত্রতা থাকিবেই থাকিবে। অতি ভীষণ অনর্থ না ঘটাইয়া আমরা কোন প্রকার বল খাটাইয়া এই স্বাভাবিক বৈষম্য দূর করিতে পারিব না। সামান্য বৈষম্যকেও মানুষের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে, ক্ষুদ্র মানুষের বৈষম্যকে শ্রদ্ধা করা সঙ্গত। ঐ সকল বৈষম্যের ভিতর দিয়াই ভাবগত ঐক্য সর্ব্বদা কার্য্য করিতে থাকিবে। এই ঐক্যের মূলে মানবের অধ্যাত্ম বোধ নিহিত আছে। অধ্যাত্ম বোধের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে বিশ্বমানব নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইলেও তাহার একখানিমাত্র অখণ্ড বৃহৎ ইতিহাস আছে। এই আধ্যাত্মবোধই আমাদিগকে জোরের সহিত বলিয়া থাকে যে যাহারা আমাদিগের সগোত্র নহে তাহাদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। কারণ এই স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ফলে জাতি সমূহ যাহা যাহা লাভ করিবে, সেই সকল লাভ বিশ্বমানবের ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যই বাড়াইয়া দিবে।

ইয়ুরোপের ভূখণ্ড হইতে যে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া আগাছার মত পৃথিবী আবৃত করিয়া ফেলিতেছে, ঐ সভ্যতার মূল কথা বর্জ্জন। উক্ত সভ্যতা অতি সতর্কতার সহিত বিসদৃশ জাতিসমূহকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। এই সভ্যতার গতি নরমাংস-লোলুপতার দিকে। এই সভ্যতা অপর জাতি সমূহের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য গ্রাস করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি গ্রাস করিতে চাহে। যে সকল জাতি তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতেছে, তাহাদিগকে বিপদের হেতু মনে করিয়া এই সভ্যতা ভীত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে চাপিয়া চিরদুর্ব্বল করিয়া রাখিতে চাহে।

এই রাষ্ট্রীয় সভ্যতা বলিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী গ্রাস করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদন করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে যুদ্ধ, মারামারি, রাজত্বের বিপর্য্যয় এবং আনুসঙ্গিক দুঃখ দারিদ্র্য সমস্তই ছিল; কিন্তু তখন কেহ এমন ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নাই—এক জাতি অন্য এক জাতিকে কলের দ্বারা মাংসখণ্ডে পরিণত করিয়া লোভীর মত গিলিয়া ফেলিতেছে। যেরূপ হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী এক জাতি অন্য জাতির নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া টানা-হেচড়া করিয়া গলাধঃকরণ করে, সেরূপ হিংসার উৎকট নখর দন্ত কেহ তখন প্রত্যক্ষ করে নাই।

এই রাষ্ট্রীয় সভ্যতা যান্ত্রিক, হৃদয়সম্পন্ন নহে। এই সভ্যতা শক্তিসম্পন্ন, কারণ ইহা ধনলুব্ধ হৃদয়শূন্য ক্রোড়পতির মত একটিমাত্র অভিপ্রায় সাধনের দিকে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

এই সভ্যতা ইহার উপর অভিন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করে, মিথ্যার জাল বয়ন করিয়া থাকে, মন্দিরে অর্থলালসার উচ্চ বিগ্রহরাজির প্রতিষ্ঠা করে, উপাসনার নামে ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গর্ব্বিত হয়, এবং সকল কর্ম্ম স্বদেশ প্রেমের নামে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবিষ্যৎবাণী।

এই ভবিষ্যৎবাণী অসঙ্কোচে ঘোষিত হইতে পারে যে এইরূপ সভ্যতা চিরকাল চলিতেই পারিবে না। নৈতিক নিয়ম যেমন ব্যক্তির জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি এই নৈতিক নিয়ম সুগঠিত জাতিসমূহের উপরও কার্য্য করিয়া থাকে। তোমরা জাতির নামে এই সকল নৈতিক অমোঘ বিধি লঙ্ঘন করিয়া কদাচ ব্যক্তিগত সুবিধা সম্ভোগ করিতে পারিবে না। এই নৈতিকবিধি লঙ্ঘন করিয়া জাতি যাহা করিতেছে, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া প্রত্যেককেই দুর্ব্বল করিয়া দিবে। আর এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই রাষ্ট্রীয় সভ্যতা এখনও সুদীর্ঘ পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া আইসে নাই। গ্রীসের সভ্যতার বাতি যেখানে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই খানেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও চীন—এই দুই রাজ্যের সভ্যতার মূলে সমাজ ও আধ্যাত্মবোধ ছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত উক্ত দুইটি সভ্যতা বাঁচিয়া আছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার তুলনায় এই দুইটি একান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভূত হইবে, তবুও এই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রাণরস প্রচ্ছন্ন আছে। কালক্রমে স্বর্গ হইতে বারিধারা বর্ষিত হইলে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া পুষ্পিত ও পত্রিত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে। কিন্তু যাহার মধ্যে প্রাণ নাই সেই কল কারখানা ভাঙ্গিলে বারিবর্ষণে উহার কোন সুফল ফলিবে না। যাহা প্রাণের এবং চিরন্তন বিধির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তাহার ধ্বংশাবশেষ বিদ্রোহের স্মৃতিই বহন করিবে।

বর্ষা আবাহন।

—*—

শুষ্ক ভূমি সিক্ত করি
ঢালি পীযূষ জলধারা
বরষা আসে নীরদ পরি
বাজে বিমানে সুর-কাড়া।
বরণ করি পরাণ পণে
ধরিয়া হাতে হেম ঝারী,
এয়োর মত তটিনী গণে
আনে বরষা শুভ বারি।
নবীন ঘাসে মহীর পীঠে
পড়িল চারু আলিপন,
ধূপের মত গন্ধ মিঠে
করে ধরণী বিকীরণ।
পবন বহে গন্ধ বাসে
বীজন রত তাল তরু।
হরষ হাসে বরষা আসে
সিঞ্চিবারে ধরা মরু।
গভীর যেন শ্রান্তি ভরে
কাযের সব অবসান,
তিমির চিরি বিজুরী করে
নব চেতনালোক দান।
শীতল রসে ধরা সরসা
জীবন 'প্রিয় প্রিয়' করে—
আয় নয়নে প্রেম বরষা
'প্রিয়াৎ প্রিয়তর' তরে!

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোহিনুর।

'কোহিনুর' নাম এদেশের অধিকাংশ লোকেরই পরিচিত। ইহা একখানি স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ হীরক, যেমন বৃহদাকার ও দৃষ্টিরম্য, তেমনই নির্ম্মল ও জ্যোতিষ্মান্, এবং ইহার বিবরণও আবার ততোধিক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা নানা স্থান—নানা ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রভৃতি হইতে কোহিনুরের আমূল ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া, আমাদিগের পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

কোহিনুরের নামতত্ত্ব।

'কোহিনুর' ভারতীয় নাম নহে—হিন্দী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশীয় কোন ভাষার কোন শব্দও নহে, পারসিক ভাষার একটি যৌগিক অর্থাৎ বিভিন্ন দুইটি শব্দের সমবায়ে সংঘটিত শব্দ মাত্র। সেই শব্দদ্বয়ের একটি 'কোহ' এবং অপরটি 'নুর'। আর মধ্যে সংযোজক পদ 'ই'। পারস্য ভাষায় 'কোহ' অর্থে পর্ব্বত এবং 'নুর অর্থে আলোক বুঝায়। এজন্য কোহিনুর নামের প্রকৃত অর্থ 'আলোকময় পর্ব্বত'। যে প্রথিতনামা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রস্তর খণ্ড হইতে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহাই কোহিনুর। সুতরাং যাঁহারা কোহিনুরের পারসিক নামে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা অনায়াসেই ইহাকে, 'দীপ্তিশীল প্রস্তর', 'জ্যোতির্গিরি', 'জ্যোতিঃশেখর', প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে পারেন। যাহা হউক, কোহিনুরের এই পারসিক নাম শ্রবণ করিয়া, কেহ কেহ ইহাকে পারস্যদেশজাত হীরক বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু সে অনুমান ভ্রমাত্মক। অধুনা নানা অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কোহিনুর ভারতজাত হীরক। ইহা ভারতীয় আকর হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতীয় নৃপতিদিগেরই কিরীটমণি রূপে বিরাজ করিত। সুতরাং আদি-কাল হইতেই যে ইহার নাম কোহিনুর ছিল, তাহা কথনই স্বীকার্য্য বা সম্ভাব্য নহে। অবশ্যই ইহার একটি ভারতীয় নাম ছিল, আর সেই নামেই ইহা এদেশে পরিচিত ও সম্মানিত হইত। কিন্তু সেই নাম যে কি, তাহা অবধারণ করা এখন আর সহজ নহে—সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এখন কথা হইতেছে—ভারতীয় জ্যোতির্গিরি এই বৈদেশিক কোহিনুর নাম কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল—কে বা কাহারা ইহাকে, ইহার পূর্ব্ব নাম, ভারতীয়

আখ্যা রহিত করিয়া দিয়া, এই পারসিক অভিধানে অভিহিত করিল? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন নহে, আর তজ্জন্য আয়াস স্বীকারেরও প্রয়োজন হয় না। আমরা যথাস্থলেই ইহার সদুত্তর দান করিয়া পাঠকপাঠিকার আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিব।

কোহিনুরের প্রাচীন কাহিনী।

ভারতবর্ষ চিরদিনই রত্নপ্রসূ। অতি প্রাচীনকালে, যখন পৃথিবীর অপর কোনও দেশে হীরকের নাম পর্য্যন্তও কেহ পরিজ্ঞাত ছিল না, তখন ভারতবর্ষের খনি হইতে হীরক উত্তোলিত হইত, এবং ভারতের রাজামহারাজারা হীরকখচিত মুকুট ধারণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। ভারত-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, সেকালে হৈম (হিমালয়), মাতঙ্গ (কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীতটস্থ প্রদেশ), সুরাষ্ট্র, কলিঙ্গ (উৎকল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান), পৌণ্ড্র (ছোটনাগপুর অঞ্চল), বেণগঙ্গা, সৌবীর (সিন্ধু ও সর্হিন্দ ভূভাগ) এবং কোশল (অযোধ্যা) প্রভৃতি স্থানে হীরকের আকর ছিল। আর মাতঙ্গ, কলিঙ্গ ও পৌণ্ড এই স্থান ত্রয়ের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের কার্ণুল, কদাপা, গোলকুণ্ডা, নাগপুর ও সম্বলপুর প্রভৃতির খনি হইতে যে বৃহদাকার হীরকরাজি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহারাই উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর রত্নরূপে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিল। সে অবস্থায় কোহিনুরের সদৃশ প্রাচীন ও প্রকাণ্ড হীরকের সমুৎপত্তি যে এই ভারত-বর্ষ ব্যতীত আর কোথাও সম্ভবপর নহে, তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে! এখন এই কোহিনুরের সহিত, আধুনিকের ন্যায় প্রাচীনের কোনও সম্পর্ক আছে কি না এবং যদি থাকে তবে তাহা কতদূর ঘনিষ্ঠতর তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই তিনটি অমূল্যরত্নের বিবরণ পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। উহাদের প্রথমটি বিষ্ণুবক্ষ-বিরাজিত রত্নরাজ 'কৌস্তভ,' দ্বিতীয়টি দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত 'স্যমন্তক', এবং তৃতীয়টি শ্রীরাধিকার শিরোরত্ন 'চূড়ামণি'। হিন্দুশাস্ত্র মতে কৌস্তভ নিত্যসিদ্ধ মহামণি, বৈকুণ্ঠের সম্পদ। এই মায়াময় অনিত্য সংসারে উহার অবস্থিতি সুতরাং অসম্ভব, আর তজ্জন্য উহার আলোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু স্যমন্তক ও চূড়ামণি পার্থিব রত্ন—পৃথিবী হইতেই উহাদের উৎপত্তি এবং পৃথিবীতেই উহাদের বৃদ্ধি ও পরিণতি। সত্রাজিৎ রাজা সূর্য্যের আরাধনা করিয়া স্যমন্তক

মণি লাভ করেন এবং নানা ঘটনা বৈচিত্রের পর শেষে উহা শ্রীকৃষ্ণের হস্তগত হয়। চূড়ামণি পূর্ব্বে শঙ্খচূড় নামা এক যক্ষের চূড়ামণি রূপে বিরাজ করিত। সে একদা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ঈশান-দিগ্‌বর্ত্তী 'রত্ন-সিংহাসন' নামক স্থানে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত 'হোলী' ক্রীড়া নিরতা শ্রীরাধিকা প্রমুখ গোপীগণকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন এবং তাহার সেই ভাস্বর শিরোরত্ন চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া, অগ্রজ বলরামের হস্তে প্রদান করেন। কিন্তু বলরাম উহা নিজে না রাখিয়া রাধিকাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ভারতের দুই প্রধান রত্ন—স্যমন্তক ও চূড়ামণি - শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের লীলাবসানে উক্ত মণিদ্বয়ের কোন সংবাদই শুনিতে বা কোনও গ্রন্থাদিতে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তাঁহা-দিগের সমকালে অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ এক অনিন্দ্যসুন্দর ও প্রোজ্জ্বল মণি-নিবদ্ধ শিরোকিরীট ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই মণিই সেই কৃষ্ণহস্তস্থ মণিরাজ স্যমন্তক। কোনও যদুবংশীয়ের হস্ত হইতে ঘটনাসূত্রে উহা অঙ্গরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল,—অথবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার অনন্যসাধারণ দাতৃত্বের, পূণ্যপূত ত্যাগব্রতের পুরস্কার রূপেই তাঁহাকে সেই মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কর্ণের মণিকুণ্ডল সহ জন্মগ্রহণের কথাও আবার মহাভারতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, যেরূপেই হউক, মহাবীর কর্ণ যে একটি অমূল্য মণির অধিকারী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই মণিই যে স্যমন্তক বা চূড়ামণি, আর উহাই যে উত্তর কালে কোহিনুর নামে পরিচিত হইয়া, দ্বাপরের ন্যায় এই কলিযুগেও অশেষ গৌরব গরিমা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। আর তাহা না হইলেও—স্যমন্তক বা চূড়ামণি এবং কর্ণাধিকৃত মণি অভিন্ন না হইলেও, শেষেরটিই যে আমাদের এই কোহিনুর, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে।

অঙ্গাধিপতির অধিকৃত মণিই যে মণি কোহিনুর তাহা অনেক বৈদেশিক পণ্ডিতও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার সার লেপেল গ্রিফিন্ আবার ইহাকে রাজা যুধিষ্ঠিরের শিরোরত্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্যমন্তক বা চূড়ামণি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনেকটা সম্ভবপর হইয়া পড়ে। পাণ্ডবেরা কোনও প্রথিতনামা মণিরত্নের অধিকারী ছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ নাই।

সুতরাং এরূপ কথা যদি প্রমাণিত হয় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির, এক ভাস্বর মণিভূষণে আপনার রাজমুকুট বিশোভিত করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সেই মণিই যে স্যমন্তক তাহাতে কোনও সংশয় থাকে না। সেরূপ মহাযুদ্ধের সময়ে পাণ্ডবগণের পরমহিতৈষী ও আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠিরের গৌরব বর্দ্ধনে সচেষ্ট হইবেন, আপনার পরম প্রিয় স্যমন্তক দিয়া তাঁহার শিরোস্ত্রাণের শোভা বাড়াইয়া দিবেন, তাহা যেন অনেকটা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই—একজন বৈদেশিক গ্রন্থকারের অনুমান ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তকদানের কি রাজা যুধিষ্ঠিরের মণিধারণের কোনও কথাই শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন ইংরেজ লেখক আবার বলিয়া গিয়াছেন,—"কোহিনুর গোলকুণ্ডা প্রদেশের কৃষ্ণানদীর তটবর্ত্তী এক মৃদঙ্গারের আকরেই আবিষ্কৃত হয়। ইহা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গরাজ কর্ণের অধিকারভুক্ত ছিল।" একথা কিয়দংশে যথার্থ হইলেও সর্ব্বাংশে নহে। কারণ অধুনা, নানা বিচার বিতর্কের পরে, ইহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অঙ্গ দেশাধিপতি কর্ণ সেই যুদ্ধের এক জন প্রধান নেতা ছিলেন। সুতরাং তিনি ৩,৩৪৫ তিন হাজার তিনশত পঁয়-তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের লোক। আর তজ্জন্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে কোহিনুর থাকা নিতান্তই অসম্ভব। এ সম্বন্ধে উজ্জয়িনীর ইতিহাস-বর্ণিত বিবরণই প্রামাণিক। সেই বিবরণ এইরূপ,—"কোহিনুর পঞ্চসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের পবিত্রসলিলা গোদাবরী নদীর গর্ভ মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। ইহা এক সময়ে অঙ্গদেশের রাজা স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাবীর কর্ণের রাজমুকুটে বিরাজ করিত। তিনি এই মণি শিরে ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তারপর খ্রীষ্টাব্দের সপ্ত পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই অমূল্য রত্ন উজ্জয়িনীর প্রথিতযশা ও ভারত বিশ্রুত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কিরীটমণি রূপে পরিগণিত হইয়াছে।" অধুনাতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্যের কাল নিরূপণ বিষয়ে যে অভিনব তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কিছুতেই আর তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ব্যতীত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। তবে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী অপর কোনও উজ্জয়িনীপতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে, প্রাগুক্ত মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ইনি যে

বিক্রমাদিত্যই হউন, কোহিনুর যে বিক্রমাদিত্য উপাধি বিশিষ্ট কোনও উজ্জয়িনী রাজের করায়ত্ত হইয়াছিল এবং তিনি যে অতি প্রাচীন কালের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে প্রথমে তাঁহার বংশধরগণ এবং তৎপরে হর্ষবর্দ্ধনদেব ও তদ্বংশীয় রাজারা যথাক্রমে মালবের আধিপত্যসহ কোহিনুর মণি উপভোগ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে কতদিন ধরিয়া, রাজ্যসহ এই মণি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিশদ বিবরণই কোনও গ্রন্থে বর্ণিত নাই। যাহা হউক, পরিশেষে ঘটনাচক্রে মালব সহ কোহিনুর মণি পরমার বংশীয় রাজপুতদিগের হস্তগত হইল এবং প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে তাঁহারা ইহা ভোগ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন, আর তজ্জন্য কোহিনুরও তাঁহাহিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং পাঠান নৃপতিগণ দিল্লীর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দৃপ্ততেজে ভারতের রাজদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও মুসলমান ভূপতিই কোহিনুরলাভে প্রয়াসী হন নাই, অথবা কেহ কেহ হইলেও, সৌভাগ্যদেবীর অপ্রসন্নতা বশতঃ, তদধিকারে সমর্থ হইতে পারেম নাই। তবে ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনই যে কেবল এক হিন্দুজাতির প্রতি প্রসন্না রহিবেন, আর কোনও জাতিই তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইবে না,—তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, বিধাতারও তাহা অভিপ্রেত নহে। কাজেই তাঁহার অপক্ষপাত অনুগ্রহ হিন্দুদিগকে ত্যাগ করিয়া মুসলমান জাতির উপরে পতিত হইল, আর তৎসহ রত্নশ্রেষ্ঠ কোহিনুরও হিন্দু নরপতিদিগের হস্ত-স্খলিত হইয়া বিজেতা মুসলমানদিগের শিরোমুকুট সমুদ্ভাসিত করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅঘোর নাথ বসু কবিশেখর।

"পুরুষ ও নারী।"

বলিছে পুরুষ—"শ্রেষ্ঠ জন্ম পুরুষ রতন।
নারীমাত্র গৃহ মাঝে দাসী বৃত্তি করে।"
স্নিগ্ধস্বরে নারী করে উত্তর তখন—
"অপূর্ণ জগৎ নারী পরিপূর্ণ করে॥"

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ।

মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ।

পিতৃস্নেহ টেনে আনে কর্ম্মের মাঝারে,
মাতৃস্নেহ—জেগে রয় গোপন অন্তরে।
পিতৃস্নেহ—কর্ম্মরত বাহির সংসার
মাতৃস্নেহ—ক্ষুদ্র, শান্ত কুটীর আমার।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র খাঁ।

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

২। চীন ও ভারতবাসীর প্রথম পরিচয়।

একদিকে "প্রাচীন চীন নিশিদিন কর্ম্ম অনুরত," অন্যদিকে মোক্ষাভিলাষী ভারতবর্ষ। দোঁহার জীবনস্রোত দুই বিভিন্নখাতে প্রবাহিত হইতেছিল। তারপর কখন কোন্ সূত্রে কি প্রকারে এই দুইটি সুদূরস্থ দেশবাসীর প্রথম পরিচয় সংঘটিত হইল, দুই দেশের সভ্যতার প্রভাব দুইদেশের ইতিহাস কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—তাহার আলোচনা ইতিহাসপাঠকের আনন্দপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ নহে কি? খৃষ্টাব্দের বহু বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবাসীরা বাণিজ্য করিতে জল ও স্থল পথে নানাদেশে যাতায়ত করিতেন। এই বাণিজ্য ব্যবসায় হইতেই চীন ও ভারতবাসীর আদি পরিচয় সংঘটিত হইয়াছিল কি?

চীনেরা কোন সময় হইতে বিদেশীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক সুদূর অতীতের অন্ধকার গর্ভে চলিয়া গিয়াছেন। সার হেনরি ইয়ুল চীনের জ্যোতিষ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া চীন ও ভারতবাসীর জ্যোতিষগণনা পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে, এই দুই জাতি যে অতি পুরাকাল হইতেই পরস্পরের সংস্রবে আসিয়াছিল সে কথার উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিচয় কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ তিনি হাজার অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। *

সংস্কৃত সাহিত্যে নানাস্থানে চীনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনু তাহার সংহিতায় চীনজাতিকে "পতিত ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে দেখিতে পাই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত যে সকল সৈন্যসহ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একদল ছিল চীন। কাব্যামোদী পাঠক কালিদাসের চীনাংশুকের পরিচয় জানেন। পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে, নানাতন্ত্রে,

* "There is in a part of the astronomical systems of the two (হিন্দু ও চীন) the strongest implication of very ancient communication between them, so ancient as to have been forgotten even in the far-reaching annals of China".

—"Cathay and the Way Thither"
P. XXXIV. by Sir Henry Yule, R.C.E.B., K.C.S.I.

"চীন," "মহাচীন," "চীনাচার" প্রভৃতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।*— এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত গ্রন্থকারদের সময়ের ভারতবাসীরা চীনজাতি এবং চীনদেশের পরিচয় অবগত ছিলেন। এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থ, অবশ্য বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। মনুসংহিতা খুব পুরাতন গ্রন্থ কিনা, উহা কতদিনের পুরাতন—ইত্যাদি বিষয়ের কোন সুমীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রকাশের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। কেহ বলেন মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, কেহ বলেন উহা পরবর্ত্তী। এ কথাও উঠিবে যে মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বের গ্রন্থ হইলেও, উহার মধ্যে যে ঐ চীন ইত্যাদি শব্দ সমন্বিত শ্লোক—উহা প্রক্ষিপ্ত কি না? আমাদের পুরাণ সংহিতায় যে বিস্তর ভেজাল মিশিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় কি? এ স্থলে উল্লিখিত গ্রন্থাদির রচনাকাল লইয়া মীমাংসার সম্ভাবনাশূন্য তর্ক তুলিবার আবশ্যক নাই। খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে চীন ও ভারতবাসী পরস্পরের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাহার বহু নিদর্শন অন্যত্র বিদ্যমান আছে।

* শনকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ডকাশ্চোড্র দ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ॥
—মনু সংহিতা, ১ম পরি, ৪৩-৪৪ শ্লোক।

স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চবৃতঃ প্রাগ জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৬শ অধ্যায়, ৯ম শ্লোক।

কাশ্মীরন্তু সমারভ্য কামরূপাৎ তু পশ্চিমে।
ভোটান্ত দেশো দেবশি মানসেশাচ্চ দক্ষিণে॥
মানসেশাদ্দক্ষপূর্ব্বে চীনদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
—শক্তিসঙ্গম তন্ত্রম্।

সব্রহ্মজ্ঞ সবেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী সদীক্ষিতঃ
চীনাচারক্রমাচারৈর্যোযজেৎ তারিণীং নরঃ।
—চীনাচার প্রয়োগ বিধিঃ।

মহাচীনাদি তন্ত্রাদি অধিকন্নে মহেশ্বরি।
সুসিদ্ধানি বরারোহে রথক্রান্তা সুভূমিষু।
—মহাসিদ্ধি সারতন্ত্রম্।
তন্ত্রের এই শ্লোকত্রয় শব্দকল্পদ্রুম হইতে গৃহীত।

কিন্তু একটি কথা—সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত চীন বর্ত্তমান চীনের পূর্ব্বপুরুষ কিনা ? স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—"শাস্ত্রোক্ত চীনাজাতি বর্ত্তমান 'চীনেমান' নয়, *·········ওরা ত সে কালে নিজদের চীন বলতই না। চীনে বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্বভাগে ছিল।" +

শাস্ত্রোক্ত চীন এবং বর্ত্তমান চীন এক কিনা তাহা জানা আবশ্যক। স্বামীজির উক্ত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমরা পরে এ কথার আলোচনা করিতেছি।

চীনেরা "সে কালে নিজেদের চীনে বল্‌তই না"—একথা ঠিক। তবে কিরূপে কখন চীনেরা আপনাদিগকে চীন বলিয়া জানিল ? কে বা তাহাদিগকে এই চীন নাম অর্পণ করিল ?

যেমন "হিন্দু" এই নামে আমরা প্রথমে বিদেশীর নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম এবং পরে আমরাই উহা আমাদের জাতি এবং ধর্ম্মের নামরূপে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, তেমনই "চীন"—এই আখ্যাটি চীনের অধিবাসীবৃন্দের নামরূপে বিদেশীরা, আমাদের এই ভারতবাসীরাই, সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের প্রদত্ত 'চীন' এই অভিধানটি কিরূপে চীনেরা আপনাদের জাতির পরিচায়ক নামরূপে গ্রহণ করিল, ঐতিহাসিকেরা তাহা লইয়া নানারূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

মনুসংহিতা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন চীন শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনই চীনপ্রবাসী ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা চীনভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থানুবাদ কালে নানাস্থানে চীন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতীয় আচার্য্যদের অনূদিত চীন গ্রন্থ হইতে চীনবাসীরা আপনাদের জাতিবাচক 'চীন' নামটি গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ভিক্ষুরা প্রথমতঃ যে রূপে, যে অক্ষরে চীন শব্দটি লিখিতেন, তাহা হইতে বুঝা যায় উহা কোন প্রদেশের নাম হইতেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে চীন শব্দটি একটি প্রদেশ বিশেষের নাম জ্ঞাপক ছিল, পরে ঐ প্রদেশের রাজবংশ ঐ নাম আপনাদের বংশের নামরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে পরে উহা হইতেই সমগ্রদেশ, সমগ্রজাতি, 'চান' এই সাধারণ নামে খ্যাতিলাভ করে।

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

\+ কাশ্মীরস্তু সমারভ্য কামরূপাৎ তু পশ্চিমে।
ভোটান্ত দেশো দেবেশি মানসেশাচ্চ দক্ষিণে॥
মানসেশাদ্দক্ষ পূর্ব্বে চীনদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

শক্তি সঙ্গম তন্ত্রম্।

চীনদেশে "জীন" (Dzin) নামক একটি পরাক্রান্ত করদ রাজ্য ছিল; ক্রমশঃ রাজ্যের নামানুসারে রাজবংশ "জীন" নামে অভিহিত হইতে থাকে (২৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)। বর্ত্তমান সেন-সি এবং কন-সু প্রভৃতি স্থান জীন (Dzin) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বাণিজ্যব্যপদেশে সমরখণ্ড, পারস্য এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্যবসায়ীরা এই রাজ্যে আগমন করিত। অনেকে অনুমান করেন যে ভারতীয় বণিক এবং ভিক্ষুবৌদ্ধেরা এই রাজ্যের সহিত নানা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং তাহারাই ঐ রাজ্য এবং রাজবংশের জীন নাম হইতে সমগ্র দেশ ও জাতিকে চীন নামে অভিহিত করিয়াছে।

"চীন" (Ts'in) নামক আর একটি রাজবংশ ২৬৫ খৃষ্টাব্দে চীনের অপর একটি প্রদেশে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন,—এই রাজবংশের নামানুসারেই ভারতবাসীরা সমগ্রদেশ ও অধিবাসীবৃন্দকে চীন এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছে।

এইস্থানে এই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে যে,—যদি জীন প্রদেশ বা রাজবংশের নামানুসারে ভারতীয় বণিকেরা চীন নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে পুরাণ-সংহিতায় চীন শব্দের যে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দিতে ঐ সকল গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছিল? আর যদি "চীন" (Tsin) বংশের নামানুসারে ভারতীয় বণিক এবং ভিক্ষুপ্রচারকের চীন দেশের নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবেও কি উক্ত গ্রন্থাদিতে ঐ ঐ শ্লোক খৃষ্টাব্দের ৩য় শতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল? এই সকল শ্লোক কি প্রক্ষিপ্ত? অবশ্য মহাভারতও যে খৃষ্টজন্মের পরে পুনর্ল্লিখিত হইয়াছিল—ঐতিহাসিক মহলে এমন আলোচনাও প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্লোকগুলিকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহি কেন?

অতি পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষ, হিমালয়ের উত্তর পূর্ব্বের কতিপয় মোঙ্গল জাতিকে চীন নামে অভিহিত করিতেন। পরবর্ত্তীকালে চীনপ্রবাসী ভারতীয় বণিক এবং ভিক্ষুপ্রচারকেরা পুরাণসংহিতায় উল্লিখিত চীন শব্দের সহিত, চীনদেশের কোন কোন প্রদেশ এবং রাজবংশের নামের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে, ঐ ঐ স্থানীয় অধিবাসীদিগকে চীন বলিয়া বুঝিয়া, চীন আখ্যায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। এবং ইহা হইতেই ক্রমশঃ সমগ্রদেশ চীন বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকে, এবং দেশবাসীরাও এই নাম গ্রহণ করে। আমাদের কিন্তু এই অনুমানই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

যে রূপেই হউক, চীন—এই নামটি যে চীনজাতি ভারতবর্ষের নিকট হইতে

গ্রহণ করিয়াছিলেন,— ঐতিহাসিকেরা সকলেই তাহা একরূপ স্বীকার করেন। *

* "The common Indian name China, written in Chinese Chentan, is here employed. Another orthography found in Buddhist books is Chi-na. It is clear from the use of these characters that the Indians who translated into Chinese at that early period, did not regard the word "China" as the name of the dynasty, but as the proper name of the country to which it was applied This leaves in great uncertainty the usual derivation of the term 'China' from the Dzin dynasty, B. C. 250, or that of Ts'n, A. D. 300. The occurrence of the word as the name of a nation in the "Laws of Manu", supposed to date from some time between B. C. 1000 and B. C 500, with the use of the term "Simim" in the "Prophecies of Isaiah", indicate a greater antiquity than either of these dynasties extends to. Some have supposed that the powerful feudatory kingdom Dzin, that afterwards grew into the dynasty of that name, may have originated the appellation by which the whole country subject to the Chen emperors, was known to the Hindoos. Dzin occupied the north-western tract now called Chensi and Kan-su, In that part of China that would be first reached by traders coming from Kashgar, Samarkand, and Persia. Chentan, the other Hindoo name of "Chin" used in the Buddist books may be the Thinœ of Ptolemy. When the first Buddhist reached China, the character used for syllables would be called Tin, and soon afterwards Chin. In Julien's Methode, &c., its Sanskrit equivalent is Chin. This would be somewhat late. Would it not be better, having traced the term to India, to make that country responsible for its etymology?

Edkins'—Chinese Buddism.

"The dynasty of Tsin commenced in 265 A. D., and it is presumed that the name China or Tsina, was given to the Chinese by the people of India from these rulers. The Chinese never had a name for their empire. They were "The people", the only people of the world, and all other nations they regarded as mere dependents, they themselves being the predominant inhabitants of the globe.

—"Sun-yat-sen, and the Awakening of China" by James Cantlie, M. A., M. B., F. R. C. S. Dean of the College of medicine, Hong Kong, 1889-1896, and C. Sheridan Jones.

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলেন—"শাস্ত্রোক্ত চীন জাত বর্ত্তমান 'চীনেমান' নয়,......। চীনে বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্বভাগে ছিল।"—একথা স্বীকার করিতে হইলে, বলিতে হয় যে, প্রাচীন কালের ভারতবাসীর নিকট পরিচিত কাশ্মীরের পূর্ব্বভাগে স্থিত ঐ "বড়জাতের" চীননাম হইতেই বর্ত্তমান চীন তৎদেশ ও জাতিবাচক নামটি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই মত আমাদের তেমন সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। 'শক্তি সঙ্গমতন্ত্র'-কারের মতে—"মানসেশাদ্দক্ষ পূর্ব্বে চীনদেশঃ প্রকীর্ত্তিত।" এই চীন অবশ্য কাশ্মীরের "উত্তর পূর্ব্ব" হইতে পারে না। মহাভারতোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের, বর্ত্তমান আসামের, অধিপতি ভগদত্ত "কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ সাগরানূপবাসিভিঃ বহুভির্যোধৈঃ" পরিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকপাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের ঐ চীনসৈন্য বর্ত্তমান চীনের দক্ষিণ সীমান্তের কোন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বভাগে কেহই বর্ত্তমানে, "চীন"—এই বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না, পূর্ব্বেও হইত না। ঐ স্থানের লোকদিগকে অন্য কোন দেশবাসীরাও চীন বলিয়া অভিহিত করে নাই *। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি বর্ত্তমান চীনেমান নয়—এ মত আমরা কোনও ক্রমে গ্রহণ করিতে পারিনা। আমরা বলি,—এই "বড় জাতের" লোক সকলেই "বর্ত্তমান চীনেমানেরই" জাত ভাই, জ্ঞাতি গোষ্ঠী ছিল।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাতার, তিব্বত, খোটান, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশবাসীরা মোঙ্গল—এই সাধারণ নামে অভিহিত। যেমন বর্ত্তমানে, তেমনই বহু পূর্ব্বকালে চীনসাম্রাজ্য প্রধানতঃ মোঙ্গলজাতি অধ্যুষিত দেশের সমষ্টি। কখনও কখনও মোঙ্গল জাতি-সমষ্টি যেমন "মোঙ্গল"

* Old Testament এর অংশ বিশেষে prophecies of Isaiahতে Simim নামক একটি দেশের উল্লেখ আছে, ঐতিহাসিকেরা এই Simimকে চীন বলিয়া স্বীকার করেন।

পারস্যের পৌরাণিক ইতিহাসে বর্ত্তমানে চীনদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ—"The legendary history of the Persians relates that their ancient king the famous Jemshid, had two daughters by a daughter of Mahang King of Machin (or Great China). It has been suggested that his name indicates Muwang of the Chin dynasty who reigned from B.C. 1001 to 946.

– Cathay and tqe Way Thither by H. Yule.

তেমনই "চীন"—এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। মোঙ্গল ও চীন এই শব্দদ্বয় কখন কখন একই অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে দেখা যায়। পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব্ব ইয়োরোপ মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। এই মোঙ্গল-আক্রমণকে কোন কোন ঐতিহাসিক চীন আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করেন। অথচ এই আক্রমণকারীরা ছিল পশ্চিম তাতার নিবাসী মোঙ্গল।

যে ভূ-খণ্ড খাটি চীনদেশ বলিয়া খ্যাত, সমগ্র মোঙ্গল জাতির নিকট উহা "কেন্দ্র-রাজ্য" (Middle Kingdom) নামে পরিচিত ছিল। কিরূপে এই কেন্দ্ররাজ্যের সিংহাসন লাভ করা যায়, মোঙ্গল জাতীয় সকল রাজা এবং খানদের এই এক উচ্চাভিলাষ ছিল। এই উচ্চাভিলাষ সর্ব্ব প্রথম পূর্ণ হয় পশ্চিম তাতারবাসীদের। পরে মাঞ্চু বা পূর্ব্ব তাতারের রাজারা চীনসাম্রাজ্যের এই কেন্দ্ররাজ্যের সিংহাসনাধিকার লাভ করেন। সে দিন পর্য্যন্তও এই অধিকার অব্যাহত ছিল। মোঙ্গলদের মধ্যে যে-ই যখন এই কেন্দ্ররাজ্যের অধীশ্বর হইতেন, তখন সেই রাজা এবং তৎসঙ্গীরা চীন বলিয়াই পরিগণিত হইতেন! *

অনেক সময় বিভিন্ন মোঙ্গলরাজ্য স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিলেও কেন্দ্ররাজ্যের সহিত সম্বন্ধ চ্যুত থাকিতেন না। য়ু-চি (Yueh-chi) শক নামক যাযাবর জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর পশ্চিম চীনসীমান্ত

* "—The Chinese Empire is a congeries of peoples of Mongoloid type. The Chinese have for so long a period been the predominant section of the Mongolian race, that the terms Mongol and Chinese have come to be regarded as well nigh synonymous. So much so has this been the case that the Mongolian invasion of Western Asia and Eastern Europe is often termed a Chinese invasion, whereas it was at least directed by the Mongolians or western Tartars as the Chinese describe them. The ambition of all princes and khans of the Mongolian race was to gain possession of the throne of the middle kingdom. This was accomplished first by the Mongolian or Western Tartars and subsequently by the Manchurian or Eastern Tartars. The conquerors, however, become incorporated with the middle kingdom, and their countrymen were spoken of subsequently as the Chinese.

—"Sun-yat-sen and the Awakening of China" by James Cantlie M. A., M. B. etc, and C. Sheridan Jones.

হইতে বিতাড়িত হইয়া ক্রমশঃ সম্মুখস্থ অন্যান্য যাযাবর জাতিদের পরাজয় করতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দির মধ্যভাগে বক্ট্রিয়ার গ্রীকরাজ্য অধিকার করে, এবং এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাদের বংশধর ২য় কেড্‌ফিসেস (Kadphises II) এবং কণিষ্ক উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। একবার চীন রাজদূত চেঙ্‌-কিয়েন (খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫-১১৫) রাজকার্য্যোপলক্ষে য়ু-চি রাজের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে য়ু-চিরা আমুদরীয়ার (Oxus নদীর) উত্তর তীর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, এবং এই স্থান হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজনীতিসূত্রে চীনরাজ ইঁহাদের সহিত খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ (৮ম খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৩ খৃষ্টাব্দের পর হানবংশের পতনে কিছুকাল পর্য্যন্ত কেন্দ্ররাজ্যের সহিত অন্যান্য খণ্ডরাজ্যের রাজনৈতিক সম্বন্ধ একরূপ তিরোহিত হইয়া পড়ে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পরেই পুনরায় কেন্দ্ররাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং চীনসেনাপতি পানচাওর (Pan-chao) সৈন্যগণ (৭৩-১০২ খৃঃ পর্য্যন্ত) এক জনপদের পর অন্যজনপদ জয় করিতে করিতে রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তসীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়। পশ্চিমে চীনসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এতদপেক্ষা বেশী আর কোন কালে ঘটে নাই। এই সময় খোটানের, কাশগড়ের, খরচরের এবং অন্যান্য নানা জনপদের রাজারা চীনের বশ্যতা স্বীকার করেন।* এইরূপে চীনের সৈন্য এবং বণিকদের নিকট সমগ্র এসিয়ার পথ উন্মুক্ত হয় এবং কেন্দ্ররাজ্যের সহিত চতুঃপার্শ্বের খণ্ডরাজ্যগুলির সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত হয়।

এই ঘটনারও বহুপূর্ব্বে, দুই শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব্বে, চীনের রেশম প্রভৃতি

* The embassy of Chan-kien in 125-115 B. C. to the Yueh-chi, while they still resided in Sogdiana to the north of the Oxus, had brought the western barbarians into touch with the middle kingdon, and for a century and a quarter the emperors of China kept up intercourse with the Scythian powers. In the year 8 A. D. official relation ceased, and when the first Han dynasty came to an end in 23 A.D., Chinese influence in the western countries had been reduced to nothing. Fifty years later Chinese ambition reasserted itself, and for a period of thirty years, from 73 to 102 A. D., General Pan-chao led an army from victory to victory as far as the confines of the Roman Empire, and thus effected the greatest westward extension ever attained by the power of China.

শিল্পদ্রব্যব্যবসায়ীরা পশ্চিম এসিয়ায় যাতায়াত করিত, সম্রাট বু-টি পশ্চিম এসিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে পারস্য সম্রাট দরায়ুস (Darius) সিন্ধু তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাচীন চীনের ধাতব আয়নায় কখনও কখনও গ্রীক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের যতই আলোচনা হইতেছে, ততই জানা যাইতেছে যে সে কালের লোকেরাও বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া লইত—একমাত্র স্বদেশ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিত না। প্রাচীন কালের ইতিহাসাভিজ্ঞ মাত্রই একথা স্বীকার করিবেন যে খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্ব হইতেই মধ্য এসিয়ার মধ্য দিয়া ভারতবাসী, পারস্যবাসী, এমন কি য়ুরোপীয় লোকেরা পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যপদেশে চীন এবং অন্যান্য দেশে যাতায়াত করিতেন। * ভারতবাসীরা কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও চীন এবং অন্যান্য অনেক দেশে খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্ব হইতেই গমনাগমন করিতেন। এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পরে করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশীকান্ত সেন গুপ্ত।

The king of Khotan, who had first made his submission in 73 A.D. was followed by several other princes, including the King of Kashgar, and the route to the west along the southern edge of the desert was thus opened to the arms and commerce of China. The reduction of Kucha and Kara-shater in 94 A.D, similarly threw open the northern road.

Early History of India, 2nd edition, p. 236—7, by V. Smith.

* "Inspite of the tendency of the two continents to shrink apart, the lines of communication between East and West were more open than is commonly supposed. Darius had already sent an expedition eastward to explore Asia and discover the mouths of the Indus. Great trade routes were established. Nor was all the enterprise on the side of the West. In 200 B. C, the Chinese, seeking markets for their silk, opened communications with western Asia. A century later the Emperor Wu Ti sent a mission to the same regions. Greek designs appear on the earliest metal mirriors of China. It is possible that in the Chinese fable of the Paradise of West the myths of the Greeks may be reflected."

Painting in the Far East p. 30—31 by L. Binyon.

জড় ও চৈতন্য।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৩২৩) ঢাকা সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় জষ্টিস সার জন উড্রফ মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশের অনুবাদ।

(প্রতিভা পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

* * * *

তন্ত্রশাস্ত্র ও তাহার অভ্যুদয়ের কারণ

আমি আজ যে শক্তিবাদের আলোচনা করিব তাহা তন্ত্র হইতে গৃহীত। কিন্তু তন্ত্র কথাটি কেবল শাক্ত তন্ত্রে নিবদ্ধ নহে। আমি এই জন্য আগম শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয়স্কর মনে করি; কারণ তাহা হইলে এই ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তন্ত্রই আগম এবং আগমই তন্ত্র। এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে ঔপনিষদিক যুগের অবসানে আগমশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আগম উপাসনা কাণ্ডের শাস্ত্র; সগুণ ব্রহ্মের উপসনাই এই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ইহাও অনুমান করা হইয়া থাকে যে, বৈদিক আচারের পতন এবং তৎসহ বিরোধই আগমশাস্ত্রের অভ্যুদয়ের এক কারণ; এবং হিন্দু-সমাজে বৈদিক আচারের অনধিকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাহাদের জন্য কোন না কোন প্রকারের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা বোধই উহার অন্যতম কারণ। এই শাস্ত্রের এক সাধারণ লক্ষণ এই যে ইহার শিক্ষা সকল জাতির পুরুষ এবং রমণীর জন্যই উদ্দিষ্ট। এই শাস্ত্রে এই উদার মত প্রচারিত হইয়াছে যে মনুষ্যে মনুষ্যে সামাজিক পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, ধর্ম্মের পথ সকলের নিকট সমান উন্মুক্ত; এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারেই ধর্ম্মরাজ্যে মনুষ্যের স্থান নির্দ্দেশ করা সঙ্গত; জাতিনির্দ্দেশক বাহ্য চিহ্ন দ্বারা তাহা করা সঙ্গত নহে।

তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ।

আগম শাস্ত্রে ঈশ্বর তিন আকারে পূজিত হইয়া থাকেন—বিষ্ণু, শিব, এবং শক্তি। কাজেই আগম বা তন্ত্র তিন শ্রেণীর—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। যথা, 'পঞ্চরাত্র আগম' প্রথম শ্রেণীর; অষ্টবিংশতি তন্ত্র সম্বলিত শৈব সিদ্ধান্ত, নকুলীশ-পাশুপতম্ ও কাশ্মীরের ত্রিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর; এবং কৌল, মিশ্র ও সময় নামক ত্রিধা বিভক্ত তন্ত্রসমূহ তৃতীয় শ্রেণীর। আমি এই শেষোক্ত ত্রিধা বিভাগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না। আগম শব্দ দ্বারা আমি কি বুঝি, তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম। আমি যে শক্তি-বাদ আজ মায়াবাদের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিব তাহা শক্তি আগম হইতে গৃহীত। মায়াবাদ বলিতে শঙ্করকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

হিন্দু দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য।

এখন আমি এই বিষয় বিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিব। আমি দেখাইব যে তিনটি প্রধান বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মত সমর্থন করে। বস্তুতঃ মিষ্টার লুইস ডিকিন্‌সন্ (Lewes Dickinson) অল্প দিন হয় চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতের যে এক মর্ম্মগ্রাহী সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম্মের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহজে সামঞ্জস্য হয়। ইহাতে এরূপ প্রমাণিত হয় না, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম্মের মিল আছে, সেগুলি সত্য। ঐ গুলিও প্রমাণসাপেক্ষ সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচ্য দর্শন কোনরূপ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাঁহাদের মত খণ্ডনের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচ্য দর্শনে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে সমস্ত সিদ্ধান্তের আমি উল্লেখ করিতেছি তাহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ উভয় শ্রেণীর লোকের নিকটই উপরি উক্ত বিষয়টি সমান প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদ ও বেদান্তের মায়াবাদ।

প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের জড়পদার্থবিষয়কজ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া জড় পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তাঁহারা পরমাণু এবং তদ্দ্বারা গঠিত সমগ্র বিশ্বের জড়ত্ব নিরাকৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বে জড়, ঈথার এবং বিদ্যুৎ, এই বৈজ্ঞানিক ত্রিমূর্ত্তির সাহায্যেই জড় জগতের উৎপত্তির ব্যখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তিন কমিয়া এক হইয়াছে। তাহার নাম স্পন্দনশীল ঈথার। ঈথার কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে জড় পদার্থ নহে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চ ভূত-সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভূত-সমূহ আদিতে আকাশ হইতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ঈথরই আকাশ, আমি এরূপ বলি না। কারণ, আকাশ পদার্থ ভিন্ন জাতীয় চিন্তা-প্রণালীর অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, স্থূল আকাশ সূক্ষ্ম আকাশ-তন্মাত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং আকাশকেও মূল পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু এই সামঞ্জস্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেই স্থূল জড়জগৎ একটি মাত্র পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই পদার্থটিও জড় পদার্থ নহে। ফলতঃ, জড় পদার্থের জড়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, এবং ভারতীয় মায়াবাদের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এমন একটি সীমা আছে যাহার পরে অন্তঃকরণের ক্রিয়া আর বহির্ম্মুখী হইতে পারে না। কাজেই তন্মাত্রের পর অন্তঃকরণ অন্তর্ম্মুখী হয়, এবং যে অহঙ্কার (Egoism) ভোগ জগতের সংস্পর্শে আসিয়া, মন, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়ীভূত পদার্থ-সমূহের সৃষ্টি করে, সেই অহঙ্কারই তন্মাত্রের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় যে জড়-পদার্থাত্মক তাহা কোন কোন পাশ্চাত্য

দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে; যথা, হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer)! তাঁহার অভিমত এই যে ভৌতিক ও মানসিক এই উভয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিশ্ব কেবল শক্তির (Force) ক্রিয়ার ফলমাত্র, এবং শক্তির যে জাতীয় ক্রিয়ার ফল জড়ত্ব, তাহাই আমাদের নিকট পদার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়াদির ন্যায় জড়-পদার্থাত্মক ইন্দ্রিয়। তবে বিশেষ এই যে, মস্তিষ্কাদি শক্তির এক জাতীয় ক্রিয়ার ফল এবং অন্তঃকরণ উহার আর এক জাতীয় ক্রিয়ার ফল। স্পেনসারের মত এই যে বৈজ্ঞানিক জড়পদার্থ বিশ্বশক্তির ক্রিয়াফলের প্রতিভাস মাত্র এবং অন্তঃকরণও সেই শক্তিক্রিয়ার ফল। সাংখ্য ও বেদান্তের মতও ঠিক তাহাই। এখানেও মায়াবাদের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। স্পেনসার এবং অজ্ঞেয়বাদীদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা মানবের অজ্ঞেয়; কিন্তু বেদান্তের মত এই যে উহা জ্ঞেয় এবং উহাই চৈতন্য। ইহাই সেই আত্মা যাহা অপেক্ষা আর কিছুই ঘনিষ্ঠতর ভাবে জানিতে পারা যায় না। শক্তি অন্ধ। কিন্তু এই বিশ্বে আমরা চৈতন্যের সন্ধান পাই। আদি কারণ যদি হয় জড়, না হয় চৈতন্যময় হয়, পরন্তু জড় ও চৈতন্য উভয়ের লক্ষণাক্রান্ত না হয়, তবে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে উহা জড় নহে, পরন্তু চৈতন্যময়। জড় চৈতন্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে; কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্তই অসঙ্গত। ভারতীয় দর্শনে যে পরমাত্মা বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ চৈতন্য। ইহাই নিষ্কল শিব; এবং স্রষ্টৃ রূপে তাহাই মহাশক্তি বা মহাদেবী। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ভারতীয়েরা যে অর্থে শুদ্ধ চৈতন্য শব্দের ব্যবহার করেন, সে অর্থে শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের বৈষয়িক চক্ষে চৈতন্য সর্ব্বদাই পরিচ্ছিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন আকার ও প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু মায়ার জন্যই চৈতন্য এ বিশেষত্বের অধীন হয়। চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ এবং চৈতন্যের বিবিধ প্রকার বা বিধা, এই দুয়ের পার্থক্যটুকু বুঝিতে হইবে। অনুভূতি, হর্ষদুঃখাদি ভাব, সহজ সংস্কার, ইচ্ছা বা বিচার-শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চৈতন্যের অন্তরালে এক অখণ্ড চৈতন্য বর্ত্তমান। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই, সর্ব্ববিধ উচ্চ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই প্রদান করে, যে বিভিন্ন আকার ও পরিমাণের মধ্যে একত্বেরই অনুভূতি হইয়া থাকে। এমন কি স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এবং অস্বাভাবিক রুগ্ন অবস্থায় সময়ে সময়ে আমাদেরও নির্ব্বিশেষ অখণ্ড চৈতন্যের অনুভূত হয়।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও হিন্দু দর্শন।

দ্বিতীয়তঃ, আজকাল মনোবিজ্ঞানে যে 'মগ্নচৈতন্যের' (Subliminal consciousness) আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই শাস্ত্রীয় মতবাদ সমর্থিত

হয়, যে আমাদের স্ফুট চৈতন্য বা জ্ঞানের অন্তরালে এক দুর্জ্ঞেয় রাজ্য আছে যথায় উহার কার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকে। এইখানেই বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। সম্মুখস্থিত বা দূরস্থ লোকের মনোভাব জানিবার ক্ষমতা এবং বশীকরণ (Hypnotism) প্রভৃতি নানাপ্রকার অতিলৌকিক ক্ষমতা (Occult Powers) আজকাল একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। যে মতবাদের (hypothesis) দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তাহার সহিত ভারতীয় দর্শনের যেরূপ সাদৃশ আছে, পাশ্চাত্য কোন দার্শনিক মতবাদের সহিতই তাহার তদ্রূপ সাদৃশ্য নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক সাড়া ও হিন্দুদর্শনের সত্ত্বগুণ।

তৃতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এক্ষণ স্বীকৃত হইয়াছে যে এক আদি উপাদান কারণ হইতে রূপপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিশ্বের তাবৎ পদার্থেরই জীবন আছে। প্রকৃতির বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বর্ত্তমান নাই। সকলের মধ্যেই সেই জড় ও চৈতন্য বর্ত্তমান। প্রাণ শক্তি এক; মৃত পদার্থ বলিয়া জগতে কিছুই নাই। নির্জ্জীব পদার্থও নাড়া পাইলে সাড়া দেয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষাগুলি ইহা প্রমাণিত করিয়াছে। বেদান্তে এবং সাংখ্যে সজীব নির্জ্জীব উভয় জাতীয় পদার্থেই সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বিজ্ঞানের ঐ সাড়া সেই সত্ত্বগুণের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিত করে না কি? এই সাড়া সত্ত্বগুণের মধ্যে চিৎ বা চৈতন্যেরই ক্রিয়া মাত্র; এই সত্ত্বগুণ তমোগুণের দ্বারা এইরূপ ভাবে আবৃত হইয়া থাকে যে তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতীত প্রকট হয় না। ইহাই তথাকথিত যন্ত্রজনিত (mechanical) সাড়া বলিয়া প্রতিভাত হয়। চৈতন্য এইস্থানে তমোগুণের দ্বারা আবৃত এবং আবদ্ধ হইয়া থাকে। নির্জ্জীব পদার্থে এই সত্ত্বগুণ অস্পষ্ট অনুভূতি রূপে প্রকাশিত হয়। এবং ইহাই নিতান্ত নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে সুখদুঃখের প্রাথমিক বিকাশ রূপে পরিণতি লাভ করে, এবং পরিশেষে ইহাই মনুষ্যের মধ্যে পরিপুষ্ট আত্মজ্ঞানমূলক অনুভূতি রূপে বিকশিত হয়। সর্ব্বত্রই সেই এক চৈতন্য। কেবল মাত্র বাহ্য আবরণেরই পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে দেখা যায় যে স্থূল জড়পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ্ ও নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মধ্য দিয়া চৈতন্যের ক্রমোন্নতি হইতে হইতে অবশেষে মনুষ্যের মধ্যে তাহার পূর্ণতর বিকাশ হয়। ছয় লক্ষ (?) জন্মে এই পরিণাম সংঘটিত হয়, ভারতীয় ধর্ম্মে এই তত্ত্বই বুঝান হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে উদ্ভিদেরও একপ্রকার সুপ্ত চৈতন্য আছে। মহাভরতে উক্ত হইয়াছে যে উদ্ভিদেরও দৃষ্টি শক্তি আছে এবং তৎসাহায্যে উহারা আলোকের দিকে অগ্রসর হয়। উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি আছে এ কথা বলিলে কয়েক দিন পূর্ব্বেও লোকে উপহাস করিত; কিন্তু অল্পকাল হয় সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক হেবারল্যাণ্ড (Haberlandt) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদেরও দর্শনেন্দ্রিয় আছে; পত্রের উপরিভাগে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কাচের পরকলার ন্যায় উহা

অবস্থিত। নিম্নশ্রেণীর জন্তুর চৈতন্য উচ্চতর জাতীয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের চৈতন্য চিন্তাশক্তি রূপে বিকশিত হয়। কিন্তু এই চিন্তাশক্তি চৈতন্যের পরিণতি, পরন্তু উহার ভিত্তি নহে। আমরা জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় যে বিবিধ প্রকারের চৈতন্যের সন্ধান পাই, তাহা এই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

জড় ও চৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ।

তাহা হইলেই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই সরূপ (বিশেষ) এবং অরূপ (নির্ব্বিশেষ), এই সসীম চৈতন্য এবং অসীম চৈতন্য, এই দু'য়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে টমিষ্টিক (Thomistic) দর্শনেও বলা হইয়াছে যে জড় নির্ব্বিশেষকে বিশেষত্ব প্রদান করে, এবং অসীমকে সসীম করে। কিন্তু ইহাদের সংজ্ঞানুসারে ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত। এই দুই এক হইতে পারে কিরূপে?

সাংখ্য ও বেদান্তমত।

সাংখ্যে এই দুইটির একত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্ত ইহা স্বীকার করে না; কারণ, বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে কেবল একটি মাত্র সদ্বস্তু আছে, যদিও আমাদের দ্বৈত বুদ্ধিতে অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন মত গ্রহণীয়—দ্বৈত মত, বহুত্ব মত, না অদ্বৈত মত? হিন্দুর পক্ষে উত্তর এই যে শেষোক্ত মতই গ্রহণীয়; কারণ তাহাই শ্রুতির উত্তর। কিন্তু ইহা ছাড়া এই প্রশ্ন উঠে যে, শ্রুতিতে কি প্রকৃত (আধ্যাত্মিক) অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে? আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় আমরা দ্বৈতের সন্ধান পাই, না অদ্বৈতের? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায়, বিভিন্ন রূপ এবং পরিমাণের মধ্যে অদ্বৈতেরই অনুভূতি হইয়া থাকে।

কেবল তর্কের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না; আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সহিত যে মতের মিল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তদ্দ্বারাই ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের একত্ব বা অখণ্ডত্বের সহিত ব্যবহারিক জগতের অচেতন রূপবাহুল্যের কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? যদিও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন অপর কিছুর দ্বারাই এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না, তথাপি বেদান্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ইহার নানা প্রকার উত্তর দিয়াছেন।

বেদান্তের মায়াবাদ।

শঙ্কর বলেন, একমাত্র সদ্বস্তু বর্ত্তমান আছে, তিনিই ব্রহ্ম। তত্ত্বতঃ কেবল মাত্র 'তাহাই' আছে; আর কিছুই সত্যঘটিত হইতেছে না। সর্ব্বোচ্চ (আধ্যাত্মিক)

অভিজ্ঞতায় (পরমাত্মায়) ঈশ্বরও নাই, সৃষ্টিও নাই, জগৎও নাই, জীবও নাই, বদ্ধাবস্থাও নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু শঙ্কর স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং তিনি স্বীকারও করিয়াছেন, যে ব্যবহারিক ভাবে, জগৎ বা মায়ার অস্তিত্ব আছে। এই মায়াই বীজরূপে জগৎ-সৃষ্টি-বিধায়ক সংস্কার, এবং তাহাই সেই সমস্ত ধারণা-সমূহের কারণ যাহাদের অস্তিত্ব সর্ব্বোচ্চ অপরোক্ষ অনুভূতিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সৎ কি অসৎ? শঙ্কর বলেন, ইহা সৎও নয়, অসৎও নয়। ইহা সৎ হইলে দুইটি সৎ বস্তু অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা অসৎও নহে, কারণ জগতের ব্যবহারিক সত্ত্ব অভিজ্ঞতার বিষয়; এবং জগৎ ঈশ্বরের শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না, এবং যেমন সায়ন বলিয়াছেন, ইহা চিৎ অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক।

কিন্তু জগৎ যদি সৎও না হয়, অসৎও না হয়, তবে মায়ারূপে ইহা ব্রহ্মও হইতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম ত সৎবস্তু। তবে ইহা কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকে? এবং যদি থাকে, তবে কিরূপে এবং কোথায় থাকে? শুদ্ধ চৈতন্যে অচৈতন্য কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে? শঙ্করের মতে ইহা নিত্য এবং তিনি বলেন যে প্রলয়ে মায়াসত্তাই ব্রহ্মসত্তা। সেই সময়ে সৃষ্টিসঙ্কল্পাত্মক চৈতন্যের শক্তি রূপিণী মায়া এবং উহার সঙ্কল্পফল রূপ জগৎ বর্ত্তমান থাকে না। কেবল ব্রহ্মই থাকেন। প্রলয় যদি অঙ্গীকৃত হয়, এবং ইহাও অঙ্গীকৃত হয় যে, ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজরূপে মায়া ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে না, তবে পুনরায় সৃষ্টি হয় কিরূপে? সংস্কার রূপে মায়ার বীজ যদি অব্যক্তও থাকে (অর্থাৎ চৈতন্যের অবিষয়ীভূত থাকে) তথাপি ইহার সংজ্ঞা মতেই ইহা চৈতন্য হইতে বিভিন্ন। এই জাতীয় সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিবেন যে উহারা নিজেই মায়ার ফল স্বরূপ। ইহা ঠিক; কিন্তু এ বিষয়টি অন্য প্রকারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সে ব্যাখ্যা মায়াবাদ হইতে সহজ; অথচ মায়াবাদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে, উহার বিরুদ্ধে তত পারা যায় না।

বেদান্তের মায়াবাদের সমালোচনা।

আমার বোধ হয় যে শঙ্কর সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে গিয়া কতক পরিমাণে সাংখ্য মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার মায়াবাদের ফল এই যে, তাঁহার মত শুদ্ধ অদ্বৈত মত নহে, এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে অনায়াসে আনা যাইতে পারে। তাঁহার মায়াতে, সাংখ্যমতের ন্যায় একটু স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন পাওয়া যায়, যদিও তিনি এই স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যে পুরুষাধিষ্ঠিত মায়াই প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্রী। শঙ্করেও এই মতের আভাস পাওয়া যায়। তিনি চিৎকে অয়স্কান্ত মণির সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার অথচ সকল বিকারের কারণ, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানক্রিয়া কেবল ঈশ্বরেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরও মায়ার ফল মাত্র। এই যে মত পার্থক্য তাহা কতকটা কেবল কথার পার্থক্য মাত্র। এই সম্বন্ধে আগমের

মত কতক পরিমাণে শঙ্করের মত হইতেও গভীর (কারণ) শঙ্কর তার্কিক (Intellectualist) ছিলেন।

তন্ত্রের শক্তিবাদ

আমি এই ক্ষণে এক মতের উল্লেখ করিব যাহাতে ঐশ্বরিক চৈতন্যে পরম পূর্ণতা আরোপিত করা হইয়াছে। সেই মতে ঐশ্বরিক চৈতন্যে জ্ঞান (ক্রিয়া) অস্বীকৃত হয় নাই ; কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান অস্বীকৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অপরোক্ষ অনুভূতিকে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যে মিলনে দ্বৈত অদ্বৈতরূপে অবস্থান করে ; এবং যাহাতে ভিতর বলিতেও কিছু থাকে না, বাহির বলিতেও কিছু থাকে না। এই মিলনই শক্তির লীলা, অথচ শক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার শিবের সহিত অবিভিন্ন, এক। আমার নিকট শাক্ত মত সরল ও পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। আমি ইহার মোটামোটি বিবরণ দিতে পারি ; কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবার সময় নাই।

প্রথমতঃ, ইহা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। কিন্তু এই মত কি ? 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া এই মত অগ্রসর হইয়াছে। 'সর্ব্বং' অর্থ জগৎ ; ব্রহ্ম' অর্থ চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দ। সুতরাং এই জগৎ স্বরূপতঃ চৈতন্য।

কিন্তু আমরা জানি যে আমরা কেবল চৈতন্যময় নই। আমাদের মধ্যে দৃশ্যতঃ জড়ত্ব আছে। ইহার মীমাংসা কি ? সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মই নির্গুণ শিব— আনন্দময় অদ্বৈত চৈতন্য। ইহাই শিবের স্থির অবস্থা বা বিভাব (Static aspect)। এই অব্যক্ত হইতে শক্তি ব্যক্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের গতিরূপ বিভাব (Kinetic aspect)। শক্তি এবং শক্তিমান্ এক ; সুতরাং অব্যক্ত শিব হইতে শিবশক্তি ব্যক্ত হয়, এই শিবশক্তি এক। কাজেই শক্তিও চৈতন্য-রূপিণী। কিন্তু শক্তির দুই মূর্ত্তি ; যথা, বিদ্যাশক্তি বা চিৎশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি বা মায়াশক্তি। উভয়েই যখন শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমান্ যখন এক, তখন উভয়েই চৈতন্যময়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, চিৎশক্তি জ্ঞানরূপী চৈতন্য, মায়াশক্তি চৈতন্যকে আপনাতে আপনি আবৃত করে এবং ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাবলে অচৈতন্য রূপে প্রতিভাত হয়। এই মায়াশক্তি ত্রিগুণাশক্তি অর্থাৎ তিন গুণের সমবায়। ইহাই কামকলা ; ইহাই ত্রিগুণাত্মিকা বিভূতি। সুতরাং এই গুণত্রয় মূলতঃ চিৎ বই আর কিছুই নহে। কাজেই মায়াবাদীর উল্লিখিত চিদাভাস অঙ্গীকার করার প্রয়োজন নাই। জড় অসতের উপর চৈতন্যময় সতের প্রতি-বিম্বকেই মায়াবাদীরা চিদাভাস বলিয়া থাকে। সমস্তই সৎ, তবে কতক পদার্থের ক্ষয় হয় না, এই অর্থে সেগুলি প্রকৃত সৎ ; বাকী সকলই বিকারশীল, সুতরাং সেই অর্থে অসৎ। সমস্তই ব্রহ্ম। মনুষ্যের অন্তরাত্মা বিকারহীন চিৎশক্তি। তাহার দৃশ্যতঃ জড় আধার—দেহ ও অন্তঃকরণ—মায়াশক্তিরূপে ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়াশক্তির দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতাবলে জড়রূপে প্রতিভাত চৈতন্য। সুতরাং ঈশ্বর ও চিৎশক্তি ও মায়া শক্তিরূপী ব্রহ্মেরই নাম। জগতের মাতা ও ধাত্রীস্বরূপা মহা-

দেবী ঈশ্বরেরই রমণীরূপ বিভাব (Aspect)। জীব সেই শক্তিরই অংশ; কেবল প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর মায়াবী, জীব মায়ার অধীন। সৃষ্টিকালেও চিন্তাময়ের অদ্বৈত চৈতন্যের ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু তাঁহার চিন্তা, অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা ক্রিয়ার ফল যে রূপ, তাহা মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়; অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত অন্তর্নিহিত বিদ্যাশক্তি বলে মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত উহা (ঐ চিন্তা বা জীব রূপের (দেহের) সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। সমস্তই নিত্য সত্য বা ব্রহ্ম। সৃষ্টিকালে শিব স্বীয় শক্তি সম্প্রসারিত ও প্রলয়কালে তাহা সঙ্কুচিত করেন। সৃষ্টির পরে মায়া স্বরূপতঃ চৈতন্যময় কিন্তু জড়রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান থাকে।

উপসংহার।

জগতের ব্যাখ্যা কল্পে এই মত গ্রহণ করিলে কার্য্যক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ফল লাভ করা যায়। জগৎ তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, এবং ঈশ্বরকে আর ব্রহ্মের মায়িক ভাণ বলা চলে না। জগৎ সত্য; উহা এই অর্থে মিথ্যা যে উহা পরিবর্ত্তনশীল; পক্ষান্তরে আত্মা প্রকৃত সৎ ও নিত্য বস্তু। বন্ধও সত্য; কারণ বন্ধই অবিদ্যাশক্তি, উহাই চৈতন্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মোক্ষও সত্য; কারণ ইহা বিদ্যাশক্তির অনুগ্রহের ফল। আমরা সকলেই শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ। সাফল্য লাভ করিতে হইলে এ কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আরও বুঝিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে দেবতাই চিন্তা করিতেছেন ও কাজ করিতেছেন এবং আমরাই দেবতা; আমাদের যে সুখভোগ তাহাও তাঁহারই; এবং মোক্ষ তাঁহারই শান্তিময় প্রকৃতি। আগম সকল এই শক্তি বৃদ্ধির কথা নিয়াই ব্যাপৃত। এই শক্তি বাহির হইতে আগত বলিয়া মনে করিতে হইবে না; ইহা আমাদের অন্তরেই আছে। বিবিধ প্রকার শক্তি সাধনা দ্বারা আমরা ইহা আয়ত্ত করিতে পারি। সংসারে আছি বলিয়া এবং সংসারের মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হয় বলিয়া,—কুলার্ণব তন্ত্রে যেমন উক্ত হইয়াছে—এই সংসারই আমাদের মুক্তির ক্ষেত্র। যিনি বীর তিনি সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন না। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ইহা ধারণ করেন, এবং বলপূর্ব্বক ইহার গুহ্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি অবশেষে বুঝিতে পারেন যে সমস্তই চৈতন্য স্বরূপ। তখন জড় জগতে আর তাহার স্পৃহা থাকে না। আত্মজ্ঞানহীন সাংসারিক জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া যে সমস্ত কাজকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তিনি তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জ্ঞানী হন, স্বাধীন হন; এবং নিজের ইচ্ছানুসারে, হয় শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন, না হয়, মোক্ষের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। *

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে ভাবান্তরিত।

হিন্দুর উপাসনা নীরব।

যিনি জগতের যাবতীয় ভূতে বিরাজিত, যিনি ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র সমুপস্থিত, যিনি সর্ব্বহৃদয়ে সতত অবস্থিত থাকিয়া অতি লুক্কায়িত সংবাদ জ্ঞাত হইতেছেন, যিনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট কীটাণুর পদ সঞ্চালন শব্দ শ্রুত হইতেছেন, তাঁহাকে---এমন পরম নিকটস্থকে চীৎকার করিয়া কি জানাইব, তাই নীরবভাবেই আমাদের হৃদয়ের বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া থাকি। আমরা শান্তির উপাসক, তাই আমাদের স্তব শান্তিময়, আমাদের ভালবাসার ভাষা শান্তিময়। এ জন্যই হিন্দুর উপাসনাস্থান লোকালয়ের বাহিরে—বিজন বনভূমির শান্তিময় নিকেতনে। হিন্দুর উপাসনা তাই নীরব, ওষ্ঠস্পন্দন পর্য্যন্ত নিষেধ। আমরা নীরব সাম্রাজ্য হইতে আসিয়াছি, নীরব সাম্রাজ্যে চলিয়া যাইব। এ জন্যই সেই সুন্দর নীরব সাম্রাজ্যে প্রস্থান করিতে আমরা সতত প্রয়াসী। এ সংসার সুখতরঙ্গহিল্লোলে নিয়ত হিল্লোলিত থাকিয়াও সেই সুন্দর রাজ্যে গমন করিতে আমরা সতত উদ্যোগী। ব্রহ্মাণ্ড সৃজন কাল হইতে সেই দেশ অন্বেষণ জন্যই আমাদের এত তীব্র পিপাসা ক্ষুধা। মানবজগৎ অনাদি কাল হইতে অনবরত বহু উপায়দ্বারা সেই নির্ব্বাত শান্তস্থান, সেই শান্তির পরমানন্দপ্রদ পরমভবন অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই অনন্ত গুণাধার নির্ম্মল নির্ব্বিকার অসীম কারুণ্যবারিনিধির উপাসনা, চীৎকার করিয়া হয় না, কারণ তিনি অবাঙ্‌মনস গোচর। এ জন্যই নিস্তব্ধ থাকা উচিত,—তাঁহাকে ডাকিয়াও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, তাই ভাবিয়া নিস্তব্ধ নীরব থাকা উচিত। কিন্তু আমরা নিস্তব্ধ রাজ্যের প্রজা হইয়াও, নিস্তব্ধ প্রদেশ হইতে প্রাগত হইয়াও, সতত এই সংসারের মহা কোলাহলে নিবাস করিতেছি বলিয়া অভ্যাসবশতঃ প্রথমতঃ আমরা সাকার অবলম্বন পূর্ব্বক কীর্ত্তন পূজাদি আরম্ভ করি, তৎপরে ক্রমশঃ সেই নীরবতার দিকে ধাবমান হই। যখন কোন একটি ভাল বস্তু আমরা নিরীক্ষণ করি, যদি তাহার গুণ বর্ণনা আমাদের বাক্যের অধীন হয়, তখন 'আহা কি চমৎকার' ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা মনের আবেগ তৃপ্ত করি। কিন্তু যখন এমন বড় কিছুর মহিমা আমরা অনুভব করি, ব্যক্ত ভাষায় যার প্রকাশ হয় না,—এই নীরব ভাষার দ্বারা ঐ অব্যক্তের প্রশংসা নীরবে প্রচার করি। আমরা হিন্দুজাতি সেই অনন্ত লীলাময়ের লীলা নীরবে মুগ্ধ চিত্তে চিন্তা করিয়া থাকি।

কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেই নীরব দেশের সম্রাটের, সেই শান্তিময় সর্ব্বেশ্বরের কথার উত্থাপনে, স্তবকীর্ত্তনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা যেন জাগতিক যাবতীয় আনন্দ অপেক্ষা অতুলনীয় ভাবে উৎকৃষ্টতর। যুক্তি তর্ক ও তত্ত্বালোচনা করিয়াও আপনা হইতেই অনায়াসে প্রতীত হয়, যেন তিনি অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার, যেন অনন্ত মাধুর্য্যের প্রস্রবন, নচেৎ তাঁহার নামে তাঁহার কীর্ত্তনে এত আনন্দ ধারা এত মাধুর্য্য কোথা হইতে আসিল! মন্ত্রে স্তোত্রেও—এই

নিম্নতর উপাসনাতেও—যখন এত আনন্দ - তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে কি এক অভিনব অপূর্ব্ব আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয়! এ আনন্দ, এ বিমল আনন্দ, এ প্রাণোন্মাদন আনন্দ. এ চিত্তাহ্লাদন আনন্দ, এ স্নিগ্ধ আনন্দ, এ রমণীয় কমনীয় অপূর্ব্ব অসীম আনন্দ—সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ কর, কোটি কোটি নক্ষত্র গ্রহজ্যোতিষ্ক মণ্ডলী পরিভ্রমণ কর, তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, এ অতুলনীয় ব্রহ্মানন্দ, কোথায়ও আর পাইবার নহে। ঐশ্বর্য্য বিমণ্ডিত মহীধন্য মহামান্য বলদর্পে দর্পিত রাজাগন্ধে গন্ধিত নৃপতিগণের ধন ভাণ্ডারে এ আনন্দ নাই, রাজরাজেশ্বরের সুরম্য হর্ম্ম্যে যথায় স্তূপীকৃত বিচিত্রতারাশি বিরাজিত, সেখানে এ আনন্দ নাই—ভূমণ্ডলখ্যাত মহাজনাকীর্ণ সুন্দর সুন্দর আপন শ্রেণী সজ্জিত, পরিখা পরিবেষ্টিত, অসংখ্য সেনানাদল পরিরক্ষিত মহানগরীর মহাবাণিজ্য-ভবনে এ আনন্দ নাই,—দিবাকরের অস্তকালীন অস্তাচল শিরোভাগে নীল অনন্ত অসীম আকাশের অপূর্ব্বশোভা সন্দর্শনে এ আনন্দ নাই, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বলকারী ব্যোমপথ বিহারী তমোরাশি নিদূরণকারী দেবদিবাকরের গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড তপন-দাহন-বিদগ্ধোজ্জ্বল কিরণবিকীরণ সন্দর্শনে, এ আনন্দ নাই,—শারদীয় অতি শুভ্র নির্ম্মল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতে হর্ষিত হসিত যামিনীর মধুর সহাস বদন বিকাশে এ আনন্দ নাই,—হিমাদ্রিগাত্র নির্ঝরিত মধুর কল কল নিনাদিত নানা সুঠাম সুভঙ্গ ভঙ্গে প্রবাহিত তরঙ্গবীচিমালা বিকম্পনে এ আনন্দ নাই, তাই নিত্যানন্দের ভিখারীরা এ পার্থিব নিকেতন বিসর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্যযুক্তপ্রাণে নির্জ্জন গহন বনে কিম্বা পর্ব্বতকন্দরে নীরবে নির্ম্মল প্রাণে নীরব ভাষায় নীরবে সেই নীরব দেশের অধিপতি ব্রহ্মানন্দময় পরমব্রহ্ম নিত্যানন্দ সেই বিশ্বপতির ধ্যান করিতেছেন।

যেথানে একটু নীরবতা ও নির্জ্জনতা পাওয়া যায়, মনে হয় শান্তি সেখানে বিরাজ করে। শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, এখনও দেখিতেছি যাঁহারা ভক্ত, নিজের গৌরব প্রকাশে যাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই, সেই মহাপুরুষগণ একটু নির্জ্জনতা চাহেন। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস কলিকাতা মহানগরীর বহু সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে তাঁহার তপোনিবাস নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাল্মিকী বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ দত্তাত্রেয় কনাদ গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ নির্জ্জন স্থানে তপস্যার আবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নীরব দেশের সম্রাটের অন্বেষণ করিতে হইলে নীরব দেশেই করিতে হয়, নীরব স্তবের দ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ হয়। এ জন্যই মানব এ জগতের কোলাহল সহ্য না করিয়া কিংবা সংসারঝঞ্ঝাবাতাহত হইয়া নির্জ্জনে নীরব শান্তি অনুসন্ধান করে। যে দেশে ক্ষুধার হাহাকার নাই—অসার চীৎকার নাই—যে দেশে অত্যাচার প্রপীড়িত দীর্ঘশ্বাস নাই—যে দেশে ধনগৌরবে মদমত্ত দুর্বৃত্ত অভিমানীর দুঃসহ অভিমানের বিকাশ নাই—যে দেশে নীচাশয় ব্যক্তিগণের স্বার্থসিদ্ধিকর তোষামোদের আভাস নাই—যে দেশে প্রিয় বিরহ কাতরতায় অহর্নিশ হৃদয়োচ্ছাস উচ্ছাসিত নিয়ত অশ্রু-বিসর্জ্জন নাই— মনে হয় সেই সুন্দর দেশে সেই নীরব সাম্রাজ্যে, সেই শান্তির প্রাসাদে, সেই আনন্দের ভবনে চলিয়া যাই। সেই দেশে গমন করিয়া এই আমার

অবসন্ন চিত্তটিকে আমার সংসার জ্বালা বিদগ্ধ প্রাণটিকে সেই অজানা অদেখা সতত অপরিচিত পরমবন্ধু দীনবন্ধুর শ্রীচরণে নীরবে ঢালিয়া দিই।

বিবিক্ত দেশে চ সুখাসনস্থ
শুচিঃসমগ্রীবশিরঃশরীরঃ।
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুণং প্রণম্য॥
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্॥

শান্তিই আমাদের লক্ষ্য—শান্তিই আমাদের পূজ্য—শান্তিই আমাদের পরম ভোগ্য।—শান্তিই আমাদের ব্রহ্মপদ। এ ব্রহ্মানন্দময় পরমসুখদ আনন্দ নিকেতন মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনরাগমনের আশঙ্কা নাই। মানবের একরূপ ক্ষণিক বৈরাগ্য প্রায়ই জীবনে সংঘটিত হয়। এই বৈরাগ্য ভাব, এই ঔদাসীন্য স্থায়ী করিবার জন্য, স্থায়ী রাখিবার জন্য, এত শাস্ত্র, এত দৈব, এত পুরুষকার, এত যত্ন ও চেষ্টা, এত যুক্তিদর্শন ও মীমাংসা, এত যাগ যজ্ঞ ব্রত ও তপস্যা, এত দেবালয় ও বিদ্যালয়।

হরিদ্বারে গমন করিয়া দেখিলাম মৎস্যবৃন্দ কিরূপ আনন্দের সহিত জাহ্নবী-বারিতে মানবসহ সন্তরণ করিতেছে। শুনিয়াছি মুনিগণের তপোবনে হরিণশিশুগণ মুনিকুমারগণের সহিত একত্রে ক্রিয়া করিত, দেবাদিদেব মহাদেবের গার্হস্থ ভবন কৈলাসশিখরে তাঁহার বাহন বৃষভ এবং শঙ্করী পার্ব্বতীর বাহন ভীমকেশরী একত্রে নিবাস করিতেছে। কার্ত্তিকের বাহন অসংখ্য চন্দ্রকররাশি-পরিশোভিত কেকারবকারী শিখী ভোলানাথ মহেশ্বরের অঙ্গভূষণ আশীবিষ ভুজঙ্গমগণ একত্র নিবাস করিতেছে। কোন দ্বেষ হিংসা ক্রোধ মাৎসর্য্য এ দেশে অধিকার লাভ পায় নাই। এ শান্তির স্যাম্রাজ্যে শান্তি সতত সংস্থাপিত। কিন্তু কোটি কোটি জীবগণের অসংখ্য ধ্বনিতে সতত প্রতিধ্বনিত এই অবনী মণ্ডলে পক্ষিগণ আকাশ মার্গে ব্যাধভয়ে প্রাণানন্দে উড্ডীয়মান হইতে পারে না। পথিকগণ দস্যুভয়ে প্রাণানন্দে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারে না—গৃহস্থগণ নরপিশাচগণের ভয়ে প্রাণানন্দে নিশাভাগে নিদ্রার বিমল শান্তিপ্রদসুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। তাই শাস্ত্রকারগণ, মহাপুরুষগণ এ সংসারকে অশান্তির নিকেতন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং নির্জ্জনতায় নীরবতায় শান্তিতে পরম সুখ জানিতে পারিয়া কোটি কোটি বৎসর হিমাদ্রিগহ্বরে কিংবা পর্ব্বত কন্দরে কিংবা বিজন তপোবনে মহাযশা তপোধনগণ তপস্যা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বারংবার উপদেশ দিতেছেন—এ সংসার সত্বর ত্যাগ কর।

নির্জ্জনতা, নীরবতা, একাগ্রচিত্ততা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সাধারণতঃ দিবাবসানে, কার্য্যশেষে, নিশাকালে, নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি তোমার মন নিশ্চিন্ত না থাকে, দিবাকালীন কার্য্যসমূহের ভাবনায় লিপ্ত

থাকে, তবে তুমি নিদ্রার শান্তিপ্রদ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত স্বপ্ন রাজ্যে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেমিক, অথচ কর্ত্তব্য পরায়ণ—সংসারিক জগতের যাবতীয় কার্য্যের মধ্যেও যখনই সে নিশাকালে শয্যায় শায়িত হয়, তাহার মনে চিন্তাতরঙ্গ তরঙ্গায়িত না থাকায় চিত্ত নিদ্রাজনিত পরম সুখ মহানন্দে সম্ভোগ করে এবং স্বপ্নজনিত কষ্ট তাহার সম্ভবে না। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, সেই নিদ্রিত ব্যক্তিকে, সেই আনন্দ সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তিকে, সেই কিয়ৎকাল জন্য ব্রহ্মানন্দ ভোগী ব্যক্তিকে, যদ্যপি অকস্মাৎ জাগরিত করা যায় তাহার কিরূপ বিরক্তি জন্মিবে এবং সে বলিবে, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল—আহা, আমি কি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম!" কিন্তু যখন সে নিদ্রিত ছিল, যখন সে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিল, তখন তাহার এ দ্বৈত ভাব ছিল না। তুমি আমি স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি এ ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। সে সেই নীরব দেশে নীরব উপাসনায় নীরব ভাবে অমৃতরস উপভোগ করিতেছিল। এ জন্য, সংসারে বাস কর ক্ষতি নাই, পদ্মপত্রে বারিবৎ নির্লিপ্তভাবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্য সকল করিয়া যাও। যে দিন তোমার চিরনিদ্রার সময় উপস্থিত হইবে, সেই দিন সেই কঠিন পরীক্ষার সময়ে তোমার মন এই জগতের ভাবনায় যদি লিপ্ত না থাকে, এক মাত্র পরমেশ চিন্তায় রত থাকে তাহা হইলে বারংবার ভবাগমন রূপ স্বপ্ন আর দেখিতে হইবে না। বারংবার জন্মমরণরূপ কঠোর যন্ত্রাণা ভোগ করিতে হইবে না। যে প্রকার লবণনির্ম্মিত পুত্তলিকা লবণাম্বুধিতে বিমিশ্রিত হয়, সেই প্রকার তুমি সেই ব্রহ্মসমুদ্রে পরিমিলিত হইবে!

শান্তিতে আমাদের এই নশ্বর জীবনে যখন ভাগ্য বলে ব্রহ্মানন্দ ভোগকরি তখন যে আমাদের নীরবতা বিদ্যমান অদ্বৈতভাব বিদ্যমান, তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ কৈবল্যোপনিষদ্ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। এই ভাব অতি সত্বর আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হউক। আমাদের চিত্ত মোক্ষধামের প্রতি ধাবমান হউক।

"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি॥
স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিত জীব লোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥
পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্ম যোগাৎ।
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী

ভক্তির জয়।

নবীন জলদে শিখী হেরি শ্যামরূপ
পুলকে শিহরি, নাচে—ভরি উঠে বুক।
ভক্তিমাখা তুচ্ছ পাখা দিতে চায় পায়,
আদরে তুলিয়া শিরে পরে শ্যামরায়।
—চরণ লভিতে যবে আকুল হৃদয়,
মাথায় তুলিয়া লন ভক্তে দয়াময়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন বসু।

পুস্তক পরিচয়।

ধারা। ধারা কাব্য গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ॥০। বইখানিতে ছোট ছোট ১২৫টি কবিতা আছে। বরিশালের সুলেখক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ,বি, এল্ মহাশয় এই পুস্তকের একটী ক্ষুদ্রভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। উহার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন—"কবিতার হিসাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মূল্য যতই হউকনা কেন, ভাবের হিসাবে ইহাদের মূল্য ঢের। আমরাও এইরূপ মনে করি। কবি একজন ভক্ত কিনা তাহা আমরা জানিনা, তবে তিনি যে অধ্যাত্মতত্ত্বের ভাবুক এবং অনুরাগী তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ভক্তির অর্থ—"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ. মমতা প্রেমসঙ্গতা", সে ভক্তি অতি দুর্লভবস্তু। বহুসাধনার ফলে ভাগ্যবানেরাই তাহা লাভ করিয়া থাকেন। এই নবীন লেখকের কবিপ্রতিভা সেই ভক্তির পথ খুঁজিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

স্থানে স্থানে কবির নিপুণ লেখনী সামান্য দুকথায় অতি সুন্দরভাব-কুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

"পার যদি হৃদে গড়ি প্রতিমা উজ্জ্বল,
সে নির্ম্মমে নেত্রজলে করে ফেল তল।"

"সিন্ধুসেঁচা প্রেমের বিন্দু দেখে দুর্ব্বাদলে,
স্বর্গহতে সূর্য্যকিরণ নাম্‌ল ধরাতলে।"

"তুমি আমায় লইবে কোলে কর্‌বে আলিঙ্গন,
আকুলদুঃখসিন্ধুনীরে (তাই) দীর্ঘ প্রক্ষালন।"

"বুঝিয়াছি তুমি যার চোখে দেও হাত,
দিবাসম হয় তার অন্ধকার রাত।"

ভাষা এবং ছন্দ বিষয়ে কবি সর্ব্বত্র অবহিত না হইলেও স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা হইতে আমরা তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াছি।

'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রথম কবিতাটিই উহার প্রমাণ। নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"মরণ প্রভাত পুণ্যআলোকে নেহারি ও মুখচন্দ,
ব্যর্থবাসনা পূরাব লুটিয়া চরণকুসুম গন্ধ।
পূর্ব্বগগন উজ্জ্বলকরি দাঁড়াও আসিয়া তুমি,
ম্লানরজনী পলাইয়া যা'ক চরণকমল চুমি।"

গ্রন্থের শেষ দুটী কবিতা "দক্ষিণা" এবং "বিদায়" পড়িয়া অপর কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম হইতে ভাবের যে সামীপ্য এবং ক্রমপরিণতির আশা করিয়াছিলাম, তাহার বড়ই অভাব দৃষ্ট হইল। যে পূজার দক্ষিণা আছে তাহার একটা পদ্ধতি থাকা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে কবি এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে সুখী হইব।

বর্ণবিন্যাসে অনবধানতা এবং ভাষায় প্রাদেশিকতাই সমালোচ্য গ্রন্থের প্রধানদোষ বলিয়া মনে হইল।

কবি নিজেই ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে এ "ধারা" প্রেমাশ্রুর। ভগবান এই করুন ইহার প্রবাহ যেন কখনই রুক্ষ অথবা শুষ্ক না হয়।

তর্পণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ প্রণীত। বহুচিত্রে সুশোভিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, রঘুনন্দন, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ শতাধিক চিরস্মরণীয় বঙ্গসন্তানের জীবন-গাথা ও হাফ্‌টোন চিত্র।

আজকাল অনেকেই চৌদ্দলাইনের কবিতা লিখিয়া মনে করেন সনেট লিখিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সনেটের কতকগুলি কঠিন নিয়ম আছে, যথা একটি মাত্র ভাবের অভিব্যক্তি থাকিবে—ভাবটি উচ্চ ও গম্ভীর হওয়া চাই—প্রথম অষ্টকে ভাবের উন্মাদ এবং শেষ ষষ্টকে তাহার বিলীন হইবে—অষ্টকে চারিটি করিয়া একইমিলের পংক্তি এবং শেষের ষষ্টকে তিনটি একইমিলের পংক্তি থাকিবে—ইত্যাদি। সেই নিয়ম গুলি পালন না করিলে কেবল চৌদ্দ লাইনের কবিতা অপরাপর বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও সনেট নামের গৌরব পাইতে পারে না। বাঙ্গালায় মাইকেলই প্রথম ইয়োরোপায় আদর্শে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অনেকেই সনেটের নিয়ম রক্ষা বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। সুখের বিষয় তর্পণের কবি সে নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। তর্পণের সমস্ত কবিতা গুলিই প্রকৃত সনেট পদবাচ্য। তর্পণের বিষয় ও সনেট রচনার

পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বাঙ্গালার স্মরনীয় মহাত্মাগণের গুনগাথা বর্ণন করিয়া কবির সনেট রচনা সার্থক হইয়াছে। কবিতাগুলি যে সুন্দর হইয়াছে একথা অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল কবিতাপুস্তকভাবে দেখিলে এ পুস্তকের উপর অবিচার করা হইল। এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নূতন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের বিষয়—দেশভরা বঙ্গসন্তান মাত্রেরই পরম আদরের বস্তু। বঙ্গজননীর সার্থক সন্তানগণের প্রায় সকলেরই স্মরনীয় জীবনকথা ও হাফটোন প্রতিকৃতি যে পুস্তকে একাধরে পাওয়া যায়, সে পুস্তক যে বাঙ্গালার প্রতি গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইবে এরূপ আশা করা দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ পুস্তকের যদি বহুল প্রচার না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বাঙ্গালী এখনও স্মৃতি-পূজার মহত্ব অনুভব করিতে শিখে নাই, দেশপ্রীতি তাহাদের কথা মাত্র। বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা ছাত্রবৃন্দের হাতে দিবার—আত্মীয় বন্ধুগণকে উপহার দিবার পক্ষে—এমন যোগ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বেশী নাই।

প্রার্থনা।

এস হে হৃদয় রাজ,
প্রিয় হে, চির সুন্দর।
তোমারি আসনে হের,
শোভিত হৃদি কন্দর।
পুষ্প শোভিত শুভ্র যামিনী,
কনক কান্তি কৌমুদী।
ঝঙ্কারে কিবা, গুঞ্জরে অলি,
চঞ্চল তর অম্বুধি।
সাজায়ে রেখেছি হৃদয় কুঞ্জে প্রেম তৃষিত অন্তর,
রচিয়াছি নব কুসুম শয়ান,
এস নাথ, এস আকুল পরাণ,
উদিত হও হে, পূর্ণচন্দ্র শোভিয়া হৃদি-অম্বর।
নীলকান্ত বপু, চন্দন চর্চ্চিত,
হৃদয়ে হেরিব সে রূপ বাঞ্ছিত,
প্রেম বারি নাথ, করিয়া সিঞ্চিত,
জীবন তরু মুঞ্জর।

শ্রীমতী ঊষাপ্রমোদিনী বসু

চাটনী।

ঝি। দুজোড়া ডিম দেও গো বাছা।

দোকানদার। জোড়া ছ পয়সা।

ঝি। ওমা এত দর বেড়েছে। কেন গা?

দোকানদার। যে যুদ্ধ হ'চ্চে বাছা,—দর বাড়্‌বে না!

ঝি। ওমা যুদ্ধে কি তারা ডিম ছোড়াছুড়ি করে? গোলাগুলি কি সব ফুরিয়ে গেছে?

সাহেব। হায়! তুমি বলিতে আমাতে এমন কিছু আছে, যা তুমি বড় ভালবাস।

বিবি। তা ছিল,—কিন্তু সব যে খরচ হইয়া গেল!

সেনা নায়ক কহিলেন, "সৈন্যদের মধ্যে যাহারা গির্জায় যাইতে না চাও, তাহারা সরিয়া দাঁড়াও।"

অধিকাংশ সৈন্যই সরিয়া দাঁড়াইল। তখন সেনানায়ক সহকারীকে কহিলেন, "যারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাদেরই গির্জায় পাঠাইবে। গির্জা যাইবার দরকার তাদেরই বেশী।

ডাক্তার। তোমাকে কিছু দিন মস্তিষ্ক পরিচালনা বন্ধ করিতে হইবে।

রোগী। সর্ব্বনাশ! কি করিয়া তা পারি? আমি যে মাসিকে কবিতা লিখি।

ডাক্তার। ওঃ! তা লিখিতে পার।

বড়বাবু। হাঁ গো, তোমার ঠাকুরমা ত গত বৎসরে চারবার মরিলেন। এবার ছুটি নিবার সময় কি করিবে?

কেরাণী। আজ্ঞে ঠাকুরদাদা যে আবার একটা বিবাহ করিলেন,—বছরের মধ্যে এই পাঁচটি হইল। বুড়োকালে—কারও কথা কি শোনেন?

"অর্থের সব চেয়ে বড় দোষ কি?"

"তার অভাব—আর কি?"

৩য় বর্ষ } আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি।

প্রথম অংশ।

মাতৃপূজা।*

(১)

আসিবে জননী আশায় আশায়
আশা ভরা বুকে রই
এসেছে শুনিয়া এসেছি ছুটিয়া
জননী আমার কই ?

(২)

ওই শোনা যায় কত 'হুলু'রব
বেণু বীণা ঢাক ঢোল,
আবালবনিতা সকলের মুখে
কিবা হরষের রোল।

* এই কবিতাটি স্বর্গগতা কবির অপ্রকাশিত কাব্য "নীলিমা" হইতে গৃহীত।

(৩)
মার আগমনে আগত প্রবাসী
আপন আপন ঘরে,
বিরহ-বিষাদ ঘুচে গেছে আজি
সবারি পুলক ভরে।

(৪)
দীন হতে আজি রাজা মহারাজা
নব আভরণে শোভে,
সকল বেদনা সকল ভাবনা
ভুলে গেছে আজি সবে!

(৫)
ভাই ভাই আজি নাই ঠাঁই ঠাঁই
একতা বাঁধনে বাঁধা,
হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে আজি
মিলনে নাহিকো বাধা।

(৬)
মার আগমনে গাহে আগমনী
হরষে বিহগ নীড়ে,
বরণের ডালা শোভে ঘরে ঘরে
শিশির নিষিক্ত শিরে।

(৭)
গন্ধবহ লয়ে সুগন্ধের ভার
স্নিগধ শীতল করে,
এসেছে জননী এ শুভ-বারতা
কয় সবে হর্ষভরে।

(৮)
বিশাল নভের উদার বুকেতে
গলে পরি তারা-হার,
স্মিতমুখে ওই নিশারাণী যেন
পথ পানে চেয়ে মার।

(৯)
আজি যেন সবে মারে লয়ে ভোর
ভাবে না কিছুই আর,
মা-ই যে সাধনা মা-ই যে কামনা
মা মোক্ষ স্বরগ সার।

(১০)
এস মা জননি! ভকতবৎসলে!
পূজিছে তোমারে ধরা,
এস মা কল্যাণি! করুণারূপিনি!
বিপদ-বিষাদ-হরা!

(১১)
এস মা অভয়ে! এস মা বরদে!
অশেষ শকতিময়ি!
তোমারি প্রসাদে ভকত সন্তান
সংসার-সংগ্রাম জয়ী।

(১২)
অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত জীবন
বিবেক-সুবুদ্ধি-হারা,
কেমনে পূজিব না জানি তিলেক
তুমি মা শেখাও তারা!

(১৩)
সঁপেছি জীবন তোমারি চরণে
ভকতি-অরঘ ডালি,
আমারে তোমার গড়ে লও মাগো!
ধুয়ে ধরণীর কালি।

(১৪)
তুমি মা আমার ভরসা সম্বল
তুমি ছাড়া কিছু নাই;
জীবন-সন্ধ্যায় ওগো কৃপাময়ি!
ও চরণে দিও ঠাঁই।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

প্রেমের অলকানন্দা।

এস—প্রেমের অলকানন্দা
চল বিভঙ্গা কলতরঙ্গা, মধুসঙ্গীত ছন্দা!
মর্ত্ত্যের পথে বর্ত্তিবাহিনী, মূর্ত্তিধারিণী তৃপ্তি
এসো—পুণ্যোজ্জ্বলা অবিচঞ্চলা আলোকাঞ্চলা দীপ্তি,
এসো—বাসন্তী-শোভাপুঞ্জ, মম অন্তরে রচ কুঞ্জ,
আমার জীবননন্দন বনে তুমি গো যোজন-গন্ধা।
তরুর বক্ষে এসো জঙ্গমা নবপুষ্পিতা বল্লী
মরুর চক্ষে শষ্পস্বপন ফুটাও চন্দ্র মল্লী।
এসো—চিরাকাঙ্ক্ষিত ঋদ্ধি, এস—সাধনার্জ্জিত সিদ্ধি,
তব—চরণালক্তে ভক্তের প্রাণে জাগাও রক্তসন্ধ্যা।
দেবমন্দিরে সন্ধ্যারদীপ তব সিন্দুর বিন্দু,
তুমি সংসার সিন্ধু শিয়রে চিরসুন্দর ইন্দু,
এসো—লক্ষ্মীহীনের সদ্মে—তব-করধৃতলীলা পদ্মে,
বিদূরি লক্ষ যাতনা দুঃখ এসো চিরচিত-বন্দ্যা।

শ্রীকালিদাস রায়।

আলোকে ও আঁধারে।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভবতারণের গৃহ।

ভবতারণ ও সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধে। হায়, হায়! আপনি এ কি ক'ল্লেন? সব যে গেল!

ভব। যাবেই ত—যাবেই ত সিধু! যা সনাতন তাই থাকে, তা ছাড়া আর সবই ত যায়,—বুদ্বুদের মত ওঠে আর নিমিষে মিলিয়ে যায়—বর্ষার বন্যার মত কল্ কল্ ছল্ ছল্ ক'রে আসে, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেমে সব কোথায় চ'লে যায়! বুদ্বুদ যখন বসন্তের ফুলটির মত ফুটে ওঠে—বন্যাস্রোত যখন

নবযৌবনের মত শীর্ণ নদীদেহ ভ'রে উছ্‌লে ছোটে, তখন দেখ্‌তে বেশ,—নয়ন মন মুগ্ধ হয়—প্রাণ আকুল হ'য়ে তার অপূর্ব্ব শোভা পান ক'ত্তে উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে যায়! কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় সব চ'লে যায়! আবার যখন বর্ষা আসে, বুদ্‌বুদ ফোটে—কল কল ছল ছল উছল জলকল্লোলে জাহ্নবী ভ'রে ওঠে! এই আছে—এই নাই—মায়াময় এই নশ্বর জগতে সবই ত এই রকম। এই আছে এই নাই—এই নাই এই আছে! আসে আর যায়—যায় আর আসে। আহা! সে কি রকম? না—যেমন——

"জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

সিদ্ধে। হুঁ!—তা———

ভব। তাই ত সিধু—দেখে দেখে—ভেবে ভেবে—মনটা বড় উদাস হ'য়ে উঠ্‌ল। সদ্‌গুরুর কৃপা হ'ল,—মা মহামায়া প্রসন্না হ'লেন—আহা, মাগো! 'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবিমুক্তিহেতুঃ।' মহামায়া প্রসন্না হ'লেন, মোহের আঁধার থেকে মনটাকে কিছু মুক্ত ক'রে দিলেন, যা সত্য—যা সনাতন—তার দিকেই টেনে নিলেন,—অলীক যে সব ভুয়োবাজি নিয়ে এত দিন ছিলুম—তা ছেড়ে দিয়ে সনাতন ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'ল্লুম। (হাই তুলিয়া ও তুড়ী দিয়া) তারাঃ! আহা! মা—মাগো! ত্রাহি মে তারিণী! ত্রাহি মে তারিণী!

সিদ্ধে। আমি আর কি ব'ল্‌ব? আজ আপনি এই সব কথা ব'ল্‌ছেন———

ভব। হরিহে! তুমিই সত্য! তুমিই সত্য! 'ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে!' সিধু, কি কথা আর ব'ল্‌ব? যা সত্য—যা সনাতন—তাই ত কথা! এতদিন যা ব'লেছি তা ত ছিল—সব যেন—যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।' আজ যদি মার দয়ায় সনাতনী দৃষ্টি কিছু পেলুম—সনাতন ধর্ম্মের মহিমা কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম—আজও কি হায়, অবিপশ্চিতের ন্যায় মিথ্যা পুষ্পিতা কথা উচ্চারণ ক'র্‌ব? আঃ! তারা ব্রহ্মময়ী মাগো! কৃপা যদি ক'রেছ কৃপাময়ী, অধমকে চরণপ্রান্তে স্থান দিও মা—বঞ্চনা ক'রো না!

সিদ্ধে। দেখুন, এতদিন নিতান্ত অনুগত শিষ্যের মতই আপনার অনুসরণ ক'রেছি। কখনও কিছুতে প্রতিবাদ করিনি, যা ব'লেছেন তাই মেনে নিয়েছি, তাই ক'রেছি। মনে কখনও কিছুতে খট্‌কা হ'লেও তা গ্রাহ্য করিনি—ভেবেছি নেতাকে একান্ত দ্বিধাশূন্য হ'য়ে অনুসরণ না ক'ল্লে দেশের বা সমাজের প্রকৃত হিতসাধন কিছু হয় না। দোষ ত্রুটি ভুলচুক যাই হ'ক—কাজ কিছু ক'ত্তে হ'লে দলকে দলপতির মতই একজন নেতার অধীনে চ'ল্‌তে হয়।

ভব। তা ত ঠিকই সিধু—তা ত ঠিকই! আর এখনও ত তা ক'ত্তে পার। দেশের বা সমাজের হিত সাধন—কি জান সিধু—সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত হবে না। সনাতন ধর্ম্মের লীলাভূমি এই ভারতে—বিদেশের ধর্ম্মবিপর্য্যয়কর কোনও নূতন আদর্শ চ'ল্‌বে না। তাই ব'ল্‌ছি সিধু, এখন এই ধর্ম্মের সেবাতেই সমাজের যে কল্যাণব্রতে আত্মদান ক'চ্চি, তাতেই কেন আমার সহায় হও না? সিধু! এস! ভুল সব ভেঙ্গে ফেল! ভুল পথ ছেড়ে দেও! দেশের হিত নয়—বহু অহিতই এতদিন আমরা ক'রেছি। এস, যেমন আমার সহায় ছিলে, তেমনি সহায় হবে এস! এস—সনাতনধর্ম্ম আজ বিপর্য্যস্ত, বড় বিপন্ন, এস—তার উদ্ধার সাধন আমরা করি। দেশের হিত যদি চাও—তবে তার পথ এই——'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।' যাক্‌—নববিভাকর-সভা ভেঙ্গে যাক্‌! গোড়াতেই ত কত বড় গলদ আমাদের ছিল! বিভাকর কি কখনও নব হ'তে পারেন? তিনি যে চিরপুরাতন, শাশ্বত সনাতন! এস—নববিভাকর-সভা ভেঙ্গে যাচ্ছে যাক্‌—শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম সভা আমরা করি।

সিদ্ধে। দেখুন, সরল মনে যে কাজ ভাল ব'লে মনে ক'রেছি, একটা দল বেঁধে সেই কাজের নেতৃত্ব আপনি গ্রহণ ক'রেছিলেন ব'লেই এতদিন অপ্রতিবাদে আপনার অনুসরণ ক'রেছি। কিন্তু আজ——

ভব। আজ ভুল বুঝে সে পথ ছেড়েছি, সনাতন সত্য পথ যা তাই ধ'রেছি। হায়, সিধু! তোমাদের কি এ ভুল এখনও ভাঙ্গল না?

সিদ্ধে। হঠাৎ ভাঙ্গবার মত কিছু ঘটেনি, তাই ভাঙ্গেনি। আর আপনার যে এই সনাতনধর্ম্ম—তার মহিমাও আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

ভব। হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ! হরিবোল! হরিবোল! তারা ব্রহ্মময়ী! মাগো! তোমার লীলা কে বুঝ্‌বে মা? তুমি যে মা——

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতি মহাদেবী মহাসুরী॥"

দুর্গতিহরে দুর্গেগো! তুমিই এখন যা কর!

সিদ্ধে। দেখুন, আমার বুদ্ধি কিছু নিরেট—নড়ে চড়ে কম। আজ হঠাৎ যে আমি এত বছরের অভ্যস্ত পুরোণো পথ ছেড়ে—আপনার এই সনাতন ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াব, তার সম্ভাবনা কিছু নেই। ওসব তত্ত্বও আমার নিরেট মাথায় ঢুক্‌ছে না। তবে গোটা কতক কথা আপনাকে এসেছিলুম——

ভব। কথা! এখন কথা! সিধু, সন্ধ্যে যে হ'য়ে এল! এখন গঙ্গাস্নান ক'রে এসে একটু মায়ের নাম ক'র্‌ব—কালী কালী বল! পতিতপাবনী মাগো! সন্ধ্যে ত হ'য়ে এল, কবে ডেকে কোলে নেবে মা? কত আর এ ভবের হাটে খাটাবে মা?

সিদ্ধে। তা করবেন—সন্ধ্যের এখনও দেরী আছে। আমার কথা বেশী নয়—ব'লেও এমন ফল কিছু নেই—তবু না বলে পাচ্ছি না। জানিনা আমি ছাড়া আপনার বন্ধু কোথাও কেউ আছে কি না—থাক্‌লে আজ তারা চুপ ক'রে থাক্‌তে পারত না।

ভব। বন্ধু! আহা, সেই দীনের বন্ধু হরি বই কে আর প্রকৃত বন্ধু আছে সিধু?

সিদ্ধে। সভা ত আপনার ভেঙ্গে গেলই—আর আপনিও ব'ল্‌ছেন ও ভুল সভা ভেঙ্গেই যাক্‌। কিন্তু জানেন, লোকে আপনাকে কি ব'ল্‌ছে?

ভব। লোকে! লোকে কি ব'ল্‌ছে? কারও কোনও মন্দ আমি চিন্তাও ত কখনও করিনি! কে আমাকে কি ব'ল্‌তে পারে সিধু? হাঁ, মোহমুগ্ধ বুদ্ধিতে একটা ভ্রান্ত আদর্শ ধ'রে দেশের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা ক'রেছিলুম, দেশের লোকের দান বহু অর্থ তার জন্যে সংগ্রহ ক'রেছিলুম,—কিন্তু যখনই বুঝ্‌লুম আদর্শ ভুল—পথ ভুল—ও পথে দেশের মঙ্গল হবে না, ধর্ম্মের অনুরোধে কর্ত্তব্যের অনুরোধে যখনই পথ ছাড়্‌তে বাধ্য হলুম, আমার সংগৃহীত অর্থ অম্‌নি দেশ হিতে দিয়ে দিলুম! অবশ্য সনাতনধর্ম্মের প্রচারকার্য্যেও তা রাখ্‌তে পাত্‌ম; কিন্তু মনে হ'ল, সে অধিকার আমার নেই। কারণ, যাঁরা অর্থদান ক'রেছিলেন, তাঁরা ত তার জন্যে দান করেন নি? তাই, তাঁরা পছন্দ ক'ত্তে পারেন, এমন কাজেই সব প্রত্যর্পণ ক'রেছি। এখন যে পথ আশ্রয় ক'য়্‌লুম—সে আমার সনাতনী মায়ের সনাতন পথ। কিন্তু সে পথ আজ—হায়—মায়ের ভ্রান্ত সন্তানগণের অবহেলায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে! পথ মুক্ত ও প্রশস্ত ক'ত্তে হবে—তার জন্য অর্থেরও হয়ত প্রয়োজন হবে,—তবে মায়ের কাজ—মায়ের সেবা—অর্থ মা-ই জুটিয়ে দেবেন। আমার ভাব্‌বার কিছু দরকার নাই।

সিদ্ধে। হাঁ, সংবাদপত্রে এই সাফাই-ই দেখ্‌তে পাচ্ছি বটে। কিন্তু জান্‌বেন, লোকে তাতে ভুল্‌ছে না। সকলই আপনাকে নিন্দে ক'চ্চে—ধিক্কার দিচ্চে—ব'ল্‌ছে জগদীশবাবুর জমিদারীর লোভেই আপনি নিজকে বিকিয়ে দিলেন।

এত বড় সম্পত্তি হাতে আস্‌ছে,—তাই নামটা রাখবার আশাতেই—এ টাকাটা দান ক'ল্লেন।

ভব। মহাভারত! রামঃ! রামঃ! একি কথা সিধু? এমন চিন্তাও ত আমি কখনও করিনি? হাঁ, জগদীশবাবু বন্ধু লোক—নিতান্ত ধ'রে প'ড়লেন,—তাঁর কন্যাটিকে বধূত্বে গ্রহণ ক'ত্তে স্বীকৃত হ'তে হ'য়েছে। সনাতনধর্ম্মের বিধানে এইরূপ অজাতরজা বালিকা কন্যাকেই কুলবধূরূপে গ্রহণ ক'ত্তে হয়। তাঁর জমিদারী? আ—ছি ছি ছি! তিনি যে এখনও যুবাবয়স্ক—স্ত্রী রোগযুক্তা হ'লে কিম্বা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ক'ল্লে এখনও যে কত পুত্রসন্তান তাঁর লাভ হ'তে পারে। না হয়, ধর্ম্মবিধান র'য়েছে—বংশরক্ষার্থ পোষ্যপুত্রও তিনি গ্রহণ ক'ত্তে পারেন। তাঁর কন্যাজামাতাদৌহিত্রাদির পক্ষে তাঁর জমিদারী উত্তরাধিকার করার আশা যে নিতান্ত পাপ আশা! ধিক্ ধিক্! এমন কথাও লোকে মুখে উচ্চারণ করে! করুক—যার যা খুসী বলুক! এতে আর অধীর হ'লে কি হবে? ধর্ম্ম আছেন—ভগবৎকৃপায় তাতেই যেন আমার মতি স্থির থাকে। গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধী মুর্নিরুচ্যতে॥'

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! তারা ব্রহ্মময়ী! তুমি যা কর!

সিদ্ধে। যাই বলুন, লোকে যে মিথ্যা কিছু ব'ল্‌ছে—এমন আমিও মনে ক'ত্তে পারি না। দেখুন, আমি আপনার বন্ধু—বাস্তবিক হিতার্থী বন্ধু। একেবারে আপনাকে এমন ক'রে বিকিয়ে দেবেন না। কাগজে যাই লেখান, সবাই হাস্‌ছে—টিট্‌কারী দিচ্চে—ধিক্কার দিচ্চে। এখনও সময় আছে। টাকা সব দান ক'রেছেন—ভাল কাজের টাকা ভাল কাজেই দান ক'রেছেন—বেশ ক'রেছেন। তাতেই সব রক্ষে হবে। প্রায়শ্চিত্ত টিত্তও যা ক'রেছেন,—সব লোকে মাপ ক'র্‌বে। কিন্তু বিয়েটা আর দেবেন না—বড্ড কেলেঙ্কারী হবে—আর সামলাবার উপায় থাক্‌বে না।

ভব। কি সামলাব সিধু? এতদিনের ভুল সাম্‌লে সনাতন সত্য পথ ধরলুম—তায় আর সামলাব কি? সব যাবে! কি যাবে? যাবে ত পার্থিব যশ। যাক্! সে ত হীন খেলনা মাত্র। তার জন্য সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌ব? কাচের লোভে কাঞ্চন ধূলিতে ফেলে দেব? সিধু! বোঝ—বোঝ! ভুলের চশমা চোকে র'য়েছে—ভেঙ্গে দূরে ফেলে দেও!

আলোক যে কি, একবার চেয়ে দেখ! ভুলে আমার সহায় ছিলে,—এস—এই সত্যে এখন আমার সহায় হ'য়ে এসে দাঁড়াও! ছেলেছোকরাদের নিয়ে বাজে একটা সভা ছিল—যাক্ সে সভা! এস—সনাতনী ভিত্তিতে সনাতনী সভা আমরা ক'র্‌ব। দেশের প্রবীণ সাধুসজ্জন সকলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক হবেন। ভাবনা কি সিধু? ভয় কি? মা অভয়ার চরণে শরণ নেব—ভয় কিসের?

সিদ্ধে। আপনি যা ক'র্‌বেন করুন। আমাকে কেন আর ও কেলেঙ্কারীতে টেনে নিতে চান? ব'লেছিই ত আপনার ও সব সনাতন ধর্ম্মটর্ম্মের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। মাপ ক'র্‌বেন—বড় দুঃখেই ব'ল্‌ছি—জগদীশ বাবুর জমিদারীর উপরে যে ওতে আর কিছু আছে, তাও মনে হ'চ্চে না।

ভব। সিধু, মিছে কেন ও সব সন্দেহ ক'চ্চ? লোকের কথায় ভুল বুঝো না। এস, আমার সঙ্গে থাক। কাজ হবে,—তোমারও উপকার হবে। দুঃখ কষ্টে দিন কাটাচ্চ—ইস্কুলও ভাল চ'ল্‌ছে না—জগদীশ বাবুকে ব'লে তাঁর জমিদারীতে একটা ভাল চাকরী বরং তোমায় করিয়ে দেব। জান্‌লে?

সিদ্ধে। মাপ করুন, দুঃখ কষ্ট জীবন ভ'রেই পেয়েছি—বাকী জীবনও পাব, তার জন্যে ডরাই না। সরল মনে যা ভাল বুঝেছি—সেই ভাবেই চ'লেছি,—এখনও তাই চ'ল্‌ব। এ সভা চালাতে পারি, সে শক্তি আমার নেই। তবে ভাল যা বুঝি, নিজের জীবনই তাই ধ'রে কাটাব। কি আর ক'র্‌ব? সব গেল—যাক্! ধ'রে রাখ্‌ব, সে শক্তি ভগবান্ আমায় দেন নি। আসি তবে, নমস্কার।

ভব। এস। কিন্তু—বড় ভুল বুঝ্‌লে সিধু।

সিদ্ধে। ভুলই হ'ক্ আর যাই হ'ক,—যা বুঝেছি, তাই ধ'রেই চ'ল্‌তে হবে। ভুল কখনও ভাঙ্গে, সত্য কি তা যদি দেখ্‌তে পাই—যিনি দেখাবেন, তিনিই সে সত্যে চালাবেন। তার জন্য বড় চাকরীর প্রলোভন দরকার হবে না। আসি তবে—নমস্কার! (প্রস্থান)

ভব। হুঁ—! সিধুও বিগড়ে গেল! ওকে হাতে রাখ্‌তে পাল্লে কাজ হ'ত। দেখি—ক্রমে যদি বাগিয়ে নেওয়া যায়। এ দিকে সব ত হ'ল—এখন একটা পাকা লেখাপড়া ক'রে বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌তে পাল্লেই বাঁচা যায়! জগদীশ-বাবু আবার হঠাৎ কাশী চ'লে গেল! মুখোমুখি একটা কথাও হ'ল না,—কবে আস্‌বে—কবে একটা পাকা এগ্রিমেণ্ট হবে—ঠিক কি? টাকাগুলোও সব

বের ক'রে দিলুম,—এখন হাতে যা আছে, সে ত নীলিমার টাকা! হতভাগী আবার এমন একটা গোল পাকিয়ে বসেছে! আবার দার্জ্জিলিঙ্গ যাবে বাই ধ'রেছে! চিঠির পর চিঠি লিখ্‌ছে—টাকাটা সব তার হাতে দেবার জন্যে। একেবারে হাত খালি ক'রেই বা কি ক'রে ফেলি? ব'ল্‌ছি, তুমি মেয়ে মানুষ—অতগুলো টাকা একেবারে হাতে নিয়ে শেষে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে,—এখন নেহাৎ যা লাগে তাই বরং নেও। হতভাগী সে কথা কাণেও তোলে না! সব এখন কিছুতেই যে হাতছাড়া ক'রে দিতে পারি নে। জগদীশ বাবুই বা কবে আস্‌বে? সে এলেও দেখ্‌তুম—এ টাকাটা তাঁর ঠেঁয়েই আদায় করা যায় কি না।

(কৃষ্ণলালের প্রবেশ)

এই যে কেষ্টলাল! এস বাবা এস! জগদীশবাবু কি এলেন?

কৃষ্ণ। তিনি ত—এসেছেন। কিন্তু——

ভব। কিন্তু! আবার কিন্তু কি? এ দিকে ত সব ঠিক—আমি ত তৈরী। যা যা তোমরা দাবী ক'রেছিলে—সবই ত ক'রেছি—কিছু ত আর বাকী নেই! আবার কিন্তু কি? আর কি ক'ত্তে হবে? বল!

কৃষ্ণ। আপনার ত ত্রুটি কিছুই নাই। কিন্তু এ দিকে যে ভারী গোল বেধে গেল।

ভব। গোল! কিসের গোল?

কৃষ্ণ। জগদীশবাবুর মা ভারী বেঁকে ব'সেছেন। কে কে ভট্‌চাজ্জ এসে বলেছে, প্রায়শ্চিত্ত ক'ল্লেও বিলেত যাওয়ার দোষ একেবারে যায় না। বিশুদ্ধ হিন্দুমতে যাঁরা থাক্‌তে চান, তাঁরা তাদের সঙ্গে একেবারে মিশ্‌তে পারেন না। তাতে পাপের ভাগী হ'তে হয়।

ভব। তারপর?

কৃষ্ণ। বুড়ী এখন ব'ল্‌ছে, ভবতারণ বাবু ত বিলেত যাননি, যা একটু অনাচার এখানেই ক'রেছেন। প্রায়শ্চিত্তে সে দোষ কেটে গেছে। তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতে করা যায়। কিন্তু বিনোদকে ত জামাই ব'লে ঘরে নেওয়া যেতে পারে না!

ভব। সে কি কথা কেষ্টলাল? অাঁ! বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলে কুটুম্বিতে কি ক'রে হবে? বিয়ের যুগ্যি আর ছেলে যে আমার নেই!

কৃষ্ণ। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্চি। কিন্তু বুড়ী ভারী বেঁকে ব'সেছে। কিছুতেই বাগান গেল না।

ভব। না গেলে চ'ল্‌বে কেন এখন? বল কি? এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা! এদিকে যে একেবারে আমার দফারফা হ'য়ে গেছে! আমাকে এতখানি নাবিয়ে ফেল্লে, এ দিকে আমার সব ভেঙ্গে দিলে, টাকাগুলো পর্য্যন্ত সব বের করে নিলে, এখন ব'লছ বাগান গেল না! ভদ্রলোকেও ভদ্রলোকের এমন সর্ব্বনাশ করে!

কৃষ্ণ। তাই ত জগদীশবাবু লজ্জায় একেবারে মরে আছেন—

ভব। লজ্জায় তিনি মরুন—তাতে ত আর আমার কিছু লাভ হ'ল না। না—না, কেষ্টলাল! এ সব খেলার কথা নয়। এখন পিছোলে চ'ল্‌বে কেন? যে সব সর্ত্ত হয়েছিল, ঠিক সেই সেই সর্ত্ত মত বিয়ে এখন দিতেই হবে। নইলে ছাড়ব কেন আমি? এ কি একটা ছেলে খেলার ব্যাপার?

কৃষ্ণ। তা ত নয়ই! কিন্তু উপায় কি? জানেন ত সব, জগদীশবাবু যে কেউ নন, সব তাঁর মার হাতে।

ভব। তা ব'লে এখন কি হবে? মাকে বাধ্য তাঁকে ক'ত্তেই হবে। নইলে চ'ল্‌বে কেন এখন? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এখন তিনি পিছিয়ে যাবেন! নালিশ ক'র্‌ব আমি—চুক্তি ভঙ্গের নালিশ ক'র্‌ব—দু লাখ টাকা ক্ষতি পূরণ ব'লে দাবী ক'রব! কেবল দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী মামলাও হবে—এ যে পরিষ্কার বিশ্বাসভঙ্গ—ব্রিচ্ অব্ ট্রাষ্ট! বুঝিয়ে ব'লো, কেষ্টলাল! ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো, তাঁকে জেলে যেতে হবে! নিজের ঘর ঠিক না ক'রে কেন তিনি আমাকে এই সর্ব্বনাশের মধ্যে এনে ফেলেছেন?

কৃষ্ণ। হুঁ! সে যা ক'ত্তে বসেছে—ব'ল্‌তে কি—নালিশ করে তাকে জেলে কেন—ফাঁসি দিতে পাল্লেই ঠিক হত। কিন্তু তাঐ মশাই—আপনি এমন বুদ্ধিমান লোক—বুঝতে পাচ্চেন না? নালিশ কি ব'লে ক'র্‌বেন? ফৌজদারী ত—হয়ই না,—আইনে বিশ্বাসভঙ্গ—ব্রিচ্ অব্ ট্রাষ্ট—যাকে বলে, জগদীশ বাবুর সে রকম কোনও অপরাধ কিছু হয়নি। এক চুক্তিভঙ্গ আর তার জন্যে ক্ষতিপূরণ। কিন্তু জগদীশবাবু জবাব দেবেন এখন, তাঁর সঙ্গে আপনার এমন কিছু চুক্তি হয়নি।

ভব। লেখাপড়ায় না হ'ক্—মুখে ত হয়েছে? আইনে তাতেই চুক্তি হয়,—তুমি সাক্ষী আছ।

কৃষ্ণ। আমি কিসের সাক্ষী আছি তাঐ মশাই। জগদীশ বাবুর সঙ্গে ত আপনার কোন কথাই হয় নাই।

ভব। তিনি যে কাশী গিয়ে পার হলেন! তা—তাঁর প্রতিনিধি তোমার সঙ্গে ত কথা হ'য়েছে! তাতেই তাঁকে দায়ী হ'তে হবে!

কৃষ্ণ। আমার সঙ্গেও—ঠিক কোনও চুক্তির মত কথা হ'য়েছিল কি? তাঁর পক্ষে এইমাত্র আপনাকে এসে জানাই যে আপনি এই এই কাজ ক'ল্লে—তারপর এই বিবাহ সম্বন্ধ হ'তে পারে। এতে কি চুক্তির দায়ীত্ব তাঁর কিছু হ'তে পারে?

ভব। তাঁর না হ'ক্ তোমার হবে! জান্‌লে কেষ্টলাল? এ খেলার কথা নয়। তোমাকে এর জন্যে দায়ী হতে হবে।

কৃষ্ণ। আপনার সঙ্গে ত আমার কিছু চুক্তি হয়নি, তাঐ মশাই। মেয়ে জগদীশ বাবুর, সম্পত্তি জগদীশ বাবুর,—আমি কে? আমার সঙ্গে তা নিয়ে আপনার কি চুক্তি হতে পারে?

ভব। তুমিই ত এসে আমাকে ভজিয়েছিলে!

কৃষ্ণ। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিদ্যা বেশী, বুদ্ধি বেশী। আপনাকে ভজাতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার কি আছে তাঐ মশাই? হাঁ, একটা ভালর সম্ভাবনা দেখে, কিছু হিতোপদেশ আপনাকে দেবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। তা, এতে কি আইনে আটক পড়বার মত অপরাধ কিছু আমার হ'য়েছে?

ভব। এত বড় একটা ভেল্‌কি দিয়ে ভুলিয়ে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, আর ব'লছ অপরাধ হয়নি? হয়েছে কি হয়নি, তা আদালতে বোঝা যাবে।

কৃষ্ণ। আপনি নাবালকও নন, স্ত্রীলোকও নন,—এত বড় একজন প্রবীণ বিজ্ঞ লোক, একটা হিতাহিত জ্ঞান আপনারও ত আছে? আমি একজন নগণ্য গেঁয়ে লোক, আপনাকে ভেল্‌কি দিয়ে ভুলিয়েছিলুম, একথা কোন্ মুখে গিয়ে আদালতে বল্‌বেন, তাঐ মশাই? আর ভেল্‌কি দিয়ে ভুলিয়েই যদি থাকি, ক্ষতি ত আপনার কিছু করিনি? ক্ষতি হলে আদালতে নালিশ চ'ল্‌তে পারে, নইলে—

ভব। ক্ষতি করনি? যথাসর্ব্বস্ব আমার বের ক'রে নিলে, আবার ক্ষতি করনি?

কৃষ্ণ। দেশের কাজে দেশের দেওয়া টাকা আপনার হাতে গচ্ছিত ছিল, সেচ্ছায় আপনি তা দেশের কাজেই দান ক'রেছেন। সকল খবরের কাগজে ত তাই ঘোষণা ক'রেছেন।

ভব। তুমিই ত করিয়েছ! খবরের কাগজে ত তোমার ফুস্‌লিমিতেই লিখেছি। ওরে হতভাগা হারামজাদা! একেবারে সব দিকে যে তুই আমায়

খেয়েছিস্! একটা প্রায়শ্চিত্ত করালি, সভাটা ভেঙ্গে দিলি,—হায় হায়রে, ওরে সর্ব্বনেশে! আমার মাথাটা সবদিকে যে একেবারে তুই-ই খেলি!

কৃষ্ণ। মহাভারত! আপনি গুরুজন, আপনার মাথা আমি খেতে পারি? ভগবানের কৃপায় সনাতন ধর্ম্মে আপনার মতি গেল,—সকল পাপ মুক্ত হয়ে, সনাতন ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করে এখন কৃতার্থ হবেন, তাই না নিজেই সকল বামুনপণ্ডিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত কল্লেন?—প্রায়শ্চিত্তের সভায় মুক্তকণ্ঠে তাই না সকলকে বল্লেন? তারপর নেতা আপনি স'রে দাঁড়ালেন,—সভা আপনিই ভেঙ্গে গেল। আমি ঠ্যাঙা লাঠি নিয়ে গিয়ে ত ভেঙ্গে দিই নি?

ভব। (সহসা দুই হাতে কেষ্টলালের হাত ধরিয়া) কেষ্টলাল! বাবা! তুমি আমায় রক্ষা কর! বড় দুঃখে রাগ ক'রে দুটো কথা ব'লেছি, কিছু মনে করো না। বাবা, তুমি না রাখলে আর যে আমার উপায় নেই বাবা! জগদীশ বাবু তোমার বন্ধু,—তাঁর ত ইচ্ছে ছিলই!—বাবা, একটু ব'লে ক'য়ে দেওনা বাবা,—আমার যে একেবারে সর্ব্বনাশ হ'ল—সব যে আমার গেল! বিনোদ যে ধরে আমায় জুতো মারবে! হায় হায়! ভ্যাটাভেলের মেয়ে—সেও যে ঢের দিত—তার একটা হিল্লে হত,—এখন যে আর সে মুখো হবার যো নেই। ভ্যাটাভেল জুতো মারবে! বাবা, আমার যা হ'য়েছিল তা হ'য়েছিল। বিনোদকেও যে একেবারে মাটি কল্লুম বাবা! বাবা, তুমি এখন বাঁচাও, বাবা! গুরুজন আমি—তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। তোমার ভাল হবে বাবা,—এর একটা উপায় তুমি এখন কর বাবা! একেবারে সব দিকে যে মারা গেলুম বাবা, সব দিকে যে মারা গেলুম! কেষ্টলাল! বাবা। এখন কি ক'র্‌ব বাবা? তুমি বই যে আর আমার গতি নেই-রে বাবা! ওহো হো হো!

কৃষ্ণ। আমার সাধ্য কি তাঐ মশাই? সাধ্য যা ছিল তা ক'রেছি। কিন্তু হলনা। জগদীশ বাবুর মাকে এ বিয়েতে মত লওয়াতে পারে এমন ক্ষমতা কারও নেই।

ভব। তবে কি হবে কেষ্টলাল?

কৃষ্ণ। ভগবৎ কৃপা হয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ ক'রেছেন, ভাবনা কি? সনাতন সেই ধর্ম্মই আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। জানেন ত——

"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্?"

ভব। আর বাবা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। যা গেল, সনাতন ধর্ম্মের বাবার বাবাও যে তা আমায় দিতে পারবে না।

কৃষ্ণ। তার অনেক বেশী দেবে। শক্ত করে ধরুন, ভাবনা কি? আসি তবে এখন তাঐ মশাই। প্রণাম।

(প্রস্থান।)

ভব। গেল—সব গেল—সব গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল! এখন উপায়? কিছুই যে নেই!—সর্ব্বনাশ হ'ক্! জগদীশ রায়ের সর্ব্বনাশ হ'ক! আর ওই কেষ্টলাল—সব ওর কারসাজি!—ওই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। হারামজাদা!—সর্ব্বনাশের সর্ব্বনাশ তোর হ'ক্! যে জোচ্চোর তুই—জেলের কয়েদী হ'য়ে তোকে প'চে ম'ত্তে হবে! আজ এড়ালি, কিন্তু কদিন এড়াবি? পাপের ফল একদিন ভুগতেই হবে। হায় হায়! কি হ'ল! কি হ'ল! এখন কি করি? কোন পথ ধরি? সনাতন ধর্ম্ম,—হাঁ—কেষ্টলাল ঠিক ব'লেছে—ঐটেই এখন শক্ত ক'রে ধত্তে হবে। আর কোনও উপায় নেই,—সব মাটি ক'রেছি। ওই এক পথই এখন আছে। পথেই ত এসে একরকম দাঁড়িয়েছি,—এই পথেই চলি, শেষে যা হয়। দেশের বড়লোকদেরও সনাতনধর্ম্মে একটা টান দেখা দিয়েছে—হাঁ, এই-ই এখন পথ!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

মনুর প্রবেশ।

মনু। (গান)

কে বলে সব ছেলেখেলা—কোথায় ছেলে কোথায় খেলা?
কোথায় খোলা প্রাণের হাসি—গলাগলি গায়ে ঢলা!
হাসির বুকে হাসি মুখে
ছড়ায় হাসি কুড়ায় সুখে—
প্রাণঢালা সে খেলা কোথায়—কোথায় ছেলের হাসির মেলা!
নেইকো ছেলে খেলার মাঠে,
ঝুনো বুড়োই ঠকের হাটে,
সুধুই ঠকের কেনা বেচা—ঠকের খেলায় পাশা ফেলা!

আঁধারে সে ঠকবাজারে,
এর পিঠে ও ছুরী মারে,—
আলোয় কোথা খেলে ছেলে, ঘরে ফেরে সাঁঝের বেলা !

(কৃষ্ণলালের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মনু !

মনু। কে—দাদা ? দাদা ! তুমি—এখানে ?

কৃষ্ণ। মনু ! আয় দাদা ! ঘরে ফিরে আয় ! সেই রেতে কোথায় পালিয়ে গেলি—সারাদিন তোকে খুঁজছি ! আয়, ঘরে আয় !

মনু। দাদা !

কৃষ্ণ। মনু ! কেন পালিয়ে এলি ?—কোথায় যাবি ? কেনই বা যাবি ? আয় দাদা, ঘরে ফিরে আয় ! সংসার সুধুই ঠকের বাজার নয়—ছেলেরা খেলে, এমন মাঠও ঢের আছে।

মনু। দাদা ! ভাব্‌তুম তা আছে। কিন্তু ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে ! দাদা, তুমিই ঠকালে দাদা ! কে তবে আর সংসারে ঠক নয় ? কে কোথায় আর ছেলে আছে দাদা ?—ঠকের বাজার বই কোথায় আর এ সংসারে ছেলের খেলার মাঠ আছে দাদা ?

কৃষ্ণ। মনু, আর কেউ কোথাও ছেলে না থাক্—তুই আছিস্! তুই একেবারেই ছেলে—তাই ভাব্‌ছিস্ আমি ঠকিয়েছি।—আর তাই বুঝি মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিস্ ?

মনু। ঠকাওনি কি দাদা ?

কৃষ্ণ। ঠকিয়েই যদি থাকি, কাকে ঠকিয়েছি মনু ?

মনু। দেশের সব চেয়ে বড় ঠককে। কিন্তু তবু ত ঠকিয়েছ ?

কৃষ্ণ। ঠকিয়েছি ! তার ঠকামো থেকে সারাটা দেশকে রক্ষা ক'ত্তে দেশের সব চেয়ে বড় ঠককে ঠকিয়েছি। কিছু এমন অন্যায় ক'রেছি কি মনু ? মনু, একেবারে কচি ছেলেটির মত এটা দেখিস্ নি—বুড়োর মত একটু ভেবে দেখ, তারপর বল্———

মনু। বুড়োর মত কিছুই ভাব্‌তে চাইনি দাদা ! যদি ছেলে আছি, ছেলের মতই থাক্‌ব,—ছেলের মতই সব দেখ্‌ব,—বুড়োর মত আর ভাব্‌তে কিছু বলো না দাদা !

কৃষ্ণ। মনু, প্রাণে যত পারিস্ ছেলে হ'য়ে থাক্। কিন্তু মাথায় একটু

বুড়ো হ। হ'তে হবে। নইলে যে মানুষ হবিনে। প্রাণে ছেলে, মাথায় বুড়ো, এই ত মানুষ—এই মানুষই মানুষের রাজা!—মাথায়ও যে ছেলে, সে ত পাগল!

মনু। যা ব'ল্লে দাদা ঠিক! কিন্তু প্রাণটা যে মাথাকে একেবারে দখল ক'রে ব'স্তে চায়।

কৃষ্ণ। চাইলেই কি দিতে হয়? যার যার ন্যায্য অধিকারে সব ঠিক রাখ্তে হয়। নইলে মানুষ যে তার মানুষের ধর্ম্ম পালন ক'র্ত্তে পারে না মনু?

মনু। বড় শক্ত দাদা! প্রাণটা আজ মাথাটাকে দখল ক'রে নিতে চাইছে,—আজ তাকে দমন ক'র্ব। কিন্তু কে জানে দাদা, দমে যদি একেবারেই সে নরম হ'য়ে পড়ে, তখন মাথাটাই যদি নেমে তাকে দখল ক'রে ফেল্তে চায়,—না দাদা, কাজ নেই! মানুষ না হই—নেই হলুম। পাগল ছেলে—হাঁ, তার চেয়ে পাগল ছেলেই আমার ভাল।

কৃষ্ণ। ভয় নেই রে পাগল!—আর যেখানে যাই হ'ক্—তোর মাথা এসে কখনও তোর প্রাণটা একেবারে দখল ক'রে ফেল্তে পার্বে না। তবে প্রাণের পাগলামোটা একটু দমন ক'রে রাখ্তে পারে,—তা পার্লেই ভাল।

মনু। বুড়োর মত মাথায় ত দাদা এই ঢোকাতে চাও—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'! কিন্তু দাদা, শঠ হ'লে বা কি তার সঙ্গে শাঠ্যই ক'র্ত্তে হবে? শাঠ্যই যে তবে এ সংসারে মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম হ'য়ে উঠ্বে দাদা!

কৃষ্ণ। শঠ হ'লে তার সঙ্গে শাঠ্যই ক'র্ত্তে হবে, কথাটার এমন সর্ব্বনেশে মানে করা ভুল। সাধু উপায়ে শঠকে যদি দমন করা না যায়, সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে দমন করা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে অগত্যা শাঠ্যেই তাকে দমন ক'র্ত্তে হবে।

মনু। হঁ—! বুড়োর মাথায় ভাব্লে কথাটা ঠিকই মনে হবে। কিন্তু তবু—ছেলের প্রাণে গিয়ে একটু আঘাত তায় করে না কি দাদা?

কৃষ্ণ। করুক, কিন্তু সে আঘাতের ব্যথা ছেলেকেও সংযত ক'রে রাখ্তে হয়। এই ত তোদের এই পরম ভণ্ড ভবতারণ—ভণ্ডামী ক'রে কত ছেলের মাথা খাচ্ছিল, কত লোকের টাকা এনে নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাচ্ছিল!—তোদের কুড়োন টাকা—নিজের ছেলেকে তা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছে—আর তোদের খেতে পর্য্যন্ত পয়সাটি দেয় নি। তা নাই দিক! দেশের হিত—দশের হিত—সমাজের হিত—এই সব নাম ক'রে টাকা তুলে বড় লোক কেউ যদি তা

নিজে খায়, সে দেশের সে সমাজের কোনও কল্যাণে কেউ আর কখনও কারও হাতে একটি পয়সা দিতে চাইবে? এই রকম ভণ্ডামী—এই সর্ব্বনেশে ঠকামো—চুপ ক'রে স'য়ে যাওয়া—তার প্রশ্রয় দেওয়া—এর চেয়ে বড় অনিষ্ট দেশের আর সমাজের পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না। এ সব পথে একেবারে কাঁটা দেওয়া চাই। আর এই যে পরম ভণ্ড তোদের ভবতারণ—কতদিন আর লোক ঠকিয়ে সে টাকা আনবে? যা এনেছে—কত দিন আর তা নিজে ঘরে ব'সে আরামে খাবে? তার ভণ্ডামো—ঠকামো সব বন্ধ ক'রা চাই,—দশের টাকাও সাধ্য হ'লে দশের কাজে বের ক'রে আনা চাই। কেমন—চাই না কি মনু?

মনু। চাই বই কি? কিন্তু দাদা, এত বড় একটা ঠকামো ছাড়া কি আর কিছুতে এটা হ'ত না? তিনি যত বড়ই ঠক হ'ন—তুমি যে তাঁরও বড় ঠক হ'লে দাদা!

কৃষ্ণ। তা না হলে তাকে ঠকাব কি ক'রে মনু? ঠকে ঠকে ঠকামোর লড়াই,—যে জিন্‌বে, তাকে বড় ঠক হ'তেই হবে। মনু, ওসব খুঁৎখুঁতি কিছু মনে রাখিস্ নি। আর কোনও উপায় ছিল না,—থাকৃলে এ ঠকামো ক'ত্তুম না। বড় পাকা শয়তান সে, এত বড় একটা কেলেঙ্কারী না হ'লে লোকের চোক ফুট্‌ত না,—তাকে সহজে কেউ চিন্‌ত না। দেশ ছড়ান লোকের টাকা কুড়িয়ে এনে তোরা তার হাতে দিয়েছিলি—কি দাবী ক'রে কোথা হ'তে কে এসে সে টাকা আজ বের ক'ত্তে পার্‌ত? বড় লোভী সে, লোভে জগদীশ রায়ের কাছে ঘোরা ঘুরি ক'ত্ত। সেই দিক থেকেই বড় লোভের ছলে তাকে ঠকিয়েছি। দেশে আর সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না,—অন্ততঃ দেশহিতৈষণায় ভেক ধ'রে আর কারও টাকা ঠকিয়ে নিতে পার্‌বে না।—যা নিয়েছিল, তাও বের ক'রেছি।

মনু। দেশ হিতৈষীর ভেক আর ধর্‌তে পারবেন না ঠিক্। তবে—চালাক লোক—সব গেল—নূতন কিছু একটা এমন কর্‌বেনই, যাতে নূতন পথে আবার নূতন টাকা আসে।

কৃষ্ণ। এক ধর্ম্মের ভেক এখন ধ'ত্তে পারে। ধুয়োও তাই ধরেছে। আর, এ কেলেঙ্কারীর সাফাই দিতে হ'লে এখন সনাতন ধর্ম্মের বড় একটা চাঁই-ই তাকে হ'তে হবে। দেশের লোকও হয়েছে এমন—ধর্ম্মের হুজুগ একটা তুলে দিলে তাদের আর কাণ্ডজ্ঞান কিছু থাকে না। হুঁ—এই ভেক ধ'ল্লে কিছু হবে বটে! হক্! মূর্খের টাকা ভণ্ডেরা লুটেই খায়। তা খাক্। ও আর ভাবা মিছে!

তা তুই এখন ঘরে যাবি, না সনাতনী ভেক নিয়ে আবার গিয়ে গুরুর সনাতনী চেলা হবি ?

মনু। দাদা, আর কেন দাদা ? ঢের হ'য়েছে ! এখন তুমিই আমার গুরু, তোমার যে ধর্ম্ম, আমারও সেই ধর্ম্ম।

কৃষ্ণ। আমার ধর্ম্ম আপাততঃ গার্হস্থ্য।

মনু। সুধুই গার্হস্থ্য দাদা ? সমাজ সেবা—লোক সেবা—এসব একেবারে বাদ দেবে ?

কৃষ্ণ। এ সব গার্হস্থ্যের অঙ্গ, তার বাইরে নয়। গৃহস্থ একা তার ঘরে থাকে না,—সমাজের এক জন সামাজিকও সে। সামাজিক ছাড়া গৃহস্থ হ'তে পারে না। সামাজিক ধর্ম্ম যে অবহেলা করে, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তার পূর্ণ হয় না।

মনু। ভাল, তবে গৃহস্থই হব দাদা,—চল।

কৃষ্ণ। হবি ত—কিন্তু আধা হ'লে চ'ল্‌বে না। পুরো হ'তে হবে।

মনু। কে পোরাবে দাদা ?

কৃষ্ণ। পোরাতে যাকে আন্‌ব সেই।

মনু। এমন কেউ দাদা তোমার মনুর ঘরে আস্‌বে না,—ও খেয়াল ছেড়ে দেও। আমি আধ পাগলা—আধা গেরস্তালীই আমার ঠিক হবে।

কৃষ্ণ। তুই পুরো পাগল,—পুরো গৃহস্থই তোকে হ'তে হবে। নইলে পাগলামোর ঠিক ওষুধ হবে না, জান্‌লি ? খেয়াল ছেড়ে দেব কিরে ? খেয়াল যে কাজে পাকিয়ে এল। পোরাতে যাকে আন্‌ব, তাকে আনার ব্যবস্থাই যে হয়ে গেল।

মনু। হ'য়ে গেল ! বল কি দাদা ?

কৃষ্ণ। প্রায় হ'য়ে গেল বই কি ? তবে তুই নাকি সাবালক হ'য়ে উঠেছিস্, কে জানে যদি কোথাও আবার কারও প্রেমেই প'ড়ে থাকিস্—সেই পড়ার দলেই এদ্দিন ছিলি কি না—তাই একবার তোকে সুধোবার অপেক্ষা আছে। তা বল্ না—যদি আর কারও প্রেমে প'ড়েই থাকিস্—একে বরং ছেড়ে দিই, তাকেই আন্‌বার চেষ্টা দেখি।

মনু। দাদা, তুমি কি পাগল হলে ? আমার বিয়ে দেবে ?

কৃষ্ণ। দেব না কেন ? গেরস্ত হবি, গিন্নী নইলে চ'ল্‌বে কেন ? তোরা ত বউ বিয়ে ক'ত্তে চাস্‌নে, চাস্ গিন্নী। তা ঠিক গিন্নীই আস্‌বে, ভাবনা নেই। রমা ত নেহাৎ কচি মেয়েটি নয়।

মনু। রমা!—কে—মিস্ মজুমদার?

কৃষ্ণ। সম্প্রতি হবেন মিসেস্ রায়। ও কিরে মনু? একেবারে যে হা ক'রে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি! তা তোর পছন্দ না হয়, প্রেমের টান আর কোথাও গিয়ে প'ড়ে থাকে, বল্। এখনও পাকা কথা হয় নি। এটা ছেড়েই দি।

মনু। দাদা! এ কি অসম্ভব কথা তুমি ব'লছ? মিস্ মজুমদারের সঙ্গে আমার বিয়ে! একি হ'তে পারে?

কৃষ্ণ। হুঁ! মনের মত হয়নি! তা—কোন্ রাজনন্দিনী প্যারী পদ্মিনী তুই চাস্—বল্। সাধ্যে কুলোয় চেষ্টা ক'রে দেখি!

মনু। দাদা তুমি কি ব'ল্ছ? তুমি যে উল্‌টো বুঝছ? মিস্ মজুমদারের সম্বন্ধে আমার পছন্দ অপছন্দের একটা কথাই যে চ'ল্‌তে পারে না। তিনি কে, আর আমি কে? তুমি যে মুক্তোর মালা এনে বাঁদরের গলায় দিতে চা'চ্চ।

কৃষ্ণ। হুঁ! খাঁটি প্রেমের লক্ষণ—প্রেমিকের কথা! তা এর মধ্যে কবে গিয়ে প্রেমে প'ড়লি? অঁ্যা! তা ব'ল্‌তে হয়। তোর দিদি র'য়েছে এমন দূতী—মিলনটা যে এতদিন হ'য়ে যেত!

মনু। ছি দাদা! কি ব'লছ? অসাক্ষাতে ঠাট্টা ক'রেও এ সব কথা ব'ল্লে যে তাঁর বড় অপমান করা হয়।

কৃষ্ণ। ইস্—প্রেমের গভীরতা কত! নইলে এতটা দরদ হয়? দেখ্, আমি তোর দাদা—সাদা মনেই কথা ক! আমার সঙ্গে আর লুকোচুরী খেলিস্‌নি। তোর মন বুঝেই বিয়ের সম্বন্ধ আমি ক'ত্তে যাচ্চি।

মনু। দাদা তিনি বড় ভাল———

কৃষ্ণ। তাই ত বড় ভালবেসেছিস্। তা বেশ ক'রেছিস্। এখন খুলে বল্—সম্বন্ধটা পাকা ক'রে ফেলি।

মনু। দাদা, তিনি কি আমায় পছন্দ কখনও ক'ত্তে পারেন? আমি যে কিছু না।

কৃষ্ণ। আঃ! ওসব প্রেমখেয়ালী নভেলী কথা এখন রাখ্। পছন্দ ক'র্‌বে না? কেন পছন্দ ক'র্‌বে না? স্বয়ম্বর সভায় রাজকন্যেও যে তোকে বেছে নেবে।

মনু। দাদা! মনু তোমারই মনু; আর কার কে?

কৃষ্ণ। ওরে পাগল! আর কার কে তুই, তা যখন কে হবি, তখন বোঝা

যাবে। এখন চল্—ঘরে চল্! বাজে কথা আর ভাল লাগে না—কাজ ঠিক ক'রে ফেলি।

মনু। আচ্ছা—তবে চল দাদা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কৃষ্ণলালের বাসাবাড়ী।

(কাঁপিতে কাঁপিতে তারামণির প্রবেশ ও গৃহকোণে মুখ লুকাইয়া ডাক ছাড়িয়া রোদন।)

তারা। ওরে আমার বাবারে—আমার বাবাঃ! আমার বাবার কি হইল রে—আমার বাবাঃ! আমার বাবায় যে হাইব হইছিল রে—আমার বাবাঃ! আমার কপালে হ্যাযে এই আছিল রে—আমার বাবাঃ! ওরে আমার হোনার চাঁদ বাবা রে—আমার বাবাঃ!

(ছুটিয়া বগলা ও কমলকামিনীর প্রবেশ।)

বগ। ওমা একি! কি হ'য়েছে? অমন ক'রে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌ছ কেন?

কম। হাঁ ঠান্‌দি, কি হ'ল? বালাই! বালাই! কি হ'বে? কই কিছু ত শুনিনি? ছি! ছি! অমন ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে আছে? ছেলের অমঙ্গল হবে যে!

তারা। ওলো ভাইগ্নাবউলো—মাঃ! ওলো মনুর মায়লো—দিদিঃ! ওলো আমি কি কর্‌মুলো—মাঃ! ওলো আমি কোন্ বনে হাডিয়া যামুলো—মাঃ! ওলো আমার যে রাজার লাহান বাবালো—মাঃ! ওলো মা লো—মাঃ! ওলো আমার মহিমায় লো—মাঃ!

বগলা। বালাই! বালাই! ঠাকুরপো ত ভালই আছে। কোনও ব্যামোর কথাও ত কিছু শুনিনি? কে তোমায় কি ব'ল্লে?

তারা। ওলো আমি যে হাতগো পোলা প্যাডে থুইছিলাম লো—মাঃ! হগ্‌গল যোমেরে দিয়া আমি মহিমারে পাইছিলাম লো—মাঃ! মহিমায় যে মোর বুহের ধোনলো—মাঃ! ওলো ভাইগ্নাবউলো—মাঃ! ওলো মনুর মায়লো—বুণ্ডিলো—মাঃ! ওলো আমি কথায় যামু—কি কর্‌মুলো—মাঃ!

কম। কি হ'ল খুড়ী? কেষ্টলাল কোথায়? কোত্থেকে বুড়ী কি শুনে এল? হাঁ ঠান্‌দি, কি হ'য়েছে? কে তোমায় কি ব'লেছে? বল, খুলে বল! কেঁদোনা—মিছে কথা! বালাই! বালাই! কিছু হয়নি! মিছে কথা!

তারা। ওরে আমার মহিমায়রে—বাবাঃ! বাবায় যে আমার হাইব হইছিলরে—বাবাঃ! বাবায় যে আমার বিবিবউরে—বাবাঃ! মুই যে ভাইগ্না-বউরে লইয়া দ্যাখ্‌তে গেছিলামরে—বাবাঃ! বাবায় যে আমার লগে কথাডাও কইলনারে—বাবাঃ! আমার যে বুহের মইধ্যে পুরিয়া যায়রে—বাবাঃ!

কম। ওমা—সেই পুরোণো দুঃখু! মাগো, বাঁচ্‌লুম। বুকের মধ্যে কেমন ক'চ্চিল! তাই ত ভাবছিলুম—এরি মধ্যে কি হ'ল?

বগ। ও পোড়াকপাল! বলি মামী শাশুড়ী, একেবারে ক্ষেপেছ? এরি জন্যে এই মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছ? ছি ছি ছি! ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে আছে? ছেলের যে অমঙ্গল হবে!

তারা। ওলো ভাইগ্নাবউলো—মাঃ! ওলো মনুরমায়লো—দিদিঃ! ওলো হেই পুরাণ দুঃখ যে মোর নতুন হইছেলো—মাঃ! আমার মহিমায়—আমার হোনার বাবায় যে ফাডকে গ্যাছেলো—মাঃ! ওলো এয়া আমি কেমন করিয়া হইমুলো—মাঃ। ওলো ভাইগ্নাবউলো—মাঃ! ওলো মনুরমায়লো—বুন্‌লো—মাঃ!

বগ। ওমা সে কি? ফাটকে গেছে! কেন কি ক'রেছে সে? কে ব'লেছে?

কম। তাই হবে, খুড়ী—তাই বুঝি হবে। অনেক দেনা ক'রেছে শুনেছি—তাই বুঝি পাওনাদারেরা নালিশ ক'রে ধ'রিয়ে জেলে পাঠিয়েছে।

তারা। ওলো মনুর মায়লো—হেয়াইলো—দিদিঃ! কত টাহা বোলে কর্জ্জ করছিললো—দিদিঃ! ওলো ভাইগ্নাবউলো—মাঃ! ওলো হেই টাহার লাগ্যা বাবারে বোলে ফাডকে লইয়া গ্যাছে লো—মাঃ! ভাইগ্না যে মনুড়ে কইথে লাগ্‌জে লো—মাঃ! আমি ওইদিকে গেছিলাম—হুনছিলো—মাঃ! মনুরে যে ভাইগ্না কথায় পাডাইয়া দিললো—মাঃ! হায় হায় হায়! আমার বাবারে! বাবা আমার ফাডকে রইবে—আর আমি কোন্ প্রাণে মুহে ভাত জল দিমুলো—মাঃ! কোন্ প্রাণে ঘরে রমু—হেজ লাছিয়া হুমুলো—মাঃ! বাবা আমার ফাডকে যে মাটিতে হুইবে লো—মাঃ!

(কৃষ্ণলালের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। একি! এ খবর ওঁকে এরই মধ্যে কে দিলে?

কম। তবে কি সত্যি কেষ্টলাল?

কৃষ্ণ। কে ওঁকে খবর দিলে?

তারা। কেডা? বাবা কেষ্টলাল আইছ? ও ভাইগ্না, আমার মহিমার কি হইল বাবা! আমার বাবারে আনিয়া দেও—আমি কোলে করিয়া বুক হীতল করিরে বাবা! বাবার লাগ্যা যে মোর বুক পুরিয়া যায় বাবা! ও পোড়া বুক! তুমি এহনো রইছ? ফাডিয়া যাও! ফাডিয়া যাও। (বুকে চাপড়।)

বগ। ছি ছি—কি কর? কি কর? ভাল ক'রে সব শোন—ভয় কি? উপায় এর হবেই। ওঁরা কি তাকে ফেলে দিতে পার্‌বেন?—বলি কি হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। আর কি হবে? সায়েবী ক'রে ঢের দেনা ক'রেছিল, শুধ্‌তে পারেনি, মহাজনেরা এখন দস্তক ক'রে ধ'রে জেলে পাঠিয়েছে।

তারা। আহাহা—বাবারে! বাবারে আমার ফাডকে লইয়া গেল—এয়া আমি কেমন করিয়া হইমুরে! কপালে মোর এত দুঃখও আছিলরে—বাবা!

বগ। বলি এর কোনও উপায় ক'র্‌বে না? নিজের মামাত ভাই জেলে গেল, খালাস ক'রে আন্‌বে না?

কৃষ্ণ। অত টাকা আমি কোথায় পাব যে তার সে দেনা শুধে তাকে খালাস ক'রে আন্‌ব?

তারা। ও ভাইগ্নাবউ! মোর ড্যাক্সে ত টাহা আছে। ভাইগ্নারডে যহোনে চাইছি—অম্‌নি টাহা দিছে। পোলারডে চাইয়া পাডাইছি—এউগ্‌গা পয়সাও দে নাই। ভাইগ্নায় খাওয়াইতে লাগ্‌জে—পরাইতে লাগ্‌জে—কত বত্তনিয়ম করাইতে লাগ্‌জে—তেথ করাইছে। অনন্ত বত্ত পিদিষ্টার কালে কত বেরাম্মোন ভোজন করাইছিল—কত পিতলের কলস—ঘড়ি—ভাণ্ড—কত নয়াকাপড়—কত দিছে! এউগ্‌গা কলস যে আছিল—এই এত্ত বরো!

বগ। আমর্‌! একি ঘ্যান্‌ঘেনি গো! ধান ভান্‌তে শিবের গীত! বলি কত টাকা আছে তোমার?

তারা। ড্যাক্সে আছে—কত হেয়া কি মুই কইথে পারি? ভাইগ্নায় যহোনে যা দিছে, হবই ড্যাক্সে থুইছি। খরচ ত কিছু করি নাই? কিয়ার লাগ্যা করমু? খাওয়াইতে পরাইতে—হগ্‌গল করাইতে ত ভাইগ্নাই লাগ্‌জে? হেই টাহা সব রইছে,—আবার পোলায় যে লোট্‌ দিয়া গেছিল—হেই লোট্‌ও থুইছি। লোটে বোলে দশগো টাহা হয়! এই নেও ভাইগ্নাবউ, আমার ছোরাণী লইয়া ড্যাক্স খুলিয়া টাহা আনিয়া দেও। (কোমর হইতে চাবি খুলিবার চেষ্টা) না, এ ছোরাণী দেহি খোল্‌তে পারি না। যাই আপনিই যাইয়া ড্যাক্স খুলিয়া লইয়া আই! (প্রস্থান)

কৃষ্ণ। ক্ষেপেছ তোমরা? ওঁর কাছে আর কটা টাকা আছে? এক আধ টাকা মাঝে সাঝে চেয়েছেন, দিইছি। ওতে কি আর এই দেনা শোধ যাবে?

বগ। তবে তুমি নিজে দিয়ে কেন খালাস ক'রে আন না? পর ত নয়?

কৃষ্ণ। অত টাকা আমার থাক্‌লে ত?

বগ। ওমা, কত দেনা ক'রেছে? তা, আমার গওনাপত্তর বাঁধা রাখ্‌লে হয় না?

কম। তুমি আস্ত পাগল খুড়ী। সারেদী ক'রে দেনা ক'রেছে—কত হাজার হবে তার ঠিক কি? তোমার আর কখানা গওনা আছে? জমাজমি বাড়ীঘর সব বিক্রী ক'ল্লে যদি হয়।

বগ। তবে তাই না হয় করা হ'ক্।

কৃষ্ণ। হাঁ, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে এখন গোষ্ঠী সুদ্ধ উপোস্ করে মরি! থাকুন কিছু দিন জেলে, কি হবে?

(টাকার পুঁটলী সহ তারামণির প্রবেশ।)

তারা! এই নেও বাবা! এই যে টাহা আন্‌ছি। কতদিন বইয়া জোমাইছি—ভাবছিলাম তেথ করমু। তা বাবা আমার ফাডকে রইবে, তেথ দিয়া করমু কি? এই নেও বাবা, এই টাহা নেও,—বাবারে যাইয়া খালাস করিয়া আন।

বগ। বলি ও টাকায় নাকি হবে না। সে অনেক টাকা। কত হাজার!

তারা। এয়াতে হইবে না? ও ভাইগ্না বউ—তয় করমু কি? মোর যে আর নাই! ও ভাইগ্না! বাবা, তুমি ত কত ক'র্‌তে লাগ্‌জ—কইথে সরম বাসি—তুমি মোর বাবারে আনিয়া দাও! তোমার ত কত টাহা আছে।

কৃষ্ণ। সাধ্য থাক্‌লে মামী—তোমার বল্‌তে হত না। সে অনেক দেনা, আমাকে বেচলেও শোধ যাবে না।

তারা। তবে কি হইবে বাবা? ও ভাইগ্না বউ! ও মনুর মায়! ওলো আমি করমু কি? যামু কথায়? কপালে হ্যাযে মোর এই আছিল?

বগ। বলি, একবার চেষ্টা ক'রেই দেখ না?

কৃষ্ণ। খামোকা কি চেষ্টা ক'র্‌ব? আমার অসাধ্য। আর মিছে কেন তোমরা গোলমাল ক'চ্চ? কিছু ভয় নেই। দস্তকী জেলে এমন কিছু ক্লেশ নেই। এক যা কেলেঙ্কারী। তা—তাতে মারা যাবে না। বেশ খাবে দাবে থাক্‌বে,—মাসখানেক বাদে দেউলে ব'লে ছেড়ে দেবে।

কম। তবে আর কেন মিছে সর্ব্বস্ব খোয়াতে যাবে? খালাস ত হবে,—শেষে রোজগার ক'ত্তে পারে, দেনা শোধ দেবে। না পারে, নিজেই ধর্ম্মের কাছে দায়িক হয়ে থাক্‌বে। আর সে দায় কারও পরের টাকায় শোধ যায় না। যার টাকা নেবে, ধর্ম্মে তার কাছেই দায়িক হয়ে থাকবে।

বগ। শুন্‌লে মামীশাশুড়ী? দেনার জেলে কোনও ক্লেশ নাই! বেশ খাবে দাবে থাক্‌বে,—মাসখানেক পরে ছেড়ে দেবে।

তারা। হ্যারা ভাল খাইতে দিবে? কষ্ট হইবে না? আবার একমাস পরে আইবে? আ! হত্য কইথে লাগ্‌জ?

বগ। হাঁগো! সব সত্যি, কিছু ভয় নেই।

তারা। ও ভাইগ্না, তয় এই টাহা কয়ডা বাবারে পাডাইয়া দেও। বাবার হাতে ত টাহা নাই, ফাডকে কি হ্যারা টাহা দিবে?

কৃষ্ণ। কি জ্বালা গো! বলি এখন ও রাখ, ফাটকে তার টাকা লাগবে না। দিলেও কেড়ে নেবে।

তারা। ও মা! তবে পাডাইয়া কাম নাই, খালাস হইয়া আক্—শেষে দিমু! এহন গিয়া ড্যাক্সে উডাইয়া থুই।

(প্রস্থান করিতে করিতে আবার ফিরিয়া)

ও ভাইগ্না বউ! পোলায় ত ফাডকে রইবে, বউগ্যার হইবে কি? হ্যারে যাইয়া লইয়া আইবে না? আহা, বউমা আমার আল্‌তাপাতের কোমো-লিনী—হে কি পারে ওই পুরীতে একলা থাক্‌তে? মোরা গ্যালাম—অম্‌নি ডরে মোহ পর্‌ল!

কৃষ্ণ। হঁঃ! তার জন্যে ত ভারী ভাবনা! নিজের ঢের টাকা আছে,—আবার জিনিষপত্তর যা ছিল, সব নিয়ে আলাদা হয়ে আগেই গে স'রে পড়েছে। তার দুঃখ কি?

বগ। ও মা, ঢের টাকা আছে—তবু ঠাকুরপো জেলে গেল? আবার জিনিষপত্তর সব নিয়ে চলে গেছে? কোথার গেছে? ও মা! এ কেমন কথা গো!

কম। যেমন ওরা—তেম্‌নি ওদের কথা! তার আর তোমরা কি বুঝ্‌বে বাছা? তা কোথায় গেছে?

কৃষ্ণ। সে কোন এক সায়েবী হোটেলে গে আছে।

কম। সেই টাকা ভেঙ্গে বুঝি এখন খাবে?

কৃষ্ণ। টাকাও আবার সব মামার হাতে। মামা যা—টাকা পায় না পায় কে জানে ?

কম। ও মা—কি সর্ব্বনাশ! মামার হাতে টাকা! সে টাকা কি আর মামা দেবে? যা সব শুন্‌লুম্!

কৃষ্ণ। না দিলেই বেশ হয়।—ঠিক জব্দ হবে। হতভাগী!

বগ। ছি ছি! অমন কথা বল্‌তে আছে? হাজার হক্‌, নিজেদের বউ ত? তার দুঃখে ধর্ম্ম দেখতে আছে? সে দুঃখ পেলে তার দিকে চাইতে হবে না? মান ইজ্জৎ তার রাখতে হবে না?

কম। হাঁদেখ কেষ্টলাল, কথা কিন্তু ভাল নয়। যেমনই হ'ক, সত্যি তোমাদের বউ ত? তার সুখদুঃখ মান ইজ্জতের দায়িক তোমরা। তোমার ভেয়ের কথা ছেড়ে দেও—টাকা দিয়ে তাকে খালাস কত্তে পার্‌বেও না—তার জন্যে ঘোরাও মিথ্যে। বেটাছেলে—খালাস যে দিন হয় হবে—তারপর যা হয় একটা কর্‌বে। কিন্তু বউটোর কথা ত ভাবতে হয়। ভাতারের সঙ্গে ঝগড়া ক'য়ে আলাদা হয়ে গেছে, সে কিছু আর তার হয়ে এসে দাঁড়াবে না।—আর খালাস হয়ে এলে ত দাঁড়াবে?—তারও ত দেরী কিছু আছে। আর কেউ নেই,—তুমি গিয়ে এখন তার হয়ে না দাঁড়ালে মেয়েমানুষ—টাকা সে আদায় কত্তে পার্‌বে না। যে মামা! আরও তার নাকি কিচ্ছু আর এখন নেই। টাকা যদি খরচই ক'রে ফেলে—তবে ত আর মোটেই পাওয়া যাবে না। কি উপায় হবে তখন? বউটো যাবে কোথায়? কে খেতে দেবে? তুমি বাছা, এক কাজ কর। এক্ষুণি যাও,—তার সঙ্গে দেখা করগে। বুঝিয়ে সব তাকে বল। তার পর তার অভিভাবক হ'য়ে টাকাটা তাকে আদায় করে দাও!

কৃষ্ণ। তা বল, গিয়ে দেখতে পারি। যদি কথা শোনে—টাকাটা আদায় ক'রে দেবার চেষ্টা কর্‌ব। সেটা করাই উচিত বটে!

তারা। হ বাবা, একবার যাও! মহিমারেও একবার দেখ্যা আইও! আর বউগ্‌গারে—যদি আয়—তবে একালে লইয়াই আইও! সোডেলে বোলে আছে—ও মা! বউমানুষে কি পারে সোডেলে থাক্‌তে? হ্যারে লইয়াই আইও। টাহা করি আদায় করিয়া দিতে পার—তহন না হয় আবার যাইবে, নিজে বারী ঘর করিয়া রইবে। আহা যদি আয়—হাতের ভাত খাইতে ত পারমুনা—জাত যাইবে! যে দুইদিন রয়, মুখখান ত দেখমু। আহা, মোর মহিমার বউ—মোর ধোনের ধন! বিবি হইছে, হেয়ার লাগ্যা কি ফ্যালাইতে পারি?

কৃষ্ণ। হাঁ, তোমার ঘরে সে ছুটে এল আর কি? আচ্ছা, তবে যাই একবার—দেখি কি হয়? (প্রস্থান)

কম। চল খুড়ী। ওদিকে যা হয়, কেষ্টলালই ক'র্‌বে এখন। চল, আমরা আমাদের কাজকর্ম্ম দেখিগে। বেলাও কম হল না। ঠানদি, নেয়ে এখন পূজো আহ্নিকটা সেরে ফেলনা গে?

তারা। হ, ল যাই, বেলা ত হইছেই। আহা, বউগ্‌গা যদি আয়!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সিদ্ধেশ্বরের গৃহ।

সৌদামিনী ও সিদ্ধেশ্বর।

সৌদা। তুমি ত কল্লেও না—ক'র্‌বে যে তার কিছু লক্ষণও দেখি না। ভাল একটি পাত্র পেয়েছি, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ তবে আমিই ঠিক ক'রে ফেলি।

সিদ্ধে। পাত্র পেয়েছ! কোথায়? কে? আমি জান্‌লুম না কিছু—তুমি ঠিক ক'রে ফেল্‌বে? সেকি?

সৌদা। কেন দোষই বা কি? তুমি আর আমি ত সমান? গুরুলঘু সম্পর্ক ত তোমরা আর মান না, মানাতেও চাও না। আমিই না হয় সম্বন্ধটা ঠিক কল্লুম।—ঠিক হক, তারপর তোমাকে জানালেই হবে।

সিদ্ধে। সমান হলেও সমান মত—সমান অধিকার ত দুজনের আছে?

সৌদা। সমান মত–সমান অধিকার এক কাজে দুজনের সর্ব্বদা চলে না। মতে যদি না মেলে, অধিকারে যদি ঠোকাঠুকি হয়,—তাতে কাজ আট্‌কে যায়, একেবারে অচল হয়ে পড়ে।

সিদ্ধে। তাই ব'লে তোমার একার মতে, একার অধিকারেই কি সব চল্‌বে?

সৌদা। সব কেন চল্‌বে? তুমি বা কোনটা ক'র্‌লে, আমি বা কোনটা করলুম। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধটা আমার মতে আমি ঠিক করি,—তোমার মতে তুমি আর একটা কিছু ক'রো!

সিদ্ধে। আমার মতে কোন্‌টাই বা এ ঘরে হয়?

সৌদা। তবে আর কি ? ল্যাটা চুকেই গেল। কোনটাই যদি হয় না, এটাও হবে না। বস্!

সিদ্ধে। বলি এতবড় একটা কাজ—মেয়ের বিয়ে—এ ত আর সদাসর্ব্বদা হয় না ? আমার মতটা এতে নিলে কি চলে না ?

সৌদা। মত উল্‌টো যদি হয়, তবে ত চ'ল্‌বেই না।

সিদ্ধে। উল্‌টো ত নাও হ'তে পারে। আগেই কি ক'রে ঠাওরালে যে উল্‌টো হবেই।

সৌদা। ঠাওরাই—তোমার রকম দেখে। সব গেছে—খেলার ঘর ভেঙ্গে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্চে—খেলার মোড়ল ডিগবাজি খেয়ে এখন উল্‌টো পাক দিচ্চে,—তোমার বাই তবু গেল না।

সিদ্ধে। থাক্—থাক্! ও কথা এখন থাক্! আর যে যাই করুক্, আমি যা ভাল বুঝব, তাই ক'র্‌ব।

সৌদা। সেই 'যে' ত তার ভালই বুঝেছিল। তবে ভালটা নাকি বড় বেশী দেখাচ্ছিল, লোভটাও তাই বড় বেশী টান্‌ল, লাফের তাকটা ঠিক রাখতে পাল্লে না, সোণার লঙ্কা ডিঙ্গিয়ে একেবারে ওধারে সাগর জলে গে কুপোকাৎ! হাবুডুবু খেয়ে তবু এখন ধর্ম্মের ধ্বজা ধ'রে সে মাথা তুলে উঠ্‌ছে। আর তুমি ত সেই ঘরের পিছনে আঁধার ডোবার পচা পাঁকেই হাঁকুপাঁকু ক'চ্চো!

সিদ্ধে। দোহাই তোমার! আর কেন ? ম'রে আছি, মরার উপরে আর কেন খাঁড়ার ঘা দেও!

সৌদা। বালাই! মর্‌বে কেন ? পাখনা ভেঙ্গেছে, ঊঁই এখন একেবারে ঘরের পিঁপড়ে হ'য়ে ঘরে এসেছ,—ঘরের লোককেই কামড়াচ্ছ।

সিদ্ধে। ঝেঁটিয়ে তবে বের ক'রে দাও—পায় দলে মেরে ফেল,—আপদ চুকে যাক্!

সৌদা। তার কি আর যো আছে ? কামড়ে জর্জ্জর হ'লেও মমতা যে এড়াতে পারিনে—এম্‌নি আমাদের কর্ম্মের লেখা! তা পিঁপড়ে হ'য়েই বা ঘরের কোণে সুড়্‌সুড় ক'রে কেন বেড়াচ্চ ? নতুন একজোড়া পাখনা গজিয়ে তুলে গুরুর সঙ্গে গে জোট না ? গুরু এখন প্রাচিত্তি ক'রে পাপ মুক্ত হয়েছে, গঙ্গাস্নান ক'রে রোজ নতুন পুণ্যি কুড়োচ্ছে, পথে পথে লোককে তা বিলিয়ে বেড়াচ্চে—নতুন একটা বড় নাম বাহির হবে। তুমিই বা কেন বঞ্চিত রবে ? মিছে ঘরে বসে কাঁদ্‌বে ?

সিদ্ধে। আর ব'লো না সদু! তাঁর কাণ্ড দেখে লজ্জায় একেবারে ম'রে যাচ্চি। তিনি কিনা এখন গেরুয়া পরে দিব্যি হাসিমুখে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ক'রে ফিরছেন! এত বড় যে কেলেঙ্কারীটা—যেন কিছুই হয় নি! এত বড় নির্লজ্জতা যে মানুষের থাক্‌তে পারে, তা কখনও ভাবতেও পারিনি।

সৌদা। বেহায়ার বালাই নেই। লজ্জাতেই ত মানুষ মরে,—লজ্জা যার নেই, তার আর দুঃখ কি? আর করবেই বা কি এখন? একটা পথ ত চাই। সনাতনী ধুয়ো ধ'রে প্রাচিত্তি ক'ল্লে, ঢাক ঢোল বাজালে,—লোভে ভুলে যে পথে গিয়ে পড়েছে, লোভের ধন এখন সেই পথেই খুঁজছে! তা যত্ন আছে, রত্নও মিল্‌বে।—চুলোয় যাক্! নিজের জ্বালায় বাঁচিনে—পরের কথায় আর কাজ কি? তা মেয়ের সম্বন্ধ কিন্তু আমি ঠিক ক'রে ফেল্‌ছি!

সিদ্ধে। বলি, একবার আমাকে নামটা জানাতেও কি দোষ আছে? ভাল জ্বালা হ'য়েছে!

সৌদা। জানাতে এমন দোষ কিছু নাই, তবে শুধু জানান মাত্র। যদি অমত কর, চ'ল্‌বে না।

সিদ্ধে। কেন?

সৌদা। হিতাহিত জ্ঞান তোমার কিছু থাক্‌লে ত? পাগলের মত পাগ্‌লা মতকেও বেড়ী দিয়ে রাখ্‌তে হয়।

সিদ্ধে। বলি, কার সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছ? একবার বলই না ছাই শুনি।

সৌদা। মনুর সঙ্গে।

সিদ্ধে। মনুর সঙ্গে! কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ক্ষেপেছ? মনু যে আস্ত পাগল।

সৌদা। তোমার চেয়ে ত আর নয়?

সিদ্ধে। মনুর সঙ্গে রমার বিয়ে! এ হতেই পারে না।

সৌদা। যা হচ্চে, তা হতে পারে না ব'ল্লে চল্‌বে কেন?

সিদ্ধে। রমাকে প্রতিপালন ক'ত্তে পারে, তার মত শিক্ষিতা উন্নতশীলা নারীকে তার যোগ্য অবস্থায় রাখ্‌তে পারে, এমন ক্ষমতা মনুর কি আছে? কি হ'তে পারে?

সৌদা। বলি, রমা ত দশটা পেট ভর্‌তে দশ মুখে খাবে না? তার একটা পেট ভরে, একটা মুখে ধ'রে, এমন ভাত মনুর ঘরে আছে। লেখাপড়া কেউ একটু

শিখ্‌লেই যেন তাকে রাজার রাণী হ'তে হবে! বলি, তোমার মেয়ে ত রমা? মনুর ঘর তার অযুগ্যি হবে না।

সিদ্ধে। সে যে সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক্‌বে,—চাষবাস ক'রে খাবে?

সৌদা। সহরে তুমি ইস্কুলের ব্যবসা ক'রে যা ক'ল্লে, মনু তার গেঁয়ে গেরস্তালীতে তার চেয়ে অনেক ভাল ক'র্‌বে। বলি দেখ না?—মনুর মত আর একটা অমন বর খুঁজে আন না? রমা যেন আমার সতীনের মেয়ে, তাকে জলে ফেলেই দিচ্চি।

সিদ্ধে। রমা কি বলে? তার মত নিয়েছ?

সৌদা। তার আবার মত নেব কি?

সিদ্ধে। তার মত নেবে না! বল কি? তার বিয়ে—আর তারই মত নেবে না?

সৌদা। ওগো, আর পাগলামো করো না, ঢের হয়েছে! মেয়ের মত আর জিজ্ঞেস করে জান্‌তে হবে না,—তার অমত নেই।

সিদ্ধে। কি ক'রে জান্‌লে তার অমত নেই? সে কি ব'লেছে কিছু?

সৌদা। ওগো, না ব'ল্লেই কি বুঝ্‌তে সব বাকী থাকে? তোমার মত নিরেট মাথা নিয়ে সবাই চলে না। লোকে ব'লে যা বলে, না ব'লে তার চাইতে অনেক বেশী বলে। জান্‌লে?

সিদ্ধে। কি রকম?

সৌদা। কি রকম তাই যদি বুঝ্‌তে, তবে দুঃখ ছিল কি?

সিদ্ধে। বলি বুঝিয়েই দেওনা একটু।

সৌদা। মনুর সঙ্গে তার বিয়ে দেব, ঢের বার একথা তার কাণে গেছে! ইচ্ছে ক'রেই তার কাণে দিইছি। সে কচি খুকী নয়, ভালমন্দও বোঝে,—যদি অমত থাকৃত, নিজে তা জানাত, না জানিয়ে পাত্ত না। জান্‌লে? মাথায় ঢুকল?

সিদ্ধে। তবে মত আছে?

সৌদা। অমত নেই। অমত নেই কেন, মতই আছে। তাও বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

সিদ্ধে। আচ্ছা, আমি বরং তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি। তার যদি মত থাকে———

সৌদা। ওগো, জিজ্ঞেসা আর ক'ত্তে হবে না। রমা তোমাদের ভাঙ্গা

দলের বেহায়া মেয়েদের মত নয় যে অম্‌নি টপ ক'রে ব'ল্‌বে, 'মনুর সঙ্গে আমি প্রেমে প'ড়েছি, তাকেই বিয়ে ক'র্‌ব।'

সিদ্ধে। হুঁ! মনু ছেলে মন্দ নয়,—বুদ্ধি আছে, মনটা ভাল, প্রাণটাও বড়। কাজকর্ম্ম যদি করে———

সৌদা। কাজ কর্ম্ম ত ক'র্‌বেই। কেষ্টলাল সব ঠিক ক'রে দেবে। তোমার চাইতে তার যোগ্যতা অনেক বেশী; তার হাতে তোমার জামাই মানুষ হবে। তোমরা বার ভূতেই তার ঘাড়ে বসে এদ্দিন তাকে ভূতে পাওয়া ক'রে রেখেছিলে। পাকা ওঝার মন্তরে ভূত নেমে গেছে, মানুষ হবে সে এখন।

সিদ্ধে। হুঁ—মনু আমাদের দলেরও বটে।

সৌদা। তবে আর কি? সব গোল এই খানেই চুকে গেল! মতে মতে মিল হ'ল। এখন তবে একবার উলু দিই। (উলু।)

সিদ্ধে। এই দেখ, পাগল আর কি?

সৌদা। পাগলের সঙ্গে একমতে মিল হ'ল—পাগল বই আর হব কি?

সিদ্ধে। আচ্ছা, যা বোঝ কর। আমি একটু আসি, বাইরে কাজ আছে।

সৌদা। ঘরে রইব না আমিও অকাজে।

সিদ্ধে। ভারী যে আজ ফুর্ত্তি দেখ্‌ছি!

সৌদা। শ্রীচরণের দাসী—প্রসাদ পেলেই আহ্লাদে একটু নাচি!

সিদ্ধে। তা নাচ যত পার, আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

সৌদা। এ দিক ত এক রকম হ'ল। তবে চামেলীটার কথা মনে হ'লে আর সুখ কিছু থাকে না। আহা, বিয়ে না হ'তেই যেন বিধবা হ'ল। রমা আর চামেলী—যেন জোড়া বাঁধা দুটি ময়না পাখী! রমার যেমন হ'ল—তারও যদি মনের মত একটি ভাল বরে আজ বিয়ে হ'ত, আহা, কি সুখই তবে হ'ত! হতভাগারা!—হিসেব ক'রে ত চ'লে না!—নিজেদের যত উমদো বাই—ছেলে মেয়ে গুলোকেও তাতে নাচিয়ে একেবারে তাদের মাথাটা এম্‌নি ক'রে খায়!

(বগলার প্রবেশ)

এই যে বগি! আয়, কেমন আছিস্ লো?

বগ। আছি এক রকম দিদি প্রাণগতিকে। মনে সুখ নেই,—মহিম ঠাকুরপোর এই হ'ল, বুড়ো মাগী কেঁদে কেঁদে মরে———

সৌদা। আহা! মায়ের প্রাণ! প্রবোধ কি মানে? তা—খালাস টালাস ত আর হ'ল না?

বগ। কি ক'রে হবে দিদি? অত দেনা শুধে খালাস ক'রে আন্‌বেন, এত টাকা যে ওঁদের নেই। কদ্দিন পরে মাহাজনরাই নাকি ছেড়ে দেবে। তবে মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পার্‌বে না।

সৌদা। বেটা ছেলে যদি হয়, আর বুদ্ধি যদি একটু মাথায় থাকে—শিক্ষাও ত কম হ'ল না—যা হয় একটা কিছু পথ ধ'রে দাঁড়াবেই। তা তোর মায়ের কি হ'ল? টাকা আদায় ক'ত্তে পাল্লে?

বগ। উনি মাঝে প'ড়ে এক রকম তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। ছাড়তে কি চায়? ধম্‌কে ধাম্‌কে, ভয় দেখিয়ে, শেষে একটা রফা করেছেন। একেবারে সব দেবে না,—কয় কিস্তিতে বছরের মধ্যেই শোধ ক'রে দেবে। তাই লেখাপড়া হ'য়েছে।

সৌদা। ধর্ম্মের ধ্বজা ধ'রেছে, লোকের প্রণামী কুড়িয়ে টাকা তুলবে,—একেবারে দেবে কোত্থেকে? আরও এখন মন্ত্র নেই যে দল বেঁধে গান গেয়ে ভিক্ষে করে এনে দেবে। যা ক'ত্তে হবে, নিজের গলাবাজিতে। তা গলার জোর আছে, হবে।

বগ। হাঁ দিদি, সম্বন্ধটার কি হ'ল? সিধুবাবু মত দিয়েছেন? উনি তাই জান্‌তে পাঠালেন।

সৌদা। হাঁ বোন্, এই ত কথা হ'ল। গাল মন্দ যাই দিই বোন্—মতটা না পেলে ত আর সত্যি পাকা কথাটা দিতে পারিনে? তা ধম্‌কে ধাম্‌কে রাজি করিয়েছি।

বগ। তাঁর কি মত তেমন নেই?

সৌদা। এখন হ'য়েছে। হবে না কেন? এমন আর কোথায় পাবে? অমন ছেলে—অমন মা—মেয়েটার বড় ভাগ্যি ছিল, তাই জুটল!

বগ। তবে আর কি? আসি দিদি এখন।

সৌদা। এখনই আসি! বের সম্বন্ধে হ'ল, ঘটকালী ক'ল্লি, একটু মিষ্টি-মুখ ক'রে যা! চল্ ওঘরে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

ভ্যাটাভেলের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান।

আড়ম্বরবিহীন সাধারণবেশে চামেলী।

চামে। (গান——পশ্চাতে কিছু দূরে রমার প্রবেশ।)

শান্ত মধুর—কোন্ সে দেশের
উষার আলো ওই দেখা যায়!
আঁধার আকাশ—মেঘ কেটেছে—
উঠ্‌ছে হেসে অমল আভায়!
আলোয় জাগা কোন্ আকাশে
নিত্য আলোর রবি হাসে,—
সেই রবির কি নবীন হাসি
উষার রাঙা মুখে ভায়!
আস্‌বে না আর আঁধার কালো,
নিত্য জাগা রবির আলো—
আকাশ কিসে আলোক দেশে
এক আকাশে মিশ্‌বে হায়!

রমা। মিশ্‌বে—মিশ্‌ছে—মিশেছে! চামেলী! চামেলী! এই কি তুই আমাদের সেই চামেলী!

চামে। কে—রমা? রমা—রমা!

(উভয়ের অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন)

রমা। চামেলী!

চামে। কি রমা!

রমা। আজ একি দেখ্‌ছি চামেলী?

চামে। কি দেখ্‌বি তুই ভেবেছিলি?

রমা। কি যে দেখ্‌ব ভেবেছিলুম,—তা—ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পারি নি। কিন্তু এমন যে দেখ্‌ব,—তাও ভাবি নি।

চামে। অনেকটা শান্ত হ'য়েছি ঠিক। মনটা যেন সেদিন একেবারে ভেঙ্গে এলিয়ে প'ড়েছিল, বড় একটা তীব্রজ্বালা প্রাণভরে জ্বল্‌ছিল! মনে হচ্ছিল,

জীবনে আর কখনও সাম্‌লে উঠে দাঁড়াতে পার্‌ব না। কিন্তু আজ মনে হ'চ্চে—পেরেছি—পার্‌ব। কিসে পেরেছি জানিস্‌?

রমা। জানি, বড় আকুল হ'য়ে ডেকেছিলি, প্রাণের দেবতা আজ তাই প্রাণ ভ'রে জেগে উঠেছেন। মহাশক্তি প্রসন্ন হ'য়েছেন, প্রাণে তিনি আজ তাঁর প্রশান্ত হাসিমুখে দেখা দিয়েছেন।

চামে। বড় আকুল হ'য়েই তাঁকে ডেকেছিলুম, রমা! তাঁর দয়াও কিছু পেয়েছি। কিন্তু—ঠিক তেমন যে কাউকে আলাদা ক'রে প্রাণের মাঝে দেখ্‌তে পাচ্চি—এমন ব'ল্‌তে পারি নে। তবে শান্তি পেয়েছি—বল পেয়েছি—আপনাকে আপনি ধ'রে আজ রাখ্‌তে পাচ্চি। আর গত জীবনের দিকে ফিরে ফিরে যত চাচ্চি, ততই মনে হ'চ্চে—কি ভুলের আঁধারেই জীবনটা ঘেরা ছিল, কি হীন একটা অসার খেলাতেই জীবনটা কেটে যাচ্চিল। ছিছি, নারী জীবন পেয়ে কেবল ভোগকেই নারীর অধিকার ব'লে মনে ক'রেছি, সেই ভোগই খুঁজেছি,—ত্যাগে সংযমে সেবায় নারীর ধর্ম্ম যে কি তা কখনও মনেও ওঠেনি। আলোক ব'লে যাতে গৌরব ক'ত্তুম, আজ মনে হ'চ্চে, তাই আঁধার—হীন কীটের আনন্দ বড় হীন আঁধার! আর আঁধার ব'লে যা অবজ্ঞা ক'ত্তুম—স্বর্গের স্নিগ্ধ সুন্দর চির উজ্জ্বল আলোকের আভায় তাই আজ যেন চোকের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে!

রমা। প্রাণের দেবতা প্রাণে দেখা দিয়েছেন, শক্তি আপন মূর্ত্তিতে প্রাণ-ভ'রে জেগে উঠেছেন,—তাই শান্তি এসেছে, বল এসেছে, ভুল ভেঙ্গেছে, আঁধার আঁধার হ'য়েছে—সত্যিকার আলো চোকের সাম্‌নে ফুটে উঠেছে! চামেলী! শক্তি যে তুই নিজে, প্রাণের সে দেবতা যে তোরই প্রাণের প্রাণ, আলাদা ক'রে আর কাকে দেখ্‌বি চামেলী? যে আঁধারে আপন তোর ঢাকা ছিল, সে আঁধার আজ চলে গেছে,—আপন তোর আপন আলোতে ভেসে উঠেছে! শক্তিতে জন্ম, শক্তিতে জীবন,—আপনাতেই আপনি তুই শক্তি, আপনাতেই আপনি শক্তিময়ী,—কাকে আলাদা ক'রে দেখ্‌বি চামেলী? আপনাকে আপনি কেউ আলাদা ক'রে দেখ্‌তে পারে কি? আপনার জাগরণ—আপনার মহিমা—সুধু আপন প্রাণে অনুভব করে। তুইও তাই-ই ক'চ্চিস্‌!

চামে। আত্ম-জাগরণ একটা অনুভব ক'চ্চি, আত্ম-মহিমারও—হাঁ—কিছু যেন একটা সাড়া পাচ্চি। কিন্তু আর কিছু জানিনে রমা, আর কিছু বুঝিও না।

রমা। দেবতা যে, সে আপন দেবত্বেই দেবতা,—কেন সে দেবতা, কিসে সে দেবতা, এ সব তত্ত্ব না জান্‌লেও দেবত্ব তার ক্ষুণ্ণ হয় না।

চামে। ওসব বড় বড় তত্ত্বের কথা এখন থাক্ রমা! একেবারে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিস্‌নি! দেবতার যেটুকু আশীর্ব্বাদ পেয়েছি, তাই যেন মাথায় ধ'রে রাখ্‌তে পারি,—তাতেই এ জীবন কৃতার্থ হবে।

রমা। সুধু চুপ ক'রে বসে থেকে কেউ তা মাথায় ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। কর্ম্মের বলেই তা মাথায় থাকে। কি ক'র্‌বি এখন চামেলী? কোন্ কর্ম্মের ধর্ম্মে তা মাথায় ধ'রে রাখ্‌বি?

চামে। সে ধর্ম্মের পথ তিনিই দেখাবেন রমা। তাঁর আশীর্ব্বাদ তিনি বৃথা কখনও ক'র্‌বেন না।

রমা। সংসারে কি বাইরে লোকসমাজে—কোথাও কোনও দিকে সে পথ কিছু কি দেখ্‌তে পাস্ চামেলী?

চামে। সংসার আমার ফুরিয়ে গেছে। সে দিকে সে পথের ক্ষীণ রেখাটিও আর দেখ্‌তে পাইনে রমা।

রমা। চামেলী! এখনও কি——

চামে। ছি রমা! তুই কি ভাব্‌ছিস্? সংসারের দেবতা ব'লে মেয়েমানুষ যাকে একবার প্রাণে ধ'রে নেয়, সে গেলেও তার সে মূর্ত্তি কি তার প্রাণ থেকে উঠে যায়? একখানি বই আর যে আসনের স্থান তার প্রাণে নাই,—আর কাকে সে কোথায় বসাবে রমা? প্রাণের বাইরে রেখে দেবতার পূজা হয় না, ভোগের খেলা হ'তে পারে। তার স্পৃহা আর এ বুকে নেই বোন্!

রমা। সে যদি ফিরে এসে পূজো চায়,—আস্‌তেও—হয়ত—পারে——

চামে। তার সেই মূর্ত্তিই এখন আমার দেবতা, সে নয়। আমার পূজা—হায়, সে হয়ত এসে চাইতে পারে—কিন্তু দিতে যে আমি আর পারিনে রমা! কে জানে—আবার কি গ্লানি আমার সইতে হবে। হয়—হবে! উপায় আর কি?

রমা। পূজার আকাঙ্ক্ষা তবে কোথায়—কিসে তৃপ্ত হবে চামেলী?

চামে। ছোট সংসার উঠে গেছে,—সে সংসারের দেবতাও চ'লে গেছে। বাইরে মহামানব-দেবতার মহাসংসার রয়েছে। সেই সংসারে—সেই দেবতার পূজায় মহা আকাঙ্ক্ষা যদি প্রাণে জেগে ওঠে, ক্ষুদ্র সে আকাঙ্ক্ষা যে তাতেই মিলিয়ে যাবে রমা!

রমা। উঠুক—সেই মহা আকাঙ্ক্ষাই জেগে উঠুক!—ছোট সে আকাঙ্ক্ষা তাতেই মিলিয়ে যাক্। নারীজীবন তোর সার্থক হ'ক্! মহাশক্তি তোতেই তাঁর মহামূর্ত্তিতে বিরাজ করুন।

চামে। (হাসিয়া রমার হাত ধরিয়া) আর তোতে বুঝি—তোর ছোট সংসারে তাঁর ছোট মূর্ত্তিতেই বিরাজ ক'র্‌বেন ?

রমা। মহা বেদনার আঘাত না পেলে মহামূর্ত্তিতে কারও প্রাণে তিনি জেগে ওঠেন না। সে ভাগ্য আমার হবে—এমন সম্ভাবনা ত দেখ্‌ছি না।

চামে। সে ভাগ্য কি কামনা করিস্‌ রমা ?

রমা। না—তাও করি না।

চামে। দেবতার খোঁজ বুঝি তবে পেয়েছিস্‌,—তাই এখন সেই ছোটও বড়র বড় ব'লে মনে হ'চ্চে।

রমা। পাইনি, এমনও ব'ল্‌তে পারি না। পাঁচজনে দেবতা ব'লে কাউকে আমার পূজার আসনে এনে বসিয়ে দিতে চাচ্চে।

চামে। বেশ ত। দেবতা ব'লে যদি প্রাণ টানে, আসনে বসিয়ে পূজো কর্‌। কে সে রমা ? মনু বাবু ?

রমা। হাঁ।

চামে। দেবতার মতই দেবতা যদি পেয়েছিস্‌, হেলা করিস্‌নি। আদর ক'রে আসনে বসিয়ে নে, ভক্তি ক'রে পূজো কর্‌!

রমা। যদি হয়, পূজো আমার যে দিন আরম্ভ হবে, তোর আশীর্ব্বাদ যেন পাই চামেলী। মহাশক্তি আজ তোরই প্রাণ ভ'রে র'য়েছেন। তোর আশীর্ব্বাদেই তাঁর আশীর্ব্বাদ পাব।

চামে। তাঁর আশীর্ব্বাদ তিনিই ক'র্‌বেন। তাঁর কাছেই চা। আমি কে রমা ? আমিও যে তাঁর আশীর্ব্বাদ চাই। দিতে পারি, এমন অধিকার আমার কি আছে ?

রমা। আয় তবে চামেলী! আজ এই সুন্দর শুভক্ষণে—আঁধার ভাঙ্গা আলোকের এই শুভ জাগরণে—দুজনেই তবে আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদ চাই।

চামে। আয়! তাই চাই রমা! চাওয়ার মত যদি চাইতে পারি, তুইও পাবি, আমিও পাব। যার যার পথে জীবন আমাদের সার্থক হবে!

(যুক্তকরে উভয়ের গান।)

শক্তি মা তোর দীপ্তজ্যোতি দিব্য আলোক আঁধার লোকে!
শক্তিভোগেই শান্তি ওমা—ক্ষান্তি তোমার শক্তি-যোগে!
ক্ষান্ত চিতে পিয়াস যত,
শান্ত জীবন সেবায় রত,

মঙ্গলে মা কর্ম্মব্রত—ধর্ম্ম তোমার সেই আলোকে !
জাগ্রত সে ধর্ম্মে মাগো—
প্রাণ দেবতা ! প্রাণে জাগো !
কর্ম্মে তোমার জীবন ধারা লও ধ'রে মা তোমার বুকে—
আঁধার ছেড়ে ওই আলোকে !

সম্পূর্ণ।

অশ্রুর ভাষা।

মোর বাসনা গুমরি মরে হৃদয় তলে
মোর ভাষা যে ভাসিয়া যায় নয়ন জলে।

বিষাদ মলিন মুখে মা আছে বসি,
পাণ্ডুর তনয়ের বদন শশী,
নিমেষে চারিটি আঁখি যে কথা বলে
ভাবিতে ভাষা যে ভাসে নয়ন জলে।

মরণ যুবারে টানে করেতে ধরি
কাঁচা বাঁশ ব্যাধি-ঘুণ জেরেছে মরি
মলিনা বালিকা বধূ চরণ তলে,—
মোর ভাষা যে ভাসিয়া যায় নয়নজলে

ক্রুর কাবুলীরা ধরি বুড়ারে জোরে
টানিছে, ভাসিছে নাতি নয়নলোরে।
ওই শীতের ওড়নি আনি দিতেছে ফেলে ;
হেরিয়া ভাষা যে ভাসে নয়ন জলে।

গ্রামে মহা উৎসব আজিকে মেলা,
বাঁশী কিনে ছেলে দল করিছে খেলা,
ওই ম্লানমুখে চেয়ে আছে কাদের ছেলে,
হেরিয়া ভাষা যে ভাসে নয়ন জলে।

এবার আসেনি পূজা মোদের বাড়ী
মাঠে যেগো ধান নাই, হয়নি বারি,
শূন্য দালানে ব্যথা উঠে উথলে,—
হেরি ভাষা যে ভাসিয়া যায় নয়ন জলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভাবিনী।

(গাথা।)

ক্ষুদ্র পল্লী প্রান্তর বালু
কঙ্কর শিলা আবিল ধুয়ে
বয়ে যায় এক ক্ষুদ্র তটিনী
মুক্তামালার সীমানা থুয়ে।
বর্ষায় নদী প্লাবি তীর ভূমি
বহিয়া আনিত গুল্মলতা—
নিদাঘে আবার যাইত ফিরিয়া
ক্ষুব্ধ হতাশ প্রণয়ী যথা!
রামু মোড়লের নাতিনী ভাবিনী
ললিত সুঠাম কিশোরী মেয়ে
এ নদীপাড়ের আমের বাগানে
যখন তখন আসিত ধেয়ে।
বড়ই গরীব রামমণ্ডল
কোন মতে করে দিনাতিপাত—
কেউ নাই ঘরে—আপনি, ভাবিনী,
আর নাতি এক বছর সাত!
বৃদ্ধ রামু সে রাজার রাখাল,
হরিশ ছেলেটি ভুগিছে জ্বরে,
তবু সে তাদের মঙ্গলাকে নিয়ে
চরাইত নিতি বিলের চরে।
সন্ধ্যায় দিয়ে গোয়ালে সাঁজাল
ভাবিনী ঢুকিত রান্নাঘরে
'দাদা' আর ভা'য়ে খাওয়ায়ে, রাখিত
ভিজাইয়া ভাত প্রাতের তরে।
হরিশ যে দিন পাইত মজুরী
মঙ্গলারে নিয়ে ভাবিনী যেত'—

সারাদিন ঘুরি বাগানে ও বেড়ে
'খুঁটিয়া' আনিত যা' কিছু পেত'।
কভু দু'টি বেল, একটি কয়েত্
গোটা কত ন'টে শুশুনি শাক
কিম্বা একটা ঝিঞে বা করলা
রাত্রে তাহাই হইত পাক।
বড়ই কষ্ট রামু মোড়লের
কেউ তারে ফিরে চাহে না কভু ;—
পাতিতনা হাত—সুখী সে যে ছিল
নিজ-নির্ভর-গর্ব্বে তবু !

*　　*　　*　　*

সে দিন শ্রাবণ বর্ষা ভীষণ
দুর্য্যোগ ছিল সারাটি দিন
ক্ষণেকের' তরে আসেনি দেবতা
সূর্য্য ছিলেন আঁধারে লীন !
মাঠে বাটে সব হাঁটু ভরা জল
সাঁজেই অমার নিশীথ যথা—
রাজবাড়ী হতে ফিরিতে নারিয়া
মোড়লের বড় বাজিল ব্যথা !
ভাবিনী হেথায় ভা'য়েরে খাওয়ায়ে
পাথরে দাদার অন্ন ঢালি,
রহিল বসিয়া মাটির একটি
ছোট্ট প্রদীপ সমুখে জ্বালি !
ঘন গর্জ্জনে ঘুর্ণিঝঞ্ঝা
চূর্ণিছে কত তরুর শির—
বর্ষার কেশ মুষ্ঠে আঁকড়ি
নিস্ফল রোষে কি অস্থির !
পবন আহত দ্বারেব শিকলি
বাজে ক্ষণে ক্ষণে চকিত করি—
ঝাপ্টা বাতাস দুয়ার ঠেলিয়া

দিছে বালিকার চিত্ত ভরি !
শুনিছে ভাবিনী এ প্রলয় মাঝে
বুড়ার কম্প্র পায়ের ধ্বনি—
অই বুঝি দাদা ক্লান্ত নির্বাক্
দ্বারে কর হানে রনন্ ঝনি !
খুলে দেখে দ্বার—কই ? কেউ নাই !
বায়ু করে যায় অট্টহাস ।
রুধিয়া দুয়ার আসে ফিরে ফিরে
কত বার হেন ব্যর্থ আশ !
ভাবিছে ভাবিনী ধ্রুব বিশ্বাসে
না-আসা দাদার হয়নি কভু,
আজিও আসিবে—দুর্য্যোগ আর
দূর পথে দেরী—আসিবে তবু !
হেরে যেন বালা—মাঝ পথে দাদা
একে এ আঁধার তাহাতে জল,
কোথা আ'ল কোথা পথ ঠিক নাই—
পথ থৈ থৈ সুসমতল !
আমরা তো বেশ আছি ঘরে বসে'
না এলেই তুমি করিতে ভাল !
সরে না বাক্য শুষ্ককণ্ঠে
ভাবিছ'—বাঁচিতে পাইলে আলো !
তালের ছাতাটা উড়ে গেছে ঝড়ে
ক্ষুধায় শক্তি নাহি তো হাতে !
খুঁজিছ' কি তাই সাশ্রু নয়নে
হাঁতাড়ি আঁধারে এ কাল রাতে ?
রক্তের ধারা ঝরিছে চরণে
ফুটেছে কতনা কুশের আগা—
সিক্ত সে চীর জলে সট্‌পট্
চলিতে কেবলি হোঁচট্ লাগা !
হাঁকিল তখন তৃতীয় প্রহর

"ছুটিতে ছুটিতে আসিল ভাবিনী
উর্ম্মিধ্বনিত নদীর ধারে।"
("ভাবিনী")

কমলা প্রেস—কলিকাতা।

পল্লী প্রহরী শৃগাল দলে
পড়িল লুটিয়া ভাবনা ক্লান্ত
কিশোরীর মাথা মেঝের তলে।

"যাই, যাই, দাদা,—আহা মরে' যাই—
হয়েছে তোমার কষ্ট কত।"
বলিতে বলিতে ছুটিল কিশোরী
মুছি আঁখি দু'টি তন্দ্রাহত।
"কই? কত দূরে? আলো নিয়ে যাব?
যাই, যাই দাদা সবুর কর'!
ভয় কি? এই যে আসিয়াছি আমি"
বলিয়া ভাবিনী ছুটিল খর!
থেমেছিল জল; বাতাস তখন
রাগে এলোমেলো সরাতে মেঘ—
শিশুর মতন জামা পরে' তারে
খুলিতে যেমন প্রকাশে বেগ!
ছুটিতে ছুটিতে আসিল ভাবিনী
উর্ম্মিধ্বনিত নদীর ধারে;—
আরও গেল সে—নিকটে বা দূরে
মিলাইল শেষে অন্ধকারে!

* * * *

ফিরিল মোড়ল তখনি উষায়
হরিশ তখনো ঘুমায় ঘরে
ঢুকিতে দুয়ারে কি যে এক বাধা
পাইল বৃদ্ধ বাতাস ভরে।
করুণ হিয়ার বৃথা প্রতীক্ষা
মরণের ঘোর আর্ত্তনাদ
বাড়ীর বাতাস করেছিল ভারী
বৃদ্ধ তাহার পাইল স্বাদ।
"ভাবিনী—ভাবিনী" ডাকিল মোড়ল

ফিরিল সে ডাক নিরুত্তর
'সে যে নাই' হেন কেন মনে হয়
রোদন আসিছে নিরন্তর।
নীরব নিজন—আসিল না কেউ।
সেবা-পরায়ণ সে দুটি হাত
অন্নের থালে রহিছে জাগিয়া—
করে বুড়া ঘন দৃষ্টিপাত!
চরণ পাটুনী আসিয়া তখনি
আছাড়ি পড়িল আঙন তলে—
"ঘাটে এল যবে, জানি কি তখন
'নিশি'তে তাহারে পেয়েছে বলে' ?"
মূর্চ্ছিত বুড়া পড়িল তখনি
মেলিল না আর বারেক আঁখি!—
জলটুঙি বাসী কৃষকেরা বলে—
আজ' ফিরে সে যে দাদারে ডাকি ॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এস মা বঙ্গে।

এস মা বঙ্গে অপার রঙ্গে
মুখে মধুর হাসি
হাসিতে তব হাস্থক দেশ
কত কাল বল কাঁদিবে বসি ?
শস্যশালিনী হোক্ গো ধরণী
তোমার মঙ্গল চরণ স্পর্শে,—
ধন রতনে ভাণ্ডার পূর্ণ
হোক জননীর আশীষ বর্ষে।
ঘুচুক রোগ ঘুচুক শোক
ঘুচুক সবার প্রাণের জ্বালা
শান্তির কুঞ্জে ভক্তির সঙ্গে
পারে যেন দিতে চরণে ডালা।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন

দ্যূতকার।

(ইংরেজি গল্প হইতে অনূদিত।)

প্রতিকূল ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে, বস্তুতঃ আমার নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে, গ্রাসাচ্ছাদনের সর্ব্বপ্রকার উপায়বিহীন হইয়া অবশেষে নাগরিক পুলিস বিভাগে সাধারণ পুলিসের কার্য্যে প্রবেশ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। এক বৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল কার্য্য করিতেছি। লণ্ডনের পশ্চিম প্রান্তে (ওয়েষ্ট এণ্ডে) অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীকে কতকগুলি প্রতারক চাতুর্য্যপূর্ণ এক অভিনব প্রণালীতে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। আমি ইহার একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম, এবং তাহা অবলম্বনে আসামীরা অবশেষে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাতেই জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—তিনি নাকি এই কার্য্যে আমার বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া-ছিলেন। এই বড়কর্ত্তা মহাশয় একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পরে আমার সেই কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন শীঘ্রই অন্য কতকগুলি কার্য্যোপলক্ষে আমারই প্রয়োজন হইবে। কারণ ঐ সকল কার্য্যে বিশেষ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা আবশ্যক।

আমাকে বিদায় দিবার সময় একটু অর্থপূর্ণ হাস্য সহকারে কর্ত্তা বলিলেন, "আমি বোধ হয়, পূর্ব্বেও তোমাকে দেখিয়াছি—তখন তোমার অবস্থা অন্যরূপ ছিল, যাহা হউক, তজ্জন্য তোমার চিন্তার কারণ নাই—আমি অন্যের গুপ্তরহস্যে অযথা প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। ওয়াটার্‌স্ নামটি সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অতি সাধারণ, হয়ত বা আমার ভ্রমই হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আরও একটু গভীর অর্থব্যঞ্জক হাস্য করিলেন—হাস্য যেন পরিহাসে পরিণত হইল। তিনি পুনরায় বলিলেন, "যাহা হউক, যে ভদ্রলোকের প্রশংসা ও অনুরোধ পত্রের বলে তুমি এই কার্য্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ—এবং ভূত-পূর্ব্ব কার্য্যে তোমার ব্যবহার যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিভূ। তোমার কোন অপরাধ হইলে তাহা অবিবেচনা বা বুদ্ধির ত্রুটিই মনে করা যাইবে। আর অনুসন্ধান করিবার আমার অধিকার নাই—প্রবৃত্তিও নাই। খুব সম্ভবতঃ কালই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব।"

গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম

যে, কর্ত্তার পূর্ব্বে আমাকে অনুরূপ অবস্থায় দেখিবার কথাটি নিতান্তই ভিত্তিশূন্য অনুমান মাত্র, কারণ আমার সমৃদ্ধির সময় আমি কচিৎই লণ্ডনে আসিতাম এবং আসিলেও এখানকার সমাজে একপ্রকার মিশিতাম না বলিলেই হয়। কিন্তু আমার পত্নীর নিকট এই কথোপকথনের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেই তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, একবার ঘোড়দৌড়ের সময় কর্ত্তা ডনকাষ্টারে আসিয়াছিলেন এবং হয়ত তখন আমাকে দেখিয়া বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কর্ত্তার ইঙ্গিতের বোধ হয় ইহাই বিশেষ সম্ভবপর অর্থ; কিন্তু ইহাই একেবারে সঠিক কারণ কি না তাহা আমি বিচার করিবার সুযোগ পাই নাই। তিনিও এ বিষয় পরে আর কখনও উল্লেখ করেন নাই। আমারও নূতন করিয়া কথা উত্থাপন করিবার একটুকুও ইচ্ছা ছিল না।

তিনদিন গত হইলে আমার প্রত্যাশিত তলব আসিল। তাঁহার নিকট হাজির হইবা মাত্র শুনিলাম, আমাকে তখনিই এমন একটি কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে যাহা অভিজ্ঞ সুচতুর গোয়েন্দার পক্ষেও গৌরবজনক। শুনিয়া প্রীত ও ও বিস্মিত হইলাম। "এই কাগজে সেই জুয়াচোর বাটপাড় জালিয়াৎদের সম্বন্ধে লিখিত বর্ণনা রহিয়াছে।" এই বলিয়া কমিসনার সাহেব উপদেশ স্বরূপ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে সন্ধান করিয়া তাহাদের আড্ডা বাহির করিতে হইবে এবং তাহাদের কুকার্য্যের আইনসঙ্গত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমরা যে বিফলকাম হইয়াছি, তাহা বোধ হয় আমাদের কর্ম্মচারীদের ব্যস্ততাযুক্ত আগ্রহের ফল; তোমার যেন এই ভ্রম কিছুতেই না হয়। দুরাত্মারা দুষ্কার্য্যে অতিশয় অভ্যস্থ; ইহাদিগকে আড্ডা হইতে বাহির করিয়া বিচারের অধীন আনিতে বিশেষ সহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রয়োজন হইবে। মিঃ মার্টিন ইহাদের নূতন শিকার। ইনি লেডী ইভার্টনের পূর্ব্বপক্ষের স্বামীর ঔরসজাত পুত্র। লেডী ইভার্টন ইঁহাকে উহাদের জাল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তুমি অদ্য অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় এই মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে—অবশ্য সাধারণ পরিচ্ছদেই যাইবে এবং যে সংবাদ তিনি দিতে পারেন তাহা শুনিয়া আসিবে। বরাবর আমার নিকটে সংবাদ দিতে হইবে, স্মরণ রাখিও। যদি কোন সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তাহা তুমি অবিলম্বেই পাইবে।" আরও দুই চারিটি সাধারণ উপদেশ দিয়া আমাকে কমিশনার এমন একটি কার্য্যে পাঠাইলেন যাহা দুঃসাধ্য ত বটেই, হয়ত বা বিপজ্জনকও হইতে পারে। কিন্তু আমি সে কার্য্যের ভার আনন্দের

সহিত গ্রহণ করিলাম। স্ফূর্ত্তিহীন দৈনন্দিন কার্য্যের একটানা স্রোতের গতি হইতে নিস্তার পাইলাম।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমার সম্পদের ধ্বংসাবশেষ হইতে আমার পত্নী এমিলী সৌভাগ্যক্রমে যে বেশভূষা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই বিশেষ যত্ন সহ পরিয়া লেডী ইভার্টনের প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পৌঁছিবামাত্রই আমাকে বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া হইল। তথায় লেডা ইভার্টন ও তাঁহার অপ্সরাতুল্যা সুন্দরী কন্যা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিশেষ পোষাকে সজ্জিত বা সাধারণ পরিচ্ছদে শোভিত পুলিশ-মূর্ত্তির সহিত আমার অবয়বের সাদৃশ্য একেবারেই ছিল না, তজ্জন্য আমাকে চিনিতে না পারিয়া লেডী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন বুঝা গেল, এবং আমি যে পত্র লইয়া গিয়াছিলাম তাহা পাঠ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার গর্ব্বিত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দূরীভূত হইয়া, উচ্চপদাভিষিক্তের সভ্যতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাতের করুণাও আমার ভাগ্যে ঘটিল না।

"বসুন মিঃ ওয়াটার্স্"—এই বলিয়া লেডী একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। তারপর কহিলেন, "এই পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে আমার পুত্র দুর্ভাগ্য বশতঃ যে বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে আপনিই মনোনীত হইয়াছেন।"

এই সম্ভ্রান্ত মহিলার গর্ব্বিত ব্যবহারে আমি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া কথঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বলিতে উদ্যত হইয়াছিলাম যে—তাঁহার পুত্র যে জুয়াচোরদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাদের মূলোচ্ছেদ কার্য্যে জনসাধারণের পক্ষেই আমি নিযুক্ত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সংবাদ গ্রহণ করিতেই আসিয়াছি। কিন্তু যদিও আমি ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ-পরিহিত ছিলাম, তথাপি সৌভাগ্য বশে আমার প্রকৃত অবস্থা তৎক্ষণাৎ স্মৃতিপথে সুস্পষ্টরূপে উদিত হইল, এবং আমার অসংযত জিহ্বাকে माननीয়া মহিলার প্রতি অসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগে দমন করিয়া আমি বৈশিষ্ট্যসূচক মৌন অবগতি মস্তক অবনত করিয়া জ্ঞাপন করিলাম। লেডী যে অবস্থা বিবৃত করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—মিঃ চার্লস মার্টন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে এই কয়েক মাসের মধ্যেই জুয়াচোরের দলে পতিত হইয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য অদম্য বাসনা তাঁহার সমগ্র দেহ মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার উত্তেজিত দুর্ব্বহ জীবন প্রত্যহই দিবারাত্রি সমভাবে খেলায় ব্যয়িত হইতেছে। তাঁহার মতে

পুনঃ পুনঃ দুর্ভাগ্য বশতঃ—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দিনে ডাকাতির যে ষড়যন্ত্র তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহার প্রভাবে—তাঁহার পৈত্রিক নগদ সম্পত্তি ও তাঁহার স্নেহে দুর্ব্বলা মাতার প্রদত্ত বহু অর্থই যে তিনি নষ্ট করিয়াছেন তাহা নহে, ইহা ছাড়া খত দিয়া ও হুণ্ডি কাটিয়াও ভয়ানক ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই সর্ব্বনাশের প্রধান কর্ত্তার নাম স্যাণ্ডফোর্ড। এই ব্যক্তির বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি ভব্যতা ও তেজস্বিতাব্যঞ্জক; কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই লোকটিই একদল দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর পরিচালক। এই দস্যুদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্যই আমি নিয়োজিত হইয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়,এই ব্যক্তির প্রতি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও মার্টনের অটল একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল, এবং ইহার দলের লোকের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ইহারই পরামর্শ ও সহায়তার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিলেন। ইভার্টন সম্পত্তি পুত্রাভাবে উত্তরাধিকার স্থত্রে পরলোকগত লর্ডের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং নিশ্চিত অনিবার্য্য ধ্বংসে হতভাগ্য প্রতারিত যুবক তাহার আত্মীয়দের প্রতিও তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছিল। লেডি ইভার্টনের স্ত্রীধন স্থাবর সম্পত্তি অতি সামান্যই ছিল, এবং লেডীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা তিনি পুত্রকে যথেচ্ছভাবে নষ্ট করিবার সুযোগ দিয়া বাজার দেনায় বিশেষ বিব্রত হইয়াও পড়িয়াছিলেন।

আমি আগ্রহাতিশয্য সহ সমগ্র কাহিনী শুনিলাম। পুলিসের কাগজপত্র দেখিয়া স্যাণ্ডফোর্ডকে বহুকালের পরিচিত বলিয়া আমার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। প্রসঙ্গচ্ছলে লেডী ইভার্টন যখন স্যাণ্ডফোর্ডের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন সেই পূর্ব্ব সন্দেহই আমার বদ্ধমূল হইতেছিল, এবং আমি যে এক সময়ে এই ভদ্রলোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, তাহা বারম্বার আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিল। এই সন্দেহের বিষয় আমি প্রকাশ করিলাম না। আমার কার্য্যের সহায়ক সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং মিঃ মার্টনের নিকট এই সাক্ষাতের বিষয় বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া, আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমার সেখানে বারম্বার যাতায়াত সন্দেহের কারণ হইতে পারে বলিয়া কার্য্যে যখন যতদূর অগ্রসর হইব, তাহা পত্রদ্বারাই জ্ঞাপন করিব বলিয়া আসিলাম।

পথে পদার্পণ করিয়াই মনে হইল, "যদি এই ব্যক্তিই সে হয়!" মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হইবামাত্র ভীষণ বেগে আমার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত

হইতে লাগিল। "যদি এই স্যাণ্ডফোড সত্যই সেই দুরাত্মা ফার্ডন হয়, তাহা হইলে আমার সাফল্য রণজয় তুল্য বিবেচনা করিব। তাহা হইলে আমার উৎসাহ বর্দ্ধনে লেডী ইভার্টনের অর্থ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন হইবে না। যাহার চক্রান্তে আজ এই ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘনিশ্বাস, সুশীলা যুবতী স্ত্রীর সমৃদ্ধি হইতে দুঃসহ দারিদ্র্যে পতন, ধরাবক্ষে এমন অলস কাপুরুষ নাই যে তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সমুৎসাহিত না হয়। ভগবান সমীপে প্রার্থনা করি আমার সন্দেহ যেন সত্যে পরিণত হয়। শত্রু! সাবধান! প্রতিহিংসু তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী।"

পুলিশ কার্য্যালয় হইতে জানিয়াছিলাম যে, স্যাণ্ডফোর্ড প্রায়ই ইটালিয়ান অপেরায় নৃত্যগীত দেখিতে যাইত। যে বক্সে সাধারণতঃ সে বসিত, তাহাও আমি পুলিশের নোট বহি হইতে অবগত হইয়াছিলাম। বিজ্ঞাপনে দেখিলাম সেই রাত্রিতেই একটি বিখ্যাত অপেরায় অভিনয় হইবে; আমিও তথায় যাইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলাম। নাট্যশালায় নৃত্য আরম্ভ হইবার কিয়ৎকাল পরে আমি নাট্যশালায় প্রবেশ করিলাম এবং ঔৎসুক্য সহ চারিদিক দেখিয়া লইলাম। রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া কয়েক মিনিট। যে বক্সে আমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান করিবার কথা ছিল, সেই বক্সটি দেখিলাম শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই মৌহূর্ত্তিক নৈরাশ্য শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল। পাঁচ মিনিট অতিবাহিত না হইতেই পাংশুবর্ণ একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের হস্তধারণ করিয়া ফার্ডন যেন দম্ভপূর্ণ বিজয়দীপ্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল! যুবকের আকৃতির সহিত লেডী ইভার্টনের বৈঠকখানায় রক্ষিত একখানি প্রতিমূর্ত্তির আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল; সুতরাং ইহার নামই যে মিঃ মার্টন তাহা বুঝিতে আমার কোন বিলম্ব হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলাম। যে উজ্জ্বল্যময় বিষধরের বিষাক্ত আলিঙ্গনে একদিন আমি বিজড়িত ও নিষ্পেষিত হইয়াছিলাম, তাহার দর্শন মাত্রই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উত্তেজনা একটু প্রশমিত হইবামাত্র আমি ঘুরিয়া নাট্যশালার অপরপ্রান্তে গিয়া নিঃসঙ্কোচে সেই বক্সে প্রবেশ করিলাম। ফার্ডন মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। আমি তাহার স্কন্ধে মৃদু আঘাত করিলাম, সে সহসা ফিরিয়া তাকাইল এবং এইরূপ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, অজগর সর্প দেখিলেও বোধহয় সে তদ্রূপ হইত না। তথাপি আমার মুখের ভাব বেশ স্নিগ্ধ ও প্রীতিব্যঞ্জক রহিল। আমি যেন পূর্ব্ব বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই হস্ত প্রসারণ করিলাম।

দুর্ব্বল হস্তে আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া সে বিজড়িত কণ্ঠে অবশেষে বলিল, "ওয়াটার্‌স্! তোমার সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইবে কে জানিত?"

"অন্ততঃ তুমি ত নয়ই—কারণ তুমি একজন পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া যেরূপ অবাক্ হইয়া তাকাইয়াছিলে—যেন কোন ভয়ঙ্কর দৈত্য তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। বস্তুতঃ—"

"চুপ, চুপ! চল আমরা সম্মুখের দালানে গিয়া কথাবার্ত্তা বলি—" এই বলিয়া সে মিঃ মার্টনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ইনি পুরাতন বন্ধু—আমরা এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।"

আমরা নির্জ্জনে আসিবামাত্র, ফার্ডন তাহার চিরাভ্যস্থ গাম্ভীর্য্য পুনঃ সঞ্চয় করিয়া বলিল, "কেন, কি হইয়াছে ওয়াটার্‌স্? আমি বুঝিয়াছিলাম তুমি আমাদের দল হইতে অবসর লইয়াছ। তুমি নাকি—এই—কি বলব" ——

"ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছি—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, একথা তোমার চেয়ে আর কেহই বেশী জানে না।"

ফার্ডন বলিল "দেখ ভাই, তুমি বোধহয় মনে করনা যে—"

"আমি কিছুই মনে করি না ভাই ফার্ডন। আমাকে একেবারে তারা সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল—ইতর ভাষায় যাহাকে "চোকে ধূলো" দেওয়া বলে। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমার করুণাময় খুল্লতাত—"

"পাস্‌গ্রোভ্ মরিয়াছেন? তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছ? বড়ই সুখের বিষয় ভাই! আমি আনন্দে তোমাকে অভিনন্দন করিতেছি! ইহা বাস্তবিকই 'ঘটনা চক্রের' মনোহর আবর্ত্তন!"

"সত্য বটে; কিন্তু মনে রাখিও, আমি সেই পুরাতন খেলা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছি। আমি আর সয়তান জুয়াখেলায় নাই। আমি এমিলীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর কখন তাস স্পর্শও করিব না।"

অভ্যস্ত দ্যূতকারের মুখে "সদুদ্দেশ্যের" বার্ত্তা কর্ণে প্রবেশ মাত্র, সেই পিশাচ অবতারের নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় হইতে উপহাসের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া সে কহিল, "অতি উত্তম! ঠিক্ কথাই বলিয়াছ ভাই। আইস, তোমাকে মিঃ মার্টনের সহিত পরিচিত করিয়া দিই, অতি সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত সম্পর্কিত ইনি। ভাল কথা, সম্প্রতি আমি পারিবারিক ও অন্য কারণে স্যাণ্ডফোর্ড নামে পরিচিত, সে সব কারণ তোমাকে পরে বুঝাইয়া বলিব।"

"স্যাণ্ডফোর্ড ?"

সে কহিল—"হাঁ, ভুলিও না। এখন তাড়াতাড়ি চল; নাচ শেষ হইয়া যাইবে।"

স্যাণ্ডফোর্ড আমাকে তাহার পুরাতন বন্ধু - বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই—ইত্যাদি বলিয়া মিঃ মার্টনের সহিত যথাপদ্ধতি পরিচিত করিয়া দিল। নৃত্য শেষ হইলে স্যাণ্ডফোর্ড নাট্যশালার সম্মুখস্থ ইয়োরোপিয়ান কাফিখানায় যাইবার প্রস্তাব করিল। সকলেরই সম্মতি হইল এবং আমরা সেই দিকে চলিলাম। সোপানে কমিশনার মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও আমাদের ন্যায় "রঙ্গমঞ্চ" পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাঁহার গাত্রে মিঃ মার্টনের গাত্র সংঘর্ষণ জন্য মিঃ মার্টন ত্রুটি স্বীকার করিলেন। তিনিও মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সম্ভাষণ বিনিময় করিলেন। তিনি আমাদিগের অবয়ব একবার সংক্ষেপে, উদাসভাবে দেখিয়া লইলেন। কিন্তু আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা তাঁহার হাবভাবে বিন্দুমাত্রও সূচিত হইল না। আমার মনে হইল তিনি বোধহয় আমার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন জন্য আমাকে চিনিতে পাবেন নাই। কিন্তু কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমার সেই ভ্রম অপনীত হইল। তাঁহার অবনত ভ্রূযুগের অধঃস্থ চক্ষু হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়-জ্ঞাপক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল এবং আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া পুনর্বিলীন হইয়া গেল। কাফিখানায় আমরা গল্প পরিহাস করিতে করিতে দুই তিন বোতল মদিরা আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত উদরসাৎ করিলাম! সর্ব্বাপেক্ষা স্যাণ্ড-ফোর্ডেরই স্ফূর্ত্তির আধিক্য হইয়াছিল। সে পান-পাত্র প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরায় পূর্ণ করিয়া পান করিতেছিল, আর অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী ও সুরসাল কৌতুক পরি-হাসে আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিতেছিল। আমাকে একটি নূতন ধনী শিকার ভাবিয়া আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া বেশ স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে আমার পূর্ব্বকথিত "সদুদ্দেশ্য" ও "পত্নীসমীপে কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা রূপ ধর্ম্ম" হইতে আমাকে বিচলিত করিবার সক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্রও আর সন্দেহ ছিল না। রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ দ্বাদশ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গের জন্য সে প্রস্তাব করিল। মিঃ মার্টন কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই অসহিষ্ণুতা ও অশান্তির অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, এই প্রস্তাবে তিনি আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন।

আমরা গাত্রোত্থান করিবা মাত্র, স্যাণ্ডফোর্ড বলিল, "ওয়াটারস, তুমি কি

আমাদের সহিত যাইবে? বিবাহের দলীলে অপরের খেলা দেখিবেনা বলিয়া বোধহয় তুমি রেজেষ্টরি আফিসে কোন প্রতিশ্রুত রেজেষ্টরি করিয়া দেও নাই?"

আমি বলিলাম, "তা—নয়, কিন্তু আমাকে খেলিতে বলিও না।" সে কহিল, "কখনই নয়! তুমি নিশ্চয় জানিও প্রলোভন দ্বারা তোমার ধর্ম্মের কোন বিঘ্নই করা হইবে না।" তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপাত্মক পৈশাচিক হাস্যের আবির্ভাব হইল।

আমরা শীঘ্রই নদীতীরে যাইবার পথের পার্শ্বস্থ একটি নির্জ্জন সুদৃশ্য বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। স্যাণ্ডফোর্ড দ্বারে সাঙ্কেতিক মৃদু করাঘাত করিল— অভ্যন্তর হইতেও অবিলম্বে প্রত্যুত্তর হইল। তখন চাবির ছিদ্রপথে সে আমার অবোধ্য একটি সঙ্কেত শব্দ নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিবামাত্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমরা দ্বিতলে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিকস্থ গবাক্ষ ও দ্বারগুলি এরূপ সতর্কতার সহিত আবদ্ধ যে, তথায় যাহা হইতেছে তাহার সংবাদ রাজপথে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কক্ষটি উজ্জল আলোক মালায় আলোকিত। টেবিলের উপর তাস ও পাশার পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার চলিতেছিল। নানাবিধ সুরা ও মদিরা প্রচুর পরিমাণে উপস্থাপিত হইতেছিল। ভদ্রবেশধারী প্রতারক দলের দশ বারজন ব্যতীত তথায় আরও পাঁচ ছয়জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাষণ্ড প্রবঞ্চকগুলির আকৃতি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আমি একটুকু বিচলিত হইলাম—কি জানি যদি এই মহাত্মাদের কেহ আমার বর্ত্তমান ব্যবসায় সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তাহা সম্ভবপর নহে। আমি মাত্র কয়েকমাস যাবৎ কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার মধ্যে আমার পাহাড়ার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই সজ্জন-সভাগৃহ সমুহ হইতে বহুদুরে অবস্থিত। তারপর চাকুরীর উপলক্ষ্য ব্যতীত লণ্ডনে আমি অপরিচিত। তথাপি আমার পরিচয়দাতার প্রতি ব্যগ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নানা দেশের আবর্জ্জনাই এখানে একত্রিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটা বিরাট বপু বিদেশী বিশেষ অভদ্রোচিত অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিতে লাগিল। স্যাণ্ডফোর্ড তাহার বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর বিদেশী ভাষায় সংক্ষেপে প্রদান করিল এবং অব্যক্ত মৃদুস্বরে আরও যেন কি কহিল। তাহা শুনিয়া সেই লোকটার মুখে কাষ্ঠহাসির উদয় হইল এবং আমার প্রতি তাহার ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ,

যদিও আমার সঙ্গে একাধিক পিস্তল ছিল, তথাপি আমি যেরূপ দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি দুর্বৃত্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলাম, তাহাতে আমার আত্মরক্ষার আশা মাত্রও ছিল না। লোকটা আমার নিকট খেলার প্রস্তাব করিল। প্রথমতঃ আমি একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তৎপরে ক্রমশঃ প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া যেন আমার মতির পরিবর্ত্তন হইতেছে এইরূপ ভাণ করিয়া খেলিতে স্বীকৃত হইলাম, এবং আমার বৈদেশিক "বন্ধুর (?) সহিত অল্প বাজি রাখিয়া খেলিতে লাগিলাম। আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জিতিতে দেওয়া হইল। খেলার শেষে হিসাব করিয়া দেখিলাম আমি পিশাচদের দশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছি। মিঃ মার্টিন পাশা লইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু অর্থ হারিয়া সঙ্গের সম্বল সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গেলে তিনি প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দিলেন। তাঁহাকে যেরূপ হেলায় প্রবঞ্চনা করা হইতেছিল, তাহা বস্তুতঃই নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। যে কোন আনাড়ী খেলোয়ারও ইহা নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ ধরিয়া ফেলিত। যাহা হউক, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের এই অন্যায় আচরণে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না—কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপদেষ্টা ও পরিচালক স্যাণ্ডফোর্ডের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিলেন। এই রমণীয় সভা প্রত্যূষে ছয় ঘটিকার সময় ভঙ্গ হইল—প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাটীর পশ্চাৎদ্বার দিয়া পরবর্ত্তী রাত্রির নূতন সঙ্কেত শব্দ অবগত হইয়া বহির্গমন করিতে লাগিল।

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি কমিশনার সাহেবের নিকট কার্য্যের ফলাফল জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হইলাম। আমার প্রথম উদ্যম সৌভাগ্যযুক্ত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তথাপি ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতেও বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। গত রাত্রিতে আমি সাঙ্কেতিক প্রবেশ-বাক্য অবগত হইয়াছিলাম, সুতরাং অদ্য রাত্রিতে ক্রীড়ার সময়েই দলভুক্ত সমুদয়কেই অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে আমার উদ্দেশ্যের একাংশ মাত্র সাধিত হয়। কারণ সেই সুহৃৎসঙ্ঘের স্যাণ্ডফোর্ড ও অন্য কতিপয় ব্যক্তি বিদেশীয় কৃত্রিম ব্যাঙ্ক নোট চালাইতেছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল, এবং ইহাদিগকে বিচার আমলে আনিবার জন্য আইনসঙ্গত প্রমাণ সংগ্রহ আবশ্যক। পরন্তু মিঃ মার্টিনের নিকট হইতে যে সকল সম্পত্তি ও দলিল উহারা হস্তগত করিয়াছিল, সম্ভব হইলে তাহাও পুনঃ উদ্ধার করিবার বাসনাও রহিয়াছে।

সাত আট দিন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। জুয়াখেলা পূর্ব্ববৎই প্রত্যেক রাত্রিতে চলিতেছিল এবং মিঃ মার্টনও উত্তরোত্তর—আরও ঋণে জড়িত হইতেছিলেন। সর্ব্বসাধারণের নিকটে যাহারা উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্হ, তাঁহাদিগকেও এই পাপক্রীড়া নীচতার এইরূপ চরমসীমায় লইয়া যায় যে তাঁহারা এই ক্রীড়ার অনুসরণ জন্য যে কোন কুকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। মিঃ মার্টনও অবশেষে তাঁহার ভগ্নীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া বাজী ধরিয়া তাহা হারিলেন এবং স্যাণ্ডফোর্ডের পরামর্শে তাঁহার প্রতিশ্রুত প্রভূত ঋণ পরিশোধ ও জিত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য পুনরায় ক্রীড়ার মূলধন সংগ্রহার্থ একটা বৃহৎ সম্পত্তি বন্ধক দিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। মিঃ মার্টনকে যেরূপে প্রতারিত করা হইতেছিল তাহা আমার কিছুই অপরিজ্ঞাত ছিল না, কারণ আমি সম্পূর্ণ ভুক্তভোগী,—স্যাণ্ডফোর্ড আমাকেও ঐরূপেই সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল। আমি ক্রীড়ায় যোগদান করিতাম না বলিয়া যদি কোন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়—সেইজন্য আমি স্যাণ্ডফোর্ডকে একদিন বলিয়াছিলাম যে আমি আমার খুল্লতাতের দানপত্রানুসারে চারি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের অপেক্ষায় লণ্ডনে রহিয়াছি ঐ অর্থপ্রাপ্ত হইলেই অতিসত্বর ইয়র্কসায়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এই সংবাদ আমি কথোপকথনচ্ছলে বলিবামাত্র, পাপিষ্ঠের চক্ষুদ্বয় যেন নারকীয় জ্যোতিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। হায় স্যাণ্ডফোর্ড! তোমার সমগ্র ধূর্ত্ততা লইয়াও আজ তুমি অন্ধ, নির্ব্বোধ! তুমি কিরূপে বুঝিবে যে, যে ব্যক্তি তোমার চাতুরীতে আজ হৃতসর্ব্বস্ব, সে তোমার প্রদত্ত ভীষণ শিক্ষা কিছুতেই এত শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারে না।

বিপদ দ্রুতগতিতে আবির্ভূত হইল। তার পরদিবসেই মিঃ মার্টনের সম্পত্তি বন্ধক দিয়া টাকা পাইবার কথা ছিল। আমিও সেইদিনই আমার কাল্পনিক প্রভূত অর্থ পাইব বলিয়া প্রকাশ করিলাম। এ দিকে বিগত কয়েক দিবস নূতন খেলায় মিঃ মার্টন কয়েকবার জয়লাভ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন, এবং স্যাণ্ডফোর্ড কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্তে যে সকল খত ও হুণ্ডি প্রভৃতি দিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সেই সকলের বিনিময়ে নগদ টাকা পণ ধরিয়া খেলিতেও ব্যগ্র হইলেন। বিপক্ষ দল প্রথমতঃ বাহ্যিক প্রতিবাদ করিল—কিন্তু এই অনুগ্রহের জন্য মিঃ মার্টনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে এবং স্যাণ্ডফোর্ডের অনুমোদন ফলে অবশেষে এই প্রস্তাবেই তাহারা স্বীকৃত হইল। মিঃ মার্টন স্যাণ্ডফোর্ডকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে এই শেষবার তাঁহার জয়ের আশা

সুনিশ্চিত। কারণ, গত কয়েক দিবসই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন এবং এইবার জয়লাভ করিয়া আর কখনও তিনি তাস বা পাশায় হাত দিবেন না—তাঁহার সম্পত্তির উদ্ধার হইলেই তিনি বর্ত্তমান গতিবিধিরও পরিবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির বিষয় যখন স্যাণ্ডফোর্ড সেই জুয়ারী-বৃন্দের কর্ণগোচর করিল, তখন তাহারা বিদ্রূপাত্মক যে উল্লাস প্রকাশ করিল, তাহা বোধ হয় মিঃ মার্টনেরও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; কিন্তু চৈতন্যোদয় হইয়াছিল কি?

মার্টন ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে দিনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়াছিলেন, অবশেষে সেই দিন আসিল। আমিও রাত্রির অপেক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম। সে দিন প্রধান আটজন ষড়যন্ত্রীর মাত্র উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল এবং আগন্তুকের মধ্যে মাত্র আমিই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলাম। এই সৌভাগ্যের কারণ আমার নবপ্রাপ্ত সম্পত্তি। চক্রিবৃন্দের বিশ্বাস ছিল, ঐ সম্পত্তিও সত্বরেই তাহাদের কোষভুক্ত হইবে। ইতিমধ্যে আমি মার্টনকে একটি মাত্র ইঙ্গিত দিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যাহাতে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশিত না হয় এইরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে "কল্য খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আপনার স্বাক্ষরিত দলিলাদি এবং অন্যান্য অলঙ্কার ও নগদ টাকা যাহা কিছু আপনি হারিয়াছেন তাহা সমস্তই যেন টেবিলের উপরি সজ্জিত রাখা হয়—দেখিবেন ইহার অন্যথা যেন কিছুতেই না হয়।" প্রত্যুত্তরে তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আমার উপদেশ পালন করিবেন বলিলেন।

অবশেষে আমার সমুদয় বন্দোবস্তই সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইল। রাত্রি বারটার পরে মৃদুস্বরে সঙ্কেতধ্বনি করিয়া আমি সেই বাটীতে প্রবেশ করিলাম। তখন তথায় ক্রোধব্যঞ্জক তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। আমার উপদেশানুসারে, মিঃ মার্টন যে পরিমাণ অর্থ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার সমপরিমাণ অর্থ উপস্থাপন করিতে অত্যন্ত জেদ করিতেছিলেন। এইরূপ জেদের আরও একটি কারণ ছিল,—তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে তিনি নিশ্চয়ই আজ জয়লাভ করিয়া তাঁহার জিত সমুদয় অর্থ—এমন কি কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত—বুঝিয়া লইবেন। যদিও তাঁহার প্রদত্ত খত, হুণ্ডি, ভগিনীর অলঙ্কার ও অকৃত্রিম নোট প্রভৃতি বহু অর্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তথাপি সমগ্র লুণ্ঠিত ধন আনীত হইয়াছিল না—বহু টাকারই অভাব রহিয়া গেল। স্যাণ্ডফোর্ড আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে ওয়াটর্‌স্ আসিয়াছে—এই তোমাদিগকে দুই এক ঘণ্টার জন্য

টাকাটা ধার স্বরূপ দিতে পারিবে।" এই বলিয়া আমার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কাণে কাণে বলিল, "শুধু একবার দেখাইবার জন্য—এখনই ফেরত দেওয়া যাইবে।" আমি ঔদাস্য সহকারে বলিলাম, "না ভাই, তাহা হইবে না—আমি না হারিলে টাকা হাতছাড়া করি না।"

পাষণ্ডের বদনমণ্ডলে দ্বেষপূর্ণ ভ্রূকুটি লক্ষিত হইল, কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। অবশেষে স্থির হইল যে প্রতিপক্ষের একজন এখনই অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ টাকা লইয়া আসিবে। একজন যাইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে একতাড়া নোট লইয়া আসিল—দেখিলাম আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই—এইগুলি জাল বিদেশীয় নোটই বটে। মিঃ মার্টিন নোটগুলি গণনা করিয়া লইলেন। খেলা আরম্ভ হইল।

খেলা অগ্রসর হইতে লাগিল—দেখিলাম, আমার ধ্বংসের রজনীর ঘটনা গুলি সেইরূপই সুস্পষ্টরূপে পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দারুণ উত্তেজনায় আমার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল; ধমনীগুলির দ্রুত কম্পন নিবারণ জন্য আমি বারম্বার জলপান করিতে লাগিলাম। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ জুয়ারীগণ তাহাদের খেলাতেই তন্ময় ছিল, আমার এই উদ্বেগ লক্ষ্য করিল না। মার্টিন ক্রমাগত হারিতে লাগিলেন। দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বাজি চলিতে লাগিল। তাঁহার মস্তিষ্কে যেন আগুণ জ্বলিতেছিল—তিনি অপরিণামদর্শী উন্মাদের ন্যায় খেলিতে-ছিলেন—অথবা হারিতেছিলেন।

স্যাণ্ডফোর্ড তাহার শয়তান মূর্ত্তির উপর মার্টনের সম্মুখে ভব্যতার যে মুখোস ব্যবহার করিত, তাহা আজ ক্রমশঃ অপসৃত হইতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডলে একটা ভীষণ দানবীয় ভাব প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে সহসা নিম্নতলে একটা শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "শোন ত, ওটা কিসের শব্দ? নীচে একটা কিসের যেন আওয়াজ হইল, তোমরা কেহ শুনিলে কি?"

আমার কর্ণেও শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহার কারণও আমি বিশেষ রূপেই জানিতাম। শব্দটি থামিয়া গেল। স্যাণ্ডফোর্ড পুনরায় বলিল, "এভলক! সঙ্কেত ঘণ্টা বাজাও।" এদিকে খেলা ত বন্ধ হইয়াই গেল—উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত দুরাত্মাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও যেন বন্ধ হইয়া রহিল! ইতিমধ্যে উত্তর আসিল—ঘণ্টায় আওয়াজ হইল—এক, দুই, তিন। স্যাণ্ডফোর্ড উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সবই নিরাপদ! আচ্ছা চলুক—খেলা চলুক! এই প্রহসনের শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই!"

ইতিপূর্ব্বেই আমি, পুলিশের দুইজন কর্ম্মচারীকে সাধারণ পরিচ্ছদে সদরদ্বারে উপস্থিত থাকিয়া, আমি যে সাঙ্কেতিক শব্দ বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা ব্যবহার পূর্ব্বক বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রক্ষকের মুখ ও হস্তপদাদি আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। সাঙ্কেতিক ঘণ্টা শুনিলে তাহার প্রত্যুত্তরের সঙ্কেতও শিখাইয়া দিয়াছিলাম। তারপর অন্যান্য সঙ্গীদের বাটীতে প্রবেশ করাইয়া নিঃশব্দে সোপান-পথে দ্বিতলে আরোহণ করিয়া বহির্কক্ষে অপেক্ষা করিবে এবং আমার আদেশ পাইবামাত্র ক্রীড়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া জুয়ারীদিগকে অবিলম্বে বন্দী করিবে, এই উপদেশও পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম। পশ্চাতের দ্বারও প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছিল।

কিন্তু আমার একটি সংশয় হইতেছিল। যদি পাপিষ্ঠেরা পূর্ব্বেই কোন প্রকার সন্ধান পাইয়া আলো নিবাইয়া জাল নোটগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং আমার অজ্ঞাত অন্য কোন গুপ্ত পথে পলায়ন করে, তবে কি করা যাইবে? এই চিন্তায় আমি কিয়ৎকাল অন্যমনস্ক ছিলাম—কিন্তু খেলা পুনরায় আরম্ভ হইবা-মাত্র আমি এই চিন্তা পরিহার করিয়া প্রথমেই আমার পিস্তল মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন ব্যবহার করিতে পারি এইরূপ ভাবে পকেটে রাখিলাম। যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ভীষণ লোকের সহিত আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা আমি বেশ জানিতাম, সুতরাং পূর্ব্বেই তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং অন্যমনস্ক ভাবে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া দরজাটি একটু খুলিয়া মস্তক বাহির করিলাম,—যেন সেই শব্দটির কারণ অনুসন্ধান করাই আমার উদ্দেশ্য। দেখিলাম, পুলিশ-কর্ম্মচারীতে সিঁড়ি ঘরটি পরিপূর্ণ—সকলেই নীরব, মৃতের ন্যায় নিশ্চল! দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত হইল। আমি ফিরিয়া মার্টনের টেবিলের নিকট আসিলাম। তখন শেষ বাজী খেলা হইতেছিল—বহু টাকার বাজী—অবশেষে মার্টন পরাজিত হইলেন। তিনি অমনই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন—তাঁহার বদনমণ্ডল শবের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, নৈরাশ্যমণ্ডিত ও ঘোর বিষাদক্লিষ্ট। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক ভগ্নকণ্ঠে তিনি অভিসম্পাত প্রদান করিতে লাগিলেন। আর এদিকে স্যাণ্ডফোর্ড ও তাহার পাপ সঙ্গিগণ একত্রিত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার গম্ভীরভাবে সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের আকৃতিতে দানবীয় উৎফুল্লতা বিকাশিত হইতেছিল।

সহসা আকস্মিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া মার্টন স্যাণ্ডফোর্ডের গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! বিশ্বাসঘাতক! নরাধম! তুই—পিশাচ! আমার

সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। আমাকে ধ্বংস করিয়াছিস্!" স্যাণ্ডফোর্ড তাঁহার হস্ত অপসৃত করিয়া উদ্বেগশূন্য ভাবে উত্তর করিল, "ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই—এবং আমার বোধ হয় কার্য্যটি বেশ কৌশল সহকারেই সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। শিশুর মত রোদনে, প্রিয়তম! কোন ফলই হইবে না!" ক্রোধে ও অব্যক্ত যাতনায় অধীর হইয়া মার্টন পরিহাস-পরায়ণ দুরাত্মার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

একতাড়া জালনোট হাতে লইয়া আমি তখন দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "ফার্ডন, একটুকু ধীরে—ধীরে! আমার বোধ হয় না যে মার্টন সমমূল্যের বাজী লইয়া খেলিয়াছেন—কারণ এই নোটগুলি যে কৃত্রিম তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

স্যাণ্ডফোর্ড গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কুকুর! তোর্ জীবনটাকে এমনি সস্তা মনে করিস্!" এই বলিয়া নোটগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য সে ছুটিয়া আসিল। আমিও সমান ক্ষিপ্রতায় আমার পিস্তলের নল তাহার দিকে লক্ষ্য করিলাম—তাহার গতি সংক্ষুব্ধ হইল! আমাদের চতুর্দ্দিকে সমগ্র দল আসিয়া দাঁড়াইল—ক্রোধে সকলেই উত্তেজিত। মার্টন অব্যবস্থিত চিত্তে একবার ইহার মুখের দিকে, আর একবার উহার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া স্যাণ্ডফোর্ড কহিল, "উহার নিকট হইতে জোর করিয়া নোটগুলি কাড়িয়া লও! ধর! ছোরা মার! গলা চাপিয়া মার!" আমিও তেমনিই উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, "ধূর্ত্ত! নিজের দিকেই লক্ষ্য কর্—তোদের কাল পূর্ণ হইয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ! গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমাদের কার্য্য কর!"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিশে কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল—এই আকস্মিক বিপৎপাতে দুরাত্মারা এরূপ ভীত, বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল যে উহারা সশস্ত্র থাকিয়াও কোন বাধা দিতে পারিল না—গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে নীত হইল।

এক ডজন বিভিন্নরূপ ওরফে-যুক্ত স্যাণ্ডফোর্ড বা ফার্ডন প্রধান ষড়যন্ত্রী বলিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল এবং অবশিষ্ট আসামীদিগের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নানাপ্রকার দণ্ড হইল। আমার কার্য্যও পূর্ণ সফলতার সহিত নিষ্পন্ন হইল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ আমার কর্ম্মকুশলতায় প্রীত হইয়া আমাকে পদোন্নতির জন্য প্রশংসাপত্র দিলেন এবং তাহার ফলে

বর্ত্তমানে আমি অন্য এক বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। মিঃ মার্টিন অপহৃত সমুদয় ধন সম্পত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলে জীবনে জুয়ার আড্ডার চতুঃসীমাতেও আর কখনও তিনি পদার্পণ করেন নাই। মার্টিন ও তাঁহার মাননীয়া জননী আমার কার্য্যের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে রিক্ত হস্তে বিদায় লইতেও দেন নাই!

শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

সতী-সাধ।

বিত্ত-বিভব রূপের গৌরব তুচ্ছ সে যে সতীর কাছে;
বিশ্বভরা যত কিছু পড়ে রয় সব পতির পাছে।
অন্ধ, আতুর, নিঃস্ব পতি,
তাতেও ক্ষুণ্ণ নয় গো সতী—
এ পতিরই চরণ পূ'জে হর্ষে সতীর বক্ষ নাচে;
বিত্ত-বিভব উচ্চ আসন তুচ্ছ সে যে সতীর কাছে।

অশ্বপতির অন্তবিহীন সাধনার ফল একটি মেয়ে;
সেও কিনা দরিদ্র এক তাপসকেই বর্‌ল যেয়ে,
অল্প আয়ু জেনেও তাঁর,
তবুও সতী ফির্‌ল না আর;—
ধন্য সতী পুণ্যবতী তোমার মত কে আর আছে;
বিত্ত-বিভব উচ্চ আসন তুচ্ছ সে যে সতীর কাছে।

বিশ্বামিত্রের "বিশ্বগ্রাসী" সত্য-বন্ধে 'হরিশ্‌' রাজ
বাহিরিল রাজ্য ছাড়ি লয়ে দীন দুঃখীর সাজ।
চায়নি তখন শৈব্যা সতী
ছেড়ে থাক্‌তে পরাণ পতি,—
আপনাকে সে বিক্রী কর্‌ল অমঙ্গল হয় পতির পাছে;
বিত্ত-বিভব সবি তুচ্ছ সতীর প্রিয় পতির কাছে।

শনির কোপে শ্রীবৎসরাজ রাজ্য ছাড়ি চল্‌ল বনে,—
কষ্ট হবে জেনেও চিন্তা ছাড়্‌ল নাক' স্বামী ধনে,—
রাণীর মত এ রাজ্যে আর
থাক্‌তে ইচ্ছা হলো না তাঁর;—
তুচ্ছ করি রাজ্য রত্ন ছুট্‌ল সতী প্রভুর পাছে;
বিত্ত-বিভব সবি তুচ্ছ সতীর পতি প্রেমের কাছে।

বাহককন্যা ভদ্রাবতী লইল মালীর ভাগিনে বরি ;
স্বয়ংবরের সভায় সবে উঠ্‌ল বিদ্রূপ হাস্য করি !
রাগের ভরে বাহক রাজা
দিল তাঁরে কতই সাজা,
নীরব হয়ে সইল সতী, গেল হর্ষে পতির কাছে ;
বিত্ত-বিভব উচ্চ-আসন তুচ্ছ সে যে সতীর কাছে।

পদ্মিনীকে পাবার লাগি আলাউদ্দিন করল এত ;
রাজার সেরা দিল্লীশ্বর—পড়্‌ল না তাঁর কথায় সে ত।
(শেষে) অগ্নিকুণ্ডে পড়্‌ল গিয়ে
সখী সকল সঙ্গে নিয়ে ;—
অগ্নিদাহ— তুচ্ছ তাও সতীর পতি প্রেমের কাছে ;
বিত্ত-বিভব বলের গর্ব্ব তুচ্ছ সে যে সতীর কাছে।

কুমার শ্রীরোহিণী কুমার দাস।

স্বামী ও স্ত্রী।

(১)

"বটে ! তুমি না ব'ল্‌তে বিয়ে ক'রে সুখে থাকৃতে হ'লে খাঁটি বাঙ্গালী বউই ভাল ?"

"ব'ল্‌তুম কিহে ? এখনও ত তাই বলি।"

"কদিন আর ব'ল্‌বে ?"

"বরাবরই ব'লব ! ব'লব না কেন ?"

"মিস্ শান্তা রায় এসে যে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিই হবেন, শ্রীমতী শান্তা দেবী ত হবেন না ?"

"আমি যদি নীরদ চাটুয্যে থাকি, তিনি শান্তা দেবীই হবেন।"

বন্ধু ভূপতি উত্তর করিল, "যেহেতু তিনি মিস্ শান্তা রায়, তোমাকেই বরং একেবারে মিষ্টার এন্ চ্যাটার্জ্জি হ'তে হবে।"

নীরদ উত্তর করিল, "স্ত্রীই স্বামীর ঘরে আসে, স্বামী স্ত্রীর ঘরে যায় না।"

"স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসে, তা ঠিক। তবে স্বামীকে স্ত্রীর যোগ্য ক'রেই ঘরটা তৈরী ক'রে নিতে হয়।"

"না, স্ত্রীরই আপনাকে স্বামীর ঘরের যোগ্য ক'রে নিতে হয়।"

"যদি সে তা না পারে? সেকালে ছিল, সবাই মোটামুটি এক রকম চালেই থাকৃত। আবার ছোট্ট মেয়েটি বউ হ'য়ে আস্‌ত, তফাৎ কিছু থাকলেও এমন আস্‌ত যেত না কিছু। বউ শ্বশুর বাড়ীর মত হ'য়েই গ'ড়ে উঠ্‌ত। তুমি যে বাপের ঘরেই আলাদা এক ধাঁচে একেবারে গড়া বড় একটি মেয়েকে ঘরে আন্‌তে যাচ্ছ। অবশ্য তোমার ঘর এখনও হয় নি—"

"ঘর এখনও হয় নি! বল কি ভূপতি? ঘর যে রয়েছেই। নইলে কোথায় তবে খেয়ে প'রে এত বড় হলুম?"

"সে ত তোমার বাপের ঘর।"

"বাপের ঘরই ত আমার ঘর! ছেলের কি আর বাপকে ছেড়ে আলাদা ঘর হয়?"

ভূপতি কহিল, "হ'ত না, এখন হ'চ্চে,—হওয়াটা দরকারও হ'য়ে পড়েছে।"

নীরদ তার গড়গড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়া এক গাল ধোঁয়া বাহির করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কিসে?"

"কিসে—তা বিয়েটা হ'ক্‌, তখনই দেখ্‌তে পাবে।"

নলটা ভূপতির হাতে দিয়া নীরদ উত্তর করিল, "তুমি ত এই ব'ল্‌তে চাও যে, আগে সবাই মোটামুটি এক রকম ধরণেই থাকৃত—আবার ছোট ছোট মেয়েরা বউ হ'য়ে আস্‌ত—কাজেই যে ঘরের যেমন মেয়েই হ'ক্‌, স্ত্রীকে স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে চ'ল্‌তে কিছু ঠেকত না। এখন নানারকম চাল হয়েছে,—কেউ সাহেব, কেউ বাঙ্গালী, কেউ বা আধাসাহেব আধাবাঙ্গালী,—আবার মেয়েরাও বড়সড় হয়, বাপের ঘরের চালটা তার এমনই অভ্যাস হ'য়ে পড়ে, যে ভিন্ন ধরণের ঘরে গেলে সে আর আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে না।"

"হাঁ! তা হ'লেই স্বীকার ক'ত্তে হবে যে ছেলে যদি এমন ঘরের মেয়ে বিয়ে করে, যার চাল তার বাপের ঘরের চাল থেকে আলাদা, তাহলেই তাকে বাপের ঘর ছেড়ে নূতনতর আলাদা এমন ঘর ক'রে নিতে হবে, যাতে তার স্ত্রী এসে বেশ চ'লতে পারে!"

নীরদ কহিল, "হুঁ!—যেহেতু আমার বাপের ঘর সেকেলে চালের বনেদী গৃহস্থের ঘর, আর যেহেতু আমি নব্য সাহেবী চালের ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'ত্তে যাচ্চি—সুতরাং আমাকে বাপের ঘর একদম ছেড়ে নতুন সাহেবী চালের ঘর গুছিয়ে নিতে হবে, কেমন?"

"হবে নাকি ?"

নীরদ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "আচ্ছা,—অবস্থাটা ঠিক উল্টো ক'রে একবার ধর। ধর—আজ যদি আমি সাহেবী ঘরের সাহেবী ছেলে হ'তুম,—আর একেবারে সেকেলে এক গেঁয়ে বামুনপণ্ডিতের ঘরের এক নেহাৎ গেঁয়ে মেয়েকে পছন্দ ক'রে বিয়ে ক'ত্তুম—আমরা কুলীন, কুলীনের ঘরে খুব ধেড়ে ধেড়ে বুড়ো মেয়েও থাকে—তা হ'লে কি এসে ব'ল্‌তে, নীরদ, তুমি এখন টিকি রাখ, নামাবলি পর, ঘরের চেয়ার টেবিল সব বেচে ফেল, আর মাদুরে ব'সে পুঁথি পড়।"

"তা—তা——"

"তা—তা আবার কি হে ? বল—এমন অবস্থাতে তাই করাই আমার পক্ষে ঠিক হ'ত।"

"বাঃ! সে হ'ল এক রকম——"

"এক রকম! এক রকম কেন হবে ? সেও দুই রকম, এও দুই রকম। তফাৎ আর কিছুই নেই, কেবল স্বামীর আর স্ত্রীর বাপের ঘরের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। স্বামীকে যদি স্ত্রীর সুবিধের খাতিরে স্ত্রীর বাপের চালেই ঘর ক'ত্তে হয়,—এতেও ক'ত্তে হবে, ওতেও ক'ত্তে হবে।"

"যাও! কি ব'লছ নীরু! যত ঠকামো তর্ক! কেবল কি চাল বদলান নিয়েই কথা ? এগোন পেছোন কিছু নেই ? জীবনযাত্রার ধরণে লোকে ক্রমে এগোয়, এগোতেই চায়। এগিয়ে কেউ পেছোতে পাবে না। উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনে উঠে কেউ আর সেই সেকেলে——"

"বর্ব্বরোচিত বুনো চালে নেমে আস্‌তে পারে না। কেমন ?"

"অত বড় একটা কড়া কথা—ব'লতে পারি না নীরু। তবে——"

"ওর তবে টবে আর কিছু নেই, ভূপু। ওই কথাই ব'ল্‌তে হবে, না হয় ব'লবার কিছুই নেই।"

ভূপতি কহিল, "যাই বল নীরু! মিষ্টার জে রায়ের মেয়ে মিস্ শান্তা রায়—তিনি যে গিয়ে তোমাদের সেই সেকেলে ঘরের গেরস্ত বউটি হবেন, এ হ'তেই পারে না।"

"কেন পারে না ?"

"বল কি! এক ত বড় লোক——"

নীরদ বাধা দিয়া কহিল, "আমার বড়দা যাঁর মেয়ে বিয়ে ক'রেছেন,

তিনি অনেক বেশী বড়লোক—মস্ত জমিদার—অমন পাঁচ সাতটা ব্যারিষ্টার জে রায়কে তিনি কিনতে পারেন। সেজদাও বিয়ে ক'রেছেন হাইকোর্টের বড় এক উকিলের মেয়ে—তাঁর আয়ও জে রায়ের আয়ের চাইতে কম নয়,—এঁরা ত আমাদের ঘরে ঘরের বউ হ'য়ে বেশ আছেন!"

"কি তুলনা ক'চ্ছ নীরু? মিস্ রায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলা——"

নীরদ হাসিয়া উত্তর করিল, "তা তাঁর শিক্ষার উচ্চতা কি আমার চেয়েও উপরে উঠেছে ভূপু? আমাদের গেঁয়ে গেরস্তালীর ঘরে যদি আমার চলে, আমার স্ত্রীর কি চ'লবে না?"

ভূপতি কহিল, "কেবল শিক্ষা নিয়েই ত কথা হ'চ্চে না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাপের ঘরে যে উন্নত পরিমার্জ্জিত জীবনে তিনি অভ্যস্ত হ'য়েছেন, তোমাদের গেরস্ত ঘরের বউগিরি তার সঙ্গে খাপ খাবে না। বড়লোকের মেয়ে হ'লেও তোমার বউদিরা বাপের ঘরে সেকেলে দেশী ভাবেই প্রতিপালিত হ'য়েছেন।"

নীরদ আবার নল টানিয়া গালভরা ধোঁয়া বাহির করিয়া কহিল, "গড়গড়ার যে তামাক খাচ্চি ভূপু—তুমিও খাচ্চো—এই চাইতে চুরুট কি সিগারেট টানা—সেটা কি বেশী ভাল ব'লতে চাও?

"সে যার যেমন রুচি,—মন্দ কি ব'লতে পার?"

"সেও যার যেমন রুচি। আমার রুচিতে আমার গড়গড়ার তামাক যেমন—আমাদের দেশী গেরস্তালীও তেমন মিঠে লাগে।"

"তোমার লাগে ব'লে কি সবারই লাগ্‌বে?"

"সবারই লাগ্‌বে তা কে ব'ল্‌ছে? সবার ত লাগেই না,—লাগ্‌ত যদি, সবাই দেশী গেরস্ত হ'ত,—এসব কচ্‌কচির কিছু দরকার হ'ত না। তবে কারও কারও লাগে ব'লে তাই-ই যে উন্নত রুচি—উন্নত অবস্থার পরিচায়ক, একথা স্বীকার ক'ত্তে বাধ্য নই।"

"তবে কি ব'ল্‌বে অবনত রুচি অবনত অবস্থারই পরিচায়ক?"

"তাও ব'লতে চাইনে।"

"তবে কি ব'লতে চাও?"

"কোন্‌টা উন্নত কোন্‌টা অবনত—এ নিয়ে কোনও তুলনাই আদবে ক'ত্তে চাইনে। সাহেবদের গেরস্তালী সাহেবদের ভাল; আমাদের গেরস্তালী আমাদের ভাল। সাহেবরাও ভাল ব'লে বাঙ্গালী হয় না, আমরাই বা ভাল ব'লে সাহেব হব কেন?"

ভূপতি কহিল, "তোমার ও 'কেন' আর চ'লছে কইহে? ঢের লোক যে হ'চ্চে।"

"হক্‌—যার যেমন অভিরুচি। তাই ব'লে তা ভাল কেন ব'ল্‌ব?"

"ভাল না ব'ল্‌তে পার, তোমার যেমন অভিরুচি। তবে সেই সাহেবী ঘরের মেয়ে যখন বিয়ে ক'চ্ছ, মন্দ আজ যতই বল, সে চাল তোমাকে নিতেই হবে।"

নীরদ ধীরে ধীরে নল টানিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "আমি ত ঘরজামাই হবনা ভূপু, বিয়ে করে বউ ঘরে আন্‌ব। আমি পুরুষ, আমার ঘর, স্ত্রী আমার স্ত্রী হ'য়েই সেই ঘরে এসে থাক্‌বে,—আমাকে যে তার বাপের ঘরের মত ক'রে ভেঙ্গে আবার নূতন ঘর গড়তে হবে, এমন অসম্ভব কথা হ'তে পারে না।"

ভূপতি উত্তর করিল, "বাপের ঘরে এত বড় তিনি হ'য়েছেন, সেই ঘরের মত একটা রুচিও তাঁর জন্মে গেছে! তোমার রুচিতে যদি তিনি আপনাকে নামাতে না পারেন?"

"নামাতে হবে কি ওঠাতে হবে, সেটা তর্কের বিষয়। তা, যাই হ'ক্‌, নাই যদি পারেন, তাঁর রুচি মতই তিনি থাক্‌বেন। আমার এই ঘরেই তার জন্য সেই রকম ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে। তাই ব'লে আমি কেন আমাকে বদ্‌লাব? সারাটা ঘর কেন তাঁর রুচির মত ক'রে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গ'ড়ব?"

"সেটা কেমন হবে হে?"

"অগত্যা এই-ই ক'ত্তে হবে, আর উপায় কি? তিনি যদি ঠিক আমার সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণী হ'তে না পারেন, ঘরের একটা সুন্দর সকের আসবাবের মতই সাজান থাক্‌বেন। সে আস্‌বাব রাখ্‌তে পারি, এমন সামর্থ্য আমার আছে।"

"তার চাইতে বিয়ে না ক'ল্লেই ভাল হয় না?"

"ক'ল্লেই বা এমন মন্দ কি হবে?"

"দুজনের দুরকমা মত—দুরকম ধরণ,—বিয়েট—বিয়ের পর সংসারটা—কি রকম হবে?"

"একরকম মত, এক রকম ধরণ, স্বামী স্ত্রীর কি সর্ব্বত্রই থাকে? এদেশেও নেই, সাহেবদের দেশেও নেই, কোথাও নেই। বুদ্ধি থাক্‌লে, আর ভালমানুষ হ'লে, ওতেই বেশ দুজনে বনিয়ে থাকতে পারে,—বিশেষ যদি পরস্পরের উপর স্নেহ কিছু থাকে।"

"যাই বল নীরু—কেউ তোমরা সুখী হবে না।"

"আমি অসুখী হব না। তিনিও অসুখী না হন, তার জন্যেও যত্নের ত্রুটি কিছু হবে না। তবে তাঁর সুখের জন্য যদি এটা দরকার হয় যে তাঁর স্বামী না হ'য়ে একেবারে আমাকে তাঁর খেয়ালের গোলাম হতে হবে, তবে নাচার। আর এমন স্ত্রীকে তোমাদের সেই সমুন্নত সাহেবী সমাজেও কোনও স্বামী সুখী ক'ত্তে পারেন না।"

ভূপতি একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি ভাব্‌ছি—আদর্শে এত তফাৎ জেনেও কেন তুমিও মিস্ রায়কে বিয়ে ক'ত্তে যাচ্চ?"

নীরদ উত্তর করিল, "কেন যে যাবনা তাও ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না। মিষ্টার রায় সম্বন্ধ উপস্থিত ক'ল্লেন, বাবা—দাদারা—সবাই ব'ল্লেন হক, আমিও দেখ্‌লুম, মেয়েটি বেশ, মনেও ধর্‌ল, কাজেই নিতে যাচ্চি। তাঁরা দিতে এলেন, আমারও মনে ধরল,—নেব নাই বা কি ব'লে? না নিয়ে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াই বরং এ ক্ষেত্রে কাপুরুষতা!"

ভূপতি কহিল, "তুমি বিলেত থেকে এসেছ, বড় ডাক্তার হ'য়ে বেশ দু'পয়সা পাচ্চ,—তাঁরা স্বভাবতঃই মনে ক'রেছেন, তাঁহাদের মেয়েকে তার যোগ্য অবস্থাতেই রাখ্‌তে পারবে, রাখবেও। তা না ক'ল্লে এ সম্বন্ধ তাঁরা উপস্থিত বোধ হয় ক'ত্তেন না।"

নীরদ উত্তর করিল, "তাঁদের সে মেয়ে যদি, তাঁর সে যোগ্য অবস্থায় থাক্‌তে চান্‌ই, তবে আমি যে রাখবনা কি রাখ্‌তে পার্‌ব না, এটা ত আমি ব'ল্‌ছিনি ভূপু! তিনি যদি বিলিতী ডলিপুতুল হ'য়ে থাক্‌তে চান, তাই থাকবেন। তাই ব'লে আমাকেও যে সঙ্গে সঙ্গে জোড়ামেলান আর একটা ডলিপুতুল হ'তেই হবে, এমন কোনও কথা ত হ'তে পারে না।"

ভূপতি একটু ভাবিয়া কহিল, "যাই বল নীরু, কাজটা ভাল ক'চ্চ না। শেষে হয়ত পস্তাবে। এখনও সময় আছে,—বিয়ে না হ'লেই ভাল হয়। বিশ্রী একটা বেখাপ্পা ব্যাপার হ'বে। কেন এ ক'ত্তে গেলে?"

নীরদ উত্তর করিল, "কেন ক'ত্তে গেলুম, তার এক কারণ, মেয়েটিকে বেশ লাগ্‌ল। দ্বিতীয় কারণ, অমন বাঞ্ছিত জিনিশ তাঁরা দিতে এলেন, ফেরাব কেন? তৃতীয় কারণ, স্ত্রীকে সামলাতে পারব না এই ভয়ে ফেরা পুরুষের পক্ষে নিতান্ত কাপুরুষতা! বেখাপ্পার কথা ব'লছ? ভরসা করি বেখাপ্পা হবে না। তাকে আমার ঘরের গৃহিণীই ক'রে নিতে পারব। নিতান্তই যদি তা না ঘটে, মানিয়ে এক রকম চ'ল্‌তে পারব।"

"আসল কথা—বল—নেহাৎ প্রেমে প'ড়ে গেছ।"

"তোমাদের ভাষায় তা ব'ল্‌তে পার বটে। ওরে যোদো, আর এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যারে।"

ভূপতি উঠিয়া কহিল, "খাও, তুমি তবে তামাকই খাও। ও একটু আধটু টান্‌লেও আমরা চুরুটখোরই বটে। উঠি এখন। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। ক্লাবে একবার যাব।"

নীরদ হাসিয়া কহিল, "এসগে। আমি দেখি যদি একবার কালীবাড়ীতে প্রণাম ক'রে আস্‌তে পারি।"

(২)

নীরদ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত গিয়াছিল। সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, উচ্চ উপাধি পাইল, তারপর সেখানকারই কোনও বড় হাঁসপাতালে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল কাজ করিল। কাজেও সে বিশেষ যশস্বী হইল। তখন দেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনভাবে সে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিল। তাহার খ্যাতি আগেই দেশে আসিয়াছিল,—সুতরাং অল্পদিনেই তার বেশ পসার হইল। এরূপ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে উচ্চপদস্থ সকলেই যে নিতান্ত আগ্রহশীল হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। মিষ্টার জে রায়ের কন্যা শান্তাকে নীরদ কোনও বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছিল। শান্তাকে দেখিয়া, তার সঙ্গীত শুনিয়া, সামান্য যে আলাপ হয়, তাহাতে তার কথাবার্ত্তায়ও—নীরদ বিশেষ প্রীত হইল। জে রায় বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শান্তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে নীরদকে আহ্বান করিলেন। নীরদ জানাইল, বিবাহের পূর্ব্বে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়ের কোনও আবশ্যকতা নাই। মিষ্টার রায় তাহার পিতার নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতে পারেন। পিতা ও ভ্রাতারা সম্মত হইলে বিবাহে তার নিজের আনন্দ বই আপত্তি হইবে না। পিতার নিকটে সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল,—নীরদের ইচ্ছা আছে জানিয়া পিতা এবং ভ্রাতারা প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ এবং দ্বিরাগমনের পর শান্তা আর শ্বশুরগৃহে যায় নাই। স্বামীর সঙ্গে কলিকাতাতেই আছে। পিতৃগৃহে যেরূপ জীবনে শান্তা অভ্যস্তা ছিল, যতদূর সম্ভব নীরদ নিজের গৃহেও শান্তার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া দিল। বাঙ্গালী বধূ এবং বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহিণীরূপে শান্তার কি ভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধে নীরদ শান্তাকে কখনও কোনও উপদেশ দিবার প্রয়াস

পায় নাই,—শান্তা কি ভাবে চলিলে তার মনোমত হয়, ইঙ্গিতেও শান্তাকে সে তাহা কখনও বুঝিতে দেয় নাই। ধর্ম্ম, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে নিজের কি মত সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও সে শান্তার সঙ্গে করিত না। নিজের ধরণেই নিজে সে নিজের ভাবে চলিত,—শান্তার সন্তুষ্টির জন্য কিছুতেই সে তাহা সঙ্কুচিত করিত না। শান্তাও অবাধে আপনার মতেই চলিতে পাইত,—স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য আপনাকে কিছুতে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, সেও এরূপ কখনও অনুভব করিবার অবসর পাইত না। স্বামীর চালচলনেও শান্তার কোনও রূপ বিরাগের ভাব কখনও দেখা যায় নাই। স্বামীর সাধারণ ব্যবহারে সর্ব্বদাই সে এমন একটা সরল নির্ভীক্ নিঃসঙ্কোচ তেজস্বিতা এবং তার মধ্যেও তার প্রতি নিয়ত এমন মধুর স্নেহময় ভাব সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাহাতে স্বামীর প্রতি কিছুতে বিরাগ দূরে থাক, একটা বড় শ্রদ্ধাতেই তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন স্বামীর আশ্রিতা ও নিতান্ত স্নেহের পাত্রী হইয়া শান্তা আপনাকে যারপরনাই ভাগ্যবতী বলিয়াই মনে করিত। নারী চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতা এবং স্নেহ-নির্ভরতা যে নারীতে বিলুপ্ত হয় নাই, পুরুষোচিত উদ্দাম স্বাতন্ত্র্য যার কামনীয় হয় নাই, আশ্রয়ীভূত পৌরুষের প্রতি সে নারীর চিত্তে এরূপ প্রবল শ্রদ্ধার বিকাশ না হইয়াই পারে না। জীবনের ধরণে বাহ্যতঃ একটা মিল না হইলেও, বিবাহের প্রথম বৎসর নবদম্পতির বেশ সুখেই কাটিল। ভূপতি মধ্যে মধ্যে আসিত। সে দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিতই হইল। মুখে যাই বলুক, মনে মনে নীরদকে অশেষ প্রশংসাই করিল।

প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল, পূজা নিকটে আসিল। সেদিন দিনটা ভাল ছিল না, অল্প অল্প বৃষ্টির সঙ্গে বড় ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। বাহিরের কাজ সকালেই আজ শেষ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর নীরদ নিজের বসিবার ঘরটিতে একটি বেতের আরাম কেদারায় গা ছাড়িয়া দিয়া নিমীলিত নেত্রে ধীরে ধীরে আলবোলার নলটি টানিয়া তামাকুধূম্রে ক্লান্তি দূর করিতেছিল। পাশেই শান্তার পৃথক বসিবার ঘর, শান্তা সেখানে পিয়ানো বাজাইয়া গান করিতে-ছিল। শান্তা বড় মধুর গায়িত,—নীরদ ধীরে ধীরে আলবোলার নলটানিতেছিল, আর মুগ্ধচিত্তে শান্তার সেই সঙ্গীত শুনিতেছিল। সঙ্গীত হইল,—শান্তা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া নীরদের গৃহে প্রবেশ করিল।

নলটি হাতে লইয়া বড় মধুর অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরদ কহিল,—"কি শান্তা?"

শান্তা উত্তর করিল, "ভিতরে এস না? কেউ ত আর নেই! একলা কেন ওখানে ব'সে আছ?"

"এখানে যে আমার দুটো আরামই এক সঙ্গে চ'ল্‌ছে শান্তা! তোমার গান শুন্‌ছি, আবার তামাকও খা'চ্চি।"

"তা ভিতরে কি তা চ'ল্‌তে পারে না।"

"একটা পারে,—কিন্তু আর একটা পারে কি? ভিতরে যে তোমার মন্দির, সেখানে আমার এ গড়গড়া গড়গড় ডাকে তার ধোঁয়া ছাড়্‌তে পারে কি?"

শান্তা হাসিয়া কহিল, "নেও, আর ঠাট্টা ক'রোনা—আমি কি বারণ ক'রেছি? তুমি ভিতরে এসেও দুটি আরামই ভোগ ক'ত্তে পার।"

"অনুমতি হ'লে পারি বই কি? তা হ'লে ত বাঁচি!"

"এর জন্যে আবার অনুমতির অপেক্ষা কি? তামাক খেয়ে আরাম পাও, খাবে। আমি ও ঘরটাতে একটু বসিটসি ব'লে তায় বাধা কি?"

"ওখানে—নিদেন সিগারেটটা চুরুটটা চ'ল্‌তে পারে! গড়গড়াটা পর্য্যন্ত চ'ল্‌বে কি?"

শান্তা হাসিয়া কহিল, "ধোঁয়াটাই ওর সবচে' খারাপ। তা—তাই যদি বরদাস্ত ক'ত্তে পারি, তবে চুরুট সিগারেটই বা কি? আর গড়গড়াই বা কি? তুমি এস!"

শান্তা অগ্রসর হইয়া গড়গড়া হাতে ধরিয়া তুলিল।

"কি সর্ব্বনাশ! কর কি? কর কি? তুমি———"

"তা কি এমন দোষ হ'য়েছে? এটাও কি হাতে ক'রে নিতে পার্‌ব না? এমন ভারী ত আর নয়?"

নীরদ একটু হাসিল,—কিছু বলিল না। শান্তা সাবধানে গড়গড়াটি তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে একখানি কৌচের পাশে রাখিল। নীরদ পশ্চাতে আসিল।

"ইঃ! বড্ড গরম যে! জানালা দুই একটা খুলে দিই শান্তা?" এই বলিয়া নীরদ গোটা দুই জানালা খুলিয়া ফেলিল।

"বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া যে!"

"ঘরেও ত গরম কম নয়,—তা—তোমার কি অসুবিধে হবে?"

শান্তা কহিল, "আমার আর কি এমন অসুবিধে হবে? তুমি যে একেবারে খালি গায়ে রয়েছ! একটা জামাটামা কিছু গায় দেওনা? অসুখ ক'র্‌বে যে!"

নীরদ হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার! হাঃ হাঃ! একটু ঠাণ্ডা হাওয়া গায় লাগ্‌লেই অসুখ ক'র্‌বে?"

"বল কি? একেবারে খালি গা——এই ঠাণ্ডা হাওয়া—অসুখ ক'র্‌বে না? একটা জামা কেন গায় দেওই না!"

শান্তা তাড়াতাড়ি একটা জামা আনিতে বাহিরের দিকে চলিল, "এই দেখ! পাগ্‌ল আর কি? থাম—থাম শান্তা! জামার দরকার কিছু নেই। এর চাইতে অনেক বেশী ঠাণ্ডা আমার সয়! শীতকালে ছাড়া জামাটামা ঘরে কখনও গায় দিইনে। বেটা ছেলে আমরা—নিতান্ত কোমল অবলার মত শরীরটি নেহাৎ গরমপোষা ক'রে রাখ্‌লে কি আমাদের চলে? রোদ জল ঠাণ্ডা—সবই সওয়াতে হয়। আর কি জান, তেলে জলে বাঙ্গালীর শরীর—তারও ত কসুর কিছু কখনও করিনে।"

শান্তা ফিরিল,—হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ঐ যা ব'ল্লে! যে তেল মাখ তুমি—আর দুবেলা যে নাওয়ার ঘটা! শরীরের চামড়া তোমার ওই এক রকম হ'য়ে গেছে!"

"তাই ত খালি গায়ে খাঁটি বাঙ্গালীর ঠাণ্ডালাগা অসুখ কিছু করে না। করে—যাদের রাতদিন জামায় গা ঢাকা থাকে। তা—তুমি ব'সো। আর একটা গান গাও,—আমি তামাক খাই আর শুনি।"

নীরদ কৌচে হেলিয়া গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া দিল। শান্তা পিয়ানোতে সুর দিয়া বড় সুন্দর একটি গান গায়িল।

"বাঃ! বেড়ে! শান্তা, তোমার এক একটি গান আমার এমন মিঠে লাগে, শান্তা!—আমার কি যে মনে হয়—"

"যাও! তোমার ও সব ঠাট্টার কথা আমি শুন্‌তে পারি নে।" এই বলিয়া শান্তা পিয়ানো বন্ধ করিয়া নীরদের কাছে আসিয়া বসিল। নীরদ নলটি ফেলিয়া শান্তার হাত দুখানি দুহাতে চাপিয়া ধরিল, তার পর তাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদরের বড় আবেগে তার মুখে———"যাও! তুমি ভারী দুষ্টু!—"

শান্তা স্বামীর বাহু বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া গিয়া পাশেই একখানি চেয়ারে বসিল। নীরদ ঈষৎ স্মিত মুখে বড় মধুর আবেগময় দৃষ্টিতে শান্তার মুখপানে চাহিল।

নীরদের সেই দৃষ্টির সম্মুখে শান্তা যেন কেমন সঙ্কুচিত হইতেছিল। যেন

তার চিত্তের গতি অন্য দিকে ফিরাইবার জন্যই সহসা সে কহিল, "কই—আজকে সন্ধ্যের কাগজ আন নি ?"

"ওই যা ! ভুলে গেছি !"

"যাও ! তুমি ভারী দুষ্টু ! দেখ দিকি, এবেলা যুদ্ধের খবরটা কি দেখ্‌তে পেলুম না।"

নীরদ উত্তর করিল, "তা দেখো, সকালের কাগজেই সব দেখো ! দুবেলা আর রোজ কি নতুন খবর থাকবে !"

"তা - কাজেই। ভাল কথা—দাদা বিকেলে এসেছিলেন,—এবার পূজোয় কোথায় যাবে ?"

"পূজোয় বাড়ী যাব, আর কোথায় যাব ?"

শান্তা হাসিয়া উঠিল।

নীরদ উত্তর করিল, "বাঙ্গালীর ছেলে—পূজোয় বাড়ী যাব না—কোথায় তবে যাব শান্তা ?"

"সবাই কি বাড়ী যায় ?"

"যারা যায় না—তারা বাঙ্গালীর ছেলেই নয়। বাঙ্গলা দেশে জন্মেছে—বাঙ্গালীর প্রাণ তাদের নেই !"

"সেই পাড়াগাঁয়ে—সেই জঙ্গল—চারিদিকে কেবল পচা জল—পথে উঠোনে কেবল কাদা—জোঁক পোক কেঁচো ব্যাঙ্‌ মশা—মাগো।"

নীরদ হোহো হাসিয়া উঠিল,—কহিল, "হাঁ, বর্ণনাটা বেড়ে হ'য়েছে শান্ত ! খাসা ! সত্যি—সহরে যারা থাকে, বর্ষার পাড়াগাঁটা তাদের বড় আরামের যায়গা নয়। তা করা যায় আর কি ? বর্ষার বাঙ্গলাই যে ওই ! দেশে থাকতে হ'লে দেশের সুখদুঃখ সবই মাথায় তুলে নিতে হবে !"

"তোমার যেমন কথা ! দেশে থাকতে হ'লে যেন পাড়াগাঁয়েই গিয়ে থাকতে হ'বে। দেশটা যেন কেবলই জঙ্গলে আর জলকাদায় ভরা পাড়াগাঁ।"

"দেশটা শান্ত—তাই বটে ! বাঙ্গলা দেশটা যা—তা ওই পাড়াগাঁয়েই আছে,—সহরে আসেনি।"

"দেশ ছেড়ে তবে সহরে রয়েছ কেন ?"

"কাজ কর্ম্মে যেমন বিদেশে যেতে হয়—তেমনি সহরেও থাকতে হয়। আর সহরে—কটা লোকই বা দেশের থাকে ? দেশের লোক যা, তা ত পাড়াগাঁয়েই আছে,—আছে ; তাই দেশও আছে। তারাই রুধির যোগাচ্ছে, সহরের বাবুরা আর সাহেবরা—তাই বেঁচে আছেন,—কাজ পাচ্ছেন, খাবার পাচ্ছেন।"

"তা হ'ক্ গে! এখন দেশে গিয়ে কাজ নেই!—যেতে হয়—বর্ষা বাদল যাক্—শুকনোর সময় তখন যেও—"

নীরদ উত্তর করিল, "তা—শুকনোর আরামটা ভোগ ক'ত্তে তখন আর একবার যাওয়া যাবে—তার জন্যে আর ভাবনা কি?"

"এখন?"

"এখন ত যেতেই হবে। সবাই যাচ্চে—আর আমি যাব না?"

"সবাই! কি বল্‌ছ? সবাই যে পশ্চিমে—পুরীর ওদিকে সাগরের ধারে—কত ভাল ভাল যায়গায় যাচ্চে।"

"হুঁ—তোমাদের 'সবাই' তাই যাচ্চে বটে। কিন্তু আমার 'সবাই' যারা—তারা সবই পাগল হ'য়ে পূজোয় বাড়ীর পানেই ছুটছে!"

"যাও! তোমার 'সবাই' আর আমার 'সবাই' বুঝি আলাদা?"

"কতকটা———আলাদা বই কি? নইলে আলাদা রকম দেখ্‌ব কেন?"

চটুল চোকে বড় মধুর হাসিয়া নীরদ শান্তার মুখপানে চাহিল। শান্তা মনে মনে কিছু লজ্জিত হইল, কিন্তু স্বামীর মতের কোনও যুক্তিযুক্ততা বিশেষ অনুভব করিতে পারিল না।

নীরদ আবার কহিল, "শোন শান্তা, আমি বাড়ীতে যাবই। না গিয়ে পারব না। তবে তোমার যদি ভাল না লাগে, তুমি নেই গেলে। তুমি বরং তোমার দাদাদের সঙ্গেই বেড়াতে যাও,—তাতে আমার কিছু আপত্তি নাই।"

"তুমিই বা কেন যাবে না?"

"কারণ—বাড়ীতে যাব।"

"বাড়ীতেই বা এখন কেন যাবে? হাঁ, মা বাবা সবাই রয়েছেন—তা ফিরে এস, বর্ষাবাদল যাক্, শীত আসুক্, তখন না হয় তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'র্‌বে।"

নীরদ কহিল, "হাঁ, তাঁদের সঙ্গে দেখা তখনই হ'তে পারে। কিন্তু পূজো ত আর তখন আমার গরজে নূতন ক'রে হবে না। পূজোয় বাড়ী যাব যে পূজোয়।

"পূজোয়! হাঃ হাঃ হাঃ!—কি ব'লছ তুমি? পাগল হ'লে নাকি?"

নীরদ উত্তর করিল, "হিন্দুর ছেলে, বাঙ্গালীর ছেলে—পূজোয় বাড়ীতে যাব, মার পূজো দেখব, মার পায়ে অঞ্জলি দেব—এটা কি একটা বড় পাগলামোর কথা হ'ল শান্ত?"

শান্তা যারপরনাই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। স্বামীর যে একটু 'বাঙ্গালী' 'বাঙ্গালী' বাই আছে—এটা তার তেমন ঠেকে নাই। বাই কত জনের কত রকমই থাকে, স্বামীরও এই একটা আছে। নিজের বাই নিয়েই নিজে থাকেন, তাকে ত তাহাতে বাধ্য কখনও করিতে চান না। কিন্তু পূজায় বাড়ীতে যাইবেন, পূজায় যোগ দিবেন—এ'কি কথা! পূজা টুজা—ওসব সেকেলে বর্ব্বরতা, আধুনিক উন্নত-শিক্ষালোক-বর্জ্জিত সেকেলে লোকেরাই উহা করিয়া থাকে—করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু তার স্বামী—পাশ্চাত্যশিক্ষায় এমন উন্নত, বিলাত প্রত্যাগত, আধুনিক উচ্চ সংস্কারে পরিমার্জ্জিত—তিনি কিনা—ধিক্! দুর্গাপূজায় যোগ দিতে গ্রামে যাইতে উদ্যত! এমন একটা অসম্ভব কথা সে ত স্বপ্নেও কখনও ভাবিতে পারে নাই!

"কি ভাবছ শান্তা? একেবারে অবাক হয়ে যে চেয়ে রইলে?"

"তুমি অবাক্ কল্লে, অবাক্ হয়ে থাকবনা? কি বল্‌ছ? তুমি যাবে পূজো দেখতে—পূজো ক'ত্তে।"

"যাব নাই বা কেন?"

"পূজো টুজো তুমি মান? পূজোয় তোমার শ্রদ্ধা হয়?"

নীরদ কহিল,"খুব মানি; শ্রদ্ধাও খুব হয়। মান্‌ব না কেন? শ্রদ্ধাই বা হবে না কেন?"

"তোমার মত শিক্ষিত লোকের মুখে এই কথা?"

নীরদ হাসিয়া উত্তর করিল,—"একটু নাহয় ইংরেজি লেখাপড়াই শিখেছি, নাহয় ইংরেজদের দেশেই একবার গিয়েছি,—তাই বলে নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে হবে এমন কি কথা আছে?"

"তাই—পূজো টুজো—ওগুলো কেমন যেন একটা বর্ব্বরতা নয়?"

"হাঁ, খ্রীষ্টেন পাদ্রীরা তাই বলে থাকে বটে,—তাদের কথামত সাহেবদের বইতেও অমন দুই একটা কথা পড়া যায়। কিন্তু তা মান্‌ব কেন? তাদের বিজ্ঞান টিজ্ঞানে—হাঁ—আমাদের নূতন শিখবার ঢের আছে। ধর্ম্মও যে তারা আমাদের শেখাতে পারে, এমন মনে করি না।"

শান্তা কহিল, "এর উত্তরে কি ব'লব জানি না।"

"বস্! তবে আর আপত্তির কথা কি আছে?"

"যাই বল, কেমন কেমন যেন লাগে!"

"ঐ টুকুই আমাদের শিক্ষার দোষ, শান্তা। পরের কথাটাই বড় বেশী আমরা মেনে নিই, নিজেদের ঘরের দিকে বড় একটা চাই না।"

"তা—সত্যিই তবে বাড়ীতে যাচ্চ ?"

"হাঁ ! তবে তোমার যদি ভাল না লাগে ত তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব না। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার দাদাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পার।"

শান্তা আর কিছু বলিল না। এ সম্বন্ধে দম্পতির মধ্যে পরে আর কোনও কথাও হইল না। ক্রমে পূজা নিকটে আসিল। নীরদ বাড়ী যাইবে। যাইবার আগের দিন সে শান্তাকে কহিল, "আমি ত কালই বাড়ী যাচ্চি, শান্ত। তোমার পশ্চিমে যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাই। ওঁরা ত পরশু বুঝি যাবেন ?"

"হাঁ !—তা—আমি ওঁদের সঙ্গে যাব না।"

"কোথায়—কাদের সঙ্গে তবে যাবে শান্তা ?"

শান্তা সলজ্জ ভাবে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কোথায় আর যাব ? তুমি বাড়ীতে যাচ্চ,—তা——আমার আর কোথাও যেতে ভাল লাগে না।"

"তবে কি—বাড়ীতেই আমার সঙ্গে যাবে শান্তা ?"

শান্তা সঙ্কুচিতভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "তাই ত—ভাবছি কি করি ? তা দেখ, আমি কিন্তু পূজোটুজোর মধ্যে যেতে পারব না।"

"তোমার ইচ্ছে না হয় যাবে না। তার জন্যে ভাবনা কি ?"

"সবাই যে নিন্দে করবে। আবার মা আছেন, দিদিরা আছেন—যদি তাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম না কত্তে পারি—তবে—ছি, লোকে আমাকে কি বল্‌বে ? ভারী লজ্জা করবে আমার !"

"কিচ্ছু ভাবনা নেই তোমার শান্তা ! যদি যেতে চাও, চল। তুমি যে ভাবে থাক্‌তে চাও, যে ভাবে চল্‌তে চাও,—তাই থাক্‌বে, তাই চলবে। কেউ কিছু বলে, সে তখন আমি বুঝব।"

শান্তা কহিল, "আচ্ছা—তাই যাব। কিন্তু কেউ যদি কিছু বলে—নিন্দে মন্দ যদি কিছু করে—তোমার কিন্তু দোষ !"

"হাঁ—হুশবার ! সব দোষ আমি মাথায় তুলে নেব। তবে সত্যি যাবে শান্তা আমার সঙ্গে ?"

"যাব।" অতি আনন্দে নীরদ শান্তাকে তার বিশাল উন্মুক্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

৩

আজ সপ্তমী পূজা। পূজা হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা সকলে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া অঞ্জলি দিবার জন্য এখন চণ্ডীমণ্ডপে

যাইবে। কর্ত্তা গরদের জোড়, এবং গৃহিণী একখানি গরদের সাড়ী পরিলেন। বধূরা সকলে নিজ নিজ অলঙ্কারে এবং বাণারসী শাড়ীতে সজ্জিত হইল। নীরদ ও তাহার ভ্রাতারা সকলে বাণারসী জোড় পরিয়া প্রস্তুত হইল। বালকবালিকা-দেরও যথাযোগ্য বসনভূষণে সাজান হইল। শান্তাকে কেহ ডাকে নাই,—নীরদ নিষেধ করিয়াছিল। বধূদের লইয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে গৃহিণী নীরদকে এক-পাশে ডাকিয়া নিয়া চুপি চুপি কহিলেন,—"বাবা, মায়ের পূজোর দিন আজ সেজ বৌমাকে ফেলে সবাই মণ্ডপে যাচ্চি, মোটেই আমার ভাল লাগছে না। তা বাবা—একবার দেখ্‌না গিয়ে যদি আসে। তুই নিষেধ কল্লি—আমরা ত কেউ গিয়ে ডাকতে পারিনে।"

নীরদ একটু ভাবিল,—তারপর কহিল,"আচ্ছা—গিয়ে একবার ব'লে দেখ্‌তে পারি। তবে জোর করে আন্‌তে পারব না,—ইচ্ছে ক'রে যাদ আসে ত আস্‌বে।"

মাতা কহিলেন,—"জোর ক'রে কি টেনে হিঁচড়ে আন্‌তে বলি বাবা? আর যেমনই হোক—বৌমার মন ভাল। তবে, বাপ নাকি একেবারে সাহেব, পূজোটুজো কথনও দেখেনি,—তাই,—তা যা না একবার বাবা, দেখ্‌ যদি আসে।"

গৃহমধ্যে শান্তা একখানি ইজিচেয়ারে হেলিয়া বসিয়া কি একখানা নভেল পড়িতেছিল। নীরদ ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিল। শান্তা স্বামীর দিকে চাহিল,—স্বামীর এই নূতন বেশ দেখিয়া শান্তা একটু হাসিল। নীরদ দৃঢ়পেশল বিশালদেহ পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষ, পরিধানে রক্তবর্ণ বাণারসী ধুতি, স্কন্ধে ও বক্ষে ধুতির অনুরূপ উত্তরীয়,—তার মধ্য হইতে শুভ্র উপবীত দেখা যাইতেছিল। আজ এই নূতন বেশে বারশ্রী-মণ্ডিত মুর্ত্তিমান্ পৌরুষের ন্যায় স্বামীতে শান্তা যেন কি এক নূতন শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। এতদিন যা দেখি-য়াছে, তার চেয়েও স্বামীর এই মূর্ত্তি শান্তার চোকে অনেক বেশী মোহন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাবটি দেখাইল না। বরং চিত্তের মুগ্ধতা যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া একটু যেন বিদ্রূপের ভাবেই হাসিল,—হাসিয়া কহিল, "বেশ সেজেছ ত। যেন পুরুত ঠাকুর হয়ে পূজো ক'ত্তে যাচ্চ!"

নীরদ হাসিয়া কহিল, "পূজোয় এই রকম সাজবার নিয়মই আমাদের ঘরে আছে। তা—সবাই আমরা যাচ্চি। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আমাদের সঙ্গে এইরকম সেজে যেতে পার। তাই জিজ্ঞেস কত্তে এলুম।"

যদি ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে এই রকম সেজে যেতে পার।

("স্বামী ও স্ত্রী")

কমলা প্রেস—কলিকাতা।

শান্তার সত্য সত্যই ইচ্ছা হইতেছিল, স্বামীর সহধর্ম্মিণীর বেশে স্বামীর সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে যায়। স্বামী যদি বলিতেন, 'এস শান্তা, আমার সঙ্গে। তবে বোধ হয় অমনই সে উঠিয়া যাইত।' কিন্তু তিনি মাত্র জানিতে আসিয়াছেন, শান্তার যাইতে ইচ্ছা হয় কি না। কিন্তু তার যে সত্যই ইচ্ছা হইতেছে, একথা আজ সে কেমন করিয়া স্বীকার করে? সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার ইচ্ছে টিচ্ছে কিছু নেই। তবে তোমারা যদি বল, তবে কাজেই যেতে হবে।"

"তোমার ইচ্ছে না হ'লে আমরা কিছু বলি না। ইচ্ছে হলে আস্‌তে পার, তাই মাত্র বল্‌তে এসেছিলুম।"

শান্তা কিছু বলিল না,—নীরবে নতমুখেই বসিয়া রহিল। নীরদ আবার কহিল, "থাক্‌ তবে। এরপর যদি ইচ্ছে কখনও হয়, তবে যাবে। আজ থাক্‌।" এই বলিয়া নীরদ চলিয়া গেল।

শান্তার মনটা যেন কেমন কাঁদিয়া উঠিল,—একটু বসিয়া সে কি ভাবিল! সহসা হুলু ও শঙ্খধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। শান্তা উঠিয়া মুক্ত জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তা দেখিল, তার শ্বশুর ভাসুর দেবর স্বামী প্রভৃতি পুরুষেরা আগে—পশ্চাতে শ্বশ্রূ অন্যান্য বধূদের লইয়া চলিয়াছেন! বালকবালিকারা সকলে আনন্দকোলাহল করিতে করিতে সকলের আগে ছুটিয়া চলিয়াছে! শান্তার মনটা যেন কেমন পাগল হইয়া উঠিল। উহাদের মধ্যেই ত আজ তার স্থান—যেন কোনও বড় অপরাধে সে আজ তাহাতে বঞ্চিত হইয়া একা ঘরে দাঁড়াইয়া আছে! সে যে উহাদেরই একজন। কেন তবে সে দূরে সরিয়া আছে? সকলের মধ্যে ঐ যে তার স্বামী—অমন প্রেমময় স্নেহময় স্বামী—আহা, যেন দেবমূর্ত্তি ধরিয়া দেবমন্দিরে যাইতেছেন। তাঁহারই পাশে যেন দেবী হইয়া আজ সে গিয়া দাঁড়াইতে পারে!—ধিক্‌, কেন সে নির্জ্জীব পুতুলটির মত একা ঘরে দাঁড়াইয়া আছে? শান্তা আর থাকিতে পারিল না। দ্রুত গবাক্ষ হইতে গৃহ-মধ্যে ফিরিয়া আসিল,—বাক্স খুলিয়া একখানি বাণারসী শাড়ী বাহির করিল। জ্যাকেট সায়া সেমিজ সব খুলিয়া ফেলিল,—তাড়াতাড়ি সেই বাণারসী খানি পরিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গৃহের বাহিরে আসিল।

গৃহিণী বধূদের লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারে আসিয়া যখন প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেজবধূও বধূর বেশে অন্যান্য বধূদের সঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল!

আনন্দাশ্রুসিক্ত চক্ষে নীরদ শান্তার দিকে চহিল,—শান্তাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সাশ্রুনয়ন দুটি স্বামীর দিকে তুলিল। দেবীর সমক্ষে উচ্ছ্বসিত-অশ্রু চারিটি নয়নের মিলনে স্বামিস্ত্রীর দুটি স্নেহের প্রাণ যেন এক হইয়া মিলিয়া গেল,—মাঝে যা কিছু বাধা ছিল, দূর হইল।

পূজার অর্ঘ্য।

(১)

শরতের শুভ্রাকাশে, স্বরগের দীপ্তি ভাসে,
বিশ্ব আজি প্রসন্ন উজ্জ্বল ;—
মা আমার! মা আমার। দূরে কত র'বি আর,
দীন সুতে কাঁদায়ে কেবল!
কি আনন্দে পাখী গাহে গান।
হর্ষোৎফুল্ল প্রসূন-বয়ান।
তটিনীর কলোচ্ছ্বাসে কি আনন্দ ভেসে আসে,
স্নিগ্ধ সমীরণ কিবা পুলক-চঞ্চল!
মা আমার! মা আমার! দূরে কত র'বি আর
দীন সুতে কাঁদায়ে কেবল!

(২)

সুদীর্ঘ বরষ পরে. মা তুই আসিবি ঘরে,
সারা বঙ্গে পড়ে সাড়া ;—
মধুর প্রভাতে সাঁঝে, আরতির বাদ্য বাজে,
কি উৎসবে সবে মাতোয়ারা!
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব চেতনা!
কোথা দুঃখ-বিষাদ-বেদনা!
একা আমি শূন্য-গেহে, বঞ্চিত কি রব স্নেহে,
ঢালিব নীরবে শুধু তপ্ত আঁখি-ধারা!
মধুর প্রভাতে সাঁঝে, আরতির বাদ্য বাজে,
কি উৎসবে সবে মাতোয়ারা!

(৩)

মা আমার! মা আমার! আয় আজি একবার,
তৃষ্ণাতুর বুভুক্ষু সন্তান ;—
ও পীযূষ-স্তন্য দানে, জুড়া মা, তাপিত প্রাণে,
কোলে নে মা, পদে দিয়ে স্থান।
খেলাচ্ছলে ভুলি কভু হায়।
ধূলি-কাদা মেখেছি হিয়ায়,
করুণা-নয়ন-পাতে, আমার "আমিত্ব" সাথে,
সকলি ধোয়ায়ে কর সুন্দর অম্লান!
ও পীযূষ-স্তন্য দানে, জুড়া মা, তাপিত প্রাণে,
কোলে নে মা, পদে দিয়ে স্থান।

(৪)

তুই মাগো, বিশ্বেশ্বরাণী, কন্যা তোর রমা বাণী,
সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের আঁধার ;—
সাফল্য কৌমার্য্য সনে. বন্দিছে মা, ও চরণে,
পুত্র হেন আছে আর কার!
দশ করে রক্ষি দশ দিক্
স্নেহ-আঁখি তোর অনিমিখ্।—
বধি' পাপ-দৈত্যচয়ে, হাসিস্ মা বরাভয়ে।
গুঞ্জরে কল্যাণ-শান্তি অঞ্চলে তোমার।
সাফল্য কৌমার্য্য সনে, বন্দিছে মা ও চরণে।
পুত্র হেন আছে আর কার।

(৫)

দুর্গতিহারিণী শিবা, যত দুঃখ দৈন্য কিবা,
রাখিলে এ সন্তানের তরে—
আশ্বাস-সান্ত্বনা-হারা, বহে শুধু অশ্রুধারা,
ডুবি' নিত্য নিরাশ-সাগরে।
আজি মাগো, বড় সাধ যায়,
চিরতরে ভুলি আপনায়।
মুক্ত-বিহঙ্গের মত, স্তুতি-গীতি অবিরত,
মা, তোর চরণপ্রান্তে গাহি প্রাণভরে।
আশ্বাস-সান্ত্বনা-হারা, বহে শুধু অশ্রুধারা,
ডুবি নিত্য নিরাশ-সাগরে।

(৬)

মা আমার। মা আমার! সহেনা—সহেনা আর,
নিশিদিন আকুল ক্রন্দন ;—
শরতের হাসি সনে, হাসি তোর সংগোপনে,
নিরখিতে চাহে প্রাণ মন।
ভেঙ্গে দে মা. মোহ-সুপ্তি-ঘোর,
কর্ মোরে পূজা অর্ঘ্য তোর।
তুই মাগো, কাছে এসে, তুলে নে মা, ভালবেসে
নিমেষে সার্থক হোক্ এ ব্যর্থ জীবন।
মা আমার। মা আমার। সহেনা—সহেনা আর
নিশিদিন আকুল ক্রন্দন।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ব্যর্থ যাত্রা।

(১)

আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র বাল্যাবধিই কিছু ভাবুক ও কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ভাবুকতা এবং কবিত্বের অনেকগুলি অন্তরায় ছিল। প্রথমেই, তাহার নাম। যদিও দেবসেনাপতি শক্তিধর কার্ত্তিকের—শৌর্য্যবীর্য্য না হউক—রূপ সকলের উপমাস্থানীয়,—যদিও ফুটফুটে টুকটুকে রূপবান্ খাঁটি বাঙ্গালী বাবুকে লোকে 'যেন কার্ত্তিকটি' বলিয়াই সুখ্যাতি করিয়া থাকে,—যদিও দুর্গা প্রতিমার পাশে ময়ূরচড়া কার্ত্তিকঠাকুরকে কুম্ভকার যত সুন্দর করিয়া পারে গড়ে, লোকে মিহিধুতি, কোচান উড়ুনি, জরীর জুতা, কোঁকড়া চুলে, যতদূর সুন্দর করিয়া পারে সাজায়,—তবু কার্ত্তিক নামটা ভাল নয়। না একেলে, না সেকেলে,—ঐ যেন কেমন এক রকমের! কবির ত মানায়ই না! আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্রেরও যখনই মনে হইত, নামটা কার্ত্তিক, যখনই কেহ কার্ত্তিক বলিয়া তাহাকে ডাকিত, তখনই তার হৃদয়টা বৈরাগ্যে ও বিষাদে পূর্ণ হইত। কবিত্ববিহীন অবিবেচক পিতামাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা যতটুকু আছে, তাও শুষ্ক হইয়া যাইত। বস্তুতঃ নামকরণটা পিতামাতার অধিকারে না থাকিয়া, যার যার নিজ অধিকারে থাকাই উচিত! নাম প্রত্যেকের নিজের, নাম আজীবন নিজেকে বহিতে হইবে, নামে নিজেকেই পরিচিত হইতে হইবে। রূপ লইয়া সকলে সর্ব্বত্র গমন করে না। দূরের লোকে নামই শোনে, রূপ দেখে না। মরিলে নামই থাকে, রূপ থাকে না। দেবতার নাম-মাহাত্ম্যই লোকে কীর্ত্তন করে, রূপ কে দেখে? সুতরাং সুরূপ অপেক্ষা সুন্দর নামেরই প্রয়োজন বেশী। 'সর্ব্বেশ্বর' যতই সুরূপ হউক, আর 'মলয়ানিল' যতই কুরূপ হউক, দূরে কেহ না দেখিয়া নাম শুনিলে, মলয়ানিলের প্রতিই আকৃষ্ট হইবে। কুরূপ পিতামাতা সন্তানকে সুরূপ দিতে পারেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই 'সুনাম' দিতে অবশ্য পারেন। যখন সচরাচর তাঁহারা তাহা করেন না, যখন তাঁহাদের এই বিবেচনারাহিত্যে সন্তানকেই আজীবন কষ্ট পাইতে হয়, তখন এই নামকরণের অধিকার তাঁহাদের হস্ত হইতে যার যার নিজের হস্তে ন্যস্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। সন্তান যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক ও আত্মনাম-নির্ব্বাচনে সক্ষম না হইবে, ততদিন সে পিতামাতা কর্ত্তৃক বড়, মেজ, ছোট, খোকা বা খুকী নামে অভিহিত হইতে পারে।

অলঙ্ঘনীয় নিয়তিবৎ পিতৃমাতৃদত্ত নামও অপরিত্যাজ্য। কার্ত্তিকচন্দ্র নামান্তর গ্রহণের জন্য অনেক যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। অনেক ভাবিয়া সে পূর্ণকবিত্বময় 'কুসুমদ্যুতি' নাম গ্রহণ করিল, কিন্তু তার অনুরোধ মিনতি বা রুষ্টি—কিছুতেই কেহ তাহাকে ঐ নামে ডাকিল না। আমরাও এখানে কার্ত্তিকচন্দ্রকে 'কুসুমদ্যুতি' না ডাকিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রই ডাকিব। কুসুমদ্যুতি বলিয়া কেহই যখন তাহাকে ডাকে না, আমরাই বা কেন ডাকিব? আর 'কার্ত্তিক' না বলিয়া 'কুসুমদ্যুতি' বলিলে তাকে চিনিবেই বা কে?

যাহা হউক, কবিত্বহীন নামরূপ অন্তরায় পরাভূত করিয়াও কার্ত্তিকচন্দ্র স্বীয় হৃদয়ের কবিত্ব বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারিত। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক বড় বিষম অন্তরায় ছিল, বস্তুতঃ সে অন্তরায়ের সম্মুখে কাহারও হৃদয়ে কবিত্বের পরিস্ফূরণ সম্ভব নয়। কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতা শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সেকেলে ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ। টোলে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে হস্তে-লেখা সংস্কৃত পুঁথিও ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন। ইংরেজি একেবারেই জানেন না। বাঙ্গালাতেও কোনও মতে বর্ণবিন্যাস করিয়া চিঠিপত্র ও হিসাবাদি লিখিতে পারেন মাত্র। বর্ণ সুঘন শ্যাম, দেহ নাতিদীর্ঘ নাতিস্থূল, মস্তকে লম্বমান শিখা, মুখে গুম্ফশ্মশ্রু মুণ্ডিত, ললাট-বক্ষ-বাহু চন্দনচর্চ্চিত। বেশভূষা—ঘোর গ্রীষ্মে থানের ধুতির উপর স্কন্ধে উড়ুনি, শীতে সেই উড়ুনির উপর বনাত বা নামাবলি,—পাদচারণে বহির্গমনের সময় চর্ম্মচটিকা, গৃহে অবস্থিতি কালে কাষ্ঠ-পাদুকা। কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, সামান্য কিছু নগদ টাকা লগ্নী কারবারে খাটে,—ইহাতে মোটা ভাত কাপড়ে দিনপাত হয়। প্রাতে প্রাতঃস্নান ও পুষ্পচয়ন করেন; সন্ধ্যা-আহ্নিকাদির পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া হিসাবপত্র দেখেন ও লেখেন; দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর গৃহবারান্দায় নিদ্রা যান; বেলান্তে উঠিয়া গ্রাম্য প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাশা খেলেন; তারপর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া, কয়েক ছিলেম তামাক পোড়াইয়া, আহারান্তে শয়ন করেন। দৈনিক কার্য্য তাঁহার এইরূপ। কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী খাঁটি সেকেলে ব্রাহ্মণ-গৃহিণী—শ্যামাঙ্গী, স্থূলোদরা, হাতে শাঁখা ও রৌপ্য কঙ্কণ, কাণে পাশা, নাকে নথ, গলায় মটরদানা। গৃহে দাসদাসী নাই, সুতরাং উঠান কুড়ান, ছড়া দেওয়া, ঘরনিকান, বাসন মাজা, জল তোলা, রাঁধা প্রভৃতি সমস্ত গৃহকর্ম্মই নিজহাতে করেন। ব্রত-নিয়মাদি

কিছু যাহা আছে, তাও সবই করেন। দ্বিপ্রহের পর মহিমের পিসি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন, অন্যান্য প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে তিনিও প্রত্যহই সেই বাড়ীতে বসিয়া কাশীরাম বা কীর্ত্তিবাসের ভণিত অমৃতকাহিনী শ্রবণে পুণ্যলাভ করেন। লেখাপড়া অবশ্য কিছুই জানেন না; অজ্ঞতা অসভ্যতা কুসংস্কার সবই পূরাপূরি রকম আছে। একদিন কার্ত্তিকচন্দ্র আলিপুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখিয়াছে বলায়, বিস্মিতা জননী উত্তর করেন, "সিংহ যে কৈলাসে মা ভগবতীর বাহন, মর্ত্ত্যে কি নরলোকে তাহাকে দেখিতে পায়?"

বাড়ীতে দুইখানি থাকিবার ঘর, পাকশালার পার্শ্বে ঢেঁকি ঘর, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে নারকেল সুপারী আম কাঁঠাল বাঁশ তেঁতুল—অর্থাৎ গ্রাম্য গৃহস্থের বাড়ীতে যা কিছু থাকে, সবই আছে। উঠানে ও গৃহ-পার্শ্বে খালি জায়গা যা আছে তাহাতে লাউ কুমড়া শশা বেগুণ প্রভৃতি তরকারী জন্মে। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দেবপূজোপযোগী জবা অপরাজিতা কৃষ্ণকলি কুরুবক প্রভৃতি পুষ্পাদি জন্মে—গোলাপ বেল যুথি যাঁথি চামেলী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি নয়। কবিগণ বনপ্রান্তে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রান্তরসমীপে, অথবা বনরাজিশোভিত পর্ব্বতপ্রান্তে নির্জ্জন তৃণকুটীরে প্রণয়িনীসহ বাসের অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা কবির যোগ্য কবিত্ব পরিস্ফুরণে সহায় বটে, এবং সেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অবাধ পূর্ণবিকাশময় স্থানে মনোজ্ঞ প্রেমময়ী প্রণয়িনীসহ দিনযাপন করিতে পারিলে কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয়নিহিত কবিত্ববীজও অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত ও কুসুমিত হইত•সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! অজ্ঞ অসভ্য কবিত্বমাধুরীহীন পিতামাতার আম-কাঁঠাল-নারিকেল-সুপারী-তেঁতুল-কদলী-লাউ-কুমড়া-শশা-বেগুণাদি-পরিবেষ্টিত গ্রাম্য কুটীরে কার্ত্তিকচন্দ্রের কবিত্ববীজ শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইল। সৌভাগ্যক্রমে বীজ একেবারে নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিকচন্দ্র মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রেরিত হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল কার্ত্তিকচন্দ্র টোলে পড়িয়া উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত হয়। কিন্তু মাতার ইচ্ছা হইল, ইংরেজি পড়িয়া বাবু হয়। অল্প ইংরেজিশিক্ষিত মাতুলের পোষকতায় মাতার ইচ্ছারই জয়লাভ ঘটিল। সুতরাং কার্ত্তিকচন্দ্র ইংরেজী স্কুলে পড়িতে গেল। যাহা হউক, কলিকাতায় ছাত্রনিবাসের দ্বিতল অট্টালিকাস্থ প্রকোষ্ঠের মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্ট ধূম্রাস্পষ্ট কৌমুদী বিধৌত গগন, সান্ধ্য-

সমীরণে শ্যামল ঘাসাচ্ছাদিত প্রমুক্ত গড়ের মাঠে ভ্রমণ, থিয়েটারে অভিনেত্রীগণের সুমধুর প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ—ইত্যাদিতে কার্ত্তিকচন্দ্রের মৃতপ্রায় কবিত্ব পুনর্জ্জীবিত হইল। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে গৃহে গেলে অবশ্য সেই গ্রাম্য পিতামাতার গ্রাম্য গৃহে কবিত্ব কিয়ৎকালের জন্য ক্ষীণবল হইত, কিন্তু আবার কলিকাতায় আসিলেই তাহা ফুটিয়া উঠিত। মধুর প্রেমোচ্ছ্বাসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া সে মাসিকপত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইত। (নীচে অবশ্য 'কুসুম-দ্যুতি' এই নামই সহি করিত।) দারুণ উৎকণ্ঠায় সেই সব পত্রিকা প্রকাশের জন্য সে অপেক্ষা করিত। কোনও পত্রিকায় কোন কবিতা বাহির হইলে অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই পাঠ করিত, ভাবিত, দেখিত, বন্ধুগণকে দেখাইত, আকুল চিত্তে তাহাদের মন্তব্য শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিত। তার কোমল ভাবপ্রবণ হৃদয়ে হৃদয়স্পর্শী ঘটনামাত্রেই কবিত্বের মধুর আবির্ভাব হইত। একদিন পার্শ্বের কোন বাড়ীর ছাদে কোনও তরুণী হাসিতে হাসিতে বালিকা সহোদরাকে পানের 'চাবা' দিয়া দৈবাৎ স্মিত নয়নে গবাক্ষপার্শ্বে উপবিষ্ট কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে প্রস্থান করিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী অমনই মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল,—অমনই সেই ঝঙ্কারে মধুর কবিতা প্রসূত ও গীত হইল। একদিন মেথরাণীর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কার্য্যে অমনোযোগ হেতু মাতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও প্রহৃতা হইয়া ছল ছল নেত্রে উঠান সাফ করিতে আইসে। ঝি উঠানে বাসন মাজিতেছিল, সুতরাং বালিকা সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রাঙ্গনকোণে সজলনয়নে বিরসবদনে অপেক্ষা করিতেছিল। এই করুণমূর্ত্তি কার্ত্তিকচন্দ্রের মর্ম্মের মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। অমনই অতি মিহি মর্ম্মস্পর্শিনী করুণরসাত্মিকা 'বিষাদিনী' কবিতা লিখিত হইল। কত আর বলিব? এইরূপ যখন যা দেখিত, তাতেই তার ভাবপ্রবণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া কবিতা প্রসব করিত!

(২)

কলিকাতায় পাঠাভ্যাসকালে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহ হইল। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় বাস হেতু তার হৃদয়ে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছিল। এখন প্রেমময়ী প্রণয়িনীসম্মিলনে কবিত্ব হৃদয় পূর্ণ করিয়া উছলিয়া পড়িল! কার্ত্তিকচন্দ্র আর কবিতা ছাড়া পড়ে না, কবিতা ছাড়া লেখে না। চাঁদের কিরণ, উষার বরণ, মলয় পবন, বিহগ কুজন, কুসুম কানন ব্যতীত আর কোন চিন্তাই তার মনে আসে না। প্রণয়িনীর অভাবে এতদিন কবি কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয়ে যেটুকু ফাঁক

ফাঁক ভাব ছিল, তাহা ওতঃপ্রোতঃভাবে পূর্ণ হইল। এতদিন সে বস্তুতঃ এই অভাবটি বিশেষ বোধ করিত। প্রণয়িনীর চিন্তা কবিত্বের জীবন, কার্ত্তিকচন্দ্র কল্পনাপ্রসূতা মানসসুন্দরীর সঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেমসম্মিলনকল্পনায় দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইত। কিন্তু কল্পিত জীবন দানে কতদিন কাহাকে জীবিত রাখা যায়? শেষটা যেন কার্ত্তিকচন্দ্রের কবিতাগুলি জীবনহীন বলিয়া তার নিজেরই মনে হইত। যাহা হউক, সুসময়ে প্রেমময়ীর সজীব প্রেমবর্ষণে বিশুষ্ক-প্রায়া কবিতালতা আবার সতেজে বৃদ্ধি পাইল।

সুশিক্ষিত সভ্যতালোক-প্রাপ্ত ধনী হিরণ্ময় বাবুর কন্যা প্রমীলার সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহ হইল। শ্বশুরগৃহ বাহিরে মনোরম পুষ্পোদ্যানে-বেষ্টিত, ভিতরে নানাবিধ মনোজ্ঞ সাজসজ্জায় পরিপাটিরূপে সজ্জিত। সুদৃশ্য অট্টালিকা সম্মুখে কেদারবাহিনী নাতিক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী; পরপারে বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। দূরে দিঙ্মণ্ডলন্যস্ত বনরাজি। এইরূপ মনোরম আবাসে, কুসুমবাসময় মলয় বাতাসে, ফুল্ল-জ্যোৎস্না-বিভাসে, সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মুক্ত গবাক্ষপাশে, যখনই কার্ত্তিকচন্দ্র সপ্রিয়া কৌচে বা পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া ওপারে, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর সহ বীচিমালাশোভিত চঞ্চল তটিনীবক্ষের দিকে চাহিত, আহা! তখন কার্ত্তিক-চন্দ্রের—না, সে ভাব বর্ণনা করা দীনের এ হীন লেখনীর অসাধ্য! এর কাছে কার্ত্তিকচন্দ্রের সেই পিতা মাতা, সেই অলাবু কুষ্মাণ্ড-নারিকেল-সুপারী-পরিবেষ্টিত গ্রাম্য গৃহ—ছি! মনে করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। বিবাহের পর কার্ত্তিকচন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে তার প্রবৃত্তি হইত না। ছুটীতে শ্বশুর বাড়ীতেই যাইত, সেখানেই থাকিত। সুপরিমার্জ্জিত সুকোমল বিলাস সম্ভোগে, যত্নে প্রতিপালিতা কুসুমলতা-সদৃশী প্রমীলাকে, সেই গ্রাম্য অসভ্য পিতামাতার অধীনে গৃহলেপন, বাসন-মার্জ্জন প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে নিয়োগের সম্ভাবনা স্বপ্নেও সে মনে করিতে পারিত না! দ্বিরাগমনের পর কার্ত্তিকচন্দ্র প্রমীলাকে আর নিজের পিতৃগৃহে যাইতে দিত না। শ্বশুরের আপত্তি বা অনিচ্ছা ছিল না; প্রমীলার নিজের মনের প্রবৃত্তি কিরূপ ছিল, তা জানি না। কিন্তু তার মনে যাই থাক্, কার্ত্তিকচন্দ্র যখন স্বামী, তখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। প্রমীলা পিতৃ-গৃহেই রহিল। পুত্রবধূদর্শনে বঞ্চিত হইয়া পিতা শিবপ্রসাদ ক্রুদ্ধ হইলেন, মাতা ভবতারিণী কাঁদিলেন। তা অত ভাবিলে, অত দেখিতে গেলে আর চলে না!

এবার পূজার সময় পিতামতা উভয়েই কার্ত্তিকচন্দ্রকে একবার বাড়ী যাই-

সমীরণে শ্যামল ঘাসাচ্ছাদিত প্রমুক্ত গড়ের মাঠে ভ্রমণ, থিয়েটারে অভিনেত্রীগণের সুমধুর প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ—ইত্যাদিতে কার্ত্তিকচন্দ্রের মৃতপ্রায় কবিত্ব পুনর্জ্জীবিত হইল। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে গৃহে গেলে অবশ্য সেই গ্রাম্য পিতামাতার গ্রাম্য গৃহে কবিত্ব কিয়ৎকালের জন্য ক্ষীণবল হইত, কিন্তু আবার কলিকাতায় আসিলেই তাহা ফুটিয়া উঠিত। মধুর প্রেমোচ্ছ্বাসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া সে মাসিকপত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইত। (নীচে অবশ্য 'কুসুম-দ্যুতি' এই নামই সহি করিত।) দারুণ উৎকণ্ঠায় সেই সব পত্রিকা প্রকাশের জন্য সে অপেক্ষা করিত। কোনও পত্রিকায় কোন কবিতা বাহির হইলে অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই পাঠ করিত, ভাবিত, দেখিত, বন্ধুগণকে দেখাইত, আকুল চিত্তে তাহাদের মন্তব্য শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিত। তার কোমল ভাবপ্রবণ হৃদয়ে হৃদয়স্পর্শী ঘটনামাত্রেই কবিত্বের মধুর আবির্ভাব হইত। একদিন পার্শ্বের কোন বাড়ীর ছাদে কোনও তরুণী হাসিতে হাসিতে বালিকা সহোদরাকে পানের 'চাবা' দিয়া দৈবাৎ স্মিত নয়নে গবাক্ষপার্শ্বে উপবিষ্ট কার্ত্তিকচন্দ্রের দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে প্রস্থান করিল, কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী অমনই মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল,—অমনই সেই ঝঙ্কারে মধুর কবিতা প্রস্তুত ও গীত হইল। একদিন মেথরাণীর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কার্য্যে অমনোযোগ হেতু মাতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও প্রহৃতা হইয়া ছল ছল নেত্রে উঠান সাফ করিতে আইসে। ঝি উঠানে বাসন মাজিতেছিল, সুতরাং বালিকা সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রাঙ্গনকোণে সজলনয়নে বিরসবদনে অপেক্ষা করিতেছিল। এই করুণমূর্ত্তি কার্ত্তিকচন্দ্রের মর্ম্মের মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। অমনই অতি মিহি মর্ম্মস্পর্শিনী করুণরসাত্মিকা 'বিষাদিনী' কবিতা লিখিত হইল। কত আর বলিব? এইরূপ যখন যা দেখিত, তাতেই তার ভাবপ্রবণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া কবিতা প্রসব করিত!

(২)

কলিকাতায় পাঠাভ্যাসকালে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহ হইল। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় বাস হেতু তার হৃদয়ে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছিল। এখন প্রেমময়ী প্রণয়িনীসম্মিলনে কবিত্ব হৃদয় পূর্ণ করিয়া উছলিয়া পড়িল! কার্ত্তিকচন্দ্র আর কবিতা ছাড়া পড়ে না, কবিতা ছাড়া লেখে না। চাঁদের কিরণ, উষার বরণ, মলয় পবন, বিহগ কুজন, কুসুম কানন ব্যতীত আর কোন চিন্তাই তার মনে আসে না। প্রণয়িনীর অভাবে এতদিন কবি কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয়ে যেটুকু ফাঁক

ফাঁক ভাব ছিল, তাহা ওতঃপ্রোতঃভাবে পূর্ণ হইল। এতদিন সে বস্তুতঃ এই অভাবটি বিশেষ বোধ করিত। প্রণয়িনীর চিন্তা কবিত্বের জীবন, কার্ত্তিকচন্দ্র কল্পনাপ্রসূতা মানসসুন্দরীর সঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেমসম্মিলনকল্পনায় দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইত। কিন্তু কল্পিত জীবন দানে কতদিন কাহাকে জীবিত রাখা যায়? শেষটা যেন কার্ত্তিকচন্দ্রের কবিতাগুলি জীবনহীন বলিয়া তার নিজেরই মনে হইত। যাহা হউক, সুসময়ে প্রেমময়ীর সজীব প্রেমবর্ষণে বিশুষ্ক-প্রায় কবিতালতা আবার সতেজে বৃদ্ধি পাইল।

সুশিক্ষিত সভ্যতালোক-প্রাপ্ত ধনী হিরণ্ময় বাবুর কন্যা প্রমীলার সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহ হইল। শ্বশুরগৃহ বাহিরে মনোরম পুষ্পোদ্যানে-বেষ্টিত, ভিতরে নানাবিধ মনোজ্ঞ সাজসজ্জায় পরিপাটিরূপে সজ্জিত। সুদৃশ্য অট্টালিকা সম্মুখে কেদারবাহিনী নাতিক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী; পরপারে বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। দূরে দিঙ্‌মণ্ডলন্যস্ত বনরাজি। এইরূপ মনোরম আবাসে, কুসুমবাসময় মলয় বাতাসে, ফুল্ল-জ্যোৎস্না-বিভাসে, সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মুক্ত গবাক্ষপাশে, যখনই কার্ত্তিকচন্দ্র সপ্রিয়া কোচে বা পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া ওপারে, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর সহ বীচিমালাশোভিত চঞ্চল তটিনীবক্ষের দিকে চাহিত, আহা! তখন কার্ত্তিক-চন্দ্রের—না, সে ভাব বর্ণনা করা দীনের এ হীন লেখনীর অসাধ্য! এর কাছে কার্ত্তিকচন্দ্রের সেই পিতা মাতা, সেই অলাবু কুষ্মাণ্ড-নারিকেল-সুপারী-পরিবেষ্টিত গ্রাম্য গৃহ—ছি! মনে করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। বিবাহের পর কার্ত্তিকচন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে তার প্রবৃত্তি হইত না। ছুটীতে শ্বশুর বাড়ীতেই যাইত, সেখানেই থাকিত। সুপরিমার্জ্জিত সুকোমল বিলাস সম্ভোগে, যত্নে প্রতিপালিতা কুসুমলতা-সদৃশী প্রমীলাকে, সেই গ্রাম্য অসভ্য পিতামাতার অধীনে গৃহলেপন, বাসন-মার্জ্জন প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে নিয়োগের সম্ভাবনা স্বপ্নেও সে মনে করিতে পারিত না! দ্বিরাগমনের পর কার্ত্তিকচন্দ্র প্রমীলাকে আর নিজের পিতৃগৃহে যাইতে দিত না। শ্বশুরের আপত্তি বা অনিচ্ছা ছিল না; প্রমীলার নিজের মনের প্রবৃত্তি কিরূপ ছিল, তা জানি না। কিন্তু তার মনে যাই থাক্, কার্ত্তিকচন্দ্র যখন স্বামী, তখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। প্রমীলা পিতৃ-গৃহেই রহিল। পুত্রবধূদর্শনে বঞ্চিত হইয়া পিতা শিবপ্রসাদ ক্রুদ্ধ হইলেন, মাতা ভবতারিণী কাঁদিলেন। তা অত ভাবিলে, অত দেখিতে গেলে আর চলে না!

এবার পূজার সময় পিতামতা উভয়েই কার্ত্তিকচন্দ্রকে একবার বাড়ী যাই-

বার জন্য অনেক করিয়া চিঠি লিখিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র পত্রের জবাবও দিল না। ক্রুদ্ধ হইলেও স্নেহের কাছে ক্রোধ কতক্ষণ থাকে? সুতরাং পিতা কার্ত্তিকচন্দ্রকে গৃহে আনিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। ছাত্রনিবাসে সৌখীন ছাত্রবাবুদের সমক্ষে ডাবাহুকা ও মলিন ক্যাম্বিস ব্যাগসহ ওরূপ গ্রাম্য অশিক্ষিত পিতার সমাগমে কার্ত্তিকচন্দ্র যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল। দৃঢ় বিরাগ-প্রদর্শনে পিতার সমস্ত চেষ্টা পরাভূত করিয়া সেই দিনই তাঁহাকে সে বাড়ী পাঠাইল।

পূজার পূর্ব্বে মহাদেবী আদ্যাশক্তির আবির্ভাবের সূচনায় নির্জ্জীব বঙ্গেও একটা প্রবলশক্তির আলোড়ন দেখা যায়। দেহের বলও শক্তি, মনের উৎসাহ-উদ্যমও শক্তি, আবার হৃদয়ের প্রেমও শক্তি। অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা এ শক্তির প্রাবল্য কম নয়। শক্তির আগমনে চারিদিকেই যখন শক্তির বিকাশ হইতেছে, প্রেমশক্তিরই বা বিকাশ হইবে না কেন? প্রিয়া-বিরহিত যুবক মাত্রেরই মনে এই সময় বিশেষ প্রেমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরস্থ ছাত্রনিবাসের সংসারচিন্তবিহীন, ভাবী সুখ-সমৃদ্ধির আশায় উৎফুল্ল, নবপরিণীত যুবকদের হৃদয়ই এই প্রেমবিকাশের প্রধান লীলাক্ষেত্র। অবগুণ্ঠনান্তরালে নবপরিণীতা তরুণীর সলজ্জ মৃদুহাস্যদীপ্ত প্রেমকটাক্ষ, নিশীথে নিভৃত গৃহে মৃদু প্রদীপালোকে সলজ্জ মধুর মৃদুধ্বনিত আধব্যক্ত আধসম্বরিত প্রেমসম্ভাষণ, দিবায় মধুর স্মৃতিময় নিশাজাগরণের মধুর অলস ভাব, একটি বার সেই সলজ্জ মধুর হাসিময় বদন নিরীক্ষণের—একটি বার একটি মাত্র মধুর সলজ্জ সম্ভাষণের আশায় ইতস্ততঃ সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ও সুযোগ অনুসন্ধান—ইত্যাদি আগতপ্রায় মাধুর্য্যলহরীতে প্রলোভিত যুবকগণের অবস্থা সেই যুবকগণ ছাড়া আর কে বুঝিতে পারে? প্রিয়তমার মনোরঞ্জনার্থ প্রত্যহ সাবান-মর্দ্দনে দেহলাবণ্য-বৃদ্ধির প্রয়াস, সোৎকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ দর্পণে বদননিরীক্ষণ, বয়োব্রণ ইত্যাদি রূপবৈরীর আবির্ভাবে ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস, কেশপারিপাট্যহেতু সুনিপুণ নরসুন্দরের অনুসন্ধান, বৈকালিক জলখাবার ইত্যাদির ব্যয়সংক্ষেপেও সাবান এসেন্স নভেল রম্যকবিতা ইত্যাদি প্রেম-উপহার ক্রয়, আশু প্রেম-সম্মিলনের সুখকল্পনাপূর্ণ প্রেমলিপি প্রেরণ—প্রভৃতি কার্য্যে যুবকগণের নিয়ত ব্যাপৃতি—এই অদম্য প্রেমবিকাশের পরিচায়ক। আমাদের কার্ত্তিকচন্দ্র আবার কবি—সুতরাং তার হৃদয়ের প্রেমবিকাশ, তার মধুর প্রেম সম্মিলনের কল্পনা ইত্যাদি, আর কাহারও অপেক্ষা যে কম হইবেনা,

তাহা বলাই বাহুল্য ! সে কবি, তাই অন্যান্য যুবকদের মত সাবান এসেন্স প্রভৃতি হীন প্রেম উপহার ক্রয় না করিয়া সে এক প্রস্থ দিব্য কুসুমাভরণ ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইল। শ্বশুরালয়ে যাইবার দিন সন্ধ্যার প্রাকালে সেইগুলি আনিয়া সুদৃশ্য কৌটায় সাজাইয়া তোরঙ্গ মধ্যে রাখিল। শ্বশুর গৃহে পৌঁছিতে সেই রাত্রিতে বেলে, পর দিবস সমস্ত দিন ষ্টীমারে থাকিতে হইবে। সুতরাং পুষ্পাভরণের শুষ্কীভবন আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলচিত্তে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিল।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাকালে কার্ত্তিকচন্দ্র শ্বশুরালয়ের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে ষ্টীমার হইতে অবতীর্ণ হইল, তরঙ্গিনীকুলে সাবান সহযোগে রেলষ্টীমারে অবস্থানহেতু গাত্রমলিনতা দূর করিয়া সুন্দর পরিপাটিপূর্ব্বক বেশবিন্যাস করিল। পরিস্কৃত কোচান মিহি ধুতি, জামা উড়ুনি প্রভৃতি পরিধান করতঃ সুরভি দেলখোসে সমস্ত সৌরভান্বিত করিল। দর্পণে বারম্বার বদন নিরীক্ষণে নানাবিধ মধুর হাসি ও চাহনির কস্‌রৎ করিয়া কিরূপে প্রিয়ার সবিশেষ মনোরঞ্জনের সম্ভাবনা— তাহাও স্থির করিয়া লইল। তারপর কৌটা হইতে পুষ্পাভরণ বাহির করিল। সেগুলি একটু শুকাইয়াছে, কতক পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া পড়িয়াছে,—দেখিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বদনমধ্যে রসনা-সঞ্চালনে ক্ষোভব্যঞ্জক শব্দ প্রকাশ করিল। পরে একটু একটু জল ছিটাইয়া ভাল করিয়া গুছাইয়া সেগুলি আবার কৌটায় ভরিয়া রাখিল।

সব ঠিক হইল,—কার্ত্তিকচন্দ্র নৌকার বাহিরে আসিয়া বসিল। মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণে তটিনীবক্ষে মন্দ বীচিমালা মৃদু নাচিতেছিল,—তরণী তাহাতে নাচুক বা না নাচুক, কার্ত্তিকচন্দ্রের হৃদয় নাচিতেছিল,—বড় মধুর হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়াই নাচিতেছিল,—সেই নাচে শিরায় শিরায় শোণিত নাচিতেছিল— কেমন যেন একটা উষ্ণ পুলক প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া নাচিয়া দেহমধ্যে ছুটিতেছিল!—সুতরাং না নাচিলেও কার্ত্তিকচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, তরণীখানিও তটিনী-বক্ষে নাচিয়া নাচিয়াই চলিতেছে। পঞ্চমীর চাঁদ ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোক সেই নদীবক্ষে, নদীর তীরে শ্যামল প্রান্তরে, দূরে বৃক্ষরাজিতে ঢালিয়া দিতেছিল। কবি কার্ত্তিকচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, যেন কোনও স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্য দিয়া স্বপ্নময়ী প্রণয়িনী সম্ভাষণে সে চলিয়াছে,—যেন তার মুখের হাসি, চক্ষের দীপ্তি, অঙ্গের মাধুরী—সব সেই মৃদুভাতিতে মিশিয়া তাকে আসিয়া মধুর স্পর্শ দিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তরণী আসিয়া ঘাটে লাগিল। শ্বশুরগৃহ সেখান হইতে

একটু একটু দেখা যায়। কার্ত্তিকচন্দ্র তীরে উঠিল। মাঝি তোরঙ্গটি লইয়া পশ্চাতে উঠিল। ভাবের আবেশে স্বেদসিক্ত দেহে, দুরু দুরু কম্পিত প্রাণে, চঞ্চল চরণে কার্ত্তিকচন্দ্র গৃহাভিমুখে চলিল।

গৃহদ্বারে দ্বারবান্ সেলাম করিল। ভৃত্য তোরঙ্গটি মাঝির মাথা হইতে লইল। কার্ত্তিকচন্দ্র নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে উঠিয়া উজ্জ্বল প্রদীপালোকে উদ্ভাসিত সুসজ্জিত গৃহে চেয়ারে চা-পানে উপবিষ্ট শ্বশুরের সম্মুখে উপনীত কার্ত্তিকচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। শ্বশুর কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জামাতাকে নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিতে আদেশ করিলেন। সহসা অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি উঠিল, শঙ্খ ঝাঁঝরী বাজিল! বৃদ্ধা দাসী বামীর মা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, প্রমীলার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে !!

আমন্ত্রণ।

আয় মা সারদা, আয় মা বরদা, বঙ্গে অভয় করিতে দান,
আয় মা তারিণি, আয় গো জননি, অযুত ভক্তের রাখিতে মান।
দলিয়া আয় মা শেফালি-শয্যা, গন্ধ সুষমা মাখিয়া অঙ্গে,
কনক অঞ্চল বিছায়ে শ্যামলে, জ্ঞান-গরিমা করিয়া সঙ্গে।
মিলন সঙ্গীতে আয় গো জননি সঘন-কম্পিত-স্ফীত বক্ষে,
হাসির বার্ত্তা বহিয়া আয় মা চির-বাঞ্ছিত আশার চক্ষে।
পীযূষ-প্রবাহ আন্ মা গৃহে, পরশে জাগা রোগীর শয্যা,
দীপ্ত-রথের দীপ্তি দানে ঘুচায়ে দে মা ভীতি ও লজ্জা।
রক্ত-কমল-চরণে আয় মা বিমল-অমল কমল পুঞ্জে,
আয় মা তারিণি, আয় মা ভবানি, আয় মা আমার সাধনা কুঞ্জে।
সান্ত্বনা-সরস-পরশে দে মা, মুছায়ে অধীর আঁখির লোর,
সুখের উষার অরুণ-কিরণে দুঃখের নিশা কর মা ভোর!

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত

সংসার ও সন্ন্যাস।

———:(০):———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মার্টিন দ্রুতপদে সেভেনবাগে ফিরিয়া গেল। সেখানে দেখিল মার্গারেট নিতান্ত বিষণ্ণমুখে ও আঁধার হৃদয়ে একখানি পত্র সমাপন করিতেছে। পত্রখানি রাজকুমারী মেরীর মাতা কাউণ্টপত্নী সারলোই মহোদয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং তাহাতে গেরাডের প্রতি নগরপাল গিসবেটের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মার্টিন প্রবেশ করিয়াই বলিল, "এবার সাহস চাই। আমি তাকে দেখিয়াছি। সে কারাগারের সেই ভূতের বাড়ীর উপরতলায় বন্দী আছে। ও বাড়ীর কথা অনেক শুনিয়াছি। কত লোক ওখানে বন্দী হইয়াছে, কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই।" তারপর কিরূপভাবে গবাক্ষপথে সে গেরাডকে দেখিতে পাইল, বিস্তারিত করিয়া মার্টিন্ তাহা বর্ণনা করিল।

মার্গারেট নিতান্ত ঔৎসুক্য সহকারে কিছুক্ষণ গেরাডের সম্বন্ধে মার্টিনকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। তারপর উভয়ে গেরাডের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিল,—স্থির হইল যে কাউণ্টপত্নীর স্মরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য। মার্গারেট বলিল, "আমি পত্র লিখিয়া রাখিয়াছি—এখনই লইয়া তোমাকে রটারডামে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধ পিটার এতক্ষণ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন,—এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রাচীনেরা বলিয়াছেন রাজকুলের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।"

"না করিয়া আর উপায় কি আছে পিতা?"

"জ্ঞান ও বুদ্ধি———"

"আপনার প্রাচীন শাস্ত্রের জ্ঞান এ বিপদে কোনও কাজে লাগিবে বলিয়া ত মনে হয় না।"

"কিরূপে বুঝিলে? লৌহকারাগার অপেক্ষা বুদ্ধির বল অধিক—এ কথা বহু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।"

"কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবলও পরাস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের বিশেষ প্রতিকূল। অত উচ্চ জানালা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে এরূপ মই যে হল্যাণ্ড দেশে পাওয়া যায় না।"

"মইয়ের প্রয়োজন কি? মাত্র তিনটি টাকার দরকার।"

"টাকা আমার আছে। গেরাডের নয়টি মোহর এখনও আমার রহিয়াছে। কিন্তু টাকায় কি হইবে? নগরপালকে ঘুষ দিয়া কিছু আর গেরাডকে মুক্ত করা যাইবে না।"

"টাকায় কিছু হয় না,—বটে! আচ্ছা তিনটি টাকা আমায় দাও, আজ রাত্রেই গেরাড এখানে আসিয়া আহার করিবে।"

পিটার এত দৃঢ়তার সহিত এই কথাগুলি বলিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য মার্গারেটের মনেও আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু পরক্ষণেই মার্টিনের মুখে নিতান্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া তাহার ক্ষণিক মোহ বিদূরিত হইল।

মার্গারেট নিতান্ত হতাশ কণ্ঠে বলিল, "সে আর হয় না! এরূপ নূতন উপায় মানুষের কল্পনার অতীত।"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "নূতন উপায় আবার কি? নূতন কল্পনার দিক কি আর আছে? মানুষের পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভব—যাহা কিছু বলা সম্ভব—সকলই হইয়া গিয়াছে।"

তারপর তিনি নানা দেশীয় গ্রন্থ হইতে এইরূপ কারাগার হইতে নানা কৌশলে কত বন্দী পলায়ন করিয়াছে, তাহার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। এবং তাহা হইতে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী একটি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মার্গারেট ও মার্টিন উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—বাস্তবিকই উপায়টি নিতান্ত সহজ—এ কথাটি যে তাহাদের মনে হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা; উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত; গেরাডের বাটীতে তাহার কারাবাসের সংবাদ রাষ্ট্র হয় নাই। তাহাতে পিতাও ফিরিয়া আসেন নাই। সকলেই আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। যখন গাইলের চক্ষু মধ্যে মধ্যে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় জ্যোৎস্নার আলোকে সে দেখিল, একটি শুক্লবসনা নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহার শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বেচারী ভয়ে একটি মাত্র অস্ফুট চীৎকার করিয়া এক লাফে খাটের নীচে গিয়া আশ্রয় লইল। তখন সেই মূর্ত্তি মৃদুস্বরে বলিল, "ছিঃ—গাইল! আমাকে দেখিয়া ভয় পাও?"

গাইল তখন ঈষৎ মুখ বাহির করিয়া দেখিল, বাস্তবিকই তাহার ভগ্নী কিটি আসিয়াছে—কোনও প্রেত নহে। বড়ই লজ্জা পাইয়া সে খাটের পাশ নীচ হইতে ধরিয়া দিগবাজী খাইয়া খাটের উপরে উঠিয়া পড়িল। কিটি অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহাকে নীরবে থাকিতে বলিয়া বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। উভয়ে বাহিরে আসিলে কিটি বলিল, সিবরণ ও কনেলিস গোপনে যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তাহার কতক সে শুনিয়া বুঝিয়াছে, গেরাড কারাবাসের ভূতের বাড়ীতে বন্দী হইয়া আছে। পিতা বাড়ীতে নাই কাজেই তাঁহার আদেশে এ কাজ হয় নাই। অতএব ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে। তাই গেরাডকে এ কথাটা বলিয়া আসিতে পারিলে তাহার মনে অনেক প্রবোধ পাইতে পারে। কিটি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে যাইবে। তবে ভূতের পাশে যাইতে হইবে তাই গাইলকে সঙ্গে লইতে চায়।

গাইল খুব সাহস দেখাইয়া বলিল, "ভূত প্রেত আমি মানি না। তোমার কোনও ভয় নাই, আমি সঙ্গে থাকিব।" তারপর উভয়ে একটি লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

এদিকে কারাগারে গেরাড কোনও প্রকারে দিবাভাগ কাটাইল। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় হইতে যেন শেষ আশার ক্ষীণ রেখাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেল, কারণ নগরপালের প্রদত্ত রুটি সে বিষপ্রয়োগের ভয়ে খাইতে ভরসা পায় নাই। ক্ষুধার তাড়নায় সাহসী লোকের হৃদয়ও দমিয়া যায়। বেচারী গেরাড সূর্য্যাস্তকাল হইতে নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে শূন্য মনে কাঠের বাক্সটির উপর বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। গেরাড যেন অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় সেই একই ভাবে বসিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটি কঠিন জিনিশের আঘাতের মত শব্দ হইল, এবং খর খর শব্দে উহা গড়াইয়া আসিয়া তাহার পায়ের নিকট পড়িল। গেরাডের সমস্ত দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল—তবে কি কেহ বাহির হইতে তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে? সে ভয়ে বাক্স হইতে নামিয়া তাহার পাশে গৃহতলে লুকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ যাবৎ আর কোনও শব্দ হইল না, তখন সে সাহসে ভর করিয়া হামাগুড়ি

দিয়া ভূপতিত জিনিসটি হাতে লইল এবং হাত বুলাইয়া বুঝিল উহা একটি তীর। কিন্তু তাহার অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ লৌহ ফলক নাই, একটি কোমল পদার্থ বাঁধা রহিয়াছে। তখন তাহার মনে অকস্মাৎ আশার সঞ্চার হইল। নিশ্চয়ই তাহার বন্ধু পক্ষের কেহ এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছে! গেরাড সর্ব্বদাই সঙ্গে চকমকি পাথর ও একখণ্ড সোলা রাখিত। এখন তাহার সাহায্যে আলো জ্বালিয়া সেই তীরটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, উহার সঙ্গে একগাছি রেশমী সূত্র বাঁধা রহিয়াছে এবং তীরগাত্রে কয়েকটি কথা লেখা আছে তাহা এই—

"প্রিয়তম! সূত্রের একপ্রান্তে তোমার ছুরিখানি বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দাও, অপর প্রান্ত ভাল করিয়া ধরিয়া রাখ, তারপর ধীরে ধীরে একশত গণনা করিয়া সূত্রখণ্ড উপরে টানিয়া লও।"

গেরাডের সমস্ত হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার দেহে যেন অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইল। সেই উত্তেজনার বশে সেই বৃহৎ বাক্সটি ঠেলিয়া সে গবাক্ষের নীচে লইয়া গেল, এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া গবাক্ষপথে নিম্নদিকে চাহিল।

জ্যোৎস্নালোকে কয়েকটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি ভূমিতলে সে দেখিতে পাইল। সে আনন্দে অধীর হইয়া মাথার টুপী খুলিয়া দোলাইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা দেখিতে পাইল বলিয়া মনে হইল না। তখন সে স্থিরভাবে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া উপদেশমত সূত্রে বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দিল এবং একশত গণনা করিবার পর অপর প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া উঠাইতে লাগিল,—কিন্তু সূত্রটি বড় ভারী ভারী বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে সূত্রের অপর প্রান্তে বাঁধা একগাছি সরু দড়ি তাহার হাতে পৌঁছিল, গেরাড দড়িগাছি ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, কারণ ইহার তাৎপর্য্য সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এমন সময়ে ভূতল হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"গেরাড, বিলম্ব করিও না! দড়িগাছি টানিতে থাক! ইহাই তোমার মুক্তি লাভের উপায়।" তখন সে পুনরায় নূতন উৎসাহে দড়িগাছি টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার হাতে আর একটি গ্রন্থি পৌঁছিল। তাহার সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা মোটা একগাছি দড়ি বাঁধা রহিয়াছে। এইটি টানিতে আরম্ভ করা মাত্রই গেরাড বুঝিল, ইহার সঙ্গে বিশেষ ভারী কোনও জিনিষ বাঁধা রহিয়াছে। তখন প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা সে বুঝিতে পারিল এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত অতি ক্লেশে সেই ভারী জিনিষটি টানিয়া উঠাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার ক্ষুধাকাতর দেহ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল,

সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল, বেদনায় দুই হস্ত যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল! কিন্তু ইচ্ছার দৃঢ়তায় নির্ভর করিয়া সবলে দড়িগাছি ধরিয়া রাখিয়া সে আর একবার জানালার পথে নীচের দিকে চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। গেরাড দেখিল যেন ভূপৃষ্ঠের অন্ধকার হইতে একটি বিরাট অজগর ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রায় তাহার জানালা পর্য্যন্ত আসিয়াছে! তখন সে একটি হর্ষধ্বনি করিয়া পুনরায় সবলে টানিয়া একটি স্থূল রজ্জুর প্রান্তভাগ হাতে পাইল। তাহার কতক অংশ টানিয়া ভিতরে আনিয়া সুদৃঢ়রূপে কাঠের বাক্সটির সঙ্গে ভাল করিয়া বাঁধিল, তারপর একটু দম নিবার জন্য কাঠের বাক্সটির উপর একবার বসিল। তখন তাহার মনে হইল, কাঠের বাক্সটি রজ্জুসহ তাহার ভার সহিতে পারিবে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। এই মনে করিয়া সে বাক্সটির উপর দাঁড়াইয়া দুই তিনবার লাফ দিল। তৃতীয়বার উল্লম্ফনের পর হঠাৎ বাক্সটির একটি পাশ খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে কতকগুলি জড়ান চর্ম্মপট বাহিরে গড়াইয়া পড়িল।

গেরাড প্রথমে ভীত হইল; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া বুঝিল বাক্সটি ভাঙ্গে নাই। বোধ হইল, কোনও গুপ্ত কলের উপর তাহার পা পড়াতে খুলিয়া গিয়াছে। তবুও তাহার মনে সন্দেহ হওয়াতে সে জানালার লৌহদণ্ডটি দড়ির সহিত বাঁধিয়া জানালার ফ্রেমের গায়ে আড়ভাবে বসাইয়া দিল। তারপর একবার ভগবানের নাম করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ পথে জানু পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিয়া জানালার ফ্রেমে সাবধানে রক্ষিত বাহুর উপর ভর করিয়া ঝুলিয়া পড়িল। সেই নৈশ নীরবতার মধ্যে তাহার নিজ বক্ষের দ্রুত স্পন্দনধ্বনি পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট তাহার কর্ণে পৌছিতে লাগিল।

একবার নীচের দিকে সে চাহিয়া দেখিল—সে যে অতি দূর—অতি দূর! কিন্তু সম্মুখে কারাগারের বিভীষিকা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে আবার সাহস হইল। স্নিগ্ধ নৈশ সমীর স্পর্শে তাহার উত্তপ্ত দেহ শীতল হইয়া আসিতেছিল। গেরাড ভাবিল, যখন উভয় দিকেই সঙ্কট, তখন স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় যদি প্রাণ যায়—সেও ভাল। তখন আর একবার ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দুই পায়ে অনুভব করিয়া দড়িগাছি ভাল করিয়া জড়াইয়া লইল—তারপর বামহাতখানি বাহিরে আনিয়া লৌহদণ্ডটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ধীরে ধীরে বক্ষ ও মস্তক জানালার ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিল। তারপর দক্ষিণ হস্তে লৌহদণ্ডটি ধরিয়া

বাম হাত উঠাইয়া দড়ি গাছি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু উপরের দিকে উহা দেয়ালের গায়ে এরূপভাবে লাগিয়া রহিয়াছে যে ধরা গেল না। কাজেই নীচের দিকে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে প্রায় হাঁটুর নিকটে আসিয়া ধরিবার সুবিধা পাইল। অবশেষে দক্ষিণ হস্ত চকিতে ছাড়িয়া দিয়াই ঐ হাতে দড়ি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ধরিবার পূর্ব্বেই বেগে নীচে কতক দূর নামিয়া পড়িল। তখন নীচ হইতে একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদধ্বনি তাহার কর্ণে পৌছিল। গেরাড চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া দৃঢ়তার সহিত দক্ষিণ হস্তে দড়িগাছি চাপিয়া ধরিল। এই ভাবে দুই তিন হাত নীচে নামিয়া ক্রমে সে বেগ সম্বরণ করিল। তখন ধীরে ধীরে এক হাতের পর এক হাত নীচে নামাইয়া দড়ি বাহিয়া সে নামিতে লাগিল। ক্রমে একটি একটি করিয়া দেয়ালের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলি যেন উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। গেরাডের মনে হইল যেন অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে, তাই একবার উপর ও নীচের দিকে চাহিয়া লইল। উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকারাজি দীপ্তি পাইতেছে, চন্দ্ররশ্মিতে তাহার অদূরবর্ত্তী কারাকক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষটি দেখা যাইতেছে—কিন্তু নিম্নে এ কি!—সেই মনুষ্য মূর্ত্তিগুলি এখনও সেইরূপই অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—সে যে অতি দূর—অতি দূর! সম্মুখের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া গেরাড নীচে নামিতে লাগিল—ক্রমে আরও নীচে—আরও নীচে—!

রজ্জুর ঘর্ষণে গেরাডের হাত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বেদনায় জ্বলিতে লাগিল। আর একবার উর্দ্ধে চাহিয়া সে দেখিল; এবার জানালা বহুদূরে দেখা গেল। তারপর আবার নীচে নামিতে লাগিল—আরও নীচে—আরও নীচে—!

বহুক্ষণ পরে আবার গেরাড উপরের দিকে চাহিল! এবার জানালা নিতান্ত অস্পষ্টরূপ দেখা গেল—তখন ভরসা করিয়া সে নীচের দিকে চাহিল, দেখিল প্রায় কুড়ি হাত দূরে মার্টিন ও মার্গারেট নীরবে উর্দ্ধনেত্রে বাহু উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এখন তাহাদিগকে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—তাহাদিগের ভীতি-বিস্ফারিত নেত্র ও উন্মুক্ত দশন-পংক্তি হইতে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে!

মার্গারেট অমনি ভীতি-সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "গেরাড! গেরাড! সাবধান—নীচে চাহিও না!"

"আর ভয় নাই"—এই বলিয়া গেরাড দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুইদিক হইতে দুইজন

গেরাডকে ধরিয়া ফেলিল এবং তিনটি প্রাণী এক সুদীর্ঘ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল! কিছুক্ষণ পরে মার্গারেট সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "প্রিয়তম! চুপ—কথা কহিও না। চল এখন নিরাপদ স্থানে যাই।"

তখন তিনজনে দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় লুকাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাহারা দেয়ালের একটি মোড়ের নিকট পৌঁছিল—তখন অকস্মাৎ অপর পার্শ্ব হইতে একটি আলোকরশ্মি পথের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগের পথ অবরোধ করিল। অদূরে দেয়ালের পশ্চাতে মনুষ্যকণ্ঠ এবং পদধ্বনি শ্রুত হইল।

মার্টিন সভয়ে বলিল, "পিছনে যাও!—ছায়ায় লুকাও!"

দ্রুতপদে তাহারা পুনরায় ফিরিয়া চলিল,—বিলম্বিত রজ্জুটির পার্শ্ব দিয়া আরও পশ্চাতে দেয়ালের আর একটি মোড়ের অন্তরালে যাইয়া তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময়ে আলোকরশ্মিটি যেন তাহাদিগেরই সন্ধানে সেইদিকে একবার ছুটিয়া আসিল, ক্ষণকাল পরেই আবার অন্যদিকে পড়িয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার্টিন বলিল, "ও যে লণ্ঠনের আলো! তবে রক্ষীরা আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছে!"

গেরাড দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার ছুরিখানি দাও। জীবিত থাকিতে আমি কখনও ধরা দিব না!"

মার্গারেট কাতর কণ্ঠে বলিল, "না—না—তুমি স্থির হও। কাকা, এখান হইতে বাহিরে যাইবার কি আর অন্য পথ নাই?"

মার্টিন উত্তর করিল, "না, অন্য পথ আর নাই। এখন চিত্ত দৃঢ় কর। ছয়টি শত্রুর প্রাণ আমার হাতেই আছে।" এই বলিয়া মার্টিন হাতের ধনুকটি ঠিক করিয়া তাহাতে একটি তীর যোজনা করিতে করিতে পুনরায় বলিল, "দেখ, যুদ্ধের নীতি এই—শত্রুকে প্রথম আক্রমণ করিবার সুযোগ কখনও দিতে নাই। তাহারা আমাদের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই আমি অন্ততঃ দুই একটিকে ধরাশায়ী করিবই।" মার্টিন ধনুকের জ্যা আকর্ণ টানিয়া ধীরে ধীরে দেয়ালের মোড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

মার্গারেট ও গেরাড কখনও নরহত্যার ব্যাপার চক্ষে দেখে নাই। সেই ভীষণ দৃশ্যের কল্পনাতে তাহাদের বক্ষের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া আসিল।

কিন্তু ও কি? মার্টিন মোড়ে পৌঁছিয়া ওরূপ কাঁপিয়া উঠিল কেন?—

তাহার হাত হইতে তীরধনু যেন স্খলিত হইয়া পড়িল! সে অমানুষিক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। মার্টিন আসিয়াই গেরাডকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি রক্তমাংসে গড়া মানুষ ত? একবার ধরিয়া দেখি; মানুষের সহিত লড়াই করা যায়, কিন্তু এ ভূতের বাড়ী—সব ভূতের কাণ্ড—ভূতের কাণ্ড!"

মার্টিনের ভয় সংক্রামক হইয়া উঠিল। সকলেই এই নূতন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। মার্গারেট রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল।

"চুপ—চুপ—তোমার কথা শুনিতে পাইবে। দেয়ালের উপর—দেয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতেছে—মাথাটা জ্বলন্ত আগুণ—মানুষ যেমন মাটির উপর হাঁটিয়া যায়, সেইরূপে খাড়া দেয়ালের উপর দিয়া হাঁটিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে! গেরাড! তুমি ব্রহ্মচারী। যদি কোনও মন্ত্র জান, শীঘ্র তাহা প্রয়োগ কর! আজ রাত্রে নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, প্রেতযোনি সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে।"

গেরাড কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমি দীক্ষিত ব্রহ্মচারী—গুরু আমাকে ভূতাপসরণ মন্ত্র দিয়াছেন—আমি ভূতের নিকট যাইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিব।"

"তবে তুমি একাই যাও। আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি না—একবার দেখিয়া যে এখনও প্রাণটি আছে—তাই যথেষ্ট।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কারাদণ্ডে এবং কারাগৃহে নগরপালের হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া গেরাড স্থির বুঝিয়াছিল যে নগরপাল তাহার প্রাণঘাতী শত্রু। গেরাডের মনে হইতে লাগিল, হয়ত ভূত প্রেত কিছুই নয়, সে এখনও কারাকক্ষে আবদ্ধ আছে মনে করিয়া নগরপাল তাহার প্রাণবধ করিবার জন্য বোধ হয় নূতন কোনও কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। গেরাড এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দেয়ালের মোড় পার হইতেই একখানি কোমল বাহুলতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন গেরাড চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—মার্গারেট আসিয়াছে!

মোড় পার হইয়া উভয়ে সভয়ে কারাকক্ষের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের দেহ আড়ষ্ট হইয়া আসিল। মার্টিন যেরূপ বলিয়াছে, ঠিক

তাই। একটি অদ্ভুত জীব—মাথাটা যেন জলন্ত আগুন—যেন একটা অতিকায় জোনাকী পোকা—হাঁটিয়া দেয়াল বাহিয়া উপরে চলিয়াছে,—সেই উচ্চ গবাক্ষের প্রায় অর্দ্ধপথের উপরে উঠিয়াছে। নিম্নে একটি শুভ্র পদার্থ দেখা যাইতেছে,—যেন একটি শুক্লবসনা নারীমূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম হয়। গেরাড অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দড়ি—দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট জোনাকী পোকাটি জানালায় পৌঁছিয়া কারাকক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল ঈষৎ লোহিত আলোকশিখা গবাক্ষপথে নির্গত হইয়া তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল। নিম্নে সেই শুভ্র পদার্থটি স্থির ও নিশ্চল!

অতিমানুষিক ভয়ের প্রথম আক্রমণে লোকে সাধারণতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণরূপে চেতনা হারায় না, তাহাদিগের উপর এই ভয়ের ক্রিয়া অনেক সময় বড়ই আশ্চর্য্যরূপ ধারণ করে। সর্পের দৃষ্টিতে আড়ষ্ট হইয়া পক্ষী যেরূপ বেগে আসিয়া সর্পের উপর পতিত হয়, এইরূপে অর্দ্ধচেতন ভয়াবিষ্ট ব্যক্তি অনেক সময় বেগে আসিয়া ভীতিউৎপাদক পদার্থের উপরেই পতিত হয়। মার্গারেটের মনে এই ভয়ের ক্রিয়াও সেইরূপ ভাব ধারণ করিল। সে ধীরভাবে গেরাডের হাত ছাড়াইয়া কিছুক্ষণ যেন জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর অকস্মাৎ একটি চীৎকার শব্দ করিয়া বেগে সেই শুভ্রভূতটির দিকে ধাবিত হইল। গেরাড মনুষ্য চিত্তের এই রহস্য অবগত না থাকায় বিবেচনা করিল—ভূতই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল! সে কম্পিত কলেবরে জানুপাতিয়া গুরুদত্ত ভূতাপসরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল!

গেরাড প্রাণপণে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে হঠাৎ শুনিতে পাইল, শুভ্র ভূতটি একটি ভীতিসূচক কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন গেরাডের মনে আশার সঞ্চার হইল—তবে ভূতেরও ত ভয় আছে, নিশ্চয়ই এ তাহার মন্ত্রের প্রভাব! সে আরও দৃঢ়তার সহিত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখিল, যেন শুভ্রভূতটি মার্গারেটের পায়ের নীচে গড়াইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

কিটি ও গাইল কিরূপে গেরাডের সন্ধানে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাহারা ক্রমে কারাগারের পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া পৌঁছিল, এবং একগাছি রজ্জু উচ্চ কারাকক্ষ হইতে ঝুলিতেছে দেখিতে পারিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল।

গাইল ব্যাপার দেখিয়া বলিল, "আমার বোধ হয় গেরাড এই দড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া পলাইয়াছে। কি বল দিদি—একবার দেখিয়াই আসি না কেন ?"

কিটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না—না—গাইল, ও দড়ি স্পর্শ করিস্ না। গেরাড এই দড়ি কোথায় পাইবে ? এত মোটা দড়ি নীচ হইতেই বা কিরূপে ঐ উচ্চ আকাশে উঠিবে ? এ সকলই শয়তানের কুহক। তুই কিনা যা কিছু জিনিশ হউক—বাহিয়া উপরে উঠিতে ভালবাসিস্, তাই তোর সর্ব্বনাশের জন্যই শয়তান এই মায়া রজ্জু সৃজন করিয়া রাখিয়াছে, তুই স্পর্শ করিলেই তোকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। হায় হায়! আজ রাত্রে কি নরকের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে ? চতুর্দ্দিকেই কি ভূত প্রেত বিচরণ করিতেছে ? হে স্বর্গের দেবতারা! আজ আমাদিগকে রক্ষা কর।"

বামন গাইল বড় রাগ করিয়া বলিল, "বুদ্ধি ত তোর খুব! আরে, নরক হইল পাতালে,—এই দড়ি গিয়াছে স্বর্গের দিকে। তবে আবার শয়তানের মায়া কিরূপে হইতে পারে ? দিদি, অনেক বার দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছি—কিন্তু এমন খাসা দড়ি এত উচুতে উঠিয়াছে, এমন সুযোগটি আর কখনও পাই নাই। জীবনে আর হইবে কিনা, তারই বা বিশ্বাস কি ? এমন সুযোগটা হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিব—তাও কি হয় ? তোর কোনও ভয় নাই, তুই নীচে দাঁড়া, আমি একবার উপরটা দেখিয়া আসি।"

কিটি দেখিল, বামন গাইল যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোনও বাধাই মানিবে না, তাই অগত্যা সে বলিল, "তবে এই লণ্ঠনটা সঙ্গে লইয়া যা, শুনিতে পাই আলোর কাছে ভূত প্রেত আসে না।"

গাইল লণ্ঠনটি গলায় বাঁধিয়া লইয়া মহা উৎসাহে দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিছু দূর উঠিতেই তাহাকে একটি বড় জোনাকী পোকার মত দেখা যাইতে লাগিল। বেচারী কিটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উর্দ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ অন্ধকার দেয়ালের প্রস্তরগাত্র ভেদ করিয়া যেন একটি নারীমূর্ত্তি অতিমানুষিক বেগে তাহার দিকে আসিতে লাগিল। কিটি একটি মাত্র কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার বাক্শক্তি রহিত হইয়া গেল। মূর্ত্তিটি নিকটে আসিয়া পৌঁছিল; কিটি অবলম্বন-যষ্ঠি ফেলিয়া দিয়া জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িল, এবং ভয়ে মুখ আবৃত করিয়া নিতান্ত মিনতি সহকারে বলিল, "লও, আমার প্রাণ লও! কিন্তু আমার আত্মার কোনও অনিষ্ট করিও না!"

মার্গারেট কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অঁা। তুমি একজন স্ত্রীলোক ?"

কিটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "অঁা! তুমিও ত একজন স্ত্রীলোক দেখিতেছি ?"

মার্গারেট কহিল, "তুমি আমাকে এত ভয় দিয়াছ ?"

কিটি উত্তর করিল, "তুমিই কি আমাকে কম ভয় দিয়াছ ?"

"বড় আশ্চর্য্যের কথা—তা তোমার ঐ আগুন-জ্বলা মাথার জিনিশটি কি ? তুমি ত দেখিতেছি একটি সাধারণ স্ত্রীলোক—ওটি ত তোমারই সঙ্গে ছিল ? আর এত রাত্রেই বা তুমি এখানে কেন ?"

"তাইত। তুমিই বা এখানে কেন ?"

"তবে বোধ হয় আমরা উভয়েই এক উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছি—আচ্ছা তোমার নাম—কিটি নয় কি ? আর তুমি তোমার ভাইকে খুব ভালবাস—কি বল ?"

"আর তোমার নাম মার্গারেট ব্রান্—আর তুমিও আমার ভাইকে খুব ভাল-বাস—কি বল ?"

"তবে তাই হবে।"

"তা বেশ—তুমি তাকে ভালবাস—তুমিই যখন এখানে, তবে গেরাড নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়াছে—গাইলের অনুমানই ঠিক।"

এমন সময়ে গেরাড সেখানে পৌঁছিল,—সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিল। কিন্তু গেরাড কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই উৰ্দ্ধ আকাশ হইতে ধ্বনিত হইল—"চর্ম্মপট। বিস্তর চর্ম্মপট!! রাশি রাশি চর্ম্মপট!!!"

এই ধ্বনির সঙ্গে চতুর্দ্দিকে দুপ্‌দাপ শব্দে শুভ্র চর্ম্মপট রাশি যেন কড়কাধারার ন্যায় পড়িতে লাগিল। উপর হইতে ধ্বনি আসিতেছে—"আরও চর্ম্মপট" "আরও চর্ম্মপট"—আর চতুর্দ্দিকে দুপ্ দাপ শব্দে রাশি রাশি চর্ম্মপট আসিয়া পড়িতেছে—কিছুক্ষণের মধ্যে চতুর্দ্দিকের তৃণক্ষেত্র শুভ্রবর্ণের চর্ম্মপটে শোভিত হইল। ক্রমে উৰ্দ্ধে সেই জ্বলন্তমস্তক-বিশিষ্ট জীবটি দেখা দিল ও দ্রুতবেগে দড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল—যেন একটি উল্কা ভূতলে বেগে আসিতেছে। অবশেষে লণ্ঠন শোভিত বামন গাইল সকলের সমক্ষে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

বামনের ব্যবসায়ী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল, সে আসিয়াই ভ্রাতার নিকট চর্ম্মপট-রাশির মূল্য দাবী করিল—কেননা এ সব তাহারই কাজে লাগিবার কথা।

গেরাড বলিল, "চুপ! অত জোড়ে কথা বলিস্ না—তা এ গুলি সংগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে চল্—দাম পাইবি।"

"সে ভয় আমি করি না। তুমি কি মনে কর এ ঘটনার পরেও আমি আর টরগো সহরে বসিয়া থাকিব? নগরপাল আমার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, ইহার প্রতিফলে সুযোগ পাইলে আমি তাহার প্রাণ নিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।"

"ছিঃ গেরাড! ও কি কথা?"

"কেন? জীবনের মূল্য কি স্বাধীনতার অপেক্ষা বেশী? যখন তাহার প্রাণ নেওয়ার সুযোগ এ যাত্রায় হইল না, কাজেই তাহার যাহা কিছু পাওয়া গেল, তাহা কেন ছাড়িব?"

এই কথা বলিয়া গেরাড গাইলকে কয়েকটি টাকা দিয়া বিদায় করিল, এবং চর্ম্মপটের বস্তা লইয়া সঙ্গীদিগের সহিত সেভেনবাগের দিকে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

আবাহন।

এস গো জননি মোর, এস আনন্দে
কুটীরে দীন বঙ্গে—
ল'য়ে সঙ্গে
অযুত ভকতি গীতি বন্দ'!
ছাপি' দিগন্ত বিগলিত করুণা
সিঞ্চি' অমৃত শারদ রঙ্গে,

এস বিলসিত-লাস্যে, উজল হাস্যে,
পুলকিতা চণ্ডিকা ভঙ্গে,
এস গো জননী মোর,
কুটীরে দীন বঙ্গে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন বসু।

আগমনী।

(গীত)

সারা জীবন ধরে উমা, আছি মা তোর পথ চেয়ে। (আয়-মা!)
আয় মা, এ দীন হীনের, ভাঙা ঘরে রাঙা মেয়ে। (আয়-মা!)
আনন্দ সিন্দুর বিন্দু সীমন্ত সীমায়;—
কল্যাণ কঙ্কণ দয়া, দশ ভুজে শোভা পায়; (আয়-মা)
ভূষিত কুসুমহারে, চর্চ্চিত চন্দন ধারে;
শোভিত অভয়পদ আরক্তিম জবা দিয়ে॥ (আয়-মা!)
শূন্য এ হৃদয়াসন, এসে দে মা দরশন,
হেরি রূপ অতুলন, জুড়াই তাপিত হিয়ে॥ (আয়-মা!)

দেওয়ানা ব্রজেন্দ্রমোহিনী

সাময়িক ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

শক্তি আবাহন।

এস মা শক্তি! বাঙ্গলায় এস, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এস, বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে এস। বৎসরান্তে সর্ব্ব-দেবদেবী-পরিবৃতা মহামহিমাময়ী দশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তিতে বাঙ্গালী তোমায় পূজা করিবে,—এস মা, তার পূজা গ্রহণ কর, তার পূজা সার্থক কর, তোমার অমৃত আশীর্ব্বাদে তাকে ধন্য কর। পূজার মানস করিয়া তোমারই লীলাকীর্ত্তনে বাঙ্গালী তোমার বোধন আরম্ভ করিয়াছে—প্রবুদ্ধ হও মা! বাঙ্গালা ভরিয়া মণ্ডপে মণ্ডপে তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে—প্রাণে প্রাণে তোমার চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠ মা।—জাগমা শক্তি—বাঙ্গালীর প্রাণে জাগ, বাঙ্গালীর কর্ম্মে জাগ, বাঙ্গালীর বিদ্যায় জাগ, সম্পদে জাগ, শৌর্য্যে জাগ, সিদ্ধিতে জাগ! বাঙ্গালীর শক্তি সাধনা—জাগ্রত শক্তি মা—তোমার প্রসাদে পূর্ণ হউক! তোমার এই মহিমাময়ী মূর্ত্তিতে বার্ষিক মহোৎসবে এ জগতে এক বাঙ্গালীই তোমাকে পূজা করে,—জাগ মা, বাঙ্গলায় তবে জাগ, তোমার জাগ্রত নয়নের অমৃত দৃষ্টিতে বাঙ্গলার পানে চাও। এস মা—জাগ্রত প্রাণে বাঙ্গলায় তবে এস, তোমার সেই প্রাণের স্পর্শে বাঙ্গালীর বোধন প্রাণময় হউক, পূজা প্রাণময় হউক, মন্ত্র প্রাণময় হউক, অঞ্জলি উপহার বলি—সব প্রাণময় হউক! বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর সমাজ—মহাশক্তি! তোমার প্রাণে প্রাণময় হউক! সমস্ত বাঙ্গলা তোমার পুণ্যময় পূজা পীঠে, তোমার পুণ্যপ্রাণময় মহাতীর্থে পরিণত হউক! জগৎ যেন তোমার মহামহিম লীলা দেখিতে, তোমার জাগ্রতধর্ম্ম শিখিতে, তোমার পুণ্য প্রাণের স্পর্শ পাইতে—তোমাতে উদ্বুদ্ধ তোমাতে প্রাণপ্রাপ্ত, তোমাময়-বৃত্ত, তোমার মহিমায় মহিমান্বিত, তোমারই এই বাঙ্গালার দিকে চায়, আকুল হইয়া বাঙ্গলার পানে ধায়!

স্বর্গের দেবগণও যেন এই বাঙ্গলাতে সত্যই তোমার অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিবপর্ব্বতম্" রূপ দেখিয়া বিস্মিত মুগ্ধ ও পুলকিত হন, সত্যই একদিন যেমন—

> "জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামুচুঃ সিংহবাহিনীম্।
> তুষ্টুবুর্ম্মুনয়-শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥"

আবার যেন তেমনই হয়! সমগ্র জগৎ যেন বাঙ্গলাতেই আবির্ভূতা, বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে বিরাজিতা—তোমার এই মহামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া যুক্ত-করে বলিতে পারে—

> "প্রাচ্যাং রক্ষ প্রাতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
> ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥"

এস মা তবে—এস—জাগ্রতরূপে এস! এস মা—তোমাতেই জাগ্রত প্রাণে আজ তোমাকে নমস্কার করি—

অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ!
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥

শেষ এই প্রার্থনা মা—

"বিশ্বেশ্বরা ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়িভক্তিনম্রাঃ॥"

সত্যই তোমাতে ভক্তিনত হইয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিশ্বের আশ্রয় হউক!

বাঙ্গলায় যুগান্তর।

বাঙ্গলায় সত্যই এবার যুগান্তর আসিল। বহুকাল বাঙ্গালী যাহা দেখে নাই, কিছুকাল পূর্ব্বেও স্বপ্নের অতীত বলিয়া যাহা বাঙ্গালীর মনে হইত, সেই দৃশ্য আজ বাঙ্গালী দেখিল! এতদিনে সত্যই বুঝি এ যুগে বাঙ্গালীর শক্তি-সাধনা সার্থক হইল! বাঙ্গালী সেনা রণসাজে সাজিয়া রণবাদ্যে নাচিয়া রণাঙ্গনে চলিল! সেদিন বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে, নব্যবঙ্গের শিক্ষার মন্দিরসমীপে সার্থকশিক্ষ বঙ্গীয় যুবকগণ বীরবেশে সাজিয়া সমবেত হইয়াছিল, বীরমদে বীর পাদক্ষেপে রাজপথ বাহিয়া স্বদেশবাসীর বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করিতে গিয়াছিল! বাঙ্গালীজীবনে শক্তির এই নবলীলা দেখিবার জন্য দুধারে রাজপথ লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। পুরাঙ্গনারাও গৃহের বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। যে অধিকারে বহুকাল বাঙ্গালী বঞ্চিত ছিল, যে সাধনার আকাঙ্ক্ষা ব্যথপ্রায় বেদনায় বাঙ্গালী কয়েকবৎসর যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছিল,—রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড চেম্‌সফোর্ডের কৃপায় সে অধিকার আজ বাঙ্গালী পাইল, আকাঙ্ক্ষিত সাধনা বাঙ্গালীর আরম্ভ হইল! লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুরকে আমরা কৃতজ্ঞ প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি! তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত এই উদারনীতি উদারতর হউক, উদারতার ধর্ম্মে তাহা চরমসাফল্যে পুরস্কৃত হউক!

অল্পদিন মাত্র বাঙ্গলার সহৃদয় লাট লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ঢাকায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, যুদ্ধের জন্য দুইটি বাঙ্গালী কোম্পানী গ্রহণ করা হইবে। কয়দিনের মাত্র কথা, এই সৈন্যদল গঠন করিবার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে,—ইহার মধ্যেই ১২০ জন, যতজন নেওয়া হইবে তার অর্দ্ধাধিক বঙ্গীয় যুবক দলভুক্ত হইয়াছেন,—আরও অনেকে দলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বহুকাল বাঙ্গালী যুদ্ধ কি তা দেখে নাই, যুদ্ধ কোলাহল তার কাণে আসে নাই, অস্ত্রচালনা দূরে থাক্, অস্ত্রধারণও সে করে নাই, অস্ত্রদর্শন পর্য্যন্ত কচিৎ তার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। অখণ্ড শান্তির মধ্যে অতি শান্ত কোমল নিরীহ ভাবেই তার জাতীয় জীবন কাটিয়াছে। সেই জাতির মধ্য হইতে আহ্বান মাত্র এতজন সদ্বংশজাত শিক্ষিত

যুবক যুদ্ধার্থে অস্ত্র ধরিতে অগ্রসর হইলেন! বাঙ্গালায় যে বাস্তবিকই এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, নূতন এক যুগের নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন প্রাণ, নূতন জাগরণ বাঙ্গালীর মধ্যে আসিয়াছে—ইহা তাহারই লক্ষণ!

সরকার বাহাদুর বাঙ্গালী সৈন্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, প্রথম যখন এই কথা ঘোষিত হইল, অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ইহা সফল হইবে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী যে প্রাণভয়ে রাজার এমন প্রয়োজনে যুদ্ধ করিতে চাহিবেনা, এরূপ আশঙ্কা কেহ করেন নাই। তবে এরূপ আশঙ্কা করিবার অন্যান্য কারণ ছিল। সরকার বাহাদুর জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে ভাবে যে নিয়মে সৈন্যদল গঠন করা হইয়া থাকে, সেইভাবে সেই নিয়মে এই বাঙ্গালী সৈনিক-কোম্পানী গঠিত হইবে। অন্যান্য প্রদেশের কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায় হইতে এই সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। বংশ পরম্পরা-গত সংস্কার বশতঃ সৈনিকবৃত্তি ইহারা আপনাদের স্বাভাবিকবৃত্তি বলিয়া মনে করে, ইহার প্রতিই ইহাদের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট,—তারপর সিপাহী হইয়া যে বেতন ইহারা পায়, যৎসামান্য হইলেও অন্য কোনও উপায়ে সে বেতনও ইহাদের পক্ষে দুর্লভ। ইহাব্যতীত কোনও রূপ উচ্চতর ভাবের প্রেরণা, উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য যে ইহাদের আছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বলিলে যে সম্প্রদায় বিশেষকে আমরা এখন বুঝি, সে সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ কোথাও সামান্য বেতনভোগী সিপাহী হইতে চান না। সৈনিকবৃত্তি যেখানে জীবিকার বৃত্তি মাত্র, সেখানে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত কেহ যে সিপাহী হইতে চাহিবেন, এরূপ সম্ভবও নয়।

বাঙ্গলার শিক্ষাবর্জ্জিত নিম্নতর শ্রেণী সমূহের মধ্যে এমন কোনও সম্প্রদায় দেখা যায়না, বংশপরম্পরাগত সংস্কার বশতঃ যাহারা এখন সৈনিকবৃত্তিতে আকৃষ্ট হইতে পারে। ইহাদের আর্থিক অবস্থাও এমন নয় যে সিপাহী সৈনিকের বেতন ইহাদের পক্ষে কোনও মতে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। ইহারা প্রায় সকলেই চাষী শিল্পী বা দিনমজুর, মাসে ১৫।২০ টাকা আয় কর্ম্মক্ষম সকলেই ইহাদের মধ্যে করিতে পারে। সৈনিকবৃত্তি আরামের বৃত্তি নয়, তারপর নানারূপ বিপদের আশঙ্কাও আছে। এরূপ অবস্থায় উন্নত কোনও ভাবের প্রেরণা ব্যতীত ডাকিলেই কেহ যে স্বেচ্ছায় সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা আদৌ নাই। তবে শিক্ষিত ভদ্রসমাজভুক্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এখন একটা উন্নতভাবের প্রেরণা আসিয়াছে, প্রজার অধিকার, মনুষ্যত্বের অধি-কার ভোগের জন্য একটা উন্নত আকাঙ্ক্ষা তাহাদের জাগিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধে রাজারক্ষায় বাঙ্গালীর সহায়তা চাহিলে সে সহায়তা সরকারবাহাদুর এই সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী হইতেই পাইতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মের অবসরে ইঁহারা স্বেচ্ছাসৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, দেশরক্ষার জন্য মিলিয়া দলভুক্ত হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন, সৈনিককর্ম্মচারীর পদে আকৃষ্ট হইতে পারেন,—কিন্তু ১২।১৪ টাকা মাত্র বেতনে সিপাহী যে হইতে চাহিবেন, এরূপ অনেকে প্রথমে মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু বড় আনন্দের কথা এই যে—কি হইতে

পারে না পারে, ইহার আলোচনার অবসরও হইল না,—যেমন ডাক পড়িল, বঙ্গীয়যুবকগণ অমনই সিপাহীদলভুক্ত হইতে অগ্রসর হইলেন! সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন!

প্রজার ও মনুষ্যত্বের উন্নত অধিকারলাভে বঙ্গীয় যুবকগণের আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য বাস্তবিকই এত বড় হইয়াছে, যে যাহাতে আকর্ষণ এমন কিছুই নাই, এই অধিকারলাভের সামান্য সূচনা মাত্র দেখিয়াই যুবকগণ প্রাণের আগ্রহে তাহাই আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছেন! ভারতে—ভারতে কেন—জগতের আর কোথাও যাহা সম্ভব হইত না, বাঙ্গালায় তাহা সম্ভব হইল। সত্যই বলিতে হয়, বাঙ্গলায় যুগান্তর আসিয়াছে,—নূতন যুগের নূতন প্রাণে বাঙ্গালী জাগিয়াছে। নবীন ঊষার আলোকে নব জাগ্রত বাঙ্গালীর সম্মুখে যে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের পথ আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন সাধনায় সিদ্ধ বাঙ্গালী জগতের বরেণ্য হউক, বাঙ্গালীর শক্তিতে বাঙ্গালীর গৌরবে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তিমান্ ও গৌরবান্বিত হউক্।

বাঙ্গালীর শক্তি ও ইংরেজরাজ।

বাঙ্গালী চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী, রাজসরকার-প্রবর্ত্তিত আধুনিক শিক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যে বহুল বিস্তারলাভ করিয়াছে; করিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধিশক্তিকে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি মেধা ও দৃঢ় মানসিক শ্রম যেসকল কার্য্যে প্রয়োজন, সে সব কার্য্যে বাঙ্গালীর যোগ্যতার ন্যায় যোগ্যতা এখন পর্য্যন্ত ভারতের কোনও প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে বড় দেখা যায় না। রাজসরকারও তাহা বেশ অনুভব করিতে পারেন। বিদ্যা ও প্রতিভাবলে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রভৃতিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের শক্তিতেই যে বাঙ্গালী কেবল শ্রেষ্ঠ তা নয়,—হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহের অধিকারেও বাঙ্গালী আর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। বাঙ্গালী সহৃদয়, করুণচিত্ত ও স্নেহপরায়ণ। পরিচিত ও প্রতিবেশীর মধ্যে বাঙ্গালী সরলভাবে প্রীতির বিনিময় করিয়া বড় আনন্দে ও শান্তিতে থাকিতে পারে। আপদবিপদে পরস্পরের সহায়তায় কিছুতেই কুণ্ঠিত সে কখনও হয় না। সরল প্রীতিময় ব্যবহার কাহারও নিকট পাইলে, অকপট বিশ্বাসে কেহ তাহার উপরে নির্ভর করিলে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার সেবা করিতে পারে। ছলচাতুরী, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালীর মধ্যে নাই, এ কথা বলি না। মানুষ যেখানে আছে, সেখানেই মানুষের স্বাভাবিক দোষ ত্রুটি সব দেখা যাইবে। তবে এ সব ত্রুটি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যে বেশী একথা স্বীকার করিতে পারি না। এসব যেমনই থাক, যে সব গুণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সব গুণও যে বাঙ্গালীচরিত্রের বিশেষত্ব, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে একটি বড় ত্রুটি বাঙ্গালীর আছে বলিয়া এতদিন শুনিতাম। বাঙ্গালী সাধারণতঃ ব্যায়ামবিমুখ, দেহে বাঙ্গালী কোমল ও দুর্ব্বল, পুরুষোচিত বলবীর্য্যশৌর্য্যাদি বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন দেখা যায় না,—তাই বাঙ্গালী ভীরু ও রণকুণ্ঠ, মরণের নামে বাঙ্গালী শিহরিয়া উঠে।

প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধে আত্মরক্ষায় বা দেশরক্ষায় বাঙ্গালী কখনও সাহস দেখাইতে পারে না—ইত্যাদি। এই সব অপবাদের কতক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অধুনা বাঙ্গালী সাধারণতঃ ব্যায়ামবিমুখ, দেহে দুর্ব্বল ও কোমল, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি পুরুষোচিত ধর্ম্মেরও অনেকটা অভাব তার মধ্যে দেখা যায়। তাই বলিয়া এরূপ বলা যায় না যে বাঙ্গালীর স্বভাবেই এমন কোনও অভাব আছে, যাহাতে বাঙ্গালীচরিত্রে এই ধর্ম্মের বিকাশ আদৌ হইতেই পারে না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী সাধারণতঃ যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিতেছে, যেরূপ অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে, তাহাতে এই সব পুরুষোচিত ধর্ম্ম বাঙ্গালীর মধ্যে বিকাশ পাইবার তেমন অবসর পায় নাই। অনুকূল শিক্ষাদীক্ষা পাইলে, অনুকূল অবস্থার প্রভাবে আসিলে, অন্যান্য জাতির মধ্যে যেমন, বাঙ্গালীর মধ্যেও তেমনই পুরুষোচিত ধর্ম্মের উন্মেষ হইতে পারে। পুরুষানুক্রমিক সংস্কার বাঙ্গালীর এরূপ নাই বটে,—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় ও অনুকূল অবস্থায়, এই ধর্ম্মের বিকাশ কঠিন হইলেও অসম্ভব কখনও হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ—সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বহু বঙ্গীয় যুবক যুদ্ধের ডাকেই সানন্দ উৎসাহে সামান্য সিপাহী হইয়াও যুদ্ধে যাইতে অগ্রসর হইয়াছেন।

এইস্থলে একটি কথা বলা যাইতে পারে। শৌর্য্যবীর্য্যাদির অভাব ইত্যাদি লইয়া যতই অভিযোগ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কেহ করুন, বাঙ্গালীর মরণকুণ্ঠতা আর কোনও জাতি অপেক্ষা অধিক কখনও ছিল না, এখনও নাই। যুদ্ধই একমাত্র মরণের পথ নহে,—বহু এমন পথ মানবজীবনে রহিয়াছে। যুদ্ধের শিক্ষা দীক্ষা বাঙ্গালীর নাই, যুদ্ধের অভ্যাস নাই, তাই অস্ত্রাঘাতে ও অস্ত্রাঘাত-জাত মরণের নামে বাঙ্গালী কিছু শিহরিয়া উঠে। কিন্তু রোগীর সেবায়, বিপন্নের সহায়তায়, যেসব কর্ম্মের দিকে তার স্বাভাবিক করুণ কোমল চিত্ত আপনা হইতেই ধাবিত হয়, যে সব কর্ম্মে সে পরিচিত ও অভ্যস্ত, তাহাতে মরণ নিশ্চিতপ্রায় জানিয়াও বাঙ্গালী অগ্রসর হইতে পারে। কঠিন সংক্রামক রোগী বাঙ্গালায় শুশ্রূষার অভাবে পথে বা একা ঘরে বড় পড়িয়া থাকে না, এইরূপ রোগে মৃত শব কখনও বাঙ্গলার ঘরে পচে না। রোগে যখন বাঙ্গালী মরে, শান্তচিত্তে পরলোকের দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণের একটা ভাব যেমন বাঙ্গালীতে দেখা যায়, এমন যে বহু জাতির লোকের মধ্যে দেখা যায় না, এ কথা বিদেশীরাও স্বীকার করেন। তারপর ভাল হউক মন্দ হউক—এখনও যে দেশের নারীরা হেলায় অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারে, সে দেশের নারীর সন্তান স্বভাবতঃই মরণকুণ্ঠ—একথা অশ্রদ্ধেয়।

বিদ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মতৎপরতা, সরল সহৃদয়তা, প্রভুভক্তি, প্রভৃতি গুণে বিবিধ কঠিন রাজকার্য্যে যে বাঙ্গালী ইংরেজ রাজসরকারের বড় সহায় এ কথা রাজপুরুষগণও স্বীকার করিবেন। তবে বহুকাল অবধি বাঙ্গালী রণবিমুখ, বাঙ্গালীতে শৌর্য্যবীর্য্যাদি পুরুষোচিত ধর্ম্মের অনেকটা অভাব দেখা যায়,—তাই সামরিক বৃত্তিতে রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর তেমন সহায়তা রাজসরকার পান নাই—(চানও নাই)। তাও যে চাহিলেই কতটা পাইতে পারেন, তারও পরীক্ষা

এবার হইল। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর মধ্যে নূতন একটা সম্ভাবনা যে দেখা গেল, নূতন দিকে প্রাণময় নূতন উদ্যমের যে একটা পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে বলা যাইতে পারে, যে যত্ন করিলে এই দিকেও বাঙ্গালী রাজসরকারের বড সহায় হইতে পারেন। কিন্তু যত্ন করিতে হইবে,—যে নূতন শক্তির বীজ বাঙ্গালীর মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছে দেখা গেল, সেই বীজ যত্নে ফলপুষ্পশোভিত বৃহৎ দৃঢ় বৃক্ষে পরিণত করিয়া নিতে হইবে।

দুই চারিশত বঙ্গীয় যুবক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই এ কথা বলিতে পারিনা যে ডাকিবামাত্র সহস্র সহস্র যুবক রণোন্মাদনায় প্রমত্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এখনই ছুটিয়া আসিবেন। বহুকাল যাবৎ রণবিমুখ জাতি সহসা একদিনে রণোদ্যত বা রণকুশল হইয়া উঠেনা, বহুকালের শিথিল স্নায়ুপেশী একদিনে সামরিক জীবনের কঠোরতা সহিবার মত সবল ও দৃঢ় হয় না। যে যুবকগণ প্রথমে সৈনিক বৃত্তিগ্রহণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া যোদ্ধৃজীবনের কঠোরশ্রম সহিতে, সকল বিপদকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা ইহাই দেখাইলেন যে শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণ কেবল শান্ত শাসনকার্য্য পরিচালনায় নয়, সমরে রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যেও রাজার কত বড় সহায় হইতে পারেন—যদি রাজ-সরকার সকল প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে এই কার্য্যের যোগ্য করিয়া নিতে পারেন, যে নূতন প্রাণের উন্মেষ তাহাদের মধ্যে হইয়াছে, সেই প্রাণকে যদি তার যোগাকর্ম্ম সাধনায় গড়িয়া নিতে পারেন। যদি না পারেন, শিক্ষিত উন্নতসমাজভুক্ত বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য চিরদিন অটল ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

সেবা সমিতি ও গ্রামসেবা।

সেদিন কলেজস্কোয়ার থিওসফিক হলে, যশোহর খুলনা সেবাসমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। যশোহর খুলনা অঞ্চলের যুবক ছাত্রগণ যাঁহারা কলিকাতায় অধ্যয়ন করেন, তাহাদের মধ্যেই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত। স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রধানতঃ এই সমিতির নেতৃত্ব করিতেছেন। সমিতি উক্ত দুটি জেলার দরিদ্র ছাত্রগণকে যথাশক্তি অর্থদানে শিক্ষায় সহায়তা করেন, এবং যশোহর খুলনা জেলার কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতায় অসহায় অবস্থায় রুগ্ন বা অন্য কোনও রকমে বিপন্ন হইয়া পড়েন, যথোচিত কায়িকসেবা বা অর্থদানে তাঁহারও সহায়তা করেন। কলি-কাতাই সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রে এই দুটি উপায়ে দরিদ্র ও বিপন্নের হিতসাধন আপাততঃ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ আরও সমিতি অন্যান্য দুই একটি জেলায় আছে শুনিয়াছি। ইহাদের মধ্যে বরিশাল সেবাসমিতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় এখন এই সমিতিগুলি যাহা করিতেছেন, প্রবাসী যুবক ছাত্র-গণের পক্ষে কলিকাতার মতই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তার বেশী কিছু করা বড় সহজ নয়। যতটুকুই তাঁহারা করিতে পারিতেছেন, তাহাতে দরিদ্র ও

বিপন্নের হিতসাধন কিছু ত হইতেছে? ইঁহাদের এই চেষ্টা ব্যতীত এইটুকুই ত হইত না? তারপর ইহার আরও একটা বড় দিক আছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের সামাজিক বুদ্ধি ও সামাজিক দায়িত্বের অনুভূতি বড় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,—সকলেই আমরা বড় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছি। সকলেই এখন আমরা নিজেকে ও নিজের পরিবারকে লইয়া সুখে ও আরামে থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু সংসারী মানব যে কেবল নিজেদের বা নিজ পরিবারের নহে, সমাজেরও কেহ,—নিজেদের প্রতি নিজেদের পরিবারের প্রতি যেমন, সমাজের প্রতিও যে তেমনই একটা কর্ত্তব্য সকলের রহিয়াছে,—জীবনের উন্নতি ও অবনতি যে ব্যক্তিমাত্রেরই সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণের ও সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের আগ্রহ বা উদাসীনতার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে,—সমাজ-জীবনের উন্নতি বা অবনতি সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে ব্যক্তিজীবনের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যে বড় নিকট অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ—এ কথা আমরা এক রকম বিস্মৃতই হইয়াছি। সমাজ একার কাহারও নহে, পাঁচজনেরই সমান,—সমাজের মঙ্গলে পাঁচজনেরই সমান মঙ্গল,—এই মঙ্গল সাধনের চেষ্টা পাঁচজনকেই মিলিয়া করিতে হয়, নতুবা হয় না। ছাত্রজীবন শিক্ষারকাল,—ভবিষ্যতে মানবোচিত ধর্ম্মপালনের যোগ্যতা কিসে হইবে, ছাত্রজীবনেই তাহা শিখিতে হয়। কেবল লেখাপড়া করিয়া যার যার জীবিকা উপার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ হইলেই শিক্ষার সার্থকতা হয় না, একদিক—বড় একটা দিকই—অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সব সেবাসমিতির সভ্য যুবকগণের সেবার প্রয়াস ও প্রয়াসের সাক্ষাৎ সার্থকতা যত ছোট বা যত বড়ই হউক,—পরোক্ষভাবে, এই সব কার্য্যে যোগ দিয়া ইঁহারা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মপালনের একটা বড় অমূল্য শিক্ষালাভ করিতেছেন —যাহার কোনও সুযোগ সাক্ষাৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায় নাই।

শিখিতেছেন, আরও শিখিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিতে হইবে। যেখানে তাঁহাদের প্রকৃত সমাজজীবন রহিয়াছে, সেইদিকে এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র তাঁহাদিগকে বিস্তৃত করিয়া নিতে হইবে,—তাহাতে প্রকৃত সামাজিক হিত-সাধনও বেশী হইবে, শিক্ষায় প্রকৃত সামাজিক জীবন গঠনের সুযোগও তাঁহারা তেমনই বেশী পাইবেন।

একথা এখন কাহাকেও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে না যে বাঙ্গালীর সমাজজীবন বাঙ্গলার পল্লীতে, বাঙ্গলার দুই চারিটি সহরে নয়। বাঙ্গলা দেশ যাহা, বাঙ্গালী সমাজ যাহা, তাহা পল্লীগ্রামেই ছিল, এখনও পল্লীগ্রামেই রহিয়াছে,—পল্লী ছাড়িয়া সহরে আসে নাই, আসিতে পারে না। শিক্ষিত, সম্পন্ন ও উন্নত-জীবী বাঙ্গালী অনেকে পল্লী ত্যাগ করিয়া আরামপ্রয়াসে সহরবাসী হইতেছেন,—বাঙ্গালীর বাঙ্গলা, পল্লীর বাঙ্গালী সমাজ তাহাতে হীনশ্রী হইয়া পড়িতেছে,—কিন্তু পল্লী ছাড়িয়া পল্লীর বাবুদের সঙ্গে সহরে আসে নাই, আসিতেও পারে না।

যাঁহারা পাকিয়া এখন একভাবে সংসারে বসিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের গতি ভিন্ন পথে চালান সহজসাধ্য নয়। যাঁহারা এখনও পাকিয়া বসেন নাই—অর্থাৎ যুবক ছাত্রগণ—তাঁহাদিগকে এখন বুঝিয়া বাছিয়া নিতে হইবে, তাঁহাদের

জীবনের গতি কোথায় কোন দিকে কি ভাবে প্রবাহিত হইবে—ভবিষ্যতে তাঁহারা একেবারে সহরের বাবু হইবেন, না বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে সহরে প্রবাস করিতে হইলেও প্রাণে তাঁহারা পল্লীমায়ের ছেলেই থাকিবেন—প্রবাসে বিষয়-কর্ম্মে অবসর হইলেই পাগল হইয়া পল্লীমায়ের ঘরে ছুটিয়া আসিবেন—মায়ের ঘরে ভাই বোন্ যাহারা রহিয়াছে, আসিয়া আনন্দে তাহাদের কোল দিবেন, আপন বলিয়া বুকে তুলিয়া নিবেন।

যদি এই দিকে তাহাদের লক্ষ্য থাকে, প্রাণ থাকে, তবে এখন অবধিই তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে, সেই দিকে মন দিতে হইবে—যাহাতে মায়ের ঘরটি মায়ের ঘরের মতই থাকে, মায়ের ঘরে ছেলের মত তাঁহারা কর্ম্মের অবসরে আসিয়া বিরাম ও আনন্দ ভোগ করিতে পাবেন।

পল্লীর অস্বাস্থ্যকরতা, পল্লীর জঙ্গল, পল্লীর জলকাদা, অজ্ঞতা হেতু অথবা জ্ঞানসত্বেও অবহেলা হেতু পল্লীতে পরিমার্জ্জিত আরামের অভাব—ইত্যাদিই পল্লীগুলিকে অনেকের পক্ষে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা কোনও মতে বাহিরে সহরে থাকিতে পারেন, তাঁহারা পল্লীবাসে যাইতে চান না। 'পল্লীবাসে যাও',—একথা বলিলেই কেবল হইবে না, পল্লী যাহাতে বাসের যোগ্য হয় তাহাই করিতে হইবে। যে দুরবস্থার জন্য পল্লীগুলি বাসের অযোগ্য হইয়াছে, সে দুরবস্থা যাহাতে দূর হয়, তার জন্য যথাশক্তি যত্ন সকলের করিতে হইবে।

সেবাসমিতির যুবকগণ প্রায় সকলেই পূজায় বাড়ীতে যাইতেছেন। পল্লী-সমাজ তাঁহাদেরই ভবিষ্যৎ সমাজ। সেই সমাজের আধার-ভূমি যাহাতে সেই সমাজজীবন আপন বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারে, তার দিকে এখন হইতেই তাঁহাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত,—যথাশক্তি কিছু যত্নও করা উচিত। তাঁহাদের সেবাব্রতের লক্ষ্য পল্লীর দিকে এখন হইতে কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কলিকাতার সেবাসমিতি গুলি এখনও শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাদের আর্থিক সামর্থ্য বা কার্য্যকরীশক্তি এখনও এমন হয় নাই, যে আপনারা কেন্দ্র হইয়া এক একটি জেলার শত শত গ্রামে শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা পরিচালনা করিতে পারে। তবে সেবক যুবকগণ নিজ নিজ গ্রামে গিয়া সেখানে ছোট ছোট সেবার দল গড়িয়া অনেক কাজ করিতে পারেন। কে জানে, কালে হয়ত সহরের প্রধান সেবাসমিতি গুলি এই সব দলের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে পারে।

সংস্কারে জীর্ণ পল্লীগুলিকে জীবন্ত ও উন্নত অবস্থায় আনিতে হইলে যাহা করা দরকার, তাহা সবই যে ছাত্রগণের সাধায়ত্ত, এমন কথা বলি না। এমন অনেক কাজ আছে, যাহা সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে না করিলে হইতে পারে না। অনেক কাজ আছে, যাহা গ্রামবাসী প্রবীণ ব্যক্তিগণ মন না দিলে হওয়া কঠিন। কিন্তু এসব ছাড়াও আরও এমন অনেক কাজ আছে—যাহা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ নহে—প্রধানতঃ দৈহিক শ্রম সাপেক্ষ—যাহার সুব্যবস্থা গ্রামবাসী ছাত্র যুবকগণই করিতে পারেন। গ্রামের পুকুরগুলি পানা জঙ্গলে

একেবারে না পচে, পথঘাট কাদায় জঙ্গলে একেবারে বিশ্রী—চাহিলে গা কেমন করে—এমন না হইয়া থাকে, বাড়ী ঘরগুলির চারিধার বেশ পরিচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনামুক্ত থাকে, মলমূত্রাদি ত্যাগের ব্যবস্থা একেবারে স্বাস্থ্যভঙ্গকারক না হয়, দুঃস্থ রোগীরা একটু ঔষধ পথ্য পায়, সেবার অভাবে পীড়িত কেহ মলিন-শয্যায় মলমূত্রাদিতে পরিলিপ্ত হইয়া না পড়িয়া থাকে, কেহ মরিলে সৎকারের জন্য কোনও গৃহের শোকার্ত্ত স্ত্রীজন ও শিশুরা চিন্তায় আকুল না হয়, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া যেখানে নিরন্নের মুখে এক বেলা অন্ন তুলিয়া দেওয়া যায়—সেখানে অনাহারে কেহ না মরে, গ্রামের ছেলেরা যাহাতে দেহে সুস্থ ও বলিষ্ঠ, ব্যবহারে বিনীত ও শিষ্ট এবং চরিত্রে সাধুশীল হয়, গ্রামের মেয়েরা লেখাপড়া কিছু শিখিতে পারে, এইরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা—ইচ্ছার আগ্রহ থাকিলে যুবকগণই যথেষ্ট করিতে পারেন। যদি করেন, এইরূপ গ্রামসেবা দ্বারাই গ্রামে শ্রী তাঁহারা অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। আপন বলিয়া যার জন্য খাটা যায়, তার উপরে টান কখনও শিথিল হয় না, বরং বাড়েই। আপন আপন গ্রামের জন্য যদি তাঁহারা এই রকম খাটিতে পারেন, গ্রামের দিকে তাঁদের টান থাকিবে, টান বাড়িবে। গ্রামও উন্নতশ্রী হইয়া আরও বড় টানে তাঁহাদিগকে টানিবে।

হায় মা পল্লীরাণী! তোমার টানে তোমার ছেলেরা কবে তোমার ঘরখানি আবার সুন্দর করিয়া সাজাইয়া নিবে? আপন হাতে সাজান সেই আপন মায়ের ঘরে, কবে তারা আবার আনন্দে খেলিতে প্রবাস হইতে ছুটিয়া যাইবে!

আবাহন।

এস চির পরিচিত, চির অজানা,
এস শান্তি, মহাপ্রীতি, এস করুণা;
নেব এস আলোধার,
দূর কর অন্ধকার;
ধীরে ধীরে মুছে লও মহাবেদনা;
এস চির পরিচিত চির অজানা।
ফুরায়েছে জগতের মোহ কামনা,
সবে দূরে ফেলে দিছি কিছু চাহি না;
শুধু ডাকি প্রাণ ভরে,
এস সখা হৃদি' পরে,
যাতনা, নয়ন লোর কিছু রবে না;
এস চির পরিচিত চির অজানা।

ভ্রমিয়াছি দ্বারে দ্বারে মাগি' করুণা
শুধু হাতে ফিরেছি গো বৃথা যাচঞা!
এস সখা এস বুকে,
কাতরে অভাগা ডাকে,
চির দুঃখী ব্যথিতেরে পায়ে ঠেলোনা;
এস চির পরিচিত চির অজানা।

শ্রীমাখনলাল মৈত্র।

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সমগ্র মোঙ্গল জাতির আচার ব্যবহার, শারীরিক আকার প্রকার, ধর্ম্ম সংস্কার এবং ভাষার গঠনপ্রণালীর মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে ইহাদিগকে এক জাতীয় "পরিবার" ভুক্ত বলাই সঙ্গত। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সেকালের ভারতবাসীরা সমগ্র মোঙ্গল জাতির বিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন। এই সকল কারণে আমরা বলিতে চাহি যে, শাস্ত্রোক্ত চীন এবং বর্ত্তমান চীন একই জাতি।

এই যে মোঙ্গল জাতির অধ্যুষিত বিপুল চীন সাম্রাজ্য—ইহা কি সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত 'মহাচীন' নহে? পারস্যের পৌরাণিক সাহিত্যে "মাচীন" বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। 'মা চীন' অর্থ বৃহৎ চীন—(Great China)। তবে কি পারস্যের এই 'মা চীন' আমাদের "মহাচীনের" প্রতিধ্বনি নহে?—মনে হয়, এ সকলই সুবিপুল চীনসাম্রাজ্যের নামান্তর মাত্র। +

চীন যে খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে বৈদেশিক সংস্রবে আসিয়াছিল, চীন এবং পারস্যদেশের ইতিহাস পাঠে তাহা জানা যায়। চীনের ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায় যে, তৈবুর রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ১৬৩৪) ছিয়াত্তরটি বিভিন্ন রাজ্য হইতে দোভাষীসহ দূত সকল চীনসম্রাটের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়েরও পূর্ব্বে, হোয়াংটীর রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৬৯৮), চীনে কতকগুলি শিল্পদ্রব্যের উদ্ভাবক কুয়েন লাঙ্‌ পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল। বলাবাহুল্য কুয়েন লাঙ্‌ কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত।*

পারস্যদেশের পৌরাণিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মাহং নামক মহাচীনের সম্রাট্ কন্যার গর্ভে প্রসিদ্ধ পারস্যসম্রাট জেমসিদের দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল।

+ কেহ কেহ মহাচীনকে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত কোন একটি দেশ বলিয়া অনুমান করেন। পণ্ডিত তকাকসু অনূদিত ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে মানচিত্র দেওয়া আছে তাহা দ্রষ্টব্য।

* "Other indications of ancient communication are found in the annals and traditions both of the Chinese and Western nations. Thus in the reign of Taiwu (B. C. 1634) ambassadors

ঐতিহাসিকেরা উল্লিখিত মাহংকে চীনের মুবং বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০১ হইতে ৯৪৬ অব্দ মুবংয়ের রাজত্বকাল। এতদ্ব্যতীত চীনের সহিত পারস্যের পরিচয়ের কথা পারস্যের পৌরাণিক ইতিবৃত্তেও নানাস্থানে উল্লিখিত আছে। *

এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চীন একথা নিজেই স্বীকার করিতেছে যে, পশ্চিম দেশ হইতে বিদেশবাসীরা চীনে আগমন করিতেছে, চীনবাসীরা পশ্চিমদেশে গমন করিতেছে। আবার পারস্যবাসীরাও চীনের সহিত তাহাদের পুরাতন পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিতেছে। এই সময়ে, অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দে, চীন ও ভারতবাসী পরস্পরের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলনা—একথা বোধ হয় আমরা নির্ব্বিবাদে অনুমান করিতে পারি।

খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দে চীন ও ভারতবাসীর সংস্রবের উল্লেখ দেখা যায়। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"—এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া যে সকল ভারতীয় বণিকেরা দূরাৎ সুদূর গমন করিতেন), তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চীনের কিচৌ (Kiatchou) সমুদ্রের কাছে একত্র সম্মিলিত হইতেন †। লঙ্কার (সিংহল দ্বীপের) নামানুকরণে প্রবাসী ভারতীয় বণিকেরা তাহাদের এই ক্ষুদ্র

---

accompanied by interpreters and belonging to 76 distinct kingdoms are reported to have arrived from remote regions at the court of China.

At a far earlier period under the reign of Hoanti, the first historical emperor (B.C. 2698) the Chinese historians allege that the inventors of sundry arts and sciences arrived from the western kingdoms in the neighbourhood of the Kuenlung mountains.

—Cathay and the Way Thither by Henry Yule.

* "—The legendary history of the Persians relates that their ancient king the famous Jamshed, had two daughters by a daughter of Mahang king of Machin (or Great China). It has been suggested that his name indicates Muwang of the Chen dynesty who reigned from B. C. 1001 to 946, dying in the 104th year of his age and who is related in the Chinese annals to have made in the year 985 a journey into the remote countries of the west, and to have brought back with him skilled artizeans and various natural curiosities."

—Cathay and the Way Thither, p. xxxiv-vi-vii, by H. Yule.

† "The Dawn and the Dawn Society's Magazine পত্রিকার মে, জুন, জুলাই সংখ্যায় "Maritime Activity and Enterprise in Ancient India. Intercourse and trade by sea with China" নামক ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে চীনে ভারতীয় বাণিজ্যের কি বিপুল আয়োজন ছিল, তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপনিবেশটির নাম রাখিয়াছিলেন—লঙ্কা (লং—গা, লং—য়ে)। (সিমি Tsihmie) পরে সিমো নামক স্থানে তাঁহারা দোকান পসারা মিলাইয়া বসিতেন। এই স্থানে তাঁহারা একটি টাকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন। চীনদেশে তখনও মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই, কাজেই দ্রব্যবিনিময়ে চীনদের নিকট ভারতীয় বণিকদিগকে পণ্যাদি বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু দ্রব্যবিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক অসুবিধা। দ্রব্যগুলি ওজনে ভারী, আকারে বৃহৎ, আর ব্যবহার অনুসারে তাহাদের মূল্য নানাদেশে নানারূপ হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য ভারতীয় বণিকেরা চীনদেশে প্রথম মুদ্রা প্রবর্ত্তন করেন। এই মুদ্রা তাম্রনির্ম্মিত, ইহার আকার ছুরিকার মত (Knife-money); ধরিবার সুবিধার জন্য তাহার বাটের শেষাংশে আংটীর আকার একটি গর্ত্ত থাকিত। এই মুদ্রা প্রচলন-কাল ৬৭৫-৬৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। *

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে চীন ও ভারতবাসীর সাক্ষাতের উল্লেখ চীন ইতিহাসের নানাস্থানে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর অন্যতম। চীন সম্রাট চে-বং-টে তাতার আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ঐ প্রাচীর তুলিয়াছিলেন। ঐ চে-বং-টের পুত্র সলনু পিতার আদেশে ১০,০০০ সহস্র সৈন্য সহ পশ্চিমদেশ জয় করিতে প্রেরিত হন। সলনু বু-থান (বর্ত্তমান কোটানে) শিবির সন্নিবিষ্ট করেন। এই সময়ে মহারাজ অশোকের নির্ব্বাসিত মন্ত্রী যক্ষ (?) আত্মীয় স্বজন এবং প্রায় সাতশত অনুচর সহ কোটানের নিকটস্থ শেল-চব কঁগমা নদীর তীরে বাসস্থান নির্ম্মান করেন। পলায়মানা গাভীর অনুসন্ধানকারী সলনুর দুইটি ভৃত্যের সহিত একদিন যক্ষের কয়েকদিন অনুচরের সাক্ষাৎ হয়।

তারপর সলনু ও যক্ষের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া স্থির হয় যে, সলনু রাজা, যক্ষ মন্ত্রী এবং উভয়ের অনুচরবর্গ প্রজারূপে সম্মিলিত থাকিয়া কোটানে বসবাস করিবে। কিন্তু কিছুদিন পরে এই দুই দল লোকের মধ্যে স্থানবিভাগ লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হইতে থাকে। এরূপ কথিত আছে যে, অবশেষে উত্তর প্রদেশের রক্ষা-দেবতা বৈশ্রবণ (কুবের) এবং শ্রীদেবীর

* অধ্যাপক Terrien De Laconperie, Ph. D., Litt D, চীন ইতিহাসের মূল উপকরণ হইতে এই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে এই মুদ্রার চিত্র প্রদর্শিত আছে। তৎ প্রণীত Catalogue of Chinese Coins, xi পৃষ্ঠা এবং Western Origin of the Early Chinese Civilisation পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাহায্য বিবাদের মীমাংসা হয়, এবং সলনু চীনের দিক, আর যক্ষ ভারতবর্ষের দিক প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সলনুর প্রাপ্ত স্থান চেনথান অর্থাৎ চীনস্থান এবং যক্ষের প্রাপ্তস্থান আর-থান বা আর্য্যস্থান নামে পরস্পরের নিকট অভিহিত হইত। বু-থান অর্থাৎ বর্ত্তমান কোটান, দুই জাতির সঙ্গমস্থান; ঐ স্থানের ভাষা অনেকটা ভারতীয় ভাষার মিশ্রন এবং আচারপদ্ধতি চীনের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সলনু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৫৪ বৎসর পরে জন্মলাভ করেন এবং ১৯ বৎসর বয়সে কোটানে রাজপদ প্রাপ্ত হন। অশোক এবং চে-বং-টের রাজ্য পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। *

যদি ইহা সত্য ঘটনা হয়, তবে দুইদেশবাসীর একত্রাবস্থান হেতু ভাবের আদানপ্রদান ফলে, দুই দেশের সভ্যতার প্রভাবই দুইদেশে বিস্তারলাভে অল্পাধিক সুযোগ পাইয়া থাকেবে—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

গ্রন্থকার ফা-লিন বলেন,—সম্রাট চে-বং-টের পূর্ব্বেই চীনে বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। চি-বং-ট (২২১ খৃঃ পূঃ) অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। চীন এই সময়ে কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই খণ্ড রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব বর্ত্তমান ছিল, কাজেই দেশে শান্তি ছিল না। চি-বং-ট খণ্ডরাজ্যগুলি একত্রিত করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইবার বাসনা করেন। চীনের সাহিত্যিকগণ পুরাতন সাহিত্য হইতে দেশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এবং শান্তির চিত্র উদ্ধৃত করিয়া রাজাকে ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। এই সাহিত্যিকদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য রাজা চিকিৎসা গ্রন্থ এবং অন্যান্য দুই চারিখানি পুস্তক ব্যতীত দেশের সমস্ত সাহিত্য ধ্বংস করিতে আদেশ দেন। ফা-লিন বলেন—রাজাদেশে বিনষ্ট গ্রন্থাদির মধ্যে তিনখানি বৌদ্ধগ্রন্থ ছিল। †

এই সময়ে সতর জন অনুচর সহ লি-ফঙ নামক জনৈক পুরোহিত

---

* রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সি, আই, ই, প্রণীত "Indian Pandits in the Land of Snow" পুস্তক দ্রষ্টব্য।—

"This account together with a short history of Khotan was obtained by a Tibetan historian from a roll of birch bark manuscripts in the grand library of Sakya (white land) in the 13th century. He mentioned that the early Patriarch Kings of Tibet obtained it from the Buddhists of Wu-than in the 7th century A.D.

† Beal's Buddhist Literature in China.

নানারূপ বৌদ্ধগ্রন্থ লইয়া চীনসম্রাটকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিবার মানসে চীনে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাজাদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে কোথা হইতে ছয়জন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোক আসিয়া কারাদ্বারে দাঁড়াইল,—তাহারা হীরার টুকরাদ্বারা স্পর্শ করিতেই কারাদ্বার খুলিয়া গেল এবং বন্দী বৌদ্ধেরা মুক্তদ্বারে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। রাজা এতদ্দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইয়া বন্দীদিগকে রোষশান্তির জন্য অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। *

চীনের ইতিহাস পাঠে জানা যায় ২১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কয়েক জন ভারতবাসী ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে চীন রাজধানী শেন-সিতে গমন করিয়া ছিলেন। †

১২২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে চীন হইতে ইয়রখণ্ডের নিকটে হিয়েন-দো নামক স্থানে একটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। চীন হইতে আগত লোকেরা এইস্থানে একটি হৈমমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া 'হন'-সম্রাট বু-তির নিকট প্রেরণ করেন। ইহা বুদ্ধমূর্ত্তি—চীনদেশে দয়াধর্ম্মের অবতার শাক্যমুনির প্রথম প্রতিমূর্ত্তি। ইহার পর হইতে কোটিকোটি চীনসন্তান এই রাজপুত্র মহাযোগীর শ্রীচরণোদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পুণ্য অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিয়া আসিতেছে। ‡

একবার চেঙ্-কিয়েন নামক জনৈক চীন রাজদূত গেটিদের দেশ (the Country of the Getae—yu-chi or Sakas) হইতে চীনে ফিরিয়া আসিয়া উল্লিখিত "হন" সম্রাট বুতির নিকট পশ্চিমদেশের আচার পদ্ধতি সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল। চেঙ্-কিয়েন একস্থানে সম্রাটকে বলিতেছেন :—

"আমি এইস্থান হইতে ১২০০০ চৈন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দহে নামক দেশে থাকিতে কিউঙ্গ (Kieung) হইতে আনীত বাঁশের ঝুরী, সি-চুয়েন

---

* Indian Pandits in the Land of Snow.

† Rev. J. Edkins, D. D. প্রণীত Chinese Buddhism ৮৮ পৃষ্ঠা; H. Hackmann প্রণীত Buddhism as a religion নামক জর্ম্মান্ পুস্তকের ইংরেজী অনুদিত পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ Indian Antiquiry vol. ix. পৃঃ ১৪, ১৫; Chinese Buddhism by Rev. J. Edkins এবং Beal's Record of the Buddhistic Kingdoms, পৃঃ ৫. পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হইতে আনীত বস্ত্রাদি দেখিতে পাই। ঐ গুলি কোথা হইতে আনীত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় বলা হইল যে,—এই দ্রব্যাদি বৌদ্ধদের দেশ সিন্দো হইতে আমদানি করা হইয়াছে।' এই সিন্দোই সিন্ধু—সিন্ধু বিধৌত আমাদের এই ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থানের নামান্তর। চীনেরা ভারতবর্ষকে কখনও সিন্দো, কখন চিন্দো, পরবর্ত্তী কালে ইন্দো বলিত। *

সংস্কৃত, চীন এবং পারস্য সাহিত্য হইতে যে কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন ও ভারতবর্ষের অধিবাসীর মধ্যে পরিচয় ঘটিবার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। তবে কি চীনবাসীরা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল?

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে সম্রাট অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নানা দেশে, বিভিন্নরাজ্যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষু প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের সময় হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। তিনি চীনে কোনও প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া কোথায় কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চীনে কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছিল—১২২ খৃঃ পূর্ব্বে ইয়রখণ্ড হইতে প্রবাসী চীনেরা একটি বুদ্ধমূর্ত্তি তাহাদের সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল—একবার লি-ফঙ নামক জনৈক পুরোহিত সতর জন অনুচর সহ বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া চীন সম্রাটকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার মানসে চীনে গমন করিয়াছিলেন,—একটু পূর্ব্বে আমরা এসকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। কণিষ্ক নিজে বৌদ্ধ ছিলেন স্বধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার সবিশেষ উৎসাহও ছিল। কনিষ্কের রাজ্য এবং চীন সাম্রাজ্য একরূপ পাশাপাশি ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৬৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম চীনের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করে—ইহা ঐতিহাসিক

* "The commentator of the work from which this account is taken, mentions that the name Shindo also used to be pronounced as Tindo in those days, but the Chinese now do not use the initials representing the sound *sh* or *t* in writing the name Shindo, They simply write *Indo* by which name India is known to them. The country of Dahe or Dehisthan borders on the Caspian, forming the south-east coast of that sea.

Indian Pandits in the Land of Snow.

সিদ্ধান্ত। যতদূর জানা যায় খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চীনবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। এরূপ জানিতে পারা যায় যে, চীন সম্রাট আইর রাজত্ব-কালে (৬-২ খৃষ্টপূর্ব্ব) ই-চান, খিং কিং কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধসূত্রাদি সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনের লোকেরা তাহার কথায় বিশ্বাস বা কোনরূপ আস্থা স্থাপন করে নাই।*

কাজেই বলিতে হইবে ২২১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই সুদীর্ঘ তিন শতাব্দ ব্যাপিয়া চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যে চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ইহা কি ব্যর্থতা? এই ব্যর্থ চেষ্টা পরম্পরাই ভাবী সফলতার মূল হেতু নহে কি?

ভারতীয় বণিক এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীনে গমনাগমনের ফলে দুই দেশের সংস্রব ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। এই সংস্রব হেতু দুই দেশবাসী পরস্পরের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হইতেছিলেন। আর যাহার জীবন-কথায়, ধর্ম্মবার্ত্তায় ভারতের গ্রাম নগর, বন উপবন, মুখরিত হইতেছিল—সেই বুদ্ধদেবের পুণ্য-কাহিনী এই সময় নিশ্চয়ই ভারতবাসীদের দ্বারা চীনদেশে পৌঁছিতেছিল। বুদ্ধদেবের সংযম বল, ত্যাগের বার্ত্তা, বিচিত্র ধর্ম্মমত, অপার করুণা এবং বিশ্বমৈত্রীর আনন্দকথা হৃদয়ে হৃদয়ে একটু ২ আঘাত করিয়া তাহাদের মনপ্রাণ ভারতবর্ষের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল—"অমিত আভার" একটু কণা পাইতে চীনবাসী লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল। তারপর ৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় হইতে চীনের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ফলে ভারতের সভ্যতা চীনেরা—তথা সমগ্র প্রাচ্য এসিয়ার সভ্যতার ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করে।

ক্রমশঃ

শ্রীশশীকান্ত সেনগুপ্ত।

---

* In the time of Emperor Ai (B. C. 6—2) we read that Khing-king caused I-tsan to teach the Buddhist sutras orally, but that the people gave no credence to them.

—Selected Essays, vol. II. পৃঃ ৩১৭—১৮, by Max Mulla

বাঙ্গালা ক্রিয়ার রীতি ও প্রয়োগ।

"বাঙ্গালা ক্রিয়ার "রীতি ও প্রয়োগ" আমি ইংরাজীর idiom and use অর্থেই গ্রহণ করিতেছি। ইংরাজীতে যেমন নানা verb এর দ্বারা নানারূপ phrase গঠিত হইয়াছে, এবং সেগুলি সুপ্রযুক্ত হইলে যেমন রচনার উৎকর্ষ সাধিত হয়, বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ কয়েকটি phrase এর পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ইংরাজীর phrase এর সহিত আমাদের বাঙ্গালার এই বাক্যাংশ (অর্থাৎ verb ক্রিয়া) গুলির প্রভেদ এই যে সাধু অর্থাৎ লিখিত রচনায় আমরা এগুলিকে এখনও তেমন অবাধ প্রবেশ দিই নাই—দিলে নাকি ভাষার আভিজাত্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। ইংরাজীতে কিন্তু কোন মনীষীই এখনও সেরূপ ভাবেন নাই।

কথিত ভাষাতেই এগুলি আমরা সদা সর্ব্বদা প্রয়োগ করি, পুস্তক লিখিবার সময় কথাবার্ত্তার মধ্যে ঢুকাইয়াছি,—আর, যখন হাস্যরসের কিছু কিম্বা একটু চুটকি লিখিতে হইবে, তখনই ইহাদের খোঁজ খবর রাখি। কোনও গুরু গম্ভীর রচনার মধ্যে ইহাদের ঠাঁই নাই।

যেমন আমরা কথাবার্ত্তায় বলি—অমুককে কথাটা বল্‌লাম্ কিন্তু কাণে করল না—অর্থাৎ গ্রাহ্য করিল না। এই 'কাণে করা'র প্রয়োগ উপরের প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত তিন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

যাহাই হউক, বাঙ্গালার এই নিশিদিনের কথিত idiom গুলি সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইলে, তদ্দারা সাহিত্যের যে কোনও ক্ষতি হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

এই idiom গুলিতে ক্রিয়া পদটিরও যে কিরূপ অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

(১) করা।

কায করা—সমাধা করা।
হাতে করা—লওয়া। (কোনও জিনিষ হাতে করা)
হাতে করা—স্পর্শকরা। (এ জিনিষ সে হাতেও করে নাই—ছোঁয় নাই।)
মাথায় করা—সম্মান করা।
হাত করা—স্বাধিকারে আনা (সে পুলিশকে হাত করে' এ কাজ করেছে।)
হাতে করে মানুষ করা—বাল্যাবধি তত্ত্বাবধান করা।
হাতে করে'—দ্বারা। (হাতে করে খাওয়া—হাতের দ্বারা খাওয়া।)
এক এক করে'—পর পর (এক এক করে বেরিয়ে যাও।)
এক দুই করে'—গণনায়। মানুষ করা—প্রতিপালন করা।
কানে করা—শোনা। গ্রাহ্যকরা।

পেট পেট করে' পাগল—নিমিত্ত। (পেটুক)
মনে করা—স্মরণ করা। বিছানা করা—শয্যা পাতা।
সন্দেশ করা—তৈরি করা। দু'টাকা দু'টাকা করছে—দাম হাঁকৃছে।
ধার করে'—গ্রহণ করিয়া। চাক্‌রী করা—নিযুক্ত থাকা।
কবিতা রচনা করা—অভ্যাস থাকা (সে কবিতা রচনা করে।)
এক রকম করে'—কোনও উপায়ে।
আলোকরা—সুন্দর। (আলোকরা বউ)
আপনার করা—ভাবা। দূর কর'—রাখ।
গাড়ী করে' বেড়ান'—চড়িয়া। ঠক্ ঠক্ করিয়া চলা—শব্দ করিয়া।
টাকা করা—জমান'। (সে অনেক টাকা করেছে।)
গ্লাসে করে' জল—আধারে রাখিয়া, ভরিয়া।
হাতে করে খাওয়ান'—স্বহস্তে।
হাতে ভাতে করা—ভাত খাইতে না পারা।

করা শব্দ যে কোনও ধাতুজ বিশেষ্য (verbal noun) এর সঙ্গে যুক্ত হইলে সেই ক্রিয়ার সমর্থক হয়। যেমন গমন করা, শ্রবণ করা, ইত্যাদি।

খেয়ে—

খাওয়া—চর্ব্বা, চোষা, লেহ্য ও পেয় এ চারি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
ভাত খাওয়া—ভোজন করা।
রেগে খেতে আসা—আঘাত করিতে (সে রেগে আমায় খেতে এল।)
জ্বালিয়ে খেয়ে ফেল্লে—অত্যন্ত বিরক্ত করা!
টাকা খাওয়া—ঘুঁস নেওয়া। অপহরণ করা।
আর কিছুদিন খেয়ে নাও—ভোগ করা।
ওকে না খেয়ে ছাড়বনা—হত্যা করিয়া, নিঃশেষ করিয়া।
চোখের মাথা খাওয়া—দেখিতে না পাওয়া।
মাথা খাওয়া—দুর্নীত করা (আদর দিয়ে একবারে মাথা খাওয়া হয়েছে।)
মাথা খাওয়া—শপথ করা।
বিষয় খাওয়া—ধ্বংস করা (সে জমিদারী খেয়ে বসে আছে।)
ভোগ করা—(সে বাপের বিষয় খাচ্চে।)
স্বামীর মাথা খেয়ে—বিধবা হইয়া। তাড়া খেয়ে—ভর্ৎসিত হ'য়ে।
লজ্জার মাথা খেয়ে—নির্লজ্জ হয়ে। সাপে খাওয়া—দংশন করা।
ধাক্কা খেয়ে—বহু কষ্টে; সহিয়া। টোল্ খাওয়া—নষ্ট হওয়া বা বিকৃত হওয়া
ঘোল খাওয়া—মতিভ্রষ্ট হওয়া; নাকাল হওয়া।

[এইরূপ:—গালি খাওয়া, মুখ খাওয়া, গোপ্তা খাওয়া, বিষম খাওয়া, লাথি খাওয়া, মার খাওয়া, কলাপোড়া খাওয়া, কচুপোড়া খাওয়া, দাঁত খাওয়া, জুতা খাওয়া—প্রাপ্ত্যর্থে চলিত phrase]

হাওয়া খাওয়া—উপবাস করা;—বায়ু পরিবর্ত্তন বা সেবন করা।

খেয়ে দেয়ে বসা—কার্য্য শেষ করা।

বসে' বসে' খাওয়া—বিনা পরিশ্রমে অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে জীবন ধারণ করা।

বসে' বসে' খাও—ধীরে ধীরে খাও; অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করিও না।

লেখাপড়া না শিখ্‌লে খাবে কি?—সংসার চালাইবে কি করিয়া?

আজকের খেয়ে নেড়া নাচে—কোনও রকমে কাটাইয়া দিয়া।

থুয়ে খেতে কুলোয় না—অত্যন্ত অল্প।

খাও দাও কাঁশি বাজাও—আপনার কাজ কর'।

নিজের খেয়ে পরের কথায় কেন?—মিছামিছি অপরের কার্য্য সমালোচনায় লাভ কি?

খাইরে পরিয়ে মানুষ করা—(ধাত্বর্থ হইতেই ভাবার্থ) সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া মানুষ করা।

খেয়ে আর কায নাই কিনা?—কাযের কি অভাব যে—অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ।

—চলা—

চলে' যাওয়া—প্রস্থান করা।

সংসার চলা—ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া।

চলা ফেরা—ঘুরিয়া বেড়ান।

চলা ফেরা—স্বভাব চরিত্র।

যতদিন চলে—যায়, কাটে।

টাকাটা চলে না—গ্রাহ্য নয়, জাল।

ফ্যাসান্ চলা—প্রবর্ত্তিত হওয়া।

মদমুর্গী চলা—অভ্যাস থাকা।

গান বাজনা চল্‌ছে—হইতেছে।

শুধু আদর দিলে চলে না—উচিত নয়।

হাওয়া চলা—বহা।

জল চলা' জাতি—আচরণীয়।

আর তো চলে না—কুলায় না।

কায চ'লে গেলেই হলো—সমাধা হইলেই।

সমাজে চলা—গ্রাহ্য হওয়া, প্রবেশ করা।

"চলুক্ চলুক্ নাচ"—শেষ না হউক।

চল্‌তে চল্‌তে যেখানে দাঁড়ায়—কায করিতে করিতে যেমনই ফল হউক।

চল' বাড়ী চল—এস (সঙ্গের লোক সহ)

শেষে লাঠি চল্‌লো—মারিল।

ব্যবসা চলা—আয় হওয়া।

—চেয়ে—

চেয়ে খাওয়া—মাগিয়া।

ওর চেয়ে বড়—অপেক্ষা।

আকাশ পানে চেয়ে—দেখিয়া, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া।

পথচেয়ে থাকা—প্রতীক্ষা করা।

নিজের পানে চেয়ে বলা—তুলনা করিয়া।

উপর চেয়ে চলা—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা।

মুখ চাওয়া ছেলে—আদরের।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম—লক্ষ্য করা।

চাইলে পাওয়া জিনিষ—সহজ লভ্য।

বড়লোক তো হ'তে চাই—ইচ্ছা করা।

—দিয়া, দিয়ে—

দিয়ে এস'—দান করিয়া। প্রত্যর্পন করা।
রাস্তা দিয়ে চল—(রাস্তা)—তে। অমুককে দিয়ে করিয়ে নাও—দ্বারা।
অন্য দিক্ দিয়ে প্রবেশ—হইতে। ডাল দিয়ে ভাত থাওয়া—সহিত।
কথা দিয়ে আসা—অঙ্গীকার করা, স্থির করা।
কোঁচা ছেড়ে দিয়ে বেড়ান'—নিশ্চিন্ত।
কাছা দিয়ে যেও—সাবধানে।
গোলে হার বোল দিয়ে—বাকিয়া; গোঁজামিল দেওয়া:
পায়ের উপর পা দিয়ে—বিনা আয়াসে।
দিয়ে থুয়ে যা' থাকে—আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে।
চো'খ দেওয়া—হিংসা করা। ধান দিয়ে চাল আনো—বিনিময়ে।
কলিকাতা হইতে গয়া দিয়ে কাশী—via, মধ্যে রাখিয়া।
গুলিটা পিঠ দিয়ে বেরিয়েছে—ভেদ করিয়া।
লাঙ্গল দেওয়া—হল চালনা। আদর দেওয়া—করা।
গা' দিয়ে ঘামঝরা—সর্ব্বগাত্র (ব্যাপক এবং বাহুল্য ব্যঞ্জক)

—দেখা—

ঠাকুর দেখা—দর্শন। দেখে নাও—মিলাইয়া লও।
দেখে নেওয়া—ভয় দেখান; সাবধান করা; অঙ্গীকার ও বুঝায়—যেমন "পরশু টাকা দেবই, তুমি দেখে নিও।"
ভয় দেখান'—উৎপাদন করা। উপর দেখা—অমনোযোগ অর্থে।
তরকারিতে নুন হয়েছে কিনা দেখা—আস্বাদন করা।
বই দেখা—পড়া। লেখা দেখা—সংশোধন করা।
রোগী দেখা—চিকিৎসা করা। ভয় দেখা—পাওয়া।
বাড়ী দেখা—(ভাড়াটি' বাড়ী) অনুসন্ধান করা।
গন্ধ দেখা—আঘ্রাণ লওয়া। গা দেখা—স্পর্শ করা।
হাঁ, দেখ'—শোন'। মেয়ে দেখা—বিবাহার্থ পাত্রী ঠিক করা।
দেখে খরচ করা—বিবেচনা করিয়া।
করেই দেখ'—কোনও কার্য্য সমাধা করিয়া তাহার ফলাফল লাভ করা।
মজা দেখা—ভোগ করা; (যেমন দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।)
হাত দেখা—নাড়ী পরীক্ষা। জ্যোতিষ গণনা।
দেখ দেখি, কি কাণ্ড—মনোযোগ আকর্ষণ।
উপায় দেখা—স্থির করা। চোখের দেখা—ক্ষণিক
শরীর দেখা—রক্ষা করা; স্বাস্থ্যের পানে লক্ষ্য রাখা।
অমুককে দেখ'—তত্ত্বাবধান করা। কত দেখ্‌লাম—অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।
টাকাটি দেখ' ত ?—পরীক্ষা কর'। দেখে শেষ হয় না—গণিয়া।

দেখ' নীচের দুয়ার বন্ধ কিনা—গিয়া তদন্ত কর।
ওর দুষ্টামি আজন্ম দেখ্ছি—সহ্য কর্ছি।
দেখ, যদি হয়—চেষ্টা কর'। মধ্যে মধ্যে দেখা দিও—এসো।
ঢং দেখে বাঁচি না—পর্য্যবেক্ষণ করিয়া।
[সর্ষে ফুল দেখা, ঘুঘু দেখা, ফাঁদ দেখা, অন্ধকার দেখা, পাকা দেখা, প্রভৃতি বাক্যাংশ (Phrase) গুলির অর্থ একবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।]

—ধরা—

হাত ধরা—ধারণ করা। ভাত ধরা—পুড়ে যাওয়া।
মাথা ধরা—অসুখ করা। হাঁড়ি ধরা—পাককরা।
মাছ ধরা—মৎস্য শীকার। ধামা ধরা—তোষামোদ করা।
উনান্ ধরা—জলা। (cf কপাল ধরা, কাপড় ধরা ইত্যাদি।)
আগুন ধরা—ঐ।
জিদ্ধরা—কৃতসংকল্প হওয়া; অন্যায় আব্দারও বুঝায়। (cf, গোঁট ধরা)
মদধরা—নূতন অভ্যাস, আরম্ভ। (ব্যাপ্তি বোধক)
গানধরা—আরম্ভ। (ক্ষণিক)
ফলধরা—জন্মান'। ভুল ধরা—নির্দ্দেশ করা।
কথা ধরা—শোনা; যেমন—ওর কথা ধরো'না।
ঐ—একজনের ভাষা ও উচ্চারণ পার্থক্য লইয়া ব্যঙ্গ করা।
আঁচল ধরা—ন্যাওটা। সঙ্গ ধরা—লওয়া।
যন্ত্র ধরা—বাজান; যেমন—আমার সাম্‌নে যন্ত্র ধরে' কার সাধ্য?
জোর ধরা—হওয়া; যেমন—গাছে জোর ধরেছে।
ছুতো ধরা—ছিদ্রানুসন্ধান করা।
গলা ধরা—স্বরভঙ্গ হওয়া। প্রীতি প্রকাশ, যেমন—গলা ধরে' বেড়ান'।
পা'ধরা—চলিতে চলিতে ক্লান্ত হওয়া (cf. হাত ধরা)
• ঐ—বিনয়; তোষামোদ। কাণ ধরা—কর্ণ মর্দ্দন; শাসন করা।
জলধরা—থামা; যেমন—এখুনি জল ধর্‌বে।
জল ধরা—আঁটা; যেমন—এ হাঁড়িতে কয় সের মাত্র ধরে?
কাউকে ধরে' কোন' কাজ করানো—অনুরোধ করিয়া; জোর করিয়া।
রামকে ধরে' তিনজন—গণিয়া।
ধরা পড়া'—কোন গোপন কার্য্য প্রকাশ হওয়া।
ধর'—কথার মাত্রা। ধরে' ধরে' লেখা—ধীরে ধীরে লেখা।
ধরে' নিয়ে যাওয়া—বল পূর্ব্বক। (cf. ধরে ভদ্র ঘটান)
ঐ—সাবধানে; যেমন—রোগীকে বেশ ধরে' নিয়ে যাও।
ধরে' পড়া—নির্ভর, যেমন—শ্যামকে গিয়ে ধরে' পড়' সে একটা উপায় করে দিবেই।
খুব ধরেছে' ত?—সন্ধান পাওয়া। (ধরাপড়া হইতে বিভিন্ন অর্থ।)

ধর,' সে এল, তারপর ; কল্পনা কর'। ঘড়ি ধরে'—ঠিক সময় মত।
নিক্তি ধরে'—পরিমিত। এই রাস্তা ধ'রে বরাবর যাও—বাহিয়া।
ধরে' রাখা—জোর করিয়া নিকটে রাখা।
প্রাণ ধ'রে কেমন করে' বিদায় দিই ?—থাকিতে।
যাকে তাকে ধ'রে বিয়ে দেওয়া—সঙ্গে।
যখন ধরেছে তখন ছাড়্‌বে না—জিদ্‌ধরা।

—পাওয়া, পেয়ে—

পেলে ছাড়ে কে ?—পাইলে।
পেয়ে বসা - আধিপত্য বিস্তার করা ; যেমন একবারে তাকে পেয়ে বসেছে।
অক্কা পাওয়া—মরা। কৃষ্ণ পাওয়া—মরা।
ব্যথা পাওয়া—অনুভব করা। টাকা পাওয়া রোজগার করা।
সুখ পাওয়া—ভোগ করা। তৃষ্ণা পাওয়া—লাগা।
পদ পাওয়া—উন্নতি হওয়া। হাতে পাওয়া—নিকটে লাভ, বিনা ক্লেশে।
বিষয় পাওয়া—লাভ করা। পেয়ে যাওয়া—মরা।
টের পাওয়া—বুঝা। আলোক পাওয়া (ইংরাজী তর্জ্জমা) সভ্য হওয়া।
ভূতে পাওয়া—অপদেবতার আশ্রিত হওয়া।
দুটো ভাত পাওয়া—(সাংসারিক সচ্ছলতা) অন্নের অভাব না ঘটা'।
মর্‌লে জল পাওয়া—পিণ্ডাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য্যের ফলভোগ করা।
তাকে পেতে অনেক দেরী—লাভ করিতে ; বশ্যতা স্বীকার করাইতে।
ঘা পেলেই শিখ্‌বে—ঠেকিয়া।

—বলা—

কথা বলা—কহা। সে এসে'ছিল বলে এমন হলো—যেহেতু সেইজন্য।
বলে' ক'য়ে দিও—ভাল করে' শিখাইয়া দিও।
চলে বলে' বেড়ান'—সুস্থ শরীরে।
বলা এক করা এক—বাক্য। বলে' কোনও লাভ নাই—অনুরোধ করিয়া।
সে বলে কত আদরের—কথার মাত্রা, ছোট ছোট ছেলেদের মুখে বেশী শোনা যায়।
বলে, ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে—প্রবাদ।
এই বলে' কথা পেড়ো—ভূমিকা করিয়া।
পাব বলে' কায করা—আশায় ; দুর্গা বলে' বেড়িয়ে পড়া'—স্মরণ করিয়া।
রাম বলে' এখানে কেউ নাই—নামক।
দান বলে' দান ?—অনেক বেশী অর্থে ব্যবহৃত ; যেমন, দান বলিতে যাহা বুঝায়, সে সাধারণ বস্তু অপেক্ষাও বেশী।
সে কথা আর বলে' কায কি ?—উত্থাপন করিয়া।
তুমি তোমার ব'লে দাবী করো—অধিকার স্থাপন করা।

—লওয়া, নিয়ে—

এটা লও—গ্রহণ কর'। এটা নিয়ে যাও—বহন করিয়া লইয়া যাওয়া।
এ নিয়ে কি কর্‌বো ?—দ্বারা।
এ ছেলে নিয়ে আর পারি না—সঙ্গে (cf রামকে নিয়ে বেড়াতে যাও।)
পথ নাও—পলাও। হাত নাও—সর।
অনেক খানি জায়গা নিয়ে তাঁব্ ফেলেছে—পর্য্যন্ত, ব্যাপিয়া।
কানে কথা নেওয়া—শোনা। কথা নেওয়া—আদেশ পালন।
মান নিয়ে পলাও—রক্ষা করিয়া। তোকে নিয়েই মুস্কিল—জন্য।
জল নিয়ে আসা—উত্তোলন করা; পল্লীগ্রামে স্নান করিয়া আসাও বুঝায়।
ছেলে নেওয়া—কোলে করা।
লাঠি নিয়ে তেড়ে আসা—মারিতে আসা; লাঠি হাতে করিয়া।
আদায় নেওয়া—"করিয়া"র পরিবর্ত্ত-ক্রিয়া।
লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত—নিযুক্ত থাক'। চোরে নিয়ে যাওয়া—চুরি করা।
টাকা নেওয়া—ঋণ করা। নাও, নাও, আর বক্‌তে হবে না—থাম,'থাম'।

বাঙ্গলার প্রধান প্রধান কয়েকটি ক্রিয়াপদের বিষয়ই এ প্রবন্ধে আলোচিত হইল। ভবিষ্যতে অন্যান্য ক্রিয়াগুলির বিষয়ও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুধীবচন।

"ন পুত্রাৎপরমোলাভো ন ভার্য্যায়াঃ পরং সুখম্।
ন ধর্ম্মাৎ পরমং মিত্রং নানৃতাৎ পাতকং পরম্॥"

পুত্র অপেক্ষা বড় লাভ কিছু নাই, ভার্য্যা অপেক্ষা বড় সুখ কিছু নাই, ধর্ম্ম হইতে বড় মিত্র কেহ নাই, আর অসত্য হইতে বড় পাপও কিছু নাই।

জ্যেষ্ঠাংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রং চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্‌বৃত্তমভি পূজয়েৎ।

চরিত্রবিহীন হইলে গুরুজনকেও পূজা করিবেনা, আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সদ্‌বৃত্তিশালী হন, তাঁকেও পূজা করিবে।

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যবদাচরেৎ॥

শত্রুরও গুণ থাকিলে তাহা বলিতে হয়,—গুরুর ও দোষ থাকিলে তাহা বলিতে হয়। পুত্রকে ঠিক শিষ্যের মতই ব্যবহার করা উচিত।

সুকুলে যোজয়েৎ কন্যাং পুত্রং বিদ্যাসুযোজয়েৎ।
ব্যসনে যোজয়েচ্ছত্রুমিষ্টং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ॥

কন্যাকে সুকুলে যুক্ত করিবে, পুত্রকে বিদ্যায় যুক্ত করিবে, শত্রুকে ব্যসনে যুক্ত করিবে, আর অভীষ্টের যোগ ধর্ম্মের সহিত ঘটাইবে।

মহাবলিপুর।

যে রথগুলির বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে * উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং ইহা হইতেই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির 'বিমান' অর্থাৎ শীর্ষভাগের গঠন অনুকৃত হইয়াছে। আর কয়েকটি বৌদ্ধ চৈত্যের আকারে গঠিত এবং ইহাই দ্রাবিড়ীয় মন্দিরের 'গোপুর' অর্থাৎ দ্বারমঞ্চগুলির আদর্শ। এখানে বলা আবশ্যক যে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে মন্দিরের অপেক্ষা গোপুরেই শিল্পীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মাত্র তাঞ্জোরে এবং মহাবলিপুরের সিন্ধুমন্দিরে ব্যতীত আর কুত্রাপি এই প্রথার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল না।

১। নকুলসহদেব-রথ।

এই রথটির আকার ঘোড়ার পায়ের নালের মতন। ইহা বৌদ্ধচৈত্যের উদাহরণ। ইহারই পার্শ্বে আর চারিটি রথ এরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহাদিগকে একটি মাত্র অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। উহাদের সন্নিকটেই অখণ্ড পাষাণে নির্ম্মিত একটি বিশালকায় হস্তী, একটি সিংহ এবং একটি শিববাহনের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

২। দ্রৌপদী-রথ।

এটি পূর্ব্বোক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট রথচতুষ্টয়ের অন্যতম এবং আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রবাদ এইরূপ যে এই মন্দিরে একজন প্রধান পুরোহিত উপবেশনে নিশিযাপন করিতেন। পুরোহিতদিগের ঘুমাইবার নিয়ম ছিল না, নাম জপ ও ধ্যান ধারণায় তাঁহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে হইত। এই মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ এত অল্পপরিসর যে উহার মধ্যে একজন লোকও শয়ন করিতে পারে না। ইহার ফটকের দুইপার্শ্বে দুটি রমণীমূর্ত্তি প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। উহাদের শিরোভূষণ এবং অন্যান্য চিহ্ন হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে উহারা বৌদ্ধমূর্ত্তি। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই, কেবল মাত্র একটি লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই রথের ছাদ নৌকার 'ছই'এর আকারে গঠিত। ছাদের একদিকে একটি দীর্ঘ ফাটা দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বজ্রাঘাতের চিহ্ন বলিয়া বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

---

* মালঞ্চ শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।
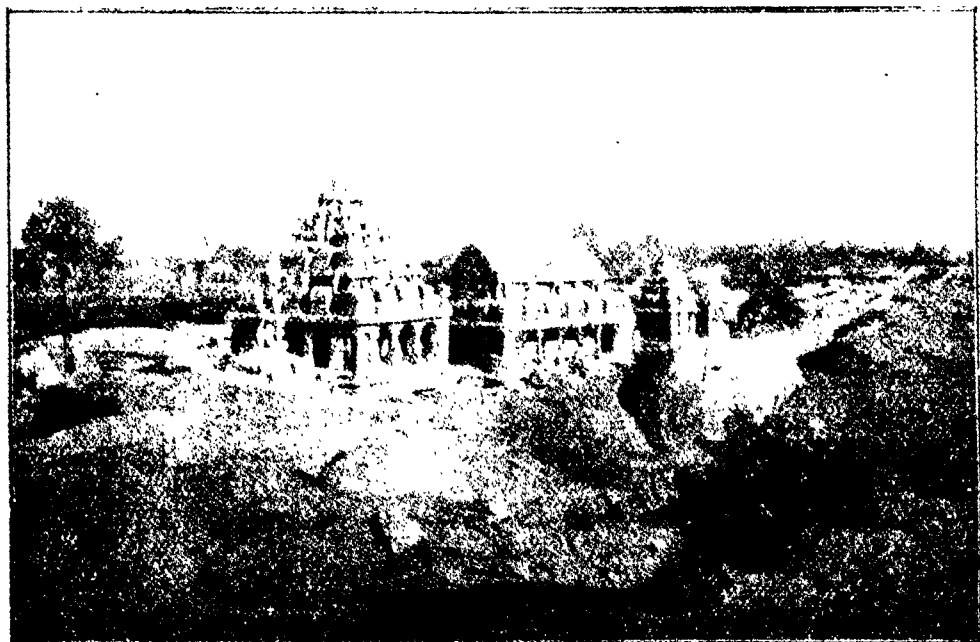
"রথচতুষ্টয়" (মহাবলিপুর)

"ভীমরথ" (মহাবলিপুর)

কমলা প্রেস—কলিকাতা।
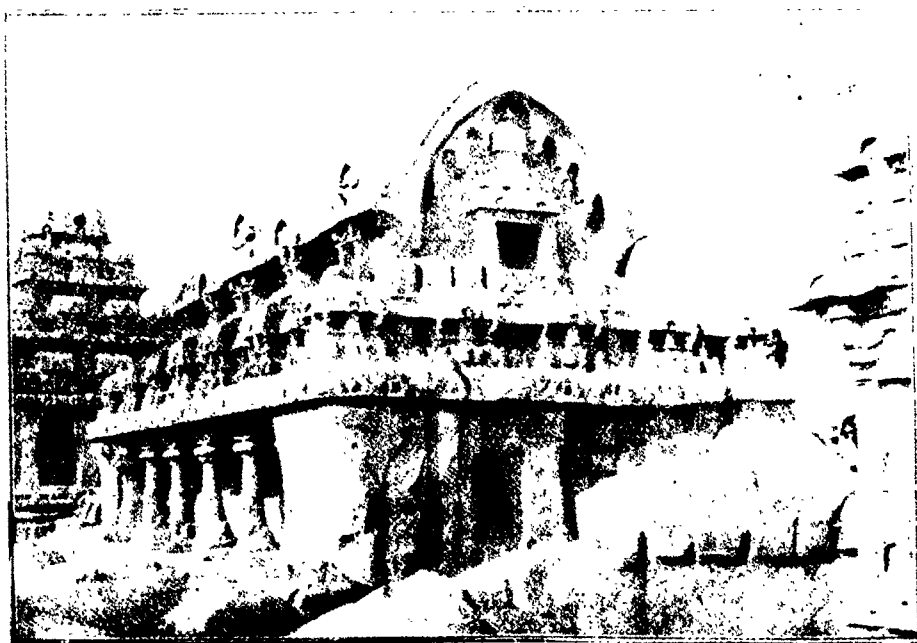
৩। অর্জ্জুন-রথ।

এটি সমতলছাদযুক্ত বৌদ্ধবিহারের অনুকরণ এবং আকারে পিরামিডের ন্যায়। ইহার আয়তন ১১×১৬×২০ ফুট। ত্রিতল।

৪। ভীম-রথ।

ইহার একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। আয়তন ৪২×২৫×২৫ ফুট। পশ্চিমমুখ বারান্দার স্তম্ভগুলির মূলদেশের শৃঙ্গযুক্ত সিংহমূর্ত্তি হইতে উহাদিগের 'পল্লভ'গোত্র বুঝিতে পারা যায় এবং এই মন্দিরের নির্ম্মাণে যে পল্লভেরা চালুক্য ভাস্করদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাও অনুমিত হয়।

৫। ধর্ম্মরাজ-রথ।

রথগুলির মধ্যে গঠন নৈপুণ্যে এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়তন ২৭×২৫×৩৪ ফুট। চতুস্তল। চতুর্থতল অষ্টভূজ গম্বুজাকৃতি। প্রথম তলায় ১৮টি, দ্বিতীয়ে ১৪টি এবং তৃতীয়ে ১০টি সিঁড়ি আছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলে নানাবিধ বৌদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। প্রাচীরের একস্থানে শিব-শক্তির অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরগাত্র বেষ্টন করিয়া দুইটি প্রদক্ষিণমার্গ নির্ম্মিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি প্রধান প্রধান হিন্দু দেবতাদিগের মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এই মন্দিরে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। মহিষমর্দ্দিনী-মণ্ডপ।

এই মন্দির পূর্ব্ববর্ণিত রথগুলি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যে পর্ব্বতোপরি এখন সামুদ্রিক আলোকমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই দক্ষিণতম শীর্ষের মূল কাটিয়া রচিত। ইহাকে 'যমপুরী' বলে। ইহাতে মোট তিনটি প্রকোষ্ঠ বা গুম্ফা আছে। মধ্য প্রকোষ্ঠই অপেক্ষকৃত প্রশস্ত। এই প্রকোষ্ঠে মহাদেব, পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণু এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। শিব এবং পার্ব্বতীর একখানি করিয়া চরণ বৃষপৃষ্ঠে রক্ষিত। প্রাচীরের অন্যত্র মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি এবং অনন্তশয়নে নারায়ণের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রকটিত। শেষোক্ত মূর্ত্তির উপরিভাগে স্বরসঙ্গীতালাপী যক্ষ ও অপ্সর-মূর্ত্তি, এবং উহার পুরো-ভাগে অত্যাচার পীড়িত বিচারপ্রার্থীর দল নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি অন্যূন পাঁচ ফুট উচ্চ এবং এমন আশ্চর্য্য ভঙ্গিমায় রচিত যে উহাকে হঠাৎ জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর—অর্থাৎ পাপের সঙ্গে পুণ্যের—এই সংগ্রাম-চিত্রে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

৭। কৃষ্ণ-মণ্ডপ।

এই মণ্ডপ একটি উন্নত পর্ব্বতের পার্শ্ব কাটিয়া আধুনিক নাটমন্দিরের আকারে নির্ম্মিত। ইহাতে অনেক গুলি স্তম্ভ আছে, এই মন্দিরের প্রাচীরে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণের চিত্র খোদিত। এই চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির বামভাগে তিনটি গোপাঙ্গনা মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। উহাদের একজনের শিরে দধিভাণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে বলরাম, এবং তাঁহার পার্শ্বে দোহনরত গোপমূর্ত্তি—বাছুরের দ্বারা গাভীকে পানাইয়া লইতেছে। ঊর্দ্ধে বংশীধারী বালকৃষ্ণমূর্ত্তি বেণু বাজাইয়া গাভীকুলকে আহ্বান করিতেছে। উহার দক্ষিণে চকিতদৃষ্টি একটি বৃষমূর্ত্তি সম্মুখের একখানি চরণ বাড়াইয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যে দেখিলে মনে হয় যেন কোনও কারণে সে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ বৃষমূর্ত্তির মধ্যে পৃথিবীতে এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই মন্দিরে খোদিত নরনারী-মূর্ত্তির বেশভূষা হইতে প্রাচীন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

অর্জ্জুনের তপস্যা।

কৃষ্ণমণ্ডপের নিকটেই একটি বিরাট শৈলদেহে পাশুপতাস্ত্র-লাভের জন্য তৃতীয় পাণ্ডবের কঠোর তপস্যার বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শিল্পনৈপুণ্যের হিসাবে স্বয়ং ফারগুসন ইহাকে সমগ্রভারতে এক অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। পাহাড়টির আয়তন ৯৬×৪৩ ফুট। ইহার মধ্যভাগে মূলদেশ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত একটি ফাটা আছে। ইহাকে শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে এক মহানাগ এবং নাগিনীর আকারে পরিণত করিয়াছেন। উহাদের অবস্থান হইতে বোধ হয় যেন অর্জ্জুনের তপঃপ্রভাবে নাগদেবতাগণ সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেছে। উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি মধ্যে অর্জ্জুনের মূর্ত্তিই সর্ব্বাগ্রে দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। এই মূর্ত্তি ফাটা'র বামে অবস্থিত। অর্জ্জুন বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে ভর করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁর বক্ষ প্রশস্ত, কিন্তু বাহুযুগল এবং দক্ষিণপদ শীর্ণ। পার্শ্বে পাশুপতাস্ত্র লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত মহাদেব বর্ত্তমান। ঊর্দ্ধে চন্দ্রসূর্য্যাদি পরিদৃশ্যমান এবং তন্নিম্নে ভক্তজন-সমাকুল একটি বিষ্ণুমন্দিরের ছবি। দক্ষিণে গুরু দ্রোণাচার্য্য পদ্মাসনে সমাসীন। তাঁর এক হস্ত বামউরুর উপরে স্থাপিত, অন্য হস্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বক্ষ স্পর্শ করিয়া হৃদয়োপরি বিন্যস্ত। চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি নাশাগ্রভাগে স্থিরনিবদ্ধ। শৈলদেহের

নিম্নাংশে দেব, যক্ষ, বিদ্যাধর প্রভৃতি স্বর্গবাসীগণ অর্জ্জুনের মহাতপস্যা দেখিবার জন্য সমবেত। ফাটা'র দক্ষিণদিকে এক বিরাটদেহ হস্তী (আয়তন ১৭×১৪ ফুট) হস্তিনীসহ শিশু হস্তীর পাল লইয়া যেন অগ্রসর হইতেছে। প্রধান হস্তীর দন্তের ছায়ায় একটি বিড়াল পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর করিয়া এবং সম্মুখের পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া অর্জ্জুনের তপস্যার অনুকরণ করিতেছে, এবং বোধহয় এই চাহিতেছে যে দেবতা এই করুন যেন সাগর শুকাইয়া যায় এবং সে যেন উহার সকল মৎস্য নির্ব্বিঘ্নে আহার করিতে পারে। এই তপস্বী বিড়াল অথবা 'বিড়াল তপস্বী'র পার্শ্বেই বহু ইন্দুর নিশ্চিন্ত মনে এবং নির্ভয়ে বসিয়া রহিয়াছে। মহামনস্বী পণ্ডিত ফারগুসন বলেন, যে "খুব সম্ভব তৎকালীন নাগোপাসক জাতি সকলের নিকটে উদার বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা এবং শান্তিমন্ত্র প্রচারের জন্যই এই অত্যাশ্চর্য্য চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল। নিপুণশিল্পী তাঁহার বাটালির সাহায্যে বজ্রকঠিন শৈলদেহে ছবির দ্বারা যে অপূর্ব্বভাব ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, মানুষের কোন ভাষা তাহা ব্যক্ত করিতে পারিত না।"

৯। পঞ্চপাণ্ডব-মণ্ডপ।

অর্জ্জুনের তপস্যার নিকটেই দক্ষিণদিকে একটি বিশাল গুম্ফা উপরোক্ত নামে পরিচিত; ইহা সম্মুখের দিকে ৫০ ফুট এবং পশ্চাতে ৪০ ফুট প্রশস্ত। কতকগুলি অষ্টভূজ স্তম্ভ উপরের পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই স্তম্ভগুলির শীর্ষভাগের সঙ্গে ইলোরা এবং এলিফাণ্টা গুম্ফার স্তম্ভ শীর্ষের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

১০। গণপতি-মন্দির।

অর্জ্জুনের তপস্যার উত্তর-পশ্চিম দিকে একখানি অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত। আয়তন ২০×১১½×২৮ ফুট—ত্রিতল। ইহারই একখানি ছবি পূর্ব্ব প্রবন্ধে (শ্রাবণ বংখ্যায়) ভুল ক্রমে 'রথ চতুষ্টয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছি। রথচতুষ্টয়ের ছবি এইবারে দেওয়া গেল।

১১। রামানুজ-মণ্ডপ।

গণেশরথের দক্ষিণে একপ্রকার দৃষ্টির অন্তরালে ইহা অবস্থিত। এই গুম্ফাও সিংহমুণ্ডযুক্ত স্তম্ভোপরি রক্ষিত। এই মন্দিরের গৃহতলে একটি প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

১২। বরাহস্বামীর মন্দির।

পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপের দক্ষিণে পশ্চিমমুখ এই গুম্ফা একটি অখণ্ড গিরিগাত্র

বিদীর্ণ করিয়া রচিত। এখানেও এখন কোন বিগ্রহ নাই, কিন্তু এই মন্দিরের প্রাচীরে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে। বামদিকের দেয়ালে বরাহাবতারের চিত্র উৎকীর্ণ। বরাহ তাঁহার দক্ষিণ চরণ সহস্রশীর্ষ নাগের উপরে রাখিয়াছেন। নাগরাজ যুক্তপাণি হইয়া অবতারের বন্দনা করিতেছে। নাগরাজের নিম্নাঙ্গ সাগরতরঙ্গে নিমজ্জিত। বরাহের বামউরুর উপরে উপবিষ্ট লক্ষ্মীর প্রেমদৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে নিবদ্ধ। অবতারের দক্ষিণ হস্ত দেবীর দেহলতাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আর বামহস্তে দেবীর দক্ষিণপদ বিধৃত। বরাহ তাঁহার অন্য দুই হস্তে শঙ্খ এবং চক্র ধারণ করিয়াছেন। পতিপত্নী উভয়েরই দৃষ্টি প্রেমব্যঞ্জক। দেবতা তাঁহার বরাহমুখে দেবীর লাবণ্যময় দেহ চুম্বন করিতেছেন। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে পদ্মাসনা লক্ষ্মীর চিত্র উৎকীর্ণ। দেবী তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া উদ্বেলিত রত্নাকরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে এবং বামে নগ্নকান্তি সুরললনাগণ ধনভাণ্ড বহন করিতেছেন। ইন্দ্রগজেরা তাহাদের বিশাল শুণ্ডে ধৃত স্বর্ণকলস হইতে দেবীর শিরে মন্দাকিনীবারি ঢালিয়া দিতেছে। ঐ প্রাচীরের দক্ষিণভাগে একটি চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। গুম্ফার দক্ষিণ প্রাচীরে বলিদর্পহারী ত্রিবিক্রম বামনাবতারমূর্ত্তি পরিকল্পনার গৌরবে এবং শিল্পনৈপুণ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছে। উহা বুঝিবার বস্তু, কিন্তু বুঝাইবার বস্তু নহে।

১৩। স্থলশয়ান স্বামীর মন্দির।

এইটিই মহাবলিপুরে সর্ব্বাপেক্ষা—আধুনিক মন্দির। এখানে স্থলশয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তির যথাবিধি পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে। ইহা বৈষ্ণবদিগের এক মহাতীর্থ।

১৪। দোলোৎসব মণ্ডপ।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের সম্মুখে এই মঞ্চ অবস্থিত। ইহা সুকঠিন গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। উন্নত এবং প্রশস্ত প্রস্তরবেদীর উপরে পরম রমণীয় স্তম্ভ চতুষ্টয় ইহার ছাদকে ধারণ করিতেছে। এই মণ্ডপের দৃশ্যটি এমন হাল্‌কা এবং মাধুর্য্যময় যে একবার দেখিলে আর চক্ষু ফিরিতে চাহে না।

১৫। সিন্ধু মন্দির।

এই মন্দিরের বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধেই কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার একখানি ছবিও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যান্য মন্দির হইতে বহু

দূরে অনন্তবারিধিসৈকতে এই মন্দিরের নিঃসঙ্গ অবস্থান বড়ই চিত্তাকর্ষক। বহুকাল ধরিয়া এই মন্দিরই পৃথিবীর পর্য্যটকদিগের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে মহাবলিপুরের বিশ্ববিশ্রুত সপ্তমন্দিরে এখন মাত্র এই একটিই বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট ছয়টি সাগরের বুভুক্ষা নিবারণ করিতে আত্মদান করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের মতে যে সকল মন্দিরের বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকল বাস্তবিক "সপ্ত-মন্দিরে"র পর্য্যায়ভুক্ত নহে। আবার কেহ কেহ অন্যরূপও মনে করিয়া থাকেন। এই সিন্ধুমন্দিরের বেষ্টন-প্রাচীরের উপরে ঘনসন্নিবিষ্ট ছয়চল্লিশটি বৃষমূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই মন্দির প্রাচীনতম দ্রাবিড়ীয় আদর্শে গঠিত। উহার 'বিমান' অর্থাৎ চূড়াই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এক্ষেত্রে 'গোপুর' তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে গোপুরের প্রাধান্য পরবর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থাপত্যশিল্পে এই ক্রম-পরিণতির ধারাটি সমগ্র পৃথিবীতে একই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্পিদিগের মনোযোগও এই ধারা অবলম্বন করিয়াই ক্রমে মন্দিরাপেক্ষা Porch অর্থাৎ দ্বারমঞ্চের গঠন-সৌন্দর্য্যের দিকেই অধিকতর ধাবিত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রধান বিমান প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। ইহার শীর্ষবিন্দু কুম্ভাকার। তাঞ্জোরের মহামন্দির ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের আর কোন মন্দিরে এমন সুগঠিত বিমান দৃষ্ট হয় না। এই মন্দির সাগরসলিলে নিমজ্জিত একটি পর্ব্বতবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনকালে এই মন্দিরের প্রাচীরবেষ্টিত একবিশাল প্রাঙ্গনের অস্তিত্ব খননের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুবিধ দেবদেবী এবং জীবজন্তুর মূর্ত্তি মৃত্তিকাতলে প্রোথিত ছিল। সে সকল এখন বাহির করিয়া মন্দিরপার্শ্বেই সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই মন্দিরে এক বিরাট ষোড়শভূজ (sixteen-sided) শিবলিঙ্গ অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। হায়দরালীর দ্বারা এই ধ্বংস কার্য্য সাধিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। মন্দিরের একপার্শ্বে একটি গুম্ফা মধ্যে এক বিরাট মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি অনন্তশয়নে বর্ত্তমান। শিব এবং বিষ্ণুবিগ্রহের এরূপ পাশাপাশি অবস্থান ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই। বোম্বাইএর এলিফ্যাণ্টা গুম্ফায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের প্রকাণ্ড ত্রিমূর্ত্তরূপ এবং মাদ্রাজের ত্রিপদী পর্ব্বতে শিব শক্তি ও বিষ্ণু, সর্ব্বাকারে পূজিত অনিশ্চিতলিঙ্গ বালাজী বিগ্রহ,— এ সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের বিবর্ত্তন বিষয়ে ভাবুকের চিত্তে একই চিন্তার উদ্রেক করিয়া দেয়।

১৬। শ্রীকৃষ্ণের নবনী পিণ্ড

একটি পর্ব্বতের উপরে একখানি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর উক্ত নামে পরিচিত। প্রবাদ এইরূপ যে দ্রৌপদী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই নবনীপিণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এক 'বাঘের মাসী' লোভের তাড়নায় উহার কিঞ্চিৎ উদরসাৎ করায় উহার গোলাকৃতি পৃথিবীর ন্যায় দুইদিকে কিঞ্চিৎ চাপা না হইয়া বোম্বাই ওলের ন্যায় একদিকে একটু চাপিয়া গিয়াছে। না বলিয়া পরদ্রব্য ভোজন-করার অপরাধে সেই দুঃসাহসী বিড়ালকে বাঁধিয়া অর্জ্জুনের তপস্যাক্ষেত্রে হাজির করা হয়। সেখানে যাইয়া বেচারী সাধু সঙ্গে কিরূপ সাধু হইয়াছিল, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। সুতরাং আমাদের দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত বিড়ালতপস্বী-দিগের আদি জন্মভূমি মহাবলিপুরে কিনা, তাহা প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব-সিদ্ধান্ত-বারিধি ইত্যাদি ইত্যাদি মহাশয়েরা স্থির করিয়া দিলে বাধিত হইব। যাহাহউক, স্থানীয় জনশ্রুতি এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই প্রিয়নবনী-পিণ্ডকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রস্তরে পরিণত করেন। এই পাথরের ননী অথবা ননীর পাথরের সন্নিকটেই একগিরিশিরে বহু পাষাণখণ্ডের সমাবেশে রচিত উর্দ্ধোত্থিত-যুক্তপাণি অবনতমস্তক বন্দনাপরায়ণ এক প্রকাণ্ড মানবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজ বলির মূর্ত্তি বলিয়া বিদিত।

১৭। ধর্ম্মরাজ-সিংহাসন।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে এক বিষ্ণুমন্দিরের পরমরমণীয় দ্বারমঞ্চ দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মঞ্চ 'রায়ালা গোপুরম্' নামে প্রসিদ্ধ। 'রায়ালা' ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজয়নগরাধিপতিদিগের রাজোপাধি। এই গোপুরের আয়তন ৬৬×৪২ ফুট। উক্ত গোপুরের মধ্যভাগে আর একটি ফটক পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত এবং উৎকীর্ণ পুষ্পহার শোভিত পাঁচটি মনোজ্ঞ স্তম্ভোপরি রক্ষিত। এই ফটকের বিপরীত দিকে ধর্ম্মরাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্মরাজ কি যুধিষ্ঠির না অন্য কোন ন্যায়পরায়ণ মহীপতি তাহা বলা সুকঠিন। তবে স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে ইহার নিকটেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এক নৃপতি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তিনিই উক্ত সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেন। এই সিংহাসন একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ প্রস্তরবেদীমাত্র। ইহার একপ্রান্তে একটি সুন্দর সিংহমূর্ত্তি সমাসীন। এই বেদীর চতুর্দ্দিকে ইষ্টকাদির অস্তিত্বও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়।

"অর্জ্জুনের তপস্যা" (মহাবলিপুর)

কমলা প্রেস—কলিকাতা

প্রাচীন স্থাপত্যের হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কিছু আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।　　　　(ক্রমশঃ।)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

হিন্দুর পূজা।

পুতুলের পূজা করে না হিন্দু.—
　　কাঠ মাটি দিয়ে গড়া;
মৃণ্ময়-মাঝে চিণ্ময় দেখে
　　হ'য়ে যায় আত্মহারা।
বিশ্বধাতার শকতি আছে,
　　ব্যাপিয়া সর্ব্বস্থান;

কাঠ মাটিতে তাঁরে-ই শক্তি
　　আছে ত বিদ্যমান?
তাই সে শকতি পুতুলের মাঝে
　　পূজা করে যে হিন্দু;
নাহি বুঝিবারে পারিলে বিন্দু
　　কেমনে বুঝ্‌বে সিন্ধু?

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

সপ্তস্বরা।

(সমালোচনা।)

সপ্তস্বরা ঃ—কাব্যগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ছাপা কাগজ উত্তম, রঙ্গীন রেশমী কাপড়ে সোণার জলে মনোরম বাঁধান। মূল্য ১৲ এক টাকা।

নাম ঃ—মানুষের নামের মত, কাব্য এবং গল্পগ্রন্থের এখন আর নামের কোনও অর্থ থাকিবার প্রয়োজন হয় না। কাযেই এখন 'এষা', 'বেগুনপোড়া' সবই চলিতেছে। সুতরাং আলোচ্য কাব্যের কবি 'সপ্তস্বরা' নামের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য সাত সংখ্যার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তাঁহার 'দংষ্ট্রাদমন' প্রথম হেঁয়ালী কবিতাটি না লিখিলেও পারিতেন। তিনি তাঁহার কবিতা গুলিকে ৭টি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে ৭টি করিয়া কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; নাম সমর্থনের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। গ্রন্থ খানিতে সর্ব্বসমেত মোট একান্নটি কবিতা আছে বলিয়া কবি যদি উহার এক-পঞ্চাশৎস্বরা নামও দিতেন, তাহাতেও আমাদের আপত্তির কারণ থাকিত না। তবে 'সপ্তস্বরা' নামটি সুন্দর এবং কাব্যামোদীর কাণে লাগিবে ভাল। ইহাই নামের প্রকৃত সার্থকতা।

কিন্তু নাম যাহাই হউক, খাঁটি সোণা নামের অপেক্ষা রাখে না। রসগ্রাহীর চিত্তরূপ কষ্টিপাথরে পলকে উহার পরীক্ষা হইয়া যায়। এই উদীয়মান কবির মধুকণ্ঠ বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জে অপরিচিত নহে। ইতিপূর্ব্বেই ইনি 'মন্দিরা' এবং 'খঞ্জনী' বাজাইয়া অনেক গান শুনাইয়াছেন। এবারে স্বরসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ওস্তাদী কায়দায় কালোয়াতী 'সপ্তস্বরা' গাহিয়াছেন। ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ঝঙ্কারে, রসে, কৌতুকে, সৌন্দর্য্যে এবং সমবেদনায় এই 'সপ্তস্বরা' ভরপুর। কবির অনুভূতির শক্তি যেমন প্রবল, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের শক্তিও তদনুরূপ। স্বদেশ এবং স্বজাতির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ টন্‌টনে। জননীর পুণ্যগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে যাঁহার কোলে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সেই শ্যামা পল্লীজননীর বন্দনাগীতেই তিনি তাঁহার প্রথম মাঙ্গলিক পল্লী-সপ্তক গাহিয়াছেন :—

"জননী পল্লী আদিম নিবাস সুখের স্বর্গ স্মৃতির তীর্থ,
ধ্যানের ধারণা জ্ঞান গায়ত্রী পিতৃলোকের পীঠ মা নিত্য।"

মায়ের কথা বলিতে গেলে যেমন সে কথা আর ফুরায় না, কত স্নেহের কত স্মৃতি একের পর আর আসিয়া চিত্তকে মথিত করিতে থাকে,—শৈশব লীলার আনন্দ নিকেতন পল্লীর স্মৃতিও সেইরূপ। কবির হৃদয়কে মথিত করিয়া অপূর্ব্বভাবে এবং ছন্দে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। ধূলাখেলার কথাটাই আগে মনে পড়ে, তাই কবি গাহিয়াছেন :—

"যেথা ধূলা খেলে ধনীর দুলাল পথে কাঙ্গালের তনয় সঙ্গে
সেথা তুমি দেবী, বিশ্বজননী, অতুল ভুবনে পল্লী বঙ্গে।"

ইহার প্রথম ছত্রে কবি বঙ্গপল্লীর কি উদার চিত্রই আঁকিয়াছেন!
তারপরেই সেই শত স্মৃতি বিজড়িত আঁকা বাঁকা পল্লী পথের কথা :—

"হেথা নবোঢ়া বধূর কত আঁখি জল পড়েরে
ক্ষৌমবসন বাহি
প্রথম পিতৃগৃহত্যাগকালে করে সে
দর্শন চাহি চাহি
অশ্রুতে অবগাহি ;—

* * *

তারপরেই— "ওগো আবার যখন ফিরে আসে বালা বাড়ীতে
সে যায় এ পথ বেয়ে
এ বাতাস মাটী এ আলোক তার নাড়ীতে
জেগে ওঠে দেহ ছেয়ে,—
মুক্তির সাধ পেয়ে ;—"

সহানুভূতির আলোকে এই কবিতাগুলি হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল ;
পুনরায় অনুরাগরঞ্জিত ভাষায় কবি বলিতেছেন :—

"ওগো পরিণয় আর উপনয় জগত তিথিতে
এই পথ চিরসাথী

রঙ্ হরিদ্রা রঞ্জিত, শত গীতিতে
মুখর দিবসরাতি ;
লোকের বিপদে মাতি
ধূসর এ পথখানি
সকরুণ স্নেহে সারা গ্রামখানি ডাকিয়া
ব্যথিতেরে দেয় আনি।

ইহার শেষ ভাবটির কল্পনা কি মনোরম !

আবার— "আপনি পুরুষ সসম্ভ্রমে পথটি ছেড়ে সরে
নারীর গর্ব্ব পল্লী আমার এম্‌নি রক্ষা করে।"

শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী সহরবাসীর ইহাতে শিখিবার কিছু নাই কি ?

ক্রমে— পল্লী দীঘির "কাকচক্ষুজলে"—
"যুবতীরা অসঙ্কোচে ডুবিয়ে দেহ বল্লরী
ভাসিয়ে ঘড়া গা হাত মাজে ঝুম্‌ঝুমিয়ে মল্ চুড়ী"

পল্লীসন্ধ্যায়— "চাষার বাড়ীর বড় ঘরের রকে বাঘবন্দী খেলা"

পল্লীহিমে— "ফসল ভরা ক্ষেতের মেলা ঝাপ্‌সা ধূসর দোলাই গায়
স্বর্ণ হরিৎ পর্দ্দা টানা এ মোর চোখের সীমানায়।"

পল্লীপৌষে— "হরেক রকম হচ্ছে পিঠে মিঠে সে যে কত
পায়স সেদিন রাঁধ্‌বে সবাই হোক না গরীব যত।"

এইরূপে একটির পর একটি পল্লীর সকল শোভা ও আনন্দের অনিন্দ্যসুন্দর ছবি আঁকিয়া কবি প্রাণভরা আবেগে গাহিয়াছেন :—

"পল্লী আমার, পল্লী আমার, আমার পল্লীখান্
মা তোর শ্যামল শাড়ীর খুঁটে বাঁধ গো আমার প্রাণ।"

* * *

"রহিম দাদা চষ্‌বে লাঙ্গল দেখ্‌তে যাব আমি
নাপিত বুড়ো বল্‌বে কাহিল ময়রা দিদির স্বামী
খোপা মামার পথ্য তরে
যাব জেলে জেঠার ঘরে
বাগ্‌দি পিসি কর্‌লে প্রণাম কর্‌ব আশীর্ব্বাদ
হাড়ি মা আর ডোম বৌকে ক'র্‌ব খুব উৎপাৎ।"

একেই বলে দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। এই যোগ যতদিন ছিল, ততদিন বঙ্গপল্লীতে পানীয় জলের অভাব ছিল না, কলেরা আর ম্যালেরিয়ার একাধিপত্য ছিল না। বাঙ্গালীর তখন দেহে শক্তি ছিল, প্রাণে আনন্দ ছিল, হৃদয়ে বল ছিল। আর, এখন ?—

"পল্লী যেন বৃদ্ধা মাতা জমায় দুঃখ সয়ে
সহর খোয়ায় দুষ্ট ছেলে খেলায় মত্ত হয়ে।"

এই জন্যই বাঙ্গালার পল্লীগুলি দিন দিন ছারে খারে যাইতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায়

বাপ পিতাম'র বাস্তুভিটে পল্লীভবনের মায়া চিরদিনের মতন কাটাইয়া সহরের পায় দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, কবির এই বাণী তাহাদের কাণে পৌঁছিবে কি ?

বর্ণ-সপ্তকে—"দান" শীর্ষক কবিতায় কবি বৃষকেতুর আত্মদানকে দানধর্ম্মের গঙ্গোত্রী করিয়া যুগে যুগে উহারই ধারার বিকাশ দেখাইয়াছেন।

* * *

"একটি নিঠুর কুঠারঘাতে
শিশুর উষ্ণ শোণিত পাতে
ধরার বুকে রইল আঁকা মহৎ দানের অটুট দাগ
রক্তের এই তর্পণেতে দেবের হ'ল অঙ্গরাগ ?
অই সে শিশু খেল্‌চে পথে পেয়ে অখিল প্রাণের ভাগ।"

* * *

তারপরে একলব্যরূপে—"জীবন ভরা সাধন দিল সেই গুরুকে হাস্যমুখে
শিষ্য হ'ল গুরুর গুরু দানের অতুল দিব্যসুখে !"

উপসংহারে— "এক সে শিশু এম্‌নি করে' খেলে মহীর ধূলির মাঝে
জীবন দিয়ে, সাধন দিয়ে, অস্থি দিয়ে তুচ্ছ সাজে।"

কি সুন্দর !

পূজা সপ্তকে—কবি ৺হেমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে যে অশ্রুতর্পণ করিয়াছেন, আন্তরিকতার হিসাবে তাহা অতুলনীয়। অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া উহার অঙ্গহানি করিলাম না।

কবির ৺দ্বিজেন্দ্র পূজার একটি নির্ম্মাল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* * *

"পঞ্চশত বৎসরের সমুদায় পাদুকা প্রহারে
হয়নিক এতশিক্ষা—হাসিভরা তব কশাভারে
হইয়াছে যতটুক। হাসি অশ্রু দুটি গণ্ডবেয়ে
এক সঙ্গে পড়িয়াছে এ দুর্ভাগা দেশখানি ছেয়ে।"

* * *

"বঙ্গ নাট্যে দেখাইলে যে গৌরবময় দৃশ্যপট—
কোটি স্তব পূজা অর্ঘ্যে রচিবে সে তব স্মৃতিমঠ।"

'সুর-সপ্তকে' কবির প্রতিভা তেমন ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

শোভা-সপ্তকে—'জ্যোৎস্না', 'বর্ষাসঙ্গীত' এবং 'শরৎলক্ষ্মী' তিনটি অতি মনোহর কবিতা। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের যৌবনের লেখা পড়িতেছি। সেইভাব, সেইভাষা, সেই ঝঙ্কার, অথচ কুত্রাপি অক্ষম অনুকরণের গন্ধমাত্র নাই। একজন নবীন কবির পক্ষে ইহা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে। 'জ্যোৎস্না' শীর্ষক কবিতাটি কল্পনার মাধুর্য্যে, ভাষার পারিপাট্যে এবং ভাবব্যঞ্জনায় কবির পত্মরত্নহারে মধ্যমনির ন্যায় সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য উহার দুচার ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—

"জ্যোৎস্না উঠেছে ফুটি ;——
এ যেন স্বর্গে দেবশিশুদল হাসিতেছে কুটি--কুটি ;
যত দেবর্ষি সোম নির্য্যাস
ঢালিতেছে একমনে
বিশ্বপাত্র ছাপায়ে যেন তা বসুধাতে পড়ে লুটি."

* * *

"যেন স্বর্গের দীপান্বিতার আলোক আসিছে ছুটি,"

* * *

"এ যেন অখিল রত্নকোষের দুয়ার গিয়াছে খুলি ;
কি সৌন্দর্য্য, এযেন মিলিত রূপ ও অরূপ দুটি ।"

বঙ্গ ভাষায় এমন জ্যোৎস্নাবর্ণন আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না নারী-সপ্তকে—কবি জননী, ভগ্নী ও প্রেয়সীরূপা নারীর যে স্তুতি বন্দনা রচিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় পবিত্র হয়, কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া উঠে। নারীর রূপসী মূর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া তিনি তার মহিয়সী দেবী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন। নারীকে দেবী বলিলে নারীর অন্তরের যে রূপ, আমরা তাহারই আভাস পাই, দেহসৌন্দর্য্যের নহে। এই জন্যই এদেশে নারীর উপাধি দেবী রূপসী নহে। তাই কবি রূপের মোহকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন :—

বাহিরের চাকচিক্য ক্ষণিকের এই আবরণ
রঙ্গীন্ মলাট,—
এত তার স্তবগান ? তারি হেন বিজয় নির্ঘোষ ?
এত তার ঠাট্ ?"

* * *

"রূপ যদি থাকে রমণীর, অন্তরে,—সে নহে দেহে,
সহজ সে রূপ,
অম্লান উজ্জ্বল সে যে অফুরন্ত রূপের নিঝর
নহে মূর্ত্তিস্তূপ !"

বঙ্গ নারীর বন্দনায় কবি গাহিয়াছেন :——

* * * * *

"সারা-গৃহকাজে আলিপনা সম যাহার কোমল করুণা রাজে
সংযমকৃশ তনুখানি বেড়ি জয় মঙ্গল আরতি বাজে।"

* * * * *

"লজ্জা যাহার দেহখানি ঢাকি লজ্জায় নত চরণরাগে,
কামনা যাহার রিক্ততা মাগি বিলায়েছে নিজে সেবা ও ত্যাগে।"

* * * * *

"বিনয় মিনতি ভরা চোখ্ দুটি ক্ষমামণ্ডিত সকল কায়।"

* * * * *

"তিল তিল করি অনু অনু করি বিলীন যে হৃদি সবার মাঝে।"

* * * * *

"জননী ভগ্নী প্রিয়া রূপে তার হাতে শুভাশীষপূর্ণ ঝারি
বঙ্গে গৃহে সে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার বঙ্গনারী।"

কি পবিত্র বন্দনা।

বিধবার দুঃখে কবির সমবেদনা এবং পতিতার প্রতি কবির করুণাও অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না।

গীতি-সপ্তকে—কবি হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কবির হাত এখনও ভাল করিয়া পাকে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এখানেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে স্বর্গীয় কান্ত কবির রসপদাবলী মনে পড়িয়া যায়। 'মক্কেল বন্দনা' শীর্ষক কবিতাটিই রসমাধুর্য্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। নিম্নে উহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল :——

* * * * *

"তুমি চির-সৎ ; তুমি বিনা আমি একদম্ চিৎ হইয়া
চক্ষে নেহারি সর্ষপ ফুল সুত কলত্র লইয়া!
সব আনন্দ উৎস স্বরূপ তুমি বাঞ্ছিত বন্দ্য
আইন জীবীর ইহ পরকালে তুমি সচ্চিদানন্দ।"

আবার—"মক্কেল তুমি স্বল্পভাষীরে করে তোল এক বক্তা,
বাত পঙ্গুরে লজ্যাও গিরি দিয়ে কমিশনে তক্তা।"

কবির এই শেষ হাসিটুকু যে অনেকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কবি স্থানে স্থানে কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া কবিতার তরল স্রোতে উপলখণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় রসভঙ্গ করিয়াছেন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ভাষার আভিজাত্য বাড়ে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। কবির সে ধারণা থাকিলে আমরা তাঁহাকে উহা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করি।

পুস্তকের মূল্য আরও কম হওয়া উচিত ছিল। বই খানির আর সবই ভাল। একজন নবীন কবির এমন একখানি কাব্যগ্রন্থ পড়িবার সৌভাগ্য আমাদের বহুদিন ঘটে নাই। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতন নিত্য নিত্য কত কবিতাই ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার জল বদ্‌বুদের মতন নিমেষে ফাটিয়া যাইতেছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তারি মধ্যে এমন রূপে রসে গন্ধে ভরা কাব্য কুসুম ফুটিতে দেখিলে প্রাণে যে আনন্দ হয়, মনুমেণ্টের মাথায় চড়িয়া উচ্চস্বরে কবির জয়বাদ করিতে পারিলে তবেই সে আনন্দ প্রকাশ করা যায়। এই ভাগ্যবান্ কবির লেখনী-শিরে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বিংশশতাব্দীর শিবের গান।

(১)

সতী তিনি, দাক্ষায়ণী, আমি পাগল শিব,
পতির নিন্দা শুনে কাণে
ঘা লাগেনা আর সে প্রাণে,
বাপের বাড়ীর গুণগানে নিয়ত উদগ্রীব।

(২)

তপস্বিনী উমা তিনি, আমি তাপস শিব,
ছেলে বেলা আমার ধ্যানে
ছিলেন কিনা কেবা জানে?
এখন তাঁহার প্রেমের টানে বেড়িয়ে আসে জিভ্।

(৩)

তিনি ধন্যা অন্নপূর্ণা আমি কাঙাল শিব
পাই না এখন খেতে পায়স,
পাচ্চি বটে ছাতার ডাণ্ডস্
সাবাস তাঁহার শক্তি সাহস, পুরুষ যে হয় ক্লীব।

(৪)

তিনি জায়া মহামায়া, আমি অঘোর শিব,
দেখ্‌লে তাঁহার করালবদন
আঁৎকে থামে হৃদ্‌স্পন্দন—
চরণতলে লভি' শয়ন গণি যে নসিব।

(৫)

গৌরী তিনি, গরবিনী, আমি ভোলা শিব,
স্বামী আমি ভুলে হা-রে
সব ক্ষমতা দিলাম তাঁরে
এখন বাঁধা কারাগারে—তিনি যে মনিব।

(৬)

তিনি নারী বিশ্বেশ্বরী, দিগম্বর এ শিব,
বিশ্ব দিয়ে তাঁহার করে
নিঃস্ব আমি,—কাজ কি ঘরে?
ভস্ম মেখে তাই ত ঘোরে এ নিরীহ জীব।

শ্রীরসময় লাহা।

সমর সংবাদ।

পশ্চিম রণক্ষেত্র ঃ—সোমনদীর উভয় তীরে ব্রিটিশ মিত্র পক্ষের নূতন আক্রমণ গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে আরম্ভ হয়। এই আক্রমণের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১৬ মাইল ব্যাপী জর্ম্মাণ প্রথম লাইন ও প্রায় ৮ মাইল ব্যাপী জর্ম্মাণ দ্বিতীয় লাইন অধিকৃত হয়। তদবধি আরও অনেক নূতন নূতন স্থান অধিকৃত হইয়াছে। জর্ম্মাণবাহিনী এই নূতন আক্রমণের বেগ এখনও প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। মোটের উপর এই আড়াইমাস যাবৎ যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশের ২৯টি স্থান জর্ম্মাণ অধিকার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। জর্ম্মাণদিগের তৃতীয় বা শেষ সুরক্ষিত লাইনের কতক অংশ একবার দখল করিতে পারিলে মিত্রবাহিনী বিশেষ দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে পারিবেন আশাকরা যায়।

ভার্ডুন সমর ঃ—ভার্ডুন দুর্গ অধিকার করিবার জন্য জর্ম্মাণগণ প্রায় পাঁচমাস যাবৎ বহুসৈন্য ক্ষয় করিয়া ভীষণবেগে যুদ্ধ চালাইতেছেন। অনেকে বিবেচনা করেন যে এই আক্রমণের বেগ প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই সোমনদীর তীরে মিলিত ব্রিটিশ মিত্রবাহিনী গত জুলাই মাসে নূতন আক্রমণ করেন। অন্ততঃ ইহাও যে এই আক্রমণের একটি উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক, নূতন আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ক্রমশঃ ভার্ডুনে জর্ম্মাণ আক্রমণের বেগ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়। ইতি মধ্যেই ২।১টি স্থান ফরাসীগণ পুনরধিকার করিয়াছেন এরূপ সংবাদ আসিয়াছে।

প্রাচ্য রণক্ষেত্র ঃ—গত জুনমাসে রুষবাহিনী প্রিপেট নদীর দক্ষিণ হইতে রুমানীয়ার সীমান্ত অবধি প্রায় ২৫০ শত মাইল ব্যাপী অষ্ট্রিয়ানবাহিনী কর্ত্তৃক রক্ষিত লাইন আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে উত্তরাংশে লাজক্ দুর্গ পুনরধিকৃত হয় এবং ঐ দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৪০ মাইলব্যাপী অষ্ট্রিয়ান্ লাইন ভেদ করিয়া রুষবাহিনী প্রায় ৫০।৬০ মাইল অগ্রসর হন। দক্ষিনাংশে রুমাণীয়ার প্রান্ত হইতে উত্তরে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী লাইনেও অষ্ট্রিয়ান্‌বাহিনী পরাভূত হইয়া হটিয়া যায়। ইহার ফলে রুষবাহিনী বুকোভিনা প্রদেশ দখল করিয়া কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতের সন্নিকট পর্য্যন্ত দক্ষিনাংশে অগ্রসর হন। এই উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যস্থ প্রায় ১২৫ মাইল ব্যাপী লাইনে অষ্ট্রিয়ান্‌বাহিনী বহুদিন যাবৎ আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উভয় প্রান্তের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় এই বাহিনী ক্রমে হটিয়া ষ্ট্রিপানদীর পশ্চিম পারে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় হটিয়া যাইয়া লিপানদীর অপরপারে আসিয়া বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছেন। বিগতমাসে রুষবাহিনী সমতল ভূমিতে বিশেষ কোনও নূতন স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। তবে কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতমালায় ২।১টি গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছেন।

যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় রুষিয়ার নূতন আক্রমণের বেগ প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে।

রুমাণীয়ার যুদ্ধ ঘোষণা ঃ—গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে রুমাণীয়া ব্রিটিশ মিত্র পক্ষে যোগদান করিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। জর্ম্মাণী, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক ইহার পরেই রুমাণীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। অনেকেরই মনে করিতেছেন—যে মিত্রপক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত বুঝিয়াই রুমাণীয়া এই ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন।

রুমাণীয়া দেশটি তৃতীয়ার চন্দ্রকলার ন্যায় অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ট্রান্‌সিলভেনিয়া প্রদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক ঘিরিয়া অবস্থিত। রুমাণীয়ার আকাঙ্ক্ষা এই যে অষ্ট্রিয়ার ঐ ট্রান্‌সিলভেনিয়ান্ প্রদেশটি কবলিত করিয়া পূর্ণ-চন্দ্রের আকার ধারণ করেন। ট্রান্‌সিলভেনিয়া আল্‌পস্ পর্ব্বতমালা ও কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতমালা রুমেণীয়ার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। যুদ্ধঘোষণার পরেই রুমাণীয়বাহিনী অগ্রসর হইয়া এই দুই পর্ব্বত মালার কয়েকটি গিরিসঙ্কট দখল করিয়া, আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। রুমাণীয়া পশ্চিম সীমান্তে সার্ভিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত মিলিত, মধ্যে ডানিউব নদী মাত্র ব্যবধান। এই সীমান্তে ডানিউবের অপরপারে অষ্ট্রিয়ার অর্সোভা দুর্গ অবস্থিত। যেরূপ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধহয় এই অর্সোভা দুর্গও রুমাণীয়বাহিনী দখল করিয়াছেন।

রুমাণীয়ার দক্ষিণদিকে ডানিউব নদীর অপরপারে বুলগেরিয়া দেশ। মিলিত বুলগার ও জর্ম্মাণবাহিনী বুলগেরিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া ডানিউব নদীর তীরস্থ টুরটুকাই নামক রুমাণীয়ার অন্তর্গত সহরটি দখল করিয়াছেন। এই স্থানে ডানিউব নদীর উপর একটি সেতু আছে এবং ইহা রুমাণীয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট নগর হইতে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। যাতায়াতের জন্য রেল-পথও আছে।

রুমাণীয়ার পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণসাগর ও উত্তরপূর্ব্ব দিকে রুষিয়া। ডানিউব নদী রুমাণীয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া প্রায় পূর্ব্বসীমান্তের নিকটে আসিয়া উত্তরবাহিনী হইয়া এই প্রান্তে আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া এই উভয়দেশের মধ্যদিয়া কৃষ্ণসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। একটি রুষবাহিনী রুমাণীয়ার সাহায্যার্থে ডানিউব পার হইয়া দক্ষিণদিকে কৃষ্ণসাগরের সন্নিহিত রুমাণীয়ার ডোব্রুজা প্রদেশের মধ্য দিয়া বুলগেরিয়ান্ সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে রুমাণীয়ার সীমান্তে বেজাজিক্ নামক স্থানে রুষ ও বুলগারবাহিনীর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বুলগার-বাহিনীই পরাস্ত হইয়াছে।

অবস্থাদৃষ্টে বিবেচনা হয় যে যদি রুষসৈন্য বুলগেরিয়া ভেদ করিয়া গ্রীসের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে বুলগেরিয়া ও তুর্কীর সহিত জর্ম্মাণীর যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইবে এবং এই দুইটি ক্ষুদ্রশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে মিত্র

পক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে জর্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া দক্ষিণদিকে অবরুদ্ধ হইবে, এবং এসিয়ার সহিত যোগাযোগ ও খাদ্যদ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ হইবে। ফলে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়াকেও বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইবে।

অপরদিকে আবার যদি রুষবাহিনী বুলগেরিয়ার সীমান্তে বাধা পাইয়া অগ্রসর হইতে না পারে, তবে অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষিণদিক হইতে বুল্‌গার ও তুর্কবাহিণী এবং পশ্চিম ও উত্তরদিক হইতে জর্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান্‌বাহিনী রুমাণীয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রুমাণীয়াকে সার্ভিয়ার দশায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে।

চাট্‌নী।

"আহা, বউটি যেন লক্ষ্মী!"

"লক্ষ্মী হবে না? বে ক'রেছে যে আমাদের নারাণ গো!

"গঙ্গা হ'লেন কি না দুর্গার সতীন্‌——"

"ওমা তাই ত! গঙ্গা স্নান ক'রে—গঙ্গাজল নিয়ে তবে এখন দুগ্‌গো মণ্ডবে কি ক'রে যাই দিদি? মা যে চটে যাবেন!"

"মিনুর একটি 'বর' যে কে জুটিয়ে দেবে!"

"দুর্গার কাছে চা মা—দুর্গার কাছে চা! তিনিই কিনা বরদা, বর তিনিই দেবেন।"

'পাখ' আছে, তাই ওকে বলে পাখী।"

"কাক নেই—তবে কি করে হ'ল কাকী?"

"কাক না থাক্‌—কাকা ত আছে?"

ছেলে। (ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেছে)—আজ্ঞা আই, বলদ গাই! আজ্ঞা আই বলদ—গাই!

মাতা। দূর হ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া। আজ্‌ আই গুরুজন, তাদের ব'ল্‌ছিস্‌ 'বলদ গাই।' এই কথা তোর বইতে লিখেছে! ছিঁড়ে ফেল ছিঁড়ে ফেল্‌—অমন বই!

"চাঁদের আলো—সব সূয্যির ঠেঁয়ে ধার করা। জান ঠাকুমা?"

"ওমা তাই নাকি! সূয্যিঠাকুর "তবে মাহাজনী ক'রে খায়? তা সুদ কি নেয় রে?"

আহা, মেয়েটি শেষে যমকেই বরণ ক'ল্লে?

"কল্লে ত! কালিন্দী যে সতীন, মানিয়ে এখন ঘর ক'ত্তে পাল্লে হয়!"

সরস ও সারগর্ভ সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র মাসিকপত্র।

তৃতীয় বর্ষ।

১ম খণ্ড

(১৩২৩ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩২৩ পর্য্যন্ত)

সম্পাদক—

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ।

প্রকাশক—

সাহিত্য প্রচার সমিতি লিমিটেড।

২৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

সন ১৩২৩ সাল।

আলেখ্য

তৃতীয় বর্ষ।

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

(১৩২৩ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩২৩)

গল্প, উপন্যাস ও নাটক।

কবিতা।

আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি

চিত্র সূচী।

৩য় বর্ষ | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। | ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি।

প্রথম অংশ।

—∞—

বৌদি'।

(১)

"বৌদি' ঘরে আছ ?"—শিশির বারান্দায় উঠিতে উঠিতে ডাকিল।

"কে, শিশির আমাকে ডাক্‌ছ ?"—একটি হাস্যপ্রফুল্লমুখী নারী দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া কহিল।

"দাদার চিঠি এসেছে,—দেখ ত, আমার কথা কি লিখেছেন"—

স্বামীর চিঠি আসিয়াছে শুনিয়া, গৌরীর বুকের মধ্যে যে শোণিত প্রবাহটা এতক্ষণ শান্তভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল, সেই শোণিত প্রবাহটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা ক্ষণিক দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস সুগৌর মুখখানিকে একটু রঞ্জিত করিয়া দিয়া গেল। চক্ষু দুইটি একটু নত হইয়া আসিল।

শিশির তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে দ্রুত চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, "বাহা—রে!—চিঠি পড় শীগ্‌গির, হাতে করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত আমার কাজ হবে না!"—

ইতিমধ্যে গৌরীর বুকের দ্রুত স্পন্দনটা কিছু শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে তাহার দেবরটির অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা' তোমার এত গরজ যদি, চিঠি খুলে এতক্ষণ পড়্‌লেই ত পার্‌তে।"—

শিশির হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আমি নাকি পরের চিঠি খুলে পড়্‌ব!—বৌদি' বলে কি?"—

"আমি কি তবে তোমার 'পর' হ'লাম শিশির?"—গৌরী তাহার স্বরটা একটু গাঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু শিশিরের মুখের বিস্মিত ভাব, ও তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটা দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল!

শিশির কহিল,—"বাঃ,—আমি বুঝি তাই বল্‌লাম!—তুমি পর হতে গেলে কেন? আমি বলছিলাম কি,"—

"—কি তুমি বল্‌ছিলে?"

"যাও, তুমি হাসছ, কারু চিঠিই দেখ্‌তে নেই,—এই অন্যের চিঠি"—

"তা' 'অন্য' ত' 'পর'—নয় কি?"—

—"কি মুস্কিল, কারু চিঠি আর কারুর দেখ্‌তে নেই,—বিশেষ খামের চিঠি!"—

বৌ দিদি যে 'পর' কথাটাকে অমন শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে শিশির ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

"তা' আমি বল্‌লে তো আর বাধা নেই, তুমি খুলে পড়!"—

শিশির বিপদে পড়িল। বৌদি নিশ্চিন্তভাবে তাহাকে চিঠি খুলিয়া দেখিতে বলিল, সে তাহা পারিল না। তখন সে মিনতির স্বরে কহিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, দাদা আমার কথা কি লিখেছেন, তুমি চিঠি পড়ে বল।"

একটু হাসিয়া গৌরী চিঠি খুলিয়া পড়িল, তারপর শিশিরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "এইবার পড়ে দেখ, তোমার কথা কাজে লাগ্‌ল না, আমি তা' আগেই বলেছিলাম!"

শিশিরের প্রকাণ্ড চক্ষু দুইটা ভরিয়া জল আসিতেছিল, সে অভিমানের স্বরে কহিল,—"তবে ছাই ও চিঠি আমি পড়্‌ব না!—আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এর মধ্যে তুমি এক চাল দিয়েছ, বৌদি,'—তুমি আমার পক্ষ হ'লে দাদা অমত কর্ত্তেন না"—

"হাঁ তা' ত বল্‌বেই এখন, আমি 'পর' কি না,—তোমার দাদাটি ভাল, আর দোষ হ'ল যত আমার! তা' তুমি চিঠিখানা একবারটি পড়েই দেখ না,

শিশির, তার পর আমার দোষ দিও!"—গৌরীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা মুখখানিকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল!

তখন শিশির চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িল; পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি গৌরীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—"ইঃ—ভারি কি না লিখেছেন! আমি ছোট বলে কেউ আমার কথা গ্রাহ্যিই করে না। তুমি দাদার পক্ষে—তুমি দাদার পক্ষে! তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি! চল্‌লাম আমি দক্ষিণ পাড়ায়, সেখানে আজ আমাদের 'ক্লাব্' আছে! দুপুর ঘুরে না গেলে আর আস্‌ছি নে, থেকো ভাত নিয়ে বসে, দাদার পক্ষে যাওয়ার মজাটা টের পাবে এখন!"

শিশিরের আহার না হওয়া পর্য্যন্ত গৌরী যে উপবাসী থাকিবে, তাহা শিশির বিলক্ষণ জানিত। একটু ছোট থাকিতে দুরন্ত শিশির গৌরীকে এমনি করিয়া মধ্যে মধ্যে ভয় দেখাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত; তারপর বৌদিদির কষ্ট হইবে ভাবিয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আহার করিত এবং একটা নূতন আব্‌দার ধরিয়া গৌরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত! কিন্তু ইদানীং একটু বড় হইয়া এমনটা আর বহুদিন করে নাই।

আজ নাকি শিশির বড় রাগিয়া গিয়াছিল, তাই বৌদিদিকে ছেলেবেলার মতই জব্দ করিবে বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য দ্রুতপদে উঠানে নামিয়া আসিল।

গৌরী হাসিতে হাসিতে ডাকিয়া কহিল, "ওরে পাগ্‌লা—ও শিশির! ওরে আমার মাথা খা'স্ যা'স্‌নে। এতটা বেলা হয়েছে, একটু কিছু খেয়ে যা'!"—

বৌদিদির কথা শুনিয়া শিশির ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তোমার অত বড় মাথাটা নাকি আমি খেতে পারি? তা' ভাত আমি সেই দুপুরের পর ছাড়া খাচ্চিনে,—বুঝ্‌বেই এখন মজাটা কেমন!"—

"তা', ভাত না খাস্, যা' এখন দি' তা ত খেয়ে যা'!"—

গৌরী ঘরে যাইয়া একটা পাথুরে বাটিতে করিয়া কিছু মুড়ি, খানিকটা ঘরে পাতা দধি ও কয়েকটা কলা লইয়া আসিল! বারান্দায় একখানা ছোট আসন পাতিল, তারপর স্নেহতরলকণ্ঠে ডাকিল, "লক্ষ্মী দাদা আমার, কিছু খেয়ে যাও, নইলে আমার মনটা অস্থির থাক্‌বে এখন, কোনও কাজই কর্‌তে পার্‌ব না!"—

বারান্দায় উঠিতে উঠিতে শিশির তাহার ক্ষুদ্র অধর উল্‌টাইয়া কহিল,—"ইঃ

ভারি লক্ষ্মী কি না!—মেয়েগুলোই লক্ষ্মী হয়,—ছেলেদের লক্ষ্মী হওয়ার জন্য ভারি দায় পড়ে গেছে!"—

মূহূর্ত্ত মধ্যে আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া শিশির আহারে মনোযোগ দিল। গৌরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুরন্ত দেবরটির খাওয়া স্নেহাশ্রু-সজল চক্ষে দেখিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে শিশির কহিল, "বেশ দৈ, বৌদি আর আছে?"

গৌরী হাসিয়া কহিল,—"আছে,—দেব?"—

—"দেবে না ত কি তোমার জন্যে রাখ্‌বে?"—

গৌরী দধির পাত্রটা ধরিয়াই লইয়া আসিল; শিশির চাহিয়া দেখিল, বেশী নাই! এক চামচ দিতেই শিশির তাহা হাত পাতিয়া লইল, একটু মুখে দিয়াই কহিল, "ইস্, এগুলি টকে গেছে,—আমি আর নেব না!"—

দেবরটির ভাব দেখিয়া গৌরী হাসিতে হাসিতে কহিল, "এরি মধ্যে ট'কে গেল, শিশির? আর একটু দি'!—এই কত রয়েছে!"

"রয়েছে ত রয়েছে;—আমি আর নেব না।"

সন্তানহীনা গৌরী তাহার দুরন্ত দেবরটির উপরেই তাহার ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াছিল! তাহার আব্দার প্রতিপালন করিয়া, তাহার দুরন্তপণা সহ্য করিয়া গৌরী পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

যেদিন শিশির কোনও আব্দার না করিত সে দিনটা গৌরীর কাছে ব্যর্থ মনে হইত! যেদিন শিশির শান্তশিষ্টভাবে দিনটা কাটাইয়া দিত, সেদিন গৌরীর বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা মৃদু বেদনা, একটু অস্বস্তি জাগিয়া উঠিত

শিশির যখন এতটুকু ছোটটি ছিল, তাহার তখনকার আবদারের, দুরন্তপণার ইতিহাসটি স্মরণ করিয়া, আলোচনা করিয়া, গৌরীর হৃদয় ...ক চঞ্চল হইয়া উঠিত, চোখের কোণে স্নেহাশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইত!

কিন্তু শিশির যে এখন বড় হইয়া উঠিতেছে! আর ত সে ছেলেবেলার মত আবদার করিয়া, সময়ে অসময়ে দুরন্তপণা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে না!

তাই, কতদিন পরে শিশিরের আজকার এই অভিমানটুকু, আবদারটুকু, গৌরীর বড় ভাল লাগিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা বিপুল স্নেহোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিয়া তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল।

তাহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা, নয়ন কোণে স্নেহাশ্রুবিন্দু জাগিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরী একদৃষ্টিতে ঐ দুরন্ত ছেলেটির সুগৌর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার খাওয়া দেখিতেছিল। আহার শেষ করিয়া, জলের গেলাস মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া শিশির গৌরীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার চোখের কোণে অশ্রু; গেলাস নামাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে শিশির কহিল, "বৌদি,' তোমার চোকে জল কেন?"

গৌরী হাসিয়া কহিল, "তুই দৈ খেলি না কেন?"

শিশির বিস্মিতভাবে কহিল, "বাঃ, এই যে কতটা খেলাম? আচ্ছা, যেটুকু আছে, তোমার সঙ্গে বসে ভাত দিয়ে খাব এখন,"——

গৌরী হাসিয়া উঠিল।

শিশিরও অপ্রতিভভাবে একটু হাসিল। হাত মুখ ধুইয়া শিশির কহিল, "বৌদি,' দা'খানা দাও ত!"

"কেনরে, দা' দিয়ে কি হবে?"

—"পাতা কাটব!"—

গৌরী হাসিয়া কহিল, "বৌ আন নাই, ভাত খাবে কে?"—

"বৌকে পাতাকেটে আমি ভাত খাওয়াব না,—সে পার ত তুমিই খাইও!—না, সত্যি, দা'খানা দাও, তোমার কুমড়া গাছটায় মাচা করে দেব?"

—"কেন, ক্লাবে যাবি না?"

সপ্রতিভ শিশির উত্তর দিল, "সে যেতে হয় বিকাল বেলা দেখা যাবে!"—

'ক্লাবে' যাইতে হইবে, এবং দুপুর কাটিয়া গেলে বাড়ী আসিয়া বৌদিদিকে দাদার পক্ষাবলম্বনের জন্য জব্দ করিতে হইবে, সে কথা শিশির একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

গৌরী ঘরের ভিতর হইতে দা' আনিয়া দিলে সেই বলিষ্ঠ বালক, বৌদিদির কুমড়াগাছে মাচা করিয়া দিবার জন্য একটা আস্ত বাঁশ টানিয়া আনিয়া খণ্ড করিতে লাগিয়া গেল!

গৌরী ডাকিয়া কহিল, "ওরে হাতে চোট্ লাগে না যেন,—"

ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া শিশির কহিল, "ইঃ চোট্ লাগে আর কি! তুমি যাও তোমার কাজে! নারকেলের বড়ি ভেজ কিন্তু—বুঝ্‌লে?"

গৌরী চলিয়া গেল।

(২)

শিশিরের যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাহার মাতাঠাকুরাণী স্বর্গগত হয়েন। গৌরীর বয়স তখন পনের বৎসর। তার চারি বৎসর পূর্ব্বে সে প্রথম এই সংসারে প্রবেশ করে। শিশিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শচীনের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের কিছুদিন পরেই, পিতার কাল হওয়াতে, সংসার প্রতিপালনের ভার শচীনের উপরেই পড়ে! সুতরাং তাহাকে কলেজ ছাড়িয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয়। পঠদ্দশায় শচীনের হৃদয়ে কতকগুলি উচ্চ আশা ছিল; পিতৃবিয়োগের পর সে গুলি ছিপিখোলা শিশিস্থ কর্পূরের মতই উড়িয়া গেল।

কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; তাঁহারই সুপারিশে কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরি জুটিল; কয়েক বৎসরে বেতন কিছু কিছু বাড়িয়া ৫৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। সংসারের অবস্থা কোনও দিনই তেমন স্বচ্ছল ছিল না; পিতামাতার শ্রাদ্ধাদিতে কিছু ধারকর্জ্জ, দোকানদেনাও হইয়াছিল। এই সামান্য আয় হইতেই সমস্ত শোধ হওয়া দরকার। সুতরাং কলিকাতার মেস্ খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, শচীন প্রাণান্তেও তাহা হইতে একটি পয়সাও অন্য কোনও ব্যয় করিতে চাহিত না। বাড়ীতে সংসার খরচের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট টাকা কয়েকটি পাঠাইত, গৌরী পাকাগৃহিণীর মতই তাহা দ্বারা সংসারটি বেশ গুছাইয়া চালাইয়া লইত।

বাড়ীর চারিধারের জমিটুকু, কিছু টাকা খরচের উপর হইতে বাঁচাইয়া, গৌরী বেশ করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্র সংসারটির উপযুক্ত নানা প্রকার তরকারী শাকসব্জি গৌরীর যত্নে সেখানেই জন্মিত। বাড়ীখানির কোথায়ও বাজে জঙ্গল ছিল না; ঘরদুয়ার গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজান, গুছনি! কোথায়ও এতটুকু ত্রুটি লক্ষিত হইত না। কাহার নিপুণ হস্ত বাড়ী খানিকে সুন্দর করিয়া রাখিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত!

কমলা কখন স্বয়ং আসিয়া, বাড়ীখানির উপর তাঁহার চরণস্পর্শ দিয়া, গৌরীকে ছুঁইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারই মায়া স্পর্শ পাইয়া, সমস্ত বাড়ীখানি গৌরীকে কেন্দ্র করিয়া, কমলার পাদপীঠ শতদলটির মতই অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল!

সংসারে এক বৃদ্ধা পিসি ছিলেন, তিনি ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর পর তাঁহার হরিনামের মালাটিই সম্বল করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ীর পাশে একটি

অনাথা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ছিল, তাহাকে খাইতে দিবার কেহ না থাকাতে গৌরী তাহাকে সংসারভুক্তা করিয়া লইয়াছিল। সে সংসারের অনেক কার্য্যে গৌরীর সহায়তা করিত। এই দুইটি বৃদ্ধা এবং গৌরী ও শিশিরকে লইয়া এই ক্ষুদ্র সংসারটি রচিত হইয়াছিল। শিশিরের একটি ভগিনী ছিল, তাহার নাম 'শ্রী'। পিতামাতা জীবিত থাকিতেই শ্রীর বড়ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রী বৎসরের মধ্যে দুই একবার পিত্রালয়ে আসিত, কোনও বৎসর আসিতও না।

শচীনের পিতামাতার মৃত্যুর পর নয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শিশির এখন চৌদ্দ বৎসরের গৌরদেহ বলিষ্ঠ কিশোর; তাহার বাল্যের চঞ্চলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু গৌরীর কাছে তাহার শিশুটির মতই আবদার, দুরন্তপণা এখনও দূর হয় নাই। পনের বৎসরের বালিকা যে দিন পাঁচ বৎসরের মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই সে তাহার বিপুল স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানি সেই অবোধ শিশুটির দিকেই একান্তভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয় যতই উন্মুখ, আকুল হইয়া উঠিতেছিল,—ততই সে এই মাতৃহীন দুরন্ত বালকটিকেই বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সন্তানহীনতার দুঃখ ও দৈন্য ভুলিতে চাহিতেছিল।

শিশির যখন তাহার সমস্ত স্নেহমমতা টুকুই একেবারে নিঃশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইল, তখন গৌরীর হৃদয়ে আর কোনও ক্ষোভই রহিল না, সে সত্যই দেখিল পরম তৃপ্তিতে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল; শিশির সেই বিদ্যালয়েই পড়িত। ভাল ছেলে বলিয়া স্কুলে তাহার নাম ছিল, শিক্ষকেরা তাহার অনেক ভরসা রাখিতেন। সুতরাং শিশির যখন চৌদ্দবৎসর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল, তখন কেহই তেমন বিস্মিত হন নাই।

বৃত্তি পাওয়ার খবর আসিলেই শিশির এক প্রস্তাব করিয়া বসিল। কলেজে পড়িবার জন্য যখন তাহাকে কলিকাতা যাইতেই হইবে,—তখন মেসে না থাকিয়া, ছোট একটা বাসা যদি করা যায়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া দাদার সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধা হয়। তাহার বৃত্তির টাকা ও দাদার বেতন বৌদিদির হাতে দিলে তিনি যে স্বচ্ছন্দে কলিকাতার বাসাখরচ চালাইয়া লইতে পারিবেন, এবিষয়ে শিশিরের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বৌদিদিকে ছাড়িয়া সে যে কলিকাতার মেসে পড়িয়া থাকিতে পারিবে না, ইহাও সে তাহার বৌদিদির কাছে দৃঢ়কণ্ঠে বংবার ঘোষণা করিতেও ছাড়িল না। প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে গৌরীরও

খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু কথাটাকে যতই সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, শিশিরের এই সঙ্কল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বহু বাধা রহিয়াছে!

শচীনের মাতা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে শচীন ও বধূকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "এ ভিটেয় সন্ধ্যে জ্বালার ভার তোমাদের উপর! লক্ষ্মী মা, আমার শশুরের ভিটে অন্ধকার করে কোথায়ও যেও না"—

মরণপথযাত্রিণীর এ আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে; তারপর এই সাজান গুছান বাড়ীখানি ছাড়িয়া কয়েক বৎসরের জন্য বিদেশে গেলে এ বাড়ীর যে আর কিছুই থাকিবে না!

এই বাড়ীর সঙ্গে, ইহার প্রত্যেক গাছপালার সঙ্গে, কত সুখের, দুঃখের, বেদনার কাহিনী জড়িত রহিয়াছে! গৌরীর স্বহস্তে রোপিত গাছগুলির, লতা-গুলির প্রত্যেকটিই যে তাহার সন্তান তুল্য! তাহারা যে গৌরীর কাছে শুধু জড় বৃক্ষ-লতা-গুল্মই নহে; গৌরী যদি চলিয়া যায়, তুলসীমঞ্চে নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলিবে না, গৃহদেবতার ভোগ হইবে না, সে নিজহস্তে পূজার ডালি গুছাইবে না, সাজাইবে না, পয়স্বিনী গাভীটি যে প্রতি সন্ধ্যায় দুয়ারে আসিয়া তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া সুস্পষ্টস্বরে "ও—মা—" বলিয়া ডাকে। যাহাকে সে নিজে খাবার না দিলে খায় না, তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে? খাঁচার ময়নাটি 'মা' ডাকিতে শিখিয়াছে, গৌরী জল না দিলে, খাবার না দিলে সে খায় না,—সেই প্রিয় পাখীটিকে কোন আকাশে উড়াইয়া দিয়া যাইবে? বিড়ালটার ছানাগুলির কেবল চক্ষু ফুটিয়াছে,—গৌরী যদি চলিয়া যায়, বিড়ালী ছানা-গুলিকে লইয়া কাহার আশ্রয়ে যাইবে?

এত কথা ভাবিতে গৌরীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। কিন্তু সকলের উপরে সে যে শিশিরের কাছে থাকিতে পারিবে, তাহাই মনে করিয়া, সমস্ত বন্ধন, সমস্ত মায়া কাটাইয়া উঠিবার জন্য একটা আগ্রহ তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবেই উন্মুখ হইয়া উঠিত।

কিন্তু যাঁহার মতের উপর সমস্ত নির্ভর করে, তিনি যে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন, তাহা গৌরীর একবারটিও মনে হইত না, সব বন্ধন কাটান সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু জননীর অন্তিম শয্যার আদেশ লঙ্ঘন করা,—না, তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না।

তবু শিশিরের পীড়াপীড়িতে গৌরী স্বামীকে সব কথা খুলিয়া লিখিল, গৌরী

যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল; শচীন বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় যাওয়ার পক্ষপাতী নহে। বিশেষ জননী তাঁহার অন্তিমশয্যায় যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা অসাধ্য!

গৌরী শচীনের পত্র পড়িবার জন্য শিশিরকে দিল; শিশির তাহা একবারটি দেখিয়াই গৌরীর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল!

শিশির দেখিল, তাহার কথা কোনও কাজেই লাগিল না; তখন সে বড় গোল বাধাইল। গৌরীর উপর অভিমান করিয়া, গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, নূতন নূতন আব্দার ধরিয়া, গৌরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শিশির বাহিরে দিগ্বিজয়ী; শিশির বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্র; গ্রামের ছেলেদের সম্ভ্রমের পাত্র। কিন্তু বাড়ীতে গৌরীর কাছে শিশির সেই পাঁচবৎসরের শিশুটির মতই অস্থির দুরন্ত।

সংসারে শুধু একটি মানুষই ছিল,—সে ঐ গৌরী, যাহার কাছে আসিয়া, শিশির নগ্ন, সরল কোলের শিশুটির মতই ঝাপাইয়া পড়িত।

গৌরী কহিল, "তা তুই যখন এতটা বাড়াবাড়িই কর্‌ছিস্, তখন আমি না হয় আর একবার লিখে দি,"—

শিশির বামচক্ষুর প্রান্তটা একটু সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত, অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "হুঁ, তা' লিখবে বই কি! তুমি সাপ হয়ে কাট, আবার রোজা হয়ে ঝাড়!'—তুমি লেখ, আর দাদা ভাবুক, 'বুড়োছেলে বৌদিদিকে ছেড়ে থাকতে পারে না! ওগো, তা' আমি থাকৃতে পার্‌ব,—পার্‌ব!———"

শিশিরের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া, দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া, আসন্ন ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ করিতে চাহিল।

গৌরীর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; কয়েকদিন পরেই শিশির কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া গৌরীর মনটা ভার হইয়াই ছিল, আজ শিশিরের কথায় হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যের রুদ্ধ আবেগটা সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কোনমতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। শিশিরকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কম্পিতকণ্ঠে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিয়া আসিতেছিল! ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

তোমরা ও আমরা।

তোমরা ত্রিদিব পারিজাত ফুল
রূপে গুণে মনোহরা,
আমরা পথের শুকান কুসুম
চরণে দলিত করা।
সুন্দর পূত-মন্দিরে তোমরা
গাহিছ পূজার গান
দূর হ'তে শুনি আমরা অভাগী
ফেটে যায় যেন প্রাণ।
শঙ্খ লৌহ আভরণ শুধু
তবু রূপ উথলিছে,
হীরক মুকুতা ভূষিতা আমরা
তবু সব যেন মিছে।
মঙ্গলময়ী তোমরা লক্ষ্মী
মূর্ত্তিমতী যেন নিষ্ঠা,
আমরা শুধুই পূতি গন্ধময়ী
কৃমি প্রপূরিত বিষ্ঠা।
তোমরা স্নিগ্ধ মধুর জোছনা
মোরা অমাময়ী রাতি,
উষার আলোক তোমরা সকলে
মোরা জ্যোতিহীন বাতি।
ফোটা-শতদল তোমরা সংসারে
মোরা যে কর্দ্দম রাশি
আনন্দ তোমরা শান্তি তোমরা
আমরা সর্ব্বনাশী।
সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিয়া তোমরা
ধীরে চল সগৌরবে,
দূর হ'তে মোরা হেরি সেই ছবি
চক্ষুজল ফেলি সবে।

সংসারের যত কর্ম্মাবসানে
হেরিয়া প্রিয়ের মুখ
ভুলে যাও সদা শতেক যন্ত্রণা
হৃদে পাও কত সুখ।
জীবন-দেবতা আসিয়া যখন
মধুভাষে তোমা তোষে
হতভাগী মোরা কাঁদি—ভাবি হায়
"হারানু কাহার দোষে।"
পতি দেবতার হৃদয়াম্বরে
তোমরাই ধ্রুবতারা,
নাই আমাদের আমার বলিতে
লক্ষ্যশূন্য পথহারা।
খোকা খুকি গুলি, যবে 'মা' 'মা' বলি
ঘোরে তোমাদের কাছে।
মোরা মনে করি এই ত স্বরগ,
আর বা কোথায় আছে?
হাসি মুখে দাও পুত্রের বিয়ে
কত না উৎসব কর,
আমাদের নাই! ওগো কিছু নাই!
কেন তা বলিতে পার?
একি বিধাতার সৃষ্ট আমরা
পার্থক্য এত বা কেন?
তোমরা স্বরগ নরক আমরা
কি পাপে হইল হেন?
কার বা সে পাপ কোথা হ'তে এল,
কেন এ অসহ জ্বালা,
লুণ্ঠিত ধূলে দলিত শুষ্ক
দেবতা পূজার মালা!

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়

সংসার ও সন্ন্যাস।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গেরাডের কারাকক্ষের চাবি নগরপাল গিম্‌বেট সিটেন নিজের কাছেই রাখিয়াছিলেন। তাহার পলায়নের পরদিন প্রভাতে গেরাডের আহার্য্য পাঠাইয়া দিবার কথা মনে হইলে, নগরপাল ভাবিলেন কিছু বিলম্ব করাই ভাল; কারণ ক্ষুধার তাড়নায় অনেক সময় নিতান্ত দৃঢ় সঙ্কল্পও শিথিল হইয়া পড়ে। তারপর বেলা ১০টার সময় একখানি রুটি ও এক পাত্র জল এবং তিনটি সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া নগরপাল ধীরে ধীরে কারাকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভিতরে কি ব্যাপার হইতেছে বুঝিবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রকার শব্দই শ্রুতি-গোচর হইল না। তাঁহার মুখে একটি কুটিল হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল! তিনি হৃষ্টচিত্তে মনে মনে ভাবিলেন "বাঃ! বাছাধন ইহারই মধ্যে এলবার্ট কুসিনের মত নরম হইয়া পড়িয়াছেন। একটু নড়াচড়ার শব্দ পর্য্যন্ত নাই।"

নগরপাল দ্বার খুলিলেন। কিন্তু কৈ! গেরাড ত সেখানে নাই! অতি বিস্ময়ে নগরপাল যেন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন কাঁপিতে লাগিল। পিছন হইতে অগ্রবর্ত্তী অনুচর তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর দিয়া একবার ঘরের মধ্যে তাকাইল—দেখিল কক্ষ শূন্য—গবাক্ষ হইতে লৌহদণ্ডের সহিত এক গাছি মোটা দড়ি ঝুলিয়া আছে। সে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রভু সেই কাঠের বাক্সটির নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া বাক্সটির সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন—যেন বাক্সটি যে খোলা রহিয়াছে ইহা দেখিয়াও তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না!

ভৃত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঐ খোলা বাক্সটির মধ্যে ওরূপভাবে চাহিয়া আছেন কেন? ছেলেটা কিছু আর ওর মধ্যে লুকাইয়া নাই। ছোকড়া কি রকম ফিকিরবাজ একবার দেখুন। এই জানালার শিকটা তুলিয়া কি ভাবে——

"সব গেল! সব গেল!! সব গেল!!!"

"সব গেল—কি মশাই! আবার গেল কি?—ভদ্রলোক শেষ কালে কি পাগল হইল নাকি?"

গিস্‌বেট হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চোর—চোর—ধর—ধর" এবং কি এক উত্তেজনায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া ভৃত্যটির গলা ধরিয়া ঝাঁকা দিতে দিতে কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বেটা! আমার সর্ব্বস্ব চোরে নিয়া যায় আর তুই দাঁড়াইয়া দেখিস্? দৌড়া! তীরের মত যা! যে আমাকে তাই আনিয়া দিতে পারিবে তাকে তিন শত টাকা পুরস্কার দিব! না—না—আর যাওয়ার দরকার নাই! সব বৃথা!—হায়! আমি কি মূর্খ! কি মূর্খ! যে ঘরে তাই ছিল, সেই ঘরে আমি তাকেও রাখিলাম। কিন্তু এ যাবৎ কেহই ত গুপ্ত কলের সন্ধান পায় নাই। সে ছাড়া হয়ত কেহ পাইতও না। যা অদৃষ্টের লেখা ছিল তাই হইল। হায়! আমার সব গেল—সব গেল!"

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার ক্ষণিক ক্রোধের উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া আসিল এবং বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা তাহাকে অধিকার করিল এবং তিনি অবসন্ন-দেহে কাঠের বাক্সটি আশ্রয় করিয়া বসিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সব গেল—সব গেল!"

ভৃত্যটি মিনতি সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গেল মহাশয়?"

গিস্‌বেট নিতান্ত ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন "বাড়ী, সম্পত্তি, সুনাম—সব গেল!"

ভৃত্যটি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি?"

তাহার এই কথা শুনিয়া ও তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া গিস্‌বেটের চমক ভাঙ্গিল ও তাহার স্বাভাবিক ধূর্ত্তভাব আবার ফিরিয়া আসিল।

"কি জান, এই সহরের দলিল পত্রগুলি এই বাক্সে ছিল সে সব গিয়াছে!" এই কথা বলিতে বলিতে গিস্‌বেট নিতান্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভৃত্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

"ওঃ! এই ব্যাপার!"

"একি গুরুতর ব্যাপার নয়? সহরবাসীরা শুনিলে কি বলিবে? সহরের প্রয়োজন হইলেই বা কি উপায় করিব?" এই কথা বলিবার পর গিস্‌বেট অধীরভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তিন শত টাকা পুরস্কার দিব যদি কেহ এই গুলি সব আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু সব—এ বাক্সে যা কিছু ছিল—সব আনা চাই! একখানি খোয়া গেলেও আমি কিছুই দিব না।"

ভৃত্য উত্তর করিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আমি তাতেই রাজী আছি! ও টাকা

আমারই হইয়াছে ধরিতে পারেন। মহাশয় বুঝিতেছেন না যে গেরাডও যেখানে, আপনার ও দলিলপত্রগুলিও সেইখানেই আছে?”

“ঠিক কথা—ঠিক কথা!—বাপ্ ডিরিক্‌রে! তুই চিরজীবি হ’—কিন্তু বাবা এ বাক্সে যা কিছু ছিল সবগুলি আনা চাই!”

“কর্ত্তা মহাশয়! আমি এখনই জন কয়েক প্রহরী নিয়া গেরাডের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে চুরী অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতেছি।”

“অঁা! চুরী!—ঠিক্ কথা! চুরীইতো বটে!—চুরীইতো বটে! এ কথাটা এতক্ষণ আমার খেয়ালই হয় নাই। তবে আর কথা কি?—চোর বেটাকে এখনই তবে আন—মাটির নীচের গারদ ঘরে এবার রাখিব! সেই অন্ধকার ঘরে ব্যাঙ, ইন্দুর প্রভৃতির সঙ্গে বেশ আরামে থাকিবে। ডিরিক্! এবার যেন আর সে দিনের আলো ফিরিয়া দেখিতে না পায়।—যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল! বেটা হয়ত অনেক কাগজ পত্র ইহার মধ্যে দেখিয়া ফেলিয়াছে—তাড়াতাড়ি কর! যেন কাহাকেও বলিবার সময় না পায়—তাড়াতাড়ি কর!”

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিরিক চারিজন প্রহরী লইয়া বনিক এলিসের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং ভীত সন্ত্রস্ত কেথেরিনের নিকট গেরাড কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিল।

মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, “হায়! হায়! কি অনর্থ বাধাইয়াছে সে আবার! জ্বালায়—জ্বালায়—আর বাঁচি না।”

ডিরিক বলিল, “ওগো ঠাকুরাণী! বেশী কিছু নয়, একটা ছেলে মানুষী ব্যাপার। বোধ করি তামাসা দেখিবার জন্য কতগুলি চর্ম্মপট নিয়া আসিয়াছে। সেই গুলি হইল কিনা এই সহরের দলিল পত্র। তাই নগরপাল সেগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন!”

এই মিষ্ট কথায় কেথেরিণের মনের আশঙ্কা তিরোহিত হইল। কিন্তু কন্যা কিটি এ কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিল না,—বিশেষতঃ যখন গেরাড বাটীতে নাই, রাত্রিকালেও আসে নাই একথা শুনিয়া ক্ষোভে ও রোষে ডিরিকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, তখন কিটির সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

যাইবার সময় ডিরিক সঙ্গীদিগকে কর্কশকণ্ঠে বলিল, “চল সব—আর এখানে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। দেখা যাক্! জীবিত থাকিতে আমার হাত কিছুতেই সে এড়াইতে পারিবে না।”

স্নেহাস্পদের বিপদে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। স্নেহের এই গুণে অনেক সময়

দেখা গিয়াছে ধূর্ত্তের প্রতারণাজাল ছিন্ন করিয়াও সাধারণবুদ্ধির লোক স্নেহাস্পদকে রক্ষা করিয়াছে। যখন ডিরিক বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় কিটি বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাকে এইরূপ সঙ্কেত করিল, যেন তাহার সহিত গোপনীয় কোন কথা আছে।

ডিরিক অন্য লোকদিগকে বিদায় দিয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

কিটি মৃদুস্বরে বলিল, "মা এখনও জানেন না—যে গেরাড টরগো ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"সে—কি? তুমি কিরূপে জানিলে?"

"কাল রাত্রে আমি তাহাকে দেখিয়াছি।"

"কোথায়?"

"ভূতের বাড়ীর নীচে!"

"দড়ি তাহাকে কে দিয়াছিল?"

"তা আমি জানি না। সেখানে দেখা হইতে গেরাড দূরদেশে যাইবে বলিয়া আমার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, এতক্ষণে হয়ত বহুদূর গিয়া থাকিবে। আর এ সহরে সে কেনই বা থাকিবে? কারাদণ্ড হওয়াতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া শপথ করিয়াছে যে আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিবে না। ইহাতেই নগরপালের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনিই তাহাকে কারাগারে দিয়া স্বদেশ ও স্বজনগণ হইতে বিতাড়িত করিলেন। ইহাতেই কি যথেষ্ট হয় নাই? তবে আর কেন তিনি এই পুলিশের হাঙ্গামা করিয়া আমাদিগের সুনামটুকু পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিতে চান?"

অন্য সময় হইলে ডিরিক এই কথা নিশ্চয়ই সুযুক্তিপূর্ণ মনে করিত, কিন্তু গেরাডকে না পাইয়া সে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল; তাই পুনরায় প্রশ্ন করিল,—

"তবে সে চুরি করিল কেন?"

"ও ছাই সে চুরী করিবে কিসের জন্য? তবে নগরপাল তাকে অকারণে কারাদণ্ড দিয়াছিলেন—তাই তাহাকে একটু জব্দ করিবার জন্য ওগুলি সে নিয়া গিয়াছে। আর সেগুলি যদি প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে আশে পাশের খাল, নালা, নর্দ্দমা, আস্তাকুড় খুঁজিলে খুব সম্ভবতঃ পাইবে।"

ডিরিক বড়ই আগ্রহসহকারে বলিল, "বটে—বটে—তুমি মনে কর এইরূপ খুঁজিলেই সেগুলি পাওয়া যাইবে? তবে হয়ত তুমি জান কোথায় আছে!"

"আমি এইমাত্র জানি যে গেরাড কখনও চুরি করিবে না—আর তার এতটুকু

বুদ্ধিও আছে যে দূরপথে যাইবার সময় অমন একটা বাজে জিনিষের বোঝা বেশী দূর বহিয়াও নিবে না।"

"তবে এখন যাই। ওগো মেয়ে! তুমি যে চর্ম্মপট এত বাজে জিনিষ মনে করিতেছ, আজ আমার নিকট সেই চর্ম্মপটের মূল্য টরগোর যে কোনও পুরুষের চামড়ার চেয়েও বেশী।"

এই কথা বলিয়া ডিরিক দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিটি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাইলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "গাইল! ব্যাপার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি অবশ্য পুলিশের লোককে বুঝাইয়া দিলাম, যে গেরাড দেশ ছাড়াইয়া এতক্ষণে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার বোধহয় যে সে এখনও যাত্রাই করে নাই।"

"তবে সে কোথায়?"

"আবার কোথায়—প্রণয়িনী যেখানে সেইখানে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে যে বড় বিপদ হইবে। পুলিশের লোকের হাবভাব দেখিয়া বেশ মনে হয় যে তাহাদের অভিপ্রায় বড়ই নিষ্ঠুর এবং বিশেষ গোপনীয় কারণে গেরাডের সন্ধানে তাহারা ফিরিতেছে। কিন্তু কি উপায় করি? আমার বয়সের মেয়েরা কত দ্রুত চলিতে পারে—কিন্তু আমি যে তার বিপদের সংবাদটাও একবার জানাইয়া আসিতে পারিতেছি না। কেন বিধাতা আমায় এমন খঞ্জ করিয়া পাঠাইলে?—না—না—ঠাকুর! মনের দুঃখে তোমার বিধানে যে দোষারোপ করিলাম, তুমি সে অপরাধ লইও না।—তা ভাই গাইল্! তুই ত খুব দ্রুত চলিতে পারিস্,—তুই একবার যা' না ভাই—গেরাডকে এই কথাটা বলিয়া আয়।"

"তা বেশ বুঝিলাম—কিন্তু বাপু, আমি অতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিব না।"

"তার আর আমি কি উপায় করিব বল্—দেখ্ গাইল্, তুইও ত গেরাডকে ভাল বাসিস্?"

"এ গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাকেই আমি সব চেয়ে ভালবাসি। তা বাপু তুমি কেন পিটার বিস্কিনের অশ্বতরটা আমার জন্য চাহিয়া আন না? তুমি চাহিলেই দিবে এখন, কিন্তু আমার কথায় দিবে না।"

কিটি আপত্তি করিল যে তাহা হইলে ব্যাপারটা অনেকেই টের পাইবে। এবং হয়ত গেরাডের বিপদ ইহাতে আরও বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু গাইল কিছুতেই নিজের মতলব ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বলিল, লোকে যাহাতে সন্দেহ না

করিতে পারে এজন্য সে ঠিক বিপরীত পথে টরগো হইতে বাহির হইয়া ঘুরিয়া শেষে সেভেনবাগে যাইবে, কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

অবশেষে এই প্রস্তাবই স্থির হইল। কিটি অশ্বতরটি চাহিয়া আনিয়া গাইলকে রওয়ানা করিয়া দিল। গাইল চলিয়া গেলে কিটি নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিল ও নীরবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট ভ্রাতার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাত্রিতে গেরাড ও মার্গারেট প্রফুল্লচিত্তে সেভেনবাগে পৌঁছিল। গেরাডের মুক্তির আনন্দে ও পুনর্ম্মিলনের ভাবাবেশে বিভোর হইয়া বহুক্ষণ তাহারা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল। ক্রমে আসন্ন বিপদের কথা তাহাদের মনে উদয় হইল। গেরাড পলাতক আসামী। নিশ্চয়ই তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হইবে। ধরা পড়িলে তাহার গুরুতর শাস্তির সম্ভাবনা। গেরাডেরও আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা নাই। কাজেই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাওয়া অনিবার্য্য। গেরাড তখন ভানিকঠাকুরাণীর উপদেশ মত ইটালী যাওয়ার প্রস্তাব উঠাইল। সেখানে সর্ব্ববিধ শিল্পীর যেরূপ সমাদর এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে যেরূপ খ্যাতি ও অর্থলাভের সম্ভাবনা, গেরাড সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিল। গেরাডের ভাবী উন্নতির আশায় তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা মার্গারেট এ প্রস্তাবে সম্মত হইল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিল না। সে অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। ক্রমে গেরাডও তাহার সহিত যোগ দিল। এইরূপে বহুক্ষণ তাহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করিল এবং মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে ললাগিল, কি তাহাদের এমন অপরাধ যে পৃথিবীর এত লোক তাহাদের সুখে বাদী হইতেছে।

প্রেমিকযুগল প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপভাবে বসিয়া রহিল। কখনও বা আপনাদিগের দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, কখনও বা ভবিষ্যতের উজ্জ্বলচিত্র কল্পনার সাহায্যে আঁকিতে লাগিল—কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া মার্গারেটের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার নয়ন প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত

হইতে লাগিল। মার্গারেটের চক্ষে অশ্রু দেখা দিলেই গেরাডেরও কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যাইত এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যলহরী যেন কঠিন প্রস্তরগাত্রে প্রতিহত হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইত।

পরদিন প্রভাতে উভয়েরই চিত্ত অনেকটা স্থির ও প্রশান্ত হইল বটে। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্ত্ত যে কখন আসিবে, তাহা কেহ কাহাকেও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এবং বোধহয় ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে না পড়িলে তাহা স্থিরও হইত না।

অপরাহ্নে বেলা প্রায় তিনটার সময় গাইল নানাদিক্ ঘুরিয়া অবশেষে সেভেনবাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতার নিকট পৌঁছিয়াই সে অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, "গেরাড, কিটি বলিয়া পাঠাইয়াছে যে যদি তোমার প্রাণের মমতা থাকে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বিলম্ব করিও না। তুমি চুরী করিয়াছ এইরূপ তাহারা রটনা করিতেছে, তোমার ব্যবহারেই তাহারা এইরূপ বলিবার সুযোগ পাইয়াছে। তুমি উপস্থিত হইয়া যে কোনও কৈফিয়ৎ দিলেও কিছু প্রতিকার হইবার নয়। কারণ টরগো সহরে তুমি ন্যায় বিচার পাইবে না। তুমি যে চর্ম্মপটগুলি নিয়া আসিয়াছ, উহা উপলক্ষ করিয়া তাহারা তোমার প্রাণদণ্ড করিবার চেষ্টায় আছে। কিটি বলিল, পুলিসের লোকের চাহনীতেই সে ভাল করিয়া ইহা বুঝিয়াছে। তোমাকে জীবিত কি মৃত ধরিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডে পালাও। মার্গারেট ও যা'রা যা'রা তোমায় ভালবাসে তা'দের সুখ যদি চা'ও—আর বিলম্ব করিয়া জীবন হারাইওনা—এই মুহূর্ত্তেই পালাও।"

যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! প্রেমিকযুগল স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া বিবর্ণ মুখে পরস্পরের দিকে ও এক একবার এই ভীষণ সংবাদ-বাহকের দিকে চাহিতে লাগিল।

এতক্ষণ কিটি যাহা শিখাইয়া দিয়াছিল, গাইল ঠিক তাহাই মুখস্ত বলিতে-ছিল। এখন সে নিজের কথায় বলিল, "তোমাকে খুঁজিতে আজ কতকগুলি পুলিস আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। তাদের সঙ্গে নগরপালের অনুচর ডিরিক্ও ছিল। দেখ দাদা, কিটির বড় বুদ্ধি। সে যা বলিয়াছে তুমি তাই কর, এখনই পালা'ও।"

মার্গারেট ভয়ে যেন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল; সে অধীর ভাবে বলিল, "গেরাড! এখনই পালা'ও। হায় হায়! কেন তুমি ও চর্ম্মপটগুলি আনিলে?

আমার তখনই মনে দ্বিধা বোধ হইতেছিল। কেনই বা আমি তোমাকে ও ছাইগুলি আনিতে দিলাম ?"

গেরাড তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "মার্গারেট, তুমি ত শুনিলেই ওগুলি একটা মিথ্যা উপলক্ষ মাত্র। সে যা'ক, বৃদ্ধ শয়তানের হাতে আর এগুলি কখনও ফিরিয়া যাইবে না। আমি যাওয়ার পূর্ব্বে এগুলি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া যাইব যে সে আর কিছুতেই উহার খোঁজ পাইবে না।"

গেরাড তারপর গাইলকে এ সংবাদ দিতে এত পরিশ্রম করিয়া আসার জন্য নানারূপ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিয়া বলিল, সে বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গেরাড রওয়ানা হইবে।

তারপর মার্টিনকে ডাকিয়া গেরাড সমস্ত কথা বলিল। পরামর্শ হইল যে মার্টিন টরগোর রাস্তায় দাঁড়াইয়া পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে, তাহাদিগকে আসিতে দেখিলেই সঙ্কেতে এ সংবাদ জানাইবে। সেই বাড়ীতে যে বড় ওক গাছটি আছে উহার উচ্চ ডালের উপর একটি তীর আসিয়া লাগিলেই গেরাড বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের বনের মধ্যে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইবে। মার্টিনও সেখানে পৌঁছিয়া তাহাকে বনের মধ্যের সোজা পথ দেখাইয়া দিয়া আসিবে।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গেরাড ওক গাছটির ছায়াতলে একটি ঝোপের মধ্যে গভীর একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে লাগিল। মার্গারেট কম্পিত বক্ষে ওকগাছের উচ্চ ডালটির দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

অবশেষে গর্ত্ত খনন শেষ হইল গেরাড এক একখানি চর্ম্মপট একটু একটু দেখিয়া গর্ত্তের মধ্যে ফেলিতে লাগিল। প্রায় সবগুলিই সহর সংক্রান্ত দলিলপত্র। কিন্তু একখানি দলিলে দেখা গেল দাতা ফ্লোরিস্ ব্রাণ, মার্গারেটের পিতামহ এবং গৃহিতা গিস্‌বেট সিটেন। গেরাড বলিল "এ যে তোমাদের দেওয়া দলিল। এখানি আমি সমস্ত পড়িয়া দেখিব।"

মার্গারেট বাধা দিয়া বলিল, "না—না গেরাড! আর সময় নষ্ট করিওনা! এক একটি মুহূর্ত্ত যাইতেছে আর আমার প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। ওদিকে আবার দেখ বড় বড় বৃষ্টির ফোটা পড়িতে আরম্ভ হইল—মেঘেও সমস্ত আকাশ ছাইয়া গিয়াছে।"

গেরাড কাজেই নিরস্ত হইল। তবে সে দলিলখানি গর্ত্তে না ফেলিয়া

নিজের জামার ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। তারপর তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট দলিলগুলি গর্ত্তে ফেলিয়া ভাল করিয়া মাটি দিয়া গর্ত্ত ভরিয়া তাহার উপর পা দিয়া ঘসিয়া পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত সমতল করিয়া দিল। তখন প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল উভয়ে দৌড়িয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। একটু পরেই মার্টিন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় জন মানব নাই, প্রবল ঝড় আসিতেছে।"

মার্টিনের কথাই ঠিক হইল। অচিরে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়া ঘোর নিনাদে বজ্র কড়মড় করিয়া উঠিল। ক্রমে আরও নিকটে ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। মেঘরাশি চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া যেন নৈশ অন্ধকারের অবতারণা করিল। মুহুর্ম্মুহু আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, ক্ষণপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দামিনী ঝলসিতে লাগিল,—প্রবল ধারায় বারিপাত আরম্ভ হইল। মার্গারেট বজ্রনিনাদে কাঁপিতে লাগিল, বিদ্যুৎঝলকে চক্ষু হস্তদ্বারা আবৃত করিতে লাগিল। গেরাড ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আলো জ্বালিল।

গেরাড এই আকস্মিক ঝটিকার আবির্ভাবে মনে মনে সন্তুষ্টই হইল, কেননা এজন্য যে আরও কিছুক্ষণ প্রণয়িনীর সঙ্গলাভের অবসর পাইল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, সূর্য্য অলক্ষিতে কখন অস্ত গেল বুঝা গেল না। ক্ষুব্ধ ঝটিকা ক্রমে দূরদেশে সরিয়া যাইতে লাগিল, বজ্রনিনাদ ক্রমশঃই দূর হইতে দূরে শ্রুত হইতে লাগিল,—কিন্তু অবিরল বারিধারার বিরাম হইল না।

নীরবে সান্ধ্য আহার সমাপন হইল, গেরাড ও মার্গারেট কিছুই খাইতে পারিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের মনে হইতে লাগিল হয়ত এ জীবনে একত্রে এই শেষ আহার—আর অমনই তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

পিটার উঠিয়া শয়ন করিতে গেলেন, কিন্তু মার্টিন তাহাদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। সে নিবিষ্টচিত্তে তাহার ধনুকে একটি নূতন জ্যা সংযোগ করিতে লাগিল। প্রেমিকযুগল তাহার সাক্ষাতেই অস্ফুটস্বরে আপনাদিগের সুখ দুঃখের কাহিনী আলোচনা করিতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল কাহারও লক্ষ্য নাই। অকস্মাৎ বৃদ্ধ মার্টিন হাত উঠাইয়া তাহাদিগকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিল।

উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া নিঃশব্দে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু কৈ, কোনও শব্দই ত শ্রুতিগোচর হইল না! কিন্তু পরক্ষণেই গৃহের পিছনের

বাগানে শুষ্ক পত্ররাশির উপর যেন কাহারও সতর্ক পদশব্দ শোনা গেল। নিঃশঙ্ক হৃদয়ের নিকট হয়ত এ শব্দের কোনও তাৎপর্য্য বোধ হইত না। কিন্তু যাহারা শত্রু পরিবেষ্টিত, তাহারা বুঝিল এইরূপ সতর্ক পদসঞ্চারে যে আসিতেছে সে শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে।

মার্টিন ক্ষিপ্রহস্তে ধনুকে একটি তীর যোজনা করিল ও ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সেই সময়ে বহিয়ের দ্বারের দিকে অনেকগুলি মনুষ্যের পদশব্দ শুনা গেল—যেন সকলেই বিশেষ নিঃশব্দে গৃহের দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহাদের বক্ষের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া অসিল, শিরায় শিরায় যেন রক্ত প্রবাহ স্থির হইয়া গেল।

গেরাড অস্ফুটস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "হায় কিটি—কিটি! বোন্‌টি! আমায় তুমি ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, বিলম্ব করিও না, এখনি পালাও। হায়! হায় কেন আমি তোমার কথা অবহেলা করিলাম।"

মার্গারেট মুখ চাপিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মার্টিন পরুষকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলিল, "চুপ কর! কাঁদিও না।"

বাহির হইতে দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হইতে লগিল। ভিতরে যাহারা ছিল তাহাদের হৃৎপিণ্ডের উপর যেন সে আঘাতগুলি পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

ব্যাকুলতা।

আমার এই ব্যার্থ হীন জীবনে নাথ,
দাও হে সফলতা,—
দেখিয়ে আমায় দাও দয়াময়,
আলোক আছে কোথা।
দেখিয়ে আমায় দাও নারায়ণ,
শান্তি মাখা পথ,
সফল কর এ জীবনের ব্যর্থ মনোরথ।

নিরাশ বিষে হৃদয় ছেয়ে,
জ্বল্‌ছে আগুন' হরি,
দয়া করে নিবাও হে নাথ!
ঢেলে শান্তিবারি।
মোহের ঘোরে অন্ধ হয়ে,
ছুট্‌ছি বিপথ পানে,
নাও হে প্রভু! দয়া করে,
ঐ চরণে টেনে।

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী।

আমার ডাক্তারী।

(১)

আমি একজন ডাক্তার। পরীক্ষার পরিমাণ-যন্ত্রের ওজনে আমি উচ্চশিক্ষিত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার সৌভগ্য লাভ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হই এবং সেখানকার শেষ পরীক্ষা পার হইয়া আমি "এম্ বি' বিভবে গৌরবান্বিত হইয়াছি। বিদ্যার গভীরতা কতদূর হইয়াছে বলিতে পারি না,—তবে অদৃষ্টের গুণে নামের শেষে চারিটি ইংরেজি বর্ণ যোজনার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিবার পরিজনসহ আশা ও মর্য্যাদার প্রখরতা যে সংগ্রহ করিয়াছি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মেডিকেল কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি, সম্মুখে দুইটি পথ বিদ্যমান রহিয়াছে; একটি রাজবর্ত্ম বা সরকারি চাকুরী, অপরটি সাধারণ পথ বা প্রাইভেট প্রাক্টিস্। কিছুদিন ভাবিলাম, কি করি, কোন্ পথে যাই। নিজের মস্তিষ্ক খরচ করিয়াও যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তের সীমায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তখন হিতৈষী বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের শরণাপন্ন হইলাম। প্রায় সকলেই আমাকে সাধারণ রাস্তা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই পথই সুপ্রশস্ত। দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত এই পথের পথিক হইলে নিশ্চয় সফলতার মন্দিরে উপনীত হইতে পরিবে। রাজপথের যাত্রীদের উন্নতি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, কিন্তু এই পথের পথিকদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার শেষ আছে ত সম্পদ সম্মানের শেষ নাই।" সকলেরই মুখে এক কথা, এক উপদেশ। সুতরাং প্রাইভেট্ প্রাক্টিসের পথে পদক্ষেপ করিতেই বাধ্য হইলাম। সংসার গোলক-ধাঁধাঁর প্রবেশের দ্বারে দেখিলাম, সহস্র রকমের চিন্তা, ভাবনা ও সঙ্কট সংশয়ের পূর্ণ রাজত্ব। এক সঙ্কট পার হইতে না হইতেই দেখি সম্মুখে আর এক সমস্যার বিকট মূর্ত্তি। বিশাল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কোন্ স্থান আমার অবস্থানের উপযোগী হইবে, ইহা হইল দ্বিতীয় ভাবনার বিষয়। নিজে ভাবিয়া ভবিয়া যখন এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলাম না, তখন স্থান নির্ব্বাচনের জন্য আবার সুহৃদ্ স্বজনের দ্বারস্থ হইলাম। বাঙ্গালী সমাজে বিনা মতলবে কেহ আর কিছু করুন না করুন, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানে কাহাকেও উদাসীন বা কৃপণ দেখা যায় না। আমার উপরেও যাচিত ও অযাচিত ভাবে উপদেশ ও পরামর্শের বর্ষার ধারা অবিরল ভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই পুঞ্জীভূত পরামর্শের মধ্যে বড় একটা মতপার্থক্য

বা ভেদবৈষম্য দেখিতে পাইলাম না। দূরদর্শিতা ও কুশাগ্রবুদ্ধির উপরে দাঁড়াইয়া প্রায় সকলেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, কলিকাতাই আমার মত বিদ্বান্ ও বিচক্ষণের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। ধনিজনবহুল রাজধানীতে প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিলে আমি শীঘ্রই নাকি লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পূর্ণ কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইব। আমার নিষ্ফল জীবনকাহিনী পাঠে কেহ কেহ উপকৃত হইতে পারেন মনে করিয়া সরল ভাষায় লিখিতেছি, পরের কথায় দশের পরামর্শে আমার মনে নিঃসন্দেহ ধারণা জন্মিল যে আমি অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিয়া একটা কিছু হইয়াছি। লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রদের লীলাভূমি কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উপার্জ্জনের জন্য ভ্রমণ করিলে নিশ্চয় আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে। রাজধানী ছাড়া অন্যত্র আমার বিদ্যা বুদ্ধির উপযুক্ত আদর বা সম্মানলাভ কখনও সম্ভবপর নহে। একজন বি এ, এম্ বির সমুচিত সম্মান মফঃস্বলের সহরে রক্ষিত হইতে পারে কি? কলিকাতাতেই বা আমার মত উচ্চশিক্ষিত কয়জন ডাক্তার আছেন? সুতরাং এস্থানেও পশার প্রতিপত্তিলাভ করিতে আমাকে বেশী কিছু ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। "দশচক্রে ভূত" সাজিয়া অর্থাৎ দশের কথায় আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া মনে মনে কত কিছু ভাবিলাম, নিজে নিজে নীরবে গর্ব্বোন্মাদের কত কি অভিনয় করিলাম!

(২)

বিডন্ ষ্ট্রীটের উপরে একখানি সুন্দর দোতালা বাসা ভাড়া করিয়া যশঃসম্পদের সাধনায় নিযুক্ত হইলাম। প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে আশা আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, দিনের পর দিন সেই আশা আকাঙ্ক্ষার দল ধীরে ধীরে আমার হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে, প্রথম তিন মাসে কলিকাতার জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে মাত্র এগারটি লোক আমাকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহাদের পকেট হইতে বিরানব্বই দিনে মবলক ৩৮৲ টাকা প্রাপ্ত হইলাম। সুতরাং বি, এ, এম, বি মহাশয়ের দৈনিক উপার্জ্জন কত হইল—পাঠকবর্গ হিসাব করিয়া দেখিবেন। উপার্জ্জন যাহাই হোক, বাসাখরচের জন্য কিন্তু ন্যূন পক্ষে প্রতিদিন ৪৲ টাকার বিশেষ দরকার দেখিতে পাইলাম। বৃদ্ধ পিতা আমার ছলনায় প্রতারিত হইয়া ধার করিয়া দীর্ঘকাল পড়ার-

খরচ চালাইয়া আমাকে তথাকথিত বিদ্যাদিগ্‌গজ করিয়াছেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের সময়ে সেই আশার কুহকে ভুলিয়া ঋণ করিয়া আমার হস্তে ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রথম তিন মাসে সেই টাকা ও আমার উপার্জ্জিত অর্থ একত্র করিয়াও বাসাখরচ বিনা হাওলাতে নির্ব্বাহ করিতে পারিলাম না। এই সময় হইতেই ভাবনা-প্রবাহে ভাসিতে লাগিলাম। অর্থের অভাবে আমার অতলস্পর্শ আত্মবিশ্বাসের উপরে সংশয়ের দারুণ আঘাত উপস্থিত হইতে লাগিল। চতুর্থ মাসে আরও বিপদ! চতুর্থ মাসের বিড়ম্বনার কথা কি বলিব, মোট প্রাপ্তি ১০৲ টাকা। এমাসের বাসাখরচ যে ভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছি তাহা জীবনের দীপনির্ব্বাণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বোধহয় স্মরণ থাকিবে। দুঃখের উপরে দুঃখ, বিড়ম্বনার উপরে বিড়ম্বনা—যে সকল হিতৈষী আত্মীয়স্বজন আমাকে কলিকাতায় প্র্যাক্টিস্ করিয়া কুবেরের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমার উপার্জ্জনের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "তুমি অদৃষ্টের গুণে পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিয়াছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই জন্মে নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকিলে কলিকাতার মত সহরে কেহ উন্নতি করিতে পারে না। 'বিপিন' ও "শরৎ" বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। তাহা হইলে কি হয়? পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে দেখিতে পাইতেছ তাহারা কোন্ স্থান দখল করিয়াছে। আজকাল ১০০০৲ টাকা রোজগারের কথা তাহাদের পক্ষে অস্তিসম্পাৎ নয় কি?" এইরূপ কত সফল জীবনের দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে ধরিয়া আমার পরিশ্রমকাতরতা, বিষয়-বুদ্ধিহীনতা ও সর্ব্বপ্রকারের অকর্ম্মণ্যতা তাঁহারা সর্ব্ব-প্রযত্নে সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমি অর্থের অভাবে এবং বন্ধুবান্ধবের ধিক্কারে ও নিন্দায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ পিতা সাংসারিক সহস্র অসুবিধার সহিত বীরের মত সংগ্রাম করিয়া আমাকে রীতিমত মাসিক খরচ প্রদান করিয়াছেন। এখন তিনি আমার উচ্চ শিক্ষার উপরে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি আরামের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে আমার এই শোচনীয় আয়ের কথা লিখিতে প্রকৃতপক্ষেই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ও দারুণ লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম। ধার হাওলাত ও বাকী বকেয়ার মাহাত্ম্যে তথাবিধ আয়ের মধ্য দিয়া আরও কয়টি মাস যাপন করিতে সমর্থ হইলাম। এই ভাবে আমার কর্ম্মজীবনের এক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার পর অবসন্ন জীবন বহন করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম

প্রভাতে অভাবের তাড়না সহ্য করিতে না পরিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই পথের সুখ দেখিতেছি শুধু অভাবের কণ্টকযাতনা। সুতরাং প্রাইভেট্ প্রাক্টিসের পদে প্রণাম করিয়া চাকুরী গ্রহণই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এতক্ষণ একটা কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। অমি যখন মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন পিতার অদেশে এক বালিকার গলদেশে অবিচ্ছেদ্য প্রেমমাল্য প্রদান করিতে বাধ্য হই। প্রজাপতিঠাকুরের মিলনরাজ্যে সুখমাধুর্য্য উপভোগ করিবার অবসর এতদিন আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ছাত্রজীবনে অন্নবসনক্লিষ্টা পত্নীকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া শান্তি সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছি। তারপর? তারপর আর কি! মাসাধিক কাল অতীত হইতে চলিল, সুখ দুঃখের সেই সঙ্গিনী কত প্রয়োজনে, কত লজ্জা কত বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার কাছে পাঁচটি টাকা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়েও তাহার প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করিবার শক্তি আমি দেখাইতে পারি নাই। কোন্ মুখে চিঠির উত্তর দিব? সুতরাং নীরব নিরুত্তর রহিয়াছি। এইরূপে আর দিন চলে না ভাবিয়া প্রাইভেট্ প্রাক্টিসের পথ পরিত্যাগের সঙ্কল্প প্রতিবেশী ডাক্তার বোসকে নিভৃতে জানাইলাম। বোস্ সাহেব আমাকে স্নেহ করিতেন। ভালবাসিয়া মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেও যত্ন দেখাইয়াছেন। তিনি ধীর স্থিরভাবে সব শুনিলেন। শেষে স্নেহসিক্তস্বরে বলিলেন,—"এত অস্থির হচ্চ কেন? দু'চার বছরে নিরাশ হইলে চল্‌বে কেন? কলকাতার মত সহরে কাজে হাত দিতে না দিতেই ফল পাওয়া যায় কি? লোকের সাথে চেনা পরিচয় কর্‌তেও দু'চারটা বছর কেটে যায়। তারপর তুমি যে ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছ, এতে কোনও দিন তোমার কিছু হবে ব'লে মনে হচ্চে না। তুমি পথের লোক ধরে বলে বেড়াচ্ছ, আমার কিছু হচ্ছে না। এত সরল সোজা হলে কি আর চলে?"

ডাক্তার বোসের অনুযোগের খরপ্রবাহে বাধা দিয়া বলিলাম "কিছু না হলেও লোককে বল্‌তে হবে নাকি খুব হচ্চে? মিথ্যেকথা না বল্লে এ ব্যবসায় কিছু হয় না নাকি?"

ডাক্তার বোস। "মিথ্যা কথা বল্‌তে যদি প্রবৃত্তি না হয়, বেশ ত চুপ করে থাক না কেন? গায়ে পড়ে সত্য কথা বল্‌বার দরকার কি? মনে রেখো, ডাক্তার চৌধুরী, আমাদের চিকিৎসাবৃত্তিটাও একটা ব্যবসা। ব্যবসাতে বাহিরের চটক্ চাই। জাঁকজমক কায়দার উপরে ব্যবসার

উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। লোকে কথায় বলে ভেকে ভিক্, ঐ ভেকের ভিতরেই একটু প্রতারণার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম "মিথ্যা, প্রতারণা, চুরী, ডাকাতি করেই যদি পয়সা রোজ্‌গার কর্‌তে হ'ল, তবে এত পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে লেখাপড়া শেখার দরকার ছিল কি?"

ডাক্তার বোস্ কহিলেন, "বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি বল্‌ব? বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, এম্ এ প্রভৃতি ডিগ্রীগুলো ব্যবসাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের কাজ করে মাত্র, এগুলোর দোহাই দিয়ে ব্যবসা চালাতে খুব সুবিধে। এই দেখ না কেন, তোমার এই বি এ, এম্, বি ডিগ্রীকে মূলধন করে যদি কিছু ব্যবসা বুদ্ধি খরচ কর্‌তে পার্‌তে, তাহলে কি আর তোমার এ দশা হয়? তুমি বাহিরের পোষাকপরিচ্ছদ, চলাফেরা এমনভাবে কর্‌তে আরম্ভ কর, লোকেরা যেন সহজে বুঝ্‌তে পারে তোমার পশার প্রতিপত্তি খুব জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে। যদি আত্মীয় স্বজন জান্‌তে চায় কেমন পাচ্ছ, উত্তরে "কিছুই হচ্ছেনা" না বলে বল্‌বে "বাসা খরচটা একরকম চলে যাচ্ছে—" এবং তখনই এক নিশ্বাসে বলে ফেল্‌বে বাসা খরচ ২০০৲ টাকার কমে কিছুতেই চালিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছ না। কথাটা আংশিক সত্য, অথচ লোকে একটা ধারণা কর্‌তে পার্‌বে তোমার প্রায় ২০০৲ টাকা আয়। এই টুকুরই নাম ব্যবসা বুদ্ধি।"

"এমন জলজ্যান্ত মিছে কথাটা বলা যায় কি? পাচ্ছিনে কাণা কড়ি, বল্‌ব সোনার মোহর!"

ডাক্তার বোস্। তাই ত ডাক্তার চৌধুরী, এখন পর্য্যন্ত কলেজী নেশা মন থেকে দূর হ'ল না? এইটুকু কর্‌তেই ভয় পাচ্ছ। সংসারে আরও কত কি কর্ত্তে হবে। তোমার হাতে রোগী থাক্ না থাক ছুটাছুটি দৌড়া-দৌড়িতে সকলকে জান্‌তে দেবে তোমার বিস্তর রোগী জুটেছে, আহার নিদ্রার সময়টুকু পর্য্যন্ত নাই। কয়েকটা কঠিন রোগী আরোগ্য করাতে অমুক অমুক মহলে তোমার খুব ডাক্ হাক্ পড়ে গিয়েছে—এমন ভাবের বহু কথাও নানা ভঙ্গীতে লোকের কাছে বল্‌তে হবে। দেখ চৌধুরী, নিজের জয়ঢাক নিজে না বাজালে এখানে কিছু কর্‌তে পার্ব্বেনা, শুধু বিদ্যার বস্তার উপরে বসে থাক্‌লে কোন কালেও কিছু হবে না।

আর একটা দরকারী কথা শুনে রাখ, যদি হাতে কাজকর্ম্ম না থাকে

বাড়ীর ভিতর বোসে পড়াশুনা করবে। কিন্তু খবরদার রোগীর বাড়ী গিয়ে কখনও গল্প ক'রে এক মিনিটও বিলম্ব কর্ব্বে না, ব্যস্ততার খুব ভাণ কর্ব্বে। রোগীর বাড়ীর লোকদিগকে জান্তে দেবে, তোমার ঢের কাজ, বহু রোগীর ভার মাথায় পড়েছে। তারা যেন ঘুণাক্ষরে বুঝ্তে না পারে, তুমি নিষ্কর্ম্মা বসে আছ। তবে অবশ্যি সব জায়গায় এই নিয়ম খাটবে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ব্বে। যেখানে দুটো পয়সা পাবে, যাকে দিয়ে তোমার উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে তার কাজে একটু বেশী সময় দেবে, একটু বেশী যত্নের ভাব দেখাবে। শক্তিসামর্থ্য বুঝে কতক কতক লোকের সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন কর্ব্বে। কিন্তু হুঁসিয়ার হ'য়ে এসব কাজ করতে হবে। কেহ যেন কোন রকমে তোমার অভিপ্রায় না জান্তে পারে। আজ এপর্য্যন্তই থাক্, এটুকু শেখা হলে আবার পাঠ দেব।

আমি সাহেবী ধরণে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাড়ী আসিয়া ডাক্তার বোসের উপদেশের কথা অনেকক্ষণ ভাবিলাম। মনে বড় অশান্তি ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। যদি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতার মধ্য দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইল, তবে এই ছাইভস্ম বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য পিতাকে পথের ভিখারী ও সর্ব্বদা চিন্তা ভাবনার অনলে দগ্ধ করিলাম কেন? আরও কত কি ভাবিলাম—ভাবনার শেষ নাই, কিনারা নাই।

(৩)

অভাবে স্বভাব নষ্ট। সংসর্গের প্রভাবও কম নয়। আমি ধীরে ধীরে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধপথে পদক্ষেপ করিলাম। ডাক্তার বসুর উপদেশ ধীরে ধীরে আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করিল। প্রথমে তাহার উপদেশমত আয় ব্যয়ের মিথ্যা তালিকা প্রকাশ করিতে গিয়া দু'চার জনের কাছে ধরা পড়িলাম। মিথ্যা বাগাড়ম্বরে জিহ্বার জড়তা ও মুখের মলিনতা ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ইহাতেও অপসারিত হইল না। প্রতারণাতেও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কোনও চিহ্ন উপলব্ধির ভিতরে শীঘ্র উপস্থিত হইল না। ডাক্তার বোসের কাছে প্রায়ই যাইতাম, আর একদিন গিয়াছি, দু'চারিটি কথার পর তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"কাল বেলা ৯টার সময় হেঁটে যাচ্ছিলে কোথা?"

আমি। সাম্নের গলিতে একটি রোগী দেখ্তে।

ডাঃ বোস্। হেঁটে কেন?

আমি। রোগী বড় গরীব, বাড়ীও বেশী দূরে নয়। মিছামিছি বেচারার উপরে গাড়ী ভাড়ার টেক্সটা চাপিয়ে লাভ কি?

ডাঃ বোস। বাঃ রে, চৈতন্য চরিতামৃতের অবতার! এত দয়া দেখাতে হলে ডাক্তারিটি ছেড়ে সেবাশ্রমে গিয়া ভর্ত্তি হও না কেন? রোগীর বাড়ী হেঁটে গেলে তার কি আর মান থাকে? তোমায় ত সেদিনই বলেছি, যেমন চালের উপরে থাকবে তেমনই পশার প্রতিপত্তি হবে।

আমি। আমি ত আপনার সেদিনকার উপদেশ মত চলছি, কিন্তু ফল ত—"যথা পূর্ব্বং তথাপরং"—কোনই উন্নতি নাই।

ডাঃ বোস্। অস্থির হ'চ্চ কেন? তারপর হাতে কলমে শিখিয়েও তোমাকে মানুষ করা যাচ্ছে না। পাঁচদিন হ'ল পটলডাঙ্গার * * * বাবুদের বাড়ীতে গিয়েছিলে?

আমি। হাঁ।

ডাঃ বোস্। রোগী দেখে উপস্থিত লোকদের কাছে কি বলেছিলে?

আমি। বলেছিলাম, রোগীর আর জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন। অনর্থক টাকা পয়সা ব্যয় করে লাভ নাই।

ডাঃ বোস্। এই বুদ্ধিতে ব্যবসা চালিয়ে উন্নতি হচ্ছে না বলে অনুযোগ দিচ্ছ? এমন সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহীনের কোনও কালে কিছু হতে পারে কি? রোগীকে টাকার বাক্সবন্ধ রাখার উপদেশ দিতে তোমার এত মাথা ব্যথা হয়েছিল কেন? তোমার ঐ কথার ফল দাঁড়িয়েছে কি জান? তুমি ছেলে মানুষ, কঠিন রোগী কখনও দেখ নাই, তাই ভয় পেয়ে পালাবার পথ দেখেছ। রোগীর বাড়ীর লোকেরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তোমাকে বিদায় দিয়েছে, এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে নিয়ে রোগীর ভার আমার উপর ন্যাস্ত করেছে। তাদের কাছে শুনলাম তোমার এই ব্যবসাবুদ্ধির কথা। আমি আজ ৫দিন রোগী দেখছি, রোগী এখনও মরে নাই। এই পাঁচদিনে ১০০৲ টাকার উপরে আমার পকেটে পড়েছে। রোগ যে কঠিন—দুঃসাধ্য, ভাবে ভঙ্গিতে আমিও তা বলেছি, তবে শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময় আছে এই কথা বলে কিঞ্চিৎ আশা দিয়ে রোগীটি হাত করেছি। যদি কোনও রকমে এই রোগী আরোগ্য লাভ করে,—যেমন টাকা পাব, তেমনি নাম ছড়িয়ে পড়্‌বে। না বাঁচলেও নিন্দার আশঙ্কা নাই। রোগী যে কঠিন রোগে আক্রান্ত, সেকথা বল্‌তে ত আর ভুল করি নাই। রোগীর

অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখ্‌লে ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর না কর, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর উপরে ছেড়ে দিতে হয়। আয়ু না থাকিলে স্বয়ং ধন্বন্তরীও যে বাঁচাতে পারে না একথাটাও পরম বিশ্বাসীর মত বল্‌তে হয়। ঘটনা-চক্রে যদি রোগী বেঁচে উঠে, তখন নিজের বিদ্যাবুদ্ধির, চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খুব বড়াই কর্‌তে হয়—অর্থাৎ রোগী মর্‌লে ভগবানের দোষ, বাঁচলে আমাদের গুণ। আমাদের দেশের লোকেরা এত আহাম্মক যে তারাও ইহাই বিশ্বাস করে। তুমিও যদি এইভাবে দুইদিক্ বজায় রেখে কথা ব'ল্‌তে, তা হ'লে কি রোগী তোমার হাতছাড়া হয়? এই ক'দিনে দু'পয়সা রোজ-গারও হত।

আমি। জেনে শুনে শুধু টাকার জন্য কি করে বলি এই রোগী বাঁচতে পারে? টাকার জন্য বিবেকটাকে ত আর গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে পারি না।

ডাঃ বোস্। আরে রেখে দেও তোমার বিবেক। বিবেক ধুয়ে এখন জল খাও গে। আচ্ছা, তুমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পার এ রোগী কিছুতেই বাঁচতে পার্ব্বে না? পৃথিবীতে এমন রোগী কি বাঁচে না? আর বাঁচবে বলে যে সকল রোগী ধর, তাদের ভিতরে কি কেউ মরে না? দেখ চৌধুরী, রোগের গতির কথা কি কেউ বল্‌তে পারে? তাই আমরা যে সে রোগী হাতে নিতে পারি, এতে বিবেক মারা যায় না।

ডাক্তার বোসের কথায় বড় ধিক্কার উপস্থিত হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সাধ করিয়া মেডিকেল্ কলেজে কেন প্রবেশ করিয়াছিলাম।

(৪)

ডাক্তার নী——বাবু আমার সহাধ্যায়ী ও প্রাণপ্রতিম বন্ধু। তিনি সর্ব্বদাই অবসর মত আমার বাসায় আসিতেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল অবস্থা জানিতে চাহিতেন। একদিন নী——বাবু আমার বাসায় আসিয়া যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, যতদূর স্মরণ হয় নিম্নে তাহা লিখিলাম।

নী—বাবু। এই মাসে কিছু উন্নতি হল কি?

আমি। কিছু মাত্র না।

নী—বাবু। বাসা খরচ চলে কি প্রকারে?

আমি। সে দুঃখের কথা কি বল্‌ব? যে ভাবে চলে, তা আমি জানি, আর জানেন ভগবান।

নী—বাবু। সকলের হচ্চে, তোমার হয় না কেন?

আমি। অদৃষ্ট। আগে অদৃষ্ট মান্‌তাম না, এখন ঠেকে মান্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

নী—বাবু। ওসব কথা কিছু নয়। তোমার ভিতরে এমন একটা কিছু ক্রটি আছে, যার জন্য তোমার কিছু হচ্ছে না। একটা মনে হয়, তোমার চলা ফেরাটা তেমন জমকাল নয়। বিনা আড়ম্বরে কলিকাতার মত হুজুগের জায়গায় কিছু হয় না। তুমি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বের না হয়ে যদি নিজের গাড়ীতে রোগীর বাড়ী যেতে পার, তা'হলে বোধহয় তাড়াতাড়ি কিছু ফল পেতে পার।

আমি। নিজের গাড়ী! তোমার মত লোকের এমন ভাবে ঠাট্টা করা কি শোভা পায়? যে খেতে পায় না, সে কর্‌বে গাড়ী?

বড় দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এই কয়টি কথা বলিলাম। বন্ধু নী—বাবু আমার মর্ম্মজ্বালা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তিনি সহানুভূতি-ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—"দেখ দী——, আমি তোমার অবস্থা জেনেশুনেই গাড়ীর কথা বলেছি। তোমার হাতে যে পয়সা নাই, বাড়ী থেকে যে কিছু আনতে পার্ব্বে না,—তা' আমি জানি। কিন্তু গাড়ী ঘোড়া ছাড়া কল্‌কাতার বাজারে কিছু করা যায় না বলেই ও কথাটা তুলেছি। আমি তোমায় ১০০০৲ টাকা দিচ্ছি, তুমি এই দিয়ে গাড়ী খরিদ করে জোরে একবার ব্যবসা চালাও দেখি। যখন তোমার সুবিধা হবে তখন আমার টাকা ফেরত্ দিও।"

বন্ধুর এই সমবেদনায় আমার চোখে জল আসিল, এই দৈন্য-নিপীড়িত জীবনে বহু নির্জ্জলা উপদেশ অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু কেহ এমন ভাবে টাকার তোড়া লইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে উপস্থিত হয় নাই। "আচ্ছা যা' হয় পরে বল্‌ব"—বলিয়া বন্ধুকে বিদায় দিলাম। সেদিন রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। নী বাবুর নিঃস্বার্থ-প্রেমের কথা সমস্ত রাত্রি ভাবিলাম। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম আমার মত হতভাগ্যের বন্ধুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ জীবনে তাহা শোধ করিবার হয়ত অবসর ঘটিবে না। পরে মনে হইল, স্ত্রীর অধিকারে তাহার পিতৃপ্রদত্ত কতকগুলি অলঙ্কার আছে। আমি চাহিলে সরলা রমণী আমাকে তাহা প্রদান করিতে

নিশ্চয় কুণ্ঠিতা হইবে না। সেই সকল গহনা বিক্রয় করিয়াই গাড়ী করা যা'ক। যদি ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় তাহাকে তাহার গহনা ফিরাইয়া দিতে পারিব। যদি সুসময় জীবনদ্বারে কখনও না আসে, ক্ষতি নাই, দরিদ্রের পত্নী শাঁখা সিন্দুরেই শোভা পাইবে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প প্রয়োজন মত লোকদিগকে বলিলাম, তারপর যথাসময়ে ট্রেণে উঠিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। বাড়ীতে আসিয়া তিনদিন পর স্ত্রীকে ভবিষ্যতের ভরসার চিত্র দেখাইয়া তাহার পিতৃপ্রদত্ত গহনাগুলি হস্তগত করিলাম। সাতদিন বাড়ী থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া ৮৮২৲ টাকা প্রাপ্ত হইলাম। তারপর ৭০০৲ টাকা মূল্যে সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ ভাল রকমের গাড়ী ঘোড়া খরিদ করিলাম। বাকী টাকা ঘোড়ার খোরাক যোগাইবার জন্য রাখিয়া দিলাম।

(৫)

রোগী থাক্ না থাক্, দুইবেলা নিজের গাড়ীতে চড়িয়া কলিকাতার ছোট বড় রাস্তাগুলা ক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীঠাকুরাণী ইহাতেও আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। অনেকদিনই বিনা কাজে, বিনা প্রয়োজনে শুধু ব্যবসার খাতিরে গাড়ীতে এদিক সেদিক ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি। এদিকে বিক্রীত অলঙ্কারের বাকী টাকা ঘাস দানায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘোটকরাজের বিশাল উদরে স্থানলাভ করিল। আবার ভাবনায় পড়িলাম। ভাবনাতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছি এমন সময়ে একদিন বন্ধু নী—বাবু বাসায় আসিয়া পূর্ণ উৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে দী,—লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছ ত?"

আমি। কৈ! সেই পেচকবাহিনী আমার উপরে বিন্দুমাত্রও কৃপা বর্ষণ করিতেছেন না। তোমরা যা যখন বল্‌ছ আমিও তখনই তা সাধ্যমত পালন কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই ত কিছু হচ্ছে না।

নী—বাবু। হবে, হবে, নিরাশ হও কেন? কিন্তু ভাই, আজও একটা বিষয়ে তোমায় মন্দ বল্‌তে হচ্ছে। গাড়ীতে চ'ড়ে যখন কোনও স্থানে যাও, তখন রাস্তার দুই পার্শ্বের দোকান গুলোর উপরে গ্রাম্য লোকের মত হা করে তাকিয়ে থাক কেন? আমি চার পাঁচদিন তোমার পাশ দিয়ে গিয়েছি, তুমি আমায় দেখ্‌তে পেয়েছ কি? রোগীর বাড়ী যাওয়ার সময়ে

আমাদের একটা রীতি আছে,—গাড়ী যখন চল্‌তে থাক্‌বে তখন একখানা দৈনিক ইংরেজী খবরের কাগজের উপরে সম্পূর্ণ নজরটি আটক্ রাখ্‌তে হয়।

আমি। গাড়ীর চলতিমুখে কাগজের উপরে নজর ঠিক রাখা যায় কি? আমি ত কিছুতেই পড়্‌তে পারি না।

নী—বাবু। দেখ্‌ছি তুমি নিরেট্ মূর্খ। প্রকৃতপক্ষে তোমায় কাগজ পড়্‌তে বল্‌ছে কে? পড়্‌তে পার আর না পার পড়ার ভাণ কর্‌তে হবে।

আমি। এই প্রতারণার প্রয়োজনটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুক্‌ছে না।

নী—বাবু। কেন, এমন একটা মোটা কথাটাও তোমার উপলব্ধি হচ্চে না? পথে পত্রিকা পড়্‌তে দেখ্‌লেই লোকে মনে কর্‌বে, তোমার কাছে সময়ের মূল্য খুব বেশী,—তোমার বাড়ীতে রোগীর এত ভিড়, এত কাজ, যে তা শেষকরে পত্রিকা পড়ার আর এক সেকেণ্ডও অবসর পাও না। তাই পথের এই সময়টুকু বৃথা নষ্ট না করে কাজে লাগাচ্ছ। আর একটা লাভ এই, লোকে মনে কর্‌বে পৃথিবীর খবর জান্‌তেও তোমার বেশ আগ্রহ আছে, কেবল যে রোগী দেখে বেড়াচ্চ তা নয়। তৃতীয় লাভ, দৈনিক কাগজের গ্রাহক হওয়ার তোমার যে শক্তি জন্মেছে তাও তারা সহজে বুঝতে পার্‌বে। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছ, পথে পত্রিকার উপরে ঝুঁকে থাক্‌বার কত গুণ।

আমি ঘৃণার সহিত নী—বাবুকে ব'লিলাম "কপটতা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত যে কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা নাই, তার সাধনায় সময় নষ্ট কর্‌তে আমি আর ইচ্ছা করি না। আমি পবিত্র ব্রত ভেবে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে-ছিলাম, এখন দেখ্‌ছি চন্দনভ্রমে বিষের গাছকে জড়ায়ে ধরেছি। এ ব্যবসার পদে নমস্কার ক'রে সময় থাক্‌তে সরে পড়াই ভাল।"

ইহার পর বন্ধু নী—বাবু নিজের সফলজীবনের শত কথা নানা ভঙ্গীতে বলিয়া আমার প্রাণে আবার আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া দিলেন। নী—বাবু তাহার অসামান্য উন্নতির কারণ গুলি আমার কাছে খুলিয়া বলিলেন। আমিও শেষে সেইপথে সফলতার মন্দিরে উপনীত হইতে পারিয়াছি। সেই অধ্যায় আর একদিন বিদিত করিব ইচ্ছা র'হিল। আজ নিরাশ জীবনের দু'ফোটা চোখের জল ও দুটি উষ্ণশ্বাস পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রী :——

ভু'লব না।

তোমায় আমি ভু'লব না গো ভু'লব না!
তুমি আমায় ভুলে গেলেও আমি তোমায় ভু'লব না!
যতই দুঃখ দাও আমায়, যতই পায় ঠেল, হায়!
তবুও তোমায় ভু'লব না গো ভু'লব না!
প্রাণটি স'পে ডাক্‌লে তোমায় তবু কি গো পাব না?
তুমি হ'বে যতই নিঠুর, আমি হ'ব ততই কঠোর—
আমার বাঁধা শক্ত হ'বে, টুটবে না গো টুটবে না!
ডাক্‌ব তোমায়, ভাব্‌ব তোমায়, তবুও কি পাব না?
প্রাণটি দিয়ে ভাব্‌ব যখন, তোমার আসন ট'ল্‌বে তখন,
তোমায় জানা সেত অমন চুপটী ক'রে আস্‌বে না।
তোমার দীপ্তি আস্‌বে প্রাণে অন্ধকার আর থাক্‌বে না,
তোমার পদে সব স'পিব, তোমার পদে আমায় দিব,
বন্ধুজন কোলাহলে ফির্‌বে না গো ফির্‌বে না।
তোমায় আমার পাবার আশা এ বুকে ত আঁটবে না।
তোমার তরে বসে আছি, তোমায় দিবানিশি ভাবি,
দরশ পরশ চাই তোমারি আর ত কিছুই চাই না,
তোমায় আমি ভু'লব না গো ভু'লব না!

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী।

নিরাশ।

জীবন ভরিয়া আলোক খুজিলি
লভিলি আঁধার রাশি;
সুখের আশায় সংসার বাঁধিলি
পরিলি দুঃখের ফাঁসি।
রতন তুলিতে সাগরে নামিলি
ডুবিলি অতল জলে,
আশায় আশায় কতই করিলি
বিফল হইল ফলে।
এত যে ভাবিলি এত যে করিলি
এই কি তাহার ফল?
আশার হৃদয়ে নিরাশ লভিলি—
লভিলি নয়ন জল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

বি, এ, পাশ করিলেও চাকরি জিনিষটা তত সুলভ নয়, তাহা কলেজ-জীবন সমাপ্তির পর হরমোহন একদিনের জন্যও ভাবে নাই। যেদিন বি, এ পাশের খবর বাহির হইয়াছিল, সেদিন উত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর তালিকার মধ্যে নিজ নামের সন্নিবেশ দেখিয়া তাহার হৃদয় যতটা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, এক মার্চ্চেণ্ট আফিসের সাহেবের নিকট চাকরি প্রার্থী হইয়া উপেক্ষিত হওয়াতে তাহা ততোধিক দুঃখে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে ভাবিল, ছিঃ, এই চাকরির বাজার! এত দুর্দ্দশা!

ষ্টেটসম্যানে এক বিজ্ঞাপন ছিল যে একজন শিক্ষিত, কর্ম্মঠ, সুদর্শন, 'বাবু'র প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। জামিন কিছুই আপাততঃ দিতে হইবে না। ষ্টেটসম্যান আফিসের বিজ্ঞাপন বিভাগের বাক্সবিশেষের নম্বরে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে বিজ্ঞাপনটিকে কাটিয়া লইয়া পরদিনই একখানি দরখাস্ত টাইপ করাইয়া খামে আঁটিয়া সেই অজানিত বাক্সের উদ্দেশ্যে হরমোহন ডাকে ফেলিয়া দিল।

তিনদিন পরে উত্তর আসিল, আফিসের জয়েণ্টসেক্রেটারী পরদিন ১টার সময় তাঁহার আফিসে তাহাকে দেখিলে আনন্দিত হইবেন।

হ্যাটকোট পরিহিত হরমোহন ১২টার সময়ই বাটি হইতে রওনা হইল। মাতাঠাকুরাণী তাহার ললাটে সিদ্ধির ফোঁটা দিয়া ঠাকুরের নিকট হরির লুট মানত করিলেন, কনিষ্ঠা ভাগিনী খানিকটা তুলসীতলার মাটী তাহার কপালে ঘসিয়া দিল। রুমাল দিয়া তাহা পুছিয়া, পাণের পরিবর্ত্তে সেনসেন চিবাইতে চিবাইতে সে যখন আফিসে পৌঁছিল, তখন ১টা বাজিতে আর পনর মিনিট বাকী।

ঠিক ঢং করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল, দুড়ুম করিয়া তোপ পড়িল, আফিসের বাবুরা নিজ নিজ ঘড়ি মিলাইলেন, হরমোহনের 'স্লিপ'ও সাহেবের হস্তগত হইল। সাহেব সেলাম দিলেন। ছড়ি ও হ্যাট হাতে করিয়া হরমোহন সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া সাহেবকে সেলাম করিল।

একথা ওকথার পর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়াছে কিনা। তাহার উত্তরে সে জানাইল যে সে গ্র্যাজুয়েট এবং সে কথা তাহার দরখাস্তেও উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পুনর্ব্বার যখন সাহেব ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে সে গ্র্যাজুয়েট কিনা তাহা জানিবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন তাঁহার নাই এবং সে ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসাস্বত্বেও তাহার সঠিক উত্তর না দেওয়া তাহার পক্ষে ভদ্রোচিত কার্য্য হয় নাই, তখনই হরমোহনের ধৈর্য্য-সীমাচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

যাহাহউক, বিনীতস্বরে হরমোহন পুনর্ব্বার জানাইল যে সে কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বি, এ পাশ করিয়াছে, এবং সেই কথাই সে সাহেবকে ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছে।

গম্ভীরভাবে সাহেব বলিলেন, তাহার ন্যায় বাবুকে তিনি যে তাঁহার আফিসে স্থান দিতে পারিলেন না সেজন্য তিনি দুঃখিত। তাঁহার ন্যায় সাহেবের নিকট একজন বঙ্গীয় যুবকের "গ্র্যাজুয়েট" শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রয়াস পাওয়া সাহসের কার্য্য হইলেও তাহা অমার্জ্জনীয়।

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং সেলাম করিয়া হরমোহন বাহির হইয়া আসিল। চাপরাসী বক্‌সিস্ চাহিল। কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও না করিয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাহিরে আসিল,—একেবারে ট্রামে উঠিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, চাকরি আর সে করিবে না। তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত তখন লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মাতা অনেক বুঝাইলেন, ভগ্নী অনুনয় করিল, হিতা-কাঙ্ক্ষী বৃদ্ধগণ ভৎর্সনা করিলেন, বন্ধুগণকে দিয়াও অনেক অনুরোধ করান হইল,—তথাপি সে টলিল না, ভীষ্মের মত অবিচলিত রহিল।

ক্রমে একমাস দুইমাস গেল। কিন্তু তাহার সেই এক কথা, না খাইয়া মরিলেও চাকরি আর করিব না। যে গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে জানে না, তারই অধীনে চাকরি! "তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!"

ভগ্নীর শ্বশুর আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তা মার্চ্চেন্ট আফিসে না হোক্ গভর্ণমেণ্টের চাকরির চেষ্টা করলেও ত হত। লোকে কি আর চাকরি করে খাচ্ছে না?"

"বুঝতে পাচ্ছেন না তালুইমশাই———"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "খুব বুঝতে পেরেছি বাবা। বেইমশাই নেই, এখন সংসারের ভার তোমার উপর তা বুঝ্‌ছ? এ কটা বচ্ছর যেন না খেয়ে না দেয়ে গহনা বেচে বেনঠাক্‌রুণ পড়ারখরচ সংসার খরচ সবই চালিয়ে এলেন, এখন?"

"আমি ভাবছি হয় বিলাত, না হয় আমেরিকা, না হয় জাপান যাব।"

'হোঃ হোঃ' করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "বেনঠাকরুণ, কবিরাজ দেখান, বাবাজির মাথাটার একটু বিকৃতি হয়েছে।"

হরমোহনের মনে একেই অগ্নি জ্বলিতেছিল, এই মন্তব্যে তাহাতে ইন্ধন-সংযুক্ত হইল।

মাতা বলিলেন, "সেই কবে কে সাহেব কি বলেছে, তাই বলে যে একেবারে চাকরিই কর্‌বি নে তার মানে কি? লেখাপড়া শিখে পাশ করে লোকে কি এমনি করেই বাঁদর হয়?"

ক্ষুন্নস্বরে হরমোমন বলিল, "মা, আমি বিলাত যাব।"

"যা খুসী তাই কর বাপু; বেই যে বলে গেল মিছে নয়, তোর মাথাই খারাপ হয়েছে বটে। পাগল কোথাকার! লেখাপড়া শিখলি, ভাবলুম কোথায় একটা মানুষ হয়ে চাকরি বাকরি কর্‌বি, তা নয় এ কি সব পাগলের পাগলামি।"

(২)

কথাটা যে বাস্তবে পরিণত হইবে তাহা কি কেহ ভাবিয়াছিল? হঠাৎ একদিন হরমোহন নিরুদ্দিষ্ট হইল। মাতা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইলেন, ভগ্নী ভাবিলেন, মাথা খারাপ মানুষ—হয়ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মধ্যে খোঁজ করা হইল, সকলেই একবাক্যে বলিল, যে তাহারা কোন খবরই রাখে না। হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া রাস্তার চতুঃপার্শ্বে, ট্রামোয়ের থামে আঁটিয়া দেওয়া হইল, বেঙ্গলী হিতবাদী উভয় পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কিন্তু তিনদিন চারিদিন করিয়া এক সপ্তাহ কাটিল, তথাপি কোন উদ্দেশ মিলিল না। মাতা যোড়করে কালীঘাটে পূজার মানত করিলেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তথাপি হরমোহনের সন্ধান মিলিল না।

যে যাহাই বলিল, তাহাই করা হইল, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি রহিল না। এক জ্যোতিষীর নিকট গণনা করান হইল, তিনি সবিশেষ গণনা করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'তোমার ছেলে হৃষীকেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে।'

হরিদ্বারে এক পরিচিত ব্যক্তি রেলে কাজ করিতেন। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইল, চিঠিও লেখা হইল, পাঁচদিন পরে তিনি উত্তর দিলেন যে সেখানকার সন্ন্যাসীসাগর মন্থন করিয়া হরমোহনরূপ রত্ন উদ্ধার করা একান্তই দুরাশা।

পনের দিন পরে বম্বে হইতে এক পত্র আসিল। মাতাকে অশেষবিধ সান্ত্বনা-

বাক্য দিয়া শেষে হরমোহন লিখিয়াছে যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন আংটী প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া এবং 'অন্য উপায়ে' চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু অর্থের সংস্থান হইয়াছে, তাহাতে সে ডেকপ্যাসেঞ্জার হইয়া বিলাত রওনা হইল। চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই, অল্পকাল মধ্যেই সে 'মানুষ' হইয়া ফিরিবে।

হতভাগিনী মাতা যখন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র পাইলেন, তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সপুত্র জাহাজ তখন আরবসাগরে। বাটীতে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল।

(৩)

'বিলাত দেশটা মাটির' এই গানটি কেবল শোনা নহে, হরমোহন নিজেও অনেকবার গাহিয়াছে। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, রোগে ভুগিয়া যখন নিরাপদে সে লণ্ডনের জনসমুদ্র মাঝে অবতরণ করিল, তখন বিলাতের রঙ্গীন নেশাটা তাহার অনেক পরিমাণে ছুটিয়া গিয়াছে। নিঃসহায় এবং অর্থহীন অবস্থায় এ সাগরে পাড়ি জমান যে অসম্ভব, তাহা সে এতদিন পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। পুত্রহারা জননীর মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার সহপাঠী এক বন্ধু ব্যারিষ্টার হইবার আশায় কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়াছিল। তাহার ঠিকানাও জানা ছিল,—অকুল সমুদ্রে কুল পাইবার আশায় অনেক ঘুরিয়া অনেক খুঁজিয়া যখন বন্ধুবরের নিকট সে উপস্থিত হইল, তখন বন্ধুবর যে কেবল বিস্মিত হইল তাহা নহে, যৎপরোনাস্তি আনন্দিতও হইল।

অবশেষে সে বলিল, "তা বেশ হয়েছে হরা—তুই এসেছিস্! আমি ত ভাই এখানে থেকে থেকে বাঙ্গলা ভাষাটা এক রকম ভুলেই যাচ্ছিলাম, এখন তবু তোর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচব।"

হরমোহন তাহার জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস ও বৈরাগ্যের কারণ বিবৃত করিল। বন্ধুবর সহাস্যে করতালি দিয়া বলিলেন, 'Bravo!'

কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলে কি করিয়া? মৌখিক মিষ্টালাপে ত লণ্ডনের ন্যায় সহরে একজন ভদ্রলোকের উদরপূর্ত্তি হয় না! প্রায় দিন পনের পরে বন্ধুবর যখন দেখিল যে তাহার পিতৃপ্রেরিত অর্থে এরূপ আতিথেয়তা করা ঘোর অমিতব্যয়িতার পরিচায়ক, তখন একদিন সে স্পষ্টই হরমোহনকে বলিল "হরা, এখন কি করবি ভাবছিস্?"

"কিছুই ত ভাবি নি,———"

"কি রকম! তবে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এত টাকা খরচ করে গুরুজনের মনে কষ্ট দিয়ে বিলাতে এলি?"

"ঐ যা বলেছি, একটা ভয়ানক বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হল।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বন্ধুবর বলিল, "দূর কর ছাই বৈরাগ্য! একটা কিছু কাজ করা ত চাই! ব্যারিষ্টারি পড়বি?"

"না, আমার উদ্দেশ্য একটা স্বাধীন ব্যবসা কিছু শেখা।"

"তবে কি করবি ভাবছিস? একটা যা হয় বল।"

হরমোহন তখন বড়ই কাতর স্বরে বলিল "আমি ত ভাই কিছুই জানি না, তুমিই যা হয় একটা কিছু উপায় করে দাও। এখন ভাবছি মাকে কাঁদিয়ে পালিয়ে আসাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

বেকার অবস্থায় থাকিয়া বন্ধুর পিতৃপ্রেরিত অর্থ ধ্বংস করিতে তাহারও বড় লজ্জা বোধ হইতেছিল!

বন্ধু বলিল "নিশ্চয়ই! তা আর বল্‌তে।"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর সে আবার বলিল "দেখ্ হরা! একটা কাজ করতে পারিস্ ত আমি বলি। এখানকার থিয়েটার-পাগলা যারা, তারা প্রাচীন ভারতের নাটক খুব পছন্দ করে। এই সে দিন একটা থিয়েটারে বুদ্ধদেব প্লে হয়ে গেল,—ওরে বাপরে, সে লোকের কি ঠেলাঠেলি! তুই এক কাজ কর্। ভাল ভাল বাংলা নাটকের ইংরাজী তরজমা করে দে, আমি বরং চেষ্টা করে একটা থিয়েটারে তোকে পরিচয় করিয়ে দেব।"

আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভাসমান তৃণ দেখিয়া কলম্বসের মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, বুঝি হরমোহনের আজ ততোধিক আনন্দ হইল।

সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল "বেশ বলেছিস্ ভাই, তাই করব। কি বই তরজমা করা যায়—একটা ভাব্ দেখি।"

অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর স্থির হইল যে "কালাপাহাড়" অনুবাদ করা হইবে।

হরমোহন বলিল "তা ত হ'ল। কিন্তু এখানে বই কোথা পাব?"

"কুছ পরোয়া নেই। আমার কাছে "কালাপাহাড়" আছে।

সে দিন বৃহস্পতিবার। 'বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া হরমোহন সেই দিনই "কালাপাহাড়" ভাষান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

কালাপাহাড়ের অনুবাদ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেন। গ্রহ সুপ্রসন্ন হইলেন, হরমোহনের "Iconoclast" (মূর্ত্তিঘাতক অর্থাৎ কালাপাহাড়) এর খুব পশার হইল। তৃতীয় অভিনয় রজনীতে এমন ভিড় হইল যে রঙ্গালয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া হরমোহনের করমর্দ্দন করিয়া আনন্দ সম্ভাষণ করিয়া গেলেন। ইহাতে তাহার যে অর্থের সংস্থান হইল, তাহাতে সে বন্ধুবরকে ধন্যবাদ দিয়া অন্যত্র বাসা করিল।

উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সে গিরিশ বাবুর "জনা"র অনুবাদ করিল। ভাগ্যদেবী এবারও সুপ্রসন্না হইলেন, লিট্‌ল্ থিয়েটারের ম্যানেজার আসিয়া তাহাকে মাসিক কিছু বৃত্তি দিয়া বাংলা নাটকের তরজমা করিবার চুক্তিপত্র লেখাইয়া লইলেন।

মাস তিনেকের মধ্যে পাঁচখানি নাটক সে প্রকাশ করিল। যে দিন প্রতাপাদিত্য অভিনীত হইল, সেদিন সহরে বোধ হয় আর লোক ছিল না। তাহাতে যে তাহার কেবল অর্থলাভ হইল তাহা নহে, আরও যাহা লাভ হইল, তাহার জন্য তাহাকে পরে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

থিয়েটারের এক অভিনেত্রী বঙ্গীয় যুবকের এই কৃতকার্য্যতায় মুগ্ধ হইল। ক্রমে উভয়ে আলাপও হইল। ক্রমে ঘনীভূত আলাপ যখন প্রণয়ে পরিণত হইল, তখনও কেহ তাহার মধ্যে নিতান্ত অসঙ্গত কিছু দেখিল না, কারণ এরূপ ব্যাপার ইংলণ্ডে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে দিন শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ড বিতরিত হইল, সে দিন নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর বন্ধুগণই যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

অভিনেত্রী "ম্যাবেলে"র সহিত হরমোহন রায়ের শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়া গেল। বধূও থিয়েটারের খাতা হইতে নাম কাটাইলেন।

সেই দিন হরমোহনের বিলাত প্রবাসের একবর্ষ পূর্ণ হইল।

* * * * * * * * *

স্বামী স্ত্রীতে কয়েক মাস বেশ সুখেই কাটিল। অকস্মাৎ হরমোহনের জীবনবসন্তকুঞ্জে তুষারপাত হইল কি না জানি না, কিন্তু মিসেস্ রায় একদিন প্রস্তাব করিলেন যে ইংলণ্ড ছাড়িয়া তাঁহারা ভারতে আসিয়া কলিকাতার জঘন্য থিয়েটারগুলিকে পদদলিত করিয়া সম্পূর্ণ বিলাতী ধাঁজে, বিলাতী কায়দায় এক দেশী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিবেন,—আর তাহার নাম হইবে 'প্যারাডাইজ

থিয়েটার',—স্বর্গের মতই তাহা মনোরম ও নয়নারাম, কল্পনা ও ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

বিবাহের ঠিক ছয়মাস পরেই কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের খাতায় মিষ্টার ও মিসেস্ রয়ের নাম রেজেষ্ট্রী হইল।

হরমোহন থিয়েটার খুলিবার জন্য উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

(৫)

"ওমা! দাদা এসেছে গো!"

"কই বাবা আমার! এসেছিস্ ফিরে! আয় বাবা!"

জননী আছড়াইয়া পড়িলেন। হ্যাট কোট পরিহিত হরমোহন সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতেছিল।

"এত কাল কোথায় ছিলি বাবা আমার! আমার যে ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে মস্ত রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছে।"

ভগ্নী সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল "মার কি আর সে শরীর আছে? কেবল দিন রাত কান্না। একেবারে এমনি করেই কি ভুলে থাকতে হয় দাদা?"

"দূর পাগলি ভুলব কেন?" বলিয়া হরমোহন চিরপরিচিত তক্তপোষের উপর বসিল।

যখন সে তার বৈচিত্রময় প্রবাসকাহিনী বলিতেছিল, মাতাপুত্রী উভয়েই তখন নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিল। তারপর যখন ম্যাবেলের সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া শোকতাপক্লিষ্টা আতুরা জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন হরমোহন একটু চঞ্চল হইল।

"হাঁ দাদা, তোমার মনে শেষ এই ছিল? শেষটা থিয়েটারের একটা বিবি নাচউলী বিয়ে করে নিয়ে এলে!" বলিয়া ভগ্নী শুশ্রূষা দ্বারা মূর্চ্ছিতা জননীর চৈতন্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল।

অনেক স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া হরমোহন যখন হোটেলে ফিরিল, তখন রাত্রি ৮॥০ টা বাজিয়া গিয়াছে। খানসামা ডিনার আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু তখনও মেমসাহেব ফিরেন নাই। টিফিনের পরই তিনি সপিংএ বাহির হইয়াছিলেন।

৯॥০টার সময় সপিং প্রত্যাগত মেমসাহেব আসিয়া হরমোহনকে বুঝাইলেন যে তাঁহাদেরই থিয়েটারের একজন দক্ষ অভিনেতা নিজে এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া গ্রাণ্ড অপেরা হাউসে সদলবলে অভিনয়ার্থে আসিয়াছেন।

চৌরঙ্গীতে তাঁহারই সহিত দেখা হওয়ায় গল্প গুজব এবং অতীত কাহিনীর চর্চ্চায় যে এত রাত্রি হইয়াছে, তাহা তাঁহার মোটেই খেয়াল ছিল না।

হরমোহন কিন্তু মনে মনে ভারি বিরক্ত হইল। কিন্তু উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন ঐ রকম বেশী রাত্রি হইয়া অবশেষে যখন একদিন মেমসাহেব রাত্রিতে আদৌ গৃহে ফিরিলেন না, তখন হরমোহন যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সে তাহার সন্ধানও লইল না। তাহার মনে তখন অনুতাপ হইয়াছিল। মনোযন্ত্রণায় সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন "ডেলি নিউস" পড়িতে পড়িতে থিয়েটারের সমালোচনার কলমে সে পড়িল যে গ্রাণ্ড অপেরা হউসে যে বিলাতী কোম্পানি কয়েক মাস যাবৎ অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা গত রজনীতে যেরূপে 'ম্যাকবেথ' অভিনয় করিয়াছেন তাহা বস্তুতই তুলনারহিত; এবং এরূপ সুচারুরূপে ম্যাকবেথ অভিনীত হইবার অন্যতম কারণ এই যে, বিলাতের যে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিস্ ম্যাবেল প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ "অজ্ঞাতবাসে" ছিলেন, তিনি এতদিনে স্বীয় অজ্ঞাতবাস পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া গত রজনীতে 'লেডী ম্যাকবেথের' ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসীর দুর্ভ্যাগ্য যে উক্ত কোম্পানি সদলবলে আগামী সপ্তাহেই জাপান রওনা হইবেন। সুতরাং 'ম্যাকবেথ' দর্শনার্থী নাট্যো-মোদীগণের ইহাই শেষ সুযোগ—

ঘৃণায়, লজ্জায় ও ক্রোধে সে কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আরও কি লেখা ছিল, কিন্তু আর তাহা পড়িতে প্রবৃত্তি হইল না।

(৬)

সেই দিনই হ্যাটকোট ছাড়িয়া, ধুতি চাদর পরিয়া, দ্বিপ্রহরে হরমোহন আসিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইল। মাতাপুত্রের অশ্রুতে উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল।

প্রায় পনের দিন পরে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে গ্রাণ্ড অপেরা হউসের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের 'সুপ্রসিদ্ধা' অভিনেত্রীর 'সুসমাচার' জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে মিস্ ম্যাবেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সৌভাগ্য তিন দিন পূর্ব্বে আসিলেই হইতে পারিত। কারণ দুই দিন পূর্ব্বে সে কোম্পানি সদলবলে জাপান যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রাণ্ড অপেরা হাউসের ষ্টেজ ভাড়া লইয়াছিলেন মাত্র, সুতরাং তিনি অধিক সংবাদ কিছু রাখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই।

নতমুখে হরমোহন চলিয়া আসিল। সেই দিনই সমস্ত বৃত্তান্ত বিলাতে তাহার ভাবী ব্যারিষ্টার বন্ধুকে লিখিল। উপসংহারে লিখিল, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এইবার মাথা মুড়াইব।"

উত্তরে বন্ধুবর লিখিলেন "যদি নালিশ করিতে চাও, আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তুমিও কোন উকিলের পরামর্শ লইতে পার, কিন্তু আমি বলি আর কেলেঙ্কারিতে কাজ নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ, বেশ হইয়াছে। মাথা মুড়ানর ব্যবস্থাও মন্দ নয়, তবে একটু ঘোলও ঢালিও, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঘোলটা অনেক কঠিন রোগের বীজাণু নষ্ট করে!"

হরমোহন মাথা মুড়াইয়াই হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

তুমিই সব।

আলোক তুমি আঁধার তুমি
তুমিই আবার গোধূলি ;
আকাশ তুমি জলদ তুমি
তুমিই আবার বিজলী।
প্রাতে তুমি তরুণ ভানু
প্রভায় জগত উজলি,
প্রেমে উছল তরল তনু
উজান বয়ে যাও চলি।
মন্দিরে তুমি বিগ্রহ পর
লুকায়ে রেখেছ চেতনা,
কলুষে তুমি নিগ্রহ কড়া
অবতার যার প্রেরণা।
তোমার লীলা তুমিই কর
কিছুই ওগো বুঝি না,
ওহে, অন্ধ আমি বন্ধু তুমি
স্বরূপ তোমার দেখাও না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

ভাই ভাই।

(১)

"হাঁ সেজ বৌ——"

"কি বড়দি?"

"তোমার ভাসুর বল্লেন, সেজ বৌমাকে গিয়ে বল——"

"কি বড় দিদি? কি?"

"তা দেখ ভাই, সংসারটা এখনও গুছিয়ে নিতে পারেন নি। শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ যেতে না যেতেই মেজঠাকুরপোর ব্যামো হ'ল—চিকিচ্ছেয় কত খরচ হ'ল—নানা যায়গায় বেড়াতে হ'ল—আহা তবু যদি প্রাণটা থাকৃত—হুঁ——"

বলিতে বলিতে বড়বধূ বিমলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পসিক্ত নয়ন অঞ্চলে মার্জ্জনা করিলেন।

সেজবধূ নিরুপমার মুখখানি যেন একটু আঁধার হইয়া উঠিল। সে কহিল, "তা—আমাকে কি ক'ত্তে হবে দিদি?"

বিমলা আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ—তা—অনেক দেনা পত্তর হ'য়েছে। সেজঠাকুরপোর মুখের দিকেই চেয়ে ছিলেন,—তার বড় চাকরী হ'য়েছে—এখন দু তিনটে বছর একটু সামলে সুমলে চ'ল্‌লে দেনা সব শোধ দিয়ে সংসারটা গুছিয়ে নিতে পারেন। মেজঠাকুরপোর—ষাট ঐ কটি গুড়ো আছে—তাদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে,—আবার সুরু (বড় বধূর কন্যা) বড় হ'য়ে উঠ্‌ল, তাকে বিয়ে দিতে হবে—দায় ত কম নয়।—তাই ব'ল্লেন,—তুমি এখনই না গিয়ে—অবিশ্যি যাবেই ত—যাবেই ত—কেন যাবে না? সেজঠাকুরপোর বড় চাকরী হ'য়েছে, সবাই যায়—তুমিই বা কেন যাবে না? তা উনি ব'ল্লেন—আর দু তিনটে বছর যদি বাড়ীতে থাক———"

নিরুপমা উত্তর করিল, "তা এ কথা আমায় কেন ব'লছ দিদি? তোমার ঠাকুরপোকে গিয়ে ব'ল্লেই ত পার? তাঁর ভাই, তাঁর ভাইপো ভাইঝি, তাঁর সংসার—যা ভাল বিবেচনা হয় তিনিই ক'র্‌বেন? আমি কে দিদি?"

"তাঁকে ত উনি ব'লেছেনই, তা——"

"তবে আর কি? আমার কাছে আবার কেন? আমার কি এমন দিদি? যেখানে হয় দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলেই হ'ল।—তবে ওঁর নাকি শরীর ভাল না—একা থাকৃতে কষ্ট হয়—— খাওয়া দাওয়ার একটু যত্নই বা কে করে? তা দিদি—আমি কি ব'লব? তোমরা বোঝ। আমি ত জোর ক'রে যেতে চাইনি। ওঁর শরীর ভাল না—তাই নিতে চাচ্চেন,—তোমরা পাঠাও যাব—না পাঠাও নেই।"

"শরীর—বালাই! কই ঠাকুরপোর অসুখ বিসুখ ত কিছু দেখি না—"

নিরুপমা উত্তর করিল, "তা দিদি, তোমাদের চোকে পড়ে না ব'লে কি শরীরে অসুখ হ'তে পারে না? তোমরা ভাবছ সংসারের কিসে ভাল হবে, তাই। তা মানুষটোর দিকেও ত একবার চাইতে হয়?"

বিমলার একটু রাগ হইল। ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া অনুযোগের স্বরে তিনি কহিলেন, "হাঁ সেজবৌ, এত বড় কথাটা আজ তুই আমাকে ব'ল্লি? সেই ছেলে বেলা থেকে আমি এক রকম হাতে গড়ে মানুষ ক'রেছি ব'ল্লেই হয়। আমার দরদ কিছু নেই, আর দুবছরেই তোর এত বড় দরদ হ'ল? তা যা খুসী তোদের কর্। আমি আর কিছু ব'ল্‌তে চাইনে। এত বড় সংসারটা—পাঁচজন রয়েছে—তা তার দিকে চাইতে হয় বই কি? তাই ব'লে মানুষের দিকেও না চাই, তা নয়। তা তোর যেমন মানুষটাই সব—সংসারটা কিছুই নয়—এমন হ'লে ত আমাদের চলে না বোন্!"

"না চলে—সংসারের ভালই দেখ না? আমাকে নিয়ে কেন অত কথা ব'লছ? আমি কি অপরাধ ক'ল্লুম? আমি ত আর বলিনি যে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। ভাল জ্বালা হ'য়েছে! সাতে নেই পাঁচে নেই—আমাকে নিয়ে এ টানাটানি কেন? তোমাদের দ্যাওর—তোমাদের সংসার—তোমরা কেন বোঝা পড়া ক'রে একটা ঠিক ক'রে নেও না? আমাকে কেন সুধোতে এসেছ? মিছে ত একটা নিন্দের ভাগী আমায় করা? যেন আমার ইচ্ছেতেই সব হ'চ্চে—আর হবে।"

"তা বোন্, কিছু হয় বই কি? দিনকাল ঐ এক রকম, তোমরা এখন বড় সড় হ'য়েছে, তোমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেও ত একটা আছে।—আর তা মেনেও একটু চ'ল্‌তে হয়। এই ত তুমি যদি ইচ্ছে করে খুসী হ'য়ে থাক, ঠাকুরপো হয়ত এখন তোমাকে নিয়ে যাবে না।"

"এ কেমন কথা দিদি? সব দোষ ত আমার ঘাড়ে চাপান! আমার ইচ্ছে অনিচ্ছেয় কি এমন এসে যায়? তাঁর যদি ইচ্ছে না হয়,—অসুখ শরীর—তা তোমরা ব'লছ—ও কিছু নয়—বেশ, যদি কিছু নাইই হয়—আমি জোর ক'রে কেন যাব? এমন যেতেই আমি কে? নিজের সকের জন্যে ত আর যেতে চাইনি! অসুখ ব'লে নিতে চেয়েছিলেন—আপত্তি করিনি। সংসারের ভালর জন্যে যদি না নিতে চান—যাব না। তোমরাই যা হয় একটা ঠিকঠাক ক'রে নেও না গে? আমাকে নিয়ে কেন এত গোলমাল ক'রছ? ছিঃ! লজ্জায় যেন আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্চে। আর বট্‌ঠাকুর—তিনি হ'লেন কর্ত্তা—আমি ঘরের বউ, তিনি আমায় কেন একথা ব'লে পাঠান? তাঁর ভাই আমার কথামতই চ'ল্‌বেন, একথা তিনি কিসে মনে কত্তে পাল্লেন? কি এমন স্বাধীনতা দেখাচ্চি আমি? ব'ল্লে মন্দ শোনাবে দিদি—তিনি বড়, তিনি কর্ত্তা—এটা কি সেই রকম বিবেচনার কাজ তিনি ক'রেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "এদ্দিন ত ছিলেন না,—এখন তোদের মত সুবিবেচক ভাদ্দর বউ সব ঘরে এনে যদি অবিবেচক হ'য়ে থাকেন। তা এখন তাঁকে কি ব'লব?"

নিরুপমা উত্তর করিল, "আমি কি জানি দিদি? তোমাদের সংসারের ভাল মন্দ কিসে হবে, তাই বুঝে যা ব্যবস্থা ক'র্‌বে তাই হবে। আমি ত আর একথা ব'ল্‌তে পারিনে যে তোমাদের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে কেবল একটা মানুষের দিকেই চাইবে।"

"আচ্ছা, তাই তবে বলিগে।" আঁধার মুখে এই কথা বলিয়া বিমলা ফিরিলেন। দ্বারের বাহিরে আসিতেই নিরুপমা ডাকিয়া কহিল, "হাঁ দিদি, আর একটা কথা।—"

"কি বোন্?"

"বট্‌ঠাকুরকে ব'লো—এখানকার আর আবহাওয়া খোকার তেমন সইছে না। দেখ্‌ছ ত—সর্দ্দি কাশি পেটের অসুখ যেন লেগেই আছে। আমার নিজের শরীরটাও ভাল নয়। তোমাদের বলিনি কিছু—বিকেল বিকেল মাথা ধরে—গা জ্বর জ্বর করে,—তা আমাকে যেন বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন।"

"আচ্ছা।" এই বলিয়া বিমলা চলিয়া গেলেন।

(২)

"নাগো! সে সব হবে টবে না! পাঠিয়েই দেও! আগেই ত জানি, তা তুমি কিছুতেই মান্‌বে না।"

"কেন সেজবৌমা কি ব'ল্লেন? থাক্‌তে চাইলেন না?"

"নাগো! থাক্‌তে তার আদবে ইচ্ছেই নেই। জোর ক'রে রাখ্‌তে চাইলেও এখানে সে থাক্‌বে না,—বাপের বাড়ী যাবে। এ পাড়াগেঁয়ে আব-হাওয়া তার ছেলেরও সয় না—তার নিজেরও সয় না। তার নাকি রোজই বিকেলে মাথা ধরে—গা জ্বর জ্বর করে!"

"হুঁ—তা তিনি কি ব'ল্লেন? এখানে থাক্‌বেনই না?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "এখানে কবেই বা ছিল যে আজ থাক্‌বে? এদ্দিন ঠাকুরপোর চাকরী হয়নি, বাপের বাড়ীতেই ত র'য়েছে,—মাঝে মাঝে দু এক মাসের তরে যা এখানে এসেছে। এখন ঠাকুরপোর চাকরী হ'য়েছে, সঙ্গে গিয়ে থাক্‌বে। না যেতে দেও—আবার বাপের বাড়ী যাবে।"

স্বামী বিপিনচন্দ্র কহিলেন, "হুঁ—তা সেটা—কি ভাল দেখাবে?"

"ভাল ত দেখাবেই না। বিয়ের পর বাপের ঘরে সুখ সুসার থাক্‌লে অনেক বউ দু চার বছর সেথায় অমন বেশী থাকে। তাতে এমন দোষেরও দেখায় না—কিছু কথাও হয় না। এখন বড় হ'য়ে উঠেছে, ছেলেটি কোলে হ'য়েছে, ঠাকুরপো বড় চাকরী পেয়েছে,—এখনও যদি বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ে থাকে, লোকে কি ব'ল্‌বে? তারাই বা কি মনে ক'র্‌বে? লাভের মধ্যে হবে কেবল নিন্দে অখ্যাতি। ঘরে যায়েরা জ্বালা দেয়, ভাতারের সঙ্গে থাক্‌তেও ভাসুর বাদী হয়,—আবাগীর আর গতি কি? তাই বাপের বাড়ীতেই প'ড়ে আছে! না—এত সব কথার কি দরকার? ও পাঠিয়েই দেও,—যেখানে স্বস্তিতে থাকে থাক্‌গে। এখানে থাক্‌লেও স্বস্তিতে কেউ থাক্‌বে না।"

"তাই ত! তাই ত। বড় মুস্কিলের কথাই হ'ল———"

"এ রকম যে হবে তা ত জানা কথাই, তুমি সে বোঝনি। বাপ বড় চাক্‌রে, বরাবর বাপের সঙ্গে সহরে আরাম বিরেমে র'য়েছে, একটু ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছে, ১৪।১৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাপের বাসার সহুরে সব বাবুয়ানা চাল অভ্যেস হ'য়েছে,—ও এখন এসে এ গেঁয়ে গেরস্তালীর মধ্যে থাক্‌তে পারবে কেন? তাই এলেই ছট ফটিয়ে পালিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। ওর দোষ কি? যে ভাবে মানুষ হ'য়েছে, তেমনি ত হবে?"

"তা বাপ যখন গেঁয়ে গেরস্তর ঘরে সেধে বিয়ে দিয়েছিলেন——"

"দিয়েছিলেন ঠাকুরপোকে দেখে! তোমার গেঁয়ে গেরস্তালীর ঘর

দেখে ত আর নয়? ভেবেছিলেন, ছেলে ভাল, কটা বছর গেলেই ভাল চাকরি পাবে, জামায়ের সঙ্গেগে সহরেই থাক্‌বে,—দুচারটে বছর কোনও মতে কেটে গেলেই হয়। তাও তাঁর কাছেই প্রায় থাকৃতে পাবে। হাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা! তুমিই বোঝনি, আমি এটা প্রথম থেকেই বুঝেছি। তারপর যে ঘরের মেয়ে,--ওর বাপ খুড়ো সবাই বড় চাকরী করে, যার যার পরিবার নিয়ে বিদেশেই থাকে। গেঁয়ে গেরস্তালীতে পাঁচজনে মিলেমিশে কেমন ক'রে থাকৃতে হয়, তা ওরা চোকেও কথনও দেখেনি। এখন ব'ল্লে কি হবে? ওরা জানে ভাতার চাকরী ক'ল্লে তার সঙ্গেই গে থাকৃতে হয়, তার উপর সকল দাবী তার মাগছেলেরই। সংসারে আর পাঁচজন যারা আছে, তাদের কুলোয় কিছু দেবে—না কুলোয় না দেবে,—বস্!"

বিপিনচন্দ্র ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে স্ত্রীর বক্তৃতা শুনিতে-ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে লম্বা একটি টান দিয়া একরাশি ধূম উদ্গীরণ করিয়া কহিলেন, "হুঁ——তা হ'লে সেজবৌমাকে পাঠাতেই হবে?"

"যদি এখনও বাপের ঘরে তাকে ফেলে রেখে নিন্দের ভাগী না হ'তে চাও ত হবে বই কি?"

"হুঁ!—বড় মুস্কিলের কথাই হ'ল বড়বৌ! এতগুলো দেনা হ'য়ে গেছে। সংসারে পুষ্যিও কম নয়। শরৎ চ'লে গেল, পুলীনের ত পড়াই শেষ হ'ল না! এক সুরেশের মুখের দিকেই চেয়ে ছিলুম। পরিবার নিয়ে সহরে থাক্‌তে হ'লে খরচ যে বড় বেড়ে যাবে। সংসারে আর কতই দিতে পার্‌বে? তাই ত—তাই ত—বড় বিপদের কথাই হ'ল। আর নিদেন দুটো বছরও যদি একটু গুছিয়ে চলা যেত, তবু সাম্‌লে উঠ্‌তে পাত্তুম!"

বিমলা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তা কি ক'র্‌বে? ঠাকুরপোর যদি বিবেচনা থাকে—সত্যি তুমি একলাই ত সব দায়িক নও—তা তার বিবেচনা যদি থাকে, যা দিতে পারে তাই দিয়েই চালাতে হবে। না পারে, কি আর হবে? দুঃখে কষ্টে কত লোকেরই ত দিন যাচ্ছে—আমাদেরও যাবে। তবে ঐ মেজ-বউটো—আহা, বাপের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বছরে একখানা কাপড় দিয়েও তত্ত্ব করে—আর যাট ঐ গুড়োকটি আছে,—তা ঠাকুর বাঁচিয়ে রাখুন, প্রাণ তিনি দিয়েছেন—খেতেও তিনি দেবেন। আর ঐ ছোট ঠাকুরপোর পড়ার খরচটা—আরও ২।৩ বছর ত অন্ততঃ চালাতে হবে——।"

বিপিন ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি ভাব্‌ছি এতগুলো দেনার কি

হবে? সংসারটা মোটা ভাত কাপড়ে একরকম আমিই চালিয়ে নিতে পারব। পুলীনের পড়ার খরচাটা—সুরেশই হয়ত দেবে। কিন্তু বাড়ীতে যদি তেমন কিছু না দিতে পারে, দেনার কি হবে? কুল্লে ত ৫০টি টাকা আমার মাইনে। সংসার চালিয়ে দেনা শোধ কি দিতে পার্‌ব? জমাজমিটুকুও যদি শেষে যায়, তবে যে গোষ্ঠী উপোস ক'র্‌বে। দুটো বছরও সুরেশ—সওয়াশ না হক—নিদেন একশ ক'রেও যদি মাসে দিতে পার্‌ত, তবু দেনাটা একরকম শোধের মধ্যে আস্‌ত। তা পরিবার সঙ্গে নিয়ে গেলে কি আর তা পার্‌বে? দুশোটাকা ত এখন মাইনে,—কত আর বাঁচাতে পার্‌বে? সেজবোমা কি আর তেমন গুছিয়ে অল্পখরচে চ'ল্‌তে পার্‌বেন?"

"হাঁ! দুশতেই কুলুক আগে। সদরালার মেয়ে—ডেপুটীর মাগ—তার গরজ প'ড়েছে তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে ক্লেশ কষ্ট ক'রে অল্প খরচে গুছিয়ে থাক্‌বে!"

"তবে কি উপায় হবে বড়বৌ?"

"ঠাকুর যা ক'রেন তাই হ'বে, ভেবে মিছে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ কি?"

(৩)

স্বামীর সঙ্গে কথা বলিয়া বিমলা পাকের ঘরের দিকে গেলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে। মেজবধূর উপরে ছেলে পিলেদের প্রতিপালনাদি কার্য্যের ভার ছিল। ছোটবধূই প্রায় রান্না করিত। বড়বধূর অবসর কম হইত। মেজবধূ নববিধবা—যায়েরা তাঁহাকে মাছের হেঁসেলে ঢুকিতে দিত না। সেজবধূ ইচ্ছামত মাঝে মাঝে এক আধদিন রান্না করিত, অন্য কাজও—যখন সক হইত—কিছু করিত। বাঁধা নিয়মের কঠিন কোনও কাজে কেহ তাহার উপরে নির্ভর করিত না। সন্ধ্যার পর মেজবধূ ছেলেপিলেদের খাওয়াইতেন, ছোটবধূ পাক করিত, সেজবধূ কোনও দিন আসিয়া কাছে বসিয়া হাসিগল্প করিত, কোনও দিন নিজের ঘরে শুইয়া বই পড়িত। না আসিলে কেহ তাহাকে ডাকিত না,—আসিয়া বসিলেও কেহ উপেক্ষা করিত না। মন খুলিয়াই হাসিগল্প করিত। বড়বধূ সংসারের গৃহিণী, ঘুরিয়া ফিরিয়া যেখানে যেমন প্রয়োজন হইত, সকলের কাজ-কর্ম্মেই সাহায্য করিতেন। স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া বিমলা পাকের ঘরে আসিলেন। ছোটবধূ পাক সারিয়া একা চুপচাপ বসিয়া আছে। বিমলা কহিলেন, "কিলো! একা চুপচাপ ব'সে আছিস্ যে! ছেলেপিলেদের খাওয়া হ'য়েছে?"

"হাঁ দিদি।"

"মেজবৌ কোথালো ?"

"ওদের খাইয়ে দাইয়ে নেয়ে বুঝি ঠাকুর ঘরে গেছেন।"

"না:—এত বারণ করি, কথা শুন্‌বে না। রোজ রেতে নেয়ে নেয়ে জ্বরে পড়্‌ক, শেষে মর মাগী তুই! কেন রেতে রোজ মাছের সকড়ির মধ্যে তার আসা কেন ? ছেলেপিলেদের কি তোরা মাঝে সাঝে দুটি খাইয়ে দিতে পারিস্ নে ?"

"পার্‌ব না কেন ? তা তিনি ছাড়্‌বেন না, কি ক'র্‌ব দিদি ?"

"আমারও হ'য়েছে যেমন! বার কাজে ঘুরে ঘুরে সময় মত এদিকে আস্‌তেই পারি না। সেজবৌ বুঝি গে শুয়ে আছে ?"

"হাঁ, তাঁর বড় মাথা ধ'রেছে; আজ খাবেন না, শুয়ে আছেন।"

"ঐ ত! রাগ হ'লেই তার মাথা ধরে—আর না খেয়ে গে শুয়ে থাকে। বাপু-যাবি যা! কেউ ত আর বারণ ক'চ্ছে না ? সবাইকে এত জ্বালাস্ কেন ? নাণ্টু খেয়েছে ?" (নাণ্টু সেজবধূর শিশুপুত্র।)

ছোট বধূ নতমুখে উত্তর করিল, "না, তার নাকি অসুখ ক'রেছে। মেজদি দুধ নিয়ে গিইছিলেন——"

"তা বুঝি খাওয়াতে দেয় নি ? কেন, কি অসুখ ক'রেছে তার ?"

"তা ত জানিনে দিদি! মেজদি দুধ নিয়ে গিয়েছিলেন——"

"তা কি হ'য়েছিল ? তাকে কি ব'লেছে ?"

ছোট বধূ এদিকে ওদিকে চাহিয়া চাপা স্বরে কহিল, "দুধের বাটি রাগ ক'রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। নাণ্টুর অসুখ ক'রেছে—ঠাণ্ডা দুধ—তা আমি ত গরম ক'রেই দিইছিলুম, তা——"

"রাগ ক'রে দুধের বাটি ফেলেই দিয়েছে! ওমা, একি কথা ? ছি! মেজ-বউ এম্‌নি ক'রে সবার জন্যে মরে, তার উপরে এমন ব্যাভারটা ক'ল্লে!—এ সব কি ? যাক্ না ভাতারের সঙ্গে! যেদিন খুসী—যাক না! কেউ ত আর তাকে বেঁধে রাখ্‌তে আমরা চাইনে ?"

বলিতে বলিতে বিমলা বাহিরে আসিলেন। ছোটবধূ প্রমাদ গণিল! সেও দ্রুত পশ্চাতে আসিয়া কহিল, "দিদি! তোমার পায় পড়ি, কিছু ব'লো না! আমি জানিনে দিদি—কি শুন্‌তে কি শুনেছি—তুমি কিছু ব'লো না দিদি! বড় অনর্থ হবে, সেজদি বড় রাগ ক'র্‌বে।"

"রাগ ক'র্‌বে ত ব'য়েই গেল! রাগ ক'রে কার কি ক'র্‌বে সে ? থরচ

যায়ে যায়ে—(ভাই ভাই।)

কমলা প্রেশ,—কলিকাতা।

পত্তর বাড়ীতে দেবে না? নেই দিল। তাই ব'লে মেজবউকে এত বড় অপমান ক'র্‌বে? কেন কি হ'য়েছে?"

"না দিদি! কিছু হয়নি—কিছু হয়নি!—কি অপমান আমায় সে ক'রেছে? ও কিছু নয় দিদি! দুধ বুঝি ঠাণ্ডা ছিল—তাই——"

বলিতে বলিতে মেজবউ ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিমলা উত্তর করিলেন, "তাই ব'লে দুধের বাটি তোর গায় ছুড়ে মার্‌বে? কেন কি হ'য়েছে? এত দম্ভই বা কেন? কে তার দাসীবাঁদী যে এত সইতে যাবে?"

"হাঁ মেজদি! এ সব কি কথা? দুধের বাটি আমি তোমার গায় ছুড়ে মেরেছি? আমি না হয় আছিই মন্দ একটা লোক,—তাই ব'লে এম্‌নি ক'রে মিছে ক'রে গিয়ে লাগাতে হয়? তোমরা ত সব ভাল?"

সেজবধূও তার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজবধূ কহিল, "না, গায় ছুড়ে মার্‌বে কেন? ওমা, তা কে ব'লেছে?"

"তবে কে ব'ল্লে এমন কথা বড়দি'কে? বড়দিই বা কেন আমাকে মিছে ক'রে গাল দিচ্ছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তা গায় ছুড়ে না মার, ফেলে ত দিয়েছ? তাই বা কেন দেবে? ও তোমার ছেলের জন্য দুধ নিয়ে গেছে,—আর তুমি তা রাগ ক'রে ছুড়ে ফেলে দিলে? ওতে ওর দুঃখু হয় না?"

নিরুপমা উত্তর করিল, "দুঃখু সবারই আছে—কেবল নেই আমার! ছেলেটা অসুখে মরে—কেউ একবার চেয়ে দেখ না—আর বাটি ভরা ওবেলার একরাশি ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াইনি কেন, তাই নিয়ে এত কথা!"

বিমলা কহিলেন, "ওবেলার ঠাণ্ডা দুধ কেন হবে? এই ত সন্ধে বেলায় গাই দোয়া হল, ছোটবউ দুধ জ্বাল দিয়ে দিল———"

নিরুপমা কহিল, "তবে আমি মিছে কথা ব'ল্‌ছি! বল—বল! যা তোমাদের মনে আছে—বল! আমার নিন্দের ত আর বাকী রইল না কিছু এ ঘরে? তা আর যত যাই বল, মিছে কথা আমার বাপের ঘরে আমরা শিখিনি। মেজদিই বলুক না—দুধ গরম ছিল কি ঠাণ্ডা ছিল?"

মেজবধূ একটু থতমত খাইয়া বলিল, "তা নাণ্টুর অসুখ ক'রেছে—তা ত জানিনি—ব'ল্লে ত আবার বেশী গরম ক'রে নিতে পাত্তুম।"

বিমলাও কহিলেন, "তা দুধ আরও গরম চাই ব'ল্লে ত দোষ হ'ত না কিছু! তাই ব'লে দুধের বাটি ছুড়ে ফেল্‌তে হয়?"

"ছুড়ে কে ফেলেছে? সবাই মিলে আমার কেবল দোষই ত কেবল দেবে? মেজদিই বলুক না? আমি ছুড়ে ফেলেছি বাটি? ছেলের অসুখ—ঠাণ্ডা দুধ দেখে না হয় একটু রাগই হ'য়েছিল—এমন কি তোমাদের হয় না? তাই সরিয়ে রাখ্‌তে প'ড়ে গেল। কি অপরাধ যে ক'রেছি আমি—সবাই মিলে কেবল আমার দোষই ধ'রবে। এমন হ'লে কদিন কে টেঁক্‌তে পারে? আরও বাড়ীতে বারমাস কেন প'ড়ে থাকৃতে খুশী হয়ে চাই না, তাই কত কথা শুন্‌তে হ'চ্চে। থেকে ত রোজ এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হবে? সবার চোকের বিষ হ'য়ে কে কদ্দিন থাকৃতে পারে? তা বাপের বাড়ীতে ত এখনও যায়গা আছে। আমি সেখানে গিয়েই না হয় প'ড়ে থাকৃব।"

নিরুপমা কাঁদিয়া গৃহমধ্যে গিয়া শয্যায় পড়িল। বিমলা একটুকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, "যা ছোটবউ, ফের দুধ গরম ক'রে নিয়ে আয়।"

ছোটবধূ দ্রুত গিয়া একবাটি দুধ গরম করিয়া আনিল।

"যা মেজবউ, সন্ধ্যে আহ্নিক সেরে এখন জলটল খেগে যা। আমি দেখি যদি নাণ্টুকে একটু খাইয়ে আস্‌তে পারি।" এই বলিয়া বিমলা দুধের বাটি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিরুপমা তখনও ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। বিমলা নাণ্টুকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। নিরুপমা উঠিয়া ক্রোধ-ভরে কহিল, "বল্‌ছি ওর অসুখ ক'রেছে, তবু আমায় না ব'লে ওই ঠাণ্ডা দুধগুলো খাওয়াতে আরম্ভ ক'ল্লে? ছেলেটাকেও না মেরে নিশ্চিন্তি হবে না বুঝি?"

বিমলা কহিলেন, "কেন মিছে গোল করিস্ বোন্? দুধ খুব গরম ক'রেই এনেছি। নাণ্টু আমার শত্তুর নয় যে ওকে কুপথ্যি খাইয়ে মেরে ফেল্‌ব। রাগ হ'য়েছে—তুইও দুকথা ব'লেছিস্, আমিও দুকথা ব'লেছি। তাই ব'লে কি ছেলেটাকে না খাইয়ে রাখ্‌বি? বালাই! এমন কিছু অসুখ হয়নি ওর যে টাটকা গরম দুধ খেলে মারা যাবে।"

নিরুপমা আর কিছু বলিল না।

বিমলা নাণ্টুকে পেট ভরিয়া দুধ খাওয়াইয়া তার মুখে একটি চুমো দিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর নিরুপমাকে কহিলেন, "চল্, এখন খেতে চল্।"

নিরুপমা কহিল, "আমার মাথা ধ'রেছে, আমি খাব না।"

বিমলা উত্তর করিলেন, "ওলো, কেন মিছে আর গোল রাখিস্? যাবিই ত। আমরা বারণ ক'র্‌ব না, তোর ভাসুরও ব'লেছেন পাঠিয়ে দেবেন। এক

আধদিন যা আছিস্, কেন মিছে আমাদের কষ্ট দিবি ? চল্, এখন খেতে চল্। খেলেই ও মাথা ধরা সেরে যাবে এখন।" এই বলিয়া বিমলা নিরুপমার হাত ধরিলেন। নিরুপমা আর আপত্তি করিল না। নীরবে যায়ের সঙ্গে আহার করিতে গেল।

(৪)

পরদিন সকালে বাহির বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া বিপিন ও সুরেশ দুই ভ্রাতায় কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুরেশ কহিল, "তা সেজবৌকে ত সঙ্গে নিয়ে যাবারই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে বড়দা।"

বিপিন একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, বড়বৌ সব ব'লেছে। তা বাধা কি ? নিয়ে যাবে।"

কথার ও মুখের ভাবে সুরেশ বুঝিল, জ্যেষ্ঠের মনে কিছু ভার আছে। এই ভার ভার ভাবের কারণও যে তার অবিদিত ছিল, তা নয়।

সুরেশ একটু কি ভাবিয়া কহিল, "বড়দা, কালকার কথা সব আমি জানি। তাই আজ ইচ্ছে ক'রে নিঃসঙ্কোচে নিজেই একথা তোমার কাছে তুল্‌ছি। মনের গোল চেপে রাখ্‌লেই বাড়ে। প্রথম থেকেই খোলাখুলি ভাবে চলা ভাল।"

সর্ব্বনাশ! সুরেশ কি বলিবে ? ভবিষ্যতের বিবাদের আশঙ্কায় ভ্রাতাদের সঙ্গে একেবারে খোলাখুলি ভাবে এখনই পৃথক হইয়া যাইতে চায় না কি ? বিপিন শিহরিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন, "তা গোল আর কি ভাই ? তোমরা সুখে থাক্‌বে, এটাতে কি আমাদের কারও অন্যমত হ'তে পারে ? তবে দেনা টেনা অনেক হ'য়ে গেছে—খরচ বেড়ে গেলে———"

"সব জানি বড়দা। এখন খরচ বাড়ান আমাদের উচিত নয়। সেজবউ এখনই বাড়ীতে থাক্‌লেই ভাল হ'ত! কিন্তু তা যে চলে না।"

"হাঁ শুন্‌ছিলুম—তোমার শরীর ভাল নয়——"

সুরেশ হাসিয়া উঠিল— কহিল, "ও সব কিছু নয় বড়দা। শরীর আমার বেশ আছে। আসল কথা—ব'লবই বা কি ছাই—তা—বুঝ্‌তেই কি পাচ্চ না বড়দা ?"

সুরেশের হাসিতে ও কথার ভাবে বিপিনের মনের ভারটা যেন কাটিয়া গেল। দুটি ভাই আবার যেন খোলা সরল মনের দুটি ভাই হইলেন। বিপিনও হাসিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ, বুঝ্‌তে পাচ্চি বই কি ভাই ? তা তুই যদি প্রাণটা খুলে দিলি, আমিই বা কেন খুল্‌ব না ? বাস্তবিক এই সব গোল-মালের সুরু থেকেই খোলাখুলি কথা ভাল। তা হ'লে শেষে আর বড় একটা

গোল পেকে ওঠে না। হাঁ, সেজবউমা যখন বাড়ীতে থাকৃতে নেহাৎ নারাজ, তখন তাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই দরকার বই কি ?”

সুরেশ উত্তর করিল, “কেবল নারাজ হ’লে—তাতেও ভাবতুম না। ইচ্ছেয় কি অনিচ্ছেয় যদি চুপ চাপ থাকৃত, ক্ষতি ছিল না। তবে ঐ এক ধাতু আলাদা, শিক্ষা আলাদা—জোর ক’রে রেখে যেতে চাইলে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকৃবে। নেহাৎ যদি তা না যেতে দিই, ঘরে কেউ স্বস্তিতে থাকৃবে না। এ অবস্থায় এ সবের প্রতিকার—আমার কেন—বোধহয় কোন পুরুষেরই সাধ্যায়ত্ত নয়।”

“হুঁ—তা ঠিকই ত—ঠিকই ত! আর যখন বিয়ে ক’রেছিস্—ওকে নিয়ে যাতে অবিরত একটা গোলমাল না চলে, লোকে নিন্দে মন্দ না করে, একটু সুখে স্বস্তিতে থাকে, তাও ত দেখ্‌তে হয়।”

সুরেশ কহিল, “সে সব সঙ্গে নিয়ে থাকৃলেও কতটা কি হবে বল্‌তে পারিনে। তবে বাড়ীর চাইতে ভাল থাকৃবে।”

“হুঁ—তা নিয়ে যা সঙ্গে।”

সুরেশ উত্তর করিল, “‘নিয়ে যা সঙ্গে’—তুমি যতটা সোজায় ব’লে ফেল্লে বড়দা, আমার পক্ষে ত তেমন সোজা ব’লে মনে হচ্চে না।”

“কেন রে ? কঠিনটা এমন কিসে হ’ল ?”

“বাড়ীর খরচপত্তর র’য়েছে, দেনা র’য়েছে। এ সবের ত একটা ব্যবস্থা ক’ত্তে হয় ?”

বিপিন উত্তর করিলেন, “সেই ত ভাবনার কথা ভাই। তা—কি হবে ? যা পারিস্ বাড়ীতে পাঠাবি।”

“আমি যা পারি, তাই মোটে পাঠাব—তা হ’লে চ’ল্‌বে কেন ? আমার পারা না পারার উপরে নির্ভর ক’ল্লে হয়ত খুব কমই পারব। তুমি কিসে পার, তাই বুঝে আমাকে চ’ল্‌তে হবে। দায় ত সব তোমার।”

বিপিন ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, “জমাজমি বাগ বাগিচে যা কিছু আছে বছরের ধান কলাই সরষে নারিকেল সুপুরী এ গুলো আসে। আর আমার মাইনে যা আছে, তাতে সংসারটা এক রকম চালিয়ে নিতে পারি। তবে দেনাটা রয়েছে, আবার সুরুর বিয়ে দিতে হবে,—তারপর আবার পুলিনের পড়ার খরচ র’য়েছে।”

“সেটা আমি ওখান থেকেই পাঠাব। তা ছাড়া ন্যূনকল্পে কত ক’রে মাসে পাঠালে চালাতে পার ?”

"একশ টাকা ক'রে কি দিতে পার্‌বি ?"

"তা খুব পারব। বেশীও পার্‌তে পারি। তবে এখনও ভরসা ক'বে ব'ল্‌তে পারিনে। দেখি ত—একশ ক'রে পাঠাবই,—বেশী যদি পারি, তবে ত কথাই নাই।"

বিপিন কহিলেন, "বেশী আর কি ক'রে পার্‌বি ? এতেই যে তোর চালান দায় হবে। সহরে বাসা ক'রে থাক্‌তে হবে, নিজের পদমর্য্যাদা রেখে চ'ল্‌তে হবে,—একশ টাকা—আজকালকার দিনে আর সে ক'টা ? আবার পুলিনের পড়ার খরচও ওইথেকে দিতে হবে। কি ক'রে চালাবি ? পদমর্য্যাদা বজায় রেখে ত চ'ল্‌তে হবে।"

সুরেশ উত্তর করিল, "যে দায় তোমার ঘাড়ে ফেলে যাচ্ছি দাদা, তার চেয়ে পদমর্য্যাদার দাবী কি আমার বড় ? যাক্‌, দেখি কত পাঠাতে পারি।"

বিপিন কহিল, "বরং এক কাজ করিস্‌। পুলিনের খরচার টাকাটা কেটে রেখে বাকীটে—বরং আমায় পাঠাস্‌ ?"

সুরেশ কহিল, "যদি নেহাৎ না চলে, তাই বরং করা যাবে।"

পরামর্শ স্থির হইল। পরদিনই সেজবধূকে লইয়া সুরেশ তাহার কর্ম্মস্থলে গেল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব রাত্রির কলহ ঘটনা সত্ত্বেও সেজবধূ সেদিন মুখ ভার করিয়া নিজের ঘরে রহিল না। যায়েদের সঙ্গে হাসিয়া মিশিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিল।

(৫)

বাসাখানি ছোট ও সুন্দর,—নিরুপমার অপছন্দ হইল না। কিন্তু আসবাব পত্র অতি সামান্য। যাহাহউক, ক্রমে মাসের বেতন হইতে দস্তুরমত আসবাব যা দরকার হয়, করা যাইবে। বাসায় একটি মাত্র চাকর, ঝি নাই, বামুনও নাই। ডেপুটী বাবুর পত্নী, সে নিজে কি প্রকারে দুবেলা পাচিকার কাজ করিবে ? অন্যান্য হাকিমপত্নীরা, বড় বড় উকিলগৃহিণীরা বৈকালে বা সন্ধ্যায় যদি বেড়াইতে আসেন, আসিয়া যদি দেখেন ডেপুটী ঘরণী হাঁড়ীশালে,—হয়ত—এক চাকর—কোনও কাজে সে বাহিরে গিয়াছে—মশলা পর্য্যন্ত নিজের পিষিতে হইতেছে, তখন—ধিক ! সে লজ্জা সে কোথায় রাখিবে ? হয়ত ভাত নামাইবার সময় হইয়াছে, কড়াতে তেল ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন—হায় ! সে হাড়ীকড়া সামলাইবে না ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিবে ? তাড়াতাড়ি যদি হলুদ মাখা কাপড়ে, তেল মশলা মাখা হাতে, স্বেদাপ্লুত বদনে ইঁহাদের সম্মুখে বাহির হয়, হয়ত

তাহাকেই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, "হাঁগো, বামুণের মেয়ে, তোমাদের গিন্নী কোথা ?" হায়, তখন সে কি বলিয়া উত্তর দিবে, সেই যে সেই হতভাগিনী দীনাগৃহিনী ! তারপর দুবেলা আগুণের জ্বালে পোড়া—রোজ দুবেলা হাঁড়ী-ঠেলা—সে ত কখনও তা করে নাই—এখন পারিবে কি ? শরীরে সহিবে কি ? তারপর একজন ঝি নহিলেই বা চলে কি প্রকারে ? ঘরের সব কাজ ত চাকর দিয়া হয় না ? কে তার চুল বাঁধিয়া দিবে ? ছেলেটিকে কে দুধ খাওয়াইবে ? কে তার ময়লা চাদর তোয়ালে সব ধুইয়া শুকাইয়া দিবে ? প্রতিবেশিনী সমপদস্থা নারীদের সঙ্গে খবরাখবর করিবার দরকার হইলে কাকে দিয়া সে তা করাইবে ? কোথাও বেড়াইতে গেলে কে তার সঙ্গে যাইবে ? বামুন যেমন, ঝিও ঠিক তেমনই একটি দরকার। নিরুপমা এই অপরিহার্য্য প্রয়োজনের কথা স্বামীকে জানাইল। ঝি বামুন নহিলে যে তার মত পদস্থা নারীর মান থাকে না, তাও বিশদভাবে বহু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টান্তে স্বামীকে বুঝাইল। সুরেশ হাসিয়া কহিল, "তা মাস কাবারে টাকা এনে দিই, যদ্দূর যা ব্যবস্থা ক'ত্তে পার ক'রে নিও। আপত্তি কি ?"

নিরুপমা হৃষ্ট হইল। দুইশত টাকা, ট্যাক্স বীমা প্রভৃতিতে কিছু কাটা যাইবে। তা—১৯০৲ কি অন্ততঃ ১৮৫৲ টাকা আন্দাজ ত পাওয়া যাইবে ? সে হিসাব করিয়া দেখিল, ঝি বামন রাখিয়াও বেশ চলিতে পারে। তার গহনাপত্র, কাপড় চোপড় এবং গৃহের আসবাব ইত্যাদির জন্যও মাসে মাসে বেশ কিছু বাঁচানও যাইবে। আবার মাস মাস সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে কিছু পাঠান চাই—সময় অসময় ত আছে—তা তাও একরূপ চলিয়া যাইবে। তবে বাড়ীতে কিছু কিছু খরচ ওঁরা চাহিবেন। তা—এ দিকের খরচপত্র সব কুলাইয়া যে মাসে কিছু বাঁচে, ১০।১৫টা টাকা না হয় বাড়ীতে পাঠান যাইবে। তাঁরা হয়ত আপত্তি করিতে পারেন। তবে যথাসর্ব্বস্ব ত আর তাঁহাদের সঁপিয়া দেওয়া যায় না ? আপনাদের কুলাইয়া কিছু বাঁচে—তবে না আর পাঁচজনকে দেওয়া যায়। নইলে কে দিতে পারে বল ?

মাসকাবার হইল। সুরেশ ৬০টি টাকা আনিয়া নিরুপমার হাতে দিল। নিরুপমা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আর টাকা কি হ'ল ?"

সুরেশ হাসিয়া উত্তর করিল, 'আর টাকা কোথায় পাব ? এই ত মোটে আছে।"

"ওমা সে কি ! মোটে ৬০টি টাকা আছে ? কেন দুশ টাকা ক'রে না মাইনে পাও ?"

"কতকটা ট্যাক্স বীমা এই সবে কাটা গেল, ২৫৲ টাকা পুলিনকে পাঠাতে হ'ল, নিজের হাতখরচের জন্য কিছু রেখেছি। বাকী এই ৬০৲ টাকা দিলুম, এতে বাসা খরচ চালিয়ে নেবে।"

"আর একশ টাকা কি হ'ল ?"

"একশ ত বাড়ীতে পাঠিয়েছি! একশ ক'রেই মাসে বাড়ীতে পাঠাতে হবে।"

"একশ বাড়ীতে পাঠিয়েছ ? একশ ক'রে মাসে বাড়ীতে পাঠাতে হবে ?"

"তা ত হবেই। বড়দার সঙ্গে তাই বন্দোবস্ত হ'য়েছে। নইলে চ'ল্‌বে কেন ? রাজ্যির দেনা র'য়েছে, সরুর বিয়ে আস্‌ছে, একশ টাকা এমন বেশী কি ?"

নিরুপমা রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "ভাইকে মাসে মাসে এই ঘুষ দিয়ে বুঝি আমাকে এখানে আনবার হুকুম পেয়েছ ? এ দয়া না ক'ল্লেই পাত্তে ? পেটে দুটি ভাত কি আমার বাপের বাড়ীতেই জুট্‌ত না !"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "তা জুট্‌বে না কেন ? তবে সেটা কি এর চাইতে বেশী মানের হ'ত নিরু ?"

ক্রোধে ও ক্ষোভে রুদ্ধমানা হইয়া নিরুপমা উত্তর করিল, "তা তোমার এখানে বাঁদীপনা করার চাইতে, পেটে দুটি খেয়ে সেখানে প'ড়ে থাকাও ঢের ভাল। এ যে থেকেও নেই, তবু মনকে বোঝান যায় যে কেউ নেই—বাপের ঘরে প'ড়ে আছি।"

সুরেশ কোনও উত্তর করিল না। একখানা বই খুলিয়া সম্মুখে ধরিল। নিরুপমা আবার কহিল, "এতে কি ক'রে চ'ল্‌তে পারে, তা হিসেব ক'রে দেখেছ ?"

সুরেশ পুস্তকের দিকেই চক্ষু রাখিয়া কহিল, "হিসেব ক'রে চ'ল্লে ওতেই চলে বই কি। বেশই চলে, কটি বা লোক আমরা ?"

"একটা বামুন রাখ্‌তে হবে—ঝি রাখ্‌তে হবে——"

"তা ওতে কুলোয় রাখ।"

"কি ক'রে কুলোবে ? ৬০টি টাকা—এতে এম্‌নিই যে টানাটানি হবে। আর যা দরকার তা ত চু'লোয় যাক্‌, ঝি বামুনের খরচাই যে এথেকে কুলোবে না।"

"না কুলোয়, রাখ্‌বে না।"

"বাড়ীতে মাসে একশ টাকা ক'রে পাঠাবার কি দরকার ? হাঁ, নিজের কুলিয়ে কিছু বাঁচে, পাঠাও। তাই বলে একেবারে অর্দ্ধেক মাইনে ধ'রে বাড়ীতে পাঠাতে হবে! এত টাকার কি দরকার তাঁদের ?"

সুরেশ আবার মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "বাড়ীতে কটিলোক আছে, আর আমরা এখানে বা কটি লোক থাক্‌ব, একবার হিসেব ক'রে দেখ দিকি নীরু, অর্দ্ধেক মাইনে সেখানে পাঠান কি বেশী হবে? আরও দেনা কত র'য়েছে। কেবল তুমিই ত সব নও নিরু, তাঁদেরও বড় একটা দাবী আমার উপর আছে। সেটা ত আর ঠেলে ফেল্‌তে পারিনে।"

নিরুপমা টাকাগুলি সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "নেও না, আমি কেউ নই, তারাই সব, তাদেরই সব পাঠিয়ে দেওনা! এ ভিক্ষের আমার দরকার কিছু নেই!"

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া নিরুপমা শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সুরেশ আর কিছু বলিল না। জামা উড়ুনি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নিরুপমা অনেকক্ষণ শুইয়া কাঁদিল। শিশু ক্ষুধায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নিরুপমা অগত্যা উঠিয়া দুধ গরম করিয়া শিশুকে খাওয়াইল। চাকর আসিয়া কহিল, "মা, উনুনে আগুণ দেব এখন?"

নিরুপমার দুটিচক্ষু ভরিয়া অশ্রু উছলিয়া উঠিল। ইহার পরেও আবার গিয়া রাঁধিতে হইবে! ধিক, ইহার চেয়ে তার মরণ হইল না কেন? কিন্তু না রাঁধিলেই বা উপায় কি? সবাই খাইবে কি? হায়, এর চাইতে বাড়ীতে থাকাও যে তার ভাল ছিল। তবু মনে কোনও দুঃখ কষ্ট হইলে বিছানায় পড়িয়া থাকিতেও সে পারিত। নিরুপমা উঠিয়া গিয়া রাঁধিল। সুরেশ সেদিন অনেক রাত্রিতে বাসায় ফিরিল। নিরুপমা কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চাকরকে ভাত দিল, স্বামীর অন্নব্যঞ্জন শয়নগৃহে ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিজে আহার করিল না। সুরেশ ফিরিয়া নীরবে আহার করিয়া শয়ন করিল। স্ত্রীকে ভালমন্দ কিছুই বলিল না। দুঃখে ও অভিমানে নিরুপমা সমস্ত রাত্রি কাঁদিল।—কিন্তু বৃথা! এ অভিমানের খাতির স্বামী কিছুই করিলেন না। নিরুপমার মনে হইতে লাগিল, এ নীরব উদাসীনতা অপেক্ষা ক্রুদ্ধ স্বামীর তিরস্কার গঞ্জনাও বুঝি তার অধিকতর সহনীয় হইত!

(৬)

সে রাত্রি কাটিয়া গেল,—কিন্তু মনোবাদজনিত অশান্তির শেষ হইল না। নিরুপমা অভিমানভরে স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলিত না,—কাজ কর্ম্ম সব করিয়া যাইত। সুরেশও এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিত না।

নিরুপমা টাকা হাতে লইতে চাহিল না। সুরেশ অগত্যা নিজেই চাকরের হাতে বাজার খরচ ইত্যাদি দিত। জিনিশপত্র যা আসিত, চাকরই সব গুছাইয়া রাখিত। নিরুপমা কোনও দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। চাকর যা আনিয়া দিত, তাই রাঁধিত,—আর যা নিতান্ত না করিলে নয়, স্বামী পুত্রের নিতান্ত ক্লেশ হয়, তাই মাত্র করিত। নিজের শরীরের প্রতিও কোনও যত্ন করিত না।

এত কাজ কখনও সে করে নাই। শরীরের প্রতিও এত অবহেলা কখনও করে নাই। ক্রমে সত্যই তার শরীর বড় খারাপ হইয়া পড়িল। একদিন নিরুপমা আর না পারিয়া কাঁদিয়া কহিল, "তোমার একটু দয়ামায়াও কি ছাই নেই? না হয় দাসী বাঁদীই একটা ঘরে আছি। তার দিকেও ত লোকে একটু চায়! আমি ত আর পারিনে!"

সুরেশ উত্তর করিল, "কি ক'র্‌ব? রাগ ক'রে তুমি শরীরের যত্ন ক'র্‌বে না, নিয়ম মত খাবে দাবে না, শরীর খারাপ ত হবেই।"

নিরুপমা প্রায় কাঁদিয়া কহিল, "সারাদিন খেটে মরি, ফুর্‌সুত হ'লে ত শরীরের যত্ন ক'র্‌ব? তা, আমি ব'ল্‌ছি, আমি আর পার্‌ব না। যে ক'রে পার নিজের ঘর সংসার নিজে চালিয়ে নেও।"

সুরেশ উত্তর করিল, "চাকর একটা আছে,—আর সব ত সেই ক'ত্তে পারে। এক রান্না,—তা তুমি নেহাৎ যেদিন না পার, বল্লে ত আমিই চালিয়ে নিতে পারি। বামুন একটা বারমাস রাখ্‌তে পারি, সে সামর্থ্য নেই!"

"ও ত তোমার জব্দ করা কথা। আমি ব'সে থাকব তুমি রাঁধবে—তাও কেউ পারে?"

"তা অসুখ বিসুখ হ'লে উপায় কি?"

নিরুপমা একটু ভাবিয়া কহিল, "তা বামুন যদি রাখ্‌বে না এমন পণই ক'রে থাক, ছোট বউকে কেন এখানে নিয়ে এস না? ঠাকুরপো ত এখনও চাকরী বাকরী কিছু করে না?"

"ছোটবউ এলে বাড়ীতে কি ক'রে চ'ল্‌বে? আমরা দু তিনটি মানুষ—তাদেরই তুমি রেঁধে খাওয়াতে পার না,—আর একা বড় বউ অতগুলি লোককে কি ক'রে রেঁধে খাওয়াবে?"

"কেন, মেজদি ত আছে। বিধবা হ'লে কি আর কেউ রাঁধে না?"

"আমাদের কারও ইচ্ছে নয় যে সংসার নিতান্ত অচল না হ'লে তিনি

মাছের হেঁসেলে গিয়ে রাঁধেন। আর তিনি ত ব'সে থাকেন না। অত গুলি ছেলেপিলে বাড়ীতে আছে, তাদেরও প্রতিপালন ক'ত্তে ত একজন লোক চাই।"

"তা আমিই বা একা কি ক'রে পারি ?"

"না পার, বাড়ীতে গিয়ে থাক।"

"এই ত! আমি কি বুঝি না কিছু ? আমায় জব্দ ক'রে আবার বাড়ীতে পাঠাবে, সেই মতলব ক'রেই না এই হেনস্থা আমার ক'চ্চ ? তা যা খুসী কর, বাপের বাড়ী গিয়ে পড়ে থাক্‌ব, তবু জব্দ হ'য়ে মুখ ছোট ক'রে যে আবার বাড়ীতে যাব, আর যায়েদের নাথি ঝাঁটা খাব, আমাকে দিয়ে তা কিছুতেই হবে না।"

এই বলিয়া নিরুপমা কাঁদিয়া ক্রোধভরে উঠিয়া গেল।

(৭)

কিছুদিন পরে নিরুপমার মাতা একবার কন্যার বাসায় বেড়াইতে আসিলেন। সমস্ত অবস্থা দেখিয়া এবং কন্যার মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইলেন। জামাতাকেও অনেক অনুযোগ করিলেন।

সুরেশ যথোচিত সম্ভ্রমে অথচ দৃঢ়ভাবে শ্বশ্রূকে জানাইল, ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে স্ত্রীকে প্রতিপালন করা তার পক্ষে অসাধ্য। ঐ ব্যয়ের মধ্যে স্ত্রী যতটা সম্ভব নিজের আরাম বিরামের ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারেন। তার জন্য নিজের প্রয়োজন সে যতদূর সম্ভব খর্ব্ব করিতেও প্রস্তুত আছে। শাশুড়ী উত্তরে রুষ্ট স্বরে জানাইলেন, সুখে থাকিবে বলিয়াই কন্যা তিনি প্রতিভাবান্ শিক্ষিত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে যে এরূপ বিকৃতি আছে, তা জানিতেন না। যাহা হউক, জামাতা তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদের লইয়া যথাসুখে সংসারী করিতে পারেন। তাঁহার কন্যাকে তিনি এরূপ দুরবস্থার মধ্যে রাখিতে পারিবেন না। যদি না বাঁচে, তাঁহারই যাইবে। জামাতার কি ? ভাসুর দেবর যায়েদেরই বা কি ? তারা আবার নূতন বধূ পাইবে। তিনি কন্যা গেলে আর তাকে পাইবেন না।

সুরেশ ক্ষুব্ধভাবে উত্তর করিল, সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে নিজের ভোগসুখ যেটুকু ত্যাগ করা আবশ্যক, তাহাতে যদি তার স্ত্রী প্রস্তুত না থাকেন, তার জন্য কিছু ক্লেশ যদি সহিতে না পারেন, তিনি

অনায়াসে পিত্রালয়ে গিয়া সুখে থাকিতে পারেন। তাঁর প্রতিপালনের জন্য মাসে যথাসাধ্য খরচ সে পাঠাইবে।

শাশুড়ী প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, জামাতার ওরূপ দয়ার ভিক্ষা তাঁহার কন্যার প্রয়োজন হইবে না। তাহাকে সুখে সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য তার পিতামাতারই আছে।

শ্বশ্রূ সেইদিনই নিরুপমাকে লইয়া যাইবার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। সুরেশ আর কিছু বলিল না। যাইবার সময় হইয়া আসিল। নিরুপমা কাঁদিয়া গিয়া স্বামীকে কহিল, "কি এমন অপরাধ ক'রেছি যে আমায় আজ ত্যাগ ক'চ্চ ? তুমিই যদি ত্যাগ ক'ল্লে, তবে আর বেঁচে থেকেই বা কি হবে ?"

সুরেশ ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর করিল, "আমি কি ত্যাগ কচ্চি নিরু ? আমার অবস্থায় আমার ঘরে তুমি যখন সুখে থাক্‌তে পার্‌বেই না, তখন যেখানে তোমার সুবিধা হয় থাক্‌বে। আমার অভাবের মধ্যে জোর ক'রে তোমায় রাখ্‌ব, এমন প্রবৃত্তি আমার হয় না। হওয়াও উচিত নয়। এই নেও, খোকাকে নেও! কতদিনে আর ওকে দেখ্‌ব জানিনি। আশীর্ব্বাদ করি, ওকে নিয়ে যেন তুমি সুখে থাক্‌তে পার।"

উঠিয়া সুরেশ কোল হইতে খোকাকে স্ত্রীর কোলে দিতে উদ্যত হইল। শিশু কি মনে করিয়া পিতাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তার কাঁধে মুখ লুকাইল। মাতার কোলে যাইতে চাহিল না। নিরুপমা বড় কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

মাতা তার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। নিরুপমা গিয়া কহিল, "না মা, আমি যাব না, তুমি যাও!"

"যাবিনি! কেন ? কি আবার হ'ল ? তোদের ঠাট দেখে আর বাঁচিনে! খোকাকে নিয়ে আয়, তারপর চল্‌। গাড়ী দোরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেণেরও সময় হ'য়ে এল যে।"

নিরুপমা আবার কহিল, "না মা, আমি যাব না, যেতে পার্‌ব না। তুমি যাও!"

"এখানে থেকে কি তবে মারা যাবি ? কোন প্রাণে তোকে এই অবস্থায় আমি ফেলে যাব ? শরীরে কি কিছু আছে ?"

"শরীর খারাপ করেছি নিজের দোষে। আর ক'র্‌ব না। আমি যাব না মা, এখেনেই থাক্‌ব। উনি যে ভাবেই রাখুন—এখন মনে হ'চ্চে

তাতেই বেশ সুখে থাক্‌ব। খোকাকে ওঁর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে, ওঁকে ফেলে আমি যেতে পার্‌ব না মা।”

মাতা ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। নিরুপমা রহিল। ইহার পর সুখেই স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরে রহিল। ভাই ভাই বাহিরে ঠাঁই ঠাঁই হইয়াও প্রাণে এক হইয়া রহিলেন।

মায়ের রূপ।

অয়ি বিশ্ববন্দিতা, অয়ি চিরকল্যাণময়ী মা!
আজি কি অপরূপ রূপ দেখা'লে আমারে, বিশ্বরমা!
বিছা'য়ে রেখেছ শ্যামল অঞ্চল
উজল আলোকে গন্ধে;
প্রদীপ্ত গরিমা নীলাম্বরে তব
জাগিছে নবীন ছন্দে!
প্রভাত তোমার পিক-মুখরিত
নিত্য জাগে কুঞ্জমাঝে;
মধ্যাহ্ন তোমার পল্লীবন ছা'য়ে
মধুর আলসে রাজে!
নব অনুরাগে নিত্য আসে সন্ধ্যা
ঝিল্লি-মুখরিত বনে;
অযুত তারকা উঠে গো জাগিয়া
শান্ত নীরব গগনে!
নিথর তোমার নিবিড় যামিনী
শশাঙ্ক কিরণে হাসে;
কামিনী শেফালি শিহরিয়া ওঠে
মন্দ মলয় পরশে!
দিকে দিকে তব আরতি, শুনি' মা
তোমারি বন্দনা গান;
নিত্য নব ছন্দে তব পুণ্য নাম
হ'য়ে ওঠে গরীয়ান্‌।
অয়ি বিশ্ববন্দিতা, অয়ি চির কল্যাণময়ী মা!
আজি, কি এ অপরূপ রূপ দেখা'লে আমারে, বিশ্বরমা!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

বিজয়া।

কেন তোরা আজি শোক নিমগন,
বিজয়া নহে বিদায়।

চরণধূলির করিয়া পথ,
দিল যে জননী শকতি রথ,
পরাণের মাঝে রচিয়া তাঁর
আপন সবল ছায়।

লোভের মানস করিয়া ঘিন্ন,
রেখে গেল পিছে চরণ চিহ্ন,
সকল দ্বিধা করিতে ছিন্ন
চলিতে আপন পায়।

পরাণে জাগাতে আকুল আশ,
উঠাতে মানবে দেবতা পাশ,
ঐ হের সিদ্ধি সলিলে দূরে
রেখেছে আপন কায়।

করিয়া লক্ষ্য চরণ রেখ',
চল সবে পা'বি মায়ের দেখা,
লইতে মোদের আলয়ে তাঁ'র
জননী চকিতে কায়।

আপন চরণে করিতে ভর,
চিনা'তে মোদের আপন ঘর,
শিখাতে চলিতে না করি ডর
জননী চলিয়া যায়;
বিজয়া নহে বিদায়।

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কঙ্কালের কথা।

(ইংরেজি গল্প হইতে অনূদিত।)

ব্যাথারবেরীলের খাইবার ঘরে রাত্রিতে আহারের পরে অনেক লোক বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। ক্যাসেলব্রিজ আস্তে আস্তে বলিলেন, "ন্যাথান বোনকে ভাল করিয়া যে চিনিত, তার নিকটে বোনের সম্বন্ধে সে যে গল্প শুনিয়াছে

তা ভয়ানক বিস্ময়কর। লোকে মনে করিত যে বোন একজন পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ লোক। কিন্তু সে কে, কি করে, কোথা হইতে আসিয়াছিল, এ সংবাদ কেহ রাখিত না। বোনের মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গোল ছিল। তার রকম সকম ধরণ ধারণও ছিল সবই অদ্ভুত রকমের। তার কাছে তার একটি ভাইঝি থাকিত, তার সঙ্গে ছাড়া সে আর কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিত না। বাড়ীর চাকরাণীটি দেখিতে বেশ সুন্দরী ছিল, মনে মনে সে বোনকে খুব ভালও বাসিত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, বোন তার সঙ্গে একটি কথাও বলিত না। তার ভাইঝি ডেইজীর বয়স তখন মাত্র ২২ বৎসর, দেখিতে সে পরমাসুন্দরী। রাল্‌ফ টমসন নামক একটি ভদ্র যুবক তাকে খুব ভালবাসিত, এবং তাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ তার কথায় কাণও দিল না। সে শপথ করিয়া জানাইল, সে যতদিন বাঁচিবে ততদিন ডেইজীর বিবাহে মত দিবে না।— কি সর্ব্বনাশ, বৃদ্ধের শরীর ও স্বাস্থ্য যেরূপ তাহাতে সে অন্ততঃ আরও ৪০ বৎসরও বাঁচিবে।

যুবক ডেইজীকে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু ডেইজী সে কথা শুনিল না। সে বলিল, কাকার মত না লইয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। ইহার জন্য ৫০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইলেও তাহাতে সে প্রস্তুত।

টমসন অনন্যোপায় হইয়া প্রায়ই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিত যে সে তাঁর ভাইঝি ডেইজীকে অত্যন্ত ভালবাসে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া তার সঙ্গে তার বিবাহে মত দেন, তবে সে তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, কারণ বৃদ্ধ তার কোন কথার জবাব করিত না। শুধু তাহা নহে, সে তার কথা শুনিতও না। শেষে বৃদ্ধ টমসনকে তার বাড়ীতে ঢুকিতেও দিত না। তবে বোন যখন কোন কাজ কর্ম্মে বাহিরে যাইত, ডেইজী টমসনের সঙ্গে দেখা করিত ও তার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে যাইত।

"খৃষ্টমাসের পূর্ব্বদিন। সাধারণতঃ এ সময় বোনের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইত। তারপর সে দিন মাত্র সে লণ্ডন হইতে ফিরিয়াছে। পথে গাড়ীতে বড় ভিড় ছিল। ভিড় বোনের মোটেই পছন্দ হইত না। খৃষ্টমাসের আনন্দে মত্ত লোকজনের আনন্দ কোলাহল, গল্পগুজব বোনের মাথা

একেবারে ঘুরাইয়া দিল। বাড়ীতে আসিয়া সে যখন দেখিল যে ডেইজী লতাপাতা দিয়া বাড়ীখানি বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে, তখন সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। তার স্বাভাবিক গম্ভীর মুখ এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বোন একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ সংগ্রহ করাতেও তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। একটি ঘরে যে তার সংগৃহিত—শামুক, ঝিনুক, পাথর, পুরাতন অস্ত্রাদি, পুরাকালের পশু পক্ষার হাড়, শিশিভরা সাপ, চোরখুনীদের মাথার খুলি ইত্যাদি অদ্ভুত জিনিশ সব রাখিত।

সেদিন রাত প্রায় ১২টার সময় বোন একটা লম্বা ও সরু একটা বাক্স টানিতে টানিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বাক্সে কি আছে ডেইজী বা চাকর বাকর কেহ কিছু জানিত না। সেটায় একটা মানুষের কঙ্কাল ছিল। ঘরে আরও একটা কঙ্কাল ছিল।

যাহা হউক, ঘরে ঢুকিয়া বোন বেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল। তারপর বাক্সটা খুলিয়া দেখিল যে আসিবার সময় বাক্সে গাড়ীর ঝাঁকুনি লাগিয়া কঙ্কালের একখানা পা আলগা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, কঙ্কালটাকে আস্তে আস্তে ঘরের এক পাশে লইয়া গিয়া সেটার গলায় একটা দড়ি বাঁধিয়া দেওয়ালের সঙ্গে তাকে বোন দাঁড়া করাইল। তারপর কয়েক পা সরিয়া গিয়া বোন কঙ্কালটাকে দেখিতে লাগিল। ঘরে আলো জ্বালিতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল। চুল্লীর আগুনই আলোর কাজ করিতেছিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ করিয়া দেখিয়া সে চুল্লীর কাছে গেল এবং কঙ্কালটার দিকে পিছন দিয়া উবুড় হইয়া আগুনটা খোঁচাইতে লাগিল।

ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয়ানক বিকৃত স্বরে—কে একজন বলিল, "ওহে, শোন!"

বোন্ সহজে ভয় পাইবার মত লোক ছিল না। কিন্তু এ স্বর শুনিয়া সেও ভয় পাইল। আগুন খোঁচান বন্ধ করিয়া সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে অথবা কাহারও স্বর শুনিতে পাইল না। আবার সেই স্বরে কে বলিল, "শোন, শোন!" তাই ত! ওই কঙ্কালটাই না কথা বলিতেছে! বোন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। একদৃষ্টে সে কঙ্কালটার দিকে তাকাইয়া রহিল। তার মনে হইল, কঙ্কালটাও তার দিকে তেমনই তাকাইয়া আছে। চুল্লীর আগুনের অল্প আলোতে সেই কঙ্কালের মুখটা বড় ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল।

কঙ্কালটা এবার একটু নড়িল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে, আমার কথা শুনিতে পাইতেছ ?"

বোন কয়েক পা সরিয়া গেল এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কেন, কি হইয়াছে ?"

"কি হইয়াছে !—যথেষ্ট হইয়াছে, আমার আর একখানা পা কোথায় ?"

"বাক্সের ভিতরে !"

"বটে, বাক্সের ভিতরে ! কেন, সেখানে পা টা কি করিতেছে ?"

কঙ্কালের সঙ্গে কথা বলা বোনের জীবনে এই প্রথম। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "পাটা—লাগাইবার সময় পাই নাই।"

"তুমি সেটাকে ওখানে রাখিয়াছ কেন ?"

"আমি রাখি নাই, ওটা আল্‌গা হইয়া গিয়াছে।"

"বেশ, তবে এখন আনিয়া লাগাইয়া দাও। আর আমার গলার বাঁধনটা খুলিয়া দেও না কেন ?"

বোন যারপরনাই ভীত ও বিস্মিত হইল। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার ভরসা তার হইল না। তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে পা খানি আনিয়া যায়গামত লাগাইয়া দিল এবং তার গলার বাঁধনটা খুলিয়া ফেলিল।

তখন সেই কঙ্কাল মাথা একটু নাড়িয়া বলিল,—"হাঁ, বেশ হইয়াছে। এখন আমাকে আগুণের কাছে ঐ চেয়ারটার উপরে বসাইয়া দাও। দাঁড়াও, আমার অস্থির গ্রন্থিগুলি একটু ভাল করিয়া দেখিয়া নাও।"

বোন একটা বাতি ধরাইয়া কঙ্কালের অস্থির গ্রন্থিগুলি দেখিতে লাগিল এবং কঙ্কালটা যেখানে যাহা করিতে বলিল সব ঠিক করিয়া তাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল। তারপর তার ডান পা খানা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আরও কয়েকটা বাতি জ্বালিল। যেমন বাতিগুলি জ্বলিল, অমনি আর কে যেন কি বলিল ! এর স্বর পূর্ব্বের স্বর অপেক্ষা আরও বিকৃত, আরও ভয়ঙ্কর ! সেই স্বরে কে যেন বলিল, "কি আশ্চর্য্য !"

বোন চারিদিকে তাকাইয়া "ভুত ভুত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘরে পূর্ব্বের যে কঙ্কালটা ছিল সেইটাই কথা বলিতেছিল ! বোন নিজের মনে মনে বলিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হইয়াছে ! আমি বোধহয় পাগল হইয়াছি।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বোনের কথায় কোন মনযোগ না দিয়াই বলিতে লাগিল,

বোন্ মধ্যে একখানি টুলে বসিল (কঙ্কালের কথা।)

'বোন্! তুমি বাহিরে যাও।" (কঙ্কালের কথা।)

"আমার একজন পুরাতন বন্ধুকে এখানে দেখিয়া—আমি বাস্তবিক বড় বিস্মিত হইতেছি। এতকাল পরে যে আডাম গুডম্যানকে আমি এখানে দেখিব তা কে ভাবিয়াছিল?"

আডাম গুডম্যানের নাম করা মাত্র প্রথম কঙ্কালও যেন বিস্মিত হইল। বক্তার দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিতে গিয়া তার একখানি হাত পড়িয়া গেল। সে বলিল, "আডাম গুডম্যানের নাম কে করিল?"

"কেন, আমি।" এই বলিয়া দ্বিতীয় কঙ্কালটা তার যায়গা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে প্রথম কঙ্কালের চেয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম কঙ্কালটা তার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে, জল্লাদ উইল ড্রাগস্!"

"হাঁ; আমি সেই বটি।"

প্রথম কঙ্কালটা একটু কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমাকে আবার দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।"

"তা ত' হইবেই।" এই বলিয়া দ্বিতীয় কঙ্কালটা ভীষণ একটা শব্দ করিয়া কাছের একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বোন্ কোন কথা না বলিয়া চেয়ার দু'খানার মাঝে একখানা টুলে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা বলিল না। তারপর দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে বলিল, "তোমার সঙ্গে কোনরকমে দেখা করিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তোমার কাছে একটা গোপনীয় কথা বলিবার আছে।"

"কি কথা?"

"তোমার যার জন্য ফাঁসি হইয়াছিল, তাই।"

"আমি তাকে খুন করি নাই।"

"তা আমি জানি। কিন্তু তোমার ফাঁসি হইয়াছিল এবং আমিই তোমার গলায় ফাঁসি পরাইয়াছিলাম।"

প্রথম কঙ্কালটা আবার বলিল, "আমি ত তাকে মারি নাই।"

"তা—আমি জানি।"

"বটে! তুমি জান?"

"হাঁ, আমি জানি।"

"কি করিয়া জান?"

"কি করিয়া জানি?—কারণ, আমি নিজেই তাকে খুন করিয়াছিলাম!"

তারপর দু'জনে কিছুক্ষণ আবার কোন কথা হইল না। প্রথম কঙ্কালটা আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "তুমি আমাকে ফাঁস দিয়াছিলে, তারপর এখন আমরা—সেই সব কথা বলিতেছি। এটা ভাবিতে কেমন লাগে ?"

"এসব কথায় কোন ফল নাই বটে, কিন্তু পুরাণ কথা বলাবলি করিতে বেশ আরাম আছে। কথাগুলি বলিয়া আমি কিছু শান্তি পাইতেছি। টাকাগুলি পাইলাম এবং ডোভার রোডে একটি বাড়ীও নিলাম! কিন্তু তারপর হইতেই আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল।" এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলিতে লাগিল, "সে যে কোথায় আছে তার কোন সন্ধানই পাইতেছি না। আমার বিশ্বাস সে বোধহয় টুকরা টুকরা হইয়া, এখানে একখানা পা, ওখানে আর একখানা হাত—এইভাবে কোথাও পড়িয়া আছে।"

"তা' হবে। কিন্তু তাকে তুমি মারিলে কেন ? সে ত বেশ ভাল লোক ছিল। তবে আমার মনে হয় তার চালচলনে যেন কিছু গর্ব্বিত ভাব ছিল।"

"বেশ একটু গর্ব্বই ছিল। সেদিন তোমার দোকান হইতে বাহির হইবার সময় সে আমাকে যা তা বলিয়া গালাগালি করিয়াছিল। খারাপ মদ দিয়াছ বলিয়া তোমার সঙ্গেও তার খুব ঝগড়া হয়,—সে সব আমরা শুনিয়াছিলাম। আমাকে গালাগালি করায় আমার তার উপরে ভয়ানক রাগ হয়। তুমি বাহির হইয়া গেলে। তখন মনে করিলাম, একে যদি এখন এখানে মারিয়া রাখিয়া যাই, তবে তোমার উপরেই দোষ পড়িবে। তোমার সঙ্গে তার ভয়ানক ঝগড়ার কথাও কেহ কেহ বলিতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। সে গোপনে একটি বিবাহ করিয়াছিল এবং রিডিং এ তার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল। পুলটা পার হইয়া সেই রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি যাইতেই আমি তার কাছে উপস্থিত হইলাম।" এই বলিয়া কঙ্কালটা কথা বন্ধ করিল। তারপর কেমন একটা বিকট খল খল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

একটু পরে আবার সে বলিতে লাগিল, "আমি যখন তাকে আত্মরক্ষা করিতে বলি, সে বলিল যে আমার সঙ্গে একগৃহে ছিল তাই তার পক্ষে ধিক্কারজনক! আমার সঙ্গে লড়াই করা অপেক্ষা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে দাঁড়াইয়া মরাও তার ভাল। আরও বলিল যে, আমার সঙ্গে সে যখন কথা বলিয়াছে, তখন তার পক্ষে মরাই উচিত! তারপর কি হইল বুঝিতেই পার। কিন্তু তুমি তাকে যে খাঁদের মধ্যে দেখিয়াছিলে আমি তাকে সেখানে ফেলি নাই।" যাক্, সে আরও অনেক কথা বলিয়াছিল, কি জান ?"

"আমি কি করিয়া জানিব ?"

"তবে বলি শোন।" এই বলিয়াই দ্বিতীয় কঙ্কলটা আবার চুপ করিল। তারপর আবার বলিল, "বোনের সম্মুখে সে কথা বলিব না। তাকে বাহিরে যাইতে বল।"

ছুটি কঙ্কালই তখন উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "বোন্, তুমি বাহিরে যাও!" সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া, দরজার চাবির ছিদ্রে কাণ দিয়া ঘরের মধ্যে কি কথা হইতেছে শুনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না।

বোন্ দরজার উপরে কাণ দিয়া আছে এমন সময় তার ভাইঝি ডেইজী সেখানে আসিল। ঘরের মধ্যে যে কেহ নাই সে তা' বেশ জানিত, তবু বোন্ অমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে বড় বিস্মিত হইল। সে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বোন্ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিছুকাল পরে সে বোন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে? বোন্ ব্যস্ত ভাবে আস্তে আস্তে তাকে চুপ করিতে বলিল। ইহাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কাছে আসিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? বোন্ আবার তাকে ইসারায় চুপ করিতে বলিল। ডেইজী বোনের অবস্থা দেখিয়া ভাবিল, সর্ব্বনাশ! বোধহয় বোন্ পাগল হইয়াছে! সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাকার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আর দাঁড়াইতে না পারিয়া দরজা খুলিয়া উভয়ে ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়া বোন্ যাহা দেখিল, তাহাতে তার পা ছুখানা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল যে কঙ্কাল ছুইটা যার যার যায়গা মত চলিয়া গিয়াছে। সে যে স্বপ্ন দেখে নাই, তার প্রমাণ স্বরূপ প্রথম কঙ্কালটার যে একখানা হাত খসিয়া গিয়াছিল, সেখানা ঠিক সেই যায়গায় মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছিল!

বোনের ও ডেইজীর মধ্যে তখন যে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু সে যা দেখিয়াছিল, সে কথা যে সে তাকে বলে নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বলিলেও ডেইজী তাহা বিশ্বাস করিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ঘটনা তার চরিত্রে আশ্চর্য্য এক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ঘটনার পরদিনই সে কঙ্কাল ছুইটাকে প্যাক করিয়া লণ্ডনে পাঠাইয়া দিল। রাল্‌ফ টমসনকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেইজীকে অবিলম্বে বিবাহ

করিতে অনুরোধ করিল এবং আমরা শুনিয়াছি বিশ্বসংসারে কেবলমাত্র তার কাছেই সে সেই রাত্রির ঘটনা বলিয়াছে।

শুধু তাহা নহে বোন্ নিজে তার সেই চাকরাণীটিকে বিবাহ করিল। তখন বোন্ বেশ স্ফূর্ত্তিতে শিকার করিয়া, খেলিয়া, নিমন্ত্রণ দিয়া ও নিমন্ত্রণ খাইয়া সময় কাটাইত। দেশের লোকও তখন তাকে খুব পছন্দ করিত। তার মত রসিক লোক নাকি তখন আর সে দেশে কেহ ছিল না!

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত।

৺শারদীয়া।

নয়নের বারি ফেল গো মুছিয়া,
পড়ুক বেদন টুটি,
জননী যে আসে দুয়ারে মোদের,
আয়রে সকলে ছুটি।

শারদ বালিকা ভরি ফুলডালা,
এনেছে গাঁথিয়া কুসুমের মালা,
দাঁড়া'য়ে দুয়ারে সাদরে তাঁহারে
বন্দনা করে সাজি।
হীরক খচিত অঞ্চল খানি,
অঙ্গে যামিনী দিয়েছে যে টানি,
ছেয়েছে বিভোরা চন্দ্রমা ধারা
গগন ভুবন আজি।

জননী যাহারে দানিছে অভয়,
ভাবনা যাতনা কোথা তা'র রয়?
দীনতার ভার হতাশা আঁধার
কেন বা অধরে র'বে?
সকল অভাব যা'ক্ আজি গলি,
সরল বালক সম "মা মা" বলি,
হাসি কলরোলে জননীর কোলে
ঝাঁপাইয়া পড় সবে।

বুদ্ধির আর করিও না ভাণ,
বিদ্বান বলি, অধর ম্লান;
তেমতি আবার ভাবনার ভার
জননীরে কর দান।
আঁখির পলকে লুকাইবে ব্যথা,—
হৃদয়ের শত মোহ আবিলতা,
অপমান বোধ কর দেখি রোধ,
আবার নাচিবে প্রাণ।

দাও খুলি শত গোপন দুয়ার,
দূরে যেন কিছু থাকে নাক আর,
হইবে সরস হৃদয়ে হরষ
রহিবে না কোন জ্বালা,
জননীর পরে কেন কর রোষ,
এ যেগো মোদের আপনারি দোষ,
নিবিড় আঁধারে লুকান আধারে
যায় কি জীবন ঢালা?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

দেবতার দান।

(১)

ক্ষুদ্র গ্রামখানির পাদদেশ ধৌত করিয়া শীর্ণকায়া রজতশুভ্রতোয়া চিত্রা-নদী বহিয়া গিয়াছে। গ্রামখানির নাম অনন্তপুর। প্রকৃতিদেবী অনন্ত সৌন্দর্য্যে গ্রামখানিকে ভূষিত করিয়াছেন।

চিত্রার দুইপার্শ্বে হৈমন্ত শস্যক্ষেত্র যেন সুবর্ণমণ্ডিত। শস্যক্ষেত্রের মাঝে এখানে সেখানে দুই একটি খর্জ্জুর বা তাল বৃক্ষ ও কৃষকের দীন কুটীর। দূরে হরিৎবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কোথাও গ্রামবাসী ধনিগৃহের অট্টালিকা, কোথাও বা মঠের শ্বেতচূড়া দেখা যাইতেছে।

চিত্রাতটে একখানি খড়ের জীর্ণকুটীরে মধু ও তাহার পত্নী হারাণী বাস করিত। মধু দরিদ্র কৃষক। সংসারে পত্নী হারাণী ব্যতীত মধুর আপনার বলিবার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। পিতৃমাতৃহীনা হারাণী শৈশবে মাতুলালয়ে আদরে পালিতা হইয়াছে। নিঃসন্তান মাতুল হারাণীকে বিবাহ দিয়াই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। হারাণীরও এখন মধু ভিন্ন ত্রিসংসারে আর কেহ নাই। এ ছাড়া তাহাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখণ্ড জমি। সেই জমি চাষ করিয়া মধু কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিত।

বিবাহের পর বড় সুখে বড় শান্তিতে—আহা, একটা যেন মধুর আনন্দ-সঙ্গীত ধারার ধ্বনির ন্যায়—মধু ও হারাণী কয়েক বৎসর কাটাইল। হায়, ক্রমে তার মধ্যে বড় গভীর একটি নিরানন্দের করুণ সুর বাজিয়া উঠিল।

হারাণীর সন্তান হইল না,—হইবে যে তারও আর সম্ভাবনা দেখা গেল না! এ দুঃখ মধু ও হারাণীর বুকে বড় বাজিল। হারাণীর বড় সাধ ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কলহাস্যে তাহাদের জীর্ণকুটীর মুখরিত হইয়া উঠিবে। যখন দুঃখ ক্লেশ আসিবে, তাহাদের বুকে করিয়া সে শান্তি পাইবে। কিন্তু হায়, মানুষের কত আশাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়! সন্তানের আশায় সে কত দেবতাকে মানত করিল, কত দেব মন্দিরে পূজা দিল, কত ব্রতোপবাস করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। সন্তানের অভাব মধুরও বড় লাগিল, কিন্তু হারাণীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সে আপনার দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিত। হারাণীর দুঃখে সে নিজের দুঃখ

ভুলিয়া যাইত, কত সান্ত্বনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। সন্ধ্যার সময় যখন প্রতিবেশীদের গৃহ শিশুদের কোলাহলে মুখারিত হইয়া উঠিত, হারাণী তখন কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া তাহা শুনিত, আর সন্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। কখনও ছুটিয়া গিয়া পরের ঘরের সেই শিশুদের আপন সন্তানের ন্যায় তার ক্ষুধিত মাতৃবক্ষে তুলিয়া ধরিত।

হায়! বিধাতা যদি তাহাকে নারীজন্মই দিয়াছেন তবে সে জন্মের সার্থকতা, সে জন্মের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, সে জন্মের শ্রেষ্ঠফল—সন্তানে কেন তাকে বঞ্চিত করিলেন? সে ত জানিয়া এমন কোনও মহাপাপ করে নাই যাহাতে দেবতারা তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিলেন, তাহার নারীজন্মই বৃথা করিলেন! আর যদি সে এমন কোনও অজানিত মহাপাপ করিয়াই থাকে, তবে কি তাহার মার্জ্জনা নাই? সে ত দেবতাদের কত ডাকিতেছে, কত তাহাদের দ্বারে মাথা খুঁড়িতেছে, কত মানত করিতেছে। দেবতারা কি এমনই নিষ্ঠুর যে তবু তাকে ক্ষমা করিবেন না? অভিশাপ খণ্ডন করিয়া তাহাকে সন্তানের আশীর্ব্বাদ দিবেন না? সত্যই মরণ পর্য্যন্ত নিঃসন্তান বৃথা নারীজীবন তাকে বহন করিতে হইবে? যে নারী মা না হইল, নারীজীবনে তার কি প্রয়োজন?

তার বুক ভাঙ্গিয়া আসিত, চ'ক্ষের জল বাধা মানিত না। সমস্তদিন ক্ষেতে কাজ করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মধু দেখিত হারাণী দাওয়ায় বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হারাণী ম্লানমুখে ম্লানহাসি হাসিয়া স্বামী সেবার জন্য উঠিত। কিন্তু মধুর সে দৃষ্টির সে হাসির বেদনা সহিত না! তাহার হৃদয় হারাণীর দুঃখে ভরিয়া উঠিত। সে হারাণীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিত। মধুর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া হারাণী কাঁদিয়া আকুল হইত। এমন করিয়া কত সন্ধ্যা তাহাদের কাটিয়াছে।

(২)

সেবার বৃষ্টি হইল না; ক্ষেতের শস্য শুকাইয়া গেল। কৃষকেরা মাথায় হাত দিল। দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। মধুরও ক্ষেতের শস্য নষ্ট হইল,—মধু বিপদ গণিল। দুর্ভিক্ষের চির সহচর রোগ আসিয়া জুটিল। দেশ ভরিয়া হাহাকার উঠিল, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কি করিয়া অন্ন সংস্থান করিবে মধু তাহা ভাবিয়া পাইল না। মধুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে

চাহিয়া হারাণী নিজের কষ্ট সব ভুলিল, প্রাণপণ যত্নে মধুকে অভয় দিতে লাগিল, তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে একান্ত মনে ব্রতী হইল।

অনেক যুক্তির পর মধু স্থির করিল নিকটবর্ত্তী সহরে যাইয়া মজুরী করিয়া সে পয়সা উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা দ্বারা সংসার চালাইবে। রোজ সকালে উঠিয়া অল্প কিছু খাইয়া সে সহরে যাইত। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা দিয়া খাদ্যাদি কিনিয়া আনিত; রাত্রে তাহাই দুজনে খাইত। কিন্তু এরূপভাবে বেশী দিন চলিল না। প্রথম প্রথম মজুরী করিয়া কিছু পাইত। ক্রমে তাহাও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সহরে রোগপীড়া বাড়িতে লাগিল; অবস্থাপন্ন সকলেই সহর ত্যাগ করিল। সহর নিরন্ন দরিদ্রের হাহাকারে পূর্ণ হইল।

সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও মধু আর তেমন পয়সা পায় না,—যা পায় তা দিয়া অতিকষ্টে দুজনের একবেলা আহারও কষ্টে চলে। অল্পাহারে কঠোর পরিশ্রমে মধুর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

সেদিন সকালে যখন মধু সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, হারাণী তাহাকে যাইতে নিষেধ করিল। মধু ম্লান হাসি হাসিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু হারাণী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিল না, বলিল, "ওগো আজ তুমি সহরে যেও না। বড় খারাপ স্বপ্ন আমি দেখেছি।"

মধু কহিল, "হারাণী, না খেয়ে কদিন বাঁচব? তোকেই বা কি করে বাঁচাব? এখন তবু এক বেলা খাচ্চি, সহরে না গেলে যে তাও পাব না।"

"যদি নাই জোটে, না খেয়ে মরব। যে দেবতারা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা যদি খেতে না দেন, কি করবে? আর আমাদের বেঁচেই বা লাভ কি? মিছে কেবল বোঝা বওয়া!" সন্তানবিহীন নিষ্ফল গার্হস্থ্য জীবন স্মরণ করিয়া সাশ্রুনয়নে হারাণী গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল!

মধুর চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল, সে অশ্রুপূর্ণনয়নে হারাণীকে বুকের ভিতর টানিয়া নিল। হারাণী কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হারাণীর সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও মধু সহরে চলিয়া গেল।

(৩)

সমস্ত দিন হারাণী বিষম উদ্বেগে কাটাইল। কত আশঙ্কা তার মনে জাগিল। সমস্ত দিন সে দেবতাকে ডাকিল, যেন মধুর কোন অমঙ্গল না হয়। মধুকে যেন তিনি নিরাপদে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া

আসিল। আশঙ্কা ও উদ্বেগে তাহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। সে আর ঘরে থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া রাস্তার দিকে চাহিল। কিছুই দেখিতে পাইল না। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। গাছের একটি পাতাও কম্পিত হইতেছে না। এমন সময় দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল, নিকটে বৃক্ষের উপর পেচক বিকট শব্দ করিল! অজানিত কি এক বিপদের আশঙ্কায় হারাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তার সমস্ত শক্তি যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। কষ্টে হারাণী ঘরে গিয়া লুটাইয়া দেবতাকে ডাকিতে লাগিল।

'হারাণী!'—কে যেন বাহির হইতে কাতরকণ্ঠে ডাকিল 'হা-রা-ণী!' হারাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া দেখিল মধু উঠানে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে!' তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। সে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। হারাণী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া তাহাকে ধরিল। অতি কষ্টে তাহাকে গৃহে আনিয়া শোয়াইয়া দিল। রোগ মধুকেও আক্রমণ করিয়াছে। হারাণী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। না খাইয়া না ঘুমাইয়া সে মধুর সেবা করিতে লাগিল। আর দেবতাকে ডাকিতে লাগিল। দু'দিন পরে মধু একটু ভাল হইল! আস্তে আস্তে চক্ষু মেলিয়া মধু হারাণীকে দেখিয়া তার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বাহির হইয়া তাহার গণ্ডদেশ সিক্ত করিল। হারাণীও নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেদিন মধু একটু ভাল আছে। ঘরে খাবার নাই, পয়সাও নাই। ভিক্ষা করিয়াও কিছু পাওয়ার আশা নাই,—আর এমন দিনে ভিক্ষাই বা কোথায় মিলিবে? মধুকে খাইতে দিতে হইবে, কিন্তু কি খাইতে দিবে হারাণী তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভিক্ষার আশায় সে বাহির হইল। বহুক্ষণ ঘুরিয়া অল্প কিছু খাবার লইয়া ফিরিল। যাহা পাইয়াছিল, হারাণী তাহা মধুকেই খাওয়াইল, নিজে অনশনে রহিল। মধুকে খাওয়ান হইলে পর হারাণী পরদিনের কথা ভাবিতে লাগিল। পরদিন সে কেমন করিয়া তাহার রুগ্ন স্বামীর মুখে আহার তুলিয়া দিবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, কিন্তু একটু পরেই তাহার মুখে দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। হারাণী তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে। সে সহরে যাইবে। সহরে যাইয়া খাটিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিবে, আর আসিবার সময় স্বামীর জন্য খাবার লইয়া আসিবে।

সে তখনই সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। একবার নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তারপর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া হারাণী সহরের দিকে চলিল।

সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া হারাণী মাত্র আটটি পয়সা উপার্জ্জন করিল। চারি পয়সা দিয়া স্বামীর জন্য কিছু খাবার কিনিল আর বাকী পয়সা কাপড়ের খুটে বাঁধিয়া সে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিল, নিজে অনাহারে রহিল। চলিতে চলিতে হারাণী যখন সহরের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যাদেবী তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চল খানি পৃথিবীর উপর টানিয়া দিয়াছেন। চারিদিক এক নীরবতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। মাঝে মাঝে ২।১টি পাখী ডাকিয়া আবার নীরব হইতেছে! আর দূর নগরের অস্পষ্ট জনকোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে!

এস্থান হইতে তাহাদের গ্রাম একক্রোশ দূরে। হারাণীর পা আর চলে না। কয়েকদিনের অল্পাহারে, চিন্তায় ও আশঙ্কায় তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তারপর অনশনে সমস্ত দিন অসহ্য পরিশ্রম তাহাকে করিতে হইয়াছে। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গেল, হারাণী বসিয়া পড়িল। তখন তাহার মনে পড়িল তার রুগ্ন স্বামীর কথা। হারাণী আবার উঠিল। নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতে সে আকণ্ঠ জল পান করিল। পুষ্করিণীর তীরে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

পথের পার্শ্বে ধনীর প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে দেওয়ালে ঘেরা সুন্দর সুসজ্জিত বাগান। অট্টালিকা আলোকমালায় সুসজ্জিত। মাঝে মাঝে অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে বিলাসী ধনিজনের তরল হাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। আর বাগানের গেটের নিকট দারোয়ানের ঘর হইতে অর্দ্ধস্ফুট গানের সুর প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। বাগানের দেওয়াল ঘেঁসিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। বাগানের এক নির্জ্জন প্রান্তে পুষ্পভারাবনত কামিনী-বৃক্ষের নিম্ন দিয়া একটি অন্ধবালক যাইতেছিল। হারাণী ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে সেই পথে আসিল। শ্রান্তিতে শরীর তাহার নুইয়া পড়িয়াছিল। যন্ত্রণায় মুখখানি ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। নেত্র অর্দ্ধনিমীলিত ছিল। পথিকের পদশব্দ শুনিয়া অন্ধবালক বলিয়া উঠিল,—'মাগো! কিছু খেতে দাও মা, বড় খিদে মা!' হারাণী চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল পথের পার্শ্বে এক অন্ধ বালক। পরিধানে তার জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। শরীর তার অনশনে কঙ্কালসার। মুখে তার

দারিদ্র্যের কঙ্কাল ছায়া। বালক আবার বলিয়া উঠিল, 'মাগো, কিছু খেতে দেও মা।' হারাণীর শরীর একটু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে শ্রান্তির চিহ্ন অন্তর্হিত হইল। চক্ষু দুইটি প্রশস্ত হইল। হারাণী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বালকের নিকটে গিয়া তাহার দিকে চাহিল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল,—ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া উঠিল। বালক আবার বলিয়া উঠিল, 'মাগো, বড় খিদে মা, প্রাণ যায় মা, কিছু খেতে দেমা!' হারাণী আকাশের দিকে চাহিল। আকাশ খণ্ড খণ্ড মেঘে আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘের অন্তরাল হইতে চন্দ্রের কিরণ ঈষৎ ফুটিয়া উঠিতেছে। হারাণী নিজেকে ভুলিল, তাহার রুগ্ন ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর কথা ভুলিল, তাহার হৃদয় অন্ধবালকের করুণ আবেদনে ভরিয়া গেল। হারাণী বালককে আপনার কোলের ভিতর টানিয়া লইল। বালক কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার অঞ্চল দিয়া হারাণী বালকের অশ্রু মুছাইয়া দিল। তারপর সেই গাছতলায় বসিয়া অন্ধ বালককে সেই খাবার খাওয়াইল। কাছে একটা দিঘী ছিল, সেখানে নিয়া তাহাকে জল খাওয়াইল। তখন মেঘমুক্ত চন্দ্র পৃথিবীকে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিল, বাতাস একটু জোরে বহিয়া গেল, আর পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে শুভ্র কুসুমরাজি দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হইল। অদূরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হারাণী বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল।

* * * * *

ক্ষীণকণ্ঠে মধু ডাকিল, "হারাণী!"

"এই যে—এই যে আমি এসেছি!"

"খাবার কিছু পেলি?" মধু চক্ষু মেলিয়া চাহিল। "ও কে হারাণী?"

"ও ছেলে, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, দেবতা দিয়েছেন!"

মধু হাত দুটি বাড়াইল। হারাণী অনাথ অন্ধবালককে স্বামীর বাহু মধ্যে সরাইয়া দিল। মধু তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। তখন হারাণীর মনে পড়িল, ক্ষুধার্ত্ত পীড়িত স্বামীর জন্য খাবার কিছুই নাই!

সে কহিল, "কি হবে এখন? খাবার যে সব ছেলেকে খাইয়ে ফেলেছি! ওর যে বড় ক্ষিদে পেয়েছিল।"

"বেশ করেছিস্। একটু জল দে। তাতেই আজ হবে। কাল যদি কিছু পাস ত খাব।"

হারাণী স্বামীর মুখে একবাটি জল ধরিল। আকণ্ঠ সেই জল পান-

দেবতার দান
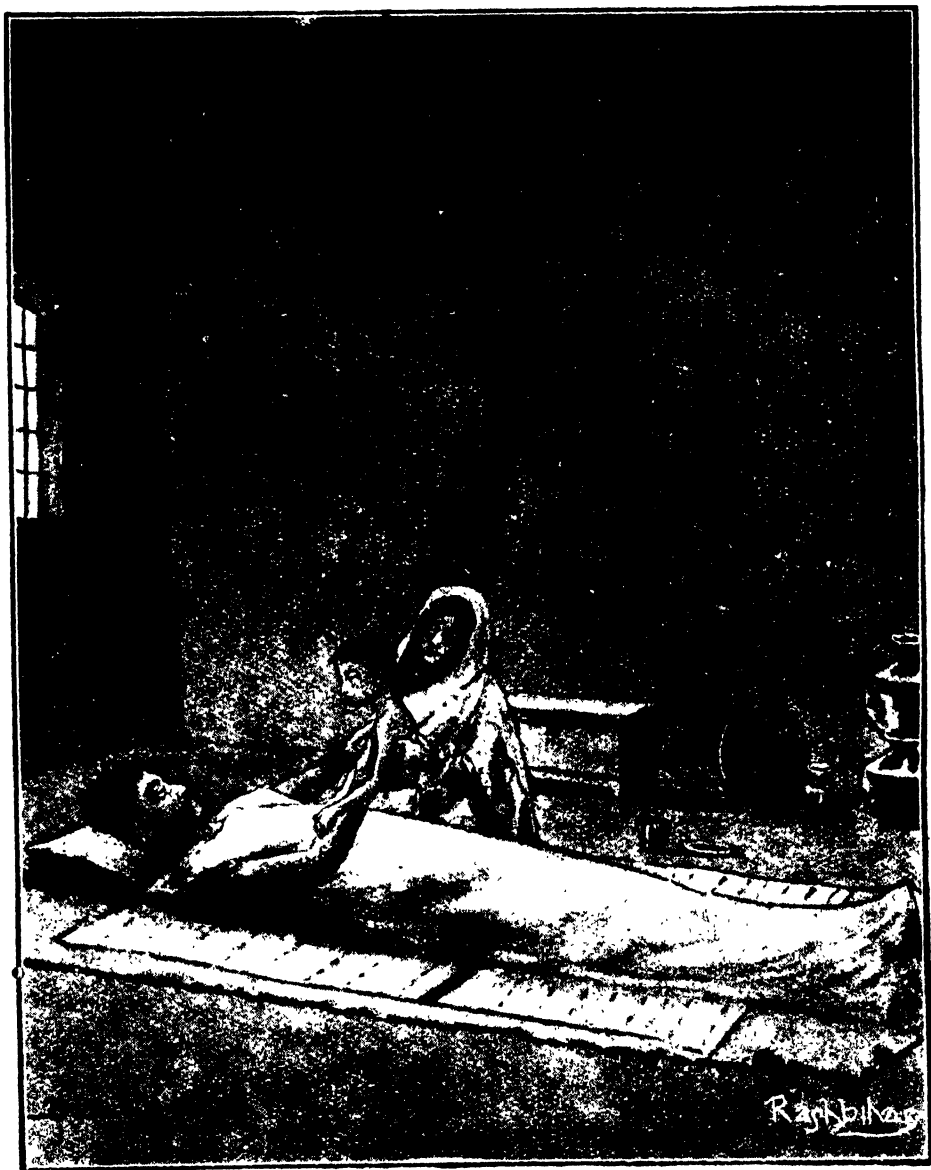
কমলা প্রেস—কলিকাতা

করিয়া মধু পরিতৃপ্ত হইল। দেবতার দান বালককে মধ্যে রাখিয়া অনশনেও পরমতৃপ্ত কৃষকদম্পতি ছিন্ন মলিন কন্থায় শয়ন করিয়া আনন্দে সুখস্বপ্নে নিশাযাপন করিল।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত।

পরিচয়।

যখন জলদ গরজে ভীষণ
অশনি সভয়ে কাঁপায় প্রাণ,
হেরিয়া তোমার রুদ্র মূরতি
হৃদয় গাহে গো তোমারি গান।
কি মূরতি ধরি নাশ গো বিশ্ব
ইহাতে গো তাই দেখিতে পাই?
অশনি গরজি ভীষণ আরবে
কহিছে পৃথিবী নাশিতে চাই।
আবার যখন জননীর কোলে
শিশুর হাসিটি—অমিয় ধারা—
আধ আধ ফোটা গোলাপের কলি
কভু হাসে কাঁদে পাগল পারা—
তখন গো তুমি স্নেহের আধার
বরষ জগতে স্নেহের ধারা;
পাইয়া সে স্নেহ নিঝর ঝরে
হয়ে থাকি মোরা আপন হারা।
বাজিল বাঁশরী যমুনারি কুলে
ছুটে উন্মাদিনী উদাম প্রাণে,
চলে ওগো সখা রাই তব পাশে
ঘরেতে কেমনে মন গো মানে?
মথুরা মোহন ব্রজের গোপাল
গোপিনীর ওগো হৃদয় সখা।
প্রেম পাগলিনী প্রেমের কাঙাল
ছুটে পথে পথে পাইতে দেখা।
এই ত তোমার প্রেমের মূরতি
প্রেমিক প্রেমিকা মিলন খেলা!
প্রেম বিতরিয়া প্রেমিক সুজন
বসাও জগতে প্রেমের মেলা।
মাধবী জোছনা কিরণ মাখিয়া
যখন দখিন সমীর বয়,
তখন সে পূত জাহ্নবী কুলে
উদাস পরাণ পড়িয়া রয়।
তখন বসিয়া নিরালা সেথায়
তোমারি ছবিটি দেখিতে পাই—
পবিত্র শান্তিতে মন্দাকিনী ধারা
তোমারি করুণা—ধরিতে চাই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র।

"আমার কবিতা।"

সবাই লেখে পদ্য ছড়া ভাবছি আমি তাই।
কাগজ কলম নিয়ে শুধু নামটি কেনা চাই॥
লিখব সন্তু রসের পদ্য পাব লাখ টাকা।
পড়বে ধন্যি দেশে অমি বোলবে কবি পাকা॥
কেউ বল্‌বে হঠাৎ কবি, কেউ বল্‌বে—না।
(ইনি) মাসিকেতে মাঝে মাঝে লেখেন কবিতা॥
সাধাসাধি করবে সবে ছাপতে আমার বই
বল্‌ব জোরে গর্ব্বভরে টাকার কাঙাল নই।
এইবা ভেবে রাতটি জেগে লিখনু কত কি।
সকালে সব গন্ধ হেরি কপাল পোড়া, ছি!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার রায়।

দৈবজ্ঞের বিড়ম্বনা।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একতারাটাকে আমি বড়ই ভয় করি। আমার মতে একতারা যন্ত্রটির নাম "নষ্টাচার্য্য" হইলেই ভাল হইত; কারণ এই একতারার জন্যে আমাকে একবার বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। শুধু কি মুস্কিল, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছিলাম। ইহা দ্বারা সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চাবে ত কোন উপকারই হয় না, অধিকন্তু ইহাকে সংশ্রবে রাখিয়া যে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা যায় তাহা সকলই বুঝি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং একতারা "নষ্টাচার্য্য" নামে অভিহিত হইলে আমার মতে একতারা নামের সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্মও সার্থক হইত।

কলিকাতা পটুয়াটোলা লেনের সেই বিখ্যাত মেসে আমি থাকিতাম। আমার প্রকোষ্ঠে প্রভাতচন্দ্র বসু নামক এক অতি ভাবুক ভগবদ্‌ভক্ত ভদ্রলোক থাকিতেন। প্রভাত বাবুর বয়স অনূ্যন ত্রিশ বৎসর। তিনি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ক্যাশে চাকুরী করিতেন। প্রভাত বাবু সুশ্রী, গৌরবর্ণ। সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান লম্বিত কেশপাশ তাঁহার সুগঠিত শিরপ্রদেশ ঢাকিয়া রাখিত। প্রভাত বাবু পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে একতারা লইয়া নিমীলিত নেত্রে ভজনা করিতেন।

সেবার আমি এম, এ পড়ি; আমার সমপাঠী পরেশ, ধীরেন ও পরিমল আমার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরেই থাকিত। আমরা এ কয়টি নাস্তিক মিলিয়া বেচারী প্রভাত বাবুকে সচরাচর, বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতাম না (অবশ্যই তাঁহার পরোক্ষে)। কখনও বা তাঁহার একতারাটি লইয়া তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া অঙ্গুলি প্রহত একতারা নিঃসৃত পেন্ পেন্ শব্দের সহিত ঐক্যতান রাখিয়া বিদ্রূপের ছলে গাহিতাম—"কত ভালবাস থেকে আড়ালে! জানালার পাশে মুচ্‌কিয়া হেসে ইসারায় মোরে ডাকিলে"—ইত্যাদি। এরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আমরা চিরাভ্যস্ত ছিলাম। দুই একদিন আবার প্রভাত বাবুর সমক্ষেও ঐরূপ করিতাম; বেচারী কেবল বক্রদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইয়া স্বীয় ক্রোধ আপনাতেই প্রশমিত করিতেন, হয়ত ভাবিতেন, "এই কুষ্মাণ্ডগুলির সহিত ঝগড়া করিয়া নিজের মান কেন খোয়াইব?"

সে দিন ডাকে মেজবৌদি একটি সুখবর পাঠাইয়াছেন—"ফরিদপুর নিবাসী নিবারণ বাবুর প্রথমা কন্যা বুল্ বুল্ ওরফে কুন্তলার সহিত তোমার বিবাহ প্রায় সুস্থির, পার ত বাড়ী আসিবার সময় পথে নামিয়া ভাবী গৃহিণীকে

একবার দেখিয়া আসিও, আমি কাহাকেও বলিব না।" বৌদি আমাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। কলিকাতায় সেবার বসন্তের প্রকোপ খুব, তাই ইষ্টারের ছুটির সহিত আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ হইল। একে ছুটি সাম্‌নে, বাড়ী যাইব, তাহার উপর আবার এই সুসংবাদ। আমি পত্র পাঠান্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন গাহিতে গাহিতে প্রভাত বাবুর দেয়ালে লম্বিত একতারাটিতে যেমনি একটি টোকা দিয়াছি, অমনি যন্ত্রটি দেয়ালচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; আমি ত একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। প্রভাত বাবু এই কাণ্ড দেখিয়া আমার উপর খুব রাগ করিতে লাগিলেন। আমি একতারাটি উঠাইয়া দেখিলাম যে উহার "কাণটা" মাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলাম "বেশী কিছু হয়নি, কানটা শুধু ভেঙ্গে গেছে, আমি নিজেই তা সমান করে দেব।" প্রভাত বাবু রোষরক্তিম নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন," "হুঁ, সেরে দেবেন! ও আর সারা যাবে না; আমার চারটে টাকাই দণ্ড গেল। আমি একখানা কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বেশ করিয়া ছুরির সাহায্যে কাণের মত করিয়া কাটিয়া রং লাগাইয়া একতারায় লাগাইয়া দিলাম। প্রভাতবাবু বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "রেখে দিন ম'শায়, বোঝা গেছে বাহাদুরী, ও আর আমার কাজে আস্‌বে না"। আমার বড়ই রাগ হইল। আমি সেই দিনই বিকালে লালবাজারের মোড় হইতে তিন টাকা দিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি একতারা কিনিয়া আনিয়া প্রভাত বাবুকে দিলাম। চার টাকা দামের একতারা আমি একটিও পাইলাম না।

প্রভাত বাবু অম্লানবদনে দ্বিরুক্তি না করিয়া একতারাটি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। পুরাতন যন্ত্রটি আপাততঃ আমার কাছেই রহিল।

পরদিন প্রাতে চাটিগাঁও মেলে আমরা বাড়ী রওনা হইব ঠিক করিয়াছি। অস্তগামী দিনমণি আসন্ন বিরহবিধুরা প্রকৃতিপ্রিয়াকে স্বীয় গোলাপী আভায় রঞ্জিত করিয়া অস্তগুহায় ডুবিয়া গেলেন। আমি চেয়ারে বসিয়া বাড়ী যাইবার কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাবী প্রিয়ার মুখচ্ছবিখানা হৃদয়পটে আঁকিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কখনও বা ভাবিতেছিলাম, হয়ত আমার কুন্তলার রূপ সদ্যস্ফুট কুন্দপুষ্পের মত হইবে, অথবা স্বচ্ছ সরসীবক্ষে সস্মিত কমলিনীর মতই হইবে, না হয় স্বভাবতঃ সলজ্জ রক্তিমাভ মুখখানা অশোক-স্তবকের সাদৃশ্যই জ্ঞাপন করিবে,—এই রকম আর কত কি ভাবিলাম। হঠাৎ

মনে হইল, আচ্ছা, বৌদির আজ্ঞাটা একবার পালন করিলে কেমন হয়? ঐ সময় পালঙ্ক সন্নিহিত সেই সর্ব্বনাশক একতারার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। ক্ষণেক পরে একটা মতলব আঁটিয়া আমি বউবাজারে গিয়া একখানা নামাবলী ও দুটি কাঠের মালা কিনিয়া নিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া হইলে আমি পরিমলকে বলিলাম যে আমি আমার মাসীমার বাসায় দেখা করিতে যাইব এবং কল্য প্রাতে গিয়া ষ্টেসনে উহাদের সহিত যোগ দিব। আমার মালপত্র উহাদের সহিত একত্র মাপাইয়া লইবে এবং দৈবাৎ যদি আমি সময় মত না আসিতে পারি তবে যেন আমার লগেজগুলি উহাদের সহিত যায়। এইরূপ বলিয়া দিয়া আমি লুকাইয়া একতারাটি, নামাবলী ও মালাগুলি লইয়া ট্রামযোগে শ্যামবাজারে গিয়া নিঃশব্দে মাসীমার বাড়ী প্রবেশ করিলাম। বাহিরের একটা অব্যবহৃত ঘরে আমার জিনিষগুলি গোপনে রাখিয়া আসিয়া মাসীমাকে বলিলাম, কাল বাড়ী যাইব তাই তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আমার জিনিষগুলি লইয়া ধীরপদে বাহির হইলাম। তখন চাটগাঁও মেলের সময় উত্তীর্ণ; ইচ্ছা করিয়া যে গাড়ী ফেল করিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ট্রামে চড়িয়া শিয়ালদ আসিলাম; বেলা ৮টার গাড়ীতে ফরিদপুরের জন্য রওনা হইলাম।

বেলা প্রায় ২টার সময় রাজবাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তখনও ফরিদপুরের গাড়ী আসিতে প্রায় ১ ঘণ্টা দেরি আছে। ষ্টেসনের পিছনে দেখিলাম কয়েকখানা ছোট কাপড়ের দোকান এবং বটতলায় বসিয়া একটা লোক সকলকে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক পরাইয়া দিতেছে। আমি দু'খানা নূতন সাদা কাপড় কিনিয়া একখানা পরিধান করতঃ দ্বিতীয় কাপড়খানা দ্বারা একটি পাগড়ি বাঁধিয়া, জুতা জোড়া, সার্টটি এবং চশমা জোড়া খুলিয়া পরিধানে যে কাপড়খানা ছিল তাহাতে পুঁটলি বাঁধিয়া, নগ্নপদে গিয়া বটতলাস্থিত ঐ লোকটার কাছে দিব্য দু'টি তিলক কাটিয়া লইলাম। ইত্যবসরে ফরিদপুরের গাড়ী আসিল; আমি গাড়ীতে উঠিয়া একতারা হস্তে গম্ভীর ও মৌন হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা চারটার সময় গাড়ী আসিয়া ফরিদপুর ষ্টেসনে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেসন সন্নিহিত এক পানওয়ালার দোকানে স্বরচিত মূর্ত্তিখানা একবার দর্পণে পরীক্ষা করিয়া লইলাম; দেখিলাম বেমালুম দৈবজ্ঞ সাজিয়াছি।

নিবারণ বাবু ইঞ্জিনিয়ার, একথা পূর্ব্বে জানিতাম; এক ছেলে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া এলাহাবাদে প্রাকটিস্ করিতেছেন এবং দুই পুত্রের

মধ্যে একজন কলিকাতা থাকিয়া বি, এ, দিতেছে, আর অন্য একজন এলে পড়িতেছে। তবে কিনা তাঁহার আর বিশেষ কোন খবর জানিতে পারি নাই; এমত অবস্থায় আন্দাজে কাহার বাড়ীতে যাই? ফরিদপুর রওনা হইবার পূর্ব্বে এ সব কথা আমার একেবারেই খেয়াল হয় নাই। তখন যেন কি একটা অজানা মাদকতা আমাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল; তারপর রাত্রিতে কোথায় যে থাকব তাহাও একবার চিন্তার পথে আসে নাই। একটু মুস্কিলে পড়িলাম; কিন্তু যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি তাহা চরিতার্থ করিবই সে বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম। মোটামোটি আন্দাজ করিয়া লইলাম যে নেহাৎ সাধারণ বাড়ীতে আর অবশ্যই নিবারণ বাবুর মত পদস্থ ব্যক্তি বাস করেন না। আমি ভাবিতে ভাবিতে ষ্টেসন পার হইয়া জেলের পূর্ব্ব পাশ দিয়া যে একটা রাস্তা চলিয়াছে সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। হঠাৎ একখানা শ্বেত পাথরে ইংরাজি কালো অক্ষরে ক্ষোদিত "নিবারণ চন্দ্র রায়, ইঞ্জিনিয়ার" নামটি দেখিয়া আমি থমকিয়া গেলাম; তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একতারায় মৃদু আঘাত দিয়া—"জন্মে'ছ হেথায় মরিব কোথায়, কি জানি কপালে কি আছে লিখন"—ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে ফটক পার হইয়া কম্পিত বক্ষে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি বাড়ীখানা বেশ সাহেবী ধরণে সাজান, সাম্‌নে একটি সুন্দর ফুলের বাগান। কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই শ্রুতিমধুর বলিয়া আমার একটু খ্যাতি ছিল; তাহার বিশেষ পরীক্ষা হইল দারোয়ানের নিকট। কারণ, সাধারণতঃ ভিখারী দেখিলে দারোয়ান প্রভুরা প্রথমেই তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ঐ দারোয়ানটা আমাকে বিতাড়িত ত করিলই না, বরঞ্চ চিত্রার্পিতের মত আমার প্রতি অপলক চাহিয়া রহিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, লোকটাকে ওষুধে ধরিয়াছে। আমার এ অদ্ভুত বেশে আবির্ভাবে আমার মনে হইতে লাগিল যেন আমি বিষবৃক্ষের হরিদাসীর অভিনয় করিতেছি। তবে কিনা বঙ্কিম বাবু দেবেন্দ্র বাবুকে বৈষ্ণবীর রূপ দিয়াছিলেন, আর আমার এক নূতন ধরণের দৈবজ্ঞের বেশ; কিন্তু উদ্দেশ্য প্রায় একই। গানটি অর্দ্ধেক গাহিয়া আমি দারোয়ানের কাছে ভিক্ষা চাহিলাম। এমন সময় কোন বালক কণ্ঠ নিঃসৃত "দারোয়ান" শব্দটি আমার কাণে প্রবেশ করিল। আমি অলক্ষ্যে একটু কাঁপিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এই রে! বুঝি মারিবার হুকুম দেয়। "বৈঠিয়ে ঠাকুরজী," বলিয়া দারোয়ান অন্দরে প্রবেশ করিল। বহির্দৃষ্টি হইতে বাটীর অভ্যন্তর প্রদেশকে একটা প্রকাণ্ডকায় নিষ্ঠুর

দেয়াল আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল; ভিতরে কি হইতেছে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলাম। ক্ষণেকপরে দারোয়ান আসিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে আদেশ করিল। আমি সর্ব্বত্রগামী ভিখারীর স্বভাব সুলভ সরল অথচ গম্ভীর বদনে অন্দরে প্রবেশ করিলাম। বাহিরে আমার মুখে বিন্দুমাত্রও ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হইলেও আমার বুক যে অবিরত দুর্ দুর্ করিতেছিল, তাহা বোধহয় বলিতে হইবে না।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয়ের সাহায্যে একতারার কটিদেশ ধারিয়া তর্জ্জনী দ্বারা তাহাতে মৃদুমন্দ ধ্বনি করতঃ পঞ্চমে গলা উঠাইয়া গানটি আদ্যোপান্ত গাহিলাম; তৎপর দীর্ঘশ্বাস নির্গত করিয়া তাহার সহিত করুণার সুর মিলাইয়া বলিলাম "দৈবজ্ঞ বিদায় কর মা, গোবিন্দ, গোবিন্দ!" এই বলিয়া আমি গানটি শেষ করিয়া একতারা হস্তে বারান্দার উপর আমার পুঁটলিটি লইয়া বসিয়া পড়িলাম। একটি মধ্যবয়স্কা নারী নিকটস্থ এক কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া দু'আনার পয়সা মাটিতে রাখিলেন। সাজ সজ্জা আধুনিক উন্নত রুচির পরিচায়ক, অনুমানে বুঝিলাম ইনিই নিবারণ বাবুর স্ত্রী। আমি দেখিলাম আমার অভিনয় সাঙ্গ হইয়া যায়; আমি পয়সা দু'আনা কুড়াইতে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিলাম, "মা আপনার বাড়ীতে শীঘ্র প্রজাপতির শুভাগমন দেখিতেছি।" মধ্যবয়স্কা আমার দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি হাত দেখিতে পার?" আমি একটু বিনয়সহকারে বলিলাম, "হাঁ মা. বাবাজির কৃপায় কিছু কিছু জানি বৈ কি?" মধ্যবয়স্কা উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তখানা আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমি হাত দেখিবার জন্য একতারাটি মাটিতে রাখিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী অন্যূন বিংশতিবর্ষীয়া এক যুবতী আমার কার্য্যকলাপ দেখিতেছে, তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আড়াল হইতে আর একটি অনাবৃতশিরা ষোড়শী আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, কি যেন একটা অব্যক্ত পুলকে আমার দেহ কণ্টকিত হইতেছিল। অনুমানে বুঝিতে পারিলাম বিবাহিতা যুবতী, নিবারণ বাবুর পুত্রবধূ, আর তাঁহার পাশে দণ্ডায়মানা যুবতী আমারই—ওর নাম কি—তাই! আমি নিজকে একটু সংযত করিয়া হস্ত দেখিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে দু'একটা শ্লোকও উচ্চারণ করিতেছিলাম যথা:—

সম্প্রদানে চতুর্থী স্যাৎ
তুমর্থাৎ ভাববাচিন :—
সম্পদ্যমানাৎ ক্লীপ্যাদে
নিবৃত্তৌ চ নিবৃত্তত:
হিত সুখেন তাদর্থে, ইত্যাদি।

বাখ্যা করিয়া দিলাম "আপনি চতুর্থ সন্তানকে শীঘ্রই সুপাত্রে সম্প্রদান করিবেন, অর্থের অভাব জনিত ভাবনা নাই, সম্পদ ও মান খুব, কন্যার বিবাহ নির্ব্বৃত্ত হইলে আপনার সকল কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে, জীবের হিতসাধন করিবেন, তাহাদের সুখেই আপনি সুখী হইবেন। আপনার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না, আয়ু যথেষ্ট, পুত্রগণ সুশিক্ষিত হইবে—" ইত্যাদি। নিবারণ বাবুর স্ত্রী আমার জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ বিদ্যা দেখিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে বলিলেন "চারু, মা, এদিকে এস ত?" যুবতী একখানা ইন্‌ভ্যালিড ক্যানবিসের চেয়ারে বসিয়া আমার দিকে ডানহাতখানা বাড়াইয়া দিলেন। যুবতীর বামহস্তস্থিত খাম হইতে উন্মুক্ত একখানা পত্রের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল; আমি পত্রখানা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমার বাহুদ্বয় তুলিয়া মুখ ডাকিয়া "জয় রাধে" বলিয়া একটা হাঁই তুলিবার ভাণ করিলাম। ইত্যবসরে আমি চিঠির খানিকটা দেখিয়া লইলাম, তাহাতে লেখা ছিল "ঢাকার সেই ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিলাম, নাম জীবেন্দ্র কুমার সেন, চশমা চোখে, বেশ কায়দা-দুরস্ত, বর্ণ—" সমস্তটা পড়িতে পারিলাম না, কারণ পত্রখানা ভাঁজ করা ছিল। আমি দেখিলাম এ আমারই নাম, কিন্তু আমি মনে করিতে পারিলাম না যে কে ক'বে আমাকে দেখিতে গিয়াছিল। আমি মুখাবরণ অপসৃত করিয়া যুবতীর হাত দেখিবার জন্য তাহার দিকে তাকাইলাম; নিবারণ বাবুর স্ত্রী বলিলেন "ওমা, ডান হাত নয়, বাঁ হাত দেখাও।" মাথা মুণ্ডু কি বলিব! আমার কেবল মনে হইতেছিল, কে কোন দিন আমাকে দেখিতে গিয়াছিল? যুবতী একটু সলজ্জহাসি হাসিয়া পত্রখানা হস্তান্তরিত করিয়া বামহস্তখানা আমার সাম্‌নে ধরিলেন; আমি তখন আর একবার "শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া মুখ ঢাকিয়া পত্রের শেষ অংশটা দেখিয়া লইলাম। তাহাতে লেখা আছে "আজ কাল কলিকাতার সহরে কোন রাজকন্যা মৃগয়া করিতে আসে না; তোমার ভয় নাই, তোমার "মৃগকে" কেউ ধরিয়া নিবে না। আমাদের পরীক্ষা ১০ই এপ্রিল শেষ

হইবে, আমি ঐ দিনই বাড়ী রওনা হইব—ইতি—তোমারই "মৃগ"। এবার আমি কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কয়দিন পূর্ব্বে চারুব্রতের সহিত একটি যুবক আমার ঘরে আসিয়াছিল; চারুব্রতের সাহায্যে তাঁহার পরিচয় জানিয়াছিলাম। নাম মৃগাঙ্ক, বাড়ী ফরিদপুর। সহসা স্মৃতি সূর্য্যের জ্যোতিঃ আমার সন্দেহছায়া-ধূসরিত হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দিল, আমি সব বুঝিতে পারিলাম। যুবতীর হাত দেখিয়া একটু নূতন করিয়া বলিলাম, "সুখী হইবে, স্বামীর নামে 'চন্দ্র' বুঝায়; ত্রিশবৎসর বয়সে একটা পীড়া হইবে (এরূপ একটা কিছু না বলিলে নয়), জীবনের হানি নাই। সপ্তাহকালের মধ্যেই স্বামী প্রবাস হইতে আসিবেন।" একথা শুনিয়া যুবতীর গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থিতা বলিলেন, "ঠিক বলেছ ঠাকুর!" যুবতীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বীণানিন্দিত স্বরে কুমারী বলিয়া উঠিলেন "বল ত ঠাকুর, মেজদা' পাশ হবে কি না?" আমি একবার আমার ভাবী প্রিয়ার "মুখ চন্দ্রার" দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু তখনই আবার চোখ নামাইয়া লইলাম।

আমি আমার ভাবী শাশুড়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "ইনি আপনার পুত্রবধূ, ইঁহার স্বামী এবার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।" কুমারী অমনি বলিয়া উঠিল "এবার বৌদি খাইয়ে দাও, দেখ্‌লে ত দৈবজ্ঞ ঠাকুর বল্‌ছে দাদা পাশ হবে।" যুবতীর গণনা শেষ করিয়া আমি উঠিবার ভাণ করিলাম। কিন্তু পার্শ্বস্থিতা বাধা দিয়া বলিলেন "ঠাকুর, বসো, ওর হাত খানা একটু দেখ। বুল্‌বুল্‌, এদিকে আয় মা।" কি একটা অজ্ঞাত হর্ষে যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্থল স্পন্দিত হইয়া উঠিল, আমি সাহসে ভর করিয়া কুমারীর হাতখানি আপন হাতে লইলাম। আমি কুন্তলার মুখের দিকে চাহিতে এনাক্ষী তাহার সলজ্জদৃষ্টি নামাইয়া লইল। আমি ভাবী প্রিয়ার স্বেদসিক্ত কণ্টকহীন করপল্লব আপন হাতে লইয়া ধীরে বলিতে লাগিলাম, "এটি আপনার কন্যা, ইহার এবার বিবাহ হইবে, কিন্তু"—এই বলিয়া আমি একটু গম্ভীর হইয়া থামিয়া গেলাম। নিবারণ বাবুর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু কি ঠাকুর?" আমার দুর্ব্বুদ্ধি আসিল; আমি খুব বিচক্ষণ দৈবজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে কোথাও সম্বন্ধের উল্লেখ আছে?" নিবারণ বাবুর স্ত্রী সোৎসাহে বলিলেন "হাঁ ঠাকুর! কেন?" পুনরায় বলিলাম "আপনার ভাব জামাতার নাম "জ" দিয়া আরম্ভ—ভগবান বুঝায়?" কুন্তলার

মাতা বলিলেন, "হাঁ!" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার কন্যাকে অন্যত্র যাইতে বলুন।" কুন্তলা মাতার আদেশে সেখান হইতে চিন্তাভারাক্রান্ত মুখে প্রস্থান করিল। আমি বলিলাম, "উত্তর পূর্ব্ব কোণে আপনার কন্যার বিবাহ হইলে বৈধব্য ঘটনা অতি সত্বরই সম্ভাবনা!" আমি এই কথা বলিতেই কুন্তলার মাতা ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও মা, কি হবে গো!—কি বল ঠাকুর, আমি যে তবে সর্ব্বনাশ করেছি!" কুন্তলার মাতা আর বাক্যব্যয় না করিয়া সেখান হইতে অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে উঠিয়া গেলেন, আমিও ধীরপদে একতারাটি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, খুব একটা বাহাদুরী কাজ করিয়াছি। কিন্তু ইহার পরিণাম যে কি হইবে যুবক সুলভ চপলতাবশে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন রাস্তায় বাতি জ্বলিয়াছে, গোধূলি কুমারী নিশাদেবীর অগ্রদূতী হইয়া সমগ্র জগতে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছে। শান্ত শর্ব্বরী আপনার দ্রব্যসম্ভার লইয়া আপন গৃহস্থালীতে নিযুক্তা হইলেন, আমি ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম; রাত্রি ৮টার সময় রাজবাড়ী পৌছিলাম। এবার দৈবজ্ঞের বেশ ছাড়িয়া দিব্যকান্তি বাবুটি সাজিলাম। শেষ রাত্রিতে ঢাকা মেল আসিবে। আমি রাত্রির অবশিষ্ট অংশটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে অতিবাহিত করিলাম। রাত্রি চারটার সময় গাড়ী আসিল, অতি প্রত্যুষে আসিয়া আমি গোয়ালন্দ নামিলাম। অনতিবিলম্বে মেল ষ্টিমার ছাড়িয়া দিল।

আমি নিভৃতে বসিয়া বালার্কচুম্বিত-স্নিগ্ধ-উষা-প্রতিমার মত নবযৌবনস্পর্শে কুন্তলার কমনীয় কান্তিপূর্ণ মূর্ত্তিখানা মানসপটে আঁকিতেছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বদিনের গণনার কথা মনে হইতেই ভাবিলাম, যদি আমার কথা সত্য ভাবিয়া এ বিবাহ দিতে নিবারণ বাবু অসম্মত হন তবে কি হইবে? তবে—আর ত কুন্তলাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিব না। আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিলাম ও বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। কিন্তু কি করিব, যাহা করিয়াছি, অনুতাপ করিলেও এখন ত আর তাহার প্রতিকাব নাই। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার উপর প্রতিশোধ লইবার মানসে আমার দৈবজ্ঞের পরিচ্ছদগুলি একে একে পদ্মাবক্ষে নিক্ষেপ করিলাম। সে গুলি তরীচক্রে প্রপীড়িত ও বিক্ষোভিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাসিয়া উঠিয়া আবার স্বপ্নের মত পদ্মার বিশালবক্ষে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ত আমার মনস্তাপ দূর হইল না। থাকিল শুধু সকলকর্ম্ম-নষ্টকারী সেই একতারা। সারাটা দিন

আমার এইভাবে গেল। বেলা ১২॥০ টার সময় নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিলাম; ঢাকা মেল তখন প্লাটফর্ম্মে প্রস্তুত ছিল। আমি গাড়ীতে উঠিলাম, বেলা প্রায় ২টার সময় একতারা হস্তে বাড়ী আসিলাম। আমার বাক্স ইত্যাদি সবই ঠিকমত আসিয়াছিল। আমার বাড়ী আসিবার দেরী হইবার কারণ বলিলাম, মাসীমার সহিত দেখা করিতে যাইয়া সময় মত নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় গাড়ী ফেল করিয়াছি। কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না।

আমার বাড়ী আসিবার ঠিক দুই দিন পরে নিবারণবাবু আমার পিতৃদেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"নিয়তির নির্ব্বন্ধ খণ্ডাইবার শক্তি মানবের হাতে নাই; গত কল্য এক অনাহুত দৈবজ্ঞ হঠাৎ আমার বাড়ীতে আসিয়া কুন্তলার হাত দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে এ বিবাহের পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর। দৈবজ্ঞকে অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ তাঁহার আরও কতগুলি গণনা একেবারে প্রত্যক্ষ ফলিয়াছে। যাহাই হউক, ঐরূপ একটা অশুভ সূচনা লইয়া বিবাহ দিতে আমাদের সাহস হয় না। জীবেন্দ্রের মত সুপাত্রে যে আমার একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিলাম না, ইহা হইতে আমার আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?"—ইত্যাদি। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে একটা বিরাট দংশনে আমার পাপ রসনাকে ছিন্ন করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার শাস্তি বিধান করি। কি উপায়ে গণনার অসত্যতা প্রমাণ করিব ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। একবার ভাবিলাম আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গোল মিটাইয়া দিব, কিন্তু একটা সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। ছি! লোকে কি বলিবে? আমার পিতৃদেব এই সংবাদে কিন্তু বিশেষ দুঃখিত হইলেন না, কারণ সাধারণতঃ সম্বন্ধ ফিরিয়া যাওয়াটা খুব বিরল নহে। আমিও আমার হৃদয়ের অসহ্য যাতনা কখনও প্রকাশ করিতাম না। তবে কি না বৌদি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তোমার অদৃষ্টে বিয়ে নেই।" ইহার দু'দিন পরে আমি মাদারীপুর আমার ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানে গিয়া নিবারণ বাবুর নামে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলাম।

"আমার নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; আমি আপনার ভাবী জামাতা জীবেন্দ্রের বিশেষ বন্ধু। গত ৫ই এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দৈবজ্ঞের বেশে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমি আপনার স্ত্রী, পুত্রবধূ ও কন্যার হাত দেখিয়া কতগুলি গণনা করিয়াছিলাম। আমার অমূলক গণনা

বিশ্বাস করিয়া আপনি জীবেন্দ্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। আমি আপনার পরিচয় জীবেন্দ্রের নিকট সব জ্ঞাত থাকাতে কতগুলি কথা অনায়াসেই ঠিক বলিতে পারিয়াছিলাম। পরন্তু, আপনার পুত্রবধূর হস্তে আপনার পুত্রের একখানা পত্র ছিল, তাহা দেখিয়া আমি আরও কিছু বলিয়াছিলাম। তারপর কি একটা চটুলতার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আপনার কন্যার হাত দেখিয়া তাঁহার বৈধব্য গণনা করিলাম। আশা করি এই পত্র হইতে আমার গণনার মূলে যে বিন্দুমাত্রও সত্য নাই, তাহা আপনার নিকট সম্যক্ প্রতীয়মান হইবে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে; আমার আশীর্ব্বাদে আপনার জামাতা ও কন্যা চিরসুখে সুখী হইবে। আপনি বিবাহ স্থির করিবেন ইহাই আমার একান্ত মিনতি। ইতি

অনুতপ্ত শ্রীনরেন্দ্রনাথ।"

অল্প কয়দিন পরে যে দিন আমি ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম সেই দিনই ফরিদপুর নামাঙ্কিত একখানা পত্র পাইলাম। পত্রে লেখা ছিল, "প্রিয় জীবেন্দ্র বাবু, একটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন যে মাদারীপুর নিবাসী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক আপনার কোন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন কি না।

ভবদীয়

শ্রীমৃগাঙ্কভূষণ রায়।

আমার সকল চেষ্টা সফল হইল ভাবিয়া আমি প্রায় আত্মহারা হইয়া পড়িলাম; এতদিনে আমার প্রাণে জল আসিল; আমি তৎক্ষণাৎ একখানা ডাক কাগজে লিখিলাম,

প্রিয় মৃগাঙ্ক বাবু,

আপনার পত্রের মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিলাম না; নরেন আমার বিশেষ বন্ধু জানিবেন।

ভবদীয়—শ্রীজীবেন্দ্রনাথ সেন।

ইহার চারিদিন পরে নিবারণ বাবু, আমার কল্পিত বন্ধু নরেন্দ্রের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিয়া এ বিবাহে তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, ভাবিলাম খুব প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেলাম।

বৈশাখ মাসে আমার বিবাহ হইয়া গেল। বাসরঘরে চারুলতা আমার

কাণ ধরিয়া বলিল, "দৈবজ্ঞ মহাশয়, দেখুন দেখি আমার হাতখানা।" আমি বলিলাম, "কি রকম?" চারুলতা তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দু'খানা চিঠি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এখনও জোচ্চুরী! দেখিলাম পত্র দু'খানা আমারই শ্রীহস্তের পদ্মাক্ষরে খচিত। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এত বড় ভুলটা কিন্তু আমার একেবারেই খেয়াল হয় নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে নাকালের একশেষ করিয়া দিল।

বিবাহের পর কুন্তলাকে লইয়া আমরা ঢাকা আসিলাম। একদিন রাত্রিতে কুন্তলা আমার শয়নকক্ষস্থিত সেই সর্ব্বনেশে একতারাটি লইয়া তাহাতে একটি শব্দ করিয়া সুর টানিয়া সস্মিত বদনে "জয় রাধে" বলিয়া উঠিল; আমি কুন্তলাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া জব্দ করিবার মানসে বলিলাম "বুলবুল, যাকে তাকে আর যেন কখনও হাত দেখিও না।" কুন্তলা মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, হাতের লেখায় ধরা প"—আমি সজোরে কুন্তলাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কিউপিডের সিলমোহরে তাহার গোলাপী ওষ্ঠ দু'খানা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সে সর্ব্বনাশক একতারাটিকে অনেকবার অগ্নিদেবকে উপহার দিতে চাহিয়াছি, কিন্তু কুন্তলা কিছুতেই আমার এ বাসনা চরিতার্থ করিতে দেয় নাই। একতারাটি কুন্তলার জীবনসঙ্গী হইয়া আছে। থাক্—আপত্তি নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আমি ও তুমি।

আমি কহে ওহে তুমি
তুমি আছ ব'লে
আমার আমিত্বটুকু
জানিছে সকলে॥
তুমি কহে ওহে আমি
আমি কিছু নই।
আমি তুমি তুমি আমি
ভেদাভেদ কই॥

যেখানেই আমি আছি
সেখানেই তুমি।
তোমার অভাবে একা
কিছু নই আমি॥
তোমার অস্তিত্বে সুধু আমিত্ব প্রমাণ
তোমার বিহনে মোর হত'না সম্মান॥

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

মুদ্রারাক্ষস।

[প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক বিশাখদত্ত প্রণীত
'মুদ্রারাক্ষসের' গল্পাংশ সঙ্কলন।]

(১)

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। সেই সময় হইতেই প্রাচীন ভারতেই প্রমাণসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, মগধই তখন উত্তর ভারতের প্রধান রাজ্য ছিল। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবগণের আবির্ভাব কালেও মগধেশ্বর জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কোনও কোনও পুরাণে জরাসন্ধের সময় হইতে বহু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত মগধের বিবিধ রাজ-বংশের এবং প্রত্যেক বংশের রাজগণের নাম পাওয়া যায়। পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়াই পুরাণে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। মগধ যে বহুকাল অবধি উত্তরভারতের প্রধান রাজ্য এবং উত্তরভারতীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, ইহা তাহারও একটি প্রমাণ। বুদ্ধদেবের সময় শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার এবং পরে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধে রাজত্ব করিতেন। শিশুনাগবংশীয় রাজগণের পরে নন্দবংশীয় কয়েকজন রাজা মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা মহানন্দ। বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের নাম একরূপ সকলেরই পরিচিত। কূটনীতি-বিশারদ বলিয়া ইনি 'কৌটিল্য' আখ্যাও প্রাপ্ত হন। চাণক্যের নীতিকৌশলেই নন্দবংশ ধ্বংস হয় এবং মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করিয়া সুবিখ্যাত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই ধারাবাহিকরূপে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তকেও একরূপ নন্দবংশসম্ভূত বলা যায়। মহানন্দের মুরা নাম্নী একজন শূদ্রা দাসী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজার সেই দাসী গর্ভজাত পুত্র। জননী মুরার নাম হইতে তাঁহার বংশের মৌর্য্য এই নাম হয়। মহানন্দের পুত্র ও জ্ঞাতিগণের বিদ্বেষবশতঃ প্রথম বয়সে চন্দ্রগুপ্তের জীবন বিপন্ন হয়,—পলায়ন করিয়া তিনি পশ্চিমভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় গ্রীক্ বা যবনবীর আলেকজণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। শোনা যায়, চন্দ্রগুপ্ত কিছুকাল আলেকজণ্ডারের সঙ্গে তাহার শিবিরে ছিলেন। আলেকজণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন ও মৃত্যুর পর

ভারতবাসীরা ভারত হইতে আলেকজণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত যবনরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন। প্রধানতঃ চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বাধীনেই এই ঘটনা ঘটে। ইহা হইতেই তাঁহার শক্তির ও ভাগ্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কেন যে চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হন, তার সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কিম্বদন্তী আছে। মগধেশ্বর মহানন্দের শকটার নামে একজন আমাত্য ছিলেন। কোনও কারণে মহানন্দের ক্রোধে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। শকটার এই অবমাননার প্রতিশোধ কিসে হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন! নগরের বাহিরে দূরে এক প্রান্তরে তিনি একদিন ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই প্রান্তরে বহু কুশগুল্ম ছিল। শকটার দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ এবং বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ এক ব্রাহ্মণ একমনে সেই কুশমূল তুলিতেছেন, আর তার গর্ত্তে ঘোল ঢালিতেছেন। শকটার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে তুমি ব্রাহ্মণ? এ কি করিতেছ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য।"

"তুমি এ কি করিতেছ?"

যুবক চাণক্য উত্তর করিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে এই পথ দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম। পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ * হইল,—সুতরাং বিবাহে ব্যাঘাত ঘটিল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এখানকার সমস্ত কুশ নির্ম্মূল করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিব। তাই করিতেছি।"

শকটার এই অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণযুবকের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার প্রতিশোধের বাসনা ইঁহারই সাহায্যে চরিতার্থ হইতে পারে। একটু চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, "ব্রাহ্মণ তুমি এই নগরে গিয়া একটি চতুষ্পাঠী করিবে? অধ্যাপক হইয়া সেখানে বাস করিবে?"

"কেন, তাহাতে কি হইবে?"

শকটার কহিলেন, "যদি তা কর, আমি এখনই বহু লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা এই ক্ষেত্র একেবারে কুশমুক্ত করিয়া দিব।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "ভাল, আমিও তবে নগরে গিয়া অধ্যাপনা করিব।"

---

* কোনও আঘাতে শরীরে কোথাও ক্ষত হইলে, অশৌচভোগীর ন্যায় তাহার ধর্ম্মক্রিয়াদি নিষিদ্ধ। এখনও নিয়ম আছে এইরূপ ক্ষতাশৌচ ব্যক্তি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না।

শকটার অবিলম্বে তাঁহার পণ রক্ষা করিলেন। চাণক্যও নগরে গিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে মহারাজ মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন আসিল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজগৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে সভাস্থ ব্রাহ্মণদের প্রধান আসনে বসাইয়া রাখিয়া শকটার কোনও কার্য্যের উপরলক্ষ্য করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজা সভাস্থল আসিয়া দেখিলেন, অপরিচিত এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। এরূপ ব্রাহ্মণকে এরূপ আসনদান শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। ক্রুদ্ধ রাজা শুনিলেন, শকটার এই সুলক্ষণ-বিহীন ব্রাহ্মণকে এই আসনে আনিয়া বসাইয়াছে। রাজার ক্রোধ আরও বাড়িল। তিনি শিখা ধরিয়া চাণক্যকে তুলিয়া দিলেন। তেজস্বী চাণক্য ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন, "সভ্যগণ! আপনারা সাক্ষী! রাজা মহানন্দ আমাকে এইরূপ অবমাননা করিল! আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারি, ততদিন আমার এই শিখা আমি বন্ধন করিব না!"

এই বলিয়া চাণক্য বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর নানারূপ অভিচার * ক্রিয়া ও কূট কৌশলের সাহায্যে রাজা এবং তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যু ঘটাইলেন।

নন্দরাজগণের নিতান্ত বিশ্বস্ত ও ভক্ত, যারপরনাই শক্তিমান্ ও বিচক্ষণ এক আমাত্য ছিলেন, তাহার নাম রাক্ষস। রাজা ও রাজপুত্রগণের মৃত্যুর পর রাক্ষস মহানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তরুণবয়স্ক সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসাইলেন। এদিকে চাণক্য গিয়া চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিলেন। দুইজনে শক যবন কাম্বোজ কিরাত পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি ভারতের প্রত্যন্ত দেশবাসী বহু দুর্দ্ধর্ষ ম্লেচ্ছ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পর্ব্বতক নামে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবল এক ম্লেচ্ছ রাজা ছিলেন। অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁহাকে দান করিবেন, এইরূপ সন্ধির সময় † করিয়া, তাঁহার সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তারপর এই প্রবল সৈন্য সহ আসিয়া মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র বা কুসুমপুর অবরোধ করিলেন।

নগরের কতক অংশ শত্রুসেনার অধিকৃত রইল,—পৌর ও জনপদবাসীদের উপরে নানারূপ অত্যাচার হইতে লাগিল। রাজপুরী হইতে নগরের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ ছিল। রক্ষার আর কোনও উপায় না দেখিয়া রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি এই গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করিয়া কোনও তপোবনে গিয়া

* আমার অনিষ্ট সাধনা করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রক্রিয়া বিশেষ।

† সর্ত্ত বা Condition—এই অর্থেও সংস্কৃত সাহিত্যে 'সময়' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাটলীপুত্রের রাজপুরীতে এরূপ বিপজ্জাল-বেষ্টিত হইয়া থাকা নিরর্থক বুঝিয়া রাক্ষসও সেই সুড়ঙ্গ পথে বাহিরে চলিয়া আসিলেন!

ভীরু রাজার ন্যায় তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা রাক্ষস তপোবনে গিয়া আশ্রয় নিলেন না। কতিপয় বিশ্বস্ত লোকের সহায়তায় কিরূপে চন্দ্রগুপ্তের নিধন হইবে এবং নন্দবংশ আবার মগধের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহার উপায় অবলম্বনে নিবিষ্ট হইলেন।

প্রভু রাজবংশের প্রতি অবিচলিতভক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পরাক্রম—একাধারে এই তিন গুণ সচরাচর মিলে না। চাণক্য দেখিলেন, রাক্ষসে এই তিন গুণই সমভাবে বর্ত্তমান। এ হেন রাক্ষসকে যদি চন্দ্রগুপ্তের অমাত্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন মগধে অটল হইয়া থাকিবে। কিন্তু মৌর্য্য-রাজকুলের শেষ অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেও রাক্ষসের সহায়তা লাভ হইবে না। কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভের জন্য চাণক্যের অকরণীয় কিছুই ছিল না। প্রথমেই তিনি কুটনীতি কৌশলে তপোবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিধন সাধন করিলেন।

এদিকে রাক্ষসও চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি এক বিষকন্যা * চন্দ্রগুপ্তের নিকটে প্রেরণ করিলেন। চাণক্য এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সেই কন্যা দ্বারা পর্ব্বতকের মৃত্যু ঘটাইলেন। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু ভয়ে পলায়ন করিলেন। রাক্ষসের কৌশল ব্যর্থ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি অনুসারে যাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁহাকেও পথ হইতে সরান হইল। আবার বাহিরের লোককেও এইরূপ জানিতে দেওয়া হইল যে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মিত্র পর্ব্বতককে নিধন করিবার জন্যই রাক্ষস বিষকন্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সুযোগে রাক্ষসের বিরুদ্ধে এই অপবাদ প্রচার করিবার এক গূঢ় উদ্দেশ্য চাণক্যের ছিল।

সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিধনে নন্দরাজবংশের অবসান হইল বটে, কিন্তু চাণক্যের আশা পূর্ণ হইল না। প্রভুবংশের এই উচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত উভয়ের প্রতিই রাক্ষসের চিত্তে ভীষণ প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি সংকল্প করিলেন, যে ভাবে হউক চাণক্য-সহায় চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ করিয়া তিনি ইহার প্রতিশোধ নিবেন। নন্দবংশের আর কেহ নাই, অগত্যা তিনি পর্ব্বতকের

---

* সহযোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এরূপভাবে যে কন্যার দেহ নানাবিধ বিষাক্ত ঔষধে প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেই বিষকন্যা বলে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোনও কোনও স্থলে এইরূপ বিষকন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুত্র মলয়কেতুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চাণক্যে দেখিলেন, এখন মলয়কেতুর সঙ্গে রাক্ষসের ভেদঘটান প্রয়োজন। রাক্ষসের নামে এই অপবাদ তার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু কেবল ইহাতেই হইবে না। কারণ, মলয়কেতুর ধারণা ছিল চাণক্যই বিষকন্যার দ্বারা তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটান। এখন কেহ যদি গিয়া তাঁহাকে বলে, চাণক্য নন, রাক্ষসই তাঁহার পিতার মৃত্যুর কারণ,—তবে একথা বিশ্বাস ত তাঁহার হইবেই না, বরং মনে এই সন্দেহই হইবে, যে শত্রুপক্ষীয় কেহ রাক্ষসের সঙ্গে তাঁহার ভেদ ঘটাইবার জন্যই তাঁহার নামে এই মিথ্যাপবাদ প্রচার করিতেছে। আগে অন্যান্য উপায়ে রাক্ষসের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মাইতে হইবে,—মলয়-কেতুকে এইরূপ প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে বাহিরে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা রাখিয়াও তলে তলে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ একটা অবস্থা ঘটাইতে পারিলে, তখন যদি তাঁহাকে কোনও সুযোগে জানান যায় যে রাক্ষসই তাঁহার পিতৃহন্তা, তবে নিশ্চিত শত্রুরোধে মলয়কেতু রাক্ষসকে অবশ্য ত্যাগ করিবেন।

রাক্ষসের সঙ্গে মলয়কেতুর ভেদ ঘটাইতে হইবে,—এদিকে আবার চন্দ্রগুপ্তের বিনাশ বা অনিষ্টের জন্য রাক্ষস যে সব চক্রান্ত করিতেছেন, তাহারও প্রতি-বিধান করিতে হইবে। এই দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই চাণক্য একচিত্ত ও দৃঢ়-সংকল্প হইয়া আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই, পাটলীপুত্রে কাহারা এখনও রাক্ষসের পক্ষীয় আছেন, কাহার দ্বারা রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের কি অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সংবাদ সংগ্রহের জন্য কয়েকজন অতিবিশ্বস্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চর তিনি নিযুক্ত করিলেন। ওদিকে রাক্ষসও যবন কিরাত কাম্বোজ পার্ব্বতীয় বাহ্লীক পারসীক প্রভৃতি বহু ম্লেচ্ছ রাজগণের সঙ্গে এবং ভারতীয় আর্য্য রাজগণও কাহারও কাহারও সঙ্গে মিত্রতা করিয়া তাঁহাদের সৈন্যসহ ময়লকেতুকে লইয়া পাটলীপুত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভেদনীতির দ্বারা শত্রুকে দমন করিতে পারিলে, দণ্ডনীতি সমীচীন নহে। যেমন রাক্ষসের সঙ্গে, তেমনই অন্যান্য মিত্ররাজাদের সঙ্গেও ভেদ ঘটিয়া যাহাতে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তার চেষ্টাতেও চাণক্য মন দিলেন। তাঁহার চর কেহ কেহ রাক্ষসের শিবিরে গেল। তারপর চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী *

---

* চন্দ্রগুপ্তের উত্থান বা উন্নতির সঙ্গে যাঁহাদের পদোন্নতি হইয়াছে।

প্রধান প্রধান বিশ্বস্ত রাজপুরুষও কেহ কেহ চাণক্যের পরামর্শে পাটলপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চাণক্যের সদম্ভ কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, অথবা ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাক্ষস এবং মলয়কেতুর পক্ষে তাঁহারা আসিতে চান, এইরূপ ছল করিয়া তাঁহারা গিয়া রাক্ষসের সঙ্গে মিলিত হইলেন। চাণক্যের চরেরা গিয়া তাঁহার আদেশ যখন যেরূপ জানাইবে, তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

(২)

জীর্ণগৃহ; গৃহমধ্যে যজ্ঞের অগ্নি জ্বালিবার জন্য শুষ্ক গোময় এবং তাহা ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহৃত গোময়চূর্ণ-জড়িত প্রস্তর খণ্ড সব এখানে ওখানে পড়িয়া আছে। কোথাও রাশি রাশি কুশের স্তূপ রহিয়াছে। বাহিরে সেই জীর্ণগৃহের চাল নামিয়া পড়িয়াছে,—স্তূপে স্তূপে সমিধ সেই চালের নীচে যেন চালের প্রান্তভাগ ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। তার মধ্যে চাণক্য বসিয়া এত বড় সাম্রাজ্যটা ভাঙ্গাগড়ার উপায় চিন্তা করিতেছেন!

রাজাধিরাজের প্রধান মন্ত্রী—যাঁহার বুদ্ধিবলই সেই রাজাধিরাজের রাজ-সিংহাসনের একমাত্র আশ্রয়—সেই মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। তাঁহার বাস-গৃহের এমন শ্রী কেন? প্রতিভা যত বড়ই হউক, রাজপ্রদত্ত বিভব ও ঐশ্বর্য্যের ভোগাড়ম্বর যাঁহার কাম্য হয়, তিনি রাজপ্রসাদের দিকে কিছু দৃষ্টি না রাখিয়া পারেন না, কিছু না কিছু রাজার মন রাখিয়া তাঁহাকে চলিতেই হয়। কিন্তু দীনতায় তিনি অভ্যস্ত ও সন্তুষ্ট, ভোগাড়ম্বরে যিনি একেবারে নিস্পৃহ, রাজার প্রসাদ তিনি তৃণবৎ অনাদর করিতে পারেন। কিছুতে পাছে আত্ম-মহিমা বিস্মৃত হইয়া রাজার তুষ্টিবিধানে প্রয়াস পাইতে হয়, তাই চাণক্য সমস্ত ভোগাড়ম্বর একেবারে অবজ্ঞা করিয়া এই জীর্ণগৃহে দীন ব্রাহ্মণের ন্যায়ই বাস করিতেন। নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই মাত্র তাঁহার লক্ষ্য ছিল, নিজের জন্য কাম্য তাঁহার কিছুই ছিল না। রাজার প্রধান অমাত্যপদের শক্তি বা গৌরব ও তিনি আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। সে পদেও সুদক্ষ রাক্ষসকে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, এই অভিপ্রায়ই তাঁহার ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই এই অতি নির্ম্মম নীতিসংগ্রাম তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণের নির্ম্মম কূটনীতি যত

গর্হিত বলিয়াই আমাদের মনে হউক, তাঁহার ত্যাগ ও নিস্পৃহতাও জগতে অতুলনীয় সন্দেহ নাই।

গৃহের বাহিরে চাণক্যের শিষ্য শাঙ্গরব গুরুর আদেশ অপেক্ষা করিতেছিল। একটি ব্রাহ্মণ যমপট * হাতে লইয়া গান করিতে করিতে গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিষ্য কহিল, "এখানে নয় ঠাকুর, অন্যত্র যাও। এখানে কাহারও প্রবেশ নিষেধ।

ব্রাহ্মণ কহিল, "কেন, এ কার গৃহ।"

"চাণক্যঠাকুরের।"

"বটে! আমিও ব্রাহ্মণ, তিনিও ব্রাহ্মণ,—তিনি যে আমার ধর্ম্মভাই। তা আমাকে প্রবেশ করিতে দেও, কিছু ধর্ম্ম উপদেশ আমি তাঁহাকে দিব।"

শিষ্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "ধিক মূর্খ! আমাদের গুরু চাণক্য অপেক্ষাও কি তুমি অধিক ধর্ম্মবিৎ যে তাঁহাকে উপদেশ দিবে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ওহে, সকলে সব জানে না। এমনও কত বিষয় থাকিতে পারে, যা হয়ত তিনি জানেন না, আমি জানি।"

"বটে! আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তুমি অস্বীকার করিতে চাও?"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাদের গুরুদেব ত সর্ব্বজ্ঞ। তা তিনি কি বলিতে পারেন, চন্দ্র কার অপ্রিয়?"

"ওসব জানিয়া তাঁর কি লাভ হইবে?"

"কি লাভ হইবে তা তিনিই জানিবেন। তুমি বোধহয় এইটুকু বুঝিতে পার যে ষোলকলায় পূর্ণ হইলেও কমল চন্দ্রের রূপে দ্বেষ করিয়া থাকে।"

গৃহমধ্য হইতে এই কথা শুনিয়া চাণক্য মনে মনে কহিলেন, "চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী কাহারা, ওই লোকটি তাহা জানে,—তাই ওর ওই কথার তাৎপর্য্য! ও আমারই একজন ছদ্মবেশ চর হইবে।"

শিষ্য কহিল, "এ সব অসম্বন্ধ প্রলাপ বলিতেছ কেন?"

"যা বলিতেছি, পরে তাহা সুসম্বদ্ধই হইবে।"

"কিসে?"

---

* যমের লীলা সম্বলিত চিত্রপট। ইহা দেখাইয়া গান করিয়া লোকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। কিছু দিন পূর্ব্বেও দেখা যাইত লোকে 'গাজিরপট' দেখাইয়া গাজিরলীলা কীর্ত্তন করিয়া পয়সা নিত।

"যদি যোগ্য শ্রোতা ও জ্ঞাতা পাই, সেই বুঝিবে।"

শিষ্য আর আপত্তি না করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। সেও বুঝিল, গূঢ় কোনও উদ্দেশ্যে এই ব্যক্তি ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

এই ব্যক্তি সত্যই চাণক্যের একজন চর, নাম নিপুণক। প্রজাদের মনের ভাব কিরূপ তাহাই জানিবার জন্য চাণক্য এই নিপুণককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিপুণক, তোমার সংবাদ কি ?"

নিপুণক উত্তর করিল, "প্রজারা সকলেই প্রায় চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত। তবে রাক্ষসের সুহৃদ কেহ কেহ আছে—চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্রশ্রী যাহাদের সহ্য হইতেছে না।"

"তাহারা কে ?"

"একজন ত ক্ষপণক * জীবসিদ্ধি !"

চাণক্য মনে মনে হাসিলেন। জীবসিদ্ধি তাঁহারই চর,—তাঁহারই কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তার জন্য রাক্ষসের সঙ্গে সৌহার্দ্দের ছল করিয়া তাঁহার সুহৃদ্-গণের সঙ্গে ভাব রাখিয়া চলিত। চাণক্যের এমনই ব্যবস্থা ছিল যে তাঁহার চরেরাও সকলে সকলকে জানিত না।

"তারপর—আর কে ?"

"রাক্ষসের প্রিয় বয়স্য কায়স্থ শকটদাস।"

"হুঁ !—তারপর ?—আর কেউ আছে ?"

"আর একজন প্রধান লোক আছে, রাক্ষসের পরমবন্ধু শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস। "ইঁহারই গৃহে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া রাক্ষস পলায়ন করেন।"

"বটে ! রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র চন্দনদাসের গৃহে আছে ! কি প্রকারে জানিলে ?"

"এই দেখুন রাক্ষসের অঙ্গুরীমুদ্রা † ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন।" এই বলিয়া নিপুণক একটি মুদ্রা চাণক্যের হাতে দিল। চাণক্য মুদ্রাটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ইহা রাক্ষসের মুদ্রাই বটে। রাক্ষসের নাম ইহাতে অঙ্কিত আছে। মুদ্রাটি হস্তগত হইল, অনেক কাজ ইহাতে হইবে। চাণক্য মনে মনে বড় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "কোথায় কি প্রকারে এই মুদ্রা পাইলে নিপুণক ?"

---

* বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসী।

† অঙ্গুরী সংলগ্ন নামাঙ্কিত সিলমোহর। এই মুদ্রার সাহায্যেই চাণক্য রাক্ষসের অবিশ্বস্ততার কয়েকটি বড় প্রমাণ মলয়কেতুর নিকটে উপস্থিত করান এবং তাহাই অভীষ্ট ভেদ ঘটিবার পক্ষে প্রধান কারণ হয়। এইজন্যই নাটকের নাম 'মুদ্রারাক্ষস' হইয়াছে।

নিপুণক কহিল, "সংবাদ সংগ্রহের জন্য যমপট লইয়া ঘরে ঘরে আমি গান করিয়া ফিরি। আজ চন্দনদাসের গৃহে গিয়াছিলাম। আমি যমপট দেখাইয়া গান করিতেছি, সহসা অন্তঃপুর হইতে একটি বালক বাহির হইয়া আসিল। শঙ্কিত স্বরে—'আহা বাহিরে গেল! বাহিরে গেল!' এই বলিতে বলিতে একটি স্ত্রীলোক ঈষৎ মুক্ত দ্বার হইতে হাত ও মুখ বাড়াইয়া বালককে টানিয়া নিলেন। অনবধান বশতঃ এই অঙ্গুরীমুদ্রাটি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তিনি লক্ষ্য করিলেন না। আমি তুলিয়া নিয়া দেখিলাম, ইহাতে রাক্ষসের নাম অঙ্কিত আছে। বুঝিলাম, এই রমণী ও বালকই রাক্ষসের স্ত্রী ও পুত্র। তার পরমসুহৃৎ চন্দন-দাসের গৃহেই তাহারা গুপ্তভাবে আছে।"

নিপুণককে বিদায় করিয়া দিয়া চাণ্যক্য একটু চিন্তা করিলেন। তারপর শিষ্য শঙ্গ‍র্রবকে ডাকিয়া কহিলেন, "মসীপাত্র ও একখানি পত্র লইয়া আইস।"

শাঙ্গ‍র্রব মসীপাত্র এবং পত্র আনিয়া দিল। "এই পত্রদ্বারাই রাক্ষসকে জয় করিব!" মনে মনে এই বলিয়া চাণক্য সেই পত্রে কি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় রাজপ্রতিহারী * শোনোত্তরা আসিয়া কহিল, "আর্য্য, জয় হউক!"

"এমন সময় এই শুভ জয়শব্দ গ্রহণ করিলাম!—কি সংবাদ শোনাত্তরা? কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?"

শোনোত্তরা উত্তর করিল, "দেব চন্দ্রশ্রী চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, আপনার আদেশে মহারাজ পর্ব্বতকের পারলৌকি কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিবেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে সব অলঙ্কার অঙ্গে পরিতেন, তাহা তিনি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন।"

চাণক্য কহিলেন, "ভাল, তাই করুন। তবে তাঁহাকে বলিও, সুপরীক্ষিত সাধু কয়েকজন ব্রাহ্মণকে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইতেছি। তাঁহাদেরই সেই অলঙ্কার দান করিলে আমি সুখী হইব।" 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শোনোত্তরা বিদায় হইল। চাণক্য তখনই শাঙ্গ‍র্রবকে ডাকিয়া কহিলেন, "শাঙ্গ‍র্রব, বিশ্বাবসুদের তিন ভ্রাতাকে গিয়া বল, মহারাজের নিকট হইতে এই অলঙ্কার লইয়া এখনই তাঁহারা আমার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করেন।"

বিশ্বাবসুরা চাণক্যেরই লোক। এই আভরণের সাহায্যে তাহাদের দ্বারা কোনও গূঢ় কার্য্যসিদ্ধির অভিপ্রায় চাণক্যের ছিল।

---

* সংবাদাদি প্রেরণের জন্য নিযুক্ত—সর্ব্বদা রাজার নিকটে অবস্থিত অনুচরের নাম প্রতিহার, স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহারী। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

পত্রখানি শেষ করিয়া চাণক্য আবার শাঙ্গ´রবকে ডাকিয়া কহিলেন, "শাঙ্গ´রব, যতই যত্ন করিয়া লিখুক, ব্রাহ্মণের হাতের অক্ষর তেমন স্পষ্ট হয় না। তুমি সিদ্ধার্থককে গিয়া বল, কায়স্থ শকটদাসের দ্বারা এই পত্রখানি লিখাইয়া আমার নিকট লইয়া আইসে। শিরোনাম লিখিবার প্রয়োজন কিছু নাই। আমি যে লিখিতে বলিয়াছি, একথাও যেন শকটদাসকে না বলা হয়।"

শাঙ্গ´রব পত্র লইয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধার্থক চাণক্যেরই একজন চর। শকটদাস যে রাক্ষসের মিত্র তাহা চাণক্য পূর্ব্বেই জানিতেন। শকটদাসের কার্য্যাদির উপরে লক্ষ্য রাখিবার জন্য চাণক্য সিদ্ধার্থককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থক মিত্রের ন্যায় শকটদাসের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিত।

কতক্ষণ পরে সিদ্ধার্থক পত্র লেখাইয়া লইয়া আসিল। চাণক্য রাক্ষসের সেই মুদ্রাদ্বারা পত্রখানি মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া নিলেন। তারপর কহিলেন, "সিদ্ধার্থক, একটি কাজ তোমাকে করিতে হইবে। শকটদাসকে এখনই রাজার আদেশে ঘাতকেরা শূলে দিবার জন্য বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে। তুমি সেই বধ্যভূমিতে গিয়া ডানচক্ষু টিপিয়া ঘাতকের ইঙ্গিত করিবে। ঘাতকেরা তাহাতে ভয়ের ছলে এদিক ওদিক পলাইতে আরম্ভ করিবে। তখন তুমি শকটদাসকে লইয়া নগর ছাড়িয়া একেবারে রাক্ষসের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইবে। রাক্ষস যেন বুঝিতে পারেন, সৌহার্দ্দবশতঃই তাঁর পরমসুহৃৎ শকটদাসকে তুমি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁর নিকটে লইয়া গিয়াছ। তিনি এজন্য যে পুরস্কার তোমাকে দেন, তাহা গ্রহণ করিও। এই মুদ্রাটি লইয়া যাও, রাক্ষসকে দিও। এই পত্রখানাও সাবধানে তোমার কাছে রাখিবে। আমার আদেশমত যথাসময়ে যথাযোগ্য ব্যবহার ইহার করিবে।" এই বলিয়া সিদ্ধার্থকের কাণে কাণে আরও কয়েকটি কথা চাণক্য বলিয়া দিলেন।

তারপর আবার শাঙ্গ´রবক ডাকিয়া চাণক্য কহিলেন, "শাঙ্গ´রব, তুমি এখনই কালপাশিক এবং দণ্ডপাশিককে গিয়া বল, শকটদাস রাক্ষসের লোক, আমাদের অনিষ্ট চেষ্টায় আছে। রাজার আদেশ, এখনই এই দোষ ঘোষণা করিয়া যেন তাহাকে শূলে দেওয়া হয়।"

"যে আজ্ঞা গুরুদেব।"

"আরও কথা আছে। বৌদ্ধ ক্ষপণক জীবসিদ্ধি রাক্ষসের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া বিষকন্যার সাহায্যে পর্ব্বতককে হত্যা করিয়াছে। রাজার আদেশ, এই

দোষ ঘোষণা করিয়া যেন অপমানের সহিত তাহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়।"

গুরুর আদেশ লইয়া শাঙ্গ´রব বাহিরে গেল। সিদ্ধার্থকও প্রস্থান করিল। কতক্ষণ পরে শাঙ্গ´রব ফিরিয়া আসিল। চাণক্য তাহাকে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আবার পাঠাইলেন।

কূটনীতিবিশারদ চাণক্য কেন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন? চন্দন-দাসের বড় ভয় হইল। তাঁহার গৃহে তখন তাঁহার অনুগত তিনজন বণিক ছিলেন। তাঁহাদের তিনি বলিলেন "যদি দেখ, চাণক্যের লোক আবার আমার গৃহে আসিতেছে, তখনই রাক্ষসের স্ত্রীপুত্রকে অন্যত্র কোনও নিরাপদ স্থানে সাবধানে সরাইয়া দিবে।"

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস শাঙ্গ রবের সঙ্গে চাণক্যের কুটীরে আসিলেন।

এ কথা ওকথার পর চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জান শ্রেষ্ঠী, প্রজারা কি কেহ চন্দ্রগুপ্তের দোষ ধরিয়া ভূতপূর্ব্ব নন্দরাজাদের স্তুতিবাদ করে?"

চন্দনদাস উত্তর করিলেন, "আ ছিছি! একি পাপকথা! শারদপূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রগুপ্তকে দেখিয়া প্রজারা যত আনন্দিত হয়, সেই চন্দ্রশ্রী দেখিয়াও যে তত আনন্দিত হয় না!"

"ভাল, যদি তাই হয়, তবে প্রীত প্রজাদের নিকট রাজা প্রতিপ্রিয় * কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন নাকি?"

চন্দনদাস উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা করুন, কত অর্থ আমাদের নিকট চান।"

চাণক্য হাসিয়া কহিলেন, "শ্রেষ্ঠী, এ নন্দের রাজ্য নয়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য। প্রজাদের সঙ্গে নন্দের অর্থেরই সম্বন্ধ ছিল, অর্থেই তিনি প্রীত হইতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যে তোমাদের সুখেই সুখী।"

"আর্য্য-মহারাজের কৃপায় আমরা যথেষ্ট অনুগৃহীত।"

"কিন্তু তাঁহার প্রীতি কিসে হইবে, তাহা ত জিজ্ঞাসা করিলে না শ্রেষ্ঠী?"

"আজ্ঞা করুন আর্য্য, কিসে তাঁহার প্রীতি হইবে।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "সংক্ষেপে এই বলা যায়, রাজার অবিরুদ্ধ ব্যবহারেই রাজার প্রীতি হয়।"

"রাজার বিরোধী কাহাকেও কি আর্য্য জানেন?"

---

* প্রিয়বস্তুর প্রতিদানে প্রিয়বস্তু।

চাণক্য ধীরস্বরে উত্তর দিলেন, "প্রথমতঃ—তুমিই ত একজন।"

"পাপ শান্তি হউক! পাপ শান্তি হউক! অগ্নির সঙ্গে কি তৃণের বিরোধ সম্ভব হয় আৰ্য্য ?"

চাণক্য কহিলেন, "তুমিই ত এইরূপ বিরোধ করিতেছ চন্দনদাস। রাজার শত্রু রাক্ষসের গৃহজনকে তুমি নিজের গৃহে স্থান দিয়াছ ?"

"মিথ্যা কথা আৰ্য্য! কোনও অনভিজ্ঞ লোকই আপনাকে এইরূপ বলিয়াছে।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "তা ভয় কেন পাইতেছ শ্রেষ্ঠী ? এমন হইয়া থাকে। রাজবিপর্যয় ঘটিলে পূর্ব্বরাজার অনুচরেরা পৌরজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের গৃহে পরিজন ফেলিয়া পলায়ন করে।"

চন্দনদাস কহিলেন, "তা সত্য। রাক্ষসের পলায়নের সময় তাঁর পরিবার আমার গৃহে ছিলেন বটে।"

চাণক্য প্রত্যুত্তরে করিলেন, "তুমি একবার বলিলে সবই মিথ্যা,—আবার বলিতেছ, পলায়নের সময় রাক্ষসের পরিবার তোমার গৃহে ছিলেন। দুটি কথা পরস্পর বিরোধী নয় কি ?"

চন্দনদাস অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আৰ্য্য, সত্য বলিতে কি এ সব আমার বাক্ ছল মাত্র।"

চাণক্য কহিলেন, "মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ছল কথা গ্রহণ করেন না। এখন তবে রাক্ষসের গৃহজনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অছল হও!"

চন্দনদাস কহিলেন, "আৰ্য্য, আমি নিবেদন করিতেছি, তখন রাক্ষসের পরিবার আমার গৃহে ছিলেন।"

"এখন তবে কোথায় আছেন ?"

"জানি না।"

চাণক্য হাসিয়া কহিলেন, "জান না বটে! শ্রেষ্ঠী! মাথার উপরে বিপদ, কিন্তু প্রতিকার বহুদূরে। সাবধান! রাক্ষস কখনও চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে, একথা মনেও করিও না।"

তখন বাহিরে বড় কোলাহল উঠিল। চাণক্য কহিলেন, "শার্ঙ্গরব! কিসের কোলাহল ও ?"

শার্ঙ্গরব গৃহ মধ্যে আসিয়া কহিল, "গুরুদেব, মহারাজের আদেশে রাজার অহিতকারী ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে অপমানে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে।"

চাণক্য কহিলেন, "দেখিলে চন্দনদাস! এরূপ অহিতকারীর কিরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড রাজা দিতে পারেন? এখনও বলিতেছি, সুহৃদের বাক্য গ্রহণ কর। রাক্ষসের পরিজনদের সমর্পণ কর। চিরকাল বিচিত্র রাজপ্রসাদ ভোগ করিবে।"

চন্দনদাস উত্তর করিলেন, "আমার গৃহে রাক্ষসের পরিবার নাই।"

বাহিরে আবার কোলাহল উঠিল। গুরুর আদেশে আবার শার্ঙ্গরব আসিয়া জানাইল, রাজদ্রোহী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দিবার জন্য ঘাতকেরা লইয়া যাইতেছে।

চাণক্য আবার কহিলেন, "শুনিলে শ্রেষ্ঠী, রাজার অহিত করিলে, রাজা তাকে কেমন তীক্ষ্ণ দণ্ড দিয়া থাকেন? রাক্ষসের স্ত্রীপুত্রকে তুমি গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছ, এ অপরাধ মহারাজ কখনও মার্জ্জনা করিবেন না। তাই বলিতেছি পরের পুত্রকলত্রের বিনিময়ে নিজের পুত্রকলত্র ও আত্মজীবন রক্ষা কর!"

চন্দনদাস দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "কিসের ভয় দেখাইতেছেন আর্য্য? রাক্ষসের পরিজন গৃহে থাকিলেও তাদের সমর্পণ করিতাম না। এখন ত তারা নাই-ই।"

"চন্দনদাস! ইহাই তবে তোমার সংকল্প?"

"হাঁ, ইহাই আমার স্থির সংকল্প!"

মনে মনে চাণক্য চন্দনদাসের সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, "আহা, অর্থলাভ সুলভ হইলেও পরের জন্য যে জীবন দেওয়া—মহারাজ শিবি ভিন্ন কে আর অমন দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারে?" প্রকাশ্যে আবার চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তবে তোমার সংকল্প চন্দনদাস?"

"হাঁ, এই আমার সংকল্প!"

"দুরাত্মা! দুষ্ট বণিক! থাক্ তবে! রাজরোষের ফলভোগ কর্!" অতি ক্রোধের ভাবে এই কথা বলিয়া চাণক্য শার্ঙ্গরবকে ডাকিয়া কহিলেন, "শার্ঙ্গরব! দুর্গপালকে গিয়া বল, এই বণিকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া সপরিবারে ইহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। আমি মহারাজের নিকটে গিয়া এখনই সব জানাইব। তিনি নিশ্চয়ই ইহার প্রাণদণ্ড ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড আদেশ করিবেন!"

"আসি তবে আর্য্য!" এই বলিয়া শার্ঙ্গরবের সঙ্গে চন্দনদাস প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে অতি আনন্দিত চিত্তে আপন মনে তিনি কহিলেন, "আহা, আজ কি সৌভাগ্য আমার! নিজের দোষে নয়, মিত্রের হিতের জন্য আমার বিনাশ হইল!"

চাণক্যও আপন মনে কহিলেন, "রাক্ষসকে এইবার লাভ করিতে পারিব। রাক্ষসের বিপদে অপ্রিয় বস্তুর মতই চন্দনদাস আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে! চন্দনদাসের বিপদে রাক্ষসও আপনার প্রাণ তুচ্ছ মনে করিয়া আমাদের হাতে ধরা দিবে!"

৩

রাক্ষসের শিবির। বিষাদক্লিষ্ট রাক্ষস বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কেমন করিয়া প্রভুবংশের এই বিনাশের প্রতিশোধ নিয়া ব্যথিত চিত্তে কিছু শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। এমন সময় মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলি আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাক্ষস কহিলেন, "নমস্কার জাজলি! বসুন! কি সংবাদ?"

জাজলি কহিলেন, "অমাত্য, মনোদুঃখে বহুদিন আপনি সকলপ্রকার দেহ-সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুমার মলয়কেত ইহাতে যারপরনাই ব্যথিত; আজ তিনি তাঁহার নিজ অঙ্গের এই সব আভরণ পাঠাইলেন! তাঁহার নিতান্ত অনুরোধ এই গুলি আপনি অঙ্গে ধারণ করুন!"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "জাজলি, আপনি কুমারকে বলিবেন, তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া আমার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর গুণও আমি এক রকম বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু যতদিন তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন কুসুমপুরের * সুগাঙ্গপ্রাসাদে + প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, ততদিন শত্রুর আপমান-গ্রস্ত এই দীন দেহে কোনও অলঙ্কার কি প্রকারে ধারণ করিব?"

কঞ্চুকী কহিলেন, "অমাত্য, কুমার সকলকে এরূপ অনুগ্রহ করেন না। তাঁর প্রথম এই অনুরোধ আপনার অবজ্ঞা করা উচিত নয়।"

রাক্ষস কহিলেন, "কুমারের ন্যায় আপনার অনুরোধও অনতিক্রম্য। ভাল, কুমারের আজ্ঞাই তবে পালন করুন।"

কঞ্চুকী যত্নে অলঙ্কার গুলি রাক্ষসের অঙ্গে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভৃত্য প্রিয়ম্বদক আসিয়া জানাইল, জীর্ণবিষ নামক একজন অহিতুণ্ডক § অমাত্যকে সাপের খেলা দেখাইতে চায়।

রাক্ষস কহিলেন, "প্রিয়ম্বদক! এখন সাপের খেলা দেখিতে আমার কৌতূহল নাই। ওকে কিছু পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া দেও।"

---

* পাটলীপুত্রের নামান্তর। + পাটলীপুত্রের গঙ্গাতীরস্থ রাজপ্রাসাদ।

§ সাপুড়িয়া।

প্রিয়ম্বদক বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অমাত্য লোকটি বলিল, সে কেবল অহিতুণ্ডক নয়, একজন প্রাকৃতকবিও * বটে। যদি দর্শন দিবার সুবিধা আপনার না হয়, তবে অন্ততঃ তার এই পত্রটি পাঠ করুন।"

রাক্ষস পত্র লইয়া পড়িয়া দেখিলেন,—তাহাতে লেখা আছে, "কৌশলে সমগ্র কুসুমরস পান করিয়া ভ্রমর যাহা উদ্গীরণ করে, অন্যের পক্ষে তাহাই কার্য্যকর হয়।"

"এই ব্যক্তি কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া আসিয়া তাহাই আমাকে বলিতে চায়। এ দেখিতেছি আমারই চর,—বোধ হয় বিরাধগুপ্তই হইবে।"—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষস অহিতুণ্ডককে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। প্রিয়ম্বদক তাহাকে লইয়া আসিল। ভৃত্যকে এবং অন্যান্য লোকজন যাহারা ছিল, সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া রাক্ষস কহিলেন, "সখা বিরাধগুপ্ত, তুমি আসিয়াছ! ভাল, কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল। আমার নিযুক্ত চরেরা এ পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিতে পারিয়াছে, সব খুলিয়া বল।"

বিরাধগুপ্ত একে একে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য রাক্ষস যতগুলি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, চাণক্যের বুদ্ধিবলে—হায়! সবই ব্যর্থ হইয়াছে!

নগরের প্রধান সূত্রধার দারুবর্ম্মা রাক্ষসের অনুগত ছিল। নগর অধিকারের পর শুভসময়ে রাজ-সমারোহে যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজপুরীতে প্রবেশ করিবেন, তখন রাজপুরীর সংস্কারাদি কার্য্য অবশ্য হইবে। সেই সময় দারুবর্ম্মা রাজপুরীর দ্বারে একটি যন্ত্রতোরণ প্রস্তুত করিবে। যেমন রাজবেশে সজ্জিত গজারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত তোরণের নীচে আসিবেন, অমনই যন্ত্র সাহায্যে তোরণটি ফেলিয়া দেওয়া হইবে। যদি দেখা যায়, তাহাতেও চন্দ্রগুপ্ত নিহত হন নাই, তবে তখনই নিষাদী † বর্ব্বরক সেই বিষম গোলযোগের মধ্যে ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে বধ করিবে। দারুবর্ম্মা ও বর্ব্বরকের সঙ্গে রাক্ষসের চরেরা এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

এদিকে যথাসময়ে চাণক্য সূত্রধারদিগকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, "দৈবজ্ঞের

* শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ না হইয়া, স্বাভাবিক প্রতিভাবলে যে 'প্রাকৃত' বা ইতর ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারে।

† মাহুত।

কথা অনুসারে আজ অর্দ্ধরাত্রির সময় চন্দ্রগুপ্ত রাজপুরীতে প্রবেশ করিবেন। তোমরা দ্বার হইতে সমস্ত রাজভবন সংস্কার কর।”

সূত্রধারেরা কহিল, “মহারাজ রাজভবনে প্রবেশ করিবেন জানিয়া দারুবর্ম্মা পুরীদ্বারে কনক-তোরণ প্রস্তুত করিয়াছেন, এখন পুরীর ভিতর মাত্র সংস্কার করিলেই চলিবে।”

দারুবর্ম্মা আপনাহইতে আগেই কেন তোরণ নির্ম্মাণ করিল? চাণক্যের মনে সন্দেহ হইল। বস্তুতঃ দারুবর্ম্মা এইস্থলে ভুলই করিয়াছিল। আদেশ অপেক্ষা না করিয়া তোরণনির্ম্মাণ করিলে এরূপ অবস্থায় এরূপ সন্দেহ হইতেই পারে—বিশেষ চাণক্যের মনে। যাহা হউক, চাণক্য কিছু বলিলেন না,—তোরণের পরীক্ষাও কিছু করিলেন না। বিষকন্যার প্রয়োগে পর্ব্বতক বিনষ্ট হইলে কুমার মলয়কেতু পলায়ন করেন বটে, কিন্তু পর্ব্বতকের ভ্রাতা বৈরোচক পাটলীপুত্রেই রহিলেন। ভ্রাতার সঙ্গে সন্ধির সময় অনুসারে তিনি এখন অর্দ্ধেক রাজ্য দাবী করিতেছিলেন। চাণক্য রাত্রিতেই তাঁহাকে আনিয়া চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধেক তাঁহাকে ভাগ করিয়া দিলেন। বাহিরে ঘোষণা করা হইয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তই অর্দ্ধরাত্রির সময় রাজপুরীতে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু এখন চাণক্য প্রস্তাব করিলেন, বৈরোচকই প্রথমে রাজপুরীতে প্রবেশ করুন। বৈরোচক আনন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে রাজবেশ ধরিয়া, রাজমুকুট পরিয়া, বৈরোচক হস্তিপৃষ্ঠে উঠিলেন। চন্দ্রগুপ্তের অনুচরগণ সকলে সঙ্গে চলিল। রাত্রিকাল, আলোর তেমন ভাল ব্যবস্থা করা হইল না। সকলেই মনে করিল, চন্দ্রগুপ্ত রাজপুরীতে প্রবেশ করিতেছেন। নিষাদী বর্ব্বরক তাহার গুপ্তছুরী বাহির করিল,—দারুবর্ম্মা যন্ত্রতোরণের কাছে রহিল। তোরণের নিকটে আসিয়া সহসা বর্ব্বরকেরই অনবধানতা বশতঃ হস্তীর গতি দ্রুততর হইল,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় যন্ত্রতোরণ বৈরোচকের উপরে না পড়িয়া হস্তীর পশ্চাতে পড়িল। দারুবর্ম্মা অমনই ছুরী বাহির করিয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। বর্ব্বরকও তার ছুরী লইয়া রাজার দিকে ফিরিল। ব্যস্ততা হেতু দারুবর্ম্মার ছুরী রাজদেহে না পড়িয়া বর্ব্বরকের বুকে বিদ্ধ হইল। দারুবর্ম্মা অমনই ক্ষিপ্রহস্তে যন্ত্রতোরণ-চালনের মূলবীজ লৌহকীলকটি তুলিয়া লইয়া তার দ্বারা বৈরোচককে মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। সেই আঘাতেই বৈরোচকের মৃত্যু ঘটিল। অনুচরগণ

অগ্রসর হইয়া তখনই দারুবর্ম্মাকে হত্যা করিল। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য যে কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে একসঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈরোচক এবং তাঁহারই কার্য্য-সহায়ক দারুবর্ম্মা ও বর্ব্বরক, সকলেই বিনষ্ট হইল। নীতির চালে চাণক্যেরই জয় হইল।

তারপর রাজবৈদ্য অভয়দত্ত রাক্ষসের বশীভূত হইয়া একদিন ঔষধের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের জন্য লইয়া গেলেন। দৈবাৎ চাণক্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঔষধের বিবর্ণতা দেখিয়া চাণক্যের মনে সন্দেহ হইল। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে নিষেধ করিয়া তখনই বৈদ্যকে সেই ঔষধ পান করিতে আদেশ করিলেন। বিষে বৈদ্যের মৃত্যু হইল, চন্দ্রগুপ্ত রক্ষা পাইলেন।

চন্দ্রগুপ্তের শয়ন-রক্ষক প্রমোদক রাক্ষসের অর্থে বশীভূত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের বিনাশে সহায়তা করিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। অর্থ পাইয়া সহসা মূর্খ আমোদপ্রমোদে এত ব্যয় আরম্ভ করিল যে সন্দিগ্ধ চাণক্য একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, এত অর্থ তুমি কোথায় পাইলে? প্রমোদক সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। কোনও কৌশলে চাণক্য তাহাকেও শমনসদনে পাঠাইলেন।

রাক্ষস আর একটি আয়োজন করিয়াছিলেন! রাজার শয্যাগৃহের নিম্নে একটি সুরঙ্গ ছিল। চাণক্য কি চন্দ্রগুপ্ত কেহই তাহা জানিতেন না। রাক্ষসের নিযুক্ত বীভৎসক প্রমুখ কতিপয় কর্ম্মচারী নিদ্রিত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবে, এই অভিসন্ধি করিয়া আহার্য্য প্রভৃতি লইয়া সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। প্রথম যে রাত্রিতে চন্দ্রগুপ্ত রাজভবনে প্রবেশ করেন, চাণক্য রাজার শয্যাগৃহ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলেন। তিনি দেখিলেন, গৃহতলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে একটি পিপীলিকা অন্নকণা লইয়া বাহির হইতেছে। চাণক্য স্থির করিলেন, অবশ্যই এখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে এবং তাহাতে শত্রুচর কেহ কেহ দুরভিসন্ধিতে লুকাইয়া রহিয়াছে। তিনি লোক ডাকিয়া গৃহের মধ্যে ও চারিধারে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। বাহির হইবার পথ না পাইয়া অগ্নিতাপে বীভৎসক প্রমুখ কর্ম্মচারীরা সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

বিরাধগুপ্ত একে একে এই সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাক্ষস বড় ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "হায়! বৃথা আমাদের সব চেষ্টা! চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টের জন্য যাহাই করিতে যাই, তার অদৃষ্টের গুণে তাহাতে তার শুভ ফলই ফলে।"

বিরাধগুপ্ত কহিলেন, "যাহাই হউক অমাত্য, যে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করা কোনও মতেই উচিত নয়। পণ্ডিতেরা বলেন, বিঘ্নের ভয়ে কাজ যে আরম্ভ করে না, সে অধম। কাজ আরম্ভ করিয়া বিঘ্নের বাধায় যে ক্ষান্ত হয়, সে মধ্যম। আর পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়াও প্রারব্ধ কার্য্য যে পরিত্যাগ করে না, তাহারই গুণ উত্তম। তারপর দেখুন, শেষ নাগ যে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাহাতে কি তাঁহার ক্লেশ হয় না? কিন্তু তবু ত পৃথিবীকে তিনি ফেলিয়া দিতেছেন না? অবিরতগতিতে দিনগতির কি শ্রান্তি বোধ হয় না? কিন্তু তবু তিনি নিশ্চল হইয়া কখনও থাকেন না। শ্লাঘ্যজনের পক্ষে অঙ্গীকারত্যাগ করাই লজ্জার কথা,—অঙ্গীকার পালনই সাধুর গোত্রব্রত।"

রাক্ষস দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথাই বলিয়াছ, সখা! প্রারব্ধ কার্য্য ত্যাগ করা কখনও উচিত নয়। তারপর—আর কিছু কি ঘটিয়াছে?"

"ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে চাণক্য নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে?"

"কেন?"

"আপনার কথামত বিষকন্যার দ্বারা সে পর্ব্বতককে বধ করিয়াছিল, এই দোষ ঘোষণা করিয়া।"

রাক্ষস কহিলেন, "সাধু চাণক্য সাধু! নিজের অপযশ আমার স্কন্ধে চাপাইলে, আবার অর্দ্ধরাজ্য-ভাগী পর্ব্বতককেও বিনাশ করিলে। এক নীতিবীজে কত ফল তোমার ফলিল!—তারপর?

"দারুবর্ম্মার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলিয়া শকটদাসকে শূলে দিবার আদেশ হইয়াছে।"

"হায় শকটদাস! প্রভুর হিতের জন্য প্রাণ দিলে, তোমার জন্য শোক করা উচিত নয়। শোচনীয় আমরাই, কারণ নন্দবংশ ধ্বংস হইবার পর এখনও বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

বিরাধগুপ্ত কহিলেন, "অমাত্য, আর কিছুর জন্য না হউক, প্রভুবংশের কথা স্মরণ করিয়া প্রতিশোধের জন্যও আমাদের এখনও জীবনধারণ করা প্রয়োজন।"

"তা ঠিক! তারপর আর কিছু হইয়াছে?"

"আপনার স্ত্রীপুত্রকে সমর্পণ না করায় চন্দনদাসের গৃহসম্পত্তি অপহরণ করিয়া চাণক্যবটু সপরিবারে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে!"

রাক্ষস সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "হায়, এ যে আমার নিজেরই সপরিবারে কারাদণ্ডের মত হইয়াছে!"

এমন সময় সিদ্ধার্থকের সঙ্গে শকটদাস আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি আনন্দে রাক্ষস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সখা! এস এস! আহা, কে সে, যার কার্য্যে আজ এই আনন্দ লাভ করিলাম?"

শকটদাস সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "আমার প্রিয়সুহৃদ্ এই সিদ্ধার্থক বধ্যভূমিতে গিয়া ঘাতকদের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।"

আনন্দের উচ্ছাসে আত্মবিস্মৃত হইয়া রাক্ষস কহিলেন, "সিদ্ধার্থক! তুমি আজ যে আনন্দ আমাকে দিয়াছে, তার প্রতিদান কিছুই হইতে পারে না। এই অলঙ্কারগুলি তোমাকে দিতেছি, ইহা তুমি গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া মলয়কেতুর প্রদত্ত বহুমূল্য সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া রাক্ষস সিদ্ধার্থককে দিলেন।

সিদ্ধার্থক অলঙ্কার গুলি লইয়া বিনীতভাবে কহিল, "অমাত্য, আমি এখানে নূতন আসিয়াছি। কোথায় কার কাছে এগুলি রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব জানি না। আমার প্রার্থনা—অমাত্যের মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া এগুলি অমাত্যের ভাণ্ডারেই রক্ষিত হউক। যখন আমার প্রয়োজন হইবে, আমি লইব।"

এই বলিয়া অলঙ্কারগুলি সরাইয়া দিবার সময় তার অঙ্গুলীতে রাক্ষসের মুদ্রা দেখিয়া শকটদাস কহিল, "একি! এ যে আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা!"

রাক্ষসও দেখিয়া কহিলেন,—"তাই ত! আমার এ মুদ্রা তুমি কোথায় পাইলে শকটদাস? যখন নগর হইতে আসি, ব্রাহ্মণী এইটি তাঁহার কাছে রাখিয়াছিলেন। তুমি ইহা কোথায় পাইলে?"

সিদ্ধার্থক উত্তর করিল, "শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহদ্বারে একদিন এইটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

"তা হইবে। কেমন করিয়া মুদ্রাটি যেন বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল।"

শকটদাস কহিল, "সখা সিদ্ধার্থক, এই মুদ্রাটি তুমি অমাত্যকে দেও,—অর্থদানে অমাত্য তোমাকে পুরিতুষ্ট করিবেন।

সিদ্ধার্থক উত্তর করিল, "অমাত্য মুদ্রাটি গ্রহণ করিলেই আমার যথেষ্ট পরিতোষ হইবে, আর কোনও পারিতোষিক ইহার জন্য চাই না।"

সিদ্ধার্থক মুদ্রাটি রাক্ষসের হস্তে দিল। রাক্ষস শকটদাসকে তাহা দিয়া

কহিলেন,"শকটদাস,মুদ্রাটি তুমিই রাখ। আমার পত্রাদি লেথার ভার ত তোমারই হস্তে থাকিবে, ইহা দ্বারাই তুমি সে সব মুদ্রাঙ্কিত করিও।"

চাণক্য যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। এই জন্যই তিনি সিদ্ধার্থকের দ্বারা শকটদাসের উদ্ধার সাধন করাইয়া ছলেন এবং মুদ্রাটি সহ তাহাকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শকটদাস রাক্ষসের লেথক হইল, এবং মুদ্রাটিও তাহার হস্তে রহিল। এখন তাঁহার সেই কপটপত্র যথন ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে, তখন সে পত্র যে রাক্ষসের আদেশে শকটদাসেরই লেখা এবং তাহার দ্বারাই রাক্ষসের মুদ্রায় অঙ্কিত করা, ইহা সহজেই সকলে বিশ্বাস করিবে।

সিদ্ধার্থক কহিল, "অমাত্য, পাটলীপুত্রে আর আমার ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। আপনার আদেশ হইলে এখানে থাকিয়া আপনার শ্রীচরণসেবাই করিব।"

রাক্ষস কহিলেন, তাই তবে থাক। যাও শকটদাস, সিদ্ধার্থককে লইয়া বিশ্রাম কর গিয়া।" সিদ্ধার্থককে লইয়া শকটদাস প্রস্থান করিলেন।

রাক্ষস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর? আর কোনও সংবাদ আছে বিরাধগুপ্ত? চন্দ্রগুপ্তের রাজপুরুষদের মধ্যে যে ভেদনীতির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কিছু সফলতা দেখা গিয়াছে?"

বিধাধগুপ্ত উত্তর করিলেন, "হাঁ অমাত্য! এইদিকেই যাহা কিছু সুখের সংবাদ আছে। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীরই ভেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।"

"বটে! তা কি প্রকারে হইল?"

বিরাধগুপ্ত কহিলেন, "মলয়কেতুর পলায়নের পর হইতে আপনাকে নিঃশঙ্ক মনে করিয়া চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। চাণক্যও জয়গর্ব্বে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া এখন চন্দ্রগুপ্তকে গ্রাহ্য করেন না। যখন তখন তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার চিত্তে নিঃসঙ্কোচে বিরক্তি উৎপাদন করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া আসিয়াছি।"

রাক্ষস যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "সখা! তুমি আবার অহিতুণ্ডকের বেশে কুসুমপুরে যাও। সেখানে বৈতালিক স্তনকলস আমার বড় সুহৃদ্। তুমি গিয়া আমার নাম করিয়া তাহাকে বলিবে,—চন্দ্রগুপ্ত যে আজকাল চাণক্যের আজ্ঞা অনুসারে চলেন না, তার প্রশংসাসূচক শ্লোক পাঠ করিয়া যেন তাঁকে তিনি উত্তেজিত করেন। তার যা ফল হয়, গোপনে উষ্ট্রারোহী দূতের দ্বারা আমাকে জানাইবে।"

বিরাধগুপ্ত প্রস্থান করিলেন। একজন রক্ষী তিনখানি অতি মূল্যবান্

অলঙ্কার আনিয়া দেখাইয়া কহিল, "অমাত্য, শকটদাস বলিলেন, কে একজন এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। আপনার ইচ্ছা হইলে রাখিতে পারেন।"

রাক্ষস দেখিয়া কহিলেন, "বাঃ! এযে অতি উত্তম ও মহামূল্য অলঙ্কার। তুমি শকটদাসকে গিয়া বল, যথোচিত মূল্য দিয়া এ গুলি যেন তিনি রাখেন।"

রক্ষী অলঙ্কার লইয়া চলিয়া গেল। এগুলি পর্ব্বতকের সেই অলঙ্কার—যাহা চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণকে দান করিতে চান এবং যাহা গ্রহণ করিতে চাণক্য বিশ্বাবসুদের তিন ভ্রাতাকে পাঠান। চাণক্য এইরূপে তাহা রাক্ষসের হস্তগত করাইলেন। কি উদ্দেশ্যে, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

(৪)

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যের ভেদ! একটা ভেদের মত ভাবই দেখা যাইতেছিল, বটে। কিন্তু এই ভেদ যে বাস্তব নয়, অভিনয় মাত্র,—একথা পাঠকবর্গকে না বলিলেও চলে! তবে এই ভেদের অভিনয়ই বা কেন? কেন, তা কে বলিতে পারে? চাণক্যের অতি গূঢ় রহস্যময় কোন্ অভিসন্ধি কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ পথে কোন্ অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হইতেছিল, কার সাধ্য তাহা সহজে ধরিতে পারে? এখন সে চেষ্টা নিরর্থক,—কার্য্যফলে আপনিই তাহা প্রকাশ পাইবে। অন্যের কথা দূরে থাক্, কেন যে গুরুতুল্য মন্ত্রীর সঙ্গে এইরূপ কপট কলহ করিতে হইবে, চন্দ্রগুপ্ত নিজেও তাহা জানিতে পারিলেন না। চাণক্য তাঁহাকে এইমাত্র বলিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে কৃত্রিম কলহ করিয়া কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে রাজকার্য্য করিবে।" চন্দ্রগুপ্ত বড় বিস্মিত হইলেন,—কেমন একটা কুণ্ঠাও বোধ করিতে লাগিলেন। একান্ত ভাবে চাণক্যের উপরে নির্ভর করায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত পরাধীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, স্বাতন্ত্র্যের শক্তি শিথিল হইতেছিল। এক একবার তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা দিবার জন্যই কি চাণক্য এইরূপ করিতে চাহিতেছেন? কিন্তু তারজন্য এরূপ বিবাদের প্রয়োজন কি! এইরূপ একটা পাতকের কাজইবা কি প্রকারে তিনি করিবেন? যাহাহউক, গুরুর আদেশ পালন করিতেই হইবে। চন্দ্রগুপ্তও এই কপট বিবাদে প্রস্তুত হইলেন।

কিছুদিন ধরিয়া খুঁটিনাটি লইয়া একটা মনান্তরের সূচনা অনেকেই লক্ষ্য করিল। (বিরাধগুপ্ত ইহাই দেখিয়া গিয়াছিলন।) এখন প্রকাশ্য একটা বিবাদে রাজা ও মন্ত্রী ভয়ে পরস্পরকে একেবারে যেন ত্যাগ করিলেন, এইরূপ একটা অবস্থা ঘটান আবশ্যক। উত্তম একটি সুযোগও উপস্থিত হইল। শারদ

পূর্ণিমা আসিল। এই সময়ে রাজধানীতে কৌমুদী-উৎসব হইত, নাগরিক নর-নারীরা নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে মত্ত হইত। রাষ্ট্রবিপ্লব, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রভৃতির জন্য নগরে নিতান্ত একটা অশান্তির অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-উৎসবের আদেশ ঘোষণা করিলেন।

নাগরিকগণের উৎসব দেখিবেন. বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত পারিষদবর্গ সহ সুগাঙ্গ প্রাসাদের উপরে রাজপথের সন্নিকটস্থ একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজপথে উৎসবের ত কিছু দেখা যাইতেছে না! চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিতভাবে কহিলেন, "কৌমুদী উৎসবের যে কোনও উদ্যোগই দেখিতেছি না! বৈহীনরা! তুমি আমার নাম ক'রয়া উৎসবের ঘোষণা করিয়াছিলে ত?"

কঞ্চুকী বৈহীনরা উত্তর করিল, "হাঁ মহারাজ, করিয়াছিলাম বই কি?"

"তবে কি পৌরজনেরা আমার আদেশ পালন করিল না?"

"একি পাপ কথা! তাও কি হইতে পারে! মহারাজের আদেশ কখনও লঙ্ঘিত হয় নাই, আজ কি হইবে?"

"তবে তাহারা এখনও কৌমুদী উৎসবে প্রবৃত্ত হয় নাই কেন? দেখ, কোথাও উৎসবের আয়োজন নাই।"

"তাই বটে, মহারাজ!"

"কিরূপ?"

"এই—যা দেখিতেছি।"

"এর কারণ কি? স্পষ্ট করিয়া বল।"

"কৌমুদী উৎসব নিষিদ্ধ হইয়াছে?"

"নিষিদ্ধ হইয়াছে! সে কি? কে নিষেধ করিয়াছে?"

বৈহীনরা করজোড়ে কহিল, "দেব, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিব না।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "অবশ্য আর্য্য চাণক্য এই রমণীয়দৃশ্য হইতে দর্শকদের বঞ্চিত করেন নাই।"

বৈহীনরা উত্তর করিল, "জীবিতকাম আর কে এমন আছে যে মহারাজের শাসন অতিক্রম করিবে?"

"শোনোত্তরা! আমি বসিতে চাই।"

প্রতিহারী শোনোত্তরা অগ্রসর হইয়া কহিল, "এই যে দেব, আপনার আসন।—বসুন।"

চন্দ্রগুপ্ত রাজাসনে বসিয়া আবার কহিলেন, বৈহীনরা! আমি আর্য্য চাণক্যকে একবার দেখিতে চাই।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বৈহীনরা প্রস্থান করিল। চাণক্যের গৃহে গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল।

চাণক্য আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৃষলের * জয় হউক!"

চন্দ্রগুপ্ত আসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন, "আর্য্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

চাণক্য কহিলেন, "ওঠ বৎস! যার শিলাস্তস্খলিত সুরনদীর ধারাপাত হইতে সুশীতল শীকররাশি বিক্ষিপ্ত হইতেছে, শৈলেন্দ্র সেই হিমালয় হইতে বহুরাগ-রঞ্জিত মণিময় দক্ষিণসাগরের কুল পর্য্যন্ত যত নৃপতি আছে, সকলে ভীত হইয়া তোমার চরণযুগলে এইরূপ প্রণত হউক! তোমার পদাঙ্গুলীর রন্ধ্র ভাগ তাহাদের চূড়ারত্ন-প্রভায় পরিপূর্ণ হউক্!"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "আর্য্যের প্রসাদে সমস্তই আমি উপভোগ করিতেছি। আর্য্য এখন উপবেশন করুন।"

উভয়ে যথাযোগ্য আসনে বসিলেন। চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃষল * কি অভিপ্রায়ে আমাকে আহ্বান করিয়াছে?"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "আর্য্যের দর্শনে আপনাকে অনুগৃহীত করিব, এই অভিপ্রায়,—আর কি?"

চাণক্য হাসিয়া কহিলেন, "এরূপ বিনয়ে আর কি প্রয়োজন? অধিকার-ভুক্ত কর্ম্মচারীদের প্রভুরা কখনও নিস্প্রয়োজনে আহ্বান করেন না।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "কৌমুদী মহোৎসব নিষেধে কি সুফল আর্য্য দেখিতেছেন, তাহা জানিতে পারি কি?"

চাণক্য আবার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তবে দেখিতেছি তিরস্কারের জন্যই আমি এখানে আহুত হইয়াছি!"

* 'বৃষল' কথার অর্থ—শূদ্র—নীচকুলোদ্ভব। তাঁহার মাতা নীচজাতীয়া দাসী ছিলেন, এইজন্য সাধারণতঃ এই আখ্যা চন্দ্রগুপ্তের হয়। রাজা হইলেও নির্ভীক গর্ব্বিত এবং রাজানুগ্রহে বিন্দুমাত্র স্পৃহাবিহীন চাণক্য এই 'বৃষল' নামেই চন্দ্রগুপ্তকে সম্বোধন করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহারই অনুগ্রহে রাজপদলাভ করিয়াছেন, রাজা বলিয়াও অনুচিত একটা সম্মানেরযোগ্য চাণক্য তাঁহাকে মনে করেন না, এইরূপ বুঝাইবার জন্যই যেন তিনি চন্দ্রগুপ্তকে এই হীননামে অভিহিত করিতেন। বিনীত ও বুদ্ধিমান্ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে গুরুর ন্যায়ই দেখিতেন, শিষ্যের প্রতি গুরুর এই অবজ্ঞা অপমান বলিয়া মনে করিতেন না।

চন্দ্রগুপ্ত শিহরিয়া কহিলেন, "পাপ শান্তি হউক! পাপ শান্তি হউক! না—না! তারজন্য নয়। উপদেশ লাভের জন্যই আহ্বান করিয়াছি।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "তাই যদি হয়, তবে উপদিষ্ট শিষ্যের পক্ষে গুরুর উপদেশের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিরুচি মত চলা উচিত নয়।"

"তাই বটে! ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আর্য্য কখনও নিস্প্রয়োজনে কোনও কার্য্য করেন না। তাই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

চাণক্য কহিলেন, "বৃষল! তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, বিনা প্রয়োজনে চাণক্য স্বপ্নেও কোন কাজ করেন না।"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "তাই আর্য্য, সেই প্রয়োজন শিষ্যের ন্যায় শুনিবার বাসনাই আমাকে এইরূপ মুখর করিয়াছে।"

চাণক্য কহিলেন, "বৃষল! আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ রাজকার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা, রাজায়াত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। আমি সচিব,—সচিবায়ত্ত কার্য্যের সকল রহস্য আমিই জানিব, তোমার তাহা জানিবার কি প্রয়োজন?"

চন্দ্রগুপ্ত অসন্তুষ্ট ভাবে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইলেন। তখন বাহিরে বৈতালিকদের শ্লোক পাঠধ্বনি উঠিল। ক্রমে দুইজন বৈতালিক শ্লোকপাঠ করিল। একজন মহাদেবের এবং অনন্তশয়নোত্থিত নারায়ণের স্তুতি করিয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রার্থনা-সূচক কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিল। অপর একজন যে কবিতা আবৃত্তি করিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—কাহাকে বিধাতা কিসের জন্য তেজের আধার করিয়া সৃষ্টি করেন, তিনিই জানেন। সিংহ মদস্রাবী গজরাজকে জয় করিয়াই বিজয়গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। হে রাজন, সিংহাসনে বসিয়া সার্ব্বভৌম নৃপতিগণ প্রজাদের আজ্ঞাভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। ভূষণের উপভোগে প্রভু কখনও প্রভু বলিয়া খ্যাত হন না। যাঁহার আদেশ অটুট থাকে, তিনি প্রভু।"

চাণক্য শুনিয়া মনে মনে কহিলেন "এই দ্বিতীয় বৈতালিকটি নিশ্চয় রাক্ষসের নিয়োজিত। রাক্ষস! জানিও, কৌটিল্য এখনও জাগ্রত!"

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, স্তনকলস নামক কোন বৈতালিককে এইরূপ উত্তেজক শ্লোকপাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় বৈতালিকই সেই স্তনকলস।

বৈতালিকদের পাঠ শেষ হইলে চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "বৈহীনরা! তুমি

এই দুই জন বৈতালিককে শত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিতে কোষাধ্যক্ষকে বল।"

চাণক্য বাধা দিয়া কহিলেন, "বৈহীনরা! দাঁড়াও! যাইও না!——বৃষল! অপাত্রে কেন এত অর্থ উৎসর্গ করিতেছ?"

চন্দ্রগুপ্ত ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "আর্য্য! সকল কার্য্যেই যদি আপনা হইতে এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হই, তবে দেখিতেছি এ রাজ্য আমার রাজ্য নয়, কারাবন্ধন বিশেষ!"

চাণক্য কহিলেন, "যে রাজারা নিজে রাজকার্য্য দেখেন না, তাঁহাদের এইরূপই হইয়া থাকে। ভাল, যদি এ সব তোমার সহ্য নাই হয়, নিজেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।"

"ভাল, তাই এখন হইবে। নিজকার্য্য আমি নিজেই নির্ব্বাহ করিব।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "উত্তম! আমিও তবে এখন নিজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি।"

চন্দ্রগুপ্ত আবার কহিলেন, "যদি তাই হয়, তবে কৌমুদী-উৎসব কি প্রয়োজনে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "বৃষল! আমিও শুনিতে ইচ্ছা করি, কৌমুদী উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনই বা কি?"

"আমার আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, এই ত প্রথম প্রয়োজন।"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "আমারও প্রথম প্রয়োজন—এই নিষেধেই তোমার প্রভুত্ব অব্যাহত থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত নরপতিগণ যাঁর আদেশ পুষ্পমাল্যের ন্যায় শিরে ধারণ করেন, সেই প্রভুর আজ্ঞা যে এ দীন ব্রাহ্মণ চাণক্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় না, ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে চন্দ্রগুপ্তের অসীম প্রভুত্ব বিনয়ভূষণে অলঙ্কৃত। ইহা ব্যতীত আরও কোন প্রয়োজন আছে কি না, যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাও বলিতে পারি।"

"বলুন।"

চাণক্য প্রতিহারীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শোনোত্তরা, কায়স্থ অচলদত্তের নিকটে গিয়া ভদ্রভট্ট প্রভৃতির নাম লেখা যে পত্রখানি তার কাছে আছে, তাহা লইয়া আইস?"

শোনোত্তরা বাহিরে গিয়া সেই পত্র আনিয়া দিল। চাণক্য কহিলেন, "বৃষল, তোমার যে সব প্রধান রাজপুরুষ এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর সঙ্গে গিয়া

যোগ দিয়াছেন, শোন, এই পত্রে তাহাদের নাম লেখা আছে—গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট্ট, অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত, প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত, মহারাজের কুটুম্ব বলগুপ্ত, শৈশবভৃত্য রাজসেন, সেনাপতি সিংহবলদত্তের ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, মালবরাজপুত্র রোহিতাক্ষ, ক্ষত্রগণ প্রধান বিজয়বর্ম্মা।”

প্রকৃতপক্ষে এই কয় ব্যক্তি চাণক্যের পরামর্শ অনুসারেই কপটমিত্ররূপে মলয়কেতুর পক্ষে গিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর্য্য, ইঁহাদের বিরাগের কারণ কি ঘটিয়াছিল, শুনিতে চাই।”

চাণক্য এক এক জনের সম্বন্ধে এক একটি কারণ দেখাইলেন। সকল কারণই যে ছল মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

সমস্ত শুনিয়া চন্দ্রগুপ্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিরাগের কারণ জানিতে পারিয়াও আপনি তাহার প্রতিবিধান কেন করেন নাই?”

“করিতে পারি নাই।”

“কৌশলের অভাবে, না কোনও প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষায়?”

“কৌশলের অভাব কেন হইবে? প্রয়োজনের অপেক্ষাতেই পারি নাই বটে!”

“কি সে প্রয়োজন শুনিতে ইচ্ছা করি।”

চাণক্য উত্তর করিলেন, “প্রজাদের বিরাগের প্রতিবিধানের মাত্র দুই প্রকার উপায় আছে, অনুগ্রহ আর নিগ্রহ। ইহাদের যেরূপ সব দোষ ছিল, যে কারণে যে বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুগ্রহে দূর হইবার নহে। ভদ্রভট্ট ও পুরুষদত্ত নিতান্ত ব্যসনী, পদচ্যুতির পর অনুগ্রহ-নীতে যার যার পদে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিলে, রাজ্যের মূলশক্তি হস্তী অশ্বাদির অনিষ্ট হইত। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত নিতান্ত লুব্ধ প্রকৃতির লোক, সমস্ত রাজ্যসম্পদ দিলেও ইহারা পরিতুষ্ট হইত না। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ দুই জনেই নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, নিয়ত ধনপ্রাণনাশের ভয়ে ভীত, ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ নিষ্ফল। রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা যারপর নাই ঈর্ষী ও অভিমানী, কি পরিমাণ অনুগ্রহে ইহাদের সন্তুষ্ট করা যায়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপর নিগ্রহের কথা। ইহারা সকলেই তোমার সহোত্থায়ী। রাজ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই যদি আমরা ইহাদের নিগ্রহ করি, তবে নন্দকুলের অনুরক্ত প্রজা যাহারা আছে, তাহারা নিতান্ত ভীত হইবে, আমাদের উপরে কোনও বিশ্বাস বা ভরসা রাখিতে পারিবে না। সুতরাং নিগ্রহও এরূপ ক্ষেত্রে চলে না। অতএব, তাদের বিরাগ দূর করিতে বা পলায়নে বাধা দিতে চেষ্টা করি

নাই। আমাদের ভৃত্য আবার এমন অনেক আছে, যাহারা রাক্ষসের অনুগত,—রাক্ষসের উপদেশ শুনিতেই উদ্‌গ্রীব। ভিতরে এই ত অবস্থা। ইহার উপর আবার বহু ম্লেচ্ছসৈন্য লইয়া রাক্ষস এবং মলয়কেতু আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে! এখন আমাদের শ্রমক্লেশের সময়, উৎসবের সময় নয়। তাই উৎসব নিষেধ করা হইয়াছে।"

চন্দ্রগুপ্ত শুনিয়া কহিলেন, "ভাল, আমার তবে আরও প্রশ্ন আছে।"

"বল।"

"যে মলয়কেতু আমাদের সকল অনর্থের মূল, তার পলায়নে আপনি উপেক্ষা কেন করিয়াছিলেন?"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "এস্থলেও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ—এই দুইটি নীতির একটি মাত্র অবলম্বন করা সম্ভব হইত। যদি নিগ্রহ করা যাইত, লোকে বিশ্বাস করিত, অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে হইবে বলিয়া তার পিতা পর্ব্বতককে আমরাই হত্যা করিয়াছি। কৃতঘ্নতার অপবাদ আমাদের হইত। আর অনুগ্রহ করিলে প্রতিশ্রুত অর্দ্ধেক রাজ্য মলয়কেতুকে দিতে হইত। এই সব বিবেচনাতেই তার পলায়নে উপেক্ষা করিয়াছি।"

"ভাল, বুঝিলাম। কিন্তু এত বড় শত্রু রাক্ষসও যে পলায়ন করিল, করিয়া এখন নগরের বাহিরে থাকিয়া আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে আর্য্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন?"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "নন্দকুলের প্রতি অচল অনুরাগ রাক্ষসের আছে, এ নগরেও বহুদিন বাস করিয়াছে। চরিত্রজ্ঞ নন্দের অনুরক্ত প্রজাগণ সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, বিশ্বাস করিত। রাক্ষসের বুদ্ধি ও পৌরুষ অসাধারণ, বহু সহায় সম্পদ এ নগরে তার ছিল, তার কোষবলেরও অবধি ছিল না। সেই রাক্ষস যদি নগরের মধ্যে থাকিত, অভ্যন্তরিক মহান্ উৎপাতের সম্ভাবনা হইত! এরূপ শত্রু বাহিরে গেলে বাহির হইতেও বহু উৎপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু তার প্রতিবিধান তেমন দুঃসাধ্য হয় না। হৃদয় নিহত শেল যেমন লোকে দূর করিয়া ফেলে, তেমনই তাহাকে দূর করা হইয়াছে।"

"এখানেই বলপূর্ব্বক তাকে ধৃত করিয়া রাখিলে কি ভাল হইত না?"

চাণক্য উত্তর করিলেন, "রাক্ষস এইরূপ লোকে যে বলে নিগৃহীত হইলে, হয় তোমার বহু বল সে নাশ করিত, অথবা নিজের হাতেই বিনষ্ট হইত। এই উভয় ঘটনাতেই দোষের আশঙ্কা ছিল। বদ্ধ রাখিলে তার প্রাণনাশ হইত, আবার

ছাড়া পাইলেও সে বহু অনিষ্ট করিতে পারিত। বনগজের তুল্য এমন পুরুষকে কৌশলেই বশীভূত করিতে হয়।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "আপনার সঙ্গে এরূপ তর্কবিতর্ক আর করিতে পারি না। আমার মনে হয়, রাক্ষসই এস্থলে অধিক প্রশংসনীয়।"

চাণক্য সক্রোধে কহিলেন,—"'আপনি নন'—কেমন এই ত তোমার বাক্য-শেষ? বৃষল! বৃষল! রাক্ষস কি এমন করিয়াছে?"

"কি করিয়াছেন, তবে শুনুন! আমাদের বিজিতপুরে যতদিন ইচ্ছা তিনি যেন আমাদেরই বুকে পা দিয়া ছিলেন। নিজের বলে আমাদের সৈন্যদের বিজয়ঘোষণাধ্বনি তিনি ক্ষীণ করিয়াছেন। নিজের সুনীতিবলে আমাদের মনে এমন বিষম সংশয়ের উৎপাদন করিয়াছেন যে নিজপক্ষীয় লোকের উপরেও এখন আর বিশ্বাস হইয়াও হয় না।"

"বৃষল! রাক্ষস এই সব করিয়াছে! তুমি এই কথা বলিতেছ?"

"হাঁ, করিয়াছে বই কি?"

"বুঝিলাম, নন্দকে উচ্ছেদ করিয়া আমি যেমন তোমাকে এই সিংহাসনে বসাইয়াছি, রাক্ষস তেমনই আবার তোমাকে উচ্ছেদ করিয়া মলয়কেতুকে সেই সিংহাসনে বসাইবে!"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "যাহা হইয়াছে, দৈবই করিয়াছেন। আর্য্যের কি গৌরব তাহাতে আছে?"

অতি ক্রোধে চাণক্য তখন কহিলেন, "মৎসরী বৃষল! হস্তের অঙ্গুলীতে ক্রোধ-বিকম্পিত শিখা উন্মোচন করিয়া সকলের সমক্ষে কে সেই রিপুনাশের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল? রাক্ষসেরই সম্মুখে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া কে সেই নবনবতিশতদ্রব্যকোটীশ্বর নন্দরাজগণকে রজ্জুনিবদ্ধ পশুর ন্যায় সংহার করিয়াছিল? দেখ, গৃধ্রগণ এখনও আকাশে উড়িতেছে! ভানুর আভা ঢাকিয়া চিতানল এখনও দশদিক্ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! শ্মশানের জীবগণের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করিয়া—দেখ, এখনও নন্দ-দেহ-চিতানল বহু বসা-হব্য লাভ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে! কে এ সব করিয়াছে?"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "কে আর করিবে আর্য্য? নন্দ-কুলবিরোধী দৈব!"

"মূর্খের নিকটই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁরা নিরহঙ্কারই হইয়া থাকেন।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া চাণক্য তখন কহিলেন, "বৃষল! বৃষল! আমাকে

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত—(মুদ্রারাক্ষস।)

কমলা প্রেশ,—কলিকাতা।

তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করিতে চাও? দেখ, বদ্ধশিখা মোচন করিতে আবার আমার হস্তে ধাবিত হইতেছে!" বলিতে বলিতে ভূমিতে ভীমপদাঘাত করিয়া চাণক্য বলিতে লাগিলেন, "আবার সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আরোহণ করিতে আমার চরণ ধাবিত হইতেছে! নন্দকুল বিনাশের পর যে ক্রোধানল প্রশমিত ছিল, কালের প্রেরণায় আবার তুমি তাহা প্রজ্বলিত করিতেছ!"

চাণক্যের এই ভীষণ ক্রোধপ্রকাশ দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে বড় শঙ্কিত হইলেন। তবে কি সত্যই চাণক্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন! চক্ষুর পক্ষ্মসমূহ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে! অরুণ-নয়ন অশ্রুতে প্রক্ষালিত! ভ্রূভঙ্গ যেন ধূমরাশির ন্যায় দেখাইতেছে,—তার নিম্নে নেত্রে ক্রোধানল ঘোর প্রজ্জ্বলিত! মনে হয় পৃথিবী যেন রুদ্রের সেই মহাতাণ্ডবের রৌদ্রলীলা স্মরণ করিয়া চাণক্যের পদাঘাতে থর থর কাঁপিয়া কোনও মতে এই ভার বহন করিতেছেন!

চন্দ্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া চাণক্যও বুঝিতে পারিলেন, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার কৃত্রিম ক্রোধ সত্য মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এ অভিনয় অধিকক্ষণ আর করিলে হয়ত সব পণ্ড হইবে। তখনই তিনি সেই কৃত্রিম রোষ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বৃষল! আর উত্তরপ্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। যদি রাক্ষসকে আমা অপেক্ষা যোগ্যতর বলিয়া মনে কর, আমার এই শস্ত্র তাকেই দেও!" এই বলিয়া শস্ত্র ত্যাগ করিয়া চাণক্য প্রশান্ত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "বৈহীনরি! এখন অবধি চাণক্য আর কেহ নন। চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ংই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এই কথা তুমি প্রজাদের বুঝাইয়া দিবে।"

"বড় সৌভাগ্য দেব এখন সত্যই আমাদের দেব হইলেন!"

এই বলিয়া বৈহীনরি বাহিরে গেল। চন্দ্রগুপ্ত আপন মনে কহিলেন, "আর্য্যের আদেশেই আজ আর্য্যের গৌরব লঙ্ঘন করিলাম। কিন্তু তবু ইচ্ছা হইতেছে, লজ্জায় পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করি। যাহারা সত্যই গুরুর অবমাননা করে, কেন লজ্জায় তাহাদের হৃদয় দুই ভাগ হইয়া যায় না।"

সভাভঙ্গ হইল। চন্দ্রগুপ্ত বিশ্রামার্থ শয়নগৃহে গেলেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে।)

আমি।

আমি বড় বড় বড়
সবার চেয়ে আমিই বড়,
আমার চেয়ে নাইক বড় আর।
আমার ধরে না চরণ
আকাশে অশেষ কোটি-বিশ্বাধার।
আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
সূক্ষ্ম হ'তে আমিই সূক্ষ্ম
আমার চেয়ে নাইক সূক্ষ্ম আর
পায় না বাতাস প্রবেশ যেথা
সেথাও আমার সহস্র প্রসার।
আমি আছি আছি আছি
কেবল আমিই আছি, নাইক কিছু,
কোথাও কখন ছিল নাক আর।
থাক্‌'বেনাক কখন কোথাও,
থাক্‌না কোটি সহস্র সংসার।
আমি জ্ঞানী জ্ঞানী জ্ঞানী
আমিই জ্ঞানী সদাই কেবল,
আমা বই ত নাইক জ্ঞানী আর।
জ্ঞানী আমি অদ্বিতীয়, অজ্ঞ বিজ্ঞ,
অজ্ঞান বিজ্ঞান, অজ্ঞ ত্রিসংসার।
আমিই আছি, নাইক কিছু,
ছিল নাক, থাক্‌'বে নাক,
থাক্‌ব কেবল আমি।
আমার নাইক ধর্ম্ম, নাই অধর্ম্ম,
নাইক সত্য, নাই অসত্য,
নাইক ভৃত্য স্বামী।
আমিই আছি আমার কেবল,
নাইক আমার "তুমি"।
আমিই ছদ্ম আকাশ, বাতাস,
আলোক, সলিল, ভূমি।
নিত্য আমি, সত্য আমি,
শান্ত আমি, কান্ত আমি,
আমিই কেবল শুদ্ধ।
জ্ঞানী আমি, সুখী আমি,
নিত্য-মুক্ত দীপ্ত আমি
আমিই কেবল বুদ্ধ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞানব্রত।

(নক্সা)

[বিজ্ঞানব্রত—স্বামী। সরলা—স্ত্রী। সত্যব্রত—পুত্র।]

"রামঃ! এ কি মানুষেও পারে?"

গৃহ মধ্যে বিজ্ঞানব্রত বসিয়া অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতেছিলেন। বাহিরে স্ত্রী সরলার মুখে ঐ কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কঠোরস্বরে ডাকিলেন—"সরলা!"

"কিগো ?" সরলা গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বিজ্ঞা। তুমি ও কি ব'লছিলে ?

সর। ব'ল্‌ছিলুম ত ওদের বাড়ীর কারখানার কথা।

বিজ্ঞা। এই দেখ! বহুদিন ব'লেছি—ভুল কিছু ব'ল্‌বে না। সত্য বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে, তার প্রথম শিক্ষা তোমা থেকেই হবে, তুমি যদি এই রকম ভুল করেই চল——"

সর। ওমা, ভুল আবার কি ক'ল্লুম ?

বিজ্ঞা। ভুল ক'ল্লে না! প্রথম ত ভাষাতেই ভুল। এই ত তুমি ব'ল্লে 'ওদের'! 'ওদের' ব'ল্‌তে কি বোঝা যায় ? 'ওদের' হ'ল সর্ব্বনাম শব্দ—অর্থাৎ যাতে সকলকেই বোঝায়। 'ওদের' ব'ল্লে সকলকারই বোঝা যেতে পারে।

সর। তা বাড়ী ত ওদের সকলকারই! একজনের ত আর নয়।

বিজ্ঞা। আহা, তা কে ব'ল্‌ছে ? আমি ব'ল্‌ছি সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগের কথা।

সর। হাঁ—তা কি হ'য়েছে ?

বিজ্ঞা। সর্ব্বনাম কাকে বল জান না ?

সর। সর্ব্বনাম! 'সর্ব্বনাশ' বুঝি! বালাই! ও জেনে কাজ নেই! একটা কথার কথা—মুখে বলি—সেই ভাল!

বিজ্ঞা। আঃ! কি মূর্খতা! কি অজ্ঞতা! আমার স্ত্রী—আমার সন্তানের মাতৃ-ধাত্রী-শিক্ষয়িত্রী—জীবন গঠয়িত্রী! সে জানে না সর্ব্বনাম কি! ধিক! ব্যাকরণ কখনও পড়নি ? পদ কাকে বল জান না ?

সর। পদ জান্‌ব না কেন ? পদ ত বলে—'পা'কে ?

বিজ্ঞা। আঃ! কি আপদ গো! ওগো তা নয়—তা নয়। এই ব্যাকরণের পদ, ব্যাকরণের কয়টা পদ আছে জান না ?

সর। ব্যাকরণের! তা ব্যাকরণ মানুষ না কোনও জন্তু ? মানুষ হ'লে দুটো আছে, আর জন্তু হ'লে চারটে। এটা আর জান্‌ব না কেন ?

বিজ্ঞা। অাঁ! বলে কি ? ব্যাকরণ মানুষ না জন্তু! অাঁ! একেবারে এত বড় অশিক্ষিতা মূর্খা তুমি। ওগো, ব্যাকরণ মানুষও নয়—জন্তুও নয়।

সর। তবে কি পাখী ?—তা হ'লেও ত দুটো পা হবে। তবে পোকা মাকড় হ'লে—

বিজ্ঞা। হায়! হায়! ওগো ব্যাকরণ কোনও প্রাণময় দেহধারী জীব নয়।

সর। তবে কি? খাট পালঙ্গ—টেবল চেয়ারের মত কিছু নাকি? তা সে গুলোর ত প্রায় চারটে ক'রেই——

বিজ্ঞা। তা নয়—তা নয়! কোনও জিনিশপত্রও ব্যাকরণ নয়।

সর। তবে কি? জীব জন্তু নয়—জিনিস পত্তর নয়,—তবে আবার পদ কি পা যাই বল—আর কিসের আছে।

বিজ্ঞা। বাক্যের—বাক্যের! জান্‌লে—ব্যাক্যের!

সর। বাক্যি ত কথা। ওমা, তার আবার পা কোথায়? কথা চলে মুখে মুখে। পায়ে হেঁটে ত চ'ল্‌তে কখনও দেখিনি। কি ব'লছ পাগলের মত?

বিজ্ঞা। কি আপদেই পড়া গেল হে! এ 'পদে'র অর্থ 'পা' নয়।

সর। তবে কি?

বিজ্ঞা। 'পদ' হচ্চে—এই—এই—কি জান লজিক অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের বিধান মত কিছুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ বড় কঠিন ব্যাপার। তা 'পদ' বলে কাকে জান? এই—ব্যাকরণে যাকে 'বাক্য' বলে—তার বিভিন্ন অংশ। বাক্যে পাঁচটি অংশ আছে—যথা বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ইংরেজি ব্যাকরণ বলে বাক্যের সাতটি পদ—

সর। হুঁ! তাই বুঝি ইংরেজি অমন তাড়াতাড়ি বেরোয়! দেশী বাক্যির হ'ল পাঁচটি পা—আর ইংরেজি বাক্যির হ'ল সাতটি পা! তাড়াতাড়ি ত চ'ল্‌বেই!

বিজ্ঞা। এই দেখ! আবার কি গোল আরম্ভ ক'ল্লে! ব'ল্লুম না—বাক্যের যে পদ—তার মানে 'পা' নয়—অংশ—অংশ! বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলে—বাক্যের পাঁচটি পদ বা অংশ, আর ইংরেজি ব্যাকরণ সেই পাঁচটিকেই সাত ভাগ ক'রে ধ'রে, যথা—

সর। ও! তাই বুঝি 'সাত পাঁচ' কথা হ'য়েছে!

বিজ্ঞা। নাঃ! তোমার এ নীরেট মূর্খতার অন্ধকার ভেদ করা কারও সাধ্য নয়। দেখ্‌ছি সত্যকে এখন তোমার কাছ থেকে একেবারে পৃথক ক'রে রাখ্‌তে হবে। নইলে তার শিক্ষা সব ভুল হ'য়ে যাবে।

সর। সর্ব্বনাশ! কি ক'রে থাকৃব তবে! আর দুধের ছেলে—মা ছাড়া হ'য়ে কি বাঁচ্‌বে?

বিজ্ঞা। এই ত! আবার এত বড় একটা ভুল কথা ব'ল্‌ছ! দুধের ছেলে! দুধের ছেলে কি? তার মাও দুধ নয়, বাপও দুধ নয়, দুধ দিয়েও সে গড়া নয়,—তবে দুধের ছেলে তাকে কি ক'রে ব'লছ?

সর। ওমা তা—দুধের ছেলে—

বিজ্ঞা। আবার! আবার ব'লছ 'দুধের ছেলে'—ওগো, সে দুধের ছেলে নয়, দুধের ছেলে নয়! দুধের ছেলে হয় না। দুধ ক্ষীর ক'রে পুতুল হ'তে পারে,—জ্যান্ত ছেলে—অর্থাৎ 'মানবশিশু' হয় না! নাঃ! আর নয়! সত্যকে আর তোমার কাছে রাখা যেতে পারে না। কথায় কথায় যার এত ভ্রম-প্রমাদ—তার কাছে থেকে ছেলের কি শিক্ষা হ'তে পারে?

সর। ওগো, দোহাই তোমার! রক্ষে কর। আর ভুল ক'র্‌ব না। তুমি যা শেখাবে, তাই শিখ্‌ব, তাই ব'লব। খোকাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিও না। তা কি ব'ল্‌ছিলে—সর্ব্বনাশের কথা! 'ওদের' হ'ল কিনা—' 'সর্ব্বনাশ',—তা যা আরম্ভ ক'রেছে—সর্ব্বনাশই হবে!

বিজ্ঞা। সর্ব্বনাশ নয় গো! সর্ব্বনাম—সর্ব্বনাম!

সর। হাঁ—হাঁ! সর্ব্বনাম—সর্ব্বনাম! সর্ব্বনাশ নয়। বালাই! সর্ব্বনাশ কেন হবে? সবই ভালভালাই হ'য়ে থাক্‌। ওদের সর্ব্বনামই হ'ক্‌—সবাই নাম করুক?

বিজ্ঞা। সর্ব্বনাম হ'চ্চে একটা পদ—যাতে সকলকেই বোঝাতে পারে।

সর। তা পারে বই কি? আমি ত আলাদা ক'রে একজন কারও নাম করিনি। ব'লেছি ওদের, তা ওদের সবাইকেই ত বোঝাতে পারে!

বিজ্ঞা। তাই 'সর্ব্বনাম' শব্দ ব্যবহার করার আগে, বিশেষ ক'রে কাকে বোঝায়,—অর্থাৎ বিশেষ্যটা কি তা, ব'ল্‌তে হয়। নইলে সর্ব্বনামের কোনও অর্থ বোধই হয় না।'

সর। তা ত হয়ই—না। আমারও ত হ'চ্চে না, তা—

বিজ্ঞা। হাঁ, তাই বল্‌ছি, যার কোন অর্থবোধ হয় না, এমন বাক্য কখনও উচ্চারণ করবে না।

সর। না—তা ত ক'রবই না,—কেন ক'র্‌ব? তা খোকাকে ত কেড়ে নেবে না?

বিজ্ঞা। যদি কথায় কার্য্যে ও ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হ'য়ে চ'লতে পার, তবে নেব না।

সর। ওমা—তা চ'লব বই কি? খুব চ'ল্‌ব, ভুল চুক একটু হয়, তুমি শুধ্‌রে দিও।

বিজ্ঞা। তোমার প্রথমকার ওই একটি কথার মধ্যেই এত ভ্রান্তিও কুসংস্কারে প্রভাব র'য়েছে যে—তা শোধরাতে বহু শিক্ষা—বহু সময়ের আবশ্যক!

সর। ওমা! আর কি ভুল ব'লেছি? ওর মধ্যে পুতুল পুজো নেই, গঙ্গা-স্নান ব্রতনিয়ম নেই, পালপর্ব্বণের কথাও নেই,—ভাল মন্দ দিনের কথা নেই—লক্ষণ অলক্ষণের কথাও নেই,—তবে কুসংস্কারই বা এল কিসে?

বিজ্ঞা। বটে! আচ্ছা, প্রথমে তুমি কি কথাটা উচ্চারণ করিছেলি—বিরাগ বা বিস্ময় প্রকাশক অব্যয় স্বরূপ?

সর। কি ব'লেছিলুম?

বিজ্ঞা। তা আমার মুখবিবর হ'তে বহির্গত হবে না। গো মুখ হ'তেই তোমাদের গঙ্গা নিঃসৃত হয়, নরমুখ হ'তে নয়।

সর। তা নরমুখের এমন ভাগ্যি হ'লে ত? গরু দেবতা—তাই তার মুখ থেকেই গঙ্গা এসেছেন।

বিজ্ঞা। কি! কি ব'ল্লে! গরু দেবতা!

সর। দেবতা নয় গো দেবতা নয়—ভুল ক'রেছি! দেবতাদের মা—দেবতারা সব বাছুর।

বিজ্ঞা। বাছুরই বা কেন ব'ল্‌বে? দেবতা টেবতা ওসব কিছু নয়,—ভুল—ভুল—কেবল ফাঁকা কথা!

সর। তা ঠিকই ত। তোমাদের আমাদের কাছে—ফাঁকা কথা বই আর কি? (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিজ্ঞা। হাঁ, সেইটে বুঝো—ভাল ক'রে বুঝে মনে রেখো! তা এখন তোমার সেই প্রথম কথাটা——কি ব'লেছিলে তুমি বল ত?

সর। ব'লেছিলুম ত ওদের বাড়ীর কারখানার কথা।

বিজ্ঞা। এই দেখ! আবার ব'লছ 'ওদের'! আবার বিশেষ্যকে নির্দ্দেশ না ক'রে বাক্যে 'সর্ব্বনাম' ব্যবহার ক'চ্ছ।

সর। তা কি ব'ল্‌তে হবে?

বিজ্ঞা। 'ওদের' কাদের?

সর। কেন, তা কি জান না?

বিজ্ঞা। আমি কি জানি না জানি, তার অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে

অর্থহীন অসম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ ক'র্‌বে? আমি কি জানি না জানি, তার তুমি কি জান?

সর। তা তোমাকে ত আর ও কথা বলিনি?

বিজ্ঞা। কাকে ব'লেছ?

সর। কাউকে বলিনি,—মনের কথা আপন মনে ব'লেছি—কাউকে শোনাবার জন্যে নয়।

বিজ্ঞা। চিন্তা লোকে ভাষার সাহায্যেই করে। মনের চিন্তাতেও ভাষার বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়। তার পর কোনও চিন্তা লোকে বাহিরের শব্দে প্রকাশ করে অপর কাহারও শ্রুতির উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যই যদি না থাকে, তবে বৃথা শব্দ উচ্চারণে কণ্ঠের স্নায়ুপেশীপ্রভৃতির শক্তিক্ষয়ে কি প্রয়োজন? শক্তির সঞ্চয় আবশ্যক, বৃথাক্ষয় যারপরনাই অপব্যয়। শক্তি অপব্যয়ের বস্তু নয়, আপনার ও সমাজের কল্যাণের জন্য তাকে রাখ্‌তে হয়। কারও শ্রুতির অপেক্ষা না ক'রে যদি ঐ শব্দ গুলি উচ্চারণ ক'রে থাক, কেবল ভুল নয়, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি আর মানব-সমাজের প্রতি বড় একটা অন্যায়ও করেছ।

সর। তা করেছি বই কি? হাঁ; খুব করেছি।

বিজ্ঞা। আর ক'র্‌বে না?

সর। না! কখনো না।

বিজ্ঞা। এখন—'ওদের' এই যে সর্ব্বনাম,—তার বিশেষ্য সম্বন্ধে তোমার মনের জ্ঞাত বিষয় কি ছিল?

সর। ঐ ত ও বাড়ীর বিনোদ ঠাকুরপোদের।

বিজ্ঞা। (ক্রোধে টেবলে চপটাঘাত করতঃ) আবার 'ও'! আবার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ্য ব্যতীত সর্ব্বনাম! 'ও' বাড়ী—কোন্ বাড়ী? নির্দ্দেশ করে ব'লতে পার না?

সর। ঐ ত বিনোদ ঠাকুরপোদের।

বিজ্ঞা। ও ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্দ্দেশ ক'ল্লে,—'ওদের', তাতে বিশিষ্ট হ'ল। কিন্তু 'ও'—এই সর্ব্বনামের অর্থ বোধ ত তাতে হ'ল না। 'ও'বাড়ী কোন্ বাড়ী?

সর। এই যে গো পাশের বাড়ী?

বিজ্ঞা। কোন পাশের?

সর। পূব পাশের।

বিজ্ঞা। কিসের পূব?

সর। তোমাদের বাড়ীর, আর কিসের?

বিজ্ঞা। আমাদের বাড়ীর পূবের সীমানা নির্দ্দেশ কর ত?

সর। ঐ ত বাগান পর্য্যন্ত।

বিজ্ঞা। এই! ঐ 'পর্য্যন্ত কথাটা'ই অব্যক্তার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে কতদূর মনে ক'চ্চ?—বাগানের পশ্চিম প্রান্ত না পূর্ব্ব প্রান্ত?

সর। পূবের প্রান্তই হবে। নইলে বাগান আর তোমাদের বাড়ীর সীমানার মধ্যে কি ক'রে হবে?

বিজ্ঞা। আমাদের বাড়ীর পূব পাশের বাড়ী,—পাশ বল্‌তে সংলগ্নতা বোঝায়। কই, বাগানের পূর্ব্বপ্রান্ত-সংলগ্ন ত কোনও বাড়ী নাই!

সর। ওই একটুখানি প'ড়ো জমি রয়েছে, তার পরেই ত বিনোদ ঠাকুর-পোদের বাড়ী গো!

বিজ্ঞা। তা হ'লে ব'ল্‌তে হবে—আমাদের গৃহাদির পূর্ব্বদিকে বাড়ীর অধিকারভুক্ত বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তরূপ সীমানা-সংলগ্ন পরিচিত পতিত জমির পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী।

সর। হাঁ, তাই ব'ল্‌তে হ'বে বই কি? কেবল ব'ল্‌তে কেন, ভাবতেও হবে এতখানি। নইলে যে ভুল হবে।

বিজ্ঞা। হাঁ, ভুল বুঝতে পেরেছ, এখন অবধি সাবধানে সংযতকণ্ঠে শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক কথা ব'ল্‌বে এবং মনে চিন্তা ক'র্‌বে।

সর। তা ক'র্‌ব। আর ভুল টুল ত কিছু হয় নি?

বিজ্ঞা। হ'য়েছে বই কি! ঢের হয়েছে। ব'ল্‌ছিলে—কারখানা। ওদের বাড়ীতে কিসের কারখানা আছে?

সর। কোঁদল কচকচির! আর আবার কিসের?

বিজ্ঞা। কোঁদল কচকচির কারখানা! কি সর্ব্বনাশ! কারখানায় স্থূল পদার্থজাত অর্থাৎ জড়প্রকৃতির অঙ্গীভূত পদার্থজাত অর্থাৎ ইংরেজিতে যাতে material বলে—সেইরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। কোঁদল কচকচির অর্থাৎ কলহ অর্থাৎ পরস্পর মনোবিদ্বেষের অমূর্ত্ত ঘটনারূপে বহিপ্র্রকাশ—এরূপ জড়পদার্থজাত অর্থাৎ material বস্তু নহে,—ইহা abstract কি না জড় হইতে স্বতন্ত্র ঘটনা বা গুণবাচক বস্তু। সুতরাং তার কোনও

কারখানা হ'তে পারে না। তারপর 'কলহ'রূপ কোনও অশান্তিকর ব্যাপারের একটা কারখানা বিনোদপ্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই কারখানা হ'তে এই সব ব্যাপার লোকের ব্যবহারর্থ বাজারে বিক্রীত হবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্চে, এমন একটা চিন্তা বা কল্পনাও অসম্ভব।

সর। হুঁ—তা ত বটেই! তা আমরা কি অত তত্ত্ব বুঝি?

বিজ্ঞা। বুঝ্‌তে হবে, বুঝ্‌তে হবে। নইলে ছেলের শিক্ষার ভার নেবে কি ক'রে? তারপর আসল কথা। বিনোদ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের গৃহে যে কলহ ব্যাপার সংঘটিত হ'চ্চে, সেই কথা ব্যক্ত কর্‌বার জন্য তুমি যে ভ্রান্ত অসম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ ক'রেছিলে, এবং তাহাতে তোমার মনের বিস্ময় বা বিরাগ বা ঘৃণার ব্যঞ্জক যে অব্যয় শব্দটি উচ্চারণ ক'রেছিলে—সেটি কি?

সর। কি?

বিজ্ঞা। আহা, প্রকৃত বাক্যটির পূর্ব্বে যে কথাটি উচ্চারণ ক'রেছিলে—তাই।

সর। ব'লেছিলুম ত—'রামঃ'।

বিজ্ঞা। কেন, ও কথা উচ্চারণ ক'রেছিলে?

সর। কেন ব'লেছিলুম! বল কি? সব শুন্‌লে তুমিও ব'লতে ত, 'রামঃ'!—

বিজ্ঞা। আমিও ব'ল্‌তুম 'রামঃ।' কি সর্ব্বনাশ! এমন ভয়ঙ্কর কথা তুমি ব'ল্‌ছ? আমিও ব'ল্‌তুম 'রামঃ'!

সর। (স্বগতঃ) ব'ল্‌তে পাল্লে ত ভালই হ'ত,—ঘাড়ের ভূত নেমে যেত! (প্রকাশ্যে) কেন, তাতে এমন কি দোষ হ'ত?

বিজ্ঞা। প্রথমতঃ—ভাষাগত ও ব্যাকরণগত প্রমাদই যথেষ্ট রয়েছে। 'রামঃ'—সংস্কৃত ব্যাকরণের পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তির একবচনান্ত পদ। অব্যয়ে বিভক্ত নাই, অব্যয়ে তুমি সেই বিভক্তিযুক্ত 'রামঃ' শব্দ ব্যবহার ক'রেছ! দ্বিতীয়তঃ 'রামঃ' এটি সংস্কৃত শব্দ; বাঙ্গালায় বিসর্গ দিয়ে কোনও বিভক্তি নাই, সংস্কৃতে আছে।

সর। তা বেশ ত! সংস্কৃত ত পণ্ডিতদের ভাষা,—না হয় তার একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েই প'ড়েছে,—ভালই ত হ'য়েছে!

বিজ্ঞা। ভাল! কি ব'ল্‌ছ? তোমার ভাষা হ'ল বাঙ্গলা, সংস্কৃত নয়। জ্ঞাতসারে যখন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ কর্‌বে, গদ্যবাক্য বা শ্লোকবাক্য উচ্চ মুখে উদ্ধৃত ক'র্‌বে, তখন মাত্র সংস্কৃত শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য, অথবা শ্লোক তুমি ব'ল্‌তে পার। নইলে নিজের ভাষায় কথা ব'ল্‌ছ, তার মধ্যে কোনও সংস্কৃত কথা—

যেন নিজের ভাষারই কথার মত কেন ব্যবহার ক'র্‌বে? এতে ভাষা-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ভাষাকে অবজ্ঞা করা হয়,—তারপর যার যা নাই, তার তাই আছে ব'লে ব্যবহার করা, অথবা লোককে বুঝতে দেওয়া ঘোর প্রবঞ্চনা! তুমি ভাষাজ্ঞা, ভাষাবজ্ঞা, তথা ভাষা-প্রবঞ্চিকা—এতগুলি ভীষণ বিশেষণের যোগ্যা!

সর। ওমা, এক 'রাম' ব'ল্‌তেই এতগুলো অপরাধ হ'য়েছে!

বিজ্ঞা। শুধু 'রাম' যদি ব'ল্‌তে, তবে এই অপরাধগুলি অবশ্য হ'ত না। তবে এ গুলোর চেয়েও অতি গুরুতর আর এক অপরাধ হ'ত।

সর। ওমা আই নাকি? তবে 'রাম' না ব'লে তবু কম অপরাধ ক'রেছি বল।

বিজ্ঞা। না কম কিছুই করনি,—বরং বেশীই ক'রেছ। 'রামঃ'—এই কথাটির মধ্যে 'রাম' ত র'য়েছেই। তার যা প্রমাদ তা ত হ'য়েছেই, আরও বিসর্গযুক্ত প্রমাদ নূতন কয়টি তাতে বৃদ্ধি ক'রেছ।

সর। কি ছাই ব'লছ তুমি? অমন পাপ কথা মুখেও এনো না। রাম নাম মুখে নিলে দোষ হয়? প্রমাদ ঘটে? ওমা! একি পাগলামো কথা। রাম নামে ভূত ছাড়ে, রাম নামে জলে শিলাভাসে, মরণকালে ত্রাণ হ'বে ব'লে রাম নাম কাণে দেয়———

বিজ্ঞা। (ক্রোধে উঠিয়া) কি! কি ব'লছ তুমি! আমার সাম্‌নে কি ওসব ব'লছ তুমি!

সর। ব'ল্‌ছি ত রাম নামের পুণ্যির কথা! রাম নামের পুণ্যির কথায় একেবারে যেন থই ছিটকে উঠেছেন। সইবে কেন? আস্ত———

বিজ্ঞা। রামের কি জান তুমি?

সর। রাম কি জানি! জান্‌বই যদি তবে আর আজ এই বিড়ম্বনা হয়? তা তুমি কি জান শুনি?

বিজ্ঞা। জান—রাম সম্বন্ধে লোকের যা সংস্কার সে একটা মস্ত ভুল। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রূপে প্রমাণ ক'রেছেন—রাম ব'লে কেউ কখনও ছিল না,—সমস্ত কাব্যখানা একটা রূপক মাত্র। মূর্খলোকেরাই কতকগুলো লুব্ধব্রাহ্মণের ছলনায় সেই রূপকটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেছে।

সর। কি রকম?

বিজ্ঞা। সমস্ত রামায়ণখানি কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার আর তার প্রচারের রূপক মাত্র। রাম হ'ল কবির কল্পিত আদর্শ কৃষক——

সর। বল—বল—ব'লে যাও! বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়টা একবার শুনি।

বিজ্ঞা। সীতা কথাটার মূল অর্থ হ'চ্চে—লাঙ্গলের ফালা অথবা সেই ফালা দ্বারা জমিতে যে খাদ হয় তাই। কাব্যের সীতা বাস্তবিক কোনও মানবী নয়—

সব। মানবী কেন হবেন? দেবী—স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী।

বিজ্ঞা। থাম—থাম! ওসব বাজে কথা এখন রাখ। বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য কথাটা একটু বোঝ। 'সীতা' এই শব্দটির ঐ যে ধাতুগত অর্থ—তা থেকেই প্রমাণিত হ'চ্চে—সীতা মানবীও নয়, তোমাদের দেবীও নয়,—কৃষিবিদ্যার রূপক অর্থাৎ কৃষিবিদ্যাকেই মানবী রূপে কল্পনা করা।

সর। বড় যুক্তিই দেখালে! তোমার নিজের নাম কি ছিল ব'ল ত? এখন যেন এক ভিটকেলে নাম ধ'রেছ,—তা বাপ মা তোমার নাম কি রেখেছিলেন?

বিজ্ঞা। পূর্ণচন্দ্র।

সর। পূর্ণচন্দ্রের মানে ত পুন্নিমের রেতের পু'রো চাঁদটি,—তা এখন কি বুঝ্‌তে হবে তুমি মানুষ নও—চাঁদের একটা রূপক?

বিজ্ঞা। আমি ত র'য়েছিই - সবাই দেখ্‌তে পাচ্চে।

সব। চিরকাল ত থাক্‌বে না? সীতাও একদিন ছিলেন। বাল্মীকিমুনি—যিনি রামসীতার লীলার কথা লেখেন—তিনিও তাঁকে দেখেছিলেন।

বিজ্ঞা। ঐটিই ভুল। বাল্মীকি একটা রূপক কাব্য লিখিছিলেন—সীতা ব'লে কেউ ছিলেন না। তিনি তাকে দেখেনও নি।

সর। কে ব'ল্লে? কে তা দেখে এসেছে? রামায়ণে কি কোথাও এমন কথা আছে সীতাদেবী কেবল চাষার বিদ্যে, আর কিছু নয়?

বিজ্ঞা। দেখে আসার দরকার কিছু করে না। ভিতরের ও বাহিরের বহু প্রমাণ দিয়ে বোঝান হ'য়েছে, রামায়ণের ঘটনা বাস্তব নয়, রূপক কল্পনা মাত্র।

সর। কি প্রমাণটা শুনি?

বিজ্ঞা। জনক জমি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সীতাকে পান—এর অর্থ কি?

সর। ওসব দেবতাদের লীলা, তুমি আমি তার বুঝ্‌ব কি? না হয় একটা রূপকথার মত কথাই একটা হ'য়েছে। তা কি হয় না?

বিজ্ঞা। রূপকথা নয়, রূপক। দেবতার লীলা নয়, ভাষার অলঙ্কার—রূপক বর্ণনা। ওর অর্থ হ'চ্চে এই যে জনক জমি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে ক্রমে বুঝ্‌তে পাল্লেন, খুঁড়্‌লে জমিতে শস্যাদি অনেক ভাল জন্মে—অর্থাৎ কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার ক'ল্লেন।

সর। খুব বুঝেছ! ভাল, তারপর?

বিজ্ঞা। তারপর কঠোর পরীক্ষায় যোগ্য বুঝে, রামকে সেই বিদ্যা তিনি দান ক'ল্লেন।

সর। হুঁ! তারপর?

বিজ্ঞা। তারপর রাম সেই বিদ্যাপ্রচার ক'ত্তে ক'ত্তে গঙ্গাতীর দিয়ে উত্তর ভারতের অনেক যায়গা ঘুরে দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে সেই বিদ্যা প্রচার ক'ত্তে গেলেন।

সর। তা রাবণ সে বিদ্যেটা কি ক'রে চুরী ক'রে নিয়ে গেল?

বিজ্ঞা। সেখানকার লোকজন ছিল সব রাক্ষস অর্থাৎ বর্ব্বরলোক—যারা বন্য জন্তু সব মেরে খেত। বন আবাদ ক'রে চাষবাস আরম্ভ হ'বে—তাদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তাইতে চটে তারা রামের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ ক'ল্লে।

সার। তা ত ক'ল্লে। তা বিদ্যেটা কি ক'রে চুরী ক'রে নিল?

বিজ্ঞা। এখানে বিদ্যে নয়, সীতা ব'লে বুঝ্‌তে হবে লাঙ্গলের ফালাটাকে। সেই বুনো লোকদের সর্দ্দার সেটা চুরী ক'রে নিয়ে গেল।

সর। হাঃ হাঃ হাঃ! সীতা হলেন রামের লাঙ্গলের ফালা! হিঃ হিঃ হিঃ!

বিজ্ঞা। হাস্‌ছ যে! হাসির কথাটা কি হ'ল?

সর। হাস্‌ব না! হিঃ হিঃ হিঃ! সীতা কিনা রামের লাঙ্গালের ফালা!—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!

বিজ্ঞা। দেখ! তোমার এই অজ্ঞতার আর মূঢ় অবজ্ঞার হাসি আমার অসহ্য বোধ হ'চ্চে।

সর। কি ব'ল্‌ছ তুমি? বাল্মীকিমুনি—অতবড় একটা দেবতার তুল্যি লোক,—তাঁর খেয়ে দেয়ে আর কাজ ছিল না,—কোন্ চাষার লাঙ্গলের ফালা কোন্ বুনো চুরী ক'রে নিয়ে গেল, তাই নিয়ে অতবড় একটা বই লিখলেন। আর সে কি যেমন তেমন বই?—অমন বই ক'টা তোমাদের বিজ্ঞেনী ফিরিঙ্গীদেশে আছে? সেই রাম সীতা, লক্ষ্মণ ভরত,—সেই মা কৌশল্যা সুমিত্রা,—সেই হনুমান্—কত কত রাজা—কত মুনিঋষি—তাঁদের কত সব ভাল ভাল কথা,—শুনে যা লোক কেঁদে ভাসায়,—সেই ত্রেতাযুগ থেকে এই কলি পর্য্যন্ত সকলেই যা সত্যি বলে মেনে এসেছে,—সেইকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত যাঁদের কথা পড়ে লোকে শিখ্‌ছে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিসে হয়, ভাল হ'তে হ'লে কোন্ কাজে কার মত হ'তে হয়—যাতে আমাদের সকল ভালকে ধ'রে রেখেছে,—সেই বই—বইএর সেই সব

দেবতা কি দেবতার মত মানুষের কথা,—তাই ব'ল্‌ছ একটা মিছে কথা! চাষায় আর বুনোয় কি মারামারি খাওয়াখাওয়ি ক'রেছিল,—তাই নিয়ে একটা গড়া কথা? হঁা, চাষের বিদ্যেও একটা বিদ্যে বটে,—তাও একদিন লোকে শিখেছিল—তা সে কথাটা যদি কারও লিখ্‌তেই হয়, তা কি সোজাসুজি কেউ লিখ্‌তে পাত্ত না?

বিজ্ঞা। সেকালের লোক সব কথা রূপকেই লিখ্‌ত।

সর। কে ব'লেছে? এই যে ক'ব্‌রেজরা ক'বরেজি শাস্তর পড়ে,—অতবড় একটা বিদ্যে—তাতে ত সোজাসুজি ব্যামোর কথা—তার ওষুধের কথাই সব আছে। তার চেয়েও কি চাষের বিদ্যেটার এতবড় মান হ'ল যে অতবড় একটা দেবতার লীলে ক'রে সেটা লিখ্‌লেই হ'ত না?

বিজ্ঞা। রামসীতা ব'লে কেউ ছিল, রামায়ণের ঘটনা যে সত্যই ঘটেছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নেই।

সর। রামায়ণই ত র'য়েছে! বাল্মীকিমুনির লেখা—সবাই সেকাল থেকে মেনে আস্‌ছে—আর আবার প্রমাণ কি চাই তার? তারপর রামসীতা যে ছিলেন না, রামায়ণের ঘটনা যে ঘটেনি, তারই বা প্রমাণ এমন কি র'য়েছে?

বিজ্ঞা। সে প্রমাণের কোনও দরকার নেই। ঘটনা যে হ'য়েছিল, তারই প্রমাণ চাই। ছিল না—তার প্রমাণ দেখাবার কোনও দরকার করে না।

সর। ছিল ব'লে সবাই বরাবর যা মেনে আস্‌ছে,—তা যে ছিল—সেই প্রমাণেরই কোনও দরকার নেই। যারা বলে ছিলনা, তাদেরই প্রমাণ দেখাতে যে সত্যি ছিল না।

বিজ্ঞা। তুমি মূর্খ। বিজ্ঞান কি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, এ সবের কিছু জান না, খবর রাখ না,—তোমার সঙ্গে এ সব যুক্তিতর্ক ক'রা বৃথা সময় ক্ষয় আর অশান্তিকর চিত্তবিক্ষেপ মাত্র। যাক্, আমি ব'ল্‌ছি, যা সত্য যা প্রমাণসিদ্ধ তা মান্‌বে কিনা।

সর। কেন মান্‌ব না? অবিশ্যি মান্‌ব।

বিজ্ঞা। তবে মান্‌তে হবে রাম মিথ্যা—রামায়ণ মিথ্যা।

সর। কক্ষনো না! যদি রাম মিথ্যে, রামায়ণ মিথ্যে—তবে আমাদের ধর্ম্ম মিথ্যে, দেবতা মিথ্যে, পুথি মিথ্যে, শাস্তর মিথ্যে! তুমি মিথ্যে, আমি মিথ্যে,—তোমার আমার এই সম্পর্ক মিথ্যে! যা নিয়ে আমরা আমরা হ'য়ে আছি—সব মিথ্যে!

বিজ্ঞা। দেখ! তুমি কিছু শেখনি—কিছু জান না,—আমি ঢের শিখেছি—ঢের জানি। আমার কথা মত তোমাকে চ'ল্‌তেই হবে!

সর। ছাই শিখেছ, ছাই জান। শিখেছ—ধর্ম্ম পুণ্যি দেবতা শাস্তর সব মিথ্যে—সত্যি কেবল ধূলোমাটি গাছ পাথর, টাকাকড়ি বাড়ী ঘর, খাওয়া দাওয়া আর আরাম বিরেমে থাকা! ওর চাইতে ধর্ম্মপুণ্যি আমার যা জানি আর মানি—সে ঢের বড়।

বিজ্ঞা। দেখ, অসংযত হ'য়ে তুমি এখন যা তা ব'লছ! এতে তোমার অজ্ঞতা ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের গভীরতাই প্রকাশ পাচ্চে। তা আমি ব'ল্‌ছি, সত্যকে তোমার কাছে আমি থাকৃতে দেব না,—যদি না অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার কর যে তাকে ওসব ভ্রান্তি কখনও শেখাবে না।

সর। ওগো, আমার শেখাতে হবে না। এদেশের ছেলে ত? আপনিই শিখ্‌বে।

বিজ্ঞা। যদি শেখে, তোমাকে সে ভুল শুধ্‌রে দিতে হবে।

সর। কি ক'তে হবে! তাকে শেখাতে হবে—রাম মিথ্যে—রামায়ণ মিথ্যে—ধর্ম্মপুণ্যি দেবতা সব মিথ্যে! সে কক্ষনো আমাকে দিয়ে হবে না। ছেলের মুখে বরং হাতে ধ'রে বিষ দেব, তবু কাণে এমন সর্ব্বনেশে অধর্ম্মের কথা দেব না।

বিজ্ঞা। তা হ'লে ব'ল্‌ছি—সত্যকে তোমার কাছে রাখ্‌তে পাবে না।

সর। পাব না! কেন? সত্য কি কেবল তোমারই ছেলে, আমার নয়? কোন্ অধিকারে আমার কাছ থেকে তুমি তাকে কেড়ে নেবে?

বিজ্ঞা। কোন অধিকারে! তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী—সেই অধিকারে। আমি তোমার স্বামী,—আমি যা ক'র্‌ব, তাতে তোমার বাধ্য হ'তেই হবে।

সর। বটে! বলি, ধর্ম্ম মান্‌বে না, দেবতা মান্‌বে না, শাস্তর মান্‌বে না,—স্বামী ব'লে তুমি বড়, স্ত্রী ব'লে তোমার হুকুমে আমার নরম হ'য়ে চ'ল্‌তেই হবে,—এ নিয়ম তোমাকে কে দিলে? কোত্থেকে পেলে? তোমাদের বিজ্ঞানে কি একথা লেখা আছে? দেখাও,—প্রমাণ এনে দেখাও—বিজ্ঞান কি ব'ল্‌ছে বুঝিয়ে দেও,—তখন মানব। নইলে ছেলে কেড়ে নেবে? নিতে এস, তখন বোঝা যাবে। দেখব, আমার হাতাবেড়ীই বড়, না তোমার পাগলা বিজ্ঞানের ছুটো পাগলা কথাই বড়। (প্রস্থান)

(বিজ্ঞানব্রতের স্তব্ধভাবে অবস্থিতি।)

কোহিনুর।

পাঠান অধিকারে কোহিনুর।

কালক্রমে দিল্লীর পাঠানবংশীয় দাসরাজগণের অবসান হইল এবং খিলজী রাজগণ তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। খিলজি রাজাদিগের মধ্যে আলাউদ্দীন সর্ব্বপ্রধান ও অত্যধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের নিধন সাধন দ্বারা সিংহাসন লাভ করিয়াই রাজ্য বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেখিতে দেখিতে গুর্জ্জর, মিবার ও সমস্ত দক্ষিণ দেশে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত রাজপতাকা সমুড্ডীন হইল। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য মালবও তাঁহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। মালবরাজগণ আলাউদ্দীনের প্রতাপে মস্তক অবনত করিলেন এবং তাঁহাদিগের শিরোরত্ন কোহিনুরও স্খলিত হইয়া বিজেতার চরণতলে নিপতিত হইল। এরূপ মহামূল্য মণিলাভ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কোনও মুসলমান রাজার ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং কোহিনুর পাইয়া আলাউদ্দীনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি ইহাকে শিরস্ত্রাণে সন্নিবদ্ধ করিয়া মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার দেহাবসান ঘটিলে, তৎপুত্র মোবারক রাজ্যসুখসহ কোহিনুরমণির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে ইহা ব্যবহার করিতে হইল না। চারিবর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার উজির খসরু খাঁ তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার রাজসিংহাসন ও মণি কোহিনুর আয়ত্ত করিয়া লইলেন। খসরু প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে দুর্দ্দম লোভ ও উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, তিনি আবার হিন্দু মতাবলম্বী হইলেন এবং মুসলমানদের মসজীদে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রকাশ্যভাবে ইস্‌লামের অবমাননা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্জাবের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা তুগ্‌লক বংশীয় গাজীবেগ বা গিয়াসউদ্দিন সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন এবং কোহিনুর করায়ত্ত করিয়া তাঁহার রাজসিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

গাজীবেগের মৃত্যুর পরে তদ্বংশীয় সাত, সৈয়দ বংশীয় চারি এবং লোদী বংশীয় দুই, সর্ব্বসমেত এই ত্রয়োদশজন পাঠান ভূপতি ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্যসুখসহ কোহিনুর-মণি উপভোগ করিলেন। অবশেষে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে লোদীকুলের শেষ রাজা

ইব্রাহিমের হস্তে এই রত্ন নিপতিত হইল। ইব্রাহিম ভাল রাজা ছিলেন না, বরঞ্চ কুশাসক ও অত্যাচারী বলিয়া দেশে তাঁহার দুর্ণাম রটিয়াছিল। তাঁহার অসদ্-ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, পঞ্জাবের সুবাদার দৌলত খাঁ লোদী, রত্নপ্রসূ ভারত-ভূমির এবং রত্নরাজ কোহিনুরের লোভ দেখাইয়া, প্রসিদ্ধনামা তৈমুরলঙ্গের অতি-বৃদ্ধ প্রপৌত্র মোগলবংশীয় বাবরসাহকে ভারতে আহ্বান করিলেন। বাবর সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিলেন না, পরন্তু ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রভূত মোগল সেনা সহ পাণিপথে উপস্থিত হইয়া, ইব্রাহিম লোদীর সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বাবর, 'মহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবর সাহ' এই উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

বাবর বিজয়ী হইলেও, বিজিত শত্রুর পরিজনদিগের প্রতি কুব্যবহার করিলেন না, অপিতু ইব্রাহিমের জননী ও পত্নীদিগের প্রতি সাধুজনোচিত সৌজন্য প্রদর্শনে তাঁহাদিগের চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের জননী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, বাবরের তথাবিধ সদ্ব্যবহার শুধু কোহিনুর লাভের জন্য। কোহিনুর না পাইলে তাঁহার সমস্ত সৌজন্যই অসৌজন্যে পরিণত হইবে। তখন তিনি ছলে, বলে, কৌশলে—যেরূপেই হউক কোহিনুর করায়ত্ত করিবেন। অবলা ও সহায়হীনা বলিয়া কিছুতেই তিনি ইহার রক্ষায় সমর্থা হইবেন না। এজন্য কোহিনুরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই, তিনি কোহিনুর-দান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন, এবং তদনুসারে একদিন বাবরের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া সসম্মানে তাঁহার হস্তে কোহিনুর রত্ন তুলিয়া দিলেন। বহুদিন পাঠান সম্রাট্‌দিগের রাজমুকুটে বিরাজ করিয়া, কোহিনুর এখন বিজয়ী মোগলের আশ্রয় গ্রহণ করিল—ক্রমান্বয়ে চারিটি পাঠান রাজবংশের উত্থান পতন ও হর্ষ-বিষাদের বিভিন্ন অভিনয় দর্শন করিয়া আর এক অভিনব রাজকুলের প্রীতিবিধানে প্রবৃত্ত হইল।

মোগল অধিকারে কোহিনুর।

কোহিনুর লাভ করিয়া বাবরসাহ চারিবর্ষ কাল পরমানন্দে ইহা উপভোগ করিলেন। তিনি কোহিনুরকে এরূপ প্রীতির চক্ষে অবলোকন করিতেন যে, নিজের স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি উক্ত গ্রন্থের একস্থলে, ৪ঠা মে—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই তারিখে কোহিনুর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"খিলজী সম্রাট আলাউদ্দীন মালবদেশ

জয় করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই মহামূল্য হীরক মুসলমান রাজভাণ্ডারে আনয়ন করেন। ইহার মূল্য পৃথিবীর দেড় দিনের ব্যয়ের সমান।"

বাবর সাহের পরলোকান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন, পৌত্র আকবর এবং প্রপৌত্র জাহাঁগীর যথাক্রমে রাজপদ গ্রহণ করিয়া এই কোহিনুর মণি ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনকালে ইহার কোন সংবাদই শুনিতে পাওয়া যায় না, অথবা তৎকালীন কোনও গ্রন্থে ইহার কোনও আলোচনাও পরিদৃষ্ট হয় না। এজন্ত অনেকের এইরূপ অনুমান যে, কোহিনুরের পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত বিবরণই অমূলক—কোনও কল্পনাপ্রিয় লোকের স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যা উপাখ্যান ভিন্ন কিছুই নহে। তাহারা বলেন,——"সাজাহাঁর শাসনভার গ্রহণের পূর্ব্বে কোহিনুর মানবদৃষ্টির অন্তরালে খনির তিমিরগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। তারপর তাঁহার শাসনকালের প্রারম্ভে গোলকুণ্ডাধিপতির ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব ও সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ হীরক-ব্যবসায়ী মীরজুমলা তত্রত্য কোন কয়লার খনিতে * ইহা প্রাপ্ত হন এবং সম্রাটের প্রসাদ প্রাপ্তির আশায়, দিল্লীতে গিয়া অপরাপর মূল্যবান উপঢৌকনাদির সহিত এই অমূল্য রত্ন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।" কেহ কেহ আবার এ কথাও বলিয়া থাকেন—"শূরবংশীয় রাজা সলিমসাহশূরের রাজ্যকালে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদীর তীরে এক ব্যক্তি এই মণি প্রথম প্রাপ্ত হয়। তাহার নিকট হইতে ঘটনাক্রমে ইহা প্রথমে আদিলসাহশূরের ও শেষে মোগলবংশীয় আকবর সাহের হস্তগত হইয়াছিল। আকবর ও জাহাঁগীর স্ব স্ব জন্মতিথি, 'খোসরোজ ও 'নরোজা, প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে উষ্ণীষোপরি যে কপোত ডিম্বাকার প্রকাণ্ড ও জ্যোতিষ্মান হীরক ধারণ করিতেন, তাহা এই কোহিনুর।" এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন অভিমত দুইটি যে অনেকাংশেই অমূলক তাহা বাবর-সাহের স্বলিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাবর একজন ন্যায়নিষ্ঠ, সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান্ রাজা ছিলেন। সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। সুতরাং তিনি যে এক মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করিবেন—'রাম না হইতেই রামায়ণ রচনা'র ন্যায়, জন্ম না হইতেই কোহিনুরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য আমরা তাঁহার লিখিত বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া, এই অভিনব অভিমতকে সত্য ও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হুমায়ুন

* এই খনিকে সুপ্রসিদ্ধ খনিজ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডাক্তার বল্, কৃষ্ণানদীর তটবর্ত্তী 'কলুর' নামা জনপদে অবস্থিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই, যুদ্ধবিগ্রহে, নানাস্থানে ও নির্ব্বাসনে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। অনেক সময়েই তাঁহাকে, প্রথমতঃ সেরসাহের, তৎপরে ভ্রাতা কামরাণের এবং পরিশেষে পারস্যপতির শ্যেন দৃষ্টি হইতে, কোহিনুর গোপন করিতে হইয়াছিল। একদিনের জন্যও তিনি ইহা নির্ভয়ে অথবা প্রকাশ্যভাবে মুকুটে ধারণ করিবার অবসর কি সুবিধা পান নাই। সে অবস্থায় তাঁহার সময়ে কোহিনুরের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাব্য হইতে পারে না। তারপর আকবর ও জাহাঁগীর। আকবর যেরূপ গুণগ্রাহী ও বিদ্যানুরাগী সম্রাট ছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিকটে গুণ ও বিদ্যা অপেক্ষা মণি-ময়কতাদির গৌরব বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তিনি আপনার অনন্য-সাধারণ গুণগ্রাহিতা প্রভাবে, নির্জ্জীব ও অচল রত্নখণ্ড অপেক্ষা সজীব ও সচল রত্ননিচয়েরই অধিক আদর করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠক-মাত্রেই আকবর সাহের দরবারের কথা—উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন'-সভার * অনুকরণে গঠিত 'নওরতন' † সভার বিষয় অবগত আছেন সেই সভা যে কিরূপ গুণী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত রত্নে সতত সমুদ্ভাসিত থাকিত, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং সেরূপ সর্ব্বগুণান্বিত নৃপতি, রত্নসদৃশ বিদ্বৎ মণ্ডলীর উপেক্ষা কি অনাদর করিয়া কোহিনুরের তুল্য নশ্বর ও অকিঞ্চিৎ-কর পদার্থ বিশেষের মান বর্দ্ধনেই যে অধিক যত্নপর থাকিবেন,—কোহিনুরের আলোচনা প্রসঙ্গে বা গুণানুবাদে নিয়ত নিরত রহিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। জাহাঁগীর উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র না হইলেও, তাঁহার সময়ে আকবর প্রবর্ত্তিত কোন শাসননীতিরই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই। তিনি নানা কারণে স্বীয় সাধু পিতার সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত কোন অনুষ্ঠা-নাদির কি কোন রীতিপদ্ধতির মূলোৎপাটনে বা ব্যতিক্রমসাধনে সাহসী হন নাই আর তজ্জন্য প্রকৃত গুণীর প্রতি অনাদর প্রদর্শিত না হওয়ায়, তাঁহার সময়েও

* নয়জন রত্নতুল্য পণ্ডিতের সমবায়ে সংঘটিত বলিয়া এই সভা 'নবরত্ন' নামে অভিহিত। নবরত্ন-সভায়, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি এই নয়জন পণ্ডিত বিরাজ করিতেন।

† এই সভা নামে ও অর্থে নবরত্নেরই অনুরূপ। ইহাতে এই নয়জন সদস্য বা সভাপণ্ডিত অবস্থিতি করিতেন :——মোল্লা দোপেঞ্জা, ফৈজী, আবুলফজল, মির্জ্জা কোকলতাস, আব্দর রহিম খানখানান্, বীরবল, মানসিংহ, তোড়লমল ও হাকিম হিক্কম্। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মির্জ্জাকোকলতা-সের পরিবর্ত্তে মিয়া তানসেন নওরতনের অন্তর্নিবিষ্ট হন।

কোহিনুরের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত ও নাম সহস্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে পারে নাই। এই সকল কারণ বশতঃই বোধহয় তদানীন্তন ঐতিহাসিকগণ আকবর ও জাহাঁগীরের সময়ে প্রতি রাজকীয় উৎসবে ব্যবহৃত হইলেও কোহিনুরের নাম বা ইহার সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই, কেবল মৌনেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে নির্ব্বাক দেখিয়া তৎপরবর্ত্তী অদূরদর্শী লেখকগণ কোহিনুরের পূর্ব্ব বিবরণের—এমন কি, তাঁহাদিগের শাসনকালে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

জাহাঁগীর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র খরম, 'সাহাবুদ্দীন মহম্মদ সাহজহাঁ' নাম ধারণ করিয়া রাজাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি স্বীয় পিতামহের ন্যায় গুণানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না॥ কাজেই তাহার সময়ে গুণ ও বিদ্যার প্রভাব বহুলাংশে মন্দীভূত হয় আর তজ্জন্য কোহিনুরের প্রভাব প্রসার, শক্তিসমাদর শতগুণে সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সাহজহাঁ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন—তাঁহার লালসা ও ভোগ-সুখপরায়ণতার তুলনা ছিল না। ইহলৌকিক নশ্বর সুখভোগের জন্য, তিনি রাশি রাশি অর্থ জলের ন্যায় অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এরূপ লোকের নিকটে যে, কোহিনুরের মত রত্নের আদর হইবে না—জ্যোতিঃশেখর কোহিনুর যে সর্ব্বোচ্চ পদবীপ্রাপ্ত হইয়া প্রসার প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না, তাহা কি কখনও সম্ভাব্য হইতে পারে ? অতএব আকবর জাহাঁগীরের শাসনকালে, যাহার সত্তা মাত্র উপলব্ধ হইত না,—এমন কি, যাহার নাম পর্য্যন্তও একরূপ লোপ পাইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই কোহিনুর এখন যেন অভিনব জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহার আম 'খাসমহল' সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কোহিনুরের প্রজ্জ্বল প্রভা পরম্পরায়, রাজসভাধিষ্ঠিত প্রতিভাদীপ্ত বুধমণ্ডলী যেন হীনপ্রভ হইয়া গেলেন।

সাহজহাঁ পার্থিব সুখসম্ভোগে এতদূর অবিতৃপ্ত ছিলেন যে, কোহিনুরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রত্নের সেরূপ নয়নমনোমোহন অপরূপ রূপলাবণ্যেও তাঁহার প্রীতি জন্মিল না। তিনি কোহিনুরকে নবীন আকারে পরিবর্ত্তিত এবং অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর করিয়া লইবার জন্য অভিলাষী হইলেন, আর সেই অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত, দেশে উপযুক্ত লোক থাকিলেও এক ভিনিসীয় মণিকারকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি মণিকার হইলেও, কোহিনুরের মত বৃহদাকার হীরকের কর্ত্তন ও তক্ষণাদিতে পারদর্শী ছিলেন না। কেবল প্রভূত অর্থ প্রাপ্তির আশায়, নিজের সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই সেই দুষ্কর কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। উহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। তাহার তক্ষণের দোষে কোহিনুর অভিনব মূর্ত্তিতে অর্দ্ধ'ডিম্বাকারে পরিণত হইল বটে, কিন্তু ইহার ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্ব বহু পরিমাণেই ন্যূন হইয়া গেল। আর একটী দোষ এই হইল যে, ইহার একদিকে একটি অগভীর রন্ধ্র চিহ্ন বা খুঁত রহিয়া গেল। সাহজহাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া মণিকারের দশসহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইল না। তিনি বহুদিন মনের কষ্টে কালযাপন করিয়া,শেষে অপরাপর মণি সংগ্রহের দ্বারা সেই কষ্ট নিবারণে মনযোগী হইলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে "বড় বাদসা" প্রভৃতি আরও ১০।১২ টি মহামূল্য হীরক সংগ্রহ করিলেন এবং দশসহস্র বিভিন্ন আকার ও বর্ণের রত্ন ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা এক মহামূল্য রত্নাসন—"তক্ততাউস্" * বা "ময়ুর-সিংহাসন" নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনের ক্ষোভ দূর হইল না এবং বিলাস-পিপাসাও প্রশমিত হইল না। তাহার উপরে আবার তাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁহার সুখপথের কণ্টক বা প্রধান অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে আগরার প্রাসাদদুর্গে, লাল কেল্লায় অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বন্দী হইয়াও সাহজহাঁ কোহিনুর প্রমুখ রত্নরাজির মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না—কারাগৃহের মহা দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সেইগুলি স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন বুঝিলেন, রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির এবং প্রকাশ্যভাবে কোহিনুরাদি ব্যবহারের আশা সুদূরপরাহত, তখন তিনি নিদারুণ ক্রোধ ও মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত হইয়া, সেইগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিতে কি যমুনার জলে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা তাঁহাকে তাহা করিতে দিলেন না। তিনি নিতান্ত বিনীত-

* এই সিংহাসন এক প্রকাণ্ড শিখণ্ড ময়ূরের অবয়ববিশিষ্ট ছিল—ময়ূর পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া, পেখম ধরিয়া থাকিলে যেমন মনোহর দেখায়, ইহার দৃশ্যও তেমনই মনোমোহন ও লোচন শোভন ছিল। ময়ূরের যে যে স্থলে, যে যে ভাবে, যে যে বর্ণ বিদ্যমান আছে এই আসনেও নানাবর্ণ ও আকারের মণি মরকতাদির সাহায্যে, সেই সেই স্থলে সেই সেই ভাবে, সেই সেই বর্ণের সমাবেশ করা হইয়াছিল। আম খাস-সভায় ছয়টি সুবৃহৎ স্থূল সুবর্ণ স্তম্ভের উপরে এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিত। ইহার নির্ম্মাণে ৯০০০০০০০ নয় কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। সাহজহাঁর 'প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু'রূপ যে তাজ, তাহারও নির্ম্মাণ ব্যয় কিন্তু ইহার অর্দ্ধাংশেরও সমতুল্য ছিল না।

ভাবে বার বার অনুরোধ করিয়া, অবশেষে চরণে ধরিয়া, তাঁহাকে সেই অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। জাহানারা না থাকিলে অথবা তিনি যদি পিতৃ-সেবার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত কারাবাসিনী না হইতেন তাহা হইলে সেই সময়েই কোহিনুরের মণিলীলার অবসান হইত এবং আমাদিগকেও আজ আর এত আয়াস স্বীকার করিয়া ইহার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। সুতরাং এ সম্বন্ধে জাহানারা আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী সন্দেহ নাই।

অতঃপর সাহজহাঁ সাত বর্ষ কারাক্লেশ ভোগ করিয়া, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহসংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন আর জাহানারা কোহিনুর প্রভৃতি রত্নরাজি গ্রহণ করিয়া, সস্নেহে কনিষ্ঠ আওরঙ্গজেবকে গিয়া উপহার প্রদান করিলেন। কোনও কোনও ইতিহাসে লিখিত আছে, আওরঙ্গজেব সাহজহাঁর মৃত্যুর পরে কোহিনুর লাভ করেন নাই, তাঁহার জীবিত থাকার সময়েই উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসন অধিকার করিয়াই, কোহিনুর প্রমুখ পিতার সমস্ত মণিরত্নাদি করায়ত্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলের সাহায্য না লইয়া, কৃত্রিম সাধুতারই আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রিয় পুত্র মহম্মদকে বার বার পিতার নিকটে পাঠাইয়া, নানাছলে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিদারুণ ক্রোধ ও বিষম বিদ্বেষ বশতঃ সাহজহাঁ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, অপিচ বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা বুঝিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত রত্নাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন এইরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরংঙ্গজেবের কোন কূটনীতি বা কৌশলই তাঁহার নিকটে কার্য্যকর হয় নাই। অবশেষে, কি জানি কি জন্য, মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে, সাহজাহাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়। আর তজ্জন্য, জাহানারার দ্বারা আওরঙ্গজেবকে নিকটে আহ্বান করিয়া, স্বহস্তে তাঁহাকে কোহিনুর প্রভৃতি রত্নাদি সমর্পণ করেন।

আওরঙ্গজেবের পরে পাঁচজন মোগলসম্রাট যথাক্রমে কোহিনুর ধারণ করিয়া গতাসু হইলে, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ মোগল ভূপতি মহম্মদসাহ ইহা প্রাপ্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের ন্যায়, আজীবন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের বিংশবর্ষে পারস্যাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ নাদের সাহ, 'মার' 'মার' শব্দে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণালের বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে মোগলক পারসিকে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কয়েক-দিন ধরিয়া উভয়পক্ষে তুল্যবলে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু পরিশেষে মহম্মদ সাহেরই

কপাল ভাঙ্গিল। তিনি পরাজিত ও বিজয়ী নাদের কর্ত্তৃক বন্দীভূতও শৃঙ্খলিত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন। নাদের দিল্লী অধিকার করিয়া, আপনাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন মহম্মদ নিরুপায় হইয়া নাদেরের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিতান্ত কাতরভাবে তাঁহার নিকটে নিজ জীবন ও সিংহাসন ভিক্ষা চাহিলেন, মহম্মদের দুর্দ্দশা দেখিয়া নারদেরের দয়া হইল। তিনি সঙ্গে করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। মহম্মদ, রাজ্য ও রাজসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও, নাদেরের লুণ্ঠন হইতে রাজভাণ্ডার ও নগরবাসীদিগের ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখিতে পারিলেন না। একদা সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই নৃশংস পারসিক দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই অসির আঘাতে শমনভবনে পাঠাইয়া দিলেন। দিল্লীর রাজপথ সকল নর-শোণিতে পরিপ্লাবিত ও শবদেহে সমাচ্ছন্ন হইল। রাজকোষ ও নাগরিকদিগের অর্থবিত্ত সমস্তই লুণ্ঠিত হইল। সম্রাট ভীত হইয়া, স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে কোহিনুর মণি লুকাইয়া রাখিলেন। নাদের কোহিনুরের কোনও সংবাদই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এজন্য সাহজহাঁর বড় সাধের 'ময়ূর সিংহাসন', 'বড় বাদসা' প্রভৃতি সমস্ত বহুমূল্য হীরক, অসংখ্য রত্নাভরণ ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতিতে প্রায় পঞ্চচত্বারিংশ কোটী মুদ্রা হস্তগত করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন এবং মোগল রত্নাগারে যে সকল মূল্যবান মণি-মাণিক্যাদি সঞ্চিত ছিল। সমস্তই তাঁহার অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মহম্মদের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি আজ দীন হইতে দীন— সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও কপর্দ্দক-শূন্য পথের ভিখারীরও অধম। তবে সব গিয়াও তাঁহার কোহিনুর আছে—সমস্ত ধনসম্পদের বিনিময়েও তিনি কোহিনুর রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, উহাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হইল। সুতরাং মহম্মদ একেবারেই দুঃখের পাথারে ভাসিলেন না, কোহিনুর থাকার চিন্তা সেরূপ দুর্দ্দিনেও তাঁহার হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ সে শান্তিও তাঁহার অধিকক্ষণ অক্ষুণ্ণ রহিল না। নাদের ঘটনাক্রমে কোহিনুরের সন্ধান জানিতে পারিলেন। একদা সম্রাটের অন্তঃপুরচারিণী কোনও রমণীর সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে ইহার নাম (তখন অবশ্যই কোহিনুরের কোনও দেশীয় নাম ছিল) ও অবস্থিতি স্থান তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি কোহিনুর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে বা ব্যবহারে ব্যাকুলতার

কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বলপ্রয়োগ-নীতির সহায়তা না লইয়া, চাতুর্য্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি করিলেন কি ?—না, একদা সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া, সন্ধি ও মিত্রতা-স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়া মহম্মদকে কহিলেন,—"দেখুন সম্রাট, কিরীটবিনিময়ই আমাদের দেশে সন্ধিবন্ধনের শেষ অনুষ্ঠান। যতদিন না উহা সম্পন্ন হয়, ততদিন সন্ধি প্রকৃত বলিয়া পরিগৃহীত ও দৃঢ়ীভূত হয় না। আপনার সহিত আমার নামমাত্র সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, প্রকৃত সন্ধি এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব আসুন, আজ আমরা পরস্পর উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের সন্ধি ও বন্ধুত্ব-বন্ধন চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় করিয়া লই।" মহম্মদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কোহিনুরের ভাবী বিয়োগ চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় নাই। নাদেরের কথায় অন্যথা-চরণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতরাং তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে ত পারিলেনই না, তদ্ব্যতীত 'এখন নহে, পরে হইবে', 'আজ নহে কাল করিব'—এরূপ অভিমত প্রকাশেও সাহসী হইলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার সেই ভীষণ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং হৃদয়ে গভীর বিষাদ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এবং মুখে কৃত্রিম প্রফুল্লতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মুকুট-বিনিময়-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে অতি সহজেই নাদেরের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল—মহম্মদের উস্তীষ মধ্যে লুক্কায়িত কোহিনুর নাদেরের হস্তে আসিল। অতঃপর নাদেরসাহ, কোহিনুরের সংবাদদাত্রী সেই রমণীকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লুণ্ঠিত ধনরত্নাদিসহ কোহিনুর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

পারস্যে উপস্থিত হইয়া নাদের, সাহজহাঁর সাধের ময়ুরসিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উহা হইতে সমস্ত মণিমরকতাদি গ্রহণ করিয়া কোহিনুরের নূতন নামকরণে অবহিত হইলেন। কোহিনুর যখন পারস্যেরই সম্পদ হইল, তখন ইহাকে আর ভারতীয় নামে অভিহিত করা সঙ্গত নহে—এই ভাবিয়া নাদের, ইহার গুণ অথবা পূর্ব্ব ভারতীয় নামের অর্থানুসারে, পারস্য ভাষার দুইটী শব্দ যোগে, ইহাকে 'কোহিনুর' নামে পরিচিত করিয়া দিলেন। এই হইতে ভারতীয় জ্যোতির্গিরি, পারসিক 'কোহিনুর' অভিধানে অভিহিত হইল এবং অভিনব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পারস্যপতির শিরোরত্নরূপে পারসিক জাতির চিত্ত বিনোদনে, নয়ন রঞ্জনে আত্মনিয়োগ করিল।

পারস্যে কোহিনুর।

জ্যোতিঃশেখর কোহিনুর এখন পারস্যরাজের ও রাজভাণ্ডারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ও প্রধান সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইল। নাদেরসাহ মনের আনন্দে আজীবন এই অমূল্যনিধি ধারণ করিলেন। অতপঃর ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার নিধন ঘটিলে, তৎ পৌত্র সারুখমির্জ্জার হস্তে কোহিনুর পতিত হইল। কোনও কোনও ইংরাজি ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সারুখ নাদেরের পৌত্র নহেন, পুত্র—আর তাঁহার নাম সারুখ নহে, সাহরোখ। যাহাহউক, তিনি নাদের সাহের পৌত্র না হইয়া পুত্রই হউন, অথবা তাঁহার নাম সারুখ না হইয়া সাহরোখই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে তিনিই যে নাদেরের পরে কোহিনুরের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য সুখ ও কোহিনুর ভোগ করিতে হইল না। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার কতকগুলি অবাধ্য প্রজা, আগামহম্মদ নামা জনৈক দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। সারুখ স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেও কোহিনুর রত্ন পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এরূপ সতর্কতা সহকারে উহা লুক্কায়িত রাখিলেন যে, আগামহম্মদ প্রমুখ রাজদ্রোহীরা সহস্র চেষ্টা ও নানা উৎপীড়ন করিয়াও, তাঁহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু সারুখমির্জ্জার ভয় ঘুচিল না, তিনি কোহিনুরকে নিরাপদ ও রাজ্য পুনর্লাভ করিবার জন্য, পিতামহ বা পিতার ভুতপূর্ব্ব বিশ্বস্ত ও কোষাধ্যক্ষ ও সেনানায়ক, আফগান স্থানের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তা আহম্মদসাহ আব্দালীর (নামান্তর আহম্মদসাহ দোরাণির) শরণাপন্ন হইলেন। সারুখের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আব্দালীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে একদল পরাক্রান্ত আফগান সেনা সঙ্গে লইয়া পারস্য আক্রমণ করিলেন। আগামহম্মদ তাহাতে বাধা দিলেন বটে, কিন্তু নিজেই পরাজিত ও ভীত হইয়া দেশত্যাগে বাধ্য হইলেন। অতঃপর আব্দালী সারুখমির্জ্জাকে পারস্যের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। সারুখের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। তিনি আব্দালীর সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুরের সহিত আপনার এক কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

কোহিনুরের উপরে পূর্ব্ব হইতেই আহম্মদসাহের লোভ ছিল। কিন্তু তিনি

একদিনের জন্যও সে কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিজের বহুদর্শিতা প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—নাদেরের মৃত্যুর পরে নিশ্চিতই তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বিপদস্থ হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে আর সেই সূত্রে সহজেই কোহিনুর তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িবে। হইলও তাহাই, তবে সারুখ স্বইচ্ছায় তাঁহার হস্তে কোহিনুর তুলিয়া দিলেন না। আহম্মদ যখন দেখিলেন সারুখ উপকারের কোনও প্রত্যুপকার করিলেন না, মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই বিরত রহিলেন, তখন অগত্যা নির্লজ্জ হইয়াই তাঁহাকে কোহিনুরের প্রার্থনা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইল। একদিন সর্ব্ব সমক্ষে সারুখকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"দেখুন সাহ মহাশয়, উপকারীর উপকার করাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আপনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা হইয়াও, সে ধর্ম্ম, সে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছেন না। তাই আজ আমি আপনাকে আপনার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।" সারুখ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। আব্দালী একটু বিরক্ত হইয়া একটু রুক্ষস্বরে আবার বলিলেন,—"আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার করা কি আপনার উচিত নহে? যদি উচিত হয়, তবে কোহিনুর দিয়া সেই উপকারের প্রত্যুপকার করুন—আমি আমার উপকারের বিনিময়ে আপনার নিকটে কোহিনুর মণির প্রার্থনা জানাইতেছি। অন্ধের নিকটে সৌন্দর্য্যের কোনও মূল্য নাই। এজন্য আশা করি—আপনার নিকটে অসুন্দর ও নিষ্প্রয়োজন কোহিনুর, বন্ধুত্ব ও উপকারের প্রতিদান রূপে, অদ্যই আমার হস্তগত হইবে।" এবার আর সারুখ নীরব থাকিতে পারিলেন না—আব্দালীর বিধিসঙ্গত, ন্যায্য প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না, অনিচ্ছা থাকিলেও, শিষ্টাচারের বশীভূত হইয়া, তদ্দণ্ডেই তিনি তাঁহাকে সেই অমূল্যরত্ন সমর্পণ করিলেন। আব্দালী আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার সাধুবাদ করিলেন এবং কিছুদিন পারস্যে থাকিয়া, তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া, শেষে পুত্র, পুত্রবধূ ও কোহিনুরসহ প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় রাজধানী কান্দাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কোহিনুর দ্বাদশ বর্ষকাল পারস্য দেশে অবস্থিতি করিয়া এখন তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত নিকটে, আফগানস্থানে আসিয়া উপনীত হইল।

আফগানস্থানে কোহিনুর।

আহম্মদ সাহ আব্দালী আজীবন কোহিনুর ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৈমুব প্রায় বিংশতি বৎসর ইহা ব্যবহার করিলেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিলে, তাঁহার ত্রয়োবিংশ পুত্র, রাজ্য ও কোহিনুর লইয়া, পরস্পর ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ও শোণিতপাতের পর তাঁহার পঞ্চম পুত্র জমান সাহের ভাগ্য প্রসন্ন হইল—তিনি বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে কোহিনুব সহ বিশাল কাবুল রাজ্যের অধিকারী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কুগ্রহ বশতঃ বহুদিন তাঁহার ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ সাহ বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহার রাজ-সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। জমান শত চেষ্টা করিয়াও নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইলেন না; অগত্যা তিনি রাজভাণ্ডারস্থ সমস্ত মূল্যবান মণি-রত্নাদি সহ কোহিনুব লইয়া, গুপ্তভাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন এবং আসীক নামা তদীয় এক অনুগত সর্দ্দারের অধিকারে গিয়া, তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। আসীক জমান সাহের বন্ধুরূপে পরিচিত থাকিলেও, তাঁহাব শুভানুধ্যায়ী ছিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে কি জানি কি জন্য, হৃদয়ে এক বিষম বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য সতত সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, এবং তাঁহার দুঃখে মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া, বিশেষ সৌজন্য সহকারে স্বীয় দুর্গমধ্যেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সরল চিত্ত জমান আসীকের সেই কৃত্রিম সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং নিঃসন্দেহে ও পরম সুখে তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা আসীক অধিককাল তাঁহাকে সেভাবে থাকিতে দিল না। একদিন সামান্য ত্রুটি উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল এবং গোপনে রাজধানীতে গিয়া, মহম্মদ সাহকে তাঁহার সংবাদ জানাইয়া আসিল। জমানসাহ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং কি নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু তিনি তজ্জন্য ভীত হইলেন না, নিজের অপমান উৎ-পীড়নকেও তত ক্লেশকর বলিয়া বোধ করিলেন না। তিনি কোহিনুর ও অপরা-পর মণিরত্নের জন্যই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এত বিপদ ও দুঃখকষ্টে পতিত হইয়াও তিনি, যে কোহিনুর প্রমুখ মণিমরকতাদি পরিত্যাগ করেন নাই,

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞানে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন, আজ সেইগুলি তাঁহার অধিকারচ্যুত হইবে ভাবিয়া, তিনি নিতান্ত ম্রিয়মান ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিষাদের, পরিতাপের, উৎকণ্ঠার সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু আর উপায় নাই দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গৃহমধ্যেই সেইগুলি লুক্কায়িত রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আর তদনুসারে স্বীয় কটিনিবদ্ধ অসির অগ্রভাগ দ্বারা, ভিত্তি-গাত্রে ও গৃহতলে দুইটি গহ্বর খনন পূর্ব্বক, প্রথমটিতে কোহিনুর এবং দ্বিতীয়টিতে অপরাপর মণিরত্নাদি স্থাপন করিয়া, বালি চুণের সাহায্যে সেই গহ্বরদ্বর পূরণ ও সমতল করিয়া দিলেন! জমানের বুদ্ধি কৌশলে সেই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যেই কোহিনুর মণি লোকলোচনের অলক্ষ্য হইয়া রহিল!

মহম্মদ সাহ পলায়িত ভ্রাতার সন্ধান পাইবামাত্রই, কোহিনুর প্রভৃতি রত্নের লোভে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী পাঠাইয়া দিলেন। জমানসাহ তজ্জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না, বরঞ্চ সেইরূপ কোনও বিপদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে ভ্রাতৃপ্রেরিত প্রহরীদিগকে উপস্থিত দেখিয়াই তাহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং বন্দীভাবে অবিলম্বে কাবুলে ভ্রাতার সম্মুখে আনীত হইলেন। জ্যেষ্ঠের তথাবিধ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মহম্মদের নিষ্ঠুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না, পরন্তু তিনি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং উপস্থিত জল্লাদকে, লোহিতোত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই মহম্মদের সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালিত হইল। তখন তিনি অবমাননা সূচক পরুষ কণ্ঠে জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ, চক্ষু দুইটি ত হারাইয়াছ, এখন জীবনটীও কি এই ভাবে হারাইতে ইচ্ছা কর? যদি না কর—প্রাণের প্রতি মমত্ব থাকে, তবে কোহিনুর প্রভৃতি সমস্ত মণিরত্নাদি এখনই আমাকে সমর্পণ কর, অথবা কোথায় রাখিয়াছ শীঘ্র বলিয়া দাও।" জমান সাহ কনিষ্ঠের ভীতি প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না, অপিতু তাঁহার অনুরূপ কঠোর স্বরেই উত্তর দিলেন, "আমার নিকট কোন মণিরত্ন নাই। যাহা ছিল সমস্তই কাবুল নদীতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। অথবা যদি থাকিত, তাহা হইলেও আমি জীবন থাকিতে তোমাকে প্রদান করিতাম না।" মহম্মদ সে কথায় ক্রুদ্ধ না হইয়া, তাঁহার সমস্ত শরীর ও পরিচ্ছদাদি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া তাঁহার কারাগৃহও উত্তম-রূপে সন্ধান করিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোহিনুর তাঁহাকে 'মানিয়া' দিল না—

মিলনবিচ্ছেদের অভিনয় দেখাইয়া, ভারতের কোহিনুর আবার ভারতে আসিয়া দর্শন দিল। ক্রমশঃ।

শ্রীঅঘোর নাথ বসু কবিশেখর।

বিংশ শতাব্দীয় বিজয়ার উক্তি।*

১

এমন ঠাকুর ভুলে গেছেন সেই সেকেলে কথা,
তাইতে আসেন যখন তখন মা'কে দিতে ব্যথা!
প্রাণটি দিলেও পতির তরে,
ভক্তি থাকে বাপের ঘরে,
স'য়না অক্ষমতায় খোঁটা—ঠাট্টা, কটুকথা,
এখন বিভো! ভুলে গেছ সেই সহৃদয়তা!

২

"তাপস" তুমি, ত্রিপুরারি! শিখ্‌লে তা' কার ঠাঁই,
উমার সে তপস্যা বুঝি আজকে মনে নাই?
এখন বল "আমার ধ্যানে
ছিলেন কিনা কেবা জানে?"
তুমি না সেই জটিল যোগী—মুনীন্দ্র গোঁসাই,?
তোমারি সেই নেত্রানলে স্মর হ'ল না ছাই?

৩

মা আমাদের অন্নপূর্ণা "পায়স" পাওনা তুমি,
সে সব কথা আমরা জানি, দিন কাটি না ঘুমি,
অমৃতান্ন তোমার মুখে,
আগে যে মা ঢালেন সুখে,
তার পরে সব ছেলে মেয়ে, এ ব্রহ্মাণ্ড ভূমি,
ভাব্‌ছ বুঝি, ভোলা নাথ! আমরা থাকি ঘুমি!

* গত আশ্বিনের মালঞ্চে 'বিংশশতাব্দীয় শিবের উক্তি' দ্রষ্টব্য

৪

মা আমাদের "মহামায়া" তোমার আদরিণী
অঘোর তুমি বিভোর তুমি সতীর গরব চিনি,
তাই সাজিয়ে সমর-সাজে,
দাঁড় করা'লে বুকের মাঝে,
দেখি দৃশ্য মুগ্ধ বিশ্ব—শুদ্ধ নিখিল খান,
আজ ভুলেছ ভোলানাথ! আমরা ত সব জানি?

৫

সোহাগ করি সর্ব্বশক্তি দিয়ে শিবার করে,
এখন আছ সিদ্ধিদাতা, শুধু সিদ্ধি তরে,
দিগ্ বসনে, কৃত্তিবাসে,
চিত্ত নিত্য ভাল বাসে
কেন চাপাও দোষ, আশুতোষ! মা'কে এমন ক'রে?
আমরা শুনে লাজে মরি, বল্‌বে বা কি পরে?

৬

গেল বাদল—ঝগড়া কোঁদল এখন ঠাকুর রাখ,
এই যে গেল মায়ের পূজা ভুলে ছিলে না'ক;
বস্‌লে তাহে দেবীর শিরে,
দেখালে তাই পৃথিবীরে,
সতীর শিরোমণি পতি—যতই ভস্ম মা'খ;
তাই বলি সব ঝগড়া কোঁদল এখন ঠাকুর রাখ!

শ্রীশ্রীদুর্গাপদ সেবিকা।

অজ্ঞানের আত্মা।

আত্মা জিনিসটা কি, তাহা বাস্তবিকই আছে কি না, ইহা লইয়া বোধ হয় পৃথিবীর আদিকাল হইতে তর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও মাঝে মাঝে সেই তর্কের সুর শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মা যে নাই একথা এখন অবধিও কেহ জোর করিয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই, এবং সেই

আদিপুরুষের সময় হইতে এ কথাই বরাবর প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মা আছে।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে এই,—চেতন অবস্থায় আত্মা যেমন মানবের মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি করে, অচেতন অবস্থায়ও উহা সেইরূপ থাকে না মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথাও চলিয়া যায়। এই প্রশ্ন লইয়া বিলাতের পণ্ডিতমহলে কিছুদিন হইতে খুবই আলোচনা হইতেছে। সার আর্থার কনানডয়েল এই প্রশ্নের উপর 'লাইট' পত্রে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সার আর্থার প্রবন্ধে তাঁহার নিজের জীবনে ঘটিত দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার কয়েকটা দাঁত তুলিবার জন্য সার আর্থার দন্তনির্ম্মাতার দোকানে যান, সঙ্গে লেডী কনানডয়েল ও তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। সার আর্থারকে গ্যাসের সাহায্যে অচেতন করা হইলে, তাঁহারা গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসেন। সার আর্থার বলেন, "আমার বেশ মনে আছে। লণ্ডনের জনাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া আমার পত্নী ও পুত্রদিগকে লইয়া মোটর দ্রুতবেগে যাইতেছে, সেই অবস্থায় আমি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার স্ত্রীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম। তাহারা আমাকে দেখিতেই পাইল না, অথচ আমি তাহাদিগকে বেশ স্পষ্টই দেখিতেছিলাম।"

দ্বিতীয় ঘটনাটা এই,—সার আর্থা'রর কনিষ্ঠ পুত্র আড্রিয়ান পাঁচ বৎসর বয়সের সময় একবার নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে শিশু সাত দিন ধরিয়া একেবারে অচেতন, বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। লেডী কনানডয়েল তাহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তিনি কোন কার্য্যের জন্য উঠিয়া একবার পাশের ঘরে গেলেন, সেখান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডেনিস খেলা করিতেছিল। সে দৈবাৎ পায়ে মাড়াইয়া আড্রিয়ানের একটি খেলানার সিপাহী ভাঙ্গিয়া ফেলিল। লেডী কনানডয়েল ঠিক সেই সময়েই ঐ ঘর হইতে রোগীর ঘরে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। আড্রিয়ান তখনও অচৈতন্য। বিড় বিড় করিয়া জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। লেডী কনানডয়েল অতি নিকটেই উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন, প্রলাপের ঘোরে আড্রিয়ান বলিতেছে,—"দুষ্টু ডেনিসটা আমার সিপাহীটা ভেঙ্গে দিল! দুষ্টু ডেনিস—"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সাতদিন প্রলাপের মধ্যে শিশু অনেক কথাই বলিয়াছে, কিন্তু একেবারও তাহার কোনও খেলনার কথা উল্লেখই

করে নাই। সুতরাং ঐ কথাই যে তাহার মনের মধ্যে জাগিতেছিল তাহা বলা যায় না, অথচঃহঠাৎ সে এই খেলনার কথা বলিল কেন? কিন্তু ইহা হইতেই কি বুঝিতে হইবে যে আত্মা অচেতন অবস্থায় মানবের দেহত্যাগ করিয়া যায়?

সার আর্থার বলেন—"হাঁ তাহা ছাড়া আর কি বলিব? এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রমাণ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারাও ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। আমার মনে হয় আত্মা যে শুধু অচেতন অবস্থায় মানবদেহ ত্যাগ করিয়া যায় তাহা নহে, সময়ে সময়ে ইহা আবার ফিরিয়া আসে এবং বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহা কিছু দেখিয়া আসিল, মস্তিষ্কের মধ্যে তাহারই দুই চারিটা ছাপ মারিয়া দেয়। তবে কখন যে এরূপ হয় এবং কেনই বা হয়, এ সমস্যার মীমাংসা এখনও পর্য্যন্ত আমি করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

দেবী।

সংসারের শত দুঃখে হাস্যমুখে নিলে তুমি ভাগ,
কুরূপে সুন্দর বলি প্রাণ ভরে' করিলে সোহাগ,—
তটিনী মকরনক্রে ঢাকে যথা শান্ত বক্ষ দিয়া,
তেমনি সহস্র দুঃখ হাস্যমাঝে লুকায়েছ প্রিয়া।
দরিদ্রের শাকঅন্ন শিরে নেছ বলিয়া অমৃত,
তোমার অঞ্চল বায়ে অসন্তোষ চির অপসৃত।
ভোগে তুমি পদতলে, রোগে তুমি শিয়রের পরি—
পুণ্য কর্ম্মে হে বিধাত্রী, নর্ম্ম মাঝে চির সহচরী!
বিন্দু বিন্দু করি তুমি রচিয়াছ তৃণের কুলায়ে,
পালকের আবরণে বক্ষক্ষত রেখেছ লুকায়ে,
সম্পদে যে অন্নপূর্ণা, বৈদেহী যে দুঃখ বনবাসে,
জুড়াবার গঙ্গাবারি এ হৃদয় দেউলের পাশে,—
এত দয়া বক্ষে ধরি রাখিয়াছ পূর্ণকুম্ভ ভরি,

শব্দ মাত্র করিবারে অবসর দাওনি সুন্দরী।
দাওনা পূজিতে তোমা পূজা দিলে, বলো হবে পাপ,
না পূজিলে আমার যে আরো পাপ আর' অনুতাপ।
তুমি যদি দেবী নহ কোন স্বর্গে খুঁজিব দেবীরে ?
স্বর্গেরে এনেছ সঙ্গে হে দেবতা মর্ত্তের কুটীরে।
পতিরো বরেণ্যা তুমি অর্চ্চনীয়া হৃদয় দেউলে,
শঙ্কর পূজিল যথা ভবানীরে ধুতুরার ফুলে,
কোথা অর্ঘ্য কিছু নাই—যাহা আছে তব পূর্ণধারা,
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজি মোর নাহি আঁখিজল ছাড়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্যেন।

তুমি কে ডাকিলে ? এমন আকুলভাবে এমন করুণস্বরে হৃদয়ের কণ্ঠ খুলিয়া এমন আর্ত্তনাদে তুমি কে এমন ডাকিয়া উঠিলে ? এ দ্বিযামা বিভাবরীর গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া কাহার করুণ কণ্ঠ এমন আকুলভাবে ভাসিয়া উঠিল ? কে তুমি ? কি কহিলে ?

তুমি একটি সামান্য পাখী—শ্যেন পাখী—অনন্ত কোটি কোটি জীবজন্তুর বাসস্থান এই পৃথিবীর মাঝে একটি সামান্য হিংস্র পাখী শ্যেন! জগৎ তোমায় ঘৃণা করে! তুমি হিংস্র বলিয়া জগতের কঠোর কটাক্ষের অন্তর্ভুক্ত। তুমি জীবজগতের যেই হও, তোমার এক করুণ আর্ত্তনাদ আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে মিলিয়া গিয়াছে। কেন মিলিয়া গিয়াছে বলিতে পারি না, তবে এই মনে হয় আমার জীবনের আর্ত্তনাদ তোমার এই আর্ত্তনাদের সহিত যেন মিশিয়া যায়।

জগৎ তোমায় ঘৃণা করে, কারণ তুমি হিংস্র; তুমি সমস্ত দিবস আহারান্বষণেই কাটাইয়া দাও; হৃদয়ের দয়ামায়া ভুলিয়া কত শত প্রাণিবধ করিয়া নিজের উদর পূর্ণকর। তাই জগৎ তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার রূপ নাই, গুণ নাই। মানুষ তাই তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার স্বরে প্রাণে প্রেমের তুফান উঠে না,তাই তোমার আদর নাই। কিন্তু তুমি বলিতে পার, মানুষেরও হিংসাবৃত্তি

আছে; নিজের উদর পূরণ করিবার প্রয়াসে মানুষও সমস্ত দিবস ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ের দয়ামায়া ভুলিয়া দুর্ব্বলকে মারিয়া নিজের ইষ্ট সিদ্ধ করে। বক্রদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে সে চাহিতে থাকে, সুযোগ বুঝিলেই আর কথা নাই। তবে আমার দোষ কেন? স্বীকার করি, মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি আছে; কিন্তু তাহাদের আবরণ আছে। তাহাদের রূপের আবরণ, পদের আবরণ, শক্তির আবরণ আছে,—তাহাতেই সব ঢাকিয়া যায়। তোমার আবরণ নাই; তুমি অসভ্যের মতই প্রকাশ্যে দুর্ব্বলকে মারিয়া নিজের উদর পূর্ণ কর, তোমার কোন কৌশলও নাই, যুক্তিও নাই; তাই তোমাকে লোকে ঘৃণা করে।

তোমার আর একটি অপরাধও আছে। সে দোষেও তুবি ঘৃণার্হ। তুমি চিলের মত ছোবল মারিয়া অপরের ধন লইয়া যাও। একজন বড় আশা করিয়া মুখের প্রায় সম্মুখে একটি জিনিশ নিয়াছে, আর তুলি চিলের অনুকরণ করিয়া কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহা লইয়া গেলে! এ কি কম নিষ্ঠুরতা? এ কি কম স্বার্থান্ধতা? এজন্যও লোক তোমায় বিশেষ ঘৃণা করে।

কিন্তু আমি তোমাকে সেজন্য বিশেষ দোষী বলিয়া মনে করি না। যদি সে দোষে তোমাকে ভীষণ পাপী বলিয়া মনে করি, তবে মানুষকেও ভীষণ পাপী বলিয়া (আমার "মোটা" মতে) মনে করিতে হয়। মানবও যে সেই দোষে দোষী। অপরকে আশায় বঞ্চিত করিয়া সে নিজের উপর পুর্ণ করে। একজনের ভাল-বাসার ধন, চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, হয়ত সে নয়নে নয়নে আশায় আশায় রাখিয়াছে, হয়ত প্রাণ ভরিয়া হৃদয় ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছে, আর কোথা হইতে কে আসিয়া তাহার আশায় ছাই দিয়া তাহা লইয়া গেল! তাহার বক্ষের পাঁজর ভাঙ্গিয়া তাহার চির আকাঙ্ক্ষার ধন ছোবল মারিয়া লইয়া গেল! তাহার বুক চিরিয়া নিজের স্বার্থ পূর্ণ করিল। মানুষ সে দোষে দোষী নয় কি?

কিন্তু পাখী তোমার ঐ আর্ত্তনাদ কেন? তোমার কণ্ঠে এরূপ মর্ম্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাস কেন? কেন এমন করুণ ভাবে চীৎকার করিয়া উঠ? সমস্ত দিবস চলিয়া যায়, শুধু আহারন্বেষণে জীবনের সময় কাটিয়া যায়, তিলে তিলে পথে পথে জীবনের সময় কমিয়া আসিতেছে, সমস্ত জীবন বৃথাই গেল, বেলা শেষ,—তাই ভাবিয়া কি হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন জীবনের মর্ম্মকথা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ভাসিয়া উঠিতেছ! "ওহো হো! গেল গেল! সময়ে গেল! জীবন গেল!"

ওই স্বর হৃদয়ে যে প্রবেশ করিয়া আমাকে উদাস করিয়া তুলিয়াছে! আমার এ জীবনের দিবসও এমনই আহার অন্বেষনে কাটিয়া যাইতেছে, বৃথাই জীবনের দিনগুলি যখন নীরবে চলিয়া যাইতেছে, তখন এ ক্ষুদ্র ব্যর্থজীবনের অন্তঃস্থল হইতে একটি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, একটি করুণ উচ্ছ্বাস হৃদয় প্লাবিত করিয়া উঠে। কিন্তু সে আর্ত্তনাদ সে করুণ উচ্ছ্বাস হৃদয়-সৈকতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, বাহিরে আসিতে পারে না; বাহিরে আসিয়া আমার জীবনের কথা বলিয়া দিতে পারে না; আমায় পথ দেখাইয়া দিতে পারে না। তাই পাখী বলিতেছিলাম, তোমার ঐ করুণ আর্ত্তনাদ আমার হৃদয়ে মিলিয়া যায়।

পাখী! তোমার চীৎকার অমন মনে হয় কেন? হৃদয় হইতে উত্থিত করুণ ক্রন্দন জগৎ কাঁদাইতে পারে, হৃদয়ের হাসিতে জগৎ হাসাইতে পারে, হৃদয়োত্থিত প্রেমে ভগবানকে ভুলাইতে পারে, হৃদয়ের ভালবাসায় মানুষকে টানিয়া আনিতে পারে। যাহা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আসে, তাহাই সুন্দর, তাহাই ভাল লাগে। তাই পাখীর গান সুন্দর—পাখী হৃদয় খুলিয়া গায়। বালকের কথা সুন্দর—বালক প্রাণ খুলিয়া কথা বলে। যখন হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই কথার সহিত কুটিলতা মিশিতে আরম্ভ করে। তোমার মুক্ত হৃদয়ের অন্তঃস্থলের ঐ আর্ত্তনাদ, তাই তার করুণ স্বর আমার হৃদয়ের করুণ রাগিনী জাগাইয়া দিয়াছে।

শ্যেন পাখী! জগৎ তোমায় হিংস্র বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়, করুক। আমি সে কথা ভাবি না। তুমি যেই হও, হিংস্র হও কি অহিংস্র হও, জানি না,—তুমি কে জানি না,—শুধু শুনি তোমার ঐ করুণ আর্ত্তনাদ, শুধু প্রাণে বাজে তোমার নিরাশার তান! যখন গভীর নিশীথে সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়; যখন নীরব রজনীর নীরবতায় আপনাকে ডুবাইয়া নীরবে শুইয়া থাকি, তখন তোমার ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, আমার হৃদয়ে আর্ত্তনাদ গাহিয়া উঠে, তোমার করুণ ক্রন্দনে আমার জীবনের করুণ সঙ্গীত জাগিয়া উঠে, তোমার ঐ নিরাশাধ্বনির সহিত আমার বিফল জীবনের নিরাশার তান বাজিয়া উঠে—"ওহো হো! গেল! সময় গেল! কিছুই হইল না—এ জীবন আমার বিফলই গেল।" গেল, কিন্তু আর যেন সময় বিফলে না যায়; তুমি যেন প্রহরে প্রহরে ঐ আর্ত্তনাদে ডাকিয়া বলিয়া দাও, যেন আপনার অবস্থা বুঝিয়া আমায় বলিয়া দেও—"জাগ জাগ মানব—আর সুপ্তিঘোরে থাকিও না! একবার চাহিয়া দেখ, ভাবিয়া দেখ! আমার অবস্থা দেখ! একটি হিংস্র জীব, বৃথাই জীবন গেল। জাগ জাগ! সময় আসিয়াছে।"

তোমার রবের সহিত আমার শিশুকালের কি স্মৃতি যেন মিশিয়া রহিয়াছে। শিশুকাল হইতে ঐ সুর শুনিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছি। দিবসের প্রারম্ভে একবার ঐ সুর শুনিয়াছি। যখন রজনীর অবসান হইয়া আসিয়াছ, নীরবে যখন জগতের মাঝে দিবসের আরম্ভ হইয়াছে, নবীন আলোকরেখার আভাস জগতের বুকে ভাসিয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর কর্ম্মময় সময়ের পূর্ব্বস্থানে যখন একবার ধরনী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তখন তোমার রব শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তখন মনে কত কি জাগিয়া উঠিয়াছে—কি যেন করিতে হইবে? এ জীবনের কত কি কাজ করিয়া রহিয়াছে, খুঁজিয়া পাই নাই,—শুধু তোমার রব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি! আজিও তা মনে জাগে। কিন্তু হায়! তাহা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। আবার দিবসের শেষে আঁধারের মাঝে, রজনীর কোলে বসিয়া কর্ম্মময় সময়ের পর, অবসন্ন পৃথিবীর নীরবতার মাঝে, তন্দ্রাঘোরে আবার সেই করুণ রব নিরাশ রাগিনী শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যাই—সে রবে কি নিরাশা! সাথে সাথে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে, জীবনের বিফলতা মনে জাগিয়া উঠে, নিষ্ফল জীবনের ধিক্কার উঠে। তাই বলিতেছিলাম আর তোমার রাগিনীর সাথে জীবনের রাগিনী বাজিয়া উঠে।

জগৎ তোমায় ঘৃণা করিতে হয়, করুক। আমি তোমায় জানি না, তোমায় চিনি না, জানি শুধু তোমার ঐ রাগিনী। ঐ রাগিনী আমার হৃদয়ের রাগিনীর সহিত মিলিয়া যায়। তাই জানি ঐ রাগিনী। এ সংসারের লোক যাহার একবার দোষ দেখে, তাহার আর গুণ দেখিতে চায় না,—অথবা দেখিলেও চিনে না। তাহারা ভাবিয়া দেখে না, কাহার মধ্যে কি আছে! উপরের একটি সামান্য জিনিষ লইয়া মতামত স্থির করিয়া বসিয়া থাকে। তোমাকে একটি হিংস্র পাখী দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখে। তোমার কথা একবারও কেহ ভাবিয়া দেখে না। কাহারও মুখে তা শুনিয়া, অথচ একটি দোষ দেখিতে পাইয়া দোষী বলিয়া দূরে রাখে। ভিতরে চাহিয়া দেখে না। তোমার ঐ যে সময়বোধক রাগিনী, তাহাও কাণ পাতিয়া শোনে না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি; শুনিয়া বুঝিয়াছি তুমি তুচ্ছ হইলেও তোমার ঐ রাগিনী তুচ্ছ নয়, তোমার জীবন ব্যর্থ নিষ্ফল হইলেও, তোমায় ঐ ধ্বনির অর্থ নিষ্ফল নয়। তোমাকে দেখিয়া ঘৃণা হইলেও, তোমাকে দেখিয়া তুচ্ছ মনে হইলেও, তোমার করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিজের কথা মনে পড়িয়াছে, নিজের তুচ্ছতা মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। শোন! আমি তোমায় দেখিতে চাই না,

তোমাকে বুঝিতেও চাই না, শুধু তোমার ঐ রাগিনীর অর্থ বুঝিতে চাই,—প্রহরে প্রহরে ডাকিয়া কি বলিয়া দাও তাহাই জানিতে চাই। নীরব সময়ে কেন ডাকিলে, কেন এই শীতাহত রজনীর গভীরতার মধ্যে আকুলভাবে ডাকিয়া আমায় জাগাইয়া দিলে? প্রাণ কাঁদাইয়া দিলে; যেন কি বলিয়া দিলে—বুঝিয়াও বুঝিলাম না। কোথায় কোন্ সুদূরে, অতীতে যেন কি লুকাইয়া গিয়াছে, কোথায় কি দেখিয়া আসিয়াছি! আর না—শোন! তুমি বলিয়া দাও কি বলিতেছ! আমি এমনই শুইয়া তোমার মর্ম্মব্যথার কথা শুনিব।

শ্রীঅমরকিশোর দাশগুপ্ত।

বাদক।

ওই বেনু কুঞ্জের আড়ালে
গ্রামের সবার প্রিয়,
বৃদ্ধ বায়েন নারাণের
ছিল অতি ছোট গৃহ।
তার ছিল ঢাক ঢোল দগড়
ছিল একজোড়া কাঁসি,
ছিল সবাকার চেয়ে সেরা
মধুর শানাই বাঁশী।

(২)

হায় রে সুখের শরতে
তার শানায়ের স্বরে।
গ্রামের প্রবাসী তনয়ে
ফিরায়ে আনিত ঘরে।
ছুটিত সে স্বর লহরী
আহ্বান বাণী বহিয়ে,
আনন্দ ধারা ছড়াত
পেয়ে আনন্দময়ীরে।

(৩)

বিজয়ায় তার শানায়ে
উঠিত বিষাদ উথলি,
ফিরিত সকলে কাঁদিয়া
ভাসায়ে সোণার পুতলী
দারুণ বিরহ বেদনায়
জলে আঁখি যেত ভাসি,
কাঁদাত তারে ত আহা গো
তাহার করুণ বাঁশী।

(৪)

গ্রামে কুমারের জনমে
বাজাত সে আসি ঢোল,
সে কি উল্লাস মধুময়
আনন্দ উতরোল,
বিবাহে তাহার শোভাদল
চলিত সবার আগে
তার শানায়ের সাহানা
এখনো মরমে জাগে।

(৭)

(তার) পালক লাগান জয়ঢাক
বাজিত সবার চেয়ে,
সবে নাচিত ভক্ত গাজনে
শিব মহাদেব গেয়ে।
'রায় বেঁশে' আর পালোয়ান
শত উৎসব কালে
জমায়ে ফেলিত খেলা গো
তার দড়গের তালে।

(৬)

আজ উই লাগিয়া লাগিয়া আহা গো
তাহার সাধের ঢোলে,
তামাক রাখিছে ছেলে দল
তার দগড়ের খোলে,
প্রিয় সে শানাই বাঁশীটি
লয়ে খেলা করে নাতি
দরদ বুঝিবে কেবা তার
কাছে নাই তার সাথী।

(৭)

নীরব বাদ্য 'নারাণের'
বসে আছে একা দূরে,
শকতি নাহি হয় উঠিবার
সে যে বুড়া থুর থুরে,
আন মনে কভু বালিশে
তাল দেয় থেকে থেকে
গ্রামের বালক বালিকা
হাসে হাব ভাব দেখে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩। সেকালের যাতায়াতের পথ।

সেকাল ও একালের মধ্যে নানাবিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে পদে পদে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সেকাল ও একালের পথপর্য্যটনের তুলনা করিতে গেলে সকলকে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে রেল ষ্টীমারের আবিষ্কার ফলে পর্য্যটন কত সুগম, কত সুখকর হইয়াছে! আর সেকালে? এই বাঙ্গলা দেশহইতে কাশীযাত্রীরাও প্রত্যাগমনের আশা লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতেন না। যাত্রাকালে আত্মীয়স্বজনের নিকট একরূপ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াই যাইতেন, আর ফিরিয়া তাহাদের পুনঃদর্শন পূর্ব্ব-

জন্মার্জ্জিত পুণ্যফল বলিয়া মনে করিতেন। আর যাঁহারা এদেশ হইতে দেশান্তরে এবং বিদেশ হইতে এদেশে গিরিমরুসাগর অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করিতেন, তাহাদের অবস্থা সহজে অনুমান করা যায় কি ?

সেকালের ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকেরা বা বিদেশী বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা যেরূপ সঙ্কটপূর্ণ পথে এসিয়ার নানাদেশে ধর্ম্মার্থে ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। ইঁহারা কিরূপ অতিমানুষিক ধৈর্য্য এবং সাহস অবলম্বন করিয়া, কিরূপ সঙ্কল্প ও তেজ লইয়া, সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চীনভারতের পথের ভীষণ সঙ্কটের কথা জানিতে পারিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ফা হিয়েন, য়ুয়ন-চুং (হুয়েন সাঙ) প্রভৃতি তীর্থযাত্রীদের উধাও দৃষ্টি সর্ব্বদা ভারতবর্ষের দিকে নিবদ্ধ থাকিত। তাঁহারা যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা স্থানে স্থানে পথকষ্টের কথা যাহা লিপিবদ্ধ আছে তৎপাঠে বুঝা যায়—তাঁহাদের ব্যগ্রহৃদয়ও পথের ভীষণতার কথা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। নিম্নে তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে যে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে চীনের ও ভারতের যাত্রীদিগকে কত সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বনে, আত্মত্যাগে কিরূপ ধর্ম্মাপপাসা চরিতার্থ করিতে হইত, আমরা তাহা ক্ষণিক অনুভব করিতে পারিব।

ফা-হিয়েন ব'লিতেছেন :—

"চেঙ্-য়ে এই সময়ে অশান্তিপূর্ণ ছিল, রাস্তা সকল উন্মুক্ত ছিল না।"

তুন-জঙের সন্নিকটস্থ একটি মরুভূমি পার হইতে হইতে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

"এই মরুভূমিতে অনেক দুষ্কর্ম্মা দৈত্য এবং উত্তপ্ত বায়ু রহিয়াছে। ইহাদের সম্মুখীন হইতে গিয়া সকলেই প্রাণ হারায়, কেহই বাঁচে না। ঊর্দ্ধে কোন উড্ডীয়মান পক্ষী নাই, নিম্নে কোন ভ্রমণশীল জন্তু নাই। সম্মুখের পথ খুঁজিয়া নিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যতদূর দৃষ্টি যায়—পথ দেখা ত অসম্ভব—কেবল মৃত ব্যক্তির ধ্বংসোন্মুখ অস্থি সকল দিঙ্‌নির্দ্দেশ করে মাত্র।"

সেন-সেন নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি স্থল বিশেষকে বন্ধুর এবং অনুর্ব্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পেও-যুন পৌঁছিয়া তিনি পথের বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন :—

"পথে গৃহ নাই, মানুষ নাই ; রাস্তা এবং নদীগুলিতে বাধাবিঘ্নের জন্ত পর্য্যটন-ক্লেশ মানুষের তুলনা করিয়া দেখাইবার শক্তির অতীত।"

য়ুয়ন চং (হুঁয়েন-সাঙ) কেই—চি (গচি বা গজ) নামক স্থানের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

"দক্ষিণ-পূর্ব্বে আমরা একটি হিমমণ্ডিত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলাম। এই পর্ব্বতটি উচ্চ—উপত্যকা গভীর। পর্ব্বতের প্রপাত এবং গর্ত্তগুলি ভয়ানক—বাতাস এবং তুষার অবিচ্ছেদে মিশিয়া রহিয়াছে। সমস্ত গ্রীষ্ম ভরিয়া বরফ থাকে, স্তূপাকার হিমানী উপত্যকায় পড়িয়া রাস্তাগুলি আটকাইয়া রাখে। পার্ব্বত্য ভূত প্রেত দৈত্য সকল ক্রোধভরে নানারূপ বিপদ আপদ প্রেরণ করে। ডাকাতেরা পথে পড়িয়া পথিকদিগকে হত্যা করে।" *

স্থলপথের বিবরণ সম্বন্ধে উল্লিখিত বর্ণনাই পর্য্যাপ্ত নহে কি? ফা-হিয়েন স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া জলপথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি সীমাহীন, তলহীন মহাসাগরে যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার বিবরণটুকু দিলেই সেকালের জলপথ-যাত্রীদের দুর্দ্দমনীয় সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ফা-হিয়েনের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে দুই একটি স্থান তুলিয়া দিতেছি :—

তিনি (ফা-হিয়েন) দুই শত লোক পূর্ণ একখানি প্রকাণ্ড বাণিজ্য জাহাজে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রযাত্রার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ জাহাজ সংলগ্ন একখানি রক্ষাতরী ছিল। অনুকুল পবনে তিনদিন সম্মুখে অগ্রসর হইলে তাঁহারা একটা ঝড়ের সম্মুখে আসিয়া পড়েন। জাহাজে ছিদ্র হইয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিতেছিল।

বণিকেরা রক্ষা তরীতে উঠিতে অভিলাষী হইল; কিন্তু তাহা হইলে অনেকে এক সময়ে উঠিতে গিয়া সংলগ্ন রজ্জু ছিড়িয়া ফেলিবে। তখনই মৃত্যু জানিয়া বণিকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজ এখনই জলে ভরিয়া যাইবে ভাবিয়া তাহারা ভারী জিনিষগুলি জলে ফেলিয়া দিল। বণিকেরা তাঁহার (ফা-হিয়ানের) গ্রন্থ এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি জাহাজ হইতে ফেলিয়া দিতে পারে এই ভয়ে, ফা-হিয়েন—আর কি করিবেন—একাগ্রমনে "কন শে-য়িনের" কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার্থে হনদেশের দেবতার (?) কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—'আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসন্ধানে এতদূরে আসিয়াছি, এখন তুমি তোমার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আমাকে এই পর্য্যটন ক্লেশ হইতে মুক্ত কর—বিশ্রামস্থানে পৌঁছাইয়া দাও।'

* S. Beal's Records of the Western World.

দিবারাত্র এইরূপ ঝটিকা চলিতেছিল। ত্রয়োদশ দিবসে জাহাজ একটি দ্বীপের নিকটে আসিয়া পড়ে। এখানে ভাটায় জল কমিয়া গেলে জাহাজের ছিদ্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। জাহাজ থামান হইল। সমুদ্রের এই স্থানে অনেক বোম্বেটে থাকিত। ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ—না, মৃত্যু! মহাসাগর প্রসারিত—সীমাহীন তাহার বিস্তার। পূর্ব্বপশ্চিম কিছুই জানিবার যো নাই, কেবল সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকা দৃষ্টে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে না গিয়া জাহাজ বায়ুদ্বারা যেমন চালিত হয় তেমনই চলিত। রাত্রির অন্ধকারে অগ্নিসমান ঔজ্জ্বল্য প্রদানকারী প্রকাণ্ড তরঙ্গভঙ্গ, সুগভীর সমুদ্রের বিকটাকার জন্তুগুলি চারিদিকে দেখা যাইত। জাহাজ কোথায় যাইতেছে না জানিয়া বণিকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্র গভীর—অতলস্পর্শ; তাহারা যে নোঙর করিয়া একটু থামিবে এমন স্থানটুকুও পাওয়া যাইতেছিল না। আকাশ পরিষ্কার হইলে তাহারা দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতে পারিল, তখন আবার জাহাজ ঠিকপথে অগ্রসর হইল। কিন্তু যদি জাহাজ কোন গুপ্ত পাহাড়ে গিয়া পড়ে, তবে আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় থাকিবে না।

"নব্বই দিনের অধিক এইরূপে চলিয়া তাহারা যবদ্বীপে পৌঁছে। * * * * (এখান হইতে তাহারা) আর একখানি প্রকাণ্ড জাহাজে উঠে, এই জাহাজেও দুইশতের অধিক লোক ছিল। ইহারা পঞ্চাশ দিনের খাদ্যসামগ্রী লইয়া ৪র্থ মাসের ১৬শ দিবসে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। ক্বং-বো পৌঁছিবার জন্য তাহারা উত্তরপূর্ব্বের পথ লইল। এক মাসের কিছু পরে একাদশ দিনে যখন রাত্রির ঘণ্টায় দ্বিতীয় প্রহর বাজিয়া উঠিল, তখন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; বণিক এবং যাত্রীরা ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেল। পুনর্ব্বার ফা-হিয়েন তাঁহার সমগ্র মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ক্বন-সে-যিণ এবং হনদেশের শ্রমণ-সম্প্রদায়ের প্রতি চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন, এবং ইঁহাদের ভীতি (প্রভাবে) এবং রক্ষামন্ত্রে দিবাগমন পর্য্যন্ত রক্ষা পাইলেন। প্রভাতে ব্রাহ্মণেরা পরস্পর পরামর্শ করিয়া বলিলেন,—"এই শ্রমণ জাহাজে থাকাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং আমাদিগকে মহাকষ্টে পতিত হইতে হইয়াছে। এখন, এস আমরা এই ভিক্ষুকে কোনও দ্বীপতটে নামাইয়া রাখিয়া যাই। এই একটা লোকের জন্য আমরা কিছুতেই সাক্ষাৎ বিপদাক্রান্ত হইতে পারি না। তখন ফা-হিয়েনের একজন সহায়ক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা এই ভিক্ষুকে নামাইয়া

দিলে, আমাকেও অবশ্য নামাইয়া দিও, তাহা না করিলে আমাকে মারিয়া ফেলিও। তোমরা এই শ্রমণকে নামাইয়া দিলে, আমি যখন হনদেশে অবতরণ করিব, তখন রাজার নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে সকল কথা বলিয়া দিব। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ এবং বিশ্বাসবান্, তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্মান করেন।" কাজেই বণিকেরা বিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং তন্মুহূর্ত্তেই ফা-হিয়েনকে নামাইয়া দিতে সাহস করিল না।

এ সময়েও আকাশ ঘনান্ধকারে পূর্ণ ছিল। বণিকেরা পরস্পরের মুখ চাহিয়া নানারূপ ভুল করিতেছিল। যবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া সত্তর দিবসের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে; তাহাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এখন তাহারা রন্ধনের জন্য সমুদ্রের লবণাক্ত জল ব্যবহার করিতেও আরম্ভ করিল। ভাল জলটুকু সতর্কভাবে ভাগ করিয়া লইত, ইহাতে প্রত্যেকে দুই পাইণ্ট (তিন পোয়া) মাত্র জল পাইত। শীঘ্রই বাকী জলটুকু শেষ হইয়া আসিল। বণিকেরা তখন পরামর্শ করিয়া বলিল—"সাধারণ ভাবে জাহাজ চলিলেও আমাদের এখন ক্বং—চৌ পৌঁছা উচিত ছিল। কিন্তু বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে;—আমরা ভুলপথে আসি নাই ত?" তাহারা তৎক্ষণাৎই জাহাজখানি উত্তর-পশ্চিম মুখ করিয়া দ্বাদশদিন দিবারাত্র চালাইয়া চ্ব-কংয়ের এলাকার সীমাস্থিত লেও পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে আসিয়া পৌঁছিল। এইখানে সুপেয় জল এবং শাক সবজি পাওয়া গিয়াছিল। *

স্থল ও জল উভয় পথেই এইরূপ অসংখ্য বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু মানুষ যখন ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়-আকুল হয়, তখন তাহাকে কে থামাইয়া রাখিতে পারে? কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় প্রচারকেরা নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ মরুগিরিসাগরের বাধা তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—সে চেষ্টায় সফলতাও লাভ করিয়াছেন। এতদপেক্ষা ভীষণতর দুরাতিক্রম্য বাধাও বর্ত্তমান ছিল—তাহা মানুষের বাধা—বুদ্ধিমান বিচক্ষণ শক্তিশালী অত্যাচারী মানুষের বিরোধ। এই বাধাও যাঁহারা অতিক্রম করিয়া নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী সেই সকল ভিক্ষুপ্রচারকদের কীর্ত্তি কাহিনী, আমরা জানিতে চাহিব না কি?

* Prof. Legge's Translation of Fa-hien's Records of the Buddhistic Kingdoms. পৃ—১১১—১১৬।

বিজয়াগীতি।

মেঘভরা এ আঁধার গগণে
বাজিছে বাঁশরী বিষাদের সনে,
বহে না হরষ ধীর সমীরণে,
কেবলই যেন গো শোকসিন্ধু-তান।
শূণ্য আজিকে মণ্ডপ মা'র,
শূন্যরে আজি দীনের আগার,

শূন্য আজিকে হেরি চারিধার,
পূর্ণ যদিও মা-ভরা প্রাণ।
থেকনা জননী, মোদের ভুলিয়া,
আবার আসিও বঙ্গ আলোকিয়া,
তুষিতে পূজিতে চরণে নমিয়া
গাহিতে দিও গো তোমারি গান।

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

ভাব ও ভাষা।

ভাব বলে, 'ভাষা তোর বড় অহঙ্কার।'
ভাষা কয়, 'কি আশ্চর্য্য আছে ইথে আর'॥
'আমিই প্রকাশি তোমা জগত মাঝারে,
আমা বিনা কিছু নাহি হইত সংসারে ;
রাজ কার্য্য ব্যবসায় উন্নতি দেশের
সাধন করাই মোর কার্য্য জীবনের।
অত্যাচার, অবিচার, অভাব মোচনে,
প্রফুল্ল হৃদয়ে চেষ্টা করি প্রাণপণে।
প্রেম, প্রীতি, সখ্য, ভক্তি, ভালবাসা আর,
আমা বিনা এ জগতে হত কি প্রচার?'

ভাব বলে, 'অহঙ্কার কর কার কাছে,
আমাবিনা তোর মাঝে আর কিবা আছে?
ভাবহীন ভাষা যেন শিমুলের ফুল।
সেই হেতু মোর আশা করে কবিকুল।'
শুনি ভাষা হেসে কয় 'একি ব্যবহার!
অহঙ্কার নাই তব শুধুই আমার?
আমি অহঙ্কারী বলে' নিন্দিলে আমারে ;
এবে অহঙ্কার তব দেখুক সংসারে।
ভাষার বিহনে ভাব না হয় প্রকাশ,
ভাবহীন ভাষা কেহ নাহি করে আশ॥'

শ্রীউপেন্দ্রলাল সরকার।

সাহিত্যে মাতৃমূর্ত্তি।

আজকাল একটা কথা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে যে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাতৃমূর্ত্তির একান্ত অভাব, আমাদের সাহিত্যরথিগণ কেহই মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এ অপরাধে অপরাধী। প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবিষয়ে বঙ্কিম বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বড় মন দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাতৃমূর্ত্তি খুবই কম। ইহার কারণ কি? যে দেশে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী', যে দেশে ইষ্টদেবতা মাতৃমূর্ত্তিতে পরিকল্পিত, সে দেশের সাহিত্যরথিগণ যে মাতৃ-মূর্ত্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই,—ইহাও কি সম্ভব? অনেকে এরূপও আক্ষেপ করেন যে, পাশ্চাত্য কলায় যেমন সব মাতৃচিত্র আছে, ম্যাডোনায় মাতৃ-মূর্ত্তির যে অলৌকিক পরিকল্পনা হইয়াছে, আমাদের আধুনিক চিত্রকলাতেই তাহার জোড়া কই?

আমার মনে হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে কারণে খ্রীষ্ট চিত্রের অভাব, ঠিক সেই কারণেই আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাতৃমূর্ত্তির অভাব। পাশ্চাত্যের ধারণা ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে খর্ব্ব করা হয়, দেবতার অপমান করা হয়। দেবতার স্থান ঊর্দ্ধে। আর এক কথা—চরিত্রচিত্রাঙ্কন যদি কথা সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, যদি মনুষ্য-হৃদয়ের বিভিন্ন বৃত্তির ঘাত প্রতিঘাত দেখান কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, পাপপুণ্যের আলোছায়া প্রদর্শন করাই নাটক অথবা উপন্যাসের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে দেবতা বা দেবীরূপা মাতৃমূর্ত্তিকে দূরে রাখিতে হইবে। মাতৃচিত্র সম্মুখে রাখিয়া অকুণ্ঠ পুণ্য-চরিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে; অস্খলিত আদর্শ স্থাপন করা যাইতে পারে; কারণ তাহার সান্নিধ্যে মনুষ্যহৃদয়বৃত্তির অবাধ গতি ব্যাহত হয়, মানব চরিত্রের বৈচিত্র নষ্ট হয়।

য়ুরোপীয় সাহিত্যিকগণের ধারণা, যে সাহিত্যে ঈশ্বরের কথা থাকিবে সেখানে তিনিই একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হইবেন; অন্য ব্যক্তিত্ব যাহা থাকিবে তাহা ঈশ্বরের ছায়ারূপী ও তাঁহার মাহাত্ম্যের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য আমাদের ধর্ম্মসাহিত্য সর্ব্বসময়ে ঠিক এপথে চলে নাই,—কৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপ্তি,

সর্ব্বত্র তাঁহার লীলাপ্রকটন, তাহার প্রমাণ। কিন্তু মাতৃচিত্র-অঙ্কনে আমাদের সাহিত্যিকগণের মনে এই সত্যটির বুঝি প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছিলেন, যে মাতৃচিত্র আঁকিতে হইলে সে কাব্যকে মাতৃপ্রধান কাব্য করিতে হইবে,—তাহাতে মাতৃস্নেহ বা মাতৃভক্তি ছাড়া অন্য কিছুর অবসর থাকিবে না। আমরা গৃহদেবতাকে সকলের ভাল ঘরখানিতে সিংহাসনে বসাইয়া রাখি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি করি। সংসারের দ্বন্দ কলহ ত মিটিবার নয়, রাগ দ্বেষ ত দূর হইবার নয়, পাপ তাপ ত নিবৃত্ত হইবার নয়, তবে আমার ইষ্টদেবতাকে কেন তার মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহার অপমান করি? তাই তাঁহাকে একটু দূরে রাখিয়াছি। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সংসারের নিকট একটু ছুটি লইয়া, মনের পাপ তাপ যতটুকু পারি বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাই। সেখানে তিনি একা,—সে রাজ্যের তিনিই রাজ্যেশ্বর।

সেখানে তিনি মা অনন্ত স্নেহময়ী, অনন্ত করুণাময়ী মা,—আর আমি সন্তান; পাপী হইলেও, তাপী হইলেও, অবাধ্য হইলেও, বিষয়-বিষজর্জ্জরিত হইলেও, যেখানে আমি শুধুই সন্তান। আমার আর সব মুছিয়া গিয়াছে,ফুরাইয়া গিয়াছে,—চক্ষে দেখিতেছি, সম্মুখে রাজরাজেশ্বরী মাতৃমূর্ত্তি আর অনুভব করিতেছি। হৃদয়ে মাতৃভক্তির প্রবাহ। সাহিত্যে মাতৃচিত্রের অবতারণা করিলে তাঁহাকে এই ভাবেই দেখিতে হইবে। মাকে লইয়া খেলা করা বড় সামান্য কথা নহে। শিশুর মত নিষ্পাপ. সরল ও ভক্ত হইতে হইবে। যিনি পারেন তিনিই করুন,—তিনিও ধন্য হউন, আমরাও ধন্য হই!

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মেনকা ও যশোদার মাতৃমূর্ত্তি বড় উজ্জ্বল, বুঝি এমন জগতের কোন সাহিত্যে নাই। এখানে কেবল জননী মেনকা আর কন্যা গৌরী। পিতা হিমালয় যেন চাপা পড়িয়া আছেন। মেনকার মাতৃস্নেহ শতধারায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে! রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া আকুল ভাবে হিমালয়কে বলিতেছেন,—গৌরী, 'গৌরী আমার এসেছিল!' বৎসরান্তে তিনটি দিন গৌরীর দেখা পান, সেই তিন দিনের আশায় প্রাণ ধরিয়া থাকেন। ষষ্ঠীর দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া হিমালয়কে বলেন, 'ওগো! আমার গৌরীকে নিয়ে এস! আমি যে তাকে কতদিন দেখি নাই।' লোকের মুখে শুনিতে পান শিব নাকি শ্মশানবিহারী,

ভস্ম মাখে, ভিক্ষা করে, তাই গৌরীকে কোলে লইয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলেন, 'কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বলনা তাই।' এ মাতৃমূর্ত্তির তুলনা নাই। তার পর মা যশোদা। কিন্তু এখানে মা যশোদা ও নীলমণি নহেন। এখানে বলাই দাদা আছেন, শ্রীদাম সুদাম আছেন, গোপী আছেন, বৃন্দা আছেন, রাধা আছেন, আয়ান ঘোষ আছেন। এখানে বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, প্রেম সকলই একাধারে। নীলমণি মা যশোদার কোলে বসিয়া ননী খাইতেছেন, বলাই দাদার সঙ্গে গোঠে যাইতেছেন, গোপীর ঘরে হাঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন, কুঞ্জে রাধার মান ভাঙ্গিতেছেন, আবার আয়ানকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণকালী সাজিতেছেন। সকল রসের লীলা একাধারে হইতেছে, কিন্তু সেটা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া। ভগবানের লীলার বিচার করিতে বসি নাই। তবে কথা এই যশোদার মত মাতৃমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া এমন একটি নীলমণি চরিত্র কেহ আঁকিতে সাহস করেন কি?

উলঙ্গ পাপ-চিত্রের কথা বলিতেছি না। মানুষের হৃদয়ের যে টুকু অতি সাধারণ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, চিত্তসংযমের অভাবের বিষময় যে ফল, পাপের যে আপাত-মনোরম মূর্ত্তি ও তাহার শোচনীয় পরিণাম, পাপপুণ্যের যে দেবাসুর সংগ্রাম—মানবজীবনের যাহা শ্রেষ্ঠতম শিক্ষণীয়—তাহার অবতারণা কি মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া করা যাইতে পারে?

'বিষবৃক্ষের' প্রতিপাদ্য বিষয় চিত্তসংযমের অক্ষমতার বিষময় পরিণাম। তাই আমরা নগেন্দ্রনাথের জননীকে জীবিত দেখিতে পাই নাই, তাই কুন্দনন্দিনীর জননীকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছি। জননী জীবিত থাকিলে, সম্মুখে থাকিলে কি নগেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ করিতে পারিতেন? তাহাতে কি জননীকে অপমান করা হইত না? তাহাতে কি মাতৃমূর্ত্তির গৌরবের লাঘব ঘটিত না? তিলোত্তমার দূতীগিরি করিয়াছিলেন বিমাতা, শচীন্দ্রনাথেরও তাই। গোবিন্দ-লালের প্রসাদপুর যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার মাতা কাশিবাসিনী হইয়াছিলেন। হীরার যেন চরম অধঃপতনের পূর্ব্বে তাহার আয়ীটাও স্থানান্তরে ছিল। ধন্য মহাকবি, মাতৃচরিত্রের মাহাত্ম্য তুমি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলে! মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে বুঝি তোমার সর্ব্বতোমুখী অলৌকিক প্রতিভা সম্ভ্রমে আনত হইয়া আসিত; পাছে মাতৃমূর্ত্তির গৌরবের লাঘব ঘটিয়া যায়, এই ভয়ে মাতৃচিত্রাঙ্কনের কথা মনে হইলে বুঝি তোমার হৃদয়ে বেপথু উপস্থিত হইত; তোমার অলোকসামান্যসৃজন-পটিয়সী দুর্জ্জয়শক্তিশালিনী লেখনী হস্তচ্যুত হইয়া পড়িত।

যশোদা ও মেনকার মত জননী চিত্র না থাকিলেও বঙ্কিমসাহিত্যে আংশিক ভাবে মাতৃমুর্ত্তি আছে ; এবং যাহা আছে, যেটুকু আছে, তাহার তুলনা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

বিষবৃক্ষে সোণার কমল, ইন্দিরায় সুভাষিণী, আনন্দমঠে কল্যাণী ও নিমাই আর সীতারামে রমা—ইহারা সকলেই অল্পাধিক পরিণত জননীচিত্র। তন্মধ্যে রমার জননীচিত্রই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রমার চিত্রে দেখিতে পাই, কেমন করিয়া পত্নীত্ব জননীত্বে লীন হইয়া যায়। শ্রীকে পাইয়া সীতারাম রমার দিকে আর বড় আসিতেন না, কিন্তু রমা পুত্রকে লইয়া সীতারামের অনাদর একরূপ সহিয়াছিল। রমা সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া গঙ্গারামকে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ডাকিয়া সন্তানের রক্ষার উপায় করিতে গিয়া আপনি আপনার মৃত্যুর কারণ হইল। রাজসভায় দাঁড়াইয়া পুত্রের মুখ চাহিয়া সীতারামকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে, আনার ধর্ম্ম কর্ম্ম এই শিশু!" মৃত্যুশয্যায় রমা সীতারামকে বলিয়াছিল, "মায়ের অপরাধে সন্তানকে ত্যাগ করিও না।"

অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকদের কাব্যে দুইটি প্রধান মাতৃচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক 'জনা' আর এক 'মুরা'। পুত্রশোকাতুরা 'জনার চরিত্রে প্রতিহিংসাবৃত্তি অস্বাভাবিকরূপে তীব্র। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তিনি সিংহিনীর দন্ত কাড়িতে উদ্যত, ফণিনীর গরল হরণ করিতে অভিলাষিণী। জননীর জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিই আমরা দেখিতে চাহি, সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী মুর্ত্তি নহে। অধিকন্তু 'জনা' নাটকে 'জনার' মাতৃগৌরবও ক্ষুন্ন হইয়াছে। প্রবীর যত বড় বীরই হউন, যত বড় ভক্তই হউন, তাঁহার মাতৃবৎসলতা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নহে। দেবী-চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি প্রবীরের মাতৃভক্তি হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীর জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন একটা অপ্সরার গানে মুগ্ধ হইয়া বীরধর্ম্ম ভুলিয়া গেলেন, জননীর পবিত্র পদধূলির অবমাননা করিলেন! প্রবীর যখন অপ্সরার সহিত প্রেমালাপে মগ্ন, তখনও জননীর আশীষচুম্বন-রাগ তাঁহার গণ্ডে মিলাইয়া যায় নাই!

আর 'মুরা' ত চাণক্যের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। মুরার মাতৃহৃদয় চাণক্যের রাক্ষসমন্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। জননী সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন, মুরা নন্দের এক অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন নাই। "আর যদি স্ত্রীহত্যা হয়' বলিয়া মুরা যখন যূপবদ্ধ নন্দর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কাত্যায়নকে

বলিলেন, "আমার আজ্ঞা—বধ কর।" তখন কে বলিবে মুরা জননী? মুরা রাক্ষসী। কে বলিবে মুরা চন্দ্রগুপ্তের জননী? কে বলিবে মুরা নন্দকে স্তন্য দিয়া মানুষ করিয়াছেন?

জননী মুরা চন্দ্রগুপ্তকে ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত করিলেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে বুকে ধরিয়া বলিতে পারিলেন না, "বৎস, মগধের সিংহাসন কি ভাইয়ের চেয়ে বড়? আমি রাজমাতা হইতে চাহি না, তুমিই আমার রাজ্য।"

অত্যাচার জনিত প্রতিহিংসায়, উপেক্ষায় আহত অভিমানে রমণীর দলিতা ফণিনী মূর্ত্তি অনেক সময়েই নটকলার উপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু জননী সামান্যা রমণী নহেন। সন্তানের শত অত্যাচারে, সহস্র উপেক্ষায় জননী চিরস্নেহময়ী ক্ষমাপরায়ণা জননীই থাকেন। অপরাধী সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য জননীর স্নেহবাহু কম্পিত আগ্রহে চিরদিন প্রসারিত হইয়া আছে। অনুতপ্ত সন্তানের হৃদয়জ্বালা জুড়াইবার জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-কাদম্বিনী প্রাবৃটের সলিল-সম্ভার সমৃদ্ধ মেঘের মত চিরদিন বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছে।

বরং বঙ্গসাহিত্যে মাতৃমূর্ত্তির এই অভাব চিরদিন থাকুক, তথাপি এমন মাতৃচিত্র আমরা দেখিতে চাহিব না, যাহা পবিত্রতায় ও করুণায়, স্নেহে ও ক্ষমায়, আপনার উচ্চ সিংহাসনে অক্ষুন্ন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা-সাধ।

(১)

সন্ধ্যা-রাণী নেমে আসে,
অতি ধীরে মৃদুশ্বাসে,
হেমন্তের দিবা শেষে
স্তবধ ধরণী-বাসে!
নিথর বিটপী-লতা,
নিথর সে নীলাম্বর,
অনন্দে হাসিতে চায়
মোর শুধু সাধ যায়
দলি বাধা-ব্যবধান,
একবার দেখে আসি
আমারি প্রাণের প্রাণ!

(২)

সেথা কি নামে নি সন্ধ্যা
সেথা কি ফুটে নি চাঁদ,
সেথা কি রচেনি কেহ

এই সেনহাটী গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়। 'সদ্ভাব শতকের' অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গৃহস্থিত বাসুদেবমূর্ত্তি তাহাদের অন্যতম। এই মূর্ত্তিটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। মূর্ত্তিটি কষ্টিপাথরের বলিয়া বোধহয়। ইহা উচ্চতায় দুই ফিট হইবে। মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, পরিধানে আজানুলম্বী কটিবাস, গলে কটিদেশাবলম্বী যজ্ঞোপবীত ও আজানুলম্বী বনমালা। দক্ষিণাধঃহস্তে চক্র, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে পদ্ম ও বামহস্তে শঙ্খ বিদ্যমান, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও বামপার্শ্বে বীণাহস্তা পুষ্টি দণ্ডায়মানা। মূর্ত্তির পদনিম্নে গরুড়, গরুড়ের দক্ষিণে দুইটি ও বামে একটি অপরিজ্ঞাত মূর্ত্তি। বাসুদেবের স্কন্ধদেশের একটু উপরে চালে দুই দিকে দুইটি করিয়া চারিটি মূর্ত্তি এবং তাহার আর একটু উপরে দুইদিকে পাঁচটি করিয়া দশটি মূর্ত্তি খোদিত আছে। সে গুলি দশাবতারের দশমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এই মূর্ত্তিগুলির উপর তৈল ও চন্দনের প্রলেপ পড়ায় সেগুলি এরূপ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমান তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

এই বাসুদেব মূর্ত্তি কোন সময়ে, কোথা হইতে কাহার দ্বারা, কি ভাবে আনীত হইয়াছিলেন, তার সমন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে তাহা এইরূপ :——

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সেনহাটী গ্রামে নবহরিদাস কবীন্দ্রবিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কামাখ্যাধিপতির রাজধানীতে কিছু দিন দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত নিজ কার্য্যসম্পাদন করিয়া ৺কামাখ্যা মহাপীঠস্থানে উৎকট তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, এই তপস্যকালীন একবার মহানবমীর দিন প্রত্যুষে অকস্মাৎ তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। চক্ষুরুন্মিলন করিয়াই তিনি সম্মুখে একটি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকার অলৌকিক রূপদর্শনে ও শ্রুতিসুখকরী মধুরা বাণী শ্রবণে তাঁহাকেই স্বীয় ইষ্টদেবী বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এবং বিহ্বলচিত্তে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, যদি আসিয়াছ, তবে একবার আমাকে তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ কর।' কবীন্দ্রবিশ্বাসের কথা শুনিয়া বালিকারূপিনী মহামায়া উত্তর করিলেন—'বাছা, এখন আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব না। যদি একান্তই তোমার ইষ্টদেবী দেখিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আমি তাহার উপর তোমাকে বলিতেছি। আমার বর পুত্র মেহারদেশের সর্ব্বানন্দনাথ কাশী যাইবার পথে এখন তোমার বাসভূমি সেনহাটীতে অবস্থিতি করি-

তেছেন। তুমি রাত্রিযোগে নিজ বাটীতে পৌছিয়া তাঁহার নিকট সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ কর। তাহা হইলেই অল্পকাল মধ্যে ইষ্টরূপ দর্শন করিতে পারিবে। আমি তোমাকে আর একটি কথা বলিতেছি—এই মন্দিরের পশ্চাতে লক্ষ্মী ও বাসুদেব বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকা পুরাণ দেখিতে পারিবে। তুমি যত্নপূর্ব্বক বিগ্রহাদি গ্রহণ করিয়া যত্ন ও ভক্তির সহিত রক্ষা ও পূজা করিবে, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।'

দেবীর কথা শুনিয়া কবীন্দ্রবিশ্বাস বলিলেন-'মা! এ যে বড় অসম্ভব কথা। সেনহাটী এস্থান হইতে দহুদূরে অবস্থিত,—কি করিয়া অদ্য রাত্রির মধ্যে আমি সেখানে পৌছিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিব?' দেবী উত্তর করিলেন 'বাছা, ভয় পাইও না। অদ্য দিবাবসানে ব্রহ্মপুত্রনদের ঘাটে উপস্থিত থাকিও, তখন যে আগ্রহ সহকারে তোমাকে নৌকায় লইয়া যাইতে যত্ন করিবে, সেই নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলেই রাত্রিকাল মধ্যে তুমি নিজ গৃহে উপস্থিত হইতে পারিবে।' এই বলিয়াই যোগমায়া অন্তর্হিতা হইলেন। কবীন্দ্রবিশ্বাসও দেবীর কথা মত মন্দিরেব পশ্চাৎ ভাগে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মী ও বাসুদেবের বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকাপুরাণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন।

অনন্তর দিবাবসানে ব্রহ্মপুত্রতটে উপস্থিত হইবামাত্র এক নাবিক আসিয়া কবীন্দ্রকে নিজ নৌকায় লইতে যত্নপর হওয়ায় তিনি বিগ্রহাদিসহ নৌকারোহণ করিলেন এবং রাত্রি মধ্যেই নিজ জন্মভূমিতে পৌঁছিয়া ভৈরবনদতীরস্থিত নিজ পঞ্চবটীর অশ্বত্থবৃক্ষমূলে নৌকা বাঁধিলেন। লক্ষ্মী ও বাসুদেব উভয় বিগ্রহই আকারে বৃহৎ থাকায় তাহাদিগকে একেবারে লইবার সুবিধা হইল না। তাই কবীন্দ্রবিশ্বাস লক্ষ্মীকে নৌকায় রাখিয়া প্রথমে বাসুদেব বিগ্রহ, শঙ্খ ও পুরাণ লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে লক্ষ্মীকে লইবার জন্য পুনরায় ঘাটে আসিয়া লক্ষ্মীসহ সেই মায়াতরী এবং পঞ্চবটীর ও চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। কবীন্দ্রবিশ্বাস অবাক্ হইয়া নদীতীরে উপবেশন করিলেন। এমন সময় কে যেন দূর হইতে বীণানিন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'কবীন্দ্রবিশ্বাস! তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে ঠাকুরকে লইয়া গিয়াছ। আমি আর তোমার গৃহে যাইব না। তুমি ঠাকুরকে ভালবাস—তাঁহাকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দাও—তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।—যাও বৎস, তোমার মন্ত্রগ্রহণের সময় যায়, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আমার স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।'

এই দৈববাণী শুনিয়া কবীন্দ্রবিশ্বাস বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সর্ব্বানন্দসমীপে গমনপূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মহামায়ার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ইহার পর যথাসময়ে কবীন্দ্র বিশ্বাস বাসুদেব বিগ্রহকে স্বীয়গৃহে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নিয়মিত সেবাপূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কবীন্দ্রবিশ্বাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের সময় সেনহাটীর তদানীন্তন ভূস্বামী চাঁচড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় সেনহাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাসুদেব ঠাকুরের বাসের জন্য একটি ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নিয়মিত সেবাপূজার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ২।৩ বিঘা জমি দান করেন। বহুদিন ধরিয়া এই জমির উপসত্বে বিগ্রহের সেবা পূজা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সাময়িক জীর্ণ সংস্কারের অভাবে সে মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ায় এবং নানা কারণে দেবোত্তর সম্পত্তি আয় কমিয়া যাওয়ায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র অতি যত্নে গৃহহীন বিত্তশূন্য বিগ্রহকে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক একাকী সমস্ত ব্যয় ভারবহন করিয়া তাঁহার সেবাপূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কবিবরের পুত্র শ্রীযুতউমেশচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের সেবাপূজার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বিগ্রহের সহিত প্রাপ্ত সেই কালিকাপুরাণ ভূতপূর্ব্ব 'সখাসাথী' সম্পাদক ও কলিকাতার 'সাথী' প্রেমের সত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সেনহাটীর বাটীতে ও দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ জমিদার ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর মজুমদার বি, এল মহাশয়ের বাণীবহের বাটীতে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পূজিত হইতেছে।

সেনহাটীর দ্বিতীয় প্রাচীনকীর্ত্তি ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ নির্ম্মিত একটি শিবমন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও তাঁহার খনিত একটি দীঘি। সাধারণ চক্ষে ইহার মূল্য অল্প হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট ইহার যথেষ্ট আদর আছে। কারণ মোগলস্থাপত্যের আদর্শানুকরণে রাজবল্লভ তাঁহার বাসভূমি রাজনগরকে যে সকল কারুকার্য্যময় বিবিধ সৌধ এবং সপ্তরত্ন একুশরত্ন ও শতরত্ননামক বিশাল বিরাট মঠাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন, কীর্ত্তিনাশা পদ্মার বিরাটগ্রাসে পড়িয়া চিরদিনের জন্য তাহা লোক চক্ষুর অগোচর হইয়াছে। সুতরাং রাজবল্লভ-কৃত সৌধাবলীর গঠনপ্রণালী ও বাঙ্গালীর কলাকুশলতার ও স্থাপত্যনৈপুণ্যের সাদৃশ্য অনুভব করিতে হইলে এই দুইটি হইতেই তাহার কতক পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। মন্দিরাদির বিবরণ দিবার পূর্ব্বে আমরা ইহা নির্ম্মাণের একটু ঐতি-

হাসিক বিবরণ দিতে চাই। রাজবল্লভ যে বৈদ্যজাতীয় ছিলেন তাহা সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বেদগর্ভ সেন নিজ পৈতৃক বাসভূমি যশোহর জেলার ইতিনা গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর আসিয়া বাস করায় কুলহীন হন। তাই বিত্তশালী হইয়া রাজবল্লভ প্রথমেই প্রণষ্ট কুলগৌরব উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়া পুত্র কন্যাদিগকে কুলীনবংশে বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন। সেনহাটীনিবাসী কন্দর্প-রায়ের কন্যা কমলাদেবীর সহিত তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন! কিন্তু কুলগৌরব-স্ফীত বক্ষ কন্দর্প প্রথমে কিছুতেই অকুলীনে কন্যা দান করিতে সম্মত না হওয়ায়, রাজা রাজবল্লভ তাঁহাকে সেনহাটীর তদানীন্তন জমীদার চাঁচড়ার রাজা বাণীকণ্ঠের দ্বারা অনুরোধ করান। কন্দর্প রায় বাস্তুপুরুষের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার গৌরবরক্ষার জন্যই অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। যথাসময়ে রাজা গঙ্গা-দাসের সহিত কমলাদেবীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহো-পলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন প্রথানুযায়ী কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্য রাজবল্লভ বৈবাহিক কন্দর্পরায়ের বাটীতে পাকা বাসগৃহ ও মঠমন্দির প্রস্তুত করিয়া, এবং একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজবল্লভের নির্ম্মিত শিবমন্দিরটি পূর্ব্বমুখ এবং দোচালা বাঙ্গলাঘরের ন্যায়। ছাদটি সম্পূর্ণ খিলানের উপর অবস্থিত। ইহাতে কড়ি বরগা কাষ্ঠ লৌহ প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই। মন্দিরটি দশ হাত দীর্ঘ ও সাড়ে পাঁচ হাত প্রস্থ একটি মাত্র কক্ষ। কক্ষটির দুইটি মাত্র দ্বার। একটি পূর্ব্বদিকে, অপরটি উত্তর দিকে। পূর্ব্বদিকের সদর দ্বারটি বড়। গৃহের সম্মুখ দিকের প্রাচীরস্থ ইষ্টকাবলীতে নানাবিধ কারুকার্য্যমণ্ডিত বিবিধ ফুলপত্র এবং নানাপ্রকারের শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। মন্দিরের ছাদ ভেদ করিয়া এখন বট ও অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা অভগ্নাবস্থায়ই দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরে বর্ত্তমানে কোন বিগ্রহ নাই। লোকে বলে, কন্দর্প রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যা রাণী কমলা উহা রাজনগরে লইয়া গিয়াছিলেন।

রাসমঞ্চটি বহির্বাটীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা তিন থাক্ বিশিষ্ট। নিম্ন থাক্ দুইটি জল বায়ুর অত্যাচারে লোনা ধরিয়া চারিপাশেই অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। উপরের থাকৃটি এখনও অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আছে। মঞ্চটির উচ্চতা ২৫ হাতেরও অধিক হইবে। ইহার নিম্নাংশ দিয়া উত্তর দক্ষিণ

সময়ে বাটীর তোরণ রূপে ব্যবহৃত হইত। মঞ্চটীর বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন ইহা আর অধিক দিন দণ্ডায়মান থাকিবে না—সামান্য ভূকম্পনে বা ঝড়ের পীড়নেই ভুমিসাৎ হইয়া যাইবে।

এই রাসমঞ্চের ৭০।৮০ হাত দক্ষিণে রাজবল্লভ খনিত দীঘি। নিজ পুত্রবধূর নামানুসারে তিনি ইহার 'কমলা দীঘি' নামকরণ করেন। গত পূর্ব্ব বৎসর এই 'কমলা দীঘি' ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত আর একটি পুকুর লইয়া খুলনা ডিষ্টিক্ট বোর্ড একটি রিজাভ´ ট্যাঙ্ক করিয়া দিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য দীঘির অধিকারিগণ স্বতঃ-পরতঃ বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সেনহাটীর তৃতীয় দর্শনীয় প্রাচীনকীর্ত্তি 'শিবানন্দ' ও 'সরকার ঝি' নামক দুইটি প্রাচীন দীঘি।

'শিবানন্দ' গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা শীতলার পীঠস্থান 'বিজয়াতলা'র পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কথিত আছে, সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দের পুত্র শিবানন্দ এই দীঘিখনন করিয়া নিজ নামানুসারেই ইহার নাম 'শিবানন্দ' রাখেন। আবার অন্য কেহ কেহ বলেন, খাঁজাহান আলি যখন গৌড় হইতে সুন্দর বনের দিকে আসিতেছিলেন তখন তিনিই পথিমধ্যে এক রাত্রির মধ্যেই এই দীঘি খনন করিয়া দেন। বহুদিন পরে বৈদ্য হিঙ্গুবংশীয় শিবানন্দ সেন এই দীঘি জমা লইয়া নিজনামে ইহার নামকরণ করেন। 'শিবানন্দ' সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে এই যে কোনও সময় ইহাতে সাতটি যক্ষগ্রস্ত ধনের মাইট ছিল। একদিন এক দুধওয়ালী ইহাদের নিকট কিছু ধন প্রার্থনা করে। তখন দৈববাণী হইল, "সকলের ছোট মাইট হইতে তুই একবারে যত পারিস ধন তুলিয়া লইয়া যা। কিন্তু সাবধান! একবারের অধিক দুইবার লইতে গেলেই কিন্তু তোর অমঙ্গল হইবে।" দৈববাণী শেষ হইতে না হইতেই ছোট মাইটের ঢাকনি খুলিয়া গেল। দুধওয়ালী তাহা হইতে একেবারে যত পারিল ধন তুলিয়া লইল, কিন্তু মাইটপূর্ণ ধন দেখিয়া তাহার আরও লইতে লোভ হইল। সে যখন আবার মুখ নিচু করিয়া মাইট হইতে ধন তুলিতে গেল, তখন ঢাকনিটা সশব্দে দুধওয়ালীর নাক কাটিয়া পড়িয়া গেল। ইহার পরেই সাতটি মাইটই একযোগে শিবানন্দের উত্তর পাড় ভেদ করিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া গেল। তাহারা যে পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল, দুধওয়ালীর নাক-

'সরকারঝি' দীঘিটি খুব বড় না হইলেও ইহার নামকরণ-কাহিনীটি বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। সরকারঝি সম্বন্ধে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি ব্যতিত বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা জনশ্রুতির ত অনাদর করিতে পারি না। কারণ জনশ্রুতিও ত ইতিহাসের একটি অবলম্বন বটে।

এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহর মুজানগরে নূর উল্লা খাঁ নামক একজন ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্তের ভার ছিল তাঁহার জামাতা লালখাঁর হস্তে। নবীন যুবক লালখাঁ বহু সৈন্যসামন্তের কর্ত্তা হইয়া বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। লালখাঁর অত্যাচারে গৃহস্থবধূগণ ভীত ও সংত্রস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহার অত্যাচার চরমে উঠিল। তাহার পাপদৃষ্টি নূর উল্লার হিসাব নবিশ রাজারাম সরকারের কন্যা বিধবা সুন্দরীর উপর পড়িল। তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত লালখাঁ বৃদ্ধ রাজারামকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন ফৌজদারসাহেব বিদেশে ছিলেন।

রাজারামের কন্যা সুন্দরী অল্পবয়স্কা হইলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, জানিয়া তিনি লালখাঁর প্রস্তাবে সম্মতির ভাণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"আমার পিতাকে ছাড়িয়া দিলেই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমি আমার পিত্রালয় সেনহাটীতে একটি পুকুর কাটাইয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহা উৎসর্গ করিতে চাই। আপনি সেই বন্দোবস্ত করিয়া দিন।" সুন্দরীর কথা সত্য মনে করিয়া লালখাঁ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং বহুসংখ্যক বেলদার সঙ্গে দিয়া সুন্দরীকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মুজানগর হইতে যাইবার সময় সুন্দরী পিতাকে বলিয়া গেলেন—"শুধু সময়ক্ষেপ করিবার জন্যই আমি এই কৌশল অবলম্বন করিতেছি। ফৌজদার সাহেব বাড়ী আসিলে তাঁহাকে বলিয়া কোন গতিকে আপনি মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। যদি মুক্ত হইতে পারেন, তবে অবিলম্বেই দেশে চলিয়া যাইবেন। আর যদি না পারেন এবং প্রাণের আশঙ্কা বোধ করেন তবে শিক্ষিত পারাবত ছাড়িয়া দিবেন। পারাবত দেখিলেই আমিও আমার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব।"

যথাসময়ে লোকজন সহ সেনহাটীতে পৌঁছিয়া সুন্দরী দীঘি খননের অনুমতি দিলেন। খনকেরা মুসলমান ছিল। তাহারা নিজেদের সংস্কার মত পূর্ব্ব পশ্চিম

লম্বা দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করিল। সুন্দরী তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কারণ কোন প্রকারে সময় কাটানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হইল। সুন্দরী পিতার কোন সংবাদই পাইলেন না। তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। এদিকে দীঘির খননকর্ম্ম শেষ হওয়ায় তিনি তাহা উৎসর্গ করিবার আয়োজন করিলেন। উৎসর্গের দিন সন্তরণে দীঘি পার হইবার অভিপ্রায়ে জলে অবতরণ করিয়াছেন। এমন সময় তাঁহার পিতার শিক্ষিত পারাবত উড়িয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিল। পারাবত দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সন্তরণচ্ছলে দীঘির গভীর জলে গিয়া ডুব দিলেন—আর উঠিলেন না।

এদিকে ফৌজদার সাহেব দেশে ফিরিয়া লালখাঁর অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া রাজারামকে মুক্তি দিলেন। কারা-মুক্ত রাজারাম জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণ করিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার শিথিলবস্ত্র হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত পারাবত উড়িয়া গেল। বিপদ গণিয়া রাজারাম তখনই বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিজ বাসভুমিতে আসিয়া দীঘির পাড়ে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কন্যাস্নেহকাতর বৃদ্ধ রাজারাম আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়াই দঘির জলে ঝম্প প্রদান করিয়া কন্যার অনুগমন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

সরকারঝি সুন্দরী বহুকাল হইল মরধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাস্তুভুমির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার খনিত দীঘি ‘সরকার ঝি’ এখনও গ্রাম্য বালক বালিকা, পল্লীযুবতী ও বয়োবৃদ্ধদিগের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে—তাঁহার দুরদৃষ্টের করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে এখনও তাহাদের নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া আইসে।

বঙ্গের বিভিন্ন পল্লীতে এইরূপ কত শত প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান। কিন্তু কে তাহার অনুসন্ধান রাখেন? আমরা সরকারী গেজেটিয়ারের পাতা উল্টাইয়া সহানুভূতিবর্জ্জিত বিদেশী লোকের স্বকপোল কল্পিত অলীক কাহিনী পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক সাজিয়া বসি, আর বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া গম্ভীর চা'লে বলি—‘না, আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপকরণ কিছুই নাই। অথচ আমাদের নিজপল্লীর কক্ষে, পথের পাশে, গাছের তলে, গৃহের কোণে কি আছে

না আছে, তাহা কেহ খোঁজ করিয়া দেখি না বা দেখিবার আবশ্যকতা অনুভব করি না। ইহা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার কথা নহে। যদি দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হয় যদি দেশের প্রাচীন গৌরবের কথা দশ জনকে জানাইতে হয়, তবে এই সকল স্থান হইতেই তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে বেশী সময়ের আবশ্যক হইবে না। অর্থব্যয়েরও আশঙ্কা নাই যে কেহ ইচ্ছা করিলেই অবসর সময়ে অনায়াসেই ইহা করিতে পারেন। এই কার্য্যে আমি আমার স্কুল ও কলেজের ছাত্র বন্ধুবর্গকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারাই দেশের ভবিষ্য আশাস্থল। এখন তাঁহাদের তরুণ বয়স—এখন তাঁহারা নবোদ্যমে বলীয়ান্—নবোৎসাহের অধিকারী,—সুতরাং এই তাঁহাদের কাজ করার প্রকৃত সময়। ছুটিতে যখন তাঁহারা বাড়ীতে আসেন তখন কতক সময় যদি তাঁহারা এই কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে আবশ্যক উপকরণ সংগৃহীত হইয়া যাইবে,—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেরা কৃতার্থ হইবেন—তাঁহাদের পল্লীমাতারও মুখোজ্জ্বল হইবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সাধে বাদ। *

(১)

ছিল সাধ মনে হয়ে "কণ্ঠহার"
শোভিব গলায় তার,
ফিরে দেখি হায়! বিষম বিভ্রাট!
হয়েছি "পশরা-ভার!"

(২)

ছিল সাধ মনে "কঙ্কণ" হইয়া
রহিব গৌরব ভরে,
পড়িতে পলক ভাঙ্গিল চমক
'নিরখি বেড়ি' যে করে!

(৩)

ছিল সাধ মনে "নূপুর" হইয়া
বাজিবে চরণে তার,
একি বজ্রাঘাত! হইনু "কণ্টক"
বহে যে রুধির ধার!

(৪)

বুঝি এইবার জনমের মত
করিবে নিক্ষেপ হায়!
অনাথের গতি কোথা তুমি আজ
দেও দেখা অনাথায়।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

* লেখিকার অন্তিম-রোগ শয্যায় লিখিত "বৈশাখী" নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে এই কবিতাটী সঙ্কলিত হইল।

"ব্রজবেণু।" *

——•:•:•——

এমন একদিন গিয়াছে যখন অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিকৃত-তান্ত্রিকতার সুরা সুরা-গন্ধ দুষ্ট ও নারীলিপ্সা-পঙ্কিল হৃদয়-বৃত্তি-অন্তরাল হইতে কল্যাণের মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করিবার জন্য কামজ প্রেমকেই বিশেষভাবে কাব্য সৌন্দর্য্যের আশ্রয় দণ্ডরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল—এমন কি পাশব বৃত্ত অসৎ-তান্ত্রিকের কদাচার-বিধ্বস্ত মনগুলাকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শৃঙ্গার-রস-গর্ভ কবিতা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই 'হরিচরণ-স্মরণামৃত' ছিটাইবার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল। যে কবি সময়োপযোগী বিষয়-দৈন্যের উপর আবেগোচ্ছল ছন্দ-মাধুর্য্যের অতুলনীয় শব্দ-সঙ্গীত তরঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিয়া মানুষকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত রসের ভিতর হইতেই কাব্য-সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রের যে কোনো একটা দিকে প্রথম ডাক দিয়াছিলেন, তিনি জয়দেব, —অথবা অপর কথায়, বৈষ্ণব-কবি-গীতি নামে পরিচিত সাহিত্যবিভাগটির আদিপুরুষ।

এইখানে যে বীজ রোপিত হয়, সেই রাধাশ্যাম-নামাশ্রিত স্থূল ইন্দ্রিয় সুখের তীব্র অথচ কবিত্ব ঘন বর্ণনা বিদ্যাপতিতে আসিয়া সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়াশ্রয়ে দাঁড়াইলেও ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারে নাই। জয়দেবে যাহা শারীর ভোগসুখ ছিল, বিদ্যাপতির চেতনা বহুল পরিমাণে তাহাকে মানসিক করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু এখানেও সুখ দুঃখ বিরহমিলন প্রভৃতির সম্পর্ক তেলের সহিত জলের সম্পর্কই রহিয়া গেল। কবি বিদ্যাপতি প্রেমকে সুখময় বলিয়াই পৃথিবীর সারসামগ্রী-রূপে বুঝিলেন, কিন্তু সুখের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার যে দুঃখকে আলিঙ্গন করা সেই গভীর ও উদার অধিকারটির উপর প্রেমের আসন দেখিতে পাইলেন না।

চণ্ডীদাসে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার চক্ষে ইন্দ্রিয় সুখ ও অতীন্দ্রিয় সুখের ভেদরেখাটি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন প্রভৃতি সমস্তই একাকার হইয়া আসিতেছে, সুখময় বলিয়া প্রেম জগতের নির্য্যাস মাত্র নহে, পরন্তু সুখ দুঃখ-হাসি-অশ্রু-আলো-ছায়াময় এই জগতটাই প্রেমের মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কিন্তু এ যাবৎ 'মধুর রস' এই নামটির আশ্রয়ে যে প্রেমের সাধনা চলিতেছিল, তাহা নর-নারীর সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত sexlove এরই ভিন্ন ভিন্ন স্তব-সংঘটিত ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। হৃদয়ের কথা, গাঢ় অনুভূতি এবং প্রকৃত প্রেমের আকুল-গভীর লক্ষণগুলি দ্বারা বিশিষ্ট হওয়ায়, বিশেষতঃ রাধা ও কৃষ্ণ এই নামদুটিকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক-রহস্যে বিজড়িত করিয়া

* গীতিকাব্য—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত

করায়, ব্যাখ্যা ও বিষয়ের সামঞ্জস্য-সাধনের পথে যথেষ্ট সঙ্কোচ ও সংশয়-পীড়ন স্বীকার করিয়াও, মনকে এই বলিয়া আমরা ভুলাইতে চাহিয়াছিলাম যে বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্য প্রেম-সাধনার ভূমিকামাত্র নহে, পরন্তু ইহাই চরম। 'কৃষ্ণ' নাম-বিশিষ্ট একটি রাখাল-যুবক, 'রাধা' নামে পরিচিতা একটি সুন্দরী পরস্ত্রী এবং তাঁহাদের মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্য-দোদুল "পরকীয়া রসের" সুরম্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একদিকে যেমন আমাদের চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল, অপরদিকে তেমন একটা অস্পষ্ট ভাবের দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে স্পর্শ করিতেও চাহিয়াছিল। বস্তুতঃ আমাদের বুদ্ধি ঐ সকল ব্যাপারে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে ভাবের অসীমতার ভিতর মুক্তি না পাইলেও, এমন কোনো যুক্তিও উপলব্ধির ভিতর পাইতেছিলাম না, যাহা দ্বারা ঐ সীমার সত্য হইতে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত-শূন্যতাটাকে অস্বীকার করিতে পারি।

সহসা বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যকুঞ্জ আলোকোদ্ভাসিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব দেখা দিলেন—কবির সত্যান্বেষী দৃষ্টিমাত্র লইয়া নহে, একেবারে সত্যের শিখায় উদ্দীপ্ত হৃদয়খানি অনাবৃত করিয়া, সহস্র বুদ্ধিসর্ব্বস্বের আড়ম্বরময় আধ্যাত্মিকতার স্ফীত-বর্দ্ধিত কলেবরের উপর দিয়া, নিকৃষ্ট মরু-লালসা-জর্জ্জরিত বর্ণনাস্তূপকে মহাবন্যায় ভাসাইয়া দিয়া, তাঁহার উদ্বেলিত চিত্তসিন্ধু, উন্মত্ত তরঙ্গ কল্লোলে, দেশে দেশে, মানবে মানবে, কাননে পল্লবে, আকাশে বাতাসে, ধারায় ধারায় গড়াইয়া আসিল—মানুষকে দ্বিধা করিবার অবকাশ দিল না, ভাবিবার সময় দিল না, বিগলিতাশ্রু নয়ন-যুগলতলে একেবারেই পাগল করিয়া তুলিল। সেই সুরের আগুন-লাগা বিদ্যুৎ-পাগল প্রাণের স্পন্দনপার্শ্বে, সংশয়-লেশহীন বিশ্ব-প্রেম-সুন্দর আননের সম্মুখে, লক্ষ লক্ষ অন্তরাত্মা টলমল করিয়া উঠিল,—কৃষ্ণই বা কে আর রাধিকাই বা কে, মানুষ চক্ষের সম্মুখে দেখিল—প্রেম আছে, তাহার আহ্বান আছে, তাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিয়া থাকিবার ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই!

প্রেরণার সেই প্রথম আহ্বান-বাণী-তলে যাহারা মানচিত্র-নির্দ্দিষ্ট কোনো একটি বিশেষ লোকালয়ের "কৃষ্ণরাধাকে"ই সত্য বলিয়া জানিয়াছিল তাহারা আজ আর নাই। কিন্তু প্রেমকেই সত্য বলিয়া যাহারা জানিয়াছিল তাহাদের চিত্তশতদল আজ রবীন্দ্রনাথে ফুটিয়া উঠিয়া নব নব নক্ষত্রলোকে মহা-মানবের চিরন্তন-নিমন্ত্রণ-বাণী বিঘোষিত করিতেছে।

আজ আমরা মানস-স্তরের যে জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া আছি, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধা আমাদের চক্ষে কোনো সুদূর অতীতকালের অবতার-ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট নরনারীমাত্র নহেন, পরন্তু সেই পরম সত্য ভাবমূর্ত্তি যাহাতে বিশ্বাস না করিলে মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ যে সত্যের উপর, সেই "আমি আছি" রূপ সত্যটিও নিরাশ্রয় হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ তিনিই, যিনি বিশ্ব-সংসারকে আকর্ষণ করেন (কৃষ্ ধাতু—to draw)। কি এমন ভাব আছে যাহা নিখিলের আকর্ষণীয়? উত্তর—

'প্রেম'। অতএব 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রেমের সেই concrete রূপ, Love-god, তিনি 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ কোনোরূপ পরিচিত পার্থিব বর্ণ-গোত্র দ্বারা চিহ্নিত হইবার নহেন, অথচ তিনি শূন্য নন—সুরে পূর্ণ, এমন কি সুরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যই তাঁহার' শ্রী'।

জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের বা রৌদ্র যেমন তপনের, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র-সাগর-শৈল-তরুলতা-বিচিত্র জগৎখানি ঐ প্রেম-স্বরূপের effulgence,—কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়,

"প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানাবর্ণে নানা গন্ধে ফুটে আছে 'ভালবাসা'।"

এই যে প্রেমের জগৎ, ইনিই শ্রীরাধা—বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের 'হ্লাদিনী শক্তি'—যাহার দিকে সেই অনন্ত-কৃষ্ণজলধি রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দের নব নব আনন্দে আপনাকে ফিরিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য অনাদিকাল ধরিয়া নামিয়া আসিতেছেন।

অপর পক্ষে, এই জগৎ, এই সপ্তবর্ণে মূর্ত্তিমতী গৌরাঙ্গী,—আকাশের নীলিমা যাহাকে নিত্যই চোখ বাড়াইয়া বলিতেছে, 'এইখানে তোমার সীমা,'—রূপ-রসাদির মধ্যে বিশেষ হইয়া উঠিয়া ইন্দ্রিয়াদির কূলে কুলে যাহার অসীম স্বাধীনতার মুক্তপক্ষ প্রতিমুহূর্ত্তেই আহত হইতেছে.—ইনিই, আপনার মধ্যে আপন সম্পূর্ণতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া অন্ধ-আবেগের অসীম-আকুলতায় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেইদিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, যেদিক হইতে বাঁশীর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, যেদিক হইতে প্রেম স্বরূপ তাঁহাকে ডাকিতেছেন—"ওগো, তুমি আমার, একান্তই আমার!'

এই যে চিরন্তন-চলাচলের ব্যাপ্তি-চক্র, যাহার কোলে "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া; অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা"—এই ব্যাপ্তির ক্ষেত্রই যথার্থ বৃন্দাবন-লীলাস্থল, কারণ যা কিছু আনন্দ যা কিছু সৌন্দর্য্য, তা' ঐ চলাচলটিকে বেড়িয়া বেড়িয়াই, পাখীর গানে, নদীর তানে, ফুলের হাসিতে, তরুর মর্ম্মরে, এক কথায় যাবতীয় নিসর্গ-সুষমা হইতে আরম্ভ করিয়া মনোরাজ্যের বিচিত্র রস-লাবণ্য পর্য্যন্ত, নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

মৃত্যু-দলিত-চরণা জগতের এই যে চলা, কূলের বেড়ী ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, সীমার নিয়ম-শাসন তুচ্ছ করিয়া, প্রেমের টানে সুরের ডাকে এই যে পাগল হইয়া চলা—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধার অভিসার, অসীমের আহ্বানে সীমার নিরুদ্দেশ-যাত্রা। এই অপূর্ব্ব অভিসার-যাত্রার আনন্দেই প্রেমিক পাগল, তাই তাঁহাদের অভিধানে এ যাত্রার পরিণাম-কল্পনা নাই, মুক্তি বা মোক্ষের স্থান নাই। তাঁহারা জানেন, প্রেমই প্রেমিকের মুক্তি—

"যেদিন তোমার জগত নিরখি'
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি'

সে দিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়ন-পাত।"

হে প্রেম-স্বরূপ, জগতকে যখনই আমি প্রেম-সুন্দর দেখি, তখনই যে জগতের মর্ম্মকেন্দ্রে, তোমার মাঝখানে, আমার মুক্তিকেই দেখিতে পাই।

এক্ষণে কথা এই যে, যে অর্থের আলোকে গোকুল-লীলাকে আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম, সুকবি কালিদাসের "ব্রজবেণু" তাহারই প্রকাশ কি না? "ব্রজবেণু" বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা এই অবসরে আরো একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।—

এ বাঁশীটি সেই বস্তু যাহা অনন্ত ও সান্তের চিরবিরহকে সুরের মিলনে বাঁধিয়া অনাদিকাল ধরিয়া বাজিতেছে এবং সম্ভবতঃ নিরবধিকাল ধরিয়াই বাজিবে। যদি কালিদাসের আলোচ্য কাব্যখানি আগে পাছে কোনো সীমা-রচনা না করিয়া থাকে, যদি তাঁহার গান আরদ্ধ প্রবন্ধে আভাস-প্রাপ্ত 'সীমা ও অসীমার' ভিতরকার সত্য-নির্দ্দেশেরই চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোকুল-গীতি বিশ্ববাসীর আদর পাইবারই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে। কিন্তু হায়, সমগ্র কাব্যখানি শেষ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসসহ বইখানি বন্ধ করিবার সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত ভাবিতেছি—"ইহা কি সেই বাঁশী?"

এত কথা বলিবার আবশ্যকতা ঘটিত না। যদি 'পরিচয়-পত্রে' কবির এ উদ্দেশ্যটুকু ব্যক্ত না হইত যে, তিনি বয়ঃক্রমের উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান যুগের ভাষায় ভাবে ছন্দে ও কলানৈপুণ্যে গোকুল-গীতিকে জীবন-রাগ-রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। 'রাধাশ্যামের গোকুল-লীলা' যে 'অনন্ত ও চিরন্তন' তদ্বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যে-হিসাবে উহার অনন্তত্ব অনুভব করি, কবি বা তাঁহার পরিচয়-দাতা যে সে-হিসাবে করেন নাই, তাহার সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত পরিচয়-পত্রের এই একটিমাত্র ছত্রেই পাওয়া যাইবে—"বঙ্গবাসীর জীবনে ইহার মাধুর্য্য ও নবীনতা কখনো নষ্ট হইবে না"।

'বঙ্গদেশে' ত বিপুলা পৃথ্বীর ছোট একটু অংশ,—সে ক্ষেত্রে, যাহা 'অনন্ত ও চিরন্তন' তাহার প্রভাব এই ছোট অংশটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে কেন? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ বেফাঁস কথাটা লিখিয়া ফেলিবার কারণ আর কিছুই নহে,—কবিতার দিকে চাহিয়া 'পরিচয়-পত্র' লিখিতে হওয়ায়, কবির মত তাঁহার পরিচয়-দাতাও, মুখে যাহাই বলুন, মনে মনে গোকুল-লীলার অসীমতা বা চিরন্তনত্ব উপলব্ধিই করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবন-লীলার অনন্তত্ব ও চিরন্তনত্ব যাহার উপর নির্ভর করে, তাহা রাধাকৃষ্ণের নাম, অতীতকালের কোনো বিশেষ স্থান বা পাত্রপাত্রীর স্মৃতিতে নাই, আছে প্রেমের বিভুতিতে। নাম ধাম চিরদিনই সাম্প্রদায়িক, ভাবই অনন্ত ও চিরন্তন,—কাল যে-নামের আশ্রয়ে যে পরিমাণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, আজ সেই-নামটির আশ্রয়েই তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বৃহৎ ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইহারই

বলে 'বয়ঃক্রমের উপযোগী করিয়া' অতীতকে প্রকাশ করা, এবং এই কাজ যিনি যত অধিক পরিমাণে করিতে পারেন, তিনিই তত বড়দরের কবি।

রাধাকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক্। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহাদের যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা জানি। যতখানি প্রকাশ না পাইয়াছে, তাহাও আধ্যাত্মিক ব্যাখাকার-সম্প্রদায়ের ব্যাখার আলোক লইয়া আমরা দেখিতে পাই—এখন ঐ কবিত্বের প্রেরণার সহিত ব্যাখার প্রেরণা মিশাইয়া রাধাকৃষ্ণকে যদি আমরা মনশ্চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইতে চাই, তাহা হইলে দুটি নবনারীদেহের গণ্ডীতে সে মূর্ত্তি ধরিবে কি? এ যুগের যাহা ভাব তাহা বলিয়াছি—দেখাইয়াছি যে রাধাকৃষ্ণের বর্ত্তমানে যে বয়স ও যে পরিসর, তাহাতে একদিকে তাহা বিশ্ব-জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছে অপরদিকে বিশ্বজগৎকে অতিক্রম করিয়াও গিয়াছে। হায়, বন্ধু কালিদাস যদি এইরূপ কোনো ভাবের আলোকে তাঁহার কবিতাগুলিকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন!

তাই বলিতেছিলাম, এ 'ব্রজবেণু' কি সেই বাঁশী, যাহা এই ভুবন-রাধিকা-হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌন্দর্য্য-স্বরূপের নিশ্বাস-স্পর্শে অনন্তকাল ধরিয়া বিচিত্র রাগিণীতে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে? ইহা কি সেই গোকুল-গীতি যাহা বর্ত্তমান যুগের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে ও কলানৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ অজস্র জীবনে জাগাইয়া রাখিয়াছেন? কিন্তু না, গোকুল-গীতির সহিত রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত করিয়া ধরায় শ্রীযুক্ত কালিদাস ও তাঁহার পরিচয়-দাতা সম্ভবতঃ বিস্মিত হইয়াছেন,—অন্ততঃ তাঁহাদের বিস্মিত হইবার কথা, কেন না একথা যদি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইতেন যে রবীন্দ্রনাথই গোকুল-গীতিকে 'জীবন-রাগ-রঞ্জিত' করিয়াছেন, তাহা হইলে আলোচ্য 'ব্রজবেণু'র পরিচয়-পত্রে উক্ত বিশেষণটির বিশেষ ব্যবহার করিতেন না।

ভাবই যদি মুল হয়, নাম বা রূপ ঐ ভাবপ্রকাশের চিহ্নমাত্রই হয়, তাহা হইলে একথা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে না যে আধুনিক সাহিত্যে বাঁশীর ক্রিয়া আজও থামে নাই, এবং রাধা ও কৃষ্ণের নাম দুটি ঝরিয়া পড়িলেও, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' হইতে সেদিনকার সেই 'গীতাঞ্জলী' পর্য্যন্ত ঐ বৈষ্ণবকবি-সম্প্রদায়েরই বাঁশী গভীর হইতে গভীরতর সুরে অনন্ত ও চিরন্তনের গান গাহিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, sexloveএর ভিতর যাহা ক্ষুদ্র পরিসর ছিল, আজ তাহা তরু-লতা পত্রপুষ্পকে, শৈলসিন্ধু মৃত্তিকা মরুভূমিকে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রকে, এমন কি দেশদেশান্তর যুগযুগান্তর ও জন্মজন্মান্তরকে পর্য্যন্ত এতই প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে যে এ সাহিত্য-পুষ্ট অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগ এখন আর বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যথেষ্ট তৃপ্তিই পায় না।

বস্তুতঃ, গোকুল-গীতির মধ্যে চিরন্তন ও অনন্ত বলিয়াই যাহা "চিরন্তন ও অনন্ত," তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যেও মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তবে কালিদাস আজ 'বর্ত্তমান যুগের ভাষায় ভাবে ছন্দে ও কলানৈপুণ্যে' 'জীবন-রাগ-রঞ্জিত' করিতে দাঁড়াইয়া-ছেন কাহাকে? উত্তর সেই বস্তুকে যাহা 'গোকুল-গীতি' বলিয়াই "গোকুল-গীতি"

অর্থাৎ, ইনি প্রধানতঃ জোর দিয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রেমের উপর নয় নামধামের উপর,—প্রাণের উপর নয়, দেহের উপর—ভগবানের দেবত্বের উপর নয়, তাঁহার সীমার প্রাচীরে ঘেরা মানবত্বের উপর। সেই জন্যই আধ্যাত্মিকতার দীপ্তি তাঁহার কবিতার অঙ্গে মিশিয়া নাই—তাহা পরিচয়পত্রের মধ্যেই পড়িয়া আছে।

'চিরবন্দ্য' 'চিরশ্যাম' চিরবন্দী' 'চিরবন্ধু' ও 'দীনবন্ধু'—এই কবিতা-পঞ্চক লইয়া 'ব্রজবেণু' আরম্ভ হইয়াছে। পরিচয়-দাতা যে বুঝাইয়াছেন 'কবির-চক্ষে এই বিশ্বজগত ভগবানের creation নয়, পরন্তু লীলায় manifestation, তাহা এই কয়টি কবিতা এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আরও কয়েকটি-কবিতা হইতে কতক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ঐ ধারণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধরা দিলেও কবির বোধশক্তির সহিত যে মিলিয়া মিশিয়া যায় নাই, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই কাব্য-খানি হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

'চিরশ্যাম' 'চিরবন্দ্য'ও'চিরবন্ধু' শীর্ষক কবিতাত্রয় সুমিষ্ট সুন্দর সরল ও স্বাভাবিক কবিত্ব দীপ্তিতে দ্যুতিময়; 'চিরবন্দ্য' কৃত্রিম ছন্দের নিগড়ে আড়ষ্ট কবিতা; এবং 'দীনবন্ধু' ভগবৎ-প্রেমে দীনের প্রাণ না গলাইয়া তাহার অহঙ্কারেরই কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। দীনহীনের দলে ঠাকুর কি কি কাজ করিয়াছেন, তাহা উৎপ্রেক্ষা দিয়া দিয়া বলার পর "জ্ঞানের ডঙ্কা কোথা পাবো, পুঁজি' রামপ্রসাদের গানে"—এই উক্তিতে যে চাপা-কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে 'নিখিলের বন্ধু' সম্ভবতঃ তৃপ্ত হন নাই। 'আশার তপন' প্রভৃতি আরও দু'একটি কবিতায় ভগবানকে ঐরূপ 'বিশেষের' মধ্যে ধরিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে এবং কটাক্ষপাত দোষ ঘটিয়াছে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, 'নরোত্তম' শীর্ষক কবিতায় দেখিতেছি—

"মানব হ'তে অনেক দূরে তোমার বাস-ভূমি
ভাব্‌তে পরাণ গুমরি ওঠে প্রভু"—

এবং ইহার কতিপয় পৃষ্ঠা পরেই শরীরী কৃষ্ণ ও শরীরী রাধা পরস্পরের দিকে কাম-তৃষিত-নয়নে চাহিয়া উপবিষ্ট! পরিচয় পত্রে প্রকাশ—"লীলাময়কে নিকটে পাইবার জন্য কবি ব্যাথার ব্যথী পরমাত্মীয়রূপে তাঁহাকে কল্পনা করিতেছেন।"

কিন্তু হে 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য' কবিতার কবি! এই কি তোমার উপযুক্ত ভাবনা বা "মানবের স্তব-গীতে দেবেরে মানব করি আনে"—এ অপবাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইবার পক্ষে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ? যে কবির চক্ষে, শুনিতেছি, সমস্ত জগৎই ভগবানের manifestation, যাঁহার চক্ষে মানবই ভগবানের লীলার প্রকাশ, তাঁহার প্রাণে এ দুঃখ জাগা কি স্বাভাবিক যে মানব হ'তে তাঁহার বাসভূমি অনেক দূরে? কল্পনার মানুষ অপেক্ষা চক্ষের সম্মুখের এই বিচিত্র বিশ্বরূপ কি বেশী দূরে? কোন্ সুদূর অতীতের একখানি যুবতীমূর্ত্তির অন্ধকারে চোক বুজিয়া বসিবার চেষ্টা না করিয়া, আপন ঘরের খোলা জানালাপথে এই দৃশ্যমান জগৎখানার দিকে তাকাইলেই কি শ্রীরাধিকাকে অধিকতর নিকটে পাওয়া যাইত না? ঐ যে প্রকাশ-পটের সীমা মৌন-নীল-আকাশখানা মাথার উপর

স্থির হইয়া আছে, উহার অপর পারে ধ্যানদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কি সেই কালো-রূপকে চিত্তপটে ধরিতে পারা যাইত না—যেখানে পার্থিব সাতটা রংএর প্রত্যেক-টাই মুক্তিলাভ করিয়াছে? এজন্য 'কাম-বহ্নিতে দহ্যমান হিয়া' 'ভুজ-বন্ধন-দণ্ড-লাভ-লিপ্সু' যুবক-বিশেষের কল্পনা কি বাস্তবিকই অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল?

আমরা জানি, বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন জানাইয়া 'কৃষ্ণ চরিত্র' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে কোন্ কৃষ্ণ? সে কি সেই ব্যক্তি—"ছুটে—যাহার আঁখি, দুটি—চকোর-পাখী; মুখ-বিধুর অধর-সিধু-পিয়াসে মাতি?" সে কি সেই কৃষ্ণ—"গোপবল্লভাগণ. দিয়ে ঘন চুম্বন, বাড়ায়ে দিয়াছে যার চুমার লোভে"? সে কি সেই "পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-চঞ্চল-করযুগশালী"? না, না, তিনি দেবতাকে নরাধমরূপে মানেন নাই,—মানিয়াছিলেন সুস্থ-সুন্দর কল্পনায় গড়া আদর্শমানবকে দেবতারূপে; আপনার কল্পনাস্বর্গে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি নর-দেবতারূপে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কালিদাসের কৃষ্ণকল্পনা জয়দেবের যুগকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই,—বর্ত্তমান যুগের ভাবের স্বর্গে তাঁহার আসন পাতিয়া দেওয়া ত পরের কথা,—প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় যাহাকে বলে "অতীতের কালীতে কলম ডুবাইয়া বর্ত্তমানের সাহিত্য রচনা" তাহাই করিয়াছেন, আমাদের কল্পনালোকের দেবতাকে বারংবার কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

সুন্দর যাহা, তাহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য সুন্দর উপমার দুর্ভিক্ষ কি জগতে দেখা দিয়াছে? বৈষ্ণব-কাব্যে যে ব্যাপারগুলাকে যে কারণে আমরা মার্জ্জনা করি, কালিদাসকে তাহাই অবলম্বন করিতে দেখিলে কেহ মার্জ্জনা করিতে চাহিবেন কি? প্রেমের অনাদি অনন্ত ক্ষেত্রে একমাত্র নরনারীই কি সত্য? কালিদাস অন্ততঃ পক্ষে সেই সুরের অনুভূতিটাও তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কি? চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামে যখন মিলন হয়, তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—চির অতৃপ্ত এ প্রেম, "নাহি সীমা আগে পাছে, যত যাও তত আছে।" কিন্তু কালিদাসের ভূমিকা যে মিলন-চিত্র আঁকিয়াছে. তাহা কি অন্ততঃ পথে সেই ধরণেরই?

তবে কি সুদীর্ঘ পরিচয় পত্র সংযুক্ত এই কাব্যখানির ভিতর সৌন্দর্য্য নাই? উত্তর—আছে; যথেষ্ট পরিমাণে আছে; কিন্তু সেই সকল বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা সৌন্দর্য্যের ভিতর কোনো একটি মূলভাবের ধারাবাহিকতা নাই। সানাই যখন বিচিত্রসুরে কোন রাগিণী বিশেষকে ব্যক্ত করে; তখন তাহাকে অপর একটি নিরবচ্ছিন্ন সুরের স্থির জমির উপর দাঁড়াইতে হয়—এ কাব্যে সেরূপ কোন স্থায়ী আশ্রয় নাই, ইহা মেরুদণ্ডহীন। অপ্রশংসার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করিব? বন্ধু কালিদাসের আজ ইহাই প্রাপ্য,—কৃষ্ণরাধিকাকে তিনি আমাদিগের শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন নাই, 'ব্রজবেণুর' বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল দিক খুঁজিয়া পান নাই। অবশ্য এ কাব্যে 'মায়ের প্রাণ' 'সখার' সরল ভালবাসার কথাও আছে—অর্থাৎ 'পর্ণপুটে' যে দিকটার আভাস দেখা

গিয়াছিল তাহাও আছে,—কিন্তু সে জন্য যাহা প্রাপ্য তাহা কবি পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

কৃষ্ণরাধাকে পরস্পরের প্রার্থী নরনারী রূপে কল্পনা করিয়াই এ যুগের চক্ষে কবি তাঁহার কাব্যখানিকে মাটি করিয়াছেন। এই একমাত্র গুরুতর অপরাধে কুলের অর্থ 'জাতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, 'সীমাকে নয়'—'প্রেমের অর্থ' দেহের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে, 'বি-দেহে'র দিকে নয়। কবির 'ব্রজবেণু' সার্ব্বজনীন হয় নাই—সাম্প্রদায়িক হইয়াছে; ইহা আমাদিগের মনকে প্রসারিত করে নাই, সঙ্কুচিতই করিয়াছে। তত্ত্বের 'নাড়ু' হাতে দিয়া কবি আমাদিগকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কবিতা তত্ত্ব নয়—তত্ত্বের অনুভূতি।

কোথা হ'তে ডাক্‌লে বেণুতানে
চোখ না দেখুক চিত্ত তা'ত জানে
চক্ষু বুজে হস্ত দুটির টানে
বুকের পরের নিলাম তোমায় খুঁজি'—প্রভৃতি অনেকগুলি

সুন্দর সুন্দর প্রকাশ কত চমৎকার ভাবার্থই না প্রকাশ করিতে পারিত, যদি ঐ 'হাত' আর 'বুক' একটি সুন্দরী যুবতীর না হইত। এই কাব্যখানির মধ্যে এমন অনেক সুন্দর প্রকাশ অনেক জায়গায় আছে যাহা পড়িতে পড়িতে এই আক্ষেপই আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে সুরুচি ও সাবধানতার অভাবেই সেগুলিকে কবি নির্ম্মল করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

'পরাপ্রীতি' 'ভুমা' প্রভৃতির কথা এ কাব্য-প্রসঙ্গে না তোলাই ছিল ভাল,—কারণ sex love ব্যতীত আর কিছু যদি ইহা প্রকাশ করিয়াও থাকে, তবে বড় জোর মানব হৃদয়ের সহিত মানব হৃদয়ের সম্বন্ধের কথাই অল্প কিছু বলিয়াছে। কিন্তু বিশ্বজগতের যা' কিছুর সহিতই মানব-হৃদয়ের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে,—যে সম্বন্ধের খাতিরে—'নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে' যে সম্বন্ধের টানে—'লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে'—যে নিগূঢ় সম্পর্কে—"না জানি কেমনে জ্যোৎস্না-প্রবাহ সর্ব্বশরীরে পশে"—যে সম্পর্কে—"মনে হয় যেন এ মাটীর তলে, যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে"—সে প্রকাণ্ড-সম্বন্ধের আভাস-মাত্র আলোচ্য "ব্রজবেণু"তে কোথায়? বিশ্বজগতের সহিত এই প্রকাণ্ড যোগানুভূতিই বিশ্বাতীতের প্রেম-মুগ্ধা শ্রীরাধিকার সহিত সহানুভূতি—এই সহানুভূতিই আগে কালিদাসের কাব্য অর্জ্জন করুক—'পরামিলন' সে অনেক দূরের কথা। 'ছন্দ' প্রভৃতির কথা এ যাত্রা আর কিছু বলিলাম না, সে সকল দিকে কালিদাসের কবিযশঃ অক্ষুণ্ণই আছে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

[মন্তব্যঃ—সমালোচক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যে স্তরে আরোহণ করিয়া, সে সুরে কাণ বাঁধিয়া, কালিদাস বাবুর 'ব্রজবেণু'-ধ্বনি শুনিয়াছেন,—যে প্রমাণে (criterion) তার বিচার করিয়াছেন,—যদি তাহাই মাত্র বর্ত্তমান যুগোপযোগী বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাঁহার মন্তব্য মোটের উপর

অসঙ্গত হয় নাই বলিতে হইবে। তবে সকলেই তাহা গ্রহণ করিবেন কি? তা ছাড়া, এই প্রসঙ্গে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সান্ত ও অনন্ত, সাময়িক ও চিরন্তন, রূপ ও গুণ, নাম ও ভাব, concrete ও abstraei প্রভৃতি বিষয় ধরিয়া সে সব কথার অবতারণা তিনি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি যে ভাবের যে স্বরের কবিগীতি মাত্র বর্ত্তমান যুগোপযোগী বলিয়া প্রত্যাশা করেন, তাহা 'বিশ্ববেণু'তেই বাজিতে পারে, 'ব্রজবেণু'তে নয়। তবে সেই সুর নিঃসরণের জন্য 'বিশ্বে'র মুখে 'বেণুর' কল্পনা দুঃসাধ্য ব্যাপার বটে। 'ব্রজ' বলিলে, 'বেণু' বলিলে, তার স্মৃতির সঙ্গে যমুনাকুলে পুষ্পিতকদম্বমূলে সেই ত্রিভঙ্গ নন্দের দুলাল আর তাঁর বামে সেই ভুবনমোহিনী মধুরহাসিনী রাধাবিনোদিনী যে আপনিই আসিয়া পড়ে। রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্ত্তি ছাড়িয়া 'বিশ্ববেণু' যদিও বাজে, 'ব্রজবেণু' বাজে না।

যাহাহউক, এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, এবার তাহা বলিবার অবসর নাই। ব্রজেশ্বরের দয়া হইলে পর সংখ্যায় বলিতে চেষ্ট করিব।

মালঞ্চ সম্পাদক।]

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিজয়া-সম্ভাষণ।

এবার সুদীর্ঘ পূজাবকাশের পর দুই মাসের মালঞ্চে সঞ্চিত (সুগন্ধ অগন্ধ বা দুর্গন্ধ—যিনি যাই মনে করুন) পুষ্প উপহার লইয়া আমরা আমাদের পাঠক-বর্গকে বিজয়ার সম্ভাষণ করিতেছি!

এবার পূজার কিছু পূর্ব্ব হইতে পূজার পরেও মাসাধিক যাবৎ যেরূপ জল বৃষ্টি হইয়াছে, সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না। সরকারী মিটিওরোলজিকাল বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বলিতেছেন, গত ৪০ বৎসরের মধ্যেও অক্টোবর মাসে এত জলবৃষ্টি ভারতে আর কখনও হয় নাই।

এবার মা যেন কাঁদিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিনই অশ্রুজলে ভক্তের গৃহ ভাসাইয়া, কাঁদিয়াই আবার চলিয়া গেলেন। মা ত মঙ্গলময়ী, মায়ের চক্ষে তবে এত অশ্রুধারা এবার কেন?

মায়ের লীলাকাব্য শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উপসংহারে দেবগণের স্তবে তুষ্টা মহামায়া স্বয়ং বলিতেছেন——

"জলবৃষ্টি হীন বসুধায় যবে
কেঁদে ঋষিগণ
কাঁদাবে মোরে,—

জিয়াব ভুবন
শতাক্ষী হইয়া
ঢালি অশ্রুধারা
অধর ধারে।

সে সলিলে সিক্ত
বসুমতী বুকে
শাকরূপে আমি
জনম লব।

ক্ষুধাতুর জীবে
ভরণ করিয়া
শাকম্ভরী নামে
বিদিত হব।”

মায়ের সন্তানবর্গ বহুদিন নিয়ত দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্টে প্রপীড়িত,—তাই কি মা কৃপায় শতাক্ষী হইয়া অধরধারে এবার অশ্রুবর্ষণ করিলেন? সেই অশ্রু-ধারায় মৃতপ্রায় ধরা কি আবার জীবিত হইয়া উঠিবে? মা কি সত্যই শাকম্ভরী-রূপে বসুধাবক্ষে আবির্ভূতা হইয়া ক্ষুধাতুর জীবকে ভরণ করিবেন?

কিন্তু ঋষি কেহ ধরার দুঃখে কাঁদিয়া মাকে একান্ত মনে ডাকিয়া মার কৃপা এই পাপক্লিষ্ট ধরার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন কি? কে জানে? মায়ের ইচ্ছা, মায়ের লীলা, মাই জানেন। মায়ের সন্তান হইয়াও আমরা অধম, শক্তির পুত্র হইয়াও শক্তিহীন। মা কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিত কৃপায় শক্তিহীন অবসন্ন আমাদিগকে অন্নদান করিবেন? না, আরও কঠোর শাস্তির পীড়নে আমাদের শক্তি জাগ্রত করিবেন? মাই জানেন, মার কৃপা কোন পথে কি ভাবে আমাদের মঙ্গলের হেতু হইবে।

মায়ের চরণে প্রণত হইয়া আমরা এই মাত্র বলিতে পারি—তাও যদি বলিবার অধিকার আমাদের থাকে,——

“প্রণতাণাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥”

হায়! বাঙ্গলার কথা আমাদের নিজের কথা যাহাই হউক, ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য সুমঙ্গলা বরদা রূপে মায়ের আবির্ভাবের সময় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাই আবার বলি, “মা!

পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতকর্জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্।”

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

পূজার মাস—দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী।

গত মাসটাই আমাদের সব চেয়ে বড় একটা পূজার মাস গেল। প্রথমে দুর্গাপূজা, তারপর লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা—তারপর মাসের শেষে কার্ত্তিকপূজা। কবে কোন্ পূজার বিধান ও প্রবর্ত্তন হইয়াছে, জানি না। তবে শুনিয়াছি জগদ্ধাত্রী পূজা নাকি বেশী দিনের নয়। অন্যান্য সকল পূজার পরে—গত শতাব্দের মধ্যেই নাকি এই পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যাহাহউক, যখন যে কারণেই ভগবতী মা জগদ্ধাত্রী রূপে বাঙ্গালীর পূজাগ্রহণে আবির্ভূতা হইয়া থাকুন, অধুনা বাবু বাঙ্গালী সমাজভুক্ত কাহারও কাহারও পক্ষে মার এই নূতন কৃপায় বড় সুবিধা হইয়াছে। ভগবতীর পূজা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পূজার দিনত্রয়ব্যাপী শ্রম ও ব্যয় বহিতে অনিচ্ছুক, এমন অনেকেই নাকি এখন দুর্গাপূজা

ত্যাগ করিয়া জগদ্ধাত্রীপূজা করেন। মা দুর্গা বস্তুতঃই দুর্গা, পূজার্থ তাঁহার চরণসমীপে 'গমন' করিতে বহু দুঃখ বহু ক্লেশ পাইতে হয়, বহু অর্থব্যয় করিতে হয়, যাহা আধুনিক বাঙ্গালী বাবুর সভ্যতা-সাবান-পরিমার্জ্জিত কোমল ভোগশিথিল দেহে তথা সুশিক্ষাসংস্কৃত মনে সহ্য করা দুষ্কর। তিনি তিন দিন পূজার কমে তুষ্টা হন না। তারপর বোধনের তাঁর চণ্ডীপাঠ আছে, প্রতিপদাদি ষট্‌তীথির পূজা আছে, বিজয়াদশমীর একটা হুলস্থূল ব্যাপার আছে। আবার তিনি একা আসেন না, সঙ্গে শিব লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ চালচিত্রার্পিত বহুদেবদেবীগণও তাঁর সঙ্গে আসিয়া থাকেন। সকলকেই কিছু কিছু পূজা দিতে হয়। আর আমাদের মা জগদ্ধাত্রী—যেন আদুরে গোপালের স্নেহ-কোমলা নিয়তত‍ুষ্টিচেষ্টিতা সুস্মিতমুখী ধাত্রীই বটেন,—অল্পে তুষ্টা, একদিনেই তিন পূজার নৈবেদ্যভোগাদি গ্রহণ করিয়া পূজক সন্তানকে আশীর্ব্বাদ দিয়া চলিয়া যান। অথচ তিনিও সেই মহামায়া ভগবতীই ত বটেন। তাঁর পূজাতেও ত মহামায়ার পূজাই হইয়া থাকে। কলিকাতার বিত্তবশালী ভোগী বাঙ্গালী কেহ কেহ তাই এখন দুর্গমা দুর্গার কাছে না ঘেঁসিয়া জগদ্ধাত্রীর পূজাতেই ক্রমে মন দিতেছেন। আরও কারণ আছে। দুর্গাপূজা করিতে গেলে, ছুটীর অর্দ্ধেক অতীত হয়,—গিরিশিখরে সমুদ্রতীরে অথবা বঙ্গাতীত সুদূর শুষ্কবায়ু-বহুল প্রান্তরে ভ্রমণের সময় অনেকটা নষ্ট হয়। আজ কাল ধনী, অর্দ্ধধনী, সিকিধনী, আনী দুয়ানী যিনি যেমন ধনীই হউন, এরূপ দেশান্তর-ভ্রমণ ব্যতীত দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা কাহারও নাকি হয় না। মা দুর্গার কৃপায় লম্বা এই ছুটিটা পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু সে কৃপার এতটা বেশী খাতির করিলে, মায়ের পূজাভোগটির পূরা ব্যবস্থা করিতে গেলে, আপনাদের ছুটির ভোগটা যে তেমন হয় না। অবশ্য যাঁহারা কেবলই ভোগী, ভক্ত নন,—তাঁহারা পূজা না করিলেও পারেন। কিন্তু যাঁহারা ভোগী ও ভক্ত দুই-ই,—ছুটির ভ্রমণ ও মায়ের পূজন কোনটাই ত্যাগ করিতে চান না, তাঁহাদের বিষম এক সঙ্কটের অবস্থাই আসে বটে। কিন্তু মা আমাদের সঙ্কটমোচিণী, তাই এবম্বিধ এক যুগ সমাগত প্রায় জানিয়াই জগদ্ধাত্রী রূপে দেখা দিয়া সন্তানের সঙ্কট মোচন করিয়াছেন। কে জানে, মা জগদ্ধাত্রীর সুগমতায় দুর্গম দুর্গাপূজা একাধারে উঠিয়াই বা যায়। যদি যায়, ছুটি থাকিবে কি? হয় ভোগী, ভক্ত অভক্ত যাই হও, তোমাদের ভ্রমণভোগের তবে কি উপায় হইবে? তাই বলি, দুর্গমা বলিয়া মা দুর্গাকে একেবারে ছাড়িও না।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

তোমরা ত পণ্ডিত বলিয়া গর্ব্ব কর? ভোগের অর্দ্ধেক ছাড়, অর্দ্ধাংশ ছুটি মার পূজায় দেও। নহিলে সব যাইবে যে। মা আমাদের বোকা মেয়ে নন, অবজ্ঞা করিলে জব্দ করিতে জানেন।

মহরম—হিন্দু ও মুশলমানের পর্ব্বদিন নিরূপণের কাল।

জগদ্ধাত্রী পূজার পরেই এবার মুশলমানের মহরম পর্ব্ব হইয়া গেল। গত বৎসরও তাই হইয়াছিল। কিন্তু বরাবর এমন হয় না। কেন হয় না? মনসা-

পূজা, বিশ্বকর্ম্মা পূজা কাত্তিকপূজা এবং চড়কপূজা—মাত্র এই চারিটি বড় পর্ব্ব শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্ত্তিক ও চৈত্র—এই চারিটি সৌরমাসের সংক্রান্তিতে হয়,—তা ছাড়া হিন্দুর যত পূজা পার্ব্বণ—সব চান্দ্রমাসের তিথি হিসাবে হয়। মুশলমানের সকল পর্ব্বই চান্দ্রমাসের হিসাবে হয়। তাঁহারা মাত্র চান্দ্রমাস ও চান্দ্র বৎসর মানেন। হিন্দুরা চান্দ্র ও সৌর উভয়াবিধ মাস বৎসরই মানিয়া থাকেন।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের একটি আবর্ত্তনে ২৯ কিম্বা ৩০ দিনের বেশী লাগে না। এইরূপ এক একটি আবর্ত্তনের কালকে এক একটি চান্দ্রমাস বলিয়া ধরা হয়—এখন ইহার বারটি চান্দ্রমাসে বৎসর যত দিনেই গিয়া পূর্ণ হউক। সূর্য্যের চারিধারে একবার ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে। সেই কালটাকে একটা সৌর বৎসর বলিয়া ধরা হয়। তারপর বৎসরকে বার ভাগ করিয়া এক এক মাস ধরা হয়। ৩৬৫ দিন সমান বার ভাগ হয় না, তাই ২৯, ৩০, ৩১, ৩২—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন মাস পূর্ণ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং চান্দ্র ও সৌরবৎসরে মিল হয় না,—চান্দ্র বৎসরে মোটের উপর ১২ দিন আন্দাজ কম পড়ে। মাত্র চান্দ্রমাসের হিসাবে পর্ব্ব ধরিলে সৌরমাসের হিসাবে পর্ব্বগুলির তারিখ ক্রমে পিছাইয়া বৎসর ঘুরিয়া আসে। তিন তিন বৎসরে একমাসেরও অধিককাল পিছাইয়া যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই মুশলমানের পর্ব্বগুলি এইরূপ ক্রমে পিছাইয়া যে কোনও সৌরমাসেই আসিয়া পড়ে। মুশলমানেরা সৌরমাস মানেন না, সুতরাং এই পিছনটা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

হিন্দুর অধিকাংশ পূজাই চান্দ্রমাসে হয় বটে, কিন্তু কোন পূজাই এমন মাসের আগে মাসে পিছাইয়া আসে না। বৎসর বৎসর তারিখের পার্থক্য হয় সত্য, কিন্তু মোটের উপর তাহা একমাসের এদিক ওদিক হয় না। দুর্গোৎসব আশ্বিনের প্রথম হইতে কার্ত্তিক প্রথম—ইহার মধ্যেই পড়ে,—ভাদ্রে কি অগ্রহায়ণে—এমন কি কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহের পরেও কখনও যায় না। হিন্দুরা চান্দ্র ও সৌর উভয়বিধ মাস ও বৎসরই মানেন, সুতরাং দুইটিতে মোটাপুটি একটা মিল যাহাতে থাকে, তার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। চান্দ্রবৎসরে সৌরবৎসর অপেক্ষা বার দিন আন্দাজ কম হয়। আড়াই বৎসরে এই ন্যূনতা পূরা একটি চান্দ্রমাসের সমান হয়। সাধারণতঃ সৌরমাসের সঙ্গে সঙ্গে বারটি করিয়া চান্দ্রমাস ধরা হয়। কিন্তু প্রতি আড়াই বৎসর অন্তর একটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাস অর্থাৎ মোট ১৩টি চান্দ্রমাস গণনা করা হয়। এই অতিরিক্ত চান্দ্রমাসটি কোনও সৌরমাসের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকে না, কোনও পালপার্ব্বণ এ মাসে হয় না, মাসটি 'মলমাস' অর্থাৎ অবিশুদ্ধ মাস বলিয়া ধরা হয়। আড়াই বৎসরে একটি করিয়া অতিরিক্ত 'মল' চান্দ্রমাস গণনা করায়—সৌরবৎসরে ও চান্দ্রবৎসরে—মোটামুটি একটা মিল থাকিয়া যায়। প্রতি ঋতুর পূজাপার্ব্বণ সেই ঋতুতেই হয়,—প্রতি মাসের পূজাপর্ব্বণও সেইমাসে কোনও বার না হইলেও অন্ততঃ তার পরমাসের প্রথমেই হয়। তেমন জ্যোতিষ জানি না, তবে আগামী বৎসর সম্ভবতঃ আশ্বিনে মলমাস হইবে, পূজা কার্ত্তিকের ৪ঠা ৫ই হইবে, মহরম

এবারকার মহরমের ১২ দিন আন্দাজ আগে অর্থাৎ ১০ই ১১ই কার্ত্তিকে হইবে,—জগদ্ধাত্রীপূজার প্রায় এক চান্দ্রমাস পূর্ব্বে।

মহরম পর্ব্ব কি? সিয়া ও সুন্নী।

মহরম মুশলমানের বড় একটি সমারোহের পর্ব্ব, কিন্তু সকল মুশলমান ইহাতে যোগ দেন না। যাঁহারা যোগ দেন না, তাহাঁরা যে কেবল উদাসীন তাহা নয়, এই পর্ব্বের একান্ত বিরোধীও বটেন।

মুশলমানেরা প্রধানতঃ দুইটি বড় সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—সিয়া ও সুন্নী। সিয়াসুন্নীর মধ্যে বিভেদের যে কারণ, সেই কারণই মহরম পর্ব্বের মুল। সিয়ারা এই পর্ব্ব পালন করেন, সুন্নীরা ইহার বিরোধী।

পয়গম্বর মহম্মদ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, একথা সকলেই জানেন। প্রথম যে মুশলমানমণ্ডলী তিনি গঠন করেন, তাহার ধর্ম্মগুরু এবং রাজা—এই উভয় পদের দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করেন। একা তিনিই আচার্য্যরূপে শিষ্যদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, আবার রাজারূপে শিষ্যমণ্ডলীর শাসন-রক্ষণ প্রভৃতি রাজকীয় কার্য্যাদিও পরিচালনা করিতেন। ধর্ম্মগুরু ও রাজা—এই উভয়পদ একাধারে মিলিত হইল, যদি তাঁহাকে 'সমাজপতি' নাম যদি দেওয়া যায়, তবে মহম্মদ এইরূপ 'ইস্‌লাম-সমাজপতি' ছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবীণ শিষ্য আবুবেকর তাঁহার 'খলিফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ ইস্‌লাম সমাজ-পতি পদে বৃত হইলেন। ইস্‌লামমণ্ডলীর একরূপ সর্ব্বসম্মতি ক্রমেই আবুবেকর এই পদে বৃত হইলেন বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও মনে এ সম্বন্ধে একটু দ্বিধাও ছিল। ইঁহাদের মনে হইল, মহম্মদের বংশভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও তাঁহার প্রতিনিধির পদে অধিকার নাই। মহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র এবং জামাতা আলি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহারা মনে করিতেন, আলিই মহম্মদের ধর্ম্মানু-মোদিত প্রতিনিধি। যাহা হউক, আলি নিজে অথবা অপর কেহ আবুবেকরের মনোনয়নে বাদী হইলেন না। তাঁহার বিদ্রোহাচরণও কিছু করিলেন না। আবু-বেকরের পর ওমার, ওমারের পর ওসমান, মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে খলিফা হইলেন; আলি কিম্বা আলির পক্ষপাতী কেহ ইহাতেও বাদী হইলেন না। ওসমানের পর আলি খলিফা পদে বৃত হইলেন। মতান্তর যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন, মনে করিলেন ধর্ম্মানুমোদিত খলিফা (খলিফা রাসেদিন) ইনিই প্রথম হইলেন।

এই সময়ের মধ্যে আরবের বাহিরেও মুশলমান রাজ্যের এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের বহু বিস্তার ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মের প্রাথমিক সরল উন্মাদনার আবেগ মন্দীভূত হইয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মনে স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইত্যাদির স্বাভাবিক প্রভাব তখন দেখা যাইতেছিল। প্রাচীন আরব জাতি বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত ছিল। মহম্মদ কোরেশ গোত্রের হাসিম-বংশীয় ছিলেন। এই গোত্রের উম্মেয়া-বংশীয় লোকেরা ইঁহাদের বরাবর বিদ্বেষ করিতেন। সেই বিদ্বেষের ভাব এখন আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা প্রতাপশালী উম্মেয়াবংশীয় মাবিয়া আলির প্রতিদ্বন্দ্বী

হইলেন এবং দলপুষ্টি করিয়া আপনাকেই খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলির সঙ্গে স্বভাবতঃই মাবিয়ার বিরোধ আরম্ভ হইল। মাবিয়ার কূটনীতি-কৌশলে আলি খলিফার পদে বঞ্চিত এবং অচিরেই আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। আলির দুই পুত্র ছিলেন, হাসান ও হোসেন -- ইঁহারা মহম্মদের এক-মাত্র সন্তান ও দুহিতা ফতেমার গর্ভজাত, সুতরাং স্বয়ং পয়গম্বরের দৌহিত্র। আরবের পশ্চিমে পারস্য দেশের সন্নিকটস্থ ইরাক অঞ্চলের মুশলমানেরা আলির পক্ষাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা আলির জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে খলিফা করিলেন। হাসান নিতান্ত নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির পুরুষ ছিলেন,— বিবাদ বিসম্বাদের নিবৃত্তির জন্য খলিফা পদ ত্যাগ করিয়া মাবিয়ার সঙ্গে এই নিয়মে সন্ধি করিলেন যে জীবিতকাল মাত্র মাবিয়া খলিফা থাকিবেন,— তাঁহার মৃত্যুর পর— তাঁহার নিজের পুত্র নয়, হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন। ইহার পর হাসান মেদিনায় গিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। অনেকে সন্দেহ করেন, মাবিয়ার পুত্র ইয়েজিদের নিযুক্ত লোক বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করে। মাবিয়া যে এ সন্ধির নিয়ম পালন করিবেন না, তাহা সরল হাসান ব্যতীত আর সকলেই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতায় ও কৌশলে ইয়েজিদই পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন।

হোসেন মেদিনায় ছিলেন। ইয়েজিদ ইঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে চেষ্টা করায় ইনি পলাইয়া মক্কায় আসেন। তারপর আত্মীয় বান্ধবগণের কথায় হোসেন মক্কা ত্যাগ করিয়া সহচরদের লইয়া ইরাকে আসিলেন। ইরাক-বাসীদের সহায়তায় তিনিই খলিফা হইবেন, তাঁহার বন্ধুগণ এই ভরসা দিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইরাকবাসীরা আশানুরূপ সহায়তা তাঁহাকে দিল না। এদিকে ইয়েজিদের এক সেনাপতি বহু সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইরাকের অন্তবর্ত্তী কারবেলা নামক স্থানে হোসেন আপনার পরিবার ও সহচরদের লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইয়েজিদের সৈন্যগণ এই স্থানে তাঁহাকে অবরোধ করিল। বহু ক্লেশ পাইয়া— মৃত্যুকালে দারুণ তৃষ্ণায় একটু জল পানের চেষ্টার পর্য্যন্ত ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া— সহচর-গণসহ হোসেন এই কারবেলায় নিহত হইলেন। হোসেনের ছিন্ন মুণ্ড ইয়েজিদের রাজধানী দামাস্কাস নগরে প্রেরিত হইল। তাঁহার ভগ্নী জয়নাব তাঁহার একটি শিশু পুত্রকে কোনও মতে রক্ষা করিয়া মেদিনায় লইয়া আসিলেন।

স্বয়ং পয়গম্বরের দৌহিত্র, তাঁহারই ধর্ম্মানুমোদিত প্রতিনিধি বলিয়া বহু লোকের নিকট বিবেচিত, হোসেন এইরূপে নিহত হইলেন,— এই অতি শোচনীয় ঘটনা মহম্মদবংশের পক্ষপাতী সমস্ত মুশলমানের মধ্যেই বড় একটা প্রবল মনোবিকার ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। মহরম মাসের যে তারিখে এই ঘটনা হয়, প্রতি বৎসর এই দলভুক্ত মুশলমানেরা হোসেন ও তাঁহার ভ্রাতা হাসানের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতেন এবং তাঁহাদের মৃত্যুকালীন ঘটনা অভিনয় করিয়া লোককে দেখাইতেন। ক্রমে নানাবিধ অনুষ্ঠানযুক্ত হইয়া এই বার্ষিক শোকসম্মিলন একটি পর্ব্বে পরিণত

হইল। এই পর্ব্ব যাঁহারা পালন করেন, পর্ব্বের সময় বহু উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও হাসান হোসেনের নাম করিয়া এখনও তাঁহারা বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন।

দুই দলে পূর্ব্বে যে ক্ষীণ মতপার্থক্য মাত্র ছিল, এই ঘটনা হইতে তা ভীষণ এক সাম্প্রাদায়িক বিরোধে পরিণত হইল। ইহার পর আলি ও তাঁহা পুত্র হোসেনহাসেনের পক্ষাবলম্বী দল 'সিয়া' (অর্থাৎ পক্ষ, সম্প্রদায় বা দল) এ নামে অভিহিত হইলেন। অপর পক্ষ ক্রমে সুন্নী নামে পরিচিত হইলেন। লিখি কোরাণ ব্যতীত মহম্মদ ও তাঁহার সহযোগিগণের উপদেশ ও মন্তব্য ইত্যাদি নাম ছিল 'হদিস'। এই সব 'হদিস' সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইল, তার না হইল 'সুন্না'। কেবল কোরাণ নয়, সুন্নাও মানেন বলিয়া এই সম্প্রদা 'সুন্নী' নাম হয়। সিয়ারা কোরাণ ব্যতীত সুন্না মানিতেন না।

মুশলমানমণ্ডলী এইরূপ পরস্পরবিরোধী দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হই সুন্নীরা বিশ্বাস করিতেন, মুশলমণ্ডলী সাধারণ সম্মতিক্রমে যাঁহাকেই খলিফা প মনোনীত করিবেন, তিনিই ধর্ম্মানুমোদিত খলিফা,—তবে খলিফাকে কোরে- গোত্রসম্ভূত হইতে হইবে, কারণ মহম্মদের সময় এই কোরেশগোত্রই মর প্রধান ছিলেন। সিয়াদের কথা ছিল, কেবল কোরেশ হইলেই হইবে না, প্র খলিফাকে মহম্মদের নিজবংশীয় অর্থাৎ তাহার কন্যাজামাতা আলি ও ফতি বংশীয় হইতে হইবে।

উম্মেয়া এবং তাহার পরে আব্বাস বংশীয় খলিফারাই মুশলমান সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রাধিপতি ছিলেন। সুন্নীরা ইঁহাদিগকেই খলিফা বলিয়া মানতেন। সিয়া রাজ্যাধীশ্বর বলিয়া বাধ্য হইয়া ইঁহাদের শাসনাধীনে থাকিতেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মগুরু বলিয়া ইঁহাদিগকে মানিতেন না। হোসেনের বংশধরগণ মেদিনায় বাস করিতেন,—শাস্ত্রালোচনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, শান্ত নিরীহ সাধুজীবন যাপন করিতেন। ইঁহারাই সিয়া মুশলমানদের ধর্ম্মগুরু বা ইমাম্ ছিলেন। অকটা সভয় বিদ্বেষের চক্ষে দেখিলেও, ইঁহাদের প্রতি কোনও অন্যায় অত্যাচার করিতে সুন্নী খলিফারা সাহসী হইতেন না। উম্মেয়া বংশীয় খলিদের রাজধানী ছিল সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত দামাস্কাস নগরে। পরে আব্বাসবংশীয় খলিফারা পারস্যের সীমান্ত প্রদেশ মেসোপটেমিয়ায় বোগ্দাদে রাজধানীস্থাপন করেন। এই খলিফারা তাঁহাদের বিপুল শক্তি ও সমৃদ্ধি হইতে সম্ভূত আড়- ম্বরে বোগ্দাদে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে হারুণ-আল্-রসিদের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। বহু মনোজ্ঞ কাব্য-কাহিনী ইঁহার নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের পাঠকমাত্রেই ইঁহার নামের সঙ্গে সুপরিচিত।

কালসহকারে ক্রমে খলিফাদের পতন হইল,—বহুশতাব্দীগত বহু রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর খলিফা বা ইস্লাম সমাজপতির অধিকার তুর্কের সুলতানগণ প্রাপ্ত হইলেন। শেষ খলিফাগণ মিসরে বাস করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে সুলতান প্রথম সেলিম মিসর জয় করেন এবং শেষ খলিফা

হাদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল পূর্ব্বরোমসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া শ্চিম এসিয়ার অধিবাসীদের নিকট 'রোম' বা 'রুম' নামে এখনও পরিচিত। রক্ষের সুলতান বা 'রুমের বাদসাহ'কে এখনও সুন্নী মুশলমানেরা খলিফা বা পনাদের সমাজপতি বলিয়া স্বীকার করেন।

ভারতে শৈশবমৃত্যুর পরিমাণ।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভারতে শৈশব মৃত্যুসংখ্যার অনুপাত ড় শতকরা ২৯,—অর্থাৎ প্রত্যেক শতসংখ্যক জাত শিশুর মধ্যে ২৯ জনের শবেই মৃত্যু হয়। কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত রাখিবার এত বিপুল য়োজন সত্ত্বেও এখানে গত ১৯১৫ সালে প্রতি হাজারে ২৮৬ জন, প্রায় করা ২৯ অনুপাতেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় য় মৃত্যু সংখ্যা যাহাতে হ্রাস হয়, তার জন্য অবিশ্রান্ত একটা আন্দোলন লাচনা চলে। কিসে জাত শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয়, রোগপীড়া নিবারিত হয়, সহজেই না ঘটে, তাহা জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বহু স্কা প্রকাশিত ও বিতরিত হয়।

মামাদের দেশে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা যে এত অধিক পরিমাণে শৈশব মৃ একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্যধিক দারিদ্র্যও অল্পাহার জনকজননীর স্বাস্থ্যহীনতা, অতি দীন গৃহে বাস—ইত্যাদি দুষ্পরিহার্য্য অসমূহও শিশুদের অকালমৃত্যুর অন্যান্য কারণ বটে। কিন্তু এই অজ্ঞতা দূর্বল, যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় আছে, যাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার মোটা-মুটি নিয়মগুলি অবলম্বনে সমর্থ, তাহাদের মধ্যেও অন্ততঃ জাত শিশু অনেক রক্ষা পায়কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অজ্ঞতার নিবিড়তা নিতান্ত কম নহে। বাল্য হইতে বিদ্যালয়ে আমাদের এমন বহু বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব শিখিতে হয়, যাহা জীবনে কখনও কোনও প্রয়োজনে আইসে না। কিন্তু সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহার বড় শিক্ষা আর হইতে পারে না, সেই স্বাস্থ্যনীতির শিক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়সমূহে নাই। কেবল শৈশব মৃত্যু নিবারণ জন্য নয়, স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল বার্দ্ধক্য এবং অকাল মৃত্যুরূপ যে অমঙ্গলসমূহ সমস্ত দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্যও স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশীলন শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। কিসে লোকে নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে, তাহা জানা থাকিলে সকল অার মধ্যেই লোকে কিছু না কিছু তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে:

যাহা হইবার হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহা হইতে পারে হইবে। সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি এবং শৈশবমৃত্যু নিবারণের উপায়সমূহের মোটামুটি নিয়ম লিখিত পুস্তিকা প্রকাশের ও বিতরণের ব্যবস্থা হইলে এই বর্ত্তমানেই যে দেশের প্রভুত মঙ্গল হয় তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু কে এই মঙ্গল-সাধনের ভার নিতে পারে? সরকার বাহাদুর ব্যতীত দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে তাহা সাধ্যায়ত্ত কি

হইল। এই পর্ব্ব যাঁহারা পালন করেন, পর্ব্বের সময় বহু উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও হাসান হোসেনের নাম করিয়া এখনও তাঁহারা বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন।

দুই দলে পূর্ব্বে যে ক্ষীণ মতপার্থক্য মাত্র ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা ভীষণ এক সাম্প্রাদায়িক বিরোধে পরিণত হইল। ইহার পর আলি ও তাঁহার পুত্র হোসেনহাসেনের পক্ষাবলম্বী দল 'সিয়া' (অর্থাৎ পক্ষ, সম্প্রদায় বা দল) এই নামে অভিহিত হইলেন। অপর পক্ষ ক্রমে সুন্নী নামে পরিচিত হইলেন। লিখিত কোরাণ ব্যতীত মহম্মদ ও তাঁহার সহযোগিগণের উপদেশ ও মন্তব্য ইত্যাদির নাম ছিল 'হদিস'। এই সব 'হদিস' সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইল, তার নাম হইল 'সুন্না'। কেবল কোরাণ নয়, সুন্নাও মানেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের 'সুন্নী' নাম হয়। সিয়ারা কোরাণ ব্যতীত সুন্না মানিতেন না।

মুশলমানমণ্ডলী এইরূপ পরস্পরবিরোধী দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সুন্নীরা বিশ্বাস করিতেন, মুশলমণ্ডলী সাধারণ সম্মতিক্রমে যাঁহাকেই খলিফা পদে মনোনীত করিবেন, তিনিই ধর্ম্মানুমোদিত খলিফা,—তবে খলিফাকে কোরেশ-গোত্রসম্ভূত হইতে হইবে, কারণ মহম্মদের সময় এই কোরেশগোত্রই মক্কায় প্রধান ছিলেন। সিয়াদের কথা ছিল, কেবল কোরেশ হইলেই হইবে না, প্রকৃত খলিফাকে মহম্মদের নিজবংশীয় অর্থাৎ তাহার কন্যাজামাতা আলি ও ফতিমার বংশীয় হইতে হইবে।

উম্মেয়া এবং তাহার পরে আব্বাস বংশীয় খলিফারাই মুশলমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রাধিপতি ছিলেন। সুন্নীরা ইঁহাদিগকেই খলিফা বলিয়া মানিতেন। সিয়ারা রাজ্যাধীশ্বর বলিয়া বাধ্য হইয়া ইঁহাদের শাসনাধীনে থাকিতেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মগুরু বলিয়া ইঁহাদিগকে মানিতেন না। হোসেনের বংশধরগণ মেদিনায় বাস করিতেন,—শাস্ত্রালোচনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, শান্ত নিরীহ সাধুজীবন যাপন করিতেন। ইঁহারাই সিয়া মুশলমানদের ধর্ম্মগুরু বা ইমাম্ ছিলেন। অনেকটা সভয় বিদ্বেষের চক্ষে দেখিলেও, ইঁহাদের প্রতি কোনও অন্যায় অত্যাচার করিতে সুন্নী খলিফারা সাহসী হইতেন না। উম্মেয়া বংশীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত দামাস্কাস নগরে। পরে আব্বাস বংশীয় খলিফারা পারস্যের সীমান্ত প্রদেশ মেসোপটেমিয়ায় বোগ্‌দাদে রাজধানী স্থাপন করেন। এই খলিফারা তাঁহাদের বিপুল শক্তি ও সমৃদ্ধি হইতে সম্ভূত বহু আড়-ম্বরে বোগ্‌দাদে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে হারুণ-আল্‌-রসিদের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। বহু মনোজ্ঞ কাব্য-কাহিনী ইঁহার নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের পাঠকমাত্রই ইঁহার নামের সঙ্গে সুপরিচিত।

কালসহকারে ক্রমে খলিফাদের পতন হইল,—বহুশতাব্দীগত বহু রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর খলিফা বা ইস্‌লাম সমাজপতির অধিকার তুরস্কের সুলতানগণ প্রাপ্ত হইলেন। শেষ খলিফাগণ মিসরে বাস করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে সুলতান প্রথম সেলিম মিসর জয় করেন এবং শেষ খলিফা তাঁহার হস্তে খলিফার অধিকার সমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

ইঁহাদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল পূর্ব্বরোমসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া পশ্চিম এসিয়ার অধিবাসীদের নিকট 'রোম' বা 'রুম' নামে এখনও পরিচিত। তুরস্কের সুলতান বা 'রুমের বাদসাহ'কে এখনও সুন্নী মুশলমানেরা খলিফা বা আপনাদের সমাজপতি বলিয়া স্বীকার করেন।

ভারতে শৈশবমৃত্যুর পরিমাণ।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভারতে শৈশব মৃত্যুসংখ্যার অনুপাত গড়ে শতকরা ২৯,—অর্থাৎ প্রত্যেক শতসংখ্যক জাত শিশুর মধ্যে ২৯ জনের শৈশবেই মৃত্যু হয়। কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত রাখিবার এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও এখানে গত ১৯১৫ সালে প্রতি হাজারে ২৮৬ জন, প্রায় শতকরা ২৯ অনুপাতেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিশুর মৃত্যু সংখ্যা যাহাতে হ্রাস হয়, তার জন্য অবিশ্রান্ত একটা আন্দোলন আলোচনা চলে। কিসে জাত শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয়, রোগপীড়া নিবারিত হয়, মৃত্যু সহজেই না ঘটে, তাহা জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বহু পুস্তিকা প্রকাশিত ও বিতরিত হয়।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা যে এত অধিক পরিমাণে শৈশব মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্যধিক দারিদ্র্যও অল্পাহার হেতু জনকজননীর স্বাস্থ্যহীনতা, অতি দীন গৃহে বাস—ইত্যাদি দুষ্পরিহার্য্য অবস্থা সমুহও শিশুদের অকালমৃত্যুর অন্যান্য কারণ বটে। কিন্তু এই অজ্ঞতা দূর হইলে, যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় আছে, যাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার মোটা-মুটি উপায়গুলি অবলম্বনে সমর্থ, তাহাদের মধ্যেও অন্ততঃ জাত শিশু অনেক রক্ষা পায়। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই অজ্ঞতার নিবিড়তা নিতান্ত কম নহে। বাল্য হইতে বিদ্যালয়ে আমাদের এমন বহু বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব শিখিতে হয়, যাহা জীবনে কখনও কোনও প্রয়োজনে আইসে না। কিন্তু সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহার বড় শিক্ষা আর হইতে পারে না, সেই স্বাস্থ্যনীতির শিক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়সমূহে নাই। কেবল শৈশব মৃত্যু নিবারণের জন্য নয়, স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল বার্দ্ধক্য এবং অকাল মৃত্যুরূপ যে অমঙ্গল সমুহ সমস্ত দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্যও স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশীলন শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। কিসে লোকে নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে, তাহা জানা থাকিলে সকল অবস্থার মধ্যেই লোকে কিছু না কিছু তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে :

যাহা হইবার হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহা হইতে পারে হইবে। সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি, এবং শৈশবমৃত্যু নিবারণের উপায়সমুহের মোটামুটি নিয়ম লিখিত পুস্তিকা প্রকাশের ও বিতরণের ব্যবস্থা হইলে এই বর্ত্তমানেই যে দেশের প্রভুত মঙ্গল হয়, তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু কে এই মঙ্গল-সাধনের ভার নিতে পারে? সরকার বাহাদুর ব্যতীত দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে তাহা সাধ্যায়ত্ত কি

ভারতে মোটর গাড়ীর আমদানী।

প্রতি বৎসরই ভারতে মোটর গাড়ীর আমদানী অতি দ্রুত বাড়িতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের আমদানীর যে সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন বন্দরে যত মোটরগাড়ী সেই মাসে আমদানী হইয়াছে, তাহার মোট মূল্য ৮৬০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তের লক্ষ টাকা। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে যাহা হইয়াছিল, তার দ্বিগুণ। এক মাসেই তের লক্ষ টাকার মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছে। না বাড়িয়া এই হিসাবেও যদি চলে, বৎসরে সাড়ে পনর কোটি টাকারও অধিক মূল্যের মোটর গাড়ী আমদানী হইবে অবশ্য মোটর গাড়ী সাহেবদেরই বেশী সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় ধনিজনেরও নিতান্ত কম নয়। এই কলিকাতায় দেশীয় লোকের মোটর গাড়ীও নিতান্ত কম দেখা যায় না।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে লোকে ক্রমে অধিকতর সুবিধাই চায়। পায়ে হাঁটিয়া চলা অপেক্ষা পশু-চালিত গাড়ীতে চলার সুবিধা বেশী, আবার পশুর গাড়ীর অপেক্ষা মোটরের সুবিধা আরও অনেক বেশী। সুতরাং মোটর গাড়ী জুটিলে এবং কিনিবার পয়সা থাকিলে, এত সুবিধা লোকে ছাড়িবে কেন? মোটর চলিতেছে, আরও চলিবে,—আসিতেছে, আরও আসিবে। চলুক, তাহাতে এমন দোষ নাই, কিন্তু আসা কমিলে যে দেশের বহু মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রধান দুর্ভাগ্য এই, যে সুবিধার জিনিশ সব আমরা কিনিতেই চাই, নিজেরা তৈয়ারী করিয়া নিতে চাই না। যেমন কিনিতে চাই, তেমন তৈয়ারী নিতে পারিলেই ভাল হয়। কত দিনে তা পারিব, কে জানে? যত দিন না পারিব, পরকে টাকা দিয়া এইরূপ পরের তৈয়ারী জিনিশই আমাদের কিনিতে হইবে। মোট খতিয়ানে লোকসানের ঘরেই অঙ্ক বেশী পড়িবে। কিন্তু এত লোকসান কতদিন চলিবে? লাভের অঙ্ক হইতে লোকসানের অঙ্ক যে দেশে বছর বছর বেশী পড়ে, আরও বেশী হয়, সে দেশকে একদিন দেউলিয়া হইতেই হইবে।

বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষা।

সমগ্র বঙ্গদেশে মাতৃভাষার সম্যক্ ব্যাপ্তি ও প্রচারোদ্দেশ্যে বাঙ্গলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন। উত্তর লিখিতে চারিমাস সময় দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের ফিঃ ৪৲ টাকা, ৩০শে অগ্রহায়ণ ফিঃ গ্রহণের শেষ দিন। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে উপাধি সম্বলিত সার্টিফিকেট ব্যতীত গুণানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক, ও নগদ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। বিশেষ নিয়মাবলীর জন্য অর্দ্ধ আনার টীকেটসহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা, পরিব্রাজক শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, সভাপতি "আর্য্যসাহিত্য-সমাজ" ৭৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩য় বর্ষ | পৌষ । | ৯ম সংখ্যা ।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি

প্রথম অংশ ।

বৌদি ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শিশির এম, এ, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার অল্পদিন পরেই শিশির একটি সরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী গ্রীষ্মাবকাশে শিশির বাড়ী আসিয়াছে।

মধ্যাহ্ন অতীত প্রায় ; গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিবা কাটিতে চাহে না। পল্লীর শ্যামল বন-চ্ছায়ায় পাখীর গান বিরল হইয়াছে। গৃহের অলিন্দে কপোত যুগলের মৃদুল কুজন, আম্রবৃক্ষের ঘন পল্লবান্তরাল হইতে ঘুঘুর উদাস সুর, অন্তর মধ্যে একটা স্বপ্নলোক রচনা করিয়া তুলিতেছিল ; কোথায় যেন একটি অতীত স্মৃতির পুলকব্যাকুল করুণ সুর বড় মৃদু মধুর বাজিতেছিল, সেই সুরটীকে যেন ধরা যাইতেছে না, বুঝা যাইতেছেনা। তবু অন্তর একটা অনির্দ্দিষ্ট সুখের কুণ্ঠায় ও বেদনায় রহিয়া রহিয়া শিহরিতেছিল।

শিশির একটা টেবিলের কাছে বসিয়া বসিয়া একখানা বাঙ্গালা বহির পাতা উল্‌টাইতেছিল; কপোতের কূজন, ঘুঘুর উদাস সুর, তাহারও অন্তরে একটা সাড়া দিতেছিল। বহির লেখায় মনঃসংযোগ হইতেছিল না। শিশির হঠাৎ বহি ফেলিয়া দিয়া, চেয়ার সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, "বৌদি',"--

গৌরী সেই কক্ষের মধ্যেই একটু দূরে বসিয়া পান সাজিতেছিল। অহ্বান শুনিয়া সে তাহার শান্ত দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া শিশিরের দিকে চাহিল, "কি শিশির, ডাক্‌লে ?"—

"বৌদি', দাদা এলে কাল তুমি সব কথা গুছিয়ে বল্‌বে ত ?"—

গৌরী চক্ষু একটু নতকরিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তা' বল্‌ব, কিন্তু"—

—"কিন্তু কি, বৌদি ?"—

একটা বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া শিশিরের রাগ হইতেছিল; রাগটা সে টেবিলের উপরকার বাঙ্গলা বহিখানির উপর ঝাড়িল; বহিখানি তুলিয়া লইয়া, একটু জোরে আবার টেবিলের উপরেই ফেলিয়া দিল।

গৌরী হাসিল, কহিল, "তা' ও বইটার উপর রাগ কর্‌লে কি হবে ?—তুমি নিজে বল্‌লেও ত পার্‌বে,—এখন ত আর ছোটটি নও,'—

—"তা' হ'লে আর তোমার দোহাই দিচ্ছি কেন ?—তুমি পার্‌বে কি না তাই স্পষ্ট করে বল,"—

শিশিরের অস্থিরতা দেখিয়া গৌরী ক্রমাগতই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। গৌরীর হাসি দেখিয়া শিশির চটিয়া গেল।

—"যা' বল্‌ব তা' তো পার্‌বেইনা, পার শুধু হাস্‌তে !"—

গৌরী হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা শিশির, তুই কলেজে ছেলেদের পড়াস্‌ কেমন করে ?—তারা তোকে মানে ?"—

শিশির এবার হাসিয়া উঠিল। "কেন, তা' বল্‌ছ কেন, বৌদি'?"—

"তুই এখনও যেন ছোটটিই আছিস্‌! তেম্‌নি অস্থির, তেম্‌নি চঞ্চল!—তাই আমার মনে হয়, ছেলেগুলো তা'দের এই ছোট্ট অধ্যাপকটিকে মানে কি না।"—

ছেলে মহলে শিশিরির সম্ভ্রম কতটুকু, তাহা আর সে ভাঙ্গাইয়া বলিল না! গৌরী তাহা যথেষ্টই জানিত। শিশির শুধু একটু হাসিল, তারপর দু'একবার গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া কহিল, "সে কথা যাক্‌, আমি যা' বলি শোন, তুমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলে স্বীকার করাও, তিনি যদি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সত্যি বাড়ী এসে না বসেন, আমি আমার কাজ ছেড়ে দেবই !"

গৌরী হাতের পাণ বাঁটার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল, "তা' তুমিই সাম্‌না সাম্‌নি মীমাংসাটা ক'রে ফেলনা কেন?—আমার দোহাই কেন?"—

—"সে আমার সাহসে কুলায় না, বৌদি'! দাদার সাম্‌নে বেশী জেদ্ করে কোনও কথা বলা আমার দ্বারা হবেনা আমি বলে রাখ্‌ছি;—ও তোমাকেই বল্‌তে হবে, এবং ব্যবস্থা করে দিতে হবে;—নইলে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বসে থাক্‌ব, তা'তে তোমার এতটুকুও সন্দেহ কর্‌বার নেই কিন্তু!"—

"শোন একবার পাগল ছেলের কথা! সবাই চাকুরী ছেড়ে এসে বস্‌বি, সংসার চল্‌বে কি করে?"—

"তুমি ৪০।৫০৲ টাকা আয়ের দিনে যদি সংসার চালাতে পেরে থাক, দাদা চাক্‌রী ছাড়লেও আমি ২৫০, টাকা পাব, তা'তেও তোমার সংসার চল্‌বেনা?"—

"তবু শক্তি থাক্‌তে পুরুষ মানুষ চাকুরী ছেড়ে এসে বাড়ী বসে থাক্‌বে, এটা, শিশির, তুমিই কি ভাল বলে মনে"—

—"কর্‌ছি!—যে দুঃসহ পরিশ্রম করে দাদা সংসার রক্ষে করেছেন, তা' আমি ভুলিনি'! তাঁকে বিশ্রাম দিতেই হবে, এবং সেটা যে এখন থেকেই, তা' আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি,"—

পাণগুলি গুছাইয়া ডিবায় রাখিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তুই পরিষ্কার বল্‌তে কেবল আমাকেই পারিস! কেন, তুই এখনও সেই ছোটটীই থাক্‌বি?"—

গৌরীর হৃদয়ে একটি অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তির উচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিতেছিল! এই দিগ্বিজয়ী যুবকটি যে এখনও কাছে আসিয়া, অবোধ সরল শিশুটির মতই যখন তখন আব্‌দার পরিপূরণের জন্য তাহার উপরই দাবী করে, অত্যাচার করে, ইহা মনে করিয়া এই নির্ভরপটু স্নেহ পাত্রটির প্রতি তাহার স্নেহ আরও নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল!

—"আমি বাপু, কিন্তু বল্‌তে পার্‌ব না,"—গৌরী দুয়ারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার তাম্বুল রাগ রঞ্জিত অধরে একটু মৃদু হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

শিশির দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তা' তোমাকে বল্‌তেই হবে বৌদি', নইলে"—

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"নইলে তুমি কি কর্‌তে চাও, শিশির?"—

—"কি করতে চাই?—একটু এগিয়ে এসে দেখ,"—গৌরী অগ্রসর হইয়া আসিল; শিশির চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, কাগজ, কালী, কলম টানিয়া লইল, এবং দ্রুত নিপুণ হস্তে ইংরাজীতে যাহা লিখিয়া গেল, তাহা গৌরী দাঁড়াইয়া

পড়িতেছিল। গৌরী কিছু ইংরাজী জানিত, এবং চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারিত।

গৌরী চিঠি পড়িয়া কহিল, "তুমি কি ক্ষেপ্‌লে, শিশির ?"

শিশির সত্যই যে পদত্যাগ পত্র লিখিয়া শেষ করিবে, গৌরী তাহা একবারও মনে করিতে পারে নাই।

"তবে এ চিঠি আজ্‌কার ডাকেই রওনা করে দেব ?"—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া শিশির কহিল।

—"তাও কি হয় ? আচ্ছা কি বল্‌তে হবে বল, আমি সব ত আর গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌ব না" ।—

—"তুমি যা' ভাল মনে কর ব'লো, আমার যা' বলার তা' সবই তোমাকে বলেছি !"—

গৌরী একটু হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বল্‌ব—বল্‌ব !"—

আল্‌নার উপর হইতে সার্টটা টানিয়া লইতে লইতে শিশির কহিল, "বৌদি', কয়েকটা পয়সা এনে দাও, টিকিটের জন্য !"—

গৌরী কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতেছিল, শিশির ডাকিয়া কহিল, "ভাল কথা বৌদি', দক্ষিণপাড়ার ছেলেগুলি ভারি ধরেছে, তাদের লাইব্রেরীর জন্য কিছু চায়। তুমি যদি বল ত কিছু তা'দের দি' !—কি বল, বৌদি ?"—

গৌরী দুয়ারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "তা' তোমার যা ইচ্ছা হয় দাও, আমি আর কি বল্‌ব ?"—

"বাঃ, আমি যে তাদের বলেছি, বৌদি' যা' বলেন, দেব !"

"তবে পাঁচ টাকা দিলে হবে ?"

"অত ! তা' বেশ, তুমি যা' বলেছ, তাই দাও ; ছেলেগুলির কপাল ভাল !"

গৌরী টাকা ও কয়েকটি পয়সা আনিয়া শিশিরের হাতে দিতে দিতে কহিল,—

"কিছু টাকা তোর কাছে রেখে দিলেই ত পারিস, শিশির ! টিকিটের পয়সাটাও আমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি ! কেন আর এমনি নাবালক থাক্‌বি তুই ?" গৌরীর মুখে হাসি দেখা যাইতেছিল, কিন্তু চোখের পাতা জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। তরল হাস্যজড়িত কণ্ঠে শিশির কহিল, "আমি চিরকালই যেন তোমার কাছে নাবালক থাকৃতে পারি, বৌদি' !"

শিশির বাহির হইয়া গেল ! গৌরী প্রদীপ গুছাইয়া রাখিয়া, গৃহদেবতার বৈকালিক ভোগ সাজাইতে বসিল !

(৪)

শিশির কর্ম্মগ্রহণ করার পর হইতেই এক নূতন 'বাহানা' ধরিয়াছিল !

কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত শচীন্ একটি দিনের জন্যও অবসর পায় নাই ; দারুণ শ্রমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবু বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই , সে খাটিয়াই যাইতেছে। কোনও আরাম, সুখ, বিশ্রাম সে চাহে নাই । গৌরীর সঙ্গ হইতেও সে নিজেকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত একরূপ বিচ্ছিন্নই রাখিয়াছে ! এমন অবকাশ কোনও দিনই মিলে নাই. যে, কিছু দীর্ঘকালের জন্য পল্লীজীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে !

পঠদ্দশায় শিশির একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিল, কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র বাসায় গৌরীকে প্রতিষ্টিত করিয়া, একটি ক্ষুদ্র সংসার রচনা করিয়া তুলিতে পারে কিনা,শচীনকে একটু শান্তি ও আরামের মধ্যে রাখিতে পারে কিনা !

কিন্তু শচীনের জন্যই সে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। পল্লীর বাড়ীটি ছাড়িয়া কোনও দিনই যে গৌরীর বিদেশে যাওয়া হইবেনা, তাহা শিশির নিশ্চিত-রূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল। এবং সেই পঠদ্দশাতেই সে আপনার সমগ্র শক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির মধ্য দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল !

আজ সকল সাধনান্তে বীণাপাণির বরপুত্রের দিকে পদ্মালয়াও যখন একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তখন শিশিরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই হইল, যে সে শচীনকে কলিকাতার কর্ম্ম কোলাহলের মধ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া পল্লীর শান্ত-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেই !

শিশির যখন কোনও মতেই শচীনকে কর্ম্মত্যাগ করাইতে পারিলনা, তখন সে গৌরীর কাছে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বসিল, যে, গ্রীষ্মের ছুটির অগ্রে সে আর স্বীয় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবে না, এবং বাড়ীতেই বৌদিদির অঞ্চলের ছায়ায় মহা আনন্দে দিনগুলি কাটাইয়া দিবে !

গৌরী তাহাকে অনেক বুঝাইল, ফল হইল না !

শচীন তাহার অনিচ্ছা ও অমত দুইই গৌরীর কাছে লিখিয়া জানাইল, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিশিরকে কোনও মতেই নিরস্ত করা গেল না !

শিশির এখন আর ছোটটি নহে, সাংসারিক বিষয়ে তাহার মতামতকে এতটা উপেক্ষা এখন আর শচীন করিতে পারেনা, যাহাতে শিশিরের অন্তরে কোনও প্রকারে আঘাত লাগিতে পারে !

সুতারাং দীর্ঘকালের বিতর্কের পর শচীনকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

শচীন একেবারেই কর্ম্মত্যাগ না করিয়া ছয়মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিল। উদ্দেশ্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিশিরকে একবার বলিয়া দেখিবে।

সেদিন দুপুরের আহারের সময় শচীন কহিল, "শিশির, আমাকে যে একেবারেই অকর্ম্মণ্য ক'রে রাখ্‌তে চাস্, এটা কি ভাল হবে? এ ছ'টা মাস কেটে গেলে, তোর জেদ্ যদি তুই ছাড়িস্, তা' হ'লে না হয়—"

শিশির কথাটা শুনিয়া, জলের গেলাসের মধ্যে হাত ধুইতে ধুইতে নিম্নস্বরে কহিল,—"বাড়ীটাকে একেবারে ছেড়ে দিলে ত চল্‌বেনা, দাদা! এতকাল বৌদি' এ বাড়ীর জন্য প্রাণপণ করেছেন, এখন তাঁকে একটু আরামে রাখ্‌তেই হবে,—"

গৌরী একটা তরকারী লইয়া আসিয়াছিল, সে ব্যস্ত ভাবে কহিল, "ও কি শিশির, হাত ধুচ্ছ যে!—আর একটা মাছের তরকারী রয়েছে, দুধ আছে,"—

"তাই নাকি! লক্ষ্য করিনি!"—অন্যমনস্ক শিশির হাসিয়া উঠিল। গেলাসটা সরাইয়া রাখিয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও আবার কি এনেছ তুমি? আমার যে খাওয়া হয়ে গেছে!"

"তা' তো বটেই, এগুলি সব তবে পাড়ার লোক ডেকে খাওয়াই!"—গৌরী শিশিরের পাতের কাছে তরকারীর বাটিটা রাখিয়া দিয়া মৃদু হাসিল।

"কি তোমাদের কথার মীমাংসা হ'ল? কি স্থির কর্‌লে?" গৌরী কহিল।

—"তোমার বুঝি কাজ নেই, বৌদি'! আমার যা' বল্‌বার তা' তোমাকে একদিনই বলে রেখেছি। একজন বাড়ীতে থাক্‌বেই, হয় দাদা, না হয় আমি, এখন কা'কে তুমি বাড়ী থাক্‌তে বল?" গৌরীর দিকেই চাহিয়া শিশির এমন ভাবেই কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, যেন শচীন সেখানে উপস্থিতই নাই।

শচীন একবার গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া,একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তা উনি হয়ত তোমার দাদাকেই থাক্‌তে বল্‌বেন"

গৌরী তীব্র অপাঙ্গ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "ওমা, কথার শ্রী দেখ!"

গৌরী ভারি লজ্জা পাইল; এবং মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া পাকঘরের দিকে চলিয়া গেল।

শচীন দেখিল, শিশিরের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল, "তোর ছুটি আর ক'দিন আছে, শিশির?"

—"আস্‌ছে সোমবার খুল্‌বে, আর পাঁচ দিন।"

(৫)

বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করার কিছুদিন পরেই শিশিরের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

নববধূ লক্ষ্মী ধনবানের আদরিণী কন্যা; বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এ বাটীতে মাত্র দুইবার আসিয়াছে। গৌরী আনিতে পাঠাইলেই একটা না একটা আপত্তি তুলিয়া লক্ষ্মীর মাতা লক্ষ্মীকে পাঠাইতেন না। গৌরী ভাবিত, লক্ষ্মী এখনও ছেলে মানুষ,—একটু বড় হইয়া উঠিলেই নিজের সংসারের উপর মায়া বসিবে এবং তখন নিজেই উদ্যোগ করিয়া চলিয়া আসিবে। কিন্তু গত বৎসর চলিয়া যাওয়ার পরও এ পর্য্যন্ত গৌরী লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য তিনবার লোক পাঠাইয়া যখন আনিতে পারে নাই, তখন সে সত্যই একটু মুস্কিলে পড়িল।

শিশির যখন গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিল, তখনও গৌরী লক্ষ্মীকে আনিতে পাঠাইল। কিন্তু লক্ষ্মী আসিল না। গৌরী বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছিল; তাহাতেও কোনও ফল হইল না। তখন গৌরী একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারটার জন্য সে শিশিরের কাছে নিতান্তই কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া শিশিরকে লক্ষ্মীর পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিল।

শিশির তখন মধ্যাহ্নের আহারের পর শুইয়া পড়িয়া একখানা ইংরাজি নভেলের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গৌরী যখন ভয়ে ভয়ে শিশিরের কাছে দাঁড়াইয়া কথাটা উত্থাপন করিল। তখন শিশির কোনও উত্তর দিল না, শুধু মুখের উপর হইতে বহিখানি নামাইয়া একবার গৌরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির সুস্পষ্ট আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোনও কথা না কহিয়া শিশির পরক্ষণেই বহি তুলিয়া লইল। গৌরী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"লক্ষ্মী ভাইটি আমার!"—

শিশির বহি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল "তুমি আস্‌তে লিখেছ, সেইটেই যথেষ্ট নয় কি বৌ দি?"—

গৌরী আজ বিদ্রোহকে উপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল; ধীরে ধীরে কহিল, "আমি একবার লিখেছি কি না লিখেছি, তা' তোমার ত দেখবার দরকার নেই ভাই; আমি তোমাকে অনুরোধ কচ্ছি, তুমি, লক্ষ্মী ভাই আমার, একবারটি'—"

—"সে হবে না, বৌদি'। যারা তোমার চিঠিকে উপেক্ষা কর্‌তে পেরেছে, তাদের বাড়ীতে যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়"—

—"উপেক্ষা কর্‌বে কেন? অসুবিধা ছিল, পাঠায়নি; সব সময়েই যে সকলের সুবিধা থাকৃতে হবে এমন কথা নেই ত!"—

তীব্রস্বরে শিশির কহিল, "বৌদি"—

গৌরী শিশিরের মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিল।

শিশির দ্রুত অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই এক বছরের মধ্যে তুমি ক'বার আন্‌তে লোক পাঠিয়েছ, তা' কি আমি জানি না, বৌদি'?"

—"কই, ক'বার আমি লোক পাঠিয়েছি? কে তোমাকে বলে এ সব কথা?"—নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন একটা সামান্য আশ্রয়কেও আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে, গৌরীও তেমনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য কথাটা বলিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি যে কতখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং চক্ষুর দৃষ্টি যে কতটা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা গৌরী নিজেও যেন কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল! শিশির তেমনি অস্থিরভাবে কহিল, "কাউকে বল্‌তে হবে কেন, বৌদি'? আমি নিজেই সব খোঁজ রাখি।"—

গৌরীর আর কোনও উত্তর ছিল না। তবু সে হতাশভাবে কহিল, "কেন, সংসারের এমন সব তুচ্ছ ব্যাপারেরও খোঁজ তুমি অত ক'রে রাখ্‌তে যাও কেন?"—

"সংসারের কিছুরই আমি খোঁজ রাখ্‌তে চাইনে; কিন্তু যে ব্যাপারগুলিতে তোমাকে আঘাত করে এবং উপেক্ষা জানায়, তা' তুমি তুচ্ছ মনে কর্ত্তে পার, বৌদি', কিন্তু আমি সেই গুলিকেই সব চেয়ে গুরু বলে মনে করি"—

গৌরী উচ্চকণ্ঠে কহিল, "এ তোমার বড় বাড়াবাড়ি!—তিলকে তাল ক'রে তোলাটা ত ঠিক্ নয়!—দূর থেকে কে কার অসুবিধা ঠিক বুঝ্‌তে পারে? তুমি নিজে একবার গেলেই সব গোল কেটে যাবে;—সব না জেনে শুনেই কারু উপর অবিচার করাটা ত ঠিক নয়,"—

গৌরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিশির কহিল, "তোমার বিচার নিয়ে তুমিই থাক;—ইচ্ছা হয়, আবার চিঠি লেখ, লোক পাঠাও,—আমি যেতে পার্‌ব না, ঠিক জেনে রাখ।"

আল্‌নার উপর হইতে একটা জামা টানিয়া লইতে লইতে শিশির কহিল,

—"কে তোমার সঙ্গে বসে বসে ঝগড়া কর্‌বে বাপু, তোমার যা' খুসি কর, আমি বেরিয়ে পড়্‌লুম্‌।"—

(৬)

পূজার ছুটিতে শিশির বাড়ী আসিয়াছে।

চতুর্থীর দিন সকাল বেলা শিশির নিজের ঘরটা গুছাইতেছিল। গৌরী আসিয়া কহিল,—"ও ঘরে দুটা টেবিল রয়েছে, তুমি একটা এ ঘরে এনে রাখ; কাগজপত্র বইটই গুলি রাখ্‌তে সুবিধা হবে।"

চাকরটা বাহিরে যাইতেছিল, গৌরী তাহাকে টেবিল আনিয়া দিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। চাকর টেবিল আনিয়া দিল। ড্রয়ারের ভিতর কিছু কাগজ ও কয়েকখানা চিঠিপত্র ছিল; শিশির সে গুলিকে বাহির করিয়া আনিল। কোনও আবশ্যকীয় কাগজ আছে কি না একবার নাড়িয়া দেখিল। কাগজগুলি একটা চুবড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিবার সময়ে একখানা চিঠির উপর শিশিরের দৃষ্টি পড়িল। চিঠির উপর শচীনের নাম লিখিত ছিল। ডাকঘরের মোহরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সে যাহা সন্দেহ করিয়াছে তাহাই বটে। চিঠি লক্ষীর পিত্রালয় হইতে আসিয়াছে।

খামখানা হাতে করিয়া শিশির একটু ভাবিল, তার পর খামের ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে শিশিরের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল, ললাটরেখা গভীর হইল, অধর দংশন করিতে করিতে শিশির তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী পাকগৃহের মধ্যে কি করিতেছিল, শিশির চঞ্চলপদে দুয়ারের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "বৌদি, আমি মীরপুর যাব,—এখনি,—"

শিশিরের তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৌরী ফিরিয়া চাহিল; শিশিরের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া চকিতভাবে কহিল, "কি হয়েছে শিশির,—মুখ চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন তোমার?"—

"কিছু হয়নি, আমি মীরপুর যাব, তাই বল্‌তে এসেছি। আমি আজই যাব,—এখ্‌খুনি যাব!"

"এখনি যাবে!—পাক হয়নি, না খেয়ে কেমন করে যাবে?—এখনি হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন শিশির?"—

"খাওয়া আমার হবে না, আমি ন'টার গাড়ীই ধর্‌ব,—তুমি দাদাকে ব'লো, তাঁর ফির্‌বার দেরী আছে। তুমি কিছু টাকা আমায় দাও"—

গৌরীর চিত্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় পীড়িত হইতেছিল, সে শিশিরের কাছে সরিয়া আসিয়া স্নেহ তরলকণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে শিশির?—তোমার মুখ দেখে ত আমার ভাল বোধ হচ্ছে না,—কারু অসুখ বিসুখ ত করেনি?"

"হবে কি?—কিছু হয়নি! পূজার দিনে ঘরের বৌটাকে কি একবার আন্‌তে বল্‌তেও নেই,—তোমরা ত বল্‌বে না, কাজেই আমার নিজেরই যেতে হবে!"

শিশিরের কথা শুনিয়া গৌরী বুঝিল, কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহাতে হঠাৎ তীব্র আঘাত পাইয়াই শিশির অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই আঘাতটা যে শিশির লক্ষ্মীর পিত্রালয়ের দিক হইতেই পাইয়াছে, তাহাও গৌরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। শিশিরের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইতে লইতে উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে গৌরী কহিল, "আমার মাথা খাস্; শিশির, কি হয়েছে বল্!"—

গৌরীর স্নেহতপ্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে শিশিরের বলিষ্ঠ হাতখানি একটি ক্ষুদ্র শিশুর হাতখানির মতই কাঁপিতেছিল। সেই স্নেহস্পর্শ শিশিরকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল, তাহার বিশাল চক্ষু দুইটা অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল;—সে হাত ছাড়াইয়া নিতে নিতে আর্দ্রকম্পিত কণ্ঠে কহিল,——"কেন তোমরা এই একঘর কুটুম্বের কাছে এমন করে বার বার অপমান ভোগ কর্‌ছ? আমার কাছেও সে অপমান গোপন কর কেন? আমি কি এতই দূরে সরে গিয়েছি? এই অপমান লুকিয়ে লুকিয়ে সহ্য করে, কেন তোমরা আমাকে এমন কুণ্ঠিত করে তুল্‌ছ, বৌদি'?"

গৌরী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কোথায় আমরা অপমান ভোগ করে তোর কাছেও লুকিয়ে রেখেছি, শিশির? তুই কি যে বলিস্ তা'ত"—

—"মোটেই বুঝতে পার্‌ছ না, কেমন, এই ত?"—হঠাৎ শিশির উগ্র হইয়া উঠিয়া, গৌরীর হাতের মধ্য হইতে তাহার হাত টানিয়া নিয়া কহিল, "তা' বেশ, না বুঝে থাক, না বুঝেছ,—তুমি টাকা এনে দাও!"—

গৌরী শিশিরের প্রকৃতি ভাল করিয়াই জানিত। সে যখন যাওয়াই সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন তাহাকে আর বাধা দিয়া যে কোনও লাভই নাই, তাহা

সে বেশ জানিত। আর কোনও কথা না বলিয়া গৌরী কিছু টাকা আনিয়া দিল, শিশির টাকা নিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত পরে গৌরী একটা রেকাবীতে কিছু খাবার ও এক গেলাস জল নিয়া শিশিরের ঘরে গিয়া দেখিল, শিশির চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, সম্মুখের টেবিলটার উপরেই মাথাটি অবসন্ন ভাবে নীচু করিয়া রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে।

গৌরীর পায়ের শব্দ পাইয়া শিশির মাথা তুলিয়া চাহিল। ব্যথিত দৃষ্টিতে গৌরী চাহিয়া দেখিল, তখনও শিশিরের চক্ষের অশ্রুবিন্দু শুকায় নাই!

কোনও কথা না কহিয়া খাবারের রেকাবীখানা হাতে করিয়া গৌরী টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশির হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যে কি হ'য়ে যাচ্ছি, তা' আমি নিজেই ভাল ক'রে বুঝতে পাচ্ছিনা;—তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি কোথায় যাব, বৌদি'?—আমি যাব না!"—

গৌরীর স্নেহপূর্ণ অন্তর শিশিরের জন্য আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

শিশির যে বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারে নাই, সে জন্য গৌরীর বুকের মধ্যে একটা তীব্র কণ্ঠাপূর্ণ বেদনা নিশিদিন নিবিড় হইয়াই ছিল!

বিবাহের পূর্ব্বে শিশির একদিন বলিয়াছিল, 'বড় লোকের ঘরের মেয়ে না এনে, বড় গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আন, যে তোমার মর্য্যাদা বুঝবে, বৌদি'!'—কথাটা গৌরী একটি দিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই।

ধনীর জামাতা হইলে শিশির আদর যত্ন পাইবে, তাহাই মনে করিয়া, যখন মীরপুরের জমীদারের একমাত্র দুহিতার সহিত বিবাহ প্রস্তাব হইল, তখন গৌরী কত আগ্রহেই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল। বৌদিদির আগ্রহ দেখিয়া শিশির আর কোনও কথাই বলে নাই!

গৌরীর কেবলি মনে হইত শিশিরের এই অশান্তি ও অসুখের সেই একমাত্র কারণ! সমস্ত অপরাধের বোঝাটা নিজের উপর চাপাইয়া দিয়াও সে যখন কোনও মতেই শান্তি পাইত না, তখনই সে মীরপুরে পত্র লিখিতে বসিত; লোকের পর লোক পাঠাইত! কিন্তু মীরপুরেরর জমীদারগৃহিণী নানাপ্রকার আপত্তির সৃষ্টিই করিয়া তুলিতেন, লক্ষ্মীকে কবে যে সঠিক পাঠাইতে পারিবেন, তাহা কোনও দিনই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন না।

গৌরীর চিঠিতে যখন কোনও কাজই হইল না, তখন শচীন লক্ষ্মীর পিতার

নিকট পত্র লিখিল। শচীন আশা করিয়াছিল, লক্ষ্মীর পিতা সত্যশঙ্কর চৌধুরী যাহা হয় একটা সঙ্গত ব্যবস্থাই করিবেন! কিন্তু সত্যশঙ্কর বাবু শচীনের চিঠির উত্তরে এমন একখানি চিঠি লিখিলেন, যে চিঠি শচীন ত সাহস করিয়া শিশিরকে দেখাইতে পারিলই না, পরন্তু সে যে কি করিবে তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

আজ ড্রয়ারের কাগজপত্রের মধ্যে শিশির হঠাৎ সেই চিঠিখানি পাইয়া বসিল। চিঠিখানির মধ্যে এমন কয়েকটি কথা ছিল, যাহা লিখিয়া সত্যশঙ্কর বাবু অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়াই শিশিরের মনে হইতেছিল। কিন্তু দাদাকে এবং বৌদিদিকে কি প্রকার পুনঃ পুনঃ এইরূপ অপমান হইতে রক্ষা করিবে, তাহাই আজ শিশিরের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌরী খাবারের রেকাবীখানা শিশিরের সন্মুখে রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "শিশির, কিছু খেয়ে নে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি সব কথা বুঝ্‌তে পেরেছি, তুই বোধ হয় সেই চিঠিটাই পেয়েছিস্, ঐ ড্রয়ারের মধ্যেই আমি তা' রেখেছিলাম। আমি এতদিন তোকে মীরপুর যেতে বলেছি, তুই যাস্‌নি,—আজ তোকে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না; কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝ্‌তে পেরেছি, আর উপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছেনা। শিশির, আজ আমি তোকে সত্যিই মীরপুর যেতে দেব, যদি তুই একটা কথা আমার কাছে স্বীকার করে যেতে পারিস্!"—

শিশির খাবার খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি"?

—"তুই আমাকে বল্, যে, তারা যে রকম ব্যবহারই করুক না কেন, তুই তা'তে কোনও উত্তরই করবিনে,—এবং সেখানে কোনও অনর্থ ঘটাবিনে; শুধু সহ্য করেই চলে আস্‌বি!"—

গৌরী তাহার স্নেহ ব্যাকুল দৃষ্টি শিশিরের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্থির-ভাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শিশির কহিল, "আমি কোনদিনই মীরপুর যেতামনা, বৌদি'! কিন্তু যারা আমার দাদাকেও অপমান কত্তে সাহস করে, তাদের আমি কোনও মতে ক্ষমা করতে পারিনা! অন্যের সংসারের ব্যবস্থার উপর অনাহুত ভাবে কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তে আসা যে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সে জ্ঞানটাও যদি তাদের না থাকে, তা' হ'লে,"—

গৌরী বাধা দিয়া কহিল,—"না, তুমি যদি সেখানে গিয়ে অনর্থই ঘটাও, বিবাদের সূচনাই কর, তা' হ'লে যেয়ে কাজ নাই তোমার,"—

—"না, বৌদি, আমাকে এবার যেতেই হবে; সকল অপমান ও অনর্থকে সৃষ্টি করে তোল্‌বার জন্য যে সেখানে রয়েছে, সে কোনও দিনই এ বাড়ীতে আসবার ইচ্ছা রাখে কিনা, শুধু সেইটুকুই আমি জেনে আস্‌তে চাই!—তবে তোমার কথাই থাক্‌বে, আমি সবই সহ্য ক'রে আস্‌ব, তুমি যা' বল্‌বে তাই কর্‌ব, এই বল্‌ছি!"—

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

স্মৃতি।

(১)

আজি কেন বাজে বাঁশী
　　প্রভাতে দিতে যাতনা,
কমলা পলায়ে গেছে
　　কেন পড়ে আলিপনা;
প্রতিমা চলিয়া গেছে
মণ্ডপ পড়িয়ে আছে
রাস নিশি পোহায়েছে
　　কুঞ্জেতে কেন গুঞ্জনা,
আজি কেন বাজে বাঁশী
　　প্রভাতে দিতে যাতনা।

(২)

উৎসব থামিয়া গেছে,
　　মিছে কেন কোলাহল,
ভালবাসা ফুরায়েছে
　　কথাতে কি হবে বল;
মলয় গিয়াছে চলে
কুসুমে ভূতলে ফেলে
জামাতা বিহনে ওগো
　　কন্যা এবে হলাহল,
উৎসব থামিয়ে গেছে
　　মিছে কেন কোলাহল।

(৩)

বর কন্যা চলে গেছে
　　রয়েছে কনকাঞ্জলি,
রাধা শ্যাম লীলা শেষে
　　কি করিছে চন্দ্রাবলী;
বিভব গিয়াছে ঘুচে
মিছে নাম দেরে মুছে
বসন্ত চলিয়া গেছে
　　ধূ ধূ আজ বনস্থলী,
বর কন্যা চলে গেছে
　　রয়েছে কনকাঞ্জলি।

শ্রীএককড়ি দে

বন্ধনমুক্তা।

সন্ধ্যার অন্ধকার! আমি তোমায় ভালবাসি; আমি তোমার দিকে প্রতিদিন চাহিয়া থাকি; কাঞ্চনগৌর চঞ্চল মেঘশিশুগুলি যখন নানা রঙের পোষাক পরিয়া খেলিতে থাকে, তুমি তখন পিছন হইতে বিধাতার অভিশাপের মত নিষ্ঠুর অব্যর্থভাবে কেমন তাদের গ্রাস কর, তাই আমি দেখি! কোন উপায় নাই—ঐ অসহায় আনন্দময় সুন্দর মেঘশিশুদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। মনে হয়, ঐ দূর গ্রামের প্রান্তদেশে ছুটিয়া গিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দিই, কিন্তু হায় ও গ্রামের প্রান্তদেশ মিলে না—জীবন থাকিতে মিলিবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার! তুমি কুৎসিৎ, তুমি ভয়ঙ্কর, তুমি মর্ম্মহীন—তবু তোমায় ভালবাসি। তোমার কোলে আমার স্বামীকে—আমার সর্ব্বস্বকে যে তুলিয়া দিয়াছি। ওগো, বড় দুঃখের বোঝা তোমায় সঁপিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি সময়ে দিবস রজনীর মিলন বাসরে, আমার হৃদয় বাসর শূন্য করিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তুমিই সে স্মৃতি চিরনবীন করিয়া রাখিয়াছ, তাই তোমায় ভালবাসি। এই দীর্ঘ দশ বৎসর বহু কষ্ট সহ্য করিয়া আমি তাঁহার শেষ আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি—আজ ব্রত পূর্ণ, আমার কর্ম্মভার অবসান, আজ আমি বন্ধন মুক্ত। কিরূপে? তাহা বলিতেছি।

দরিদ্র বাঙালী পরিবারের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে ভাল লাগিবে কি? চোখের সামনে নিত্য যাহা দেখিতে পাই, নিত্য যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, তাহার বিষয় বেশী বলিতে বা শুনিতে ভাল লাগে না। যেটুকু আবশ্যক তাহাই বলিব।

আমার বয়স একাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিধবা মাতাঠাকুরাণী আমার বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; প্রতিবেশিনীদেরও যেন এক দারুণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তাঁহারা প্রতিদিন আমার মাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে শাস্ত্রমতে অষ্টম বা নবম বর্ষেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত, বড় জোর দশ বৎসর পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখা চলিতে পারে—কিন্তু আমার মত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়া কি রূপে তিনি নিশ্চিন্ত মনে অন্ন-পানীয় গলাধঃকরণ করিতেছেন, সেই ভাবিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ ঘন ঘন আশ্চর্য্য হইবার ফলে ও বিদ্রূপের জ্বালায় আমাদের দুঃখের ক্ষুদ্র সংসারটি আরও দুঃখময় হইয়া উঠিল।

সংসারে শুধু মা, আমি ও ছোট ছোট দু'টি ভাই। আপনার বলিতে অনেকে ছিলেন, কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপর্য্যয়ের পর হইতে কেহ আর বড় একটা খোঁজ খবর রাখিতেন না। ক্ষুদ্র একখানি পাকা বাড়ী, যৎসামান্য পুরাতন অলঙ্কার, দুইটি শিশুপুত্র ও এই অভিশপ্ত কন্যারত্নকে মা আমার পিতার শেষ দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। পিতা চাকুরী লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, দেশের পৈতৃক জমাজমি দেখিবার সময় ও সুবিধা না ঘটায় সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পরেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম।

বহু চেষ্টার পর এক প্রতিবেশিনীর আত্মীয়ের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির হইল। তাঁহাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লী-গ্রামে। আমার এক মাতুলের পরামর্শমত আমাদের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা স্থির হইল, কারণ বরপক্ষ তিনহাজার টাকা পণ চাহিয়া বসিলেন। পাত্র এণ্ট্রেন্স পাশ, পিতৃমাতৃ হীন, জ্যেঠার নিকট থাকিয়া এফ্-এ-পড়িতেছেন—আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, এইরূপ শুনিলাম। যাহাহউক, ৪ হাজার টাকায় বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া আমার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। সাতশত টাকা মাত্র সম্বল করিয়া দারুণ শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে দুইটি শিশু-পুত্রের হাত ধরিয়া মা আমার মাতুলালয়ে চলিয়া গেলেন, আমিও শ্বশুরালয়ে বিদায় হইলাম। যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, যে স্থানটিকে বাল্য ও শৈশবের অযুত স্নেহময় স্মৃতি চিরমধুর করিয়া রাখিয়াছিল, সে স্থান জন্মের মত ত্যাগ করিতে প্রাণের ভিতর অসহ্য যাতনা অনুভব করিলাম; ভাবিলাম, আমারই জন্য ভাই দু'টি পথের কাঙাল হইল।

আমি সামান্য লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শিখিয়াছিলাম; শ্বশুরালয়ে এ জন্য আমার অদৃষ্টে উৎসাহের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ লাভ ঘটিতে লাগিল। যৌতুকলব্ধ অর্থে আমার স্বামীর জ্যেঠামহাশয়ের বসতবাটীর বন্ধক উদ্ধার করা হইল। সময়মত উপযুক্ত তত্ত্ব ও উপঢৌকন মা আমার পাঠাইতে না পারায় শ্বশুরবাড়ীর সকলে আমার উপর ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। স্বামী কলিকাতার মেসে থাকিয়া কলেজে পড়েন, বাড়ী হইতে মাসিক ৫ টাকা পান, আর ছেলে পড়াইয়া মেস ও কলেজের খরচ চালাইয়া লন। তিনি এ বিষয় কিছুই জানিতেন না, আমিও তাঁহাকে চিঠিতে কোন বিষয় লিখিতাম না। বাড়ী আসিলে

এ অশান্তির কথা যাহাতে জানিতে না পারেন সে জন্য বিশেষ সতর্কও থাকিতাম। এইরূপে ২ বৎসর কাটিল; সংসারের সমস্ত কাজই মুখ বুজিয়া করিয়া যাইতাম, কিন্তু কাহারও মন পাইতাম না। দেখিলাম, আমার স্বামীকে মাসে মাসে যে পাঁচটি টাকা পাঠান হইত, তাহাও বন্ধ হইল এবং সাংসারিক অশান্তি ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। তিনি সবই বুঝিতে পারিলেন এবং আমরা দুইজনে যে জ্যেঠামহাশয়ের সংসারে গলগ্রহ মাত্র তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। আমার স্বামীর অংশে যে বিষয় ছিল তাহা এরূপ ভাবে জ্যেঠামহাশয়ের করতল-গত হইয়াছে যে তাহা উদ্ধার করা সুকঠিন। এই দুর্ব্বিপাকের উপর আরও দুইটি দুর্ঘটনা ঘটিল। আমার স্বামী পরীক্ষায় ফেল হইলেন এবং আমার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সংসারের অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইল এবং আমা-দের পক্ষে সে গৃহে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন স্পষ্টই আমরা শুনিলাম যে সে বাড়ীতে আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়াদের স্থান হইবে না।

একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া আমরা স্বামীস্ত্রীতে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া সংসার সাগরে ভাসিলাম।

কোথা যাইব? মাতুলালয়ে? সেখানে মা ও ভাই দুইটির অবস্থা শোচনীয়। মা'র টাকাগুলি ব্যবসায় লাগাইবেন বলিয়া মাতুল মহাশয় হস্তগত করিয়াছেন ও সেখানে যাইবার কয়েক মাস পর হইতেই তাঁহাদের আদর যত্ন কর্পূরের মত শূন্যে বিলীন হইয়াছে। কোন পন্থা না দেখিয়া স্বামী চাকরী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

সমুদ্র তীরে মুক্তা অন্বেষণ করিলে বরং মুক্তা পাওয়া যায় তবু চাকুরী খুঁজিলে মিলে না—তিনি আমায় এইরূপ বুঝাইতেন। আমরা তখন কলিকাতার উত্তরাংশে একটা খোলার বাড়ীতে আসিয়া আছি। প্রতিদিন বেলা ৮টার সময় বাহির হইয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মলিন মুখখানি লইয়া সন্ধ্যা ৭।৮ টায় তিনি বাড়ী ফিরিতেন, কোনও দিন আহার করিয়া যাইতেন, কোনও দিন বা আহার করিতে সময় পাইতেন না। আজ প্রায় ষোল বৎসর গত হইল, তবু সে সময়ের কষ্টের কথা আমার মনে আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অবশেষে চাকুরী মিলিল—কলিকাতার এক মার্চ্চেণ্ট আফিসে—বেতন পনের টাকা। আরও ২ বৎসর কাটিল। সমস্ত সাধআহ্লাদ বর্জ্জন করিয়া সুখে দুঃখে আমরা সংসারে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম। একদিন তিনি আফিস হইতে বেলা ৩টার সময় বাড়ী ফিরিলেন। অসময়ে বাড়ী আসায় আমি উদ্বিগ্ন চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে তাঁহার শরীর ভালই

আছে। কিন্তু তাঁহার গম্ভীর চিন্তাকিষ্ট নিরানন্দ মুখশ্রী দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল; অন্যদিন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই যিনি অনাবিল হাস্য কৌতুকের সহিত আমায় সম্ভাষণ করিতেন, কিন্তু আজ তিনি একটিও কথা কহিলেন না। বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন "চঞ্চল, আমার চাকরী গেছে।"

"সে কি, কিসে এ সর্ব্বনাশ হ'ল ?"

ম্লানমুখে তিনি কহিলেন "আমাদের বড় বাবুর একটি আত্মীয় লোককে তিনি এই কাজ দিতে চান। অনেক দিন থেকেই তিনি খুঁটি নাটি নিয়ে দোষ ধর্‌তেন, আর অনর্থক গালিগালাজ কর্‌তেন। আজ আর সহ্য কর্ত্তে না পেরে, দুই এক কথার উত্তর করি। অমনি সাহেবের কাছে গিয়ে কি ব'ললেন। সাহেব ডেকে আমায় বিদায় দিলেন। কোনও কথাও শুন্‌লেন না।"

এই বলিয়া তিনি আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাঁহাকে কখনও কাঁদিতে দেখি নাই, আমার সমক্ষে তিনি দুঃখ ব্যাকুলতা গোপন করিতেন। আজ তাঁহার চক্ষে অবিরল জলধারা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল,—আকস্মিক এই বিপৎপাতেও আমি নিতান্ত বিচলিত হইলাম।

যাহাহউক, তাঁহাকে কিছু সান্ত্বনা দিবার প্রয়াসে বলিলাম, "সবই অদৃষ্টের দোষ; বিধাতার বিধানেই সব চল্‌ছে তা তিনি ত নিষ্ঠুর নন, এ কষ্ট চিরদিন থাক্‌বে না,—খুঁজে দেখ, আর কোথাও চাক্‌রী পেয়ে যাবে।"

তিনি বলিলেন, "চঞ্চল, এ কষ্ট আমরা নিজেদের বিধানে সহ্য কর্‌চি—বিধাতার বিধানে নয়। লেখাপড়া শিখতে শিখতে, দু'টাকা রোজগার কর্‌বার ক্ষমতা হ'তে না হ'তে কেন বিবাহ করেছিলাম? সামান্য চাক্‌রী ছাড়া গতি নেই—পাঁচ বছরের ভেতর ৩টি ছেলে মেয়ে হ'য়ে পড়্‌ল, খাওয়াব পরাব কি ক'রে তার কোনও সংস্থান নাই। তা'ছাড়া নিত্য অসুখ লেগে আছে। দিন রাত মুখের রক্ত তুলে খেটে কলম পিষে, পৃথিবীর চেয়েও সহিষ্ণু হ'য়ে, ১৫।২০ টাকার বেশী রোজগার কর্‌বার অধিকার নেই—এই ত অবস্থা। চঞ্চল, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়,—কি ক'রে সংসার চালাব তাই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

আমারও প্রাণের ভিতর এই কথাটির প্রতিধ্বনি হইল—"কি করিয়া সংসার চালাইব ?" ভাবিয়া দেখিলাম পনেরটি টাকায় বাড়ি ভাড়া, দুধের দাম, ও খাওয়া পরার খরচই কুলায় না, পয়সার অভাবে ছেলেটিকে স্কুলে পড়াইতে পারিতেছি না।

আফিসের জামা কাপড় ছাড়া সবই ঘরে কাচিয়া লই, তরিতরকারির খোসা-গুলা পর্য্যন্ত ফেলি না। দু'বেলার অন্ন এক বেলায় রাঁধি, কয়লার ছাই থেকে পোড়া কয়লা বাছিয়া কাজে লাগাই, ফর্সা ভাল কাপড় চোপড় নাই বলিয়া—লোকের সঙ্গেও বড় একটা মিশি না, তবু কিছুতে সংকুলান হয় না। এখন সেই চাকরীটিও গেল, এ সামান্য রোজকারও বন্ধ হইল।

একদিন ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হইল—আমি ছোট ছোট ছেলে পড়াই না কেন। যতটুকু বিবাহের আগে শিখিয়াছিলাম, তা'তে কিছু চলিতে পারে। বাড়ী হইতে বাহির হইলে লোকে দেখিবে? দেখুক, ভাল করিয়াই দেখুক, দেখিতে দেখিতে কুভাবে দেখার অভ্যাসটা সারিয়া যাইবে। গাড়ী পাল্কি বন্ধ করিয়া কুলবধূরা যখন যান, তখনও বাঙ্গালী যুবকেরা কবাটের ফাঁক দিয়া সাধ্যমত উঁকি দিয়া দেখিতে থাকে—রেলের ষ্টেশনে যখন মেয়েরা ব্যস্ত ও ব্যাকুল ভাবে সর্ব্বশরীর ঢাকা দিয়া চলিতে থাকেন, তখন এদের যেন একটা মরসুম পড়িয়া যায়—সব কাজ ফেলিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকে! যখন তারা দেখিবেই, তখন উপায় কি? তবে সেই ভাল; কাল থেকেই ছেলে মেয়ে পড়াইতে আরম্ভ করি, যা' দু'চার টাকা পাওয়া যায়।

যে গয়লার মেয়ে আমাদের দুধ দিত, তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, যে নিকটেই এক ভদ্রলোকের দুটি মেয়েকে সেলাই ও বোনা শিখাইবার জন্য লোকের দরকার। স্বামীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয় অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না; অনেক বুঝাইবার পর তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজেই পরদিন সেই ভদ্র লোকটির সহিত দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন। বন্দোবস্ত হইল যে তাঁহার বাড়ীর একটি দাসী আসিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আমায় লইয়া যাইবে ও তিনটার সময় রাখিয়া যাইবে—মাসিক বেতন স্থির হইল চারি টাকা। অপূর্ব্ব উৎসাহে নূতন কাজে লাগিয়া গেলাম; চোখের জল মুছিয়া ৩টি ছেলে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া দুয়ারে চাবি দিয়া দাসীর সহিত বাবুদের বাড়ী যাইতাম। পথিমধ্যে যখন যুবকদিগের ঘৃণিত লোলুপদৃষ্টি আমায় আহত করিত, তখন বক্ষস্থ শিশুকন্যাকে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া অপর দুইটি শিশুকে কাছে টানিয়া লইতাম। ক্ষোভে, দুঃখে, ও ব্যর্থ অভিমানে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিত। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল; স্বামী বহুকষ্টে কলিকাতার কোন জেটীতে মালের হিসাবরক্ষকের কায পাইলেন, বেতন ১৪৲ টাকা—প্রাতে সাতটা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কাজের সময়, মধ্যে

দ্বিপ্রহরে ১ ঘণ্টা আহারের জন্য ছুটী। বাসা হইতে কর্ম্মস্থান বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায়, তিনি প্রত্যুষেই স্নানাহার করিয়া যাইতেন।

এক মাসের মধ্যেই দেখিলাম, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় মাসে এ বিষয় তাঁহাকে বলায় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি আর একটি ছাত্রী সেই বাড়িতে পাইয়াছি এবং মাহিনা আর ১ টাকা বাড়িয়াছে।

দুঃখেও এক রকম দিন কাটিতে লাগিল,—আহারের কষ্ট, শারীরিক কষ্ট, সর্ব্ববিধ অভাব ক্রমশঃ সহিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু আমার স্বামীর দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতেছে দেখিয়া বিশেষ ভীত হইলাম। একদিন তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া ডাক্তার দেখাইলাম। ডাক্তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মারোগ, জীবনের আশা কম, বড় জোর ৫।৬ মাস মাত্র।

সেই মুহূর্ত্তে যদি বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও আমি এত চমকিত হইতাম না। ডাক্তারের কথা শুনিয়া মনে হইল যেন আমি ক্রমাগত শূন্যে ঘুরিতেছি—পৃথিবীর আলো যেন চকিতে নিভিয়া গিয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

দিন যায়, সকলেরই দিন যায়,—আমাদেরও দিন যাইতে লাগিল। কেমন করিয়া যাইতে লাগিল তাহা বলিব না, বলিতে পারিব না, বলিবার ভাষা নাই। মাকে চিঠি দিলাম, শ্বশুরালয়ে চিঠি দিলাম, উত্তর পাইলাম না। বিশ্বের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন ক্রমশঃ মৃদু হইতে মৃদুতর বলিয়া বোধ হইল। সংসাররূপ একটা বিরাট বিপুল-দেহ অজাগর যেন ক্রমশঃ স্থির হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যা নামিল। সে আঁধার রোজই নামে, আজও নামিল। আমি শয্যাগত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ললাটের ঘাম মুছাইতেছিলাম, এমন সময় তিনি ডাকিলেন—"চঞ্চল!"

তিনি উত্তর পাইলেন না, আমার স্বরবদ্ধ হইয়াছিল।

আবার ডাকিলেন "চঞ্চল! কাঁদিতেছ?"

বহু আয়াসে কণ্ঠ সংযত করিয়া বলিলাম, "ভাবিতেছি, সংসারে কি করিতে আসিয়াছিলাম?" এবার বাঁধ ভাঙ্গিল, চক্ষু দিয়া স্রোত বহিল, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে আমার পুনরায় কণ্ঠরোধ হইল।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "চঞ্চল, ভয় পাইও না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই মরিতে হইবে। আমি আগে চলিলাম, তোমার জন্য স্বর্গে হউক, নরকে হউক

জাগিয়া বসিয়া থাকিব—তোমার দেহান্তে আবার আমাদের দুইটি আত্মা মিলিত হইবে। এই চিন্তাই সুখ, এই চিন্তা এই আশা বুকে ধরিয়া আমি চলিলাম, তুমিও এই চিন্তা এই আশা আমরণ পোষণ করিও। ভগবানে বিশ্বাস রাখিও, তাঁহার শাসনে টলিও না, তাঁহার করুণায় সন্দেহ করিও না। ছেলেটাকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিও।"

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল, ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নামিল, আকাশের আলোক নিভিল। আমার আলোকও নিভিল। গাঢ়, গাঢ়, গাঢ়তম অন্ধকারে আমার সর্ব্বস্ব বিলীন হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার আমার চিরসাথী হইল!

* * * * *

আবার দিন কাটিতে লাগিল,—যে ভদ্রলোকটির বাড়ীতে পড়াইতাম, তিনি অভাগিনীকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে আমার ও তিনটি শিশুর গ্রাসাচ্ছাদন এক প্রকার চলিতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীতে আমি রাঁধিতাম এবং অবসর সময়ে তাঁহার সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতাম। তিন বৎসরের মধ্যে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, আমার দুইটি কন্যাকেই কোলে টানিয়া লইলেন! ওগো, আমায় তোমরা নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা বলিয়া গালি দিও না, আমার দুঃখে সহানুভূতি করিও না, আমার ব্যর্থ আঁধারময় জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিও না!

আরও দশ বৎসর কাটিল। জীবনের ব্রত করিয়াছিলাম ছেলেটাকে মানুষ করিব। স্বামীর ইহাই শেষ আজ্ঞা। কিন্তু আমার দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল, পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু দরিদ্রের কোন সাধই মেটে না, তাই এ সাধও মিটিল না। মেয়াদ যেন অফুরন্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুত্রের উন্নত ললাটে আমার স্বামীর গৌরব-শ্রী দেখিতাম, তাহার অকলঙ্ক চরিত্র ও সরল উদার পরহিততৎপর মনুষ্যোচিত হৃদয়খানির পরিচয় সকলেই পাইয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও শারীরিক শক্তি যথেষ্টই ছিল।

একদিন বাড়ী আসিয়া পুত্র বলিল "মা, কলেজে শুনলাম গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী পল্টন নেবেন, অনেক ছেলে যুদ্ধে যাবার জন্যে উৎসুক হয়েছে, আমারও খুব যেতে ইচ্ছা করছে।"

বাড়ীর সকলে শুনিয়া তাহাকে এ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিলেন, অনেক বুঝাইলেন কিন্তু সে নিরস্ত হইল না। আমি ভাবিলাম, এই এক উপযুক্ত

বিদায় আশীর্ব্বাদ (বন্ধন-মুক্তা)

কমলা প্রেশ,—কলিকাতা।

অবসর। কয়জন এরূপ বীরপুত্রের জননী হইবার গৌরব করিতে পারে? দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই শুভ অনুষ্ঠানকে বরণ করিয়া লইলাম—আমি সম্মত হইলাম, আর ভাবিলাম সংসারে আমার এই একমাত্র বন্ধন রহিয়াছে, ইহারই জন্য আজ দীর্ঘ দশ বৎসর পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া অন্ধকার পথে যন্ত্র-চালিতের মত চলিতেছি। আর কেন? কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া কাণে কাণে বলিয়া দিল "আর কেন।"

* * * * *

কয়েক দিবসের মধ্যেই বীরসাজে সজ্জিত পুত্রকে বিদায় দিয়া ধন্য হইলাম—আজ ব্রত পুর্ণ, কর্ম্মভার অবসান, আজ আমি বন্ধনমুক্ত!

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান ও সুর।

গানটি তোমার বেজেছে মোর অন্তরে।
ওগো আমার হাসি খেলা—ওগো নয়ন জল,
তোমার পায়ে পড়ল লুটে পূজার শতদল!
দুঃখে সুখে সকল কাজে শঙ্খ তোমার নিত্য বাজে
আপন হারা হয়েছি আজ স্মৃতি ছাড়া মন্তরে
গানটি তোমার বেজেছে মোর অন্তরে।
রতন মাণিক নিয়েছ মোর ভাঁড়ার খানা লুটি,'
সিংহাসনের দাবী দাওয়া গিয়েছে আজ টুটি'—
আমার আঁধার কুটির পাণে মুকুট মণির ঝিনিক তানে
পরশ হাওয়ার বান ডেকেছে প্রান্তরে
গানটি তোমার বেজেছে মোর অন্তরে।
চরণ-রেখার দাগটি তোমার দুয়ার পরে আঁকা
তোমার দেওয়া মুক্তি-মোহন পায়ের ধূলায় রাখ
নূতন রবির কনক আলো আমার মাথার উপর চালো—
শুচির পরশ আসুক হৃদে মন্তরে
গানটি তোমায় বেজেছে মোর অন্তরে।

শ্রীঅদ্বৈত চরণ সরকার।

মুদ্রা-রাক্ষস।

[প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক বিশাখদত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষসের গল্পাংশ সঙ্কলন।]

(শেষাংশ।)

(৫)

চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী যে রাজপুরুষগণ বিদ্রোহভাবের ছলনা করিয়া গিয়া মলয়কেতুর সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ভাগুরায়ণ। মলয়কেতুর সঙ্গে রাক্ষসের ভেদ ঘটাইবার জন্ত প্রথমেই ইহা প্রয়োজন যে রাক্ষসের বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য সম্বন্ধে মলয়কেতুর চিত্তে সন্দেহের উদয় হয়। ভাগুরায়ণের হস্তেই এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যেন কত বড় হিতৈষী মিত্র এই ভাব দেখাইয়া ভাগুরায়ণ অল্পদিনেই মলয়কেতুর এমন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে তাঁহাকে ছাড়িয়া একটু কালও তিনি থাকিতে চাহিতেন না।

বহুদিন যাবৎ দুশ্চিন্তা এবং দুশ্চিন্তা হেতু অনিদ্রা প্রভৃতি কারণে রাক্ষসের শিরঃপীড়া হইল। মলয়কেতু ভাগুরায়ণকে সঙ্গে লইয়া রাক্ষসকে দেখিতে চলিলেন। কথায় কথায় মলয়কেতু কহিলেন, "সখা, ভদ্রভট্ট প্রভৃতি সকলে যখন আসেন,—তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'চাণক্যের বুদ্ধিতে পরিচালিত চন্দ্রগুপ্তকে যে আমরা পরিত্যাগ করিয়া কুমারের আশ্রয়ে আসিয়াছি, তাহা অমাত্য রাক্ষসের মধ্যবর্ত্তিতায় নয়, কুমারের সেনাপতি শিখরসেনের মধ্যবর্ত্তিতায়। তা ছাড়া কুমারের কমনীয় গুণেও আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।' কেন তাহারা এরূপ বলিলেন, অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ কথার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না।"

ভাগুরায়ণ উত্তর করিলেন, "এ কথার তাৎপর্য্য এমন দুর্ব্বোধ্য কিছুই নয় কুমার। বিজিগীষু পুরুষের আশ্রয় যাহারা নিতে চায়, তাহারা সাধারণতঃ সেই পুরুষের প্রিয় ও হিতৈষী মিত্রের মধ্যবর্ত্তিতাই অবলম্বন করিয়া থাকে।"

মলয়কেতু কহিলেন, "অমাত্য রাক্ষসও ত আমাদের পরম প্রিয় ও হিতৈষী মিত্র।"

ভাগুরায়ণ উত্তর করিলেন, "তা সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু কথা আছে। অমাত্য রাক্ষস চাণক্যেরই বদ্ধবৈরী, চন্দ্রগুপ্তের নন। আবার নন্দকুলের প্রতিও রাক্ষসের অটল ভক্তি। গর্ব্বিত চাণক্যের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া যদি চন্দ্রগুপ্ত কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তবে কে জানে রাক্ষস হয়ত নন্দবংশধর বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেই গিয়া যোগ দিতে পারেন। সম্পদ ও সুহৃদ্‌বর্গ সবই তিনি তাহাতে ফিরিয়া পাইবেন, ইহাও একটা কম আশার কথা নয়। আবার পিতৃবংশের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রী বলিয়া চন্দ্রগুপ্তও হয়ত এরূপ অবস্থায় রাক্ষসকে আদরে গ্রহণ করিতে চাহিবেন। যদি এইরূপ কিছু একটা ঘটে, তবে রাক্ষসের মধ্যবর্ত্তিতায় আসিয়াছে বলিয়া কুমার হয়ত তাঁহাদেরও বিশ্বাস করিবেন না। এই মনে করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন।"

"হুঁ! তাই বটে! ইহা ছাড়া আর কি কারণ হইতে পারে?"

মলয়কেতুর মনে প্রথম এই বিষ ঢুকিল। যাহাহউক, দুইজনে রাক্ষসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাটলীপুত্র হইতে রাক্ষসের এক চর করভক তখন আসিয়াছে। রাক্ষস তাহার নিকট হইতে পাটলীপুত্রের সংবাদ লইতেছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। বাহির হইতেই তার দুই এক কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত মলয়কেতু কহিলেন, "ঐ যে! রাক্ষস কার সঙ্গে পাটলীপুত্রের কথাই আলোচনা করিতেছেন। ভাল, অন্তরাল হইতে গোপনে ইঁহাদের কথা একটু শোনা যাক।"

উভয়ে অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন।

করভক চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধের কথা বলিতেছিল। কৌমুদী-উৎসব নিষেধ করায় চাণক্যের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধের কথা শুনিয়া রাক্ষস কহিলেন, "সত্য ক্রিড়ারস ভঙ্গ করিলে সামান্য লোকেরও তাহা অসহ্য হয়। আর যে রাজা লোকাতীত তেজের আধার, তিনি কি তাহা কখনও সহ্য করিবেন?"

করভক কহিল, "তারপর রাক্ষসের গুণকীর্ত্তন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে তখনই পদচ্যুত করিলেন।"

মলয়কেতু শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "রাক্ষসকে যে চন্দ্রগুপ্ত কতদূর ভক্তি করে, তাহা তার এই গুণকীর্ত্তনেই প্রকাশ পাইতেছে।"

ভাগুরায়ণ উত্তর করিলেন, "চাণক্যকে পদচ্যুত করায় তাহা আরও বেশী প্রকাশ পাইতেছে!"

কৌমুদী উৎসবের প্রতিষেধ ব্যতীত উভয়ের মনান্তরের আর যে সব কারণ ছিল, করভক সেই সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

শুনিতে শুনিতে অতি আনন্দে রাক্ষস নিকটে উপবিষ্ট শকটদাসের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শকটদাস! এইবার চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই আমার হস্তগত হইবে। চন্দনদাস কারামুক্ত হইবে, তুমিও তোমার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইবে!"

"'চন্দ্রগুপ্ত আমার হস্তগত হইবে'!—বটে। ইহার অর্থ কি?" মলয়কেতু অন্তরালে অতি সন্দিগ্ধভাবে মৃদুস্বরে এই কথা বলিয়া ভাগুরায়ণের দিকে চাহিলেন। ভাগুরায়ণ ঈষৎ হাসিয়া সেইরূপ মৃদুস্বরেই উত্তর করিলেন, "চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ইঁহারই হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল, এখন আবার তাকে ইনি আপন হাতে ফিরিয়া পাইবেন, এইরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছেন। আর কি?"

মূর্খ মলয়কেতুর সন্দেহ আরও বাড়িল। তারপর চাণক্য যে এই অবমাননার পরেও উদাসীনভাবে পাটলীপুত্রেই আছেন, তপোবনেও যান নাই, অথবা নূতন কোনও ভীষণ প্রতিজ্ঞাও করেন নাই, এই সংবাদে রাক্ষস যারপরনাই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। ভাগুরায়ণ মলয়কেতুকে বুঝাইলেন, ইহা রাক্ষসের পক্ষে কিছু উদ্বেগের কারণ হইয়াছে বটে, কারণ চাণক্য একেবারে দূরে চলিয়া গেলে অথবা প্রকাশ্য শত্রুতা অবলম্বন করিলে চন্দ্রগুপ্ত স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিতেন, অর্থাৎ রাক্ষসকেই অবিলম্বে আপনার মন্ত্রিত্বের পদগ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন।

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যের কপট কলহের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের ভেদের ছলনায় রাক্ষসের সঙ্গে মলয়কেতুর ভেদের পথ প্রশস্ত হইবে এইজন্য চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ঐরূপ একটা ভীষণ কলহের অভিনয় করিয়াছিলেন। করভক কথা শেষ করিয়া প্রস্থান করিল। মলয়কেতু তখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পাটলীপুত্রে বর্ত্তমানে যে সচিববিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সচিবয়াত্ত নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক হইবে। এরূপ অবস্থায় অবিলম্বে তাঁহাদের পাটলীপুত্র আক্রমণ উচিত—এই রূপ কথাবার্ত্তা হইল। তারপর ভাগুরায়ণের সঙ্গে মলয়কেতু আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেনাযাত্রার শুভ সময় নিরূপণের জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্ যাহারা ছিল, রাক্ষস

তাহাদের ডাকিতে বলিলেন। প্রথমেই ক্ষপণক জীবসিদ্ধি আসিল। (বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন।) জীবসিদ্ধির আলোচনায় ও মন্তব্যে রাক্ষস তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কহিলেন, "আরও জ্যোতিষী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করিয়া দেখ।"

জীবসিদ্ধি ইহাতে যেন নিতান্ত অবমানিত বোধ করিল, এইরূপ ভাণ করিয়া কিছু ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেল।

(৬)

মলয়কেতুর সেনা পাটলীপুত্রের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুপ্তচর-দিগের গতিবিধি যথাসম্ভব ব্যাহত করিবার জন্য এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে কেহই মলয়কেতুর মুদ্রা-চিহ্ন না দেখাইয়া মলয়কেতুর শিবিরে অথবা শিবির হইতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেহ এইরূপ চেষ্টা করিলে ধৃত হইবে।

সিদ্ধার্থক সময় বুঝিয়া রাক্ষসের প্রদত্ত এবং রাক্ষসেরই নিকটে গচ্ছিত রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত সেই অলঙ্কারের থলিয়াটি চাহিয়া নিল। তারপর সেই থলিয়া বস্ত্রমধ্যে সাবধানে লুকাইয়া এবং চাণক্যের প্রদত্ত সেই কপটপত্র লইয়া পাটলীপুত্রের দিকে চলিল। মুদ্রানিদর্শন কিছু লইল না,—কারণ তাহার অভিপ্রায়ই ছিল, সেই পত্র ও অলঙ্কারসহ ধৃত হইয়া সে মলয়কেতুর সম্মুখে আনীত হয়।

ক্ষপণক জীবসিদ্ধিও অভিমানভরে পাটলীপুত্রের দিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

লোক পরীক্ষা করিয়া মুদ্রা নিদর্শন দিবার ভার ভাগুরায়ণের হস্তে ছিল। জীবসিদ্ধি মুদ্রানিদর্শনের জন্য ভাগুরায়ণের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

"শ্রাবকের * ধর্ম্মসিদ্ধি হউক!" ক্ষপণক ভাগুরায়নকে অভিবাদন করিল।

জীবসিদ্ধি যে চাণক্যের চর একথা আর কেহই জানিত না, ভাগুরায়ণও জানিতেন না। তাহাকে মুদ্রানিদর্শনের জন্য উপস্থিত দেখিয়া ভাগুরায়ণ কিছু বিস্মিতভাবে কহিলেন, "আমাত্য রাক্ষসের কোনও প্রয়োজনে কোথাও যাইতেছ বুঝি?"

* বৌদ্ধ বা জৈনভিক্ষুরা সাধারণতঃ লোককে 'শ্রাবক' বা 'উপাসক' এই নামেই অভিহিত করিত। মানবকে সদ্ধর্ম্মের শ্রাবক বা উপাসক ব্যতীত অন্য ভাবে মনে করাও যেন অন্যায়, এই সংস্কার বশতঃই এই নাম ব্যবহৃত হইত।

জীবসিদ্ধি উত্তর করিল, "পাপ শান্তি হউক। পাপ শান্তি হউক *। আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে রাক্ষস কি পিশাচের নামও শোনা যায় না।"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "রাক্ষস ত তোমার সুহৃদ্, আজ তাঁর উপরে এ অভিমান কেন? রাক্ষস কি তোমার নিকট কোনও অপরাধ করিয়াছেন?"

জীবসিদ্ধি উত্তর করিল, "রাক্ষস কিছু অপরাধ করেন নাই। আমি অতি হতভাগা, নিজের কর্ম্মেই নিজে লজ্জিত আছি।"

"পরিব্রাজক, তোমার কথায় যে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যাপার কি শুনিতে চাই।"

"সে কথা শুনিয়া আর উপাসকের কি হইবে?"

"যদি গোপনীয় কথাই হয়, তবে শুনিতে চাই না।"

"গোপনীয় নয়, তবে অতি নৃশংস কথা।"

"তবে বল।"

"না, বলিব না।"

"বটে! আমিও তবে মুদ্রানিদর্শন দিব না।"

"তবে ত নিরুপায়! আচ্ছা বলি, শুনুন। যখন পাটলীপুত্রে প্রথমে বাস করিতে গেলাম, রাক্ষসের সঙ্গে আমার মিত্রতা হইল। রাক্ষস তখন বিষকন্যার প্রয়োগে মহারাজ পর্ব্বতককে হত্যা করিলেন।"

"বটে! তারপর—তারপর?"

"তারপর ত চাণক্য হতভাগা রাক্ষসের মিত্র বলিয়া অপমানে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিল। এখন আবার বহু আকার্য্য-কুশল সেই রাক্ষস এমন আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে আমি আর এই জীবলোকে না থাকিতে পারি।"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "পরিব্রাজক, তুমি একি বলিতেছ? প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ রাজ্য দান করিতে হইবে, এইজন্য চাণক্যই ত পর্ব্বতককে এই উপায়ে হত্যা করিয়াছেন। রাক্ষস করিয়াছেন, এমন ত আমরা কিছু শুনি নাই।"

"পাপ শান্তি হউক! চাণক্য বিষকন্যার নামও জানে না। রাক্ষসই এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছেন।"

* কোনও অন্যায় কথার বিরুদ্ধে আপত্তিসূচক অব্যয় স্বরূপ পূর্ব্বে লোকে 'শান্তং পাপম্! শান্তং পাপম্!' এই শব্দ উচ্চারণ করিত। অধুনা আমরা এরূপ স্থলে 'মহাভারত,' 'রাম রাম,' 'শিব শিব' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি।

"আচ্ছা, এই তোমার নিদর্শন নেও।—আমাদের তবে কুমারকে একথা জানান উচিত।"

কুমার মলয়কেতু অন্তরালে থাকিয়া ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে সন্দেহ ধূমায়িত হইতেছিল। এখন এই কথা শুনিয়া আগুণ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "শুনিয়াছি—সব শুনিয়াছি!—রাক্ষসের সুহৃদ্ রিপু-রাক্ষসের সম্বন্ধে এইমাত্র যাহা বলিল, শ্রবণবিদারী সেই দারুণ কথা সব শুনিয়াছি! ওঃ! কত দিন গিয়াছে, আজ আবার পিতৃবধের শোক যেন দ্বিগুণ হইয়া মন ভরিয়া উঠিতেছে!"

"আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এখন আর কেন? যাওয়া যাক্!" মনে মনে এই কথা বলিয়া ক্ষপণক প্রস্থান করিল।

মলয়কেতু কাতরস্বরে কহিলেন, "হায় রাক্ষস! তোমার মনে এই ছিল? আপনার অতি প্রিয় মিত্র মনে করিয়া সব কার্য্য যে পিতা তোমার হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই পিতাকে তুমি হত্যা করিলে? এতদিনে জানিলাম, তোমার রাক্ষস নাম সার্থক বটে!"

চাণক্যের আদেশ ছিল, রাক্ষসের প্রাণ রক্ষা যাহাতে হয় তাহা অবশ্য করিবে। ভাগুরায়ণ দেখিলেন, ক্রোধ ও ক্ষোভের উত্তেজনায় মলয়কেতু যদি রাক্ষসের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন, তবে চাণক্যের ইচ্ছা পালিত হইবে না। সুতরাং মলয়কেতুকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কহিলেন, "কুমার, শান্ত হউন, অত অধীর হইবেন না। আপনি বসুন, আমার কিছু নিবেদন আছে।"

মলয়কেতু আসনে উপবেশন করিলেন, "বল সখা, কি বলিতে চাও!"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "কুমার, সাধারণ লোকেরা যেরূপ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে, অর্থশাস্ত্র ব্যবহারীরা * সেরূপ পারেন না,—অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারেই শত্রু মিত্র উদাসীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে করিতে হয়। নহিলে রাজকীয় কার্য্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। তখন রাক্ষসের অভীষ্ট ছিল, নন্দবংশধর সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীত... পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও বলবান্। সুতরাং তাঁহা হইতে অভীষ্টসাধনের অধিক ব্যাঘাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া, তাঁহাকেই পরমশত্রু মনে করিয়া রাক্ষস

* 'ধর্ম্ম' ব্যতীত পার্থিবজীবনে লোকের আর যত কিছু পার্থিব স্বার্থের সম্বন্ধ আছে,—তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রের সাধারণ নাম 'অর্থশাস্ত্র।'

যদি মহারাজ পর্ব্বতককে হত্যা করিয়া থাকেন, তবে বিশেষ দোষ তাঁহাকে দেওয়া যায় না। রাজনীতির প্রয়োজন শত্রুকেও মিত্র করে, মিত্রকেও শত্রু করে,—পূর্ব্ব-স্মৃতি সব লোপ করিয়া এই জন্মেই যেন জন্মান্তর ঘটায়। তারপর আরও কথা আছে। রাক্ষস প্রজাবর্গ সকলেরই প্রিয়। যে পর্য্যন্ত নন্দরাজ্য আপনার হস্তগত না হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে অনুগ্রহ করাই প্রয়োজন। তারপর তার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত হয়, কুমার তাহাই করিবেন।"

মলয়কেতু কহিলেন, "ঠিক কথা! এখন রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিলে প্রজারা ক্ষুব্ধ হইবে,—আমার বিজয়লাভেও সন্দেহ থাকিবে।"

এমন সময় একজন রক্ষী আসিয়া নিবেদন করিল, একটি লোক মুদ্রা নিদর্শন না দেখাইয়াই শিবির হইতে একখানি পত্র লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাকে ধৃত করা হইয়াছে।"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "আচ্ছা, তাকে লইয়া আইস!"

রক্ষী বাহিরে গিয়া বদ্ধহস্ত সিদ্ধার্থককে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"কে তুমি? তুমি নূতন আসিয়াছ না এখানে কাহারও আশ্রিত?"

সিদ্ধার্থক উত্তর করিল, "আমি অমাত্য রাক্ষসের সেবক।"

"মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়া তবে শিবির হইতে কোথায় যাইতেছিলে?"

"গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে ত্বরা করিয়া যাইতেছিলাম।"

"কি এমন গুরুতর কার্য্য যে রাজশাসন লঙ্ঘন করিয়াই যাইতে হইতেছে?"

মলয়কেতু কহিলেন, "সখা ভাগুরায়ণ, ওর কাছে কি পত্র আছে, দিতে বল।"

সিদ্ধার্থক ভাগুরায়ণের হস্তে পত্রখানি দিল। ভাগুরায়ণ দেখিয়া কহিলেন, "এ যে রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত পত্র।"

মলয়কেতু কহিলেন, "মুদ্রাটি নষ্ট না করিয়া পত্র খুলিয়া আমাকে দেও।"

ভাগুরায়ণ সাবধানে পত্র খুলিয়া মলয়কেতুর হস্তে দিলেন। মলয়কেতু পড়িলেন,—

"স্বস্তি! যথাযোগ্য কোনও স্থান হইতে কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তিকে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। আমাদের প্রতিপক্ষকে দূর করিয়া সত্যবাদী আপনি আপনার সত্যতাই দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের যে

সব সুহৃদের সঙ্গে আপনার সন্ধির কথা হইয়াছিল, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত সেই সব পণ সোৎসাহে পালন করিয়া সত্যসন্ধ আপনি এখন তাঁহাদের প্রীতি ৬ৎপাদন করুন। এইরূপে অনুগৃহীত হইলেই ইঁহারা নিজেদের বর্ত্তমান আশ্রয় বিনষ্ট করিয়া উপকারী আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। একটি কথা—সত্যবান্ আপনি বিস্মৃত না হইলেও আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ শত্রুর কোষদণ্ড, কেহ বা তাহার বিত্তের আকাঙ্ক্ষা করেন। সত্যবান্ আপনি যে তিনখানি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। পত্রের শূন্যতা পরিহারের জন্য কিঞ্চিৎ যাহা পাঠাইতেছি, তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যাহা কথা আছে, আমার পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের মুখেই বাচিক শ্রবণ করিবেন।"

"এ কি পত্র ভাগুরায়ণ ? ইহার অর্থ কি ?"

ভাগুরায়ণ ইহার কোনও উত্তর না দিয়া সিদ্ধার্থককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কার লেখা সিদ্ধার্থক ?"

"জানি না আর্য্য !"

"ধূর্ত্ত! জান না ? পত্র লইয়া যাইতেছ, আর জান না কার পত্র ? আচ্ছা থাক্—বাচিক তোমার মুখে কি কথা শুনিবে, তাই বল ?"

সিদ্ধার্থক যেন বড় ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভাগুরায়ণ রক্ষীকে কহিলেন, "ভাসুরক ! ইহাকে বাহিরে লইয়া যাও। যতক্ষণ না সব বলে, যত পার প্রহার কর।"

ভাসুরক সিদ্ধার্থককে বাহিরে লইয়া গেল। একটু পরেই আবার আসিয়া কহিল, "প্রহার করিতে করিতে ইহার বস্ত্রের মধ্য হইতে মুদ্রাঙ্কিত এই থলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

ভাগুরায়ণ থলিয়াটি লইয়া দেখিয়া কহিলেন, "কুমার, ইহাতেও যে রাক্ষসের নাম মুদ্রাঙ্কিত।"

মলয়কেতু কহিলেন, "ইহাতেই তবে বুঝি পত্রের শূন্যতা পূর্ণ করিবে ? ভাল, মুদ্রাটি নষ্ট না করিয়া খুলিয়া দেখ উহাতে কি আছে ?"

ভাগুরায়ণ থলিয়াটি খুলিয়া ফেলিলেন,—কতকগুলি অলঙ্কার বাহির হইয়া পড়িল। মলয়কেতু দেখিয়া কহিলেন, "এ কি ? এ যে সেই সব অলঙ্কার যা আমি নিজের অঙ্গ হইতে খুলিয়া নিয়া রাক্ষসকে উপহার পাঠাইয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, রাক্ষসই এই পত্র চন্দ্রগুপ্তকে লিখিয়াছে।"

"কুমার, সংশয় এখনই দূর হইবে। যাও, ভাসুরক! আবার গিয়া তাকে প্রহার কর!"

ভাসুরক আবার বাহিরে গেল। কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রহার করায় লোকটি বলিল, আমার যাহা কথা সব কুমারকে নিবেদন করিব।"

"আচ্ছা, তাকে লইয়া আইস।"

রক্ষী সিদ্ধার্থককে লইয়া আসিল। সিদ্ধার্থক কাঁদিয়া মলয়কেতুর পদতলে পড়িয়া কহিল, "কুমার! অভয় দিন! সব আপনাকে বলিব!"

মলয়কেতু কহিলেন, "তুমি পরাধীন,—তোমাকে অভয় দিলাম। এখন সব বল?"

সিদ্ধার্থক কহিল, "শুনুন তবে কুমার! অমাত্য রাক্ষস এই পত্র দিয়া আমাকে চন্দ্রগুপ্তের নিকটে পাঠাইয়াছেন।"

"আচ্ছা,—এখন বাচিক কি কি কথা বলিবার ছিল—তাই সব বল ত শুনি।"

সিদ্ধার্থক কহিল, "কুমার, অমাত্য রাক্ষস আমাকে যে কথা মুখে গিয়া বলিতে বলিয়াছেন, তাহা এই:—মলয়কেতুর মিত্রদের মধ্যে কুলূতের রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয় দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীরের রাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ জয়সেন, আর পারসিকরাজ মেঘাক্ষ—এই ছয়জন যে আপনার সঙ্গে গোপনে সন্ধি করিয়াছেন, তার মধ্যে প্রথম তিনজন মলয়কেতুর বিষয় সম্পদের প্রার্থী, আর শেষ দুইজন তার কোষ ও হস্তিবলের প্রার্থী। মহারাজ যেরূপ চাণক্যকে দূর করিয়া আমার প্রীতি-উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ এঁদেরও প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করিবেন। মহারাজের নিকট এখন আমার ইহাই প্রার্থনা।

"হায়, চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিরাও আমার শত্রু! বিজয়া, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" এই বলিয়া মলয়কেতু প্রতিহারী বিজয়ার দিকে চহিলেন। বিজয়া প্রস্থান করিল।

রাক্ষস তখন আপন শিবিরে বসিয়া যাত্রার সময় কোন সেনা কোথার কাহার অধীনে কি ভাবে যাইবে, তাহার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। এমন সময় প্রতিহারী বিজয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কুমার মলয়কেতু তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। আহুত হইয়া মলয়কেতুর সম্মুখে যাইতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত অলঙ্কার গুলি অঙ্গে ধারণ করিয়াই যাওয়া উচিত। নহিলে তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখান হইবে না। কিন্তু সেগুলি ত তিনি সিদ্ধার্থককে পারিতোষিক

দিয়াছেন, অগত্যা যে মহামূল্য তিনখানি অলঙ্কার তিনি ক্রয় করিয়াছেন, তার কিছু পরিয়া যাইতে পারেন। সেগুলিও দেখিতে অনেকটা একরূপ। রাক্ষস তার একখানা অলঙ্কার পরিয়াই কুমারের শিবিরে গেলেন।

প্রাথমিক শিষ্টসম্ভাষণাদির পর মলয়কেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,"অমাত্য, যাত্রার কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে একবার শুনিতে ইচ্ছা করি।"

রাক্ষস কহিলেন, "আমার পশ্চাতে সকলের আগে খস মগধ * সৈন্যরা যাইবে,—গান্ধারের যবনপতি + মধ্যে এবং তাদের পশ্চাতে চীন হূনদের সঙ্গে শকরাজগণ যাইবেন। তারপর কুলূতরাজ চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বয়ং কুমার অগ্রসর হইবেন।"

"হুঁ!—আমার বিনাশের জন্য যাহারা চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা করিতেছে, তারাই আমাকে পরিবৃত করিয়া রাখিবে!" মনে মনে এই বলিয়া মলয়কেতু প্রকাশ্যে কহিলেন, "আর্য্য কুসুমপুরে ‡ যাতায়াত করিতেছে এমন কেহ কি এখন আছে?"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "এখনত আর যাতায়াতের কোনও প্রয়োজন নাই।"

"হুঁ!—তবে পত্র দিয়া আপনি কুসুমপুরে কেন লোক পাঠাইতেছেন।"

'কুসুমপুরে লোক পাঠাইতেছি! সে কি?—এই যে সিদ্ধার্থক! সিদ্ধার্থক এ কি ব্যাপার?"

সাশ্রুনয়নে যেন নিতান্ত লজ্জিতভাবে সিদ্ধার্থক কহিল, "অমাত্য, প্রসন্ন হউন! ইহাদের তাড়নায় আমি রহস্য রাখিতে পারি নাই!"

"রহস্য! কিসের রহস্য? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?"

"এরূপ তাড়না না করিলে আমি কখনই বলিতাম না"—এই বলিতে বলিতেই সিদ্ধার্থক আবার লজ্জায় মুখ নত করিল।

মলয়কেতু কহিলেন, "ভাগুরায়ণ, প্রভুর সম্মুখে ভয়ে ও লজ্জায় লোকটা কিছু বলিতে পারিতেছে না। তুমি নিজে অমাত্যকে সব বল।"

ভাগুরায়ণ কহিল, "যে আজ্ঞা কুমার!—অমাত্য, এই লোকটি বলিতেছে, আপনি পত্র দিয়া ইহাকে চন্দ্রগুপ্তের নিকট পাঠাইতেছেন, এবং বাচিকও কি কি কথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন।"

* নেপালের জাতি বিশেষ।—'মগধ'—হয় মগধের বিদ্রোহী প্রজাগণ অথবা 'মগর' নামক নেপালেরই অপর এক জাতি। বর্ত্তমানে ইংরেজের গুর্খা সৈন্যও প্রধানতঃ খস ও মগর জাতীয়।

+ গান্ধারের কোনও যবন বা গ্রীক রাজা।

‡ পাটলীপুত্রের নামান্তর।

অতিবিস্ময়ে রাক্ষস সিদ্ধার্থকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সিদ্ধার্থক! একি সত্য ?"

সিদ্ধার্থক লজ্জা দেখাইয়া কহিল, "নিতান্ত তাড়িত হইয়াই আমি এই কথা বলিয়াছি।"

"কুমার! এ কথা মিথ্যা। তাড়নায় লোকে কি না বলিতে পারে ?"

মলয়কেতু কহিলেন, "ভাগুরায়ণ! পত্র দেখাও।"

ভাগুরায়ণ পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষস শিহরিয়া কহিলেন, "কুমার! কুমার! এ নিশ্চয়ই শত্রুর প্রয়োগ।"

"পত্রের শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য আর্য্য কিছু আভরণও পাঠাইয়াছেন। তাও কি শত্রুর প্রয়োগ ? এই দেখুন দেখি এ গুলি কি ?" এই বলিয়া মলয়কেতু আভরণগুলি রাক্ষসকে দেখাইলেন।

রাক্ষস দেখিয়া কহিলেন, "কুমার! এগুলি আমি কোথাও পাঠাই নাই। আপনি আমাকে দান করিয়াছিলেন, পরে কোনও কারণে পরিতুষ্ট হইয়া আমি সিদ্ধার্থককে দান করি।"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "অমাত্য, যাহা কুমার নিজে আপনাকে উপহার দিয়াছেন, তাহা কি এইরূপ পরিত্যাগের যোগ্য ?"

মলয়কেতু কহিলেন, "আবার আপনি লিখিয়াছেন, 'বাচিকও কিছু কথা ইহার মুখে শুনিবেন।'"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "এ পত্রই আমার নয়। বাচিক আবার কি বলিতে বলিব কুমার ?"

"তবে এ কার মুদ্রা ?"

"ধূর্ত্তেরা জালমুদ্রাও প্রস্তুত করিতে পারে।"

ভাগুরায়ণ কহিলেন, "ঠিক কথা। ভাল সিদ্ধার্থক, এই পত্র কার লেখা তুমি বলিতে পার ?"

সিদ্ধার্থক রাক্ষসের মুখের দিকে কাতরভাবে একবার চাহিয়া আবার মুখ নত করিল।

"কেন, বাপু, আবার মার খাইবে ? সব খুলিয়া বল।"

সিদ্ধার্থক কহিল, "পত্র শকটদাসের লেখা।"

রাক্ষস কহিল, "পত্র যদি শকটদাসের লেখা হয়, তবে আমারই লেখা বলিতে হইবে।"

মলয়কেতু আদেশ করিলেন, "বিজয়া! শকটদাসকে ডাক।"

শকটদাস আসিয়া নিশ্চয় বলিবে, পত্র তাহারই লেখা বটে, কিন্তু সিদ্ধার্থকের অনুরোধক্রমেই সে পাটলীপুত্রে এই পত্র লিখিয়াছিল। মলয়কেতুর মনে তাহাতে কিছু বিশ্বাস জন্মিলেই সকল কৌশল ব্যর্থ হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভাগুরায়ণ কহিলেন, "কুমার, শকটদাস তার প্রভু রাক্ষসের সম্মুখে কখনই স্বীকার করিবে না যে এই পত্র তার লেখা। তাকে না ডাকিয়া বরং তার লেখা আর কোনও পত্র আনিলেই ভাল হয়। আমরা অক্ষর মিলাইয়া বুঝিতে পারিব, এই পত্র শকটদাসেরই লেখা কি না।"

"ঠিক কথা, বিজয়া! যাও শকটদাসের লেখা একখানা পত্র লইয়া এস।"

"আর তার মুদ্রাটিও আনিলে ভাল হয়।"

মলয়কেতু কহিলেন, "হাঁ, যাও বিজয়া! তার একখানা পত্র আর তার মুদ্রা দুই-ই লইয়া এস।"

বিজয়া আদেশমত পত্র ও মুদ্রা আনিয়া দিল। মিল করিয়া দেখা হইল অক্ষর একরকমই বটে!

রাক্ষস কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হায়! তাঁর মিত্র শকটদাসও কি তবে নিজের নির্ব্বাসন ও স্ত্রীপুত্রের সহিত বিচ্ছেদের ব্যথা সহিতে না পারিয়া বন্ধুত্ব ও প্রভুভক্তি সকলই ভুলিল! নিতান্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুলচিত্তে রাক্ষস নীরব হইয়া রহিলেন।

মলয়কেতু তাঁর অঙ্গে পরিহিত অলঙ্কারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "পত্রের মধ্যে যে তিনটি অলঙ্কারের কথা আছে, আপনার অঙ্গে কি এই সেই অলঙ্কার আর্য্য?—একি! এ যে আমার পিতার অলঙ্কার? এ অলঙ্কার আপনি কোথায় পাইলেন?"

"কোনও বণিকের নিকট কিনিয়াছি।"

"বিজয়া, তুমি কি এ অলঙ্কার চিনিতে পারিতেছ?"

বিজয়া সাশ্রুনয়নে উত্তর করিল, "হাঁ কুমার, চিনিতে পারিতেছি বই কি? এই অলঙ্কারই ত মহারাজ পর্ব্বতক অঙ্গে পরিতেন!"

"এ কি মহারাজ পর্ব্বতকের অলঙ্কার? বুঝিয়াছি—তবে চাণক্যের নিয়োগেই বণিক আসিয়া এই অলঙ্কার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছে!"

মলয়কেতু উত্তর করিলেন, "আর্য্য, আমার পিতার অলঙ্কার চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, আর সেইগুলি আপনি বণিকের নিকট ক্রয় করিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব

হইতে পারে ? ইহাই বরং সম্ভব যে আপনি অতিক্রূর—অধিক লাভের আশায় আমাদিগকেই মূল্যস্বরূপ দিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে এই অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছেন।"

রাক্ষস মনে মনে কহিলেন, শত্রুর এই প্রয়োগ কি সুশ্লিষ্ট !* শকটদাস আমারই লেখক, মুদ্রাঙ্কও আমার। শকটদাস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এ কথা বলিলে কে এখন বিশ্বাস করিবে ? চন্দ্রগুপ্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছেন, একথাই বা কে সম্ভব বলিয়া মনে করিবে ? হায় ! কি উত্তর এখন দিব ? ইহার যে উত্তর কিছুই নাই। নীরবতায় দোষের স্বীকার হইবে,—হউক ! ইতরের ন্যায় বিশ্বাসের অযোগ্য উত্তরের অপেক্ষা তাও ভাল।"

মলয়কেতু কহিলেন, "আর্য্য,, এখন আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "যে আর্য্য, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন কুমার ! আমি এখন অনার্য্যই হইয়াছি।"

মলয়কেতু কহিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত আপনার প্রভুপুত্র, কিন্তু আমি আপনার সেবাপরায়ণ মিত্র-পুত্র। তিনি আপনার অর্থদাতা,—কিন্তু আপনার মতানুবর্ত্তী আমাকে আপনিই সব দিতেছেন। সেখানে আপনার সচিবপদ সসম্মান দাস্যমাত্র, আর এখানে আপনিই প্রভু। তবে কি অধিক স্বার্থের লোভে আপনি এইরূপ অনার্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিলেন ?"

রাক্ষস উত্তর করিলেন,—"আমি আর কি বলিব কুমার ? আপনি নিজেই ত উত্তর দিলেন। এ কার্য্যে প্রলোভিত করিবার মত অধিকতর স্বার্থ ত কিছুই নাই।"

"এ সব তবে কি আর্য্য ?" এই বলিয়া মলয়কেতু সিদ্ধার্থকের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র, অলঙ্কার ও মুদ্রাঙ্কিত থলিয়াটি আবার রাক্ষসকে দেখাইলেন।

রাক্ষস সাশ্রুনয়নে উত্তর করিলেন "বিধাতার লীলা ! আর কি ? ভৃত্য আমরা তিরস্কারের পাত্র হইলেও যে রাজা উপকার স্মরণ করিয়া ভৃত্যদের পুত্রের মতই দেখিতেন, সেই সুবিবেচক রাজাকেও তিনি বিনাশ করিলেন, সকল পৌরুষনাশী বিধাতার লীলাই এইরূপ !"

"কি ! এখনও নিজের দোষ গোপন করিবার চেষ্টা ! সমস্তই বিধাতার লীলা—নিজের লোভের কিছুই নয় ? অনার্য্য ! তুমিই বিষকন্যা প্রয়োগে

* উত্তমরূপে গোছান বা সাজান।

আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ। এখন আবার চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বের লোভে তার সঙ্গে যোগ দিয়া মাংসের মত আমাদের বিক্রয় করিতেছ!"

"হায়! এ যে গণ্ডের উপরে বিস্ফোটক!—পাপ শান্তি হউক! পাপ শান্তি হউক! আমি মহারাজ পর্ব্বতকের উপরে বিষকন্যায় প্রয়োগ করি নাই।"

"তবে কে পিতাকে হত্যা করিয়াছিল?"

"দৈবকে জিজ্ঞাসা করুন কুমার!"

"হাঁ দৈবকে জিজ্ঞাসা করিব, ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে নয়!"

রাক্ষস আপন মনে কহিলেন, "হায়, জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর! শক্র যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে!"

মলয়কেতু অতিক্রোধে রক্ষীকে আদেশ করিলেন, "ভাসুরক! সেনাপতি শিখরসেনকে গিয়া বল, এই যে পাঁচজন রাজা—কৌলূতরাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়রাজ সিংহনাদ, কাশ্মীররাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সুষেণ, আর পারসীকরাজ মেঘাক্ষ—রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে,—তাদের মধ্যে প্রথম যে তিনজন আমার রাজ্য কামনা করিয়াছিল, তাহাদিগকে গভীর গর্ত্তে ছাই চাপা দিয়া পুতিয়া ফেলা হউক্। আর শেষ যে দুইজন আমার হস্তিবল কামনা করিয়াছিল, তাহাদিগকে হস্তীর পায়ে পিষিয়া বধ করা হউক!"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভাসুরক প্রস্থান করিল। মলয়কেতু আবার কহিলেন, "রাক্ষস! আমি বিশ্বাসঘাতক রাক্ষস নই! যাও, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একেবারেই মিলিত হও গিয়া। চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিল করিয়া তুমি আসিয়াছিলে,—যাও! ত্রিকটুবৎ এই দুর্নীতিকে অক্লেশে আমি উন্মূলিত করিতে পারিব!"

এই বলিয়া মলয়কেতু ভাগুরায়ণ এবং অনুচরদের লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাক্ষস কহিলেন, "হা ধিক! একি সর্ব্বনাশ হইল! চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড হইল! হায়, রাক্ষস! এতদিন তবে রিপুনাশের চেষ্টা না করিয়া কি মিত্রনাশের চেষ্টা করিলে? ওঃ! কি হতভাগ্য আমি!—এখন কি করি? তবে কি তপোবনে যাইব? না—না,—রিপু জীবিত থাকিতে তপস্যায়ও বৈরপূর্ণ মন আমার শান্ত হইবে না। তবে কি প্রভু নন্দরাজের অনুসরণ করিব? না—না, সে যে স্ত্রীজনের মত কাজ হইবে! তবে কি

অসিহস্তে রণক্ষেত্রে গিয়া মরিব ? না, তাও পারি না। চন্দনদাস আমারই জন্য সপরিবারে কারারুদ্ধ হইয়া আছে,—যদি তাকে মুক্ত করিতে না পারি, সত্যই তবে কৃতঘ্ন হইব। যাই, তার চেষ্টাই এখন করি গিয়া !"

(৭)

মূঢ় মলয়কেতুর অবিমৃষ্যকারিতার ফল অচিরেই ফলিল। পাঁচজন মিত্র রাজাকে এইরূপে বধ করায়, অন্যান্য অনেক প্রধান লোকই ভীত হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা মলয়কেতুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়ায় ভদ্রভট্ট, পরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত প্রভৃতি চাণক্যের প্রেরিত প্রধান ব্যক্তিরা মলয়কেতুকে বন্দী করিয়া নিয়া পাটলীপুত্রের দিকে যাত্রা করিলেন। তখন চাণক্য নিজে গিয়া মলয়কেতুর নেতৃবিহীন বিচ্ছিন্ন ও ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণকে হস্তগত করিলেন।

বিশ্বস্তজনের বিশ্বাসঘাতকতায়, নিজের লাঞ্ছনায়, দারুণ আশাভঙ্গে এবং আপনার এত যত্নে সংগৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত সৈন্য-সংস্থানের মধ্যে এই বিপর্য্যয়ে যারপরনাই ব্যথিতচিত্তে রাক্ষসও পাটলীপুত্রের দিকে চলিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করিয়া মিলিত হইবেন, এরূপ কোনও ইচ্ছা বা রুচি তাঁহার মনের কোণও স্পর্শ করিতে পারিল না। তাঁহার মনে হইল, তার অপেক্ষা বনবাসী হইয়া থাকাও ভাল। সংকল্প পালন করিতে পারিলেননা, এ অপযশও ভাল,— তবু শত্রুর অনুগত কখনও তিনি হইবেন না। কিন্তু একটি বড় কর্ত্তব্য তাঁহার রহিয়াছে। চন্দনদাস তাঁহার জন্য বিপন্ন ; যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়াও তিনি তাহাকে উদ্ধার করিবেন।

চাণক্যের অভিপ্রায়ও তাহাই ছিল। তাহাহইলেই তিনি রাক্ষসকে একেবারে হস্তগত করিতে পারিবেন। মলয়কেতুর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া রাক্ষস কোথায় যান, কি করেন—তার সন্ধান রাখিবার জন্য উন্দুর নামক একজন চর নিযুক্ত হইয়াছিল। উন্দুর রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্রে আসিয়া চাণক্যকে গিয়া সংবাদ দিল। চাণক্য তখনই চন্দনদাসকে মশানে নিয়া শূলে দিবার আদেশ দিলেন এবং এই সংবাদ যাহাতে রাক্ষস অবিলম্বে পান, তার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। রাক্ষসও সংবাদ পাইবামাত্র মশানের দিকে চলিলেন।

রাজপথে বড় কোলাহল উঠিল। চণ্ডালেরা চন্দনদাসকে বধ্যবেশে সাজাইয়া মশানে লইয়া যাইতেছে! পরিধানে রক্তবসন, গলায় পুষ্পমাল্য, স্কন্ধে সেই

মশানের পথে (মুদ্রা-রাক্ষস)

কমলা প্রেশ,—কলিকাতা।

শূল—যাহাতে বিদ্ধ হইয়া চন্দনদাসকে অচিরেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। চন্দনদাসের গৃহিণী ও পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে চলিয়াছে। চণ্ডালেরা হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে—রাজার নিষিদ্ধ অপ্রীতিকর কার্য্য করিলে এই ফল হয়। অতএব সাবধান! নাগরিকগণ এরূপ কার্য্য যেন কেহ না করে! দুইধার হইতে কোলাহল করিয়া লোক আসিয়া জমা হইতেছে। চণ্ডালেরা হাঁক ডাক করিয়া লোক সরাইয়া দিতেছে। সাধু বলিয়া চন্দনদাসকে সকলেরই শ্রদ্ধা করিত। তাঁহাকে চণ্ডালেরা শূলে দিতে নিয়া যাইতেছে—সকলেই ক্ষুব্ধ—অনেকেই কিছু উত্তেজিত। জনসংঘের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "চন্দনদাসের মুক্তির কি কোনও উপায় নাই?" চণ্ডাল উত্তর করিল, "এখনও অমাত্য রাক্ষসের পরিবারকে সমর্পণ করিলে সে মুক্তি পাইতে পারে।" উত্তরে আবার কে একজন বলিয়া উঠিল, "ইনি শরণাগতবৎসল, আপনার জীবনের জন্য কখনও এরূপ অকার্য্য করিবেন না।" চণ্ডাল উত্তর করিল, "তবে ইহার মঙ্গলও হইবে না।"

ঘাতকেরা চন্দনদাসকে লইয়া বধ্য ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল। চন্দনদাস ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "ধিক! আমার মত চরিত্রভঙ্গ-ভীরুকেও শেষে চোরের মত মরিতে হইল! কৃতান্ত! তোমাকে নমস্কার! আহা, ওই যে আমার বন্ধুরা কোনও প্রতিকার করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতেছেন—আর অশ্রুসিক্ত মুখে ফিরিয়া ফিরিয়া আমার দিকে চাহিতেছেন!"

চণ্ডাল কহিল, "মহাশয়! বধ্যভূমিতে আসিয়াছি, আপনার গৃহজনদের এখন বিদায় দিন।"

চন্দনদাস স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কুটুম্বিনী*! পুত্রকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। এখন আর কেন আমার সঙ্গে আসিতেছ?"

গৃহিণী কাঁদিয়া কহিলেন, "আর্য্য, তুমি ত দেশান্তরে† যাইতেছ না, পরলোকে যাইতেছে,—কেন তোমার সঙ্গে যাইব না?"

* এই নাটকে স্ত্রী কুটুম্বিনী বলিয়াই লিখিত। 'কুটুম্বিনী'র অর্থ কুটুম্ববিশিষ্টা নারী অর্থাৎ পুত্র কন্যাদি পরিবৃতা প্রবীণা গৃহিণী। নাটকে আরও দেখা যায়, চন্দনদাস ও তাহার গৃহিণী পরস্পরকে আর্য্যা ও আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাতে বোঝা যায়, প্রবীণ বয়সের গৃহস্থ ও গৃহিণীগণ পরস্পরকে এই সম্মানসূচক সম্বোধনেই ডাকিতেন। এখন যেমন কর্ত্তা ও গিন্নী সম্বোধন প্রচলিত আছে।

† দেশান্তরে যাইবার সময় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে নাই, এইরূপ বিধি তখন ছিল। এখন আছে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে নাই।

চন্দনদাস কহিলেন, "নিজের দোষে নয় ঠাকুরাণী, মিত্রের হিতের জন্য আমার প্রাণ যাইতেছে। এ যে আনন্দের কথা,—কেন তোমরা ইহাতে কাঁদিতেছ?"

"তা যদি হয়, তবে আপনজনকেই বা কেন ফিরিয়া পাঠাইতে চাও?"

"কি করিতে চাও কুটুম্বিনী?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "আমি ভর্তৃচরণের অনুগামিনী হইব,—দয়া করিয়া এই অনুমতি আমাকে দেও।"

চন্দনদাস কহিলেন, "এরূপ দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হও কুটুম্বিনী! এই পুত্র এখনও বালক, লোক ব্যবহার কিছুই জানে না। ইহার প্রতি নির্দ্দয় হইও না।"

"প্রসন্ন দেবতারা ইহাকে রক্ষা করিবেন। জাদু! তোমার পিতার চরণে শেষ প্রণাম কর!"

বালক প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "পিতা, তুমি ত চলিয়া গেলে। আমি তবে এখন কি করিব?"

চন্দনদাস উত্তর করিলেন, "যে দেশে চাণক্য নাই, সেই দেশে গিয়া বাস করিও।"

চণ্ডাল আবার কহিল, "মহাশয় শূল পোতা হইয়াছে। এখন প্রস্তুত হউন।"

গৃহিণী আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওগো! কে আছ! রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

চন্দনদাস স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কুটুম্বিনী! কেন বৃথা রোদন করিতেছ? শোকার্ত্ত স্ত্রীজনের প্রতি যাঁর দয়া ছিল, সেই মহারাজ নন্দ যে এখন স্বর্গে। তারপর কোন অন্যায় কার্য্যে নয়, মিত্রের হিতের জন্যই আমার মৃত্যু হইতেছে। এরূপ হর্ষের স্থলেই বা রোদন কেন করিবে?"

চণ্ডালেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিবার জন্য অগ্রসর হইল। চন্দনদাস কহিলেন, "ভদ্র, একটু অপেক্ষা কর, আমি পুত্রকে একটু সান্ত্বনা করিয়া লই।" এই বলিয়া পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া চন্দনদাস কহিলেন, "বৎস, মরণ একদিন নিশ্চিত হইবে, আজ মিত্রের হিতের জন্য যে আমি মরিতেছি, ইহাই আমার সানন্দ সান্ত্বনার কারণ হইতেছে জানিবে।"

পুত্র কাঁদিয়া চন্দনদাসের পদতলে পড়িয়া কহিল, "পিতা! ইহাই কি আমাদের কুলধর্ম্ম?"

চণ্ডালেরা আর অপেক্ষা না করিয়া চন্দনদাসকে গিয়া ধরিল। গৃহিণী আবার

চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "ওগো কে আছ গো! রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

"ভয় নাই—ভয় নাই—ঠাকুরাণী!—ঘাতকগণ! থাম—থাম! চন্দনদাসকে বধ করিও না!"

সকলে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন!

রাক্ষস কহিলেন, "রিপুকুল বিনাশের মত প্রভুকুলের বিনাশ নীরবে যে চক্ষে দেখিল, মিত্রের বিপদের সংবাদ পাইয়াও দূরে যে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল,—এই বধ্যমাল্য তারই প্রাপ্য, তার কণ্ঠেই তা পরাইয়া দেও!"

চন্দনদাস ভীত ও কাতরকণ্ঠে কহিলেন "হায়, অমাত্য! এ কি করিলেন?"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "তোমার সুচরিতের একাংশের অনুকরণ মাত্র,—আর কিছু নয়।"

চন্দনদাস ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "হায় অমাত্য! আমার সকল চেষ্টাই যে আপনি নিষ্ফল করিলেন!"

"সখা চন্দনদাস! তিরস্কার আর কেন? স্বার্থ সকলেই সাধন করিতে চায়, আমিও করিলাম।—যাও ঘাতকগণ, চাণক্যকে আমার এই কথা গিয়া বল। সাধু লোকের অপ্রীতিজনক ঘোর এই কলিকালে নিজের প্রাণবিসর্জ্জনে অন্যের প্রাণ রক্ষা করিয়া চন্দনদাস মহাত্মা শিবির যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যারপরনাই বিশুদ্ধাত্মা, সুচরিত্রে বুদ্ধগণকেও তিনি তিরস্কৃত করিয়াছেন। তাঁকে গিয়া বল, সকলের পূজ্য এই চন্দনদাস যার জন্য তোমার শত্রু হইয়াছেন, সেই অমাত্য রাক্ষস বধ্যভূমিতে আসিয়াছে।"

চণ্ডালদের মধ্যে একজন (বজ্রলোমক) অপরকে কহিল, "বেণুবেত্রক! তুমি চন্দনদাসকে লইয়া ওই দিকে ছায়ায় গিয়া অপেক্ষা কর। আমি অমাত্যকে লইয়া চাণক্য ঠাকুরের নিকটে যাই।"

বেণুবেত্রক চন্দনদাসকে লইয়া দূরে সরিয়া গেল। বজ্রলোমক রাক্ষসকে লইয়া রাজগৃহের সম্মুখে আসিয়া ডাকিয়া কহিল, "ওগো দৌবারিকগণ! কে আছ ওখানে?—চাণক্য ঠাকুরকে গিয়া বল, তাঁর নীতিকৌশলে অমাত্য রাক্ষস ধরা পড়িয়াছেন!"

বলিতে বলিতেই স্বয়ং চাণক্য একটি যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রহৃষ্টমুখে একটু বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "বল ভদ্র, বল—উত্তুঙ্গ কপিলশিখ দীপ্ত অনলকে কে বসনপ্রান্তে বাঁধিল? বল, রজ্জুর শৃঙ্খলে বায়ুর গতিরোধ কে

করিল? বল, নিহত গজের মদগন্ধ এখনও যার কেশরে আছে—এমন সিংহকে কে পিঞ্জরে বাঁধিল? নক্র-মকর-সঙ্কুল ভীমপারাবার কে সাঁতরিয়া পার হইল?"

চণ্ডাল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "নীতিনিপুণ-বুদ্ধি আর্য্য চাণক্যই এই দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, আর কে করিবে?"

চাণক্য কহিলেন, "না—না, চাণক্য নয়! বল, নন্দকুলদ্বেষী দৈব!"

রাক্ষস চাণক্যের দিকে চাহিয়া আপন মনে কহিলেন, "এই সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা চাণক্য! সাগর যেমন রত্নের আকর, ইনি তেমনই সর্ব্বশাস্ত্রের আকর! বিদ্বেষ বশতঃ ইঁহার গুণেও আমি যে পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছি না।"

চাণক্যও রাক্ষসের দিকে চাহিয়া আপন মনে কহিলেন, "এই সেই মহাত্মা রাক্ষস, যাঁহার হইতে বৃষলের সৈন্য আর আমার মন গুরু চিন্তাক্লেশে দীর্ঘ দীর্ঘ কত নিশা জাগরণ করিয়া এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে!"

আপন মনে এই কথা বলিয়া অগ্রসর হইয়া চাণক্য কহিলেন, "অমাত্য রাক্ষস! বিষ্ণুগুপ্ত আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।"

"হায়, 'অমাত্য' এই বিশেষণ যে আমার পক্ষে এখন অতি লজ্জাস্কর!" মনে মনে এই বলিয়া রাক্ষস উত্তর করিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, আমি চণ্ডালস্পর্শ-দূষিত,—আমাকে স্পর্শ করিবেন না।"

চাণক্য কহিলেন, "অমাত্য রাক্ষস! এ চণ্ডাল নয়। ইহাকে আপনি পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন। এ একজন রাজপুরুষ—নাম সিদ্ধার্থক। অন্য যে চণ্ডালকে বধ্যভূমিতে দেখিয়াছেন, সে ইহারই বন্ধু সমিদ্ধার্থক, অন্য একজন রাজপুরুষ। ইহাদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ ঘটাইয়া আমিই শকটদাসের দ্বারা সেই কপটপত্র লিখাইয়াছিলাম।"

"আহা, বড় সৌভাগ্য! শকটদাসের প্রতি আমার সন্দেহ আজ দূর হইল!"

চাণক্য কহিলেন, "শুধু তাই নয়, অমাত্য! যত কিছু ঘটনা, বৃষলের সঙ্গে আপনার মিলন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সব আমাদের নীতিপ্রয়োগ বলিয়াই জানিবেন। এই দেখুন, বৃষল নিজেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বলিতে বলিতে চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চাণক্যকে প্রণাম করিয়া চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "আর্য্য, চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

চাণক্য কহিলেন, "বৃষল! তোমার প্রতি আমার সকল আশীর্ব্বাদই সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন তোমার এই পৈতৃক অমাত্যপ্রধান রাক্ষসকে প্রণাম কর।"

চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের দিকে চাহিয়া রাক্ষস আপন মনে কহিলেন, "শৈশবে দেখিয়া সকলেই ইহাকে মহোদয় বলিয়া মনে

করিতেন। যুথপতি করীর ন্যায় ইনি এখন সত্যই রাজপদে আরোহণ করিয়াছেন।" তারপর আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "রাজন্! বিজয়ী হও!"

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "আর্য্য, আপনি ও গুরুদেব সন্ধিবিগ্রহাদি সকল রাজকার্য্যে যখন জাগ্রত রহিয়াছেন, তখন কেনই বা পৃথিবী জয়ে সমর্থ হইব না?"

রাক্ষস ভাবিতে লাগিলেন, "কৌটিল্যের এই শিষ্য আমাকে ভৃত্যভাবে কি সত্যই বিনয়ে এই কথা বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা বিদ্বেষ বশতঃই কি আমি চন্দ্রগুপ্তের কথা বিপরীতভাবে গ্রহণ করিতেছি?—যাহাই হউক্, সর্ব্বথা যোগ্যপাত্রেই চাণক্য যশস্বী হইয়াছেন। রাজা যোগ্য হইলে অক্ষম মন্ত্রীও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আর রাজা যদি অযোগ্য হন, নদীতটে শীর্ণাশ্রয় তরুর ন্যায় সুনেতা মন্ত্রীরও পতন হয়!"

রাক্ষসকে নীরব দেখিয়া চাণক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমাত্য রাক্ষস! আপনি কি চন্দনদাসের জীবন চান?"

রাক্ষস উত্তর করিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত! তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?"

চাণক্য কহিলেন, "অমাত্য রাক্ষস। শত্রুর যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করিয়া আপনি বৃষলকে অনুগ্রহ করিবেন কিনা ইহাতে এখনও সন্দেহ আছে। যদি সত্যই চন্দনদাসের প্রাণ চান, তবেই ওই শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সচিবের এই শস্ত্র গ্রহণ করুন।"

"বিষ্ণুগুপ্ত! তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি এই শস্ত্রের অযোগ্য, বিশেষ আপনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।"

চাণক্য কহিলেন, "অমাত্য রাক্ষস! যদি আমি অযোগ্য, তবে আপনি যোগ্য নন, এমন কথাও কি হয়? যাহাহউক, চন্দনদাসের প্রাণ যদি চান, এই শস্ত্র আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

একটুকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষস কহিলেন, "ভাল বিষ্ণুগুপ্ত, দিন তবে ওই খড়্গ আমাকে দিন। সুহৃৎস্নেহ সকলের বড়। কি করিব? গত্যন্তর নাই,—ইহাতেই আমি প্রস্তুত।"

রাক্ষসের হস্তে সচিবের খড়্গ অর্পণ করিয়া চাণক্য অতি আনন্দে কহিলেন, "বৃষল! অমাত্য রাক্ষস এই অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তোমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন!"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "আর্য্যের প্রসাদেই ইহা ঘটিল।"

এমন সময় রক্ষী আসিয়া কহিল, "আর্য্য! ভদ্রভট্ট ভাগুরায়ণ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ মলয়কেতুকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিছেন। বাহিরে তাঁহারা আর্য্যের আদেশ অপেক্ষায় রহিয়াছেন।"

চাণক্য কহিলেন, "ভাল। অমাত্য রাক্ষসকে বল। এখন অবধি রাজকার্য্য তিনিই দেখিবেন।"

রাক্ষস কহিলেন, "মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! সকলেই জানেন, মলয়কেতুর সঙ্গে আমি কিছুকাল একত্র বাস করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন।"

চাণক্য কহিলেন, "বৃষল! অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা অবশ্য তুমি রক্ষা করিবে। যাও রক্ষী! ভদ্রভট্ট প্রভৃতি রাজপুরুষগণকে গিয়া বল, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুর সমস্ত সম্পদ তাঁহাকেই দান করিলেন। তাঁহারা সঙ্গে গিয়া মলয়কেতুকে তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসুন।'

"যে আজ্ঞা।"

"আরও শোন। দুর্গপালকে গিয়া বলিও, অমাত্য রাক্ষস সচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রীত হইয়া এই আদেশ করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস রাজ্য মধ্যে সমস্ত নগরের প্রধান শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।"

"যে আজ্ঞা।"

"আরও কথা আছে। দুর্গপালকে বলিও, অমাত্য রাক্ষসকে পাইয়া প্রীত চন্দ্রগুপ্ত আরও এই আদেশ করিলেন, আজ এ নগরে সকলের বন্ধন মোচন হউক্। সকলেই বন্ধন মুক্ত হউক, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল—কেবল আমার এই শিখাটিই আজ বন্ধনযুক্ত হউক।"

এই বলিয়া চাণক্য বহুদিনের মুক্ত শিখা বন্ধন করিলেন। তারপর আবার কহিলেন, "মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! অমাত্য রাক্ষস! বলুন, আর কি প্রিয়কার্য্য আপনাদের সাধন করিব।"

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, "রাক্ষসের সঙ্গে মিত্রতা হইল। রাজ সিংহাসনে আমি প্রতিষ্ঠিত হইলাম। নন্দকুল নির্ম্মূল হইল। ইহার পর আর কি প্রিয়সাধন করিবার আছে আর্য্য?"

রাক্ষস কহিলেন, "আর কি প্রিয় বাসনা আমার থাকিতে পারে? ইহাতেও যদি আপনি তৃপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে মহর্ষি ভরত * শিষ্যের এই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। স্বয়ম্ভু বিষ্ণু যেমন আত্মবলের অনুরূপ বরাহমূর্ত্তি ধরিয়া দন্তাগ্রে জলমগ্ন পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চন্দ্রগুপ্ত রাজমূর্ত্তি ধরিয়া, আপনার মহাবাহু প্রসারণ করিয়া, বন্ধু ভৃত্যাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া, ম্লেচ্ছের উপদ্রব হইতে ধরণীকে রক্ষা করুন।"

সম্পূর্ণ।

* আদি নটগুরু।

অনুভূতি।

অন্ধ করে দাওগো নয়ন রুদ্ধ কর শ্রবণ দুটি,
আত্মহারা পরাণ মোর চরণে ওই পড়ুক লুটি।
লুপ্ত হউক আকাশ বায়ু গ্রহতারা চন্দ্র রবি,
তরুলতা পুষ্প ফল লুপ্ত হউক নিখিল ছবি!
নিতল নিবিড় তিমিরতলে ডুবিয়া যাক আজকে সব,
করুক হৃদয় তোমায় প্রভু মধুর নীরব অনুভব।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

পতিতা।

দেবেন বাবুর ছোট মেয়েটি টাইফয়েডে মরণাপন্ন হইয়াছিল। ডাক্তারদের সুচিকিৎসায়, সে যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন তিনি তাহাকে লইয়া হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গিরিধিতে গেলেন। বলাবহুল্য তাহার গৃহিণী সুকুমারীও সঙ্গে গেলেন।

গিরিধিতে দুইমাস কাটিয়া গেল। ঈশ্বরেচ্ছায় মেয়েটি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। ডাক্তার রমেশবাবু ইঁহাদের আত্মীয়। গিরিধিতে তিনিই মেয়েটিকে দেখিতেন। একদিন ডাক্তারবাবু আসিয়া তাঁহার রোগীর পরিপুষ্ট দেহ, আরক্ত কপোল এবং উল্লম্ফনপটুতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "খুকীকে এখন আর এখানে না রাখ্‌লেও চলে।" ডাক্তার বাবুর কথা সুকুমারীও শুনিলেন।

সেই দিন রাত্রিতে সুকুমারী দেবেন বাবুকে বলিলেন—"আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"

"আগে বলই না কি কথা।"

"তুমি রাখ্‌বে কি না বল।"

"কি, সন্দেশ খেতে হবে?"

"কি ছেলে মানুষের মত কথা! বল, রাখ্‌বে কি না!"

দেবেন বাবু বলিলেন—"হুকুম কবে অমান্য করেছি।"

সুকুমারী বলিলেন—"তা নয়, তবে খুকীর ব্যারামে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে—তাই বলছি—"

"তা ত বল্‌ছ—কিন্তু আসল কথাটা যে কি তা বল্‌ছ কই ?"

সুকুমারী স্বামীর একটু কাছে আসিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবু ত বল্‌লেন, খুকীকে এখন এখানে না রাখ্‌লেও চলে; তোমার ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে—একটি মাস মাত্র আছে। আমি বলি কি, যদি এত দূরে এসেছি, তা চলনা একবার বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করে আসি। এবার না হলে আর এ জন্মে হবে কি না তিনিই জানেন।"

দেবেন বলিলেন—"তার জন্য ভাবনা কি ? 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'—তুমি খুকীকে নিয়ে এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক, আমিই যাচ্ছি,—এতে দুজনেরই পুণ্য হবে, অথচ খরচ—একেবারে অর্দ্ধেক !"

সুকুমারী বলিলেন—"ও সব রাখ—বল যাবে কি না।"

শেষে যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইল। কাশী যাওয়াই স্থির হইয়া গেল।

দেবেন বাবু বলিলেন—"কাশীতে ত যাবে, কিন্তু যেয়ে ওঠা যাবে কোথায়! একটা ঠিকানা না করে ত আর যাওয়া যায় না।"

সুকুমারী বলিল—"সে ভার আমার। মহেশ দাদা কাশীতে আছেন, আমি আজই তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

মহেশ দাদা, সুকুমারীর দূর সম্পর্কে দাদা। সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছেন—সন্তানাদি নাই। সুকুমারী তাঁহার নিকট তাহাদের জন্য ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করিতে লিখিয়া দিলেন। যথাসময়ে তিনি সংবাদ দিলেন যে বাড়ী ঠিক হইয়াছে। দেবেন বাবু কয়েক দিন রেলওয়ে গাইড্ উল্টাইয়া উল্টাইয়া বলিলেন—"তা হলে, পাঞ্জাব মেলেই যাওয়া যাবে। একটু ভিড় হবে, তা বলে কি করা—যাওয়া যাবে সকালে।" সুকুমারী বলিলেন—"পঞ্জাব মেলে। কেন, গয়া হয়ে যাবে না ?"

দেবেন বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"এ কি রীতিমত তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা না কি ? প্রথমে কাশী, তার পর গয়া, তার পর প্রয়াগ—মথুরা—বৃন্দাবন—হরিদ্বার—জ্বালামুখী—"

"আহা থাম। অত হবে না—ঐ কাশী পর্য্যন্তই। গয়া হয়ে যখন যাওয়া যায়—তখন নাই বা যাব কেন ? মণিদাদা সেখানে আছেন, থাকবার কোন অসুবিধা হবে না।"

শেষে সেই ব্যবস্থাই হইল। গয়াতে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া তাঁহারা কাশীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, মহেশ দাদা আউধ মহল্লায়

তাঁহাদের জন্য একটা ছোট বাড়ী ঠিক করিয়াছেন। ভাড়া ছয় টাকা—গঙ্গার খুব নিকটে। উপরে নীচে যে কয়খানা ঘর আছে, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সুকুমারী খুব ভোরে উঠিয়া বোঠানের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া রান্না চড়াইয়া দিতেন। দেবেন বাবু, মহেশদাদার আসরে, এক পেয়ালা চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন; ঘুরিয়া ফিরিয়া ১০টার সময় আসিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। সবে তাঁহারা তিন দিন হইল কাশীতে আসিয়াছেন। সে দিন—বেলা তখন ১০টা—সুকুমারীর রান্না হইয়া গিয়াছে, অকর্ম্মণ্য বসিয়া আছেন। দেবেন বাবু গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। এমন সময় কে যেন সদরদরজার কড়া নাড়িল। আওয়াজ পাইয়া সুকুমারী মনে করিলেন, বুঝি দেবেন বাবু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাপড় খানা লইয়া নীচে গেলেন এবং দরজা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু দেবেন বাবুর পরিবর্ত্তে দরজা ঠেলিয়া একটি স্ত্রীলোক ভিতরে আসিল। সে সুকুমারীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে ভিতরে আসিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি গয়া হতে এসেছেন?"

"হাঁ।"

"আপনি বুঝি দেবেন বাবুর স্ত্রী?"

সুকুমারী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হাঁ"। কিন্তু বড় বিস্মিত হইলেন। দেবেন বাবুদের এমন অনেক আত্মীয় কাশীতে আছেন—তাঁহাদের সহিত সুকুমারীর চাক্ষুষ পরিচয় নাই; তিনি মনে করিলেন, ইনি বুঝি তাঁহাদের কেহ। কিন্তু সম্পর্ক না জানায় অভ্যর্থনা যে কিরূপ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি?"

সে উত্তর করিল, "আমি পতিতা। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ আবশ্যক।"

পতিতা! তার অর্থ কি? কত রকম চিন্তা যে সুকুমারীর মাথায় ঘুরিতে লাগিল, তার ঠিকানা নাই। কতক্ষণ যে তিনি এইরূপ মুখামুখি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল—বড় লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বসো।"

সে দালানের একটা থামের পাশে যাইয়া বসিল। সুকুমারী এতক্ষণ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। এখন বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কি সুন্দর মূর্ত্তি! এমন সৌন্দর্য্য যেন তিনি কোথায়ও দেখেনা

নাই। সে সৌন্দর্য্য যে তাহার রূপের কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। চোক, মুখ, নাক, ওষ্ঠাধর, কপাল—সমস্তই সাধারণ রকমের। পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে কিছুই অসাধারণত্ব পাওয়া যায় না—কিন্তু তার মধ্যেই যেন অতি মধুর চিত্তস্পর্শী, একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য তাহার সমস্ত মুখে বিরাজিত রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন আজীবনব্যাপী অতি গূঢ় দুঃখ অন্তরে থাকিয়া একটা পুণ্যপূত স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া দিয়াছে। বহু-দিন পূর্ব্বে সুকুমারী কলিকাতার প্রদর্শনীতে একখানি চিত্র দেখিয়াছিলেন। সে চিত্র স্বয়ং মহাদেবকে স্বামী পাইবার জন্য তপশ্চর্য্যানিরতা কষায়বল্কলধারিণী কুমারী গৌরীর। স্থির, শান্ত, অটল হৃদয়—সুকুমার রূপ! এ রমণীকে দেখিয়া, তাঁহার সেই চিত্রের কথা বারে বারে মনে আসিতে লাগিল। তাহার বয়স সুকুমারীর সমানই হইবে। পরিধানে মলিন একখানা সাধারণ কাপড়, দেহে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্রও নাই—কেবল সধবার চিহ্ন হাতে একগাছি লোহা। সুকুমারী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন। কিন্তু সে যে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সে দৃষ্টি একবারও স্থানচ্যুত হয় নাই। বোধ হইতেছিল, যেন তাহার মন বাহিরে কোথাও নাই।

এমন সময় দেবেনবাবু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যে সিক্তবস্ত্রে আসিয়াছেন এবং সুকুমারী যে তাহার জন্য বস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সে কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখনও সেই রমণীর দিকে নিবদ্ধ। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দেবেন বাবু বলিলেন——

"অয়মহম্ ভোঃ!"

সুকুমারী চমকিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং নিজের অবস্থায় বড়ই লজ্জিত হইলেন। দেবেন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি শাপটাও দেব নাকি?

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমনসা——"

সুকুমারী তাড়াতাড়ি তাঁহার হাতে কাপড় খানা দিয়া ছোট ছোট করিয়া বলিল, "রক্ষা কর মুনিঠাকুর, কেন ব্রাহ্মণবাক্য বিফল কর্‌বে? এ পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম, এখানে ওসব উপদ্রবের ভয় নাই। তা যাক্, একটা খবর আছে। একটি স্ত্রীলোক এসে বসে আছে—সে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।"

"স্ত্রীলোক! কে?"

"তাকে চিনি না, তবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেম। বল্‌লে 'পতিতা'।"

"ওঃ নভেলিয়ানা—তবু রক্ষে।"

"আস্তে বল না। উপহাস নয়, সত্যই একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। বিশ্বাস না হয়, দেখ ঐ থামের পাশে।"

অঙ্গুলি দিয়া সুকুমারী দেখাইয়া দিল। দেবেন বাবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেখান হইতে তাহাকে দেখা যায় না—কিন্তু তাহার বস্ত্রের কতক অংশ দেখা যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তাই ত! চল, দেখাই যাক্ না ব্যাপার কি।" সুকুমারী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন সে মুখ আজীবন যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি পবিত্র সরল হাস্যদীপ্ত; নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন সেখানে অবিশ্বাসের একটি ক্ষীণরেখাও পড়ে নাই। তত্রাচ তিনি মনে মনে একটা উপন্যাসেরই আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র কথার ক্ষুদ্র এক অঙ্কে যে সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে—তাহা তিনি মনেও করিতে পারে নাই। সুকুমারী বলিলেন, "কাপড় ছেড়ে এস, তারপর শোনা যাবে। ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?"

দেবেন বাবু কাপড় পরিতে পাশের একটা ঘরে গেলেন। যাইবার সময় সুকুমারীকে বলিয়া গেলেন—"দেখ, কাশীতে অনেক রকম মেয়েমানুষ চোর বদমায়েস আছে। এ মেয়েমানুষটিরও কিছু মৎলব আছে—ওর দিকে একটু নজর রেখ।"

সুকুমারী তাহার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। সে যে তাহাকে চোর সন্দেহ করিয়া চাহিয়াছিলেন তাহা নহে। সে মুখ দেখিলে, সেরূপ সন্দেহ মনে আসিতে পারে না। তিনি ভাবিতেছিল এ কখনই পতিতা হইতে পারে না—এ পবিত্র দৃষ্টিতে অপবিত্রতা কোথায়? তাঁহার মনে হইতেছিল—কি যেন একটা অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য তার মধ্যে লুক্কাইত আছে।

দেবেন বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা দুইজনে স্ত্রীলোকটির নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

সুকুমারী বলিলেন—"উনি এসেছেন, তোমার কি বল্‌তে আছে এখন বল্‌তে পার।"

সুকুমারী দেখিলেন, স্ত্রীলোকটির সমস্ত শরীর যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল—তাহার রক্তহীন দশটি অঙ্গুলি যেন সবলে ঘরের মেজে চাপিয়া ধরিল। কতক্ষণ পরে সে এই মাথা তুলিল। মাথা তুলিয়া দেবেন বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর তাহার চক্ষে অতি আর্ত্ত—অতি করুণ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে

একটা অস্ফুট, মৃদু চীৎকার করিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সুকুমারী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন—দেখিলেন সে সংজ্ঞাশূন্য। খানিকটা জল আনিয়া তিনি তাহার চোখে মুখে দিতে লাগিলেন। প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোক মেলিয়া চাহিল এবং তাহার পর, যেন বিশেষ কিছুই হয় নাই, এমনই ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল—একটা তীব্র যন্ত্রণা তাহার সমস্ত মুখে মৃত্যুর কালিমা ঢালিয়া দিয়াছিল। অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিয়া সে বলিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন,—আমি ভুল করে আপনাদের এখানে এসেছি। আমি যাঁর জন্য এসেছিলাম, তিনিও গয়া হতে এসেছেন। তাঁর নামও আপনার স্বামীর নাম।"

ইহাই বলিয়া সে তেমনি নতদৃষ্টিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা যে কি তাহা সুকুমারী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঘটনার পর ৫।৭ দিন ধরিয়া ইহার নানাবিধ মীমাংসা চেষ্টাই হইয়াছিল। দেবেন বাবু স্থির করিলেন, মেয়েমানুষটি পাকা জুয়াচোর—সুবিধা করিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িল। সুকুমারী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—সে মুখ যে দেবার্চ্চনার ফুলটির মত পবিত্র!

(২)

দেবেন বাবুদের কাশী হইতে ফিরিবার সময় প্রায় হইয়াছে—আর ৩।৪ দিন মাত্র বাকি আছে। তখনও তাঁহাদের আদিকেশব দেখা হয় নাই। তাই তার পরদিন সকালে সকালে আহারাদির শেষ করিয়া, একখানি নৌকা করিয়া আদিকেশবের দিকে তাঁহারা রওনা হইলেন। সেখানে যখন পৌঁছিলেন, তখন বেলা প্রায় ১২টা। দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই—যাহা আছে তাহা দেখিতে আধ ঘণ্টাও লাগিল না। স্থানটি বড় নির্জ্জন। মন্দিরের নিকটেই একটা তেঁতুল গাছ, তাহার খুব ঘন ছায়া। বিশ্রামের জন্য তাঁহারা দুইজনে তাহার নীচে যাইয়া বসিলেন। গাছের ছায়ায়, অনতি দূরে একটি স্ত্রীলোক শুইয়াছিল। তাহার সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকা—কেবল মুখখানি অনাবৃত। তাহার মুখ দেখিয়া সুকুমারীর বারে বারে মনে হইতেছিল, তাহাকে যেন কোথায়ও দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু মনে আসিতেছিল না। ফিরিয়া যাইবার জন্য যখন তাঁহারা উঠিলেন, তখন সুকুমারী আর একবার সেই মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চাহিতেই স্ত্রীলোকটি অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহাকে ডাকিল।

সুকুমারী তাহার স্বামীকে বলিলেন, "ঐ মেয়েমানুষটি আমাকে ডাক্‌ছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি শুনে আসি কেন ডাক্‌ছে।"

দেবেন বাবু বলিলেন, "আমি না শুনেই বল্‌তে পারি কেন ডাক্‌ছে। 'কিঞ্চিৎ দেহি।'"

দেবেন বাবু সেখানে দাঁড়াইলেন, সুকুমারী তাহার নিকটে গেলেন। সে সুকুমারীকে বসিতে বলিল। সুকুমারী বসিলেন। নিকটে বসিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন স্ত্রীলোকটি কত রুগ্ন। শরীর অস্থিচর্ম্মসার, মুখে একটা ক্লান্তি ও গভীর অবসাদের ছায়া। মৃত্যু অনতিদূরে—কিন্তু সে মুখে মৃত্যুভীতি নাই। সে বলিল, "আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

বিদ্যুতের মত অতীত ঘটনা সুকুমারীর চক্ষের উপর দিয়া চমকিয়া গেল। এ ত "পতিতা!" কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন। সেই অপূর্ব্ব স্থৈর্য্য ভিন্ন, সে মুখে পূর্ব্বমাধুর্য্য কিছুই নাই।

সে বলিল, "দুইবার আপনার সঙ্গে দেখা হল। যদিও আপনি অপরিচিত, তবু সেই প্রথম দিন দেখেই, আপনাকে যেন আপনার লোক বলে মনে হচ্ছে।"

সুকুমারী উত্তর দিলেন না, কিন্তু মনে মনে বুঝিতে পারিলেন কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যা নহে। প্রথম দিন হইতেই তাহার দুঃখক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া সুকুমারী তাহার জন্য কেমন একটা অজ্ঞাত বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার জীবনের ইতিহাসটি জানিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতে-ছিলেন। প্রথম দিন হইতেই তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে উহার জীবনের এমন কিছু করুণ কাহিনী আছে যাহা নিত্য নিয়ত শুনিতে প্যাওয়া যায় না। সুকুমারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বলিলেন, "প্রথমবার দেখা হলে তুমি 'পতিতা' বলে পরিচয় দিয়েছিলে—এ পরিচয় অপেক্ষা মেয়েমানুষের বেশী অপমানের কিছু নাই। তবু যে তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে কেন এমন লাঞ্ছিত করেছিলে, তা আমি আজও বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু পতিতা বলে তোমাকে একবারও মনে করতে পারি নাই।"

সে তাহার জ্যোতির্হীন চোক্ দুটি তুলিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিল—যেন চোখের দুটি পল্লব একটু আর্দ্র হইয়া আসিল। শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া দিল—সুকুমারী সস্নেহে, হাতখানি আপনার দুই হাতের মধ্যে রাখিলেন।

সে বলিল, "এই বিশ বৎসর কাশীতে আছি, এই বিশ বৎসর ধরে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত বিশ্বেশ্বরের নিকট ভিক্ষা করেছি, যেন আমার জীবনের

কাহিনীটি বলে মরতে পারি। লোকে ইহকালের, পরকালের কত নিবেদন তাঁকে জানাচ্ছে, কিন্তু আমি কেবল জানিয়েছি—হে দেবতা! যেন আমার অন্তরের বোঝা নামিয়ে যেতে পারি। কিন্তু যাঁকে বল্‌ব বলে, এই বিশ বৎসর অহল্যা পাষাণীর মত অপেক্ষা করে আছি, তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া আমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু কাউকে না বলে, এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমি মর্‌তেও পার্‌ব না। তাই বুঝি বিশ্বেশ্বর অবশেষে তোমাকে পাঠিয়েছেন—তোমাকেই আমার অদৃষ্টের কথা বলে যাব,—কেননা আজ যদি না বলি, তা হ'লে বুঝি আর বল্‌বার সময় থাকবে না। জগতে একজন লোকও আমার অপরাধের বিচার করে দেখবে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"যাঁদের কোলে বড় হয়েছিলেম তাঁরা কেউ নাই। যিনি দয়া করে ঘরে নিয়েছিলেন, তিনি অতি ঘৃণিত বলে ত্যাগ করেছেন। আজ বিশ বৎসর এই লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে পড়ে আছি—এই বিশ বৎসর কারো স্নেহের কথা শুনি নাই। আর বেশী দিন নাই—হয়ত দুই এক দিন। কিন্তু দিদি—"

"দিদি" বলিয়াই সে সুকুমারীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে দিদি বলিয়া ডাকতে দাও। আজ আমার সমস্ত ব্যর্থ জীবনের উপেক্ষিত ভালবাসা একজন আপন লোক পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তুই যেই হও—তা আমি জান্‌তে চাই না, কিন্তু তোমার কথায়, তোমার স্বরে, আমার ক্ষুধিত অন্তর জেগে উঠেছে, তোমাকে আমার জীবনের শেষ আশ্রয় বলে মনে হচ্ছে। একটি দিন শুধু একটি দিন একজনকে আমার আপনার বলে মনে কর্‌তে দাও।"

সুকুমারী বলিল, "সে কি বোন্, দিদি বল্‌বে তাতে আর দোষ কি? আজ হতে আমি তোমার দিদি।" সে সুকুমারীর হাত ধরিয়া একটু টানিল—সুকুমারী আরও কাছে গেল। সে তাহার মাথাটি সুকুমারীর কোলের উপর রাখিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—

"আমার বাবা পাবনায় মোক্তার ছিলেন। আমি যখন কেবল দুই বৎসরের তখন মা মারা যান। বাবা আর বিয়ে কর্‌লেন না। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার বিধবা পিসীমা আমাকে মানুষ কত্তেন। আমার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তিনিও মারা গেলেন। তখন আমি অনেক সময় রাধারাণীদের বাড়ীতেই থাকতাম। রাধারাণীদের বাসা আমাদের বাসার লাগা। রাধা আমার ৩।৪ বৎসরের বড়—সে আমাকে বড় ভালবাসত। বাস্তবিক বল্‌তে

গেলে তাদের বাড়ীতেই আমার জীবনের আরও তিন বৎসর কেটে গেল। এর মধ্যে রাধার বিয়ে হয়ে গেছে। সে কখনো আসে—দুই এক মাস থাকে, আবার শ্বশুর বাড়ী চলে যায়। একবার শ্বশুর বাড়ী হতে এসে সে আমাকে "সই" বলে ডাকৃতে আরম্ভ করল। তার "সই" ডাকটি আমার বেশ ভাল লাগ্‌ত। বেশী কথা বলা আমার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং হঠাৎ এই সই পাতানোর কারণ জিজ্ঞাসা না করে, আমিও তাকে সই বলে ডাকতে আরম্ভ করলেম। রাধার কিন্তু সই পাতানোর কারণটা বলবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল। সে আমাকে বল্‌ত—'তোকে কেন সই ডাকৃতে আরম্ভ করেছি জানিস, কমল ?"

আমি বলিলাম—"না"।

সে বলিল, "শোন্‌। আমার রাধা নামটা তাঁর একেবারেই অপছন্দ—কমল নামটা তাঁর খুব পছন্দ। সেই জন্য তিনি আমাকে এখন 'কমল' বলে ডাকৃতে আরম্ভ করেছেন। এখন বুঝলি কেমন করে সই হলি ?"

রাধা দুই হাত দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। সে যে কত সুখী, তা তার হাসিভরা মুখ দেখেই বুঝতে পার্‌তেম।

সেই তিন বছর পরে আমারও বিয়ে হল। আমার বিয়ে বাবা মনের মত ঘর বর দেখেই দিলেন। তবে আমার শ্বশুর শাশুড়ী কেহই ছিলেন না। বিয়ের পর দুইটি বৎসর কেটে গেল—একজনের স্নেহ ও আদরে বাল্যজীবনের সকল দুঃখ ভুলে গেলাম। তখন বুঝতে পারলেম, রাধার চোখে মুখে কেন এত আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোত। রাধার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বেশী হল। আমার স্বামী যতগুলি চিঠি লিখতেন, রাধা তার সব গুলি, জোর করে নিয়ে পড়্‌ত। একদিন আমি বল্‌লেম—'সই, তুমি জোর জুলুম করে আমার চিঠিগুলি পড়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার নিজের একখানা চিঠিও দেখালে না।'

রাধা বল্‌লে—'আয়, তোর দুঃখটা মিটিয়ে দেই।' এই বলে সে তার হাত বাক্স খুলে দুই তিন খানা বাঁধান বই বের কর্‌ল। আমি বললেম—'এ সব কি ?'

সে বল্‌লে,—'ভাই, নাটক বল, নভেল বল, মাসিকপত্রিকা বল, এই আমার সব। এ বই ছাড়া আমি অন্য বই পড়ি না। এত ভাল বই কি আর কেউ লিখ্‌তে পারে ?'

দেখিলাম, রাধা তার স্বামীর এক এক বৎসরের চিঠিগুলি বেশ করে বাঁধিয়ে এক একখানা বই করে রেখেছে, তার পর দুখানা চিঠি বের করে—আমাকে

দিয়ে বল্‌ল—দেখিস্ সই, আমার বর্ত্তমান বৎসরের বইএর দু'খানা পাতা যেন হারিয়ে ফেলিস্ না। পড়ে ফিরিয়ে দিস্—খুব সাবধান করে রাখিস্। আমি চিঠি দু খানা নিয়ে এলাম। কিন্তু সে যে কি কুলগ্নে নিয়ে এলাম, তা ভগবান জানেন। দিদি! সকলে বলে, মিথ্যা নাকি টেকে না, কিন্তু কতদিন—কত বৎসর গেল, আজীবন কেঁদে কেঁদে মৃত্যুর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তবু এত বড় যে, একটা মিথ্যা, সে যে নির্ম্মম নিঠুর পাষাণের প্রাচীরের মত আমাকে ঘিরে রয়েছে। আমার সমস্ত জীবনের ব্যর্থ চেষ্টা তাকে ভেদ করতে গিয়ে, কেবল আরও আহত হয়ে ফিরে আস্‌ছে। সে কথা যাক্। চিঠি দুখানা বাড়ী এনে পড়ে দেখলেম—তার পর আমার কাপড়ের বাক্সের তলায় পাতা খবরের কাগজ খানার নীচে গুজে রেখে দিলাম। আজ দিই—কাল দিই করে, চিঠি দুখানা ফিরিয়ে দিতে দেরী হয়ে গেল। শেষে আমিও ভুলে গেলাম, রাধাও বুঝি ভুলে গিয়েছিল—কেননা সেও আর তাগাদা করে নাই। তার কয়দিন পরে আমি শ্বশুর বাড়ী চলে গেলাম—চিঠি দুখানাও আমার সঙ্গে গেল। আরো এক বৎসর কেটে গেল—তাঁর স্নেহ, আদর, ভালবাসায় বৎসরটা একটি মধুর স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন কি জানি, সে স্বপ্নের শেষ এমনি করে হবে!

হঠাৎ একদিন খবর এল বাবা মরণাপন্ন কাতর। আমি সেই দিনই পাবনা চলে গেলাম। সঙ্গে কিছুই নিলাম না—কেবল চিঠির কাগজ ও খাম সমেত হাত বাক্সটা নিলাম। আমার স্বামীর ও আমার চাবি এক রিংএ থাকত। আমি কেবল হাত বাক্সের চাবিটা বের করে নিয়ে, চাবির গোছাটা তাঁকে দিয়ে গেলাম। বাবার ব্যারামের সংবাদ পেয়ে যাচ্ছি—তবু তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার মন এগোচ্ছিল না—আমি চোখের জল রাখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি আদর করে চোখের জল মুছিয়ে বল্‌লেন—"কমল! যদি তোমার দেরী হয়—তা হলে আমি তোমাদের ওখানে যাব।" তার পর সস্নেহ-চুম্বন করে বিদায় দিলেন। দিদি, এ জীবনে সেই শেষ বিদায়—সেই দিন হতে সব শেষ!

তাহার মৃত্যুক্লিষ্ট গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

"বাবার ব্যারাম সারতে প্রায় একমাস লাগ্‌ল। এই একমাস রোজ তাঁর চিঠি পেতাম। শেষ চিঠিতে তিনি লিখলেন 'কমল! তুমি একমাস হলো গেছ—আমার এখানে একা একা আর ভাল লাগে না। সামনের সপ্তাহে আমি

তোমাদের ওখানে যাব। আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, আমি কেবল তাঁর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলাম।

"সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু তিনি এলেন না। রোজ তাঁর যে একখানা করে চিঠি পাই—তাও পেলাম না। আমি অস্থির হয়ে উঠলেম। অজ্ঞাত আশঙ্কা দিনরাত আমার বুকের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবার শরীরও তত ভাল হয় নাই যে, তাঁকে রেখে যেতে পারি। আমি নিরুপায় হয়ে তাঁকে লিখলেম, যদি ফেরত ডাকে তোমার পত্র না পাই, তা হলে আমি তোমাদের ওখানে চলে যাব।

"ফেরত ডাকে চিঠি এল—কিন্তু সে কি ভয়ানক চিঠি! সে চিঠি পাবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হলেই ভাল হত; সেই দিন হতে, মৃত্যুকে এত করে ডাক্‌ছি, কিন্তু সেও আমাকে ভুলেছে।

"চিঠিতে কোন পাঠ নাই। লিখেছেন—'তোমার কলঙ্কের ইতিহাস, যাহা অতি সংগোপনে রাখিয়াছিলে, উভয়ের মঙ্গলের জন্য তাহা আজ আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আজ হইতে আমরা উভয়েই মুক্ত এবং এ মুক্তিতে যে উভয়েরই মঙ্গল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এখান হইতে চলিলাম—কেন না এ গৃহে বাস করা অসম্ভব। পতিতা হইলেও তোমাকে গৃহহীন করিতে চাই না। যদি ইচ্ছা কর তুমি এখানে আসিয়া থাকিতে পার। লোক সমাজে তোমাকে ঘৃণিত করিবার ইচ্ছা আমার নাই। তোমার ঘৃণিত ইতিহাস তোমাকেই ফিরাইয়া দিলাম।"

"দেখি, চিঠির মধ্যে রাধার সেই দুইখানা চিঠি রয়েছে। প্রথমে কিছু অর্থ বুঝতে পারলেম না—সন্দেহ হল, এ চিঠি হয়ত আমার নয়। শিরোনামা আবার পড়ে দেখলেম, আমারি নাম রয়েছে। তাঁরি হাতের লেখা—সন্দেহ করবার কিছুই নাই। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার পায়ের নীচে হতে সরে যেতে লাগ্‌ল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত যেন উলট্‌ পালট্‌ হয়ে, আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরতে লাগ্‌ল। কতক্ষণ যে এমন করে গেল, তা জানি না। একটু সংযত হয়ে, চিঠিগুলি আর একবার পড়ে দেখলেম্‌। দেখি, রাধার চিঠিতে তার স্বামী তাকে 'কমল' বলে লিখেছে। তখন যেন আমার সম্মুখ হতে একটা অন্ধকার পর্দ্দা সরে গেল—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নটা কেটে গেল। আমার নিজের নামটাই যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছে, তা বুঝতে তখন বাকি থাক্‌ল না। এত কষ্টেও আমার মুখে হাসি এল, কিন্তু তারপর তাঁর

উপর বড়ই অভিমান হল। ছি! তিনি আমাকে এমন অপরাধে অপরাধী মনে করতে পারেন!

"আমি সব বুঝিয়ে তাঁকে পত্র লিখলেম, কিন্তু সে পত্র বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলেন। কয়েক দিন পরে আমার পত্র আমার বেদনার ভরা পূর্ণ করে আমার কাছে ফিরে এল। আমি বাবাকে বলে, তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ী গেলাম—সেখানে কেউ তাঁর ঠিকানা বল্‌তে পারল না। বাক্যের অতীত দুঃখ ও স্ত্রীলোকের চরম লাঞ্ছনা বহন করতে করতে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

"কত দিন—কত মাস—কত বৎসর গেল, তিনি ফিরে এলেন না,—সন্ধান, করে তাঁর কোন সংবাদও পাওয়া গেল না। প্রতিদিন প্রতিরাত্রি আমার অন্তরের বেদনা, সেই অন্তর্যামীকে জানিয়েছি, কিন্তু তাঁর দয়া হল না। এ লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে হলে যে কেমন পাষাণ হয়ে থাক্‌তে হয়, তা দিদি! তোমরা বুঝতে পারবে না। এ পাষাণের কাছে, মৃত্যুর সহস্র প্রলোভন, প্রতিদিন এসে, প্রতিদিন নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে—এ পাষাণের মর্ম্মকাহিনী তাঁকে না বলে মরতে পারি নাই। শেষে ঘরে বাস করা অসম্ভব হল—সেখানে তাঁহার সহস্র আদরের, অজস্র স্নেহের শত চিহ্ন, শত দিক হতে নীরব হাস্যে আমাকে উপহাস করত। উঃ! সে হাসিতে কি জ্বালা! গৃহত্যাগ করলেম—পাবনায় বাবার নিকট চলে গেলাম। তিনি সব জানতেন—চেষ্টাও অনেক করলেন; কিন্তু কোন ফল হল না। বাবাকে বল্‌লেম, "বাবা, আমি কাশী যাব।" আমার অবস্থা দেখে বাবারও সংসারের উপর বিতৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল। তিনি বল্‌লেন—"চল মা, দুজনে বিশ্বেশ্বরের পায়ে গিয়ে পড়ে থাকি।" সেই হতে এখানে আছি। আজ ৫ বৎসর হল. বাবাও ছেড়ে গেছেন—এ জগতে আমার সব থাক্‌তে, কেউ নাই। বিশ্বেশ্বর সব নিলেন।—কিন্তু বন্ধন কাটতে পারলেন না।"

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন হয়ে গেল, এর মধ্যে কি তাঁর কোন খবরই পাও নাই?"

সে বলিল—"১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার একটা জনরব উঠেছিল, যে তিনি আবার বিবাহ করে গৃহী হয়েছেন—কিন্তু দেশে আসেন নাই। কোথায় আছেন, তা কেউ বলতে পারে নাই। বাবা গেছেন—এখন আর অনুসন্ধান করবার কেহ নাই। তবে রাধারা দুজনে বরাবরই তাঁর খোজ কচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে

প্রথম দেখা হবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে রাধা লিখেছিল যে তিনি সপরিবারে গয়া গিয়েছেন—সেখান হতে কাশীতে যাবেন। কাশীর যে ঠিকানা দিয়েছিল—সে তোমাদের ঠিকানা। রাধারা ভুল করেছিল। তাদের দোষ নাই—কেননা, তোমার স্বামীর যে নাম, তাঁরও সেই নাম। যে দিন সেই ভুল ভেঙ্গে গেল, সেই দিন হতে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। এ জীবনে আমি তাঁর কাছে পতিতাই থেকে গেলাম! যদি দেখতে পেতাম তিনি আবার সংসারী হয়েছেন, তা হলে বুঝতে পাত্তেম, তিনি আমাকে ক্ষমা করলেন না। কিন্তু তিনি যে গৃহহীন হয়ে, কোথায় পথে পথে নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াচ্ছেন,—তাতেই এত দুঃখের মধ্যেও মনে হয় যে, এ 'হতভাগিনীকে হয়ত তিনি এখনও ভুলতে পারেন নাই। আশা যে কিছুতেই যায় না দিদি!"

এই বলিয়া সে সুকুমারীর কোল হইতে মাথা নামাইয়া লইল। বলিল—"যাও দিদি, তোমার স্বামী অনেকক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছেন। এ জীবনে আমার কাহিনী কাহাকেও বলব না মনে করেছিলেম—কিন্তু নীরবে এ কলঙ্ক নিয়ে মরতে পারব না, তাই তোমাকে বলে গেলাম। তোমার কি বিশ্বাস হল দিদি?"

সুকুমারী সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুমি সতী—তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌লে মহাপাতক হবে। কিন্তু তোমাকে এমন ভাবে আমি কিছুতেই রেখে যাব না। চল বোন্! আমাদের ঘরে চল।"

সে বলিল—"হয়ত এই মুহূর্ত্তে, এমনই অবস্থায় তিনিও কোন গাছের নীচেই পড়ে আছেন। না দিদি! আর ঘরের কথা বলো না।"

তাহার অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সুকুমারী তাহার মনের অবস্থা বুঝিল—'বুঝিল এ জগতে বিশ্বনাথ তাহার জন্য গৃহ রাখেন নাই। সে উঠিয়া দেবেন বাবুর নিকটে গেল। তিনি বসিয়া বসিয়া—ঢুলিতে ঢুলিতে শেষে সেইখানে চাদর বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সুকুমারী তাঁহাকে উঠাইল। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "নৌকায় চল—শুনবে।"

শ্রীকিশোরীলাল দাসগুপ্ত।

ব্যথায় শান্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে।)

ধরণীর সুখ হ'ল না আমার
করমফলের শাপে ;
অতুল বিভব হারাইনু হায়,
গত জনমের পাপে !
সুখের লাগিয়া যাহা প্রয়োজন
লভিয়া আপন করে,
হ'ল নাক ভোগ—নিঠুর নিয়তি—
লুটাই ধূলায় পড়ে।
ইহকালে সুখ নাহি যে ভরসা
আর যে তিলেক ভবে,
পরকালে সুখ আশার কুহকে
বেঁধেছি হৃদয় এবে !
যা' গিয়েছে যাক্, ধর্ম্মধনটুকু
রাখিব লুকায়ে বুকে,
তাহারি প্রভাবে যদি কোন দিন
সকল বেদনা চুকে।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

যৌবনের অভিশাপ।

আজিকে বরষাবাণী উড়ায় অঞ্চল
উচ্ছসিয়া উঠিতেছে জীবনের রস—
শিরায় শিরায় রক্ত হইল চঞ্চল
অনুভাবি অলকার পবন-পরশ।
ক্ষম আজি অধিকার প্রমত্ত যৌবনে
আজি তার অভিশাপ ফিরাইয়া লও
বসন্তের রক্তরাগোচ্ছসিত জীবনে
যেমন করিয়া প্রভু ক্ষমা করি লও।

কুন্দকুঞ্জে ভ্রমরেরে, বসন্তে কোকিলে
ক্ষমিতেছ দ্রোহ-মোহ আকুল তৃষায়—
নিত্য তুমি উদ্দামতা সহিছ নিখিলে
যৌবনের অভিশাপ ফিরাবে না হায় !
পরধনে নাহি লোভ মত্ত স্বাধিকারে
প্রচুরাত্মবোধ আহা ক্ষমা কর তারে !

শ্রীকালিদাস রায়।

সংসার ও সন্ন্যাস।

---*---

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——o——

সম্মুখের দরজায় বাহির হইতে আঘাত আরম্ভ হইতেই যেন নির্দ্ধারিত সঙ্কেত অনুসারে পিছনের দরজায়ও বাহির হইতে প্রবল আঘাত পড়িতে লাগিল। গেরাডের পলায়নের আর উপায় নাই—চতুর্দ্দিকেই তাহারা শত্রু-দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিপদ এইরূপ ভীষণমূর্ত্তিতে দেখা দিতেই যেন মার্গারেটের চিত্তের স্থিরতা ও বুদ্ধির প্রখরতা ফিরিয়া আসিল। সে মার্টিনের কাণে কাণে বলিল, "ইহাদিগকে বলিও যে গেরাড এখানে ছিল বটে, কিন্তু চলিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে গেরাডকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া প্রথমেই তাহার পিতার ঘর, তাহার পিছনেই তার নিজের থাকিবার ঘর।

এদিকে বাহির হইতে দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল।

মার্টিন তখন ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে দরজায় ঘা দেয় কে গো?"

"খোলনা—খুলিলেই দেখিতে পাইবে।"

"চোর'ডাকাতের কথায় দরজা খুলিতে পারি না—ভাল মানুষ কি আর এত রাত্রিতে পরের দরজায় ঘুরিয়া বেড়ায়?"

"মার্টিন্ উইটেগেন্। আমরা আদালতের আদেশে আসিয়াছি। দরজা খোল, নচেৎ সাজা পাইবে।"

"কে-ও? ডিরিক্ বুয়ারের গলা শুনি যেন? তা—এত রাত্রিতে—সেই টরগো হইতে এত দূরে কি মনে করিয়া হে?"

"আরে ছাই—খোলই না শুনিবে এখন।"

মার্টিন তখন বেশ ধীরে ধীরে দরজার খিল খুলিয়া ফেলিল, অমনই ডিরিক ও চারিজন সহচর বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পিছনের দরজা খুলিয়া তাহারা সঙ্গীদেরও ভিতরে আনিল।

আগে ডিরিক্ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর মার্টিন, বণিক্ এলিসের পুত্র গেরাড কোথায়?"

মার্টিন যেন বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "ও—এই কথা। তা সে ত এখানেই ছিল—এই কতকক্ষণ হয় চলিয়া গেল।"

ডিরিকের মুখ বিবর্ণ হইল, সে বলিল "আঁ! সে কি? আরে কোথায় গেল?"

"শুনিলাম সে না কি ইটালী দেশে যাইবে—তা ভাই! ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

"আরে কিছু না—কিছু না! ছোঁড়া কখন গেল বল ত? এই ঝড় বাদলের মধ্যেও কি আর কেউ অত দূরে যাত্রা করে?"

"গেরাডকে নিয়া এত কাণ্ডকারখানা তা কে জানে বাপু"—মার্টিন এই কথাগুলি যেন নিতান্ত বিরক্তির সহিত বলিয়া ধীরে ধীরে প্রদীপটি জ্বালিল এবং একখানি আসনে বসিয়া রেশমী সূতার একটি গুটি লইয়া ধনুকের জ্যাতে যেখানে তীর বসাইতে হয় সেখানে জড়াইতে জড়াইতে বলিতে লাগিল; "তা বাপু আমি যা জানি শোন।—গেরাডের যে একটা বামনবীর ভাই আছে—গাইল বুঝি তার নাম—জান ত? সেই ছোঁড়াটা একটা অশ্বতরে চড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে এখানে আসিয়া তার ভাইকে কি বলিল। আমি একটু দূরে ছিলাম কিনা, কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলাম না। সে যাই হউক—গেরাডছোঁড়াটাও তাঁর কথা শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। ভাইটা চলিয়া যাইতেই এদিকে ত খুব কান্নাকাটি আরম্ভ হইল—দুইজনে একবার গলা ধরিয়া কাঁদে—একবার চুমো খায়—এই রকমে খানিকক্ষণ ত কাটিয়া গেল। তারপর দেখি ছোঁড়াটা একটা ব্যাগ হাতে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। পরে শুনিলাম সে নাকি ইটালী যাইবে। তা বাপু—ইটালী কোথায়—কত দূরে—অত শত আমি জানি না। তোমরা হালের লোক—জানিতে পার।"

ডিরিক্ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দেখ ভাই সব! এ বুড়ার কথাই আমার ঠিক মনে হয়। আমি তখনই নগরপাল মহাশয়কে বলিলাম, এ চেষ্টায় কোনও লাভ নাই। তিনিই ত সেই বামনটাকে পিটার বিস্কিনের অশ্বতরে চড়িয়া সেভেনবাগের পথে ফিরিতে দেখিয়াছিলেন। তাই দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, ও ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই গেরাডকে সতর্ক করিতে গিয়াছিল, অতএব গেরাড সেভেনবাগেই আছে। আমি বলিলাম, মহাশয় তাই যদি হয়,

তবে এতক্ষণে পাখী উড়িয়াছে। আমাদের সেভেনবাগের কথা আগেই মনে করা উচিত ছিল, মিছামিছি সমস্ত বেলা টরগো সহরের যত আস্তাকুঁড় আর যত নর্দ্দমা ঘাঁটিয়া নষ্ট করিলাম। ও ছাইপাঁশ চর্ম্মপটগুলি যে মানুষে নিয়াছে” তাকে ধরিতে না পারিলে আর পাওয়া যাইবে না। যদি ওই বামনটা সেভেন-বাগে তাকে খবর দিতেই গিয়া থাকে—তবে সে ত এতক্ষণে বহুদুরেই চলিয়া গিয়াছে। আর ওই ছুঁড়ীটা কি দমবাজ—আঁা—এতগুলি গোঁপ দাড়িওয়ালা মরদ আমরা—ছুঁড়ীটা বেমালুম মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া ঠকাইল?—তা বাপু, আমি সব কথাই বুঝাইয়া বলিলাম। কিন্তু নগরপাল কি আর এসব যুক্তির কথা শোনেন?—এখন আর কি? বৃষ্টিতে ভেজাই আমাদের সার হইল।”

মার্টিন ডিরিকের দিকে চাহিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিল।

ডিরিক একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, “তা দেখ—চল, যাওয়ার আগে একবার সব ঘরগুলি দেখিয়া যাই, নহিলে নগরপালের মনের সন্দেহ মিটিবে না।”

এই কথা বলিতেই মার্টিনের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; ডিরিক তাহা লক্ষ্য করিল এবং একটু ভাবিয়া বলিল, “তোমরা দুইজনে দুইদিকের জানালার নীচে দাঁড়াও, দেখিও যেন কেহ উপর হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া না পালায়, আর সকলে আমার সঙ্গে চল।”

এই কথা বলিয়া ডিরিক আলোটি লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, আর তিনজন সহচর পশ্চাতে চলিল।

মার্টিন একাকী ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল। মানসিক উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধ সৈনিকের শির অবনত হইয়া পড়িল। হায়! হায়! এতক্ষণ ত একরকম ভাল ভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল—এখন যে চরম সঙ্কট উপস্থিত। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, এখনও আশা আছে। গেরাড হয় পিটারের না হয় মার্গারেটের ঘরে আছে। কোনও ঘরের জানালাই মাটি হইতে বেশী উচু নয়। আচ্ছা, গেরাড যদি জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িতে পারে! সেখানে একজন রক্ষী বই আর ত বেশী লোক নাই! অন্ততঃ আধ মিনিট পর্য্যন্ত তাহারা থাকিবে। দুইজন বিরুদ্ধপক্ষে মাত্র একজন প্রহরী—সেই আধ মিনিটের মধ্যেই কি না করা যাইতে পারে?

মার্টিন পিছনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

উপরে পিটারের ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখা গেল। মার্টিন ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আঃ! ছোঁড়াটা কি বোকা—আলোটাও নিভায় নাই!"

কিছুক্ষণ পরেই আলোটি মার্গারেটের ঘর হইতে দীপ্তি পাইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ উপরের জানালা খুলিল না। জানালার পথে পালাইতে হইলে গেরাড কিছু আর এতক্ষণ বিলম্ব করিত না—মার্টিনের মনে একথা উদয় হইল। সে ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইল ও উৎকর্ণ হইয়া উপরে কোনও শব্দ হয় কি না শুনিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সবই নীরব। তখন তাহার মনে হইল তবে ডিরিকের লোকেরা যখন নীচে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, সেই সময়ই হয়ত গেরাড পালাইয়াছে। যতই সময় যাইতে লাগিল, মার্টিনের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই তাহার এই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অকস্মাৎ মার্গারেটের ঘর হইতে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি শোনা গেল। মার্টিনের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একটি কাতর ধ্বনি নির্গত হইল,—"হায়! হায়! তবে গেরাড ধরাই পড়িল!"

তখন স্নেহকাতর বৃদ্ধ সৈনিকের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া একটি চিন্তার উদয় হইল,—যদি গেরাডকে ইহারা ধরিয়া লইয়া যায়, তবে আর তার প্রাণের আশা নাই—আর গেরাড না বাঁচিলে মার্গারেটও বাঁচিবে না।

রোষে ও ক্ষোভে ব্যাধপরিবেষ্টিত শার্দ্দূলের ন্যায় সে তখন ভীষণভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উপায়বিহীন হিংস্র জন্তুর ন্যায় সেই বিপদ জালে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধ সৈনিক সেই নিষ্ঠুর যুগেরই উপযোগী এক অতি ভীষণ সঙ্কল্প অচিরেই স্থির করিল। সে প্রত্যেক দরজার নিকটে যাইয়া ডিরিকের স্বর অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক রক্ষীকে বলিল—"জানালার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিও।" তারপর দুইটি দরজাই ভাল করিয়া বন্ধ করিল। ধনুকখানিও ছয়টি তীর বাছিয়া লইল ও সিঁড়ির পার্শ্বে একখানি চেয়ারের উপর একখানি ছোরা খুলিয়া রাখিয়া দিল।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে একটি তীর ধনুকে যোজনা করিল ও অপর পাঁচটি পার্শ্বস্থিত তূণীরে রাখিয়া দিল, এবং এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া সে রক্ষীবর্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে সঙ্কল্প স্থির করিল যে চারিজন রক্ষীকে যে রূপেই হউক শমন সদনে পাঠাইয়া গেরাডকে রক্ষা করিতে হইবে। অগ্রবর্ত্তী দুইজনের ব্যবস্থা প্রথম দুইটি তীরেই হইবে। তারপর যে দুইজন থাকিবে, তাহারা যদি এই অতর্কিত আক্রমণে একটুও বিচলিত

হইয়া পড়ে, তবে সেই অবসরে আরও একটি তীর চালাইবার সময় পাওয়া যাইবে। তখন শত্রু বাকী থাকিবে একটি—আর তাহারা থাকিবে দুইজন। আর যদি সে অবসর নাও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও উভয় পক্ষই সমান থাকিবে—ফলাফলের জন্য অবশ্য অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে—তা হউক !

বেশীক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। মার্গারেটের ঘরের দিক হইতে কাহার পদশব্দ শোনা যাইতে লাগিল—শব্দ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল।

ক্রমে আলোকরশ্মি দেখা দিল—মনুষ্যকণ্ঠও শোনা গেল।

মার্টিনের বীরহৃদয়ও দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যাহারা আসিতেছে তাহারা জানেনা যে মৃত্যুর বিবরে পা বাড়াইতেছে, আর মৃত্যুর করাল গ্রাসে যে আজ মার্টিনকেই যাইতে হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ? শত্রুপক্ষে চারিজন—সে একাকী,—হয়ত গেরাড পাশবদ্ধ থাকিবে কোনও সাহায্যই করিতে পারিবে না। তারপর যুদ্ধক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ।—৩।৪ হাত মাত্র পরিসর। এরূপ যুদ্ধের ফলাফল নিতান্তই অনিশ্চিত। কিন্তু যে বৃদ্ধকে আমরা ভূতের আলোর ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়াছি, এই আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও তাহার হৃদয় একবারও বিচলিত হইল না। সে সতর্ক হস্তে উদ্যত অস্ত্র লইয়া স্থির সঙ্কল্পে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আসন্ন যুদ্ধের জন্য তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে যেন জ্যোতি ঠিকরিয়া বাহির হইতে লাগিল—জীবন নিতে কি জীবন দিতে তুল্য ভাবেই যেন সে প্রস্তুত! আর যে অসম সাহসিক কার্য্যে সে অগ্রসর হইতেছে—তাহার পরিণাম ?—জয়লাভে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসন—পরাজয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু !

এদিকে ডিরিক্ বুয়ার ও সঙ্গিগণ প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বৃদ্ধ পিটার নিদ্রা যাইতেছেন। তাহারা ঘরখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—আলমারী দেরাজ সব খুলিয়া দেখিল—এমন কি দেয়ালে একটা কার্পাসপূরিত কুমীরের চামড়া ছিল—দেখিতে ঠিক কুমীরের মত—ছুরি দিয়া তারও পেট চিরিয়া দেখিল, গেরাড সেখানে আছে কি না,—কিন্তু গেরাডের কোনও সন্ধান মিলিল না।

তারপর তারা মার্গারেটের ঘরে গেল, ঘরখানি বড়ই ছোট বিশেষ কোনও আসবাব পত্রও তাতে নাই,—দেখিলেই মনে হয় কাহারও লুকাইয়া থাকিবার মত স্থান এ নয়। ঘরের আসবাবের মধ্যে বড় একটি চুল্লি—ঘর গরম করিবার জন্য

শীতকালে তাহাতে আগুণ জ্বালা হয়, আর তাহার উপর হইতে ধূম নির্গমের বড় একটি চিমনি উঠিয়াছে। আর একটি লম্বা কাঠের বাক্স—মেজে হইতে এক ফুটের বেশী উচু হইবে না—তার উপরে অতি শুভ্র একখানি শয্যা বিস্তৃত এবং তদুপরি সেভেনবাগের বিখ্যাত রূপসী মার্গারেট ব্রাণ নিদ্রিত। সেই সামান্য ঘরখানির মধ্যে এই অসামান্য সুন্দরীকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন একটি প্রস্ফুটিত শতদল পথের ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ক্ষণকাল পরেই মার্গারেটের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল,—সে যেন নিতান্ত সন্ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া বসিল এবং চারিদিকে চাহিয়া এতগুলি লোক দেখিয়া যেন দস্যু তস্করের ভয়ে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিতান্ত মিনতি সহকারে তাহাদিগের দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

মার্গারেটের ভাব দেখিয়া ডিরিক বুয়ারও স্বীয়কৃত কার্য্যের জন্য নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

ডিরিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ব্যাপার এমন কিছু নয়, তোমার কোন ভয় নাই। ওগো সুন্দরি! তোমার কোনও অনিষ্ট আমরা করিব না। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাও, আর বিবাহ রাত্রির সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাক। আমরা একবার এই চুল্লিটা একটু খুঁজিয়া দেখিব, গেরাড ইহার মধ্যে লুকাইয়া আছে কি না।"

মার্গারেট যেন ক্ষোভে ও অপমানে উত্তেজিত হইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "সে কি! গেরাড আমার ঘরে!"

"কেন দোষ কি? লোকে বলে গেরাড ও তুমি—"

"নিষ্ঠুর! আবার পরিহাস করিতেছ? তুমি ত খুবই জান, তোমাদের অত্যাচারেই সে আমাকে ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর কেন? ও সব কথা তোমার ছলনা মাত্র। তোমরা সব চোর—তোমরা নিতান্ত দুষ্ট লোক। সেভেনবাগের লোক হইলে মার্গারেট ব্রাণকে ভালরূপেই জানিতে,—তা' হইলে আর তার প্রণয়ীকে খুঁজিতে রাত্রিকালে তাহারই ঘরে আসিতে না। কি বীর পুরুষ সব! চারিটা হাতীর মত মরদ অস্ত্রে শস্ত্রে সাজিয়া আসিয়াছেন একটি অসহায় ভদ্রলোকের মেয়েকে অপমান করিতে। ওগো! তোমাদের ঘরের মেয়েরা বুঝি ঐরূপ চরিত্রেরই লোক! যদি তাহারা ভাল হইত, তবে তাদের প্রতি তোমাদেরও শ্রদ্ধা থাকিত,—আর তাহা হইলে একটি সুচরিত্রের মেয়েকে এরূপ ভাবে তোমরা অপমান করিতে আসিতে না।"

ডিরিক ত্রস্তভাবে একবার চুল্লিটির ভিতরে দেখিয়া দ্রুতপদে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ওরে তাড়াতাড়ি বাহিরে আয়—এবার মেয়েলী মুখ ছুটিয়াছে—ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইবে। মেয়ে লোকের জিহ্বার মত ধারাল অস্ত্র আর কিছু নাই। আর সে দুধের মেয়েটি হইলেও মায়ের মুখের ঝাঁজ তাতে থাকে।" এই বলিয়া ডিরিক সদলবলে ত্রস্তপদে অন্তর্দ্ধান হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অভিনয়পটু নয় এমন স্ত্রীলোক কে আছে? আর প্রয়োজন হইলে প্রণয়ীর জীবন রক্ষার্থে সুচারুরূপে অভিনয় করিতে পারে না, এমন স্ত্রীলোকই বা কে আছে? প্রকৃতিদেবী অবলা নারী জাতির প্রতি এ বিষয়ে একান্তই সদয়া। বিপদে পড়িলে নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির স্ত্রীলোকও নিতান্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি পুরুষের চক্ষে অনায়াসে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে।

ডিরিকের দলবল চলিয়া যাইতেই মার্গারেট ত্রস্তভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া নীচে দাঁড়াইল ও ক্ষিপ্রহস্তে শয্যার উপকরণগুলি সড়াইয়া বাক্সের ডালাটি খুলিল। সন্ধ্যার বেশ ভুষা তখনও তাহার পরিধানে রহিয়াছে। তবে বিছানায় শুইবার উপযোগী একটি কামিজে সে সকলই ভাল করিয়া ঢাকা রহিয়াছে। বেচারী ডিরিক ইহা আদৌ বুঝিতেই পারে নাই। তারপর মার্গারেট চুপি চুপি দরজার নিকটে গিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, আগন্তুকগণের পদশব্দ তাহার পিতার ঘরের পার্শ্ব দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল। সেই লম্বা কাঠের বাক্সটির একটি বিশেষত্ব ছিল, যাহা নূতন লোকের চক্ষে ধরা পড়িবার মত নহে। ঘরের মেজেটির কাঠের ছাউনি কিছুকাল পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে গেরাড তাহার মেরামত করিয়া দেয়। কয়েকখানি কাঠের ফলক প্রয়োজন হওয়ায় গেরাড দেয়ালের পাশের কয়েকখানি কাঠের ফলক তুলিয়া নিয়া কাজ চালায়, এবং বাক্সটি সেই ফাঁকে নীচের কড়ির উপর বসাইয়া দেয়। বাক্সটির অর্দ্ধেক এইরূপে কাঠের মেজের নীচে বসিয়া যাওয়াতে বাহির হইতে মেজের উপরে মাত্র বাক্সটি এক ফুট উঁচু বলিয়াই মনে হইত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাক্সটি ভিতরে দুই ফুট গভীর ছিল।

যখন চতুর্দ্দিকে সকলই নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, তখন মার্গারেটের উৎকণ্ঠা দূর

হইল। সে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে কিছুক্ষণ ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া বাক্সটির পার্শ্বে বসিল ও মাথা নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "গেরাড।"

কেহই সাড়া দিল না।

তখন মার্গারেট আরও একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিল "গেরাড! এখন তুমি নিরাপদ ওঠ। কিন্তু সাবধান। বেশী শব্দ যেন হয় না।"

তথাপি গেরাড নিরুত্তর।

মার্গারেট শঙ্কিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "অ্যাঁ!—এ কি—কি হইল!!"

উদ্বেগকম্পিত হস্তে মার্গারেট উন্মাদের ন্যায় বাক্সের অভ্যন্তরে শায়িত গেরাডের মুখে বুকে বার বার স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার মাথা ধরিয়া ঝাঁকি দিল, ঈষৎ উঠাইয়া বসাইল—কিন্তু হাত ছাড়িয়া দিতেই গেরাডের অবসন্ন দেহ আবার শয্যায় গড়াইয়া পড়িল। তখন তাহার হৃদয়ে একটি ভয়ানক আশঙ্কার উদয় হইল। বাক্সের ডালা বন্ধ ছিল—উপরে সে শুইয়া ছিল - রক্ষীরাও কতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছিল। তবে কি—মার্গারেটের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল! সে উন্মাদের ন্যায় অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগে গেরাডের দেহ বাক্সের মধ্য হইতে তুলিয়া জানালার নিকটে নিয়া শোয়াইয়া দিল ও জানালা খুলিয়া ফেলিল। বাহির হইতে স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণের প্রবাহ আসিতে লাগিল, উন্মুক্ত গবাক্ষপথে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ আসিয়া গেরাডের মুখের উপর পড়িল। আঃ—কি সুন্দর সেই মুখখানি!—কিন্তু কৈ—সে মুখের সেই লাবণ্য কই! এ যে মৃত্যুর নীলিমায় সমস্ত মুখ ছাইয়া গিয়াছে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় নির্জীব! মার্গারেট গেরাডের বক্ষে হাত দিয়া দেখিল—কাণ পাতিয়া শুনিল—কই হৃদ্‌পিণ্ডের একটু স্পন্দনও লক্ষ্য হইল না। সর্ব্বনাশ! তবে গেরাড আর জীবিত নাই—মার্গারেটের শরীরের চাপেই গেরাডের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে! মানুষের মনে এইরূপ আকস্মিক বিপদের উপলব্ধি সহজে হয় না। মার্গারেটের মনে হইল, পাঁচ মিনিটও হয় নাই—সবল সুস্থ দেহ গেরাড এই বাক্সের ভিতরে যাইয়া লুকাইল, আর এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল—এও কি হয়!

তাহার কল্পনায় যেরূপ আসিল—কত সুমিষ্ট প্রণয় সম্ভাষণে সে গেরাডকে ডাকিতে লাগিল—কতবার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—কতবার তাহাকে চুম্বন করিল। মান, অভিমান, সোহাগ-প্রণয়ের কত ভাবে সে

গেরাডকে একটিবার কথা বলিবার জন্য কত অনুরোধ করিতে লাগিল।—কিন্তু গেরাড নিরুত্তর!

গেরাডের প্রতি এরূপ প্রগল্‌ভ ব্যবহার পূর্ব্বে সে কখনও করে নাই। প্রকৃতিস্থ থাকিলে এরূপ আচরণ সে যে করিতে পারে তাহা তাহার কল্পনায়ও আসিত না। কিন্তু এরূপ শত চেষ্টা করিয়াও যখন গেরাডের একটি প্রত্যুত্তরও সে পাইল না, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বিলাপ করিতে করিতে গেরাডের মৃত্যুচ্ছায়া-মলিন মুখখানির উপরে ঝুঁকিয়া নানাবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে লগিল।

"গেরাড! গেরাড! তুমি আর নাই! আমিই তোমাকে প্রাণে মারিলাম! কি যে আমার এই অসহনীয় দুঃখ কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর—একবার বল মার্জ্জনা করিলে। হায়! হায়! রক্ষীরা তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইত—সেও যে ভাল ছিল—কেন আমি বাধা দিলাম? গেরাড! আমার এ দারুণ অপরাধ ক্ষমা কর!"

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অকস্মাৎ মার্গারেট যেন ক্ষিপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "না—না—এও কি কখনও হয়? তবে কি বিশ্বসংসারে ভগবান কেহ নাই?—এ যে একেবারেই অসম্ভব! আমার গেরাড কেন মরিবে? আমি কি আমার গেরাডকে মারিতে পারি? আমি যে তাকে কত ভালবাসি—কত ভালবাসি! হে ঈশ্বর! তুমি সাক্ষী, তুমি ত জান আমি তাকে কত ভলবাসি! সেও জানিত না।—আমি ত তাকে জানিতেও দিই নাই। সে যদি আমার এত ভালবাসার কথা জানিত তবে কি আজ আমার এত অনুনয় বিনয়ে একটি উত্তরও না দিয়া থাকিতে পারিত? না না—এ সব মায়ার কুহক—আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই গেরাড ধরা পড়িবে—তাই এই কুহকের রচনা। এ কুহকে আমি ভুলিব না। শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ যায় তবুও একটি আর্ত্তনাদ করিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া যে একটি করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল তাহা দমন করিবার জন্য উন্মাদিনী সবলে দুই হস্তে নিজের ক চাপিয়া ধরিল।

কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "একটি কথাও যদি বলিত!—গেরাড! গেরাড!! যদি চিরদিনের জন্যই বিদায় দিয়া যাইতেছ? তবে অন্তত একটি কথাও বলিয়া যাও। একটু দয়া কর গেরাড!—তিরস্কার কর—যা ইচ্ছা হয় বল!—শুধু একটি কথা বলিয়া যাও!

রাগ হইয়াথাকে, গালি দাও—অভিশাপ দাও—আমায় উপযুক্ত দণ্ডই হইবে।—হায়! আমি কি নির্ব্বোধ—কি হতভাগ্য!—প্রাণের অধিক যাকে ভালবাসি, তাকেই হত্যা করিলাম!!—আমি নরঘাতিনী—সকল নরঘাতক অপেক্ষাও পাপিষ্ঠা।—কে কোথায় আছ আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি গেরাডকে হত্যা করিয়াছি—ওঃ—হো-হো—ওঃ—হো-হো!!

উন্মাদিনী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজের কেশ রাশি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে নিতান্ত তারস্বরে পুনঃ পুনঃ ভীষণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই তীব্র আর্ত্তনাদের ধ্বনি নিম্নতলস্থ গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেখানে ডিরিক ও তাহার সঙ্গীরা তখনও বসিয়াছিল। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের ধ্বনিতে তাহারা সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিল ও পরস্পরের মুখের দিকে ভীত চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

ফিরে এস।

কোথায় ছুটিছ মানস সুন্দরি!
বিভূতি মাখিয়া কমনীয় দেহে,
আশার তরঙ্গে, ভাসাইয়া তরী;
ফিরে এস নিজ সীমাবদ্ধ গেহে!
চির পরিচিত সাধের সংসার,
ত্যজিয়ে যেওনা কঠোর সন্ন্যাসে
যদিও হেথায় আছে হাহাকার
তবু সুখ সাধ আছে এর পাশে!
সাধের জীবনে অকাল বৈরাগ্যে
ঘটাইবে শেষ ঘোর বিপর্য্যয়,
হ'য়ে লক্ষ্যহারা নিন্দিয়ে দুর্ভাগ্যে
হেরিবে তখন অন্ধকার ময়।

বুঝিবে না হায় মায়ার ছলনা—
আপন কর্ত্তব্যে হবে শত ভুল,—
শুকাইবে শেষ শান্তিবারি-কণা
নিজ কর্ম্মফলে হারাবে দু'কুল
তাই বার বার নিবারি' তোমারে
যেওনা অকালে ত্যজি এ আবাস
ফিরে এস পুনঃ সাধের সংসারে
পূরিবে তোমার হৃদয়ের আশ।
অযথা বিশ্বাসে চিত্ত আপনার
সঁপিওনা কভু কপট মানবে
অচিরে ঘুচিবে চির হাহাকার,
নিরমল শান্তি মিলিবে এ ভবে।

স্বর্গীয়া কুসুমকুমারী রায়।

মালঞ্চ—দ্বিতীয় অংশ।

আলোচনা সংগ্রহ রঙ্গকৌতুকাদি।

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।

—প্রচারের প্রারম্ভ—

কশ্যপ-মাতঙ্গ ও সুবর্ণ।

সুদূর পশ্চিম হইতে যে একটি নবধর্ম্ম-স্রোত সমগ্র চীনকে আন্দোলিত করিয়া তুলিবে, চীন যেন তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম, তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণ এবং ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রকৃতি যেন লীলাচ্ছলে নানারূপ চিহ্ন প্রকটিত করিয়াছিলেন।

তেহুবংশের পঞ্চম রাজা চৌ-বাও বুদ্ধদেবের জন্মের হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। একদা তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—সহসা তাহার সমগ্ররাজ্য আলোকোৎভাসিত করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে একটি প্রদীপ্ত আলোকপিণ্ড ভাসিয়া উঠিয়াছে। পুলক-রোমাঞ্চিত রাজা জ্যোতির্ব্বিদদিগকে কহিলেন,—"দেখ, দেখ, কি ঐ সহস্রকিরণ-জ্বালা-বিকিরণকারী জ্যোতির্ম্ময়—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। রাজা ইহার গূঢ়ার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতির্ব্বিদেরা আলোচনা করিয়া, পরমযত্নে গণনা করিয়া বলিলেন,—ঐ মার্ত্তণ্ড-কিরণসন্নিভ আলোকপিণ্ড ঐদিকে জনৈক মহাপুরুষের জন্মলক্ষণ সূচনা করিতেছে; এবং সহস্র বৎসর পরে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম চীনদেশে প্রবর্ত্তিত হইবে।

রাজবিবরণ লিপিতে এই আশ্চর্য্য ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া রাখা হইল। *

বৎসরের পর বৎসর কালের বিরাট গর্ভে বিলীন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চীনবাসীর স্মৃতিপট হইতে আলোকপিণ্ড-সংশ্লিষ্ট স্বপ্ন বৃত্তান্ত মুছিয়া গেল।

প্রথম শতাব্দী। হনবংশের মিং-তি-ফিং চীনের সিংহাসনে উপবিষ্ট। একদিন নিশীথে ঘুমের ঘোরে মিং-তি স্বপ্ন দেখিলেন,—উর্দ্ধে, তাহার

---

* এইরূপ আরও দুই একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সো চ্বেনের মতে খ্রীঃ পূঃ ৬৮৭ অব্দে তারাপাত হয়। ইহাও বুদ্ধদেবের জন্ম লক্ষণ-সূচক বলিয়া চীনগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনার বহুদিন পরে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত শ্বেতবর্ণ একটি ইন্দ্রধনু দেখা গিয়াছিল; ঐতিহাসিক হ তো এতদৃষ্টে বলেন—ঐ দৃশ্য পশ্চিম দেশে জনৈক মহাজ্ঞানীর মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশক। Edkins' "Chinese Buddhism." এবং Rai Sarat Chandra Das Bahadur's "Indian Pandits in the Land of Snow."

মস্তকোপরে একখানি হেমপ্রভ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, করুণশান্ত ভাসমান প্রতিমা। রাজার মনে চিন্তাতরঙ্গ খেলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি স্বপ্নের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রীদের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। অনুসন্ধানে মন্ত্রী ফু-য়ি বুদ্ধদেবের জন্ম মৃত্যু, চৌ-বাঙের আলোক দর্শন, চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বাণী সকল অবগত হইলেন এবং রাজার নিকট সকল কথা সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। রাজা বুঝিলেন—চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সময় সমুপস্থিত।

কিন্তু চীনবাসীরা তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মমত, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। কেই বা সে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করে, আর কেই বা তাহার নিয়ম পদ্ধতি তথায় প্রবর্ত্তিত করে? অনন্যোপায় মিং-তি বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ আচার্য্য আনয়ন মানসে ৬১ খৃষ্টাব্দে সেই-জিন, সিন-কিং, বংসান প্রভৃতি অষ্টাদশ জন রাজকর্ম্মচারী "পশ্চিম দেশে" প্রেরণ করিলেন।

মিং-তি প্রেরিত কর্ম্মচারীরা বহুদিন পর্য্যটনের পর নানাদেশ, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গান্ধারে উপনীত হয়। এই সময়ে কশ্যপ-মাতঙ্গ এবং সুবর্ণ * নামক দুইজন মগধবাসী অর্হৎ গান্ধারে বাস করিতেছিলেন। মাতঙ্গ যৌবনেই স্বীয় বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। কি এক সুপবিত্র উচ্চভাব প্রণোদিত হইয়া তিনি পশ্চিম ভারতে আগমন করেন। এ স্থান হইতে সুবর্ণ প্রবেশ সূত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্যত্র আহূত হ'ন।

মিং-তি প্রেরিত কর্ম্মচারীরাই বোধ হয় চীনবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহারা মাতঙ্গ প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের এই দূরদেশে আগমনের কারণ ব্যক্ত করে। ধর্ম্মার্থে ত্যক্ত জীবন যাহাদের, তাহারা ধর্ম্মপিপাসুর আকুল আহ্বান ব্যর্থ করিতে পারে না। মাতঙ্গ ও সুবর্ণ তাহাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিলেন,—চীনে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

মাতঙ্গ ও সুবর্ণ চীনে যাত্রা করিলেন। সেই সুদূর চীন, সে দেশের ভাষা,

---

* এই নামটি এক একজন এক এক রূপে লিখিয়াছেন। কেহ ইহাকে বারণ বলিয়াছেন। জর্ম্মান পণ্ডিত H, Hackmann প্রণীত, ইংরেজিতে অনূদিত Buddhism as a Religion নামক পুস্তকে এই ভারতীয় ভিক্ষু গোবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। আমরা শরৎবাবুর অনূদিত নাম গ্রহণ করিয়াছি। চীনভাষায় ইহার নাম Chu-farlen.—ইহার আর একটি নাম ধর্ম্মরক্ষ।

আচার ব্যবহার চালচলন সম্বন্ধে এই ভিক্ষুরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু মানব সেবার পুণ্যাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে—তাই সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্নই তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা প্রচার সৌকার্য্যার্থে একটি শ্বেতাশ্বপৃষ্ঠে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি লইয়া চীনে যাত্রা করিয়াছিলেন :—

নানারূপ বৌদ্ধগ্রন্থ, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, ধর্ম্মপ্রভাব-উদ্দীপক কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন এবং নানাবিধ চিত্রাদি।

সে কালের পথ সুগম ছিল না। মরু প্রান্তর, পর্ব্বত গহ্বর, উপত্যকা, অধিত্যকা, নানারূপ হিংস্র জন্তুর উপদ্রব, কোথাও হাওয়া তুষারশীতল, কোথাও ভয়ানক উত্তপ্ত—এমনই পথে নিত্য নূতন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সকলে চীনের লো-য়াং নামক স্থানে উপনীত হন। *

পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় আচার্য্যদিগকে রাজোচিত জাঁকজমক করিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছিল। তাঁহাদের বাসের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। একটি শ্বেতাশ্ব মাতঙ্গ প্রভৃতির জিনিশপত্র বহন করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া মন্দিরের নাম "শ্বেতাশ্ব মন্দির" রাখা হইয়াছিল।

বং-সান অর্হৎদ্বয় সহ ৬৭ খৃষ্টাব্দে চীনের রাজপ্রাসাদে উপনীত হ'ন। তাঁহাদের আগমনে প্রাসাদ উৎসব আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্রাট নবাগত আচার্য্যদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য্যেরা সঙ্গে যাহা কিছু আনিয়াছিলেন সকলই নিঃশেষে সম্রাট্‌কে দান করিলেন। পরম আনন্দিত রাজা দেখিলেন,—কি আশ্চর্য্য! সেই সকল উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিটি, তাহার নিশীথ স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্ত্তিটির অবিকল অনুরূপ। রাজা পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। অর্হতেরা সমাগত দর্শকদিগকে কত-অলৌকিক ঘটনা দেখাইলেন। সম্রাট্ ক্রমেই এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

একটি বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রতি রাজার এত ঝোঁক্ দেখিয়া চীনের তৌ ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং বিচলিত হইয়া উঠেন। তাহারা একদিন রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—প্রথমে সম্রাট্ দুইটি ধর্ম্মেরই পরীক্ষা করুন; পরীক্ষায় যে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থির লইবে সম্রাট যেন সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করেন।

রাজাজ্ঞায় একটি সভা আহুত হইল। কুতূহলী জনসমূহ "শ্বেতাশ্ব মন্দিরের" সম্মুখভাগে সম্মিলিত। তৌ-পুরোহিতগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসম্পর্কীয় নানারূপ দ্রব্য

* কাহারও মতে সুবর্ণ মাতঙ্গের কিছু পরে চীনে পৌছিয়াছিলেন।

এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি পূর্ব্বভাগের একটি বেদীর উপর স্থাপন করিলেন। সম্রাট বুদ্ধবিগ্রহ, কতিপয় স্মারক চিহ্ন (Relics), এবং বৌদ্ধগ্রন্থ পশ্চিমভাগে সপ্তরত্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষা করিলেন। তৌ-পুরোহিতগণ সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দেবতার কাছে আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন; বেদীর উপর চন্দনকাষ্ঠ রাখিয়া সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিলেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, গ্রন্থাদির ভস্মাবশেষ হইতে নবগ্রন্থাদির আবির্ভাব হইবে, এবং সেগুলি ঊর্দ্ধে উঠিয়া আশ্চর্য্য ঘটনারাজি বিকাশ করিবে। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, পূর্ব্বে নাকি ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এবার কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। এমন কি তাহারা সময়োপযোগী গানগুলি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেল—তাহাও আবৃত্তি করিতে পারিল না। তখন প্রধান পুরোহিত চেঙ্‌-যেন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তোমাদের সকলই ভাণ,—পশ্চিম দেশের ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম।

উপস্থিত লোক সকলের সমক্ষে মাতঙ্গ ও স্থবর্ণ নানারূপ অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিলেন। মাতঙ্গ কখন ঘুমাইয়া, কখন ভ্রমণ করিয়া, কখন বা শূন্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ সকল দৃষ্টে উপস্থিত জনসঙ্ঘ একেবারে মোহিত ও বিচলিত হইয়া গেল। সেই সম্মিলিত মোহিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থবর্ণ, সংসার বিরাগী কপর্দ্দকহীন একজন ভিক্ষু, বৌদ্ধধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। "আহ্বান শুনি কে কারে থামায়"—সকলে ভক্তিধৌত চিত্তে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। এই জ্ঞানবৃদ্ধ তেজোদ্দীপ্ত ভিক্ষুর ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গেল। প্রায় দেড় হাজার চীনবাসী সে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। রাজ-পুরমহিলার এবং সম্রাটের প্রধান গৃহরক্ষক প্রভৃতি ১৯০ জন, বিচার এবং সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ২৬৮ জন, তৌ-বাদী ৬২০ জন এবং রাজধানীর অন্যান্য নরনারী ৩৯১ জন—সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সহরের বাহিরে সাতটি এবং ভিতরে তিনটি মন্দির নির্ম্মিত হইল; রাজা বাহিরের সাতটি পুরোহিতদের এবং ভিতরের তিনটি মহিলাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।* রাজা নিজে একজন উপাসক হ'ন।

* এই সকল ঘটনা হনবংশের বিবরণে Ming Ti peng Min Chown নামক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

তিনি তৌ-ধর্ম্মাবলম্বীদের পরাজয় এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিজয়দর্শনে পরম উৎফুল্ল হইলেন। রাজা তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহা পাঠে রাজার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা বেশ জানা যায়। তিনি এই ধর্ম্মকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তৌ পুরোহিতেরা বৌদ্ধভিক্ষুদের নিকট তর্কে পরাজিত হইলে পর রাজার এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় এবং তিনি তাহার প্রজামণ্ডলীকে এই বিজয়ী ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। আমরা নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি :—

"মৃগেন্দ্রের ধর্ম্ম যত নাহি থাকে কখন শৃগালে,
রবি-শশী সম আলো প্রজ্বলিত না হয় মশালে।
অপার সাগর সম নারে হ্রদ বেষ্টিতে ভুবন,
সুমেরুর সমুচ্চতা অন্য গিরি না করে ধারণ।
আশীর্ব্বাদী ধর্ম্ম-মেঘ এ জগৎ করিয়া বেষ্টন,
বিশ্বের মঙ্গল যত বৃষ্টিরূপে করিবে বর্দ্ধন।
আগে যাহা নাহি ছিল এবে তাহা করিবে বিরাজ,
চারি দিক হ'তে এস হে জীব সকল বিজয়ীর কাছ। *

প্রচারের প্রথম দিনেই প্রায় দেড় হাজার চীনবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই রাজার এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই।

শ্রীশশিকান্ত সেন।

* রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর প্রণীত "Indian Pandits in the Land of Snow."

পদত্যাগ।

(গাথা)

পরাণপণে খাটিত সদা প্রভুর কাজে রূপ,—
বাংলা সুবা দেওয়ান্ তারি—উচ্চ পদ-ও খুব।
দক্ষ হেন কর্ম্মচারী ক্লান্ত নহে কাজে
রাত্রি দিবা লেখনী যার সমান চলিয়াছে।

এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি পূর্ব্বভাগের একটি বেদীর উপর স্থাপন করিলেন। সম্রাট বুদ্ধবিগ্রহ, কতিপয় স্মারক চিহ্ন (Relics), এবং বৌদ্ধগ্রন্থ পশ্চিমভাগে সপ্তরত্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষা করিলেন। তৌ-পুরোহিতগণ সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দেবতার কাছে আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন; বেদীর উপর চন্দনকাষ্ঠ রাখিয়া সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিলেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, গ্রন্থাদির ভস্মাবশেষ হইতে নবগ্রন্থাদির আবির্ভাব হইবে, এবং সেগুলি ঊর্দ্ধে উঠিয়া আশ্চর্য্য ঘটনারাজি বিকাশ করিবে। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, পূর্ব্বে নাকি ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এবার কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। এমন কি তাহারা সময়োপযোগী গানগুলি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেল—তাহাও আবৃত্তি করিতে পারিল না। তখন প্রধান পুরোহিত চেঙ্-যেন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তোমাদের সকলই ভাণ,—পশ্চিম দেশের ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম।

উপস্থিত লোক সকলের সমক্ষে মাতঙ্গ ও সুবর্ণ নানারূপ অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিলেন। মাতঙ্গ কখন ঘুমাইয়া, কখন ভ্রমণ করিয়া, কখন বা শূন্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ সকল দৃষ্টে উপস্থিত জনসঙ্ঘ একেবারে মোহিত ও বিচলিত হইয়া গেল। সেই সম্মিলিত মোহিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুবর্ণ, সংসার বিরাগী কপর্দ্দকহীন একজন ভিক্ষু, বৌদ্ধধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। "আহ্বান শুনি কে কারে থামায়"—সকলে ভক্তিধৌত চিত্তে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। এই জ্ঞানবৃদ্ধ তেজোদ্দীপ্ত ভিক্ষুর ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গেল। প্রায় দেড় হাজার চীনবাসী সে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। রাজ-পুরমহিলার এবং সম্রাটের প্রধান গৃহরক্ষক প্রভৃতি ১৯০ জন, বিচার এবং সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ২৬৮ জন, তৌ-বাদী ৬২০ জন এবং রাজধানীর অন্যান্য নরনারী ৩৯১ জন—সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সহরের বাহিরে সাতটি এবং ভিতরে তিনটি মন্দির নির্ম্মিত হইল; রাজা বাহিরের সাতটি পুরোহিতদের এবং ভিতরের তিনটি মহিলাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।* রাজা নিজে একজন উপাসক হ'ন।

* এই সকল ঘটনা হনবংশের বিবরণে Ming Ti peng Min Chown নামক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

তিনি তৌ-ধর্ম্মাবলম্বীদের পরাজয় এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিজয়দর্শনে পরম উৎফুল্ল হইলেন। রাজা তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহা পাঠে রাজার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা বেশ জানা যায়। তিনি এই ধর্ম্মকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তৌ পুরোহিতেরা বৌদ্ধভিক্ষুদের নিকট তর্কে পরাজিত হইলে পর রাজার এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় এবং তিনি তাহার প্রজামণ্ডলীকে এই বিজয়ী ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। আমরা নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি :—

"মৃগেন্দ্রের ধর্ম্ম যত নাহি থাকে কখন শৃগালে,
রবি-শশী সম আলো প্রজ্বলিত না হয় মশালে।
অপার সাগর সম নারে হ্রদ বেষ্টিতে ভুবন,
সুমেরুর সমুচ্চতা অন্য গিরি না করে ধারণ।
আশীর্ব্বাদী ধর্ম্ম-মেঘ এ জগৎ করিয়া বেষ্টন,
বিশ্বের মঙ্গল যত বৃষ্টিরূপে করিবে বর্দ্ধন।
আগে যাহা নাহি ছিল এবে তাহা করিবে বিরাজ,
চারি দিক হ'তে এস হে জীব সকল বিজয়ীর কাছ। *

প্রচারের প্রথম দিনেই প্রায় দেড় হাজার চীনবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই রাজার এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই।

শ্রীশশিকান্ত সেন।

* রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর প্রণীত "Indian Pandits in the Land of Snow."

পদত্যাগ।

(গাথা)

পরাণপণে খাটিত সদা প্রভুর কাজে রূপ,—
বাংলা সুবা দেওয়ান্ তারি—উচ্চ পদ-ও খুব।
দক্ষ হেন কর্ম্মচারী ক্লান্ত নহে কাজে
রাত্রি দিবা লেখনী যার সমান চলিয়াছে।

প্রভুর তাহে সুবিধা বড়—বিলাসবাটিকায়
হলেন চির-বন্দী দৃঢ় প্রিয়ার প্রহরায়।
কচিৎ প্রভু বাহিরে আসি কহেন হাসি হাসি—
"রূপের মত লোকেরে আমি বড়ই ভালবাসি।"

মিষ্টবাণী, একটু হাসি, সঙ্গী করি রূপ
উচ্চপদ মদিরা পিয়ে থাটিত সদা চুপ।
মুষলধারে সে দিন প্রাতে বাদল দিল দেখা
মুছিয়া দিল পথের যত পথিক-পদ-লেখা।
সঘনে ডাকে বজ্র মেঘে বধির করি কাণ
নগরবাসী কাতর ঘরে রুদ্ধ দিনমান।
সাঁঝেতে যবে বরষা ধারা শ্রান্ত কৃশ দেহ—
জানাল' দূত—"পাল্কীবাহী এলনা আজি কেহ।"

পদব্রজে দেওয়ান্ চলে, আঁধার ঘন রাতি,
চরণ বাধে জলের তলে—নিভিয়া গেছে বাতি।
পথের পাশে কুটীর বাসে পুছিছে রজকিনী—
স্বামীরে তার—"এ ঘোর রাতে কাহার পদ শুনি?"
রজক কহে নিরীক্ষিয়া—"দেওয়ান মনে হয়।"
শুধায় প্রিয়া—"যাবেন্ কোথা, এমন অসময়?"
"ডেকেছে বুঝি বাদশা তাই হাজিরা দিতে চলে—
নহিলে যাবে চাকুরী, দেখ চাকুরী কারে বলে!!"

রজকী আরো ব্যথিত হয়ে কহিল স্নেহভরে
"কুকুর সে-ও এ হেনকালে আসেনা পথ' পরে;
অত যে মানী দেওয়ান্—কিনা এ দুর্য্যোগে ছোটে?
চাকর হ'তে তবে ত মোরা অনেক সুখী বটে!"
বেহারা বুঝি জুটেনি কেউ? আসিবে কেন তারা?
চাকুরী কারো করে ত' না যে রহিবে ডাকে খাড়া?
দু'মুঠো ভাত, আহারে বাছা, পাবিনে কি রে কোথা?
যে দেছে প্রাণ, দিবে না কি সে খাইতে, এ কি কথা?"

শুনিল রূপ দাঁড়ায়ে পথে করুণ সমব্যথা——
"যে দেছে প্রাণ, দিবেনা কি সে খাইতে, এ কি কথা ?"
"খাওয়াই যদি এতই বড়, খাওয়ায় তবে কে সে ?
চাকরী তবে করিব তারি, যাইব তারি দেশে !"
তখনি রূপ গোস্বামীজী উপজি রাজ পাশ
ইস্তিয়াফা লিখিয়া দিয়া ফেলিল নিশ্বাস !
পুছিল প্রভু—"পাগল, হাঃ হাঃ, করিছ একি দ্বিজ ?
বেতন, বল', বাড়ায়ে দিব ; বোঝনা হিত নিজ ?"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পল্লী ক্রন্দন।

—:*:—

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিমাত্রেই যাহা দেখিতে পাইতেছ, শুধু তাই আমার চরম অবনতির কারণ নহে। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলে আরও অনেকানেক কারণ দেখিতে পাইবে। দুঃখের কথা আর কি বলিব—বলিতে কান্না আসে—এখনও আমার শিক্ষিত সন্তানগণের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে শুধু সহরের উন্নতিতে দেশের উন্নতি হইবে না, জাতীয় উন্নতি হইবে না, সম্প্রদায়ের উন্নতি হইবে না—এমন কি নিজেরও উন্নতি হইবে না। একবার ভাবিয়া দেখ—আমাদের দেশে যতপ্রকার উন্নতি হইয়াছে বা হইতেছে—তাহাদের সকলেরই বীজ আমার হৃদয়ের এই নিভৃতকন্দরে অঙ্কুরিত হইয়াছে; এখনও হইতেছে। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর সহররূপ বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের অশেষ মঙ্গল প্রদানার্থ অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি কিন্তু আজ আশা ভরসাহীন, উদ্যম ও অধ্যবসায়শূন্য, প্রাণ এমন কি হৃদয় পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত। আমার একদিন এমন ছিল—যখন আমার 'আমার' বলিতে সকলই ছিল; আমাতেই, আমার সেই শাকান্নেই অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে, আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইয়াই অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে, চরমে আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমাতেই বিলীন হইয়া যাইতে। এখন আর সেদিন নাই, 'কালস্য কুটিলাগতি'। কালের কুটিল গতিতে এই পরিবর্ত্তনশীল

জগতের চির পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। আর তোমাদেরই বা দোষ কি? "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'। এখন আর বৎসরান্তেও আমার কথা তোমাদের মনে পড়ে না; যদিই বা কখন হয়—তাহা অঙ্কুরেই বিলীন হইয়া যায়।

আমার সেই প্রাচীন সাদাসিধা রুচি, সাদাসিধা হাবভাব এখন আর তোমাদের মত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের ভাল লাগিবে কেন? আমার সেই প্রাচীন শিল্পকলা, আমার রীতিনীতি, আমার অকৃত্রিম ব্যবহার, আমার মধুর আমোদ প্রমোদ, আমার সরল গল্পগুজব, আমার সাধের ধুলাখেলা, আমার সেই সরল যাত্রাপাঁচালী আর ভাল লাগিবে কেন? আজ আমি প্রাণহীন, জীবনহীন দয়ামায়াশূন্য কঠোর। আজ গর্ব্ব করিবার আমার আর কিছুই নাই; গর্ব্বের যা ছিল, সবই যে আমাকে ছাড়িয়া গেল।

কিন্তু তোমরা কি জান না—আমি কি ছিলাম আর কি হইয়াছি, আর এরূপ হইবার কারণ কি? তোমরা এখন কেহ এম এ, বি এল, কেহ বা এম বি, এম ডি, কেহ বা ব্যারিষ্টারি কেহ বা ইঞ্জিনিয়ারিং, কেহ বা আই, সি এস, পাশ করিয়া আমার সেই 'কুড়ে ঘরের' কথা—যেখানে তোমাদের জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল—একেবারে ভুলিয়া গিয়া স্ত্রী পুত্রকন্যা ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতঃ রাজপ্রাসাদতুল্য বহু আড়ম্বরে সজ্জিত, বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত অট্টালিকায় বাস করিয়া আমারই রক্ত শোষণ করিতেছ। আর তোমাদের বৃদ্ধমাতাপিতা চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া আমারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া আছেন। তাঁহারা বৎসরান্তে পূজার সময় একটিবার তাঁহাদের সেই স্নেহের পুত্তলিকা—তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া দিন গণনা করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, কবে তাঁহাদিগের নয়নযুগল তোমাদিগকে একটিবার দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের এই অমূল্য মানব জীবনকে ধন্য করিবেন।

আর যাহারা এখনও তোমাদের মত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই; এখনও যাহারা সহররূপ প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, উকীল মোক্তার, জজ ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করতঃ দেশের, তাদের নিজেদের ভাইদের—প্রকৃত পক্ষে আমার নিজেরই রক্তশোষণ করিতে শিখে নাই, তাহারা এখনও আমার আঁধারের আলোকস্বরূপ, অন্ধের যষ্টীরূপে আমারই নিকটে, আমার স্বহস্তে পক্ক শাকান্নাদি ভোজনে কিন্তু পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিশিয়া কালযাপন করিতেছে।

তাহাদের যে আদৌ শান্তি নাই, তাহারা যে নানাভয়ে ভীত। তাহাদের শক্র চারিদিকে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে!

ঐ দেখ! প্লীহা যকৃৎ সমন্বিত স্ফীত উদরবিশিষ্ট অস্থি কঙ্কালসার তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ করজোড়ে তোমাদের নিকট একটু সামান্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। আর তোমরা—তোমাদের মত শিক্ষিত চিকিৎসাব্যবসায়ী যুবকদল পাল্‌কি হাঁকাইয়া ইহাদের দ্বারে উপনীত হইতে না হইতেই রৌপ্যখণ্ডে মুষ্টিপূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে না যে তোমার ভাই যার অর্থে পকেটপূর্ণ করিলে সে—এখনই—ঐ দেখ, চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

যদি কোন অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি আমার মায়াত্যাগ করিয়া, আমাকে ছাড়িয়া সহরে বাস করিবার সুযোগ না পায়, তবে তাহাকে লইয়া আরও বিপদ। একদিকে মায়ামমতাশূন্য ম্যালেরিয়া রাক্ষসী, তাহার বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া আমার প্রাণের প্রাণ, অপার স্নেহের পুতলীগণকে অকালে আমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতেছে। অপরদিকে সেই দেশ হিতৈষী আমার অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অর্দ্ধশিক্ষিত সেই ব্যক্তিরা আমাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পতনের পথে আরও অগ্রসর করাইয়া দিতেছে।

কেহ আর কাহারও একটু ভাল দেখিতে পারে না; চোক যেন ঝল্‌সাইয়া যায়; তাই কুটনীতি অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের পতনের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। নিজেদের মধ্যে কলহ বাধাইয়া বিচারালয়ের সাহায্য লইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমারই কুসন্তান শিক্ষিত সহরবাসী শিক্ষিত লোকদের লোহার সিন্ধুক ঝন্‌ঝনানিতে পূর্ণ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছে। শেষে আমার সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য সন্তানদিগের কি অবস্থা হইতেছে?—তাহারা রোগের যন্ত্রণায়, অনশনের তাড়নায় অকালে আমাকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, আর—আমি—ক্রমে ক্রমে বন জঙ্গল পূর্ণ হইয়া হিংস্র জন্তুর বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইতেছি। কাজেই তোমরা আমার নিকট আসিতে ভয় পাও।

শুধু ইহাই আমার এই দীনদশার প্রধান কারণ নহে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও আমার নিজস্বাস্থ্যের অবনতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। দুধ, ঘি ও মাছ—এই তিনটি বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও এগুলি আমার ঘরে প্রচুর মিলিত। তখন আমার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল; কিন্তু আমার হতভাগ্য সন্তানদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ আমার নিকট হইতে এই তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিশেরই যুগপৎ অন্তর্দ্ধান হইতেছে। নিতান্ত ভাগ্যবানের গৃহে না

জন্মিলে আজকালকার সদ্যপ্রসূত শিশুটি পর্যন্ত দিনান্তে একটিবারও গো দুগ্ধের সাক্ষাৎ পায় কিনা সন্দেহ। দীর্ঘকালের অনভ্যাসপ্রযুক্ত ঘির আস্বাদ ও গন্ধ ধনী-নির্ধননির্ব্বিশেষে আমার স্নেহের দুলালগণ সকলেই একরকম ভুলিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিদিন মাছ কিনিয়া খাইতে পারে আমার সন্তান-দিগের মধ্যে এরূপ ভাগ্য অনেকেরই নাই। পূর্ব্বে গো-পালন হিন্দু গৃহস্থ মাত্রের একটি অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। তখন ঘরে ঘরেই গোলক্ষ্মী বিরাজ করিতেন; আজকাল কিন্তু কেহ কেহ নানাকারণে বাধ্য হইয়া এবং অধিকাংশ লোকে ইচ্ছা করিয়াই গোলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়াছেন। গরু আছে—এমন হিন্দু গৃহস্থের সংখ্যা আজকাল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ—অবনতির সীমা কতদূর? কাজেই, হে বৎসগণ! আমার নিকটে আসিতে বা বাস করিতে তোমরা ভয় পাও।

জননীর কাছে আসিতে আবার ভয় কিসের? যদি তোমরা আবার আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে, বনজঙ্গল কাটাইয়া তোমাদের মায়ের ঘর পরিষ্কৃত করাইতে, রাস্তাঘাট বাঁধাইতে, পুরাতন পানাপরিপূর্ণ ডোবা ও পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে, গোপালন করিতে,—তাহা হইলে দেখিতে পাইতে আমার সেই পূর্ব্বের অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি প্রাণ পাইয়াছি আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নববলে বলীয়ান হইয়া আমার শ্রীগৌরব ফিরাইয়া নিজেরাও সুখী হইতে, আমার আনন্দে প্রাণ পাইতে, প্রকৃত উন্নতির পথে ধবমান হইতে পারিতে। এস বাপেরা সব! মায়ের ঘরে একবার ফিরিয়া আসিবে কি? মায়ের ঘরখানি তোমাদের বাসের যোগ্য করিয়া বানাইয়া নিবে কি?

শ্রীঅতুল চন্দ্র রাহা।

চিত্র-মিলন।

শুধু দু'টী চিত্রপট—আর কিছু নয়!
জানে না কারেও কেহ, চিনে না হৃদয়!
বুকে বুকে মুখে মুখে,
মিলিয়াছে তবু সুখে,—
ছায়ারে ছায়ায় মায়া—ভুবন-বিস্ময়!

কি মধুর এ মিলন !
স্বপনের ফুলবন !—
স্বপনে ছড়ায় হাসি বড় সুধাময় !
হেথায় বিরহ নাই,
তিয়াসার কোথা ঠাঁই ?—
ভাবনা-বেদনা কবে হয়ে গেছে লয় !
মৌন প্রেম, মৌন ভাষা,
মৌন সব সাধ-আশা,—
নীরবতা-কোলে শুধু কৌমুদী উদয় !
জগতের যত গান,
কে হেথা করেছে দান !
যেন সবে ভুলি তান ঘুমে ডুবে রয় !
না জানি নিঠুর ভবে,
এ ঘুম টুটিবে কবে,
জাগিয়া হেরিবে বিশ্বে হয়েছে অক্ষয়
দু'জনার ভালবাসা—আর কিছু নয় !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোহিনুর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

কোহিনুর আবার ভারতে।

সাহসুজা কোহিনুর লইয়া কিয়দ্দিবস শান্তভাবে পঞ্জাবে অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু সেরূপ নিশ্চেষ্টভাবে জীবন যাপন করা ক্রমে তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আবার স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বহুকষ্টে একদল সেনা সংগ্রহ করিয়া, মুলতান ও পেশাবর অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি জয়ী হইতে পারিলেন না, বরঞ্চ পরাজিত ও ধৃত হইয়া, কাশ্মীরের তদানীন্তন অধিপতি আটামহম্মদের নিকটে প্রেরিত হইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে স্বীয় দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

সুজার ভাগ্যবিপর্য্যয় ও বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জমান সাহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ নিরতিশয় বিষণ্ণ ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশার অবধি রহিল না। অন্ধ জমানসাহ আর কোনও উপায় না দেখিয়া, পরিজন দিগের সহিত শিখ রাজধানী লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রণজিতের তুল্য রাজনীতিকুশল, সমরনিপুণ ও শক্তিশালী রাজা তৎকালে ভারতবর্ষে অতি অল্পই ছিলেন। তিনি যেমন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই সদাশয় ও শরণাগত প্রতিপালক বলিয়াও প্রতিভালাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জমান সাহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন দিগকে বিপন্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সহানুভূতি প্রদর্শন ও উপযুক্ত আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকল অভাব অভিযোগ নিরাকৃত করিয়া দিলেন।

যাহা হউক, সাহসুজাকে অধিক দিন বন্দিভাবে কাশ্মীরে থাকিতে হইল না। বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহার মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন। কাবুলের প্রথিত নামা উজীর ফতেখাঁ, কোনও কারণবশতঃ আটামহম্মদের প্রতি বিরূপ হইয়া, কাশ্মীর অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু শিখসিংহের সহায়তা ব্যতীত সে কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া, তিনি লাহোরে আসিয়া রণজিৎ সিংহের শরণাগত হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না, অপিতু মাখন চাঁদ নামা তদীয় এক রণ-নিপুণ নির্ভীক সেনানীকে, একদল খালসা সেনাসহ, তাঁহার সহিত যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সাহসুজার সাধ্বী পত্নী অকুবেগম শিবিকারোহণে রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের এক পরিচারিকার দ্বারা রণজিৎ সিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"মহারাজ, এই কাশ্মীর আক্রমণ সূত্রে আপনি যদি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার স্বামী কাবুলের ভূতপূর্ব্ব দোরানীরাজ সাহসুজাকে আটামহম্মদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার সন্তোষ বিধান করিব, প্রত্যুপকার স্বরূপ, আপনাকে সেই সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর মণি প্রদান করিব।" রণজিৎ সিংহ কোহিনুর কখনও দেখেন নাই বটে, কিন্তু বহুদিন হইতেই উহার নাম ও সুখ্যাতির কথা শুনিয়া আসিতেছিলেন এবং উহা যে একটি অতুল্য অমূল্য রত্ন, অদ্বিতীয় রাজভোগ্য সামগ্রী, তাহাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজন সমাদৃত অপূর্ব্ব নিধি আয়ত্ত করিতে যে তাঁহার অভিলাষ জন্মিবে তাহাতে বিচিত্র কি? রণজিৎ প্রলুব্ধ

হইলেন এবং অকুবেগমকে আশ্বস্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তিনি মাখনচাঁদের সহিত সুজার কারামুক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিলে, বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে মাখনচাঁদ ও ফতেখাঁর নেতৃত্বে, শিখ ও আফগান সেনাদল কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইল। আটা মহম্মদ স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু সেই সম্মিলিত সাহসী ও সমরচতুর বীরবৃন্দের নিকটে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া গেল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য আফগানিস্থানের অন্তর্নিবিষ্ট হইল এবং কাশ্মীরপতি আটা মহম্মদ পর্য্যদস্ত ও যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সাহসুজা কারামুক্ত হইয়া মাখনচাঁদের সহিত লাহোরে আসিলেন এবং পতিগতপ্রাণা অকুবেগমের শুষ্কপ্রায় আশালতা পতিমুখ দর্শনে পুনর্ব্বার সজীব ও সরস হইয়া উঠিল। রণজিৎসিংহ মাখনচাঁদের সাফল্যে সুখী হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং কোহিনুরপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপযুক্ত কাল অতিক্রান্ত হইলেও রণজিতের আশাপূর্ণ হইল না,—অকুবেগম স্বামীর কারামুক্তির প্রতিদানরূপে তাঁহাকে কোহিনুর মণি সমর্পণ করিলেন না। বেগমের কথায় ক্রমে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সুজা-পত্নীর তাহাতে কোনও অপরাধ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া যান নাই, অথবা তাহার প্রতি-পালনেও অনভিলাষিণী ছিলেন না। তিনি যথাসময়েই রণজিৎ সিংহের নিকটে কোহিনুর পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামীর প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সাহসুজা কোহিনুররক্ষাকে যেরূপ কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, পত্নীর প্রতিশ্রুতি পালন বা প্রতিজ্ঞারক্ষাকে সেরূপ বোধ করেন নাই। অধিক কি তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্ কোহিনুর প্রদান করিতে যাওয়া, তাঁহার নিকটে যেন নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। কাজেই, আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও অকুবেগম অভি-প্রেত সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ তাহা শুনিবেন কেন?—অঙ্গীকৃত প্রত্যুপকার লাভে কেন তিনি বঞ্চিত রহিবেন? তিনি যখন দেখিলেন, বেগম প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না—সময় অতীত হইলেও কোহিনুর দানের কথা মুখেও আনিলেন না, মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও বিরত রহিলেন,

তখন অগত্যা তিনি তাঁহাকে সমস্ত গত কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রণজিৎ সিংহ কি করিলেন? না,—সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনার্থ, অকুবেগমের নিকটে ফকির আজীর উদ্দীন, দেওয়ান মতিরাম, ভকতরাম ও দীননাথ প্রভৃতি জনকয়েক প্রধান ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সাহসুজা পূর্ব্ব হইতেই পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে রণজিৎ প্রেরিত প্রাগুক্ত রাজপুরুষগণ উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি তাঁহাদিগের হস্তে বৃহদাকার এক পীতবর্ণ মণি প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কোনও কথা বলিবার অবসর মাত্র না দিয়াই বলিলেন,—"এই সেই হীরকশ্রেষ্ঠ সূর্য্যপ্রভ কোহিনুর।" তাঁহারা কেহ কখনও কোহিনুর দর্শন করেন নাই, সুতরাং সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি বারবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে রাজভবনে প্রত্যাবৃত হইলেন। কিন্তু মণিদর্শনে রণজিতের সন্দেহ হইল। তিনি নানা কারণে উহাকে কোহিনুর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন ভাল ভাল মণিকার আনাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ মণিকারদিগের মধ্যে কিছু কিছু মত বৈষম্য ঘটিল বটে, কিন্তু পরিশেষে সকলেই উহাকে উৎকৃষ্ট পোক-রাজ মণি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিলেন। সাহসুজার শঠতা দেখিয়া রণজিৎ রুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাক্যের দ্বারা সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কৌশলে সঙ্কল্পসিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইচ্ছা করিলে বাহুবলের সাহায্যে তন্মুহূর্ত্তেই তিনি কোহিনুর অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। রণজিৎ কঠোর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। যে কার্য্য সহজে, মৃদু ও সদয় আচরণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে রূঢ়তা প্রদর্শন বা বলপ্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তবে কেহ যে তাঁহাকে বঞ্চনা করিবে, ঠকাইয়া যাইবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সুতরাং পাছে সাহসুজা তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করেন, এজন্য তাঁহার ও তদীয় আত্মীয়পরিজনের অবস্থিতির জন্য রাজবাটীর মধ্যেই কয়েকটি কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে সেই কক্ষাবলীর চতুষ্পার্শ্বে প্রহরী সন্নিবেশিত করিয়া, কোহিনুর লাভের জন্য নানারূপে তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাহসুজা কোনও মন্ত্রৌষধের বশীভূত হইলেন না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোহিনুর ত দিলেনই না, অধিকন্তু তাঁহাকে প্রতারিত করিবারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। একদা গভীর রাত্রে তিনি কোহিনুর লইয়া রাজবাটীর এক

ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় প্রণালীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রণালী ইরাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উহার মধ্য দিয়া রাজপ্রাসাদের সমস্ত মলমূত্র ও আবর্জ্জনারাশি নদীতে গিয়া পতিত হইত। সুজা বুঝিয়াছিলেন, ঐ প্রণালীর সাহায্যে নদীতীরে উপস্থিত হইতে পারিলেই তাঁহার ভয় ঘুচিবে, তিনি কোহিনুর লইয়া পলায়নে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। সমস্ত রাত্রি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তিনি প্রণালী অতিক্রম করিতে পারিলেন না। একে প্রণালী পথ দুর্গম, অন্ধতমসাচ্ছন্ন তদুপরি আবার গলিত বিষ্ঠামূত্রের, গলিত আবর্জ্জনা রাশির হুকারজনক তীব্র গন্ধে পরিপূর্ণ। কেবল কোহিনুরের মমত্বেই তিনি সেরূপ নরককুণ্ডে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সুতরাং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই রাত্রি প্রভাত হইল এবং তাঁহার পলায়ন সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, রাজবাটীর প্রহরীরা আসিয়া তাঁহাকে সেই স্থলে ধৃত করিয়া ফেলিল। সাহসুজা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রণজিৎ হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, কোনও কৌশলই কার্য্যকর হইল না তখন সহসা একদিন সাহসুজার গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন এবং যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও তাহার চিরসখিত্বের নিদর্শন রূপে উষ্ণীষ বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শিখসিংহের তথাবিধ সহৃদয়তা ও বিনম্রভাব দর্শনে সাহসুজা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল, পূর্ব্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের জন্য হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই মুহূর্ত্তেই রণজিতের পূর্ব্বানুষ্ঠিত মহোপকার স্মরণ করিয়া, তাঁহার হস্তে সেই জ্যোতির্গিরি তুলিয়া দিলেন। এতদিনে রণজিতের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল এবং সাধ্বী অকুবেগমও প্রতিশ্রুতি পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইল।

রণজিৎ সিংহ কেবলমাত্র সাহসুজার কারামুক্তির প্রতিদান বা মিত্রতার পুরস্কার রূপে কোহিনুর গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইহার বিনিময় বা মূল্য বলিয়া তাঁহাকে নগদ দুইলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য নানারূপ সুবিধা ও সুব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। সাহসুজার স্বলিখিত জীবনবৃত্তে কিন্তু এই নগদ অর্থদানের কথা লিখিত নাই। তিনি উক্ত গ্রন্থের একস্থলে এইরূপভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—"পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহ আমাকে কাবুলজয়ের সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস

দিয়াছিলেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য আমাকে বার্ষিক পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রার আয়ের এক ভূ-সম্পত্তি (জায়গীর) অর্পণ করিয়াছিলেন।" গ্রন্থ বিশেষে আবার লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়,—"রণজিৎসিংহ একমাত্র কোহি-নুরের লোভেই সাহসুজাকে পঞ্জাবে ও পরিশেষে নিজ প্রাসাদে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন এবং দস্যুর ন্যায় বলপ্রয়োগে অথবা বিশ্বাসঘাকতা করিয়া কোহিনুর কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" একথা যে কোনও অংশেই বিশ্বস্ত নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অমূলক ও বিদ্বেষ-বিজম্ভৃত—তাহা সাহসুজার স্বরচিত জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। রণজিৎসিংহ যে সেরূপ নীচপ্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাহা তাঁহার শত্রুমিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, ভারতীয় জ্যোতিঃশেখর, বহুদিন পরে, আবার ভারতীয় ভূপতির রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইল, মুসলমান জাতিকে ত্যাগ করিয়া শিখজাতিকে আসিয়া আশ্রয় করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—কয়েকটি কথা।

যে ব্যক্তি কর্ম্মী, সে ধন্য হউক। যিনি জাতীয় জীবনে কর্ম্মবীর, তাঁহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। এ বৎসর আমাদের মাতৃভাষার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। বঙ্গের বাহিরে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। যাঁহারা এ সাহিত্য-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, তাঁহাদের আয়োজন-শক্তির উপর ইহার স্থায়ী সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, বিক্ষিপ্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদগুলিকে এক কেন্দ্রীভূত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক। বঙ্গসাহিত্য সর্ব্বতোমুখী উন্নতি, বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করুক। এই সাধনার সিদ্ধির জন্য organisation একান্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলন (the Bengali Literary Conference, not the Bengal Literary Conference.) শুধু বঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে

পৃথিবীর যে যে স্থানে যে যে মহোদয় একটু আধটু সময় ব্যয় করিতেছেন, প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহারা আহূত হউন। গুজরাট্, মারাঠা প্রদেশে অনেক গুজরাঠি, মারাঠি আছেন, যাহারা বাঙ্গলা ভাষা বুঝেন, আলোচনা করেন ও অনেক বাঙ্গলা পুস্তক তাঁহাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল সাহিত্যসেবীকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিতির জন্য আহ্বান করা উচিত। বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রদেশে অনেকেই বাঙ্গলাভাষায় কথা বলে; যাহারা একটু আধটু সাহিত্যিক, তাহাদিগের উপস্থিতিও বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, চীনদেশে, জাপানে, যদি কেহ বঙ্গভাষাবিদ্ থাকেন, তাঁহাকে যে কোন বিষয়ে এক একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করাও উচিত।

প্রত্যেক বৎসরই প্রত্যেক সম্মিলনীতে ছোট বড় অনেক সাহিত্যিককে প্রবন্ধ পাঠ করিতে বা বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়। কেহ কেহ ১০।১৫ মিনিট সময় পান, কিন্তু তাহাদের আবশ্যক হয়ত ৫০।৬০ মিনিট। এমতাবস্থায় রচনা পাঠ বা বক্তৃতা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মন আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রবন্ধ লেখকের ও বক্তৃতাকারীর উঠা বসা হয়। আর কোনও প্রবন্ধ "takaen as read" অর্থাৎ 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' হয়। বাস্তবিক অধিকাংশ লোকের রচনাপাঠ ও বক্তৃতা সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র সময়ে হইতে পারে না। এই সব অসুবিধা দূর করণার্থ একটি প্রস্তাব করিতেছি :—

'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' কলিকাতায় থাকিবে। প্রত্যেক জিলায় এক একটি শাখা সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হইবে। জিলাস্থ ছোট বড় সকল সাহিত্যিক এই শাখা পরিষদের সভ্য হইবেন। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর একবার বৈঠকে, রচনা পাঠ, বক্তৃতা, সমালোচনা; যাহার যত দূর ইচ্ছা, করিতে পারেন। উত্তর বঙ্গস্থ জিলা হইলে তথাকার সাহিত্য-পত্রিকায় (রংপুরে) ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গস্থ জিলা হইলে তথাকার সাহিত্য-পত্রিকায় (ঢাকাতে) ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গেও (কেন্দ্রস্থান—নদীয়া বা বর্দ্ধমান হইতে পারে) একটি সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তথাকার পত্রিকায় তৎতৎ জিলা-সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবে। Central বা কেন্দ্র বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ (কলিকাতায়) এই সব শাখা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধগুলি ছাপাইবেন।

বাৎসরিক সাহিত্য-সম্মিলনীতে এত লোককে প্রবন্ধ পাঠ করিতে বা বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা বা অনুমতি দেওয়া ঠিক নয়। প্রত্যেক জিলা পরিষদ কর্ত্তৃক মনোনীত ১ জন কি ২ জন প্রবীণ সাহিত্যিককে, বাৎসরিক সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রবন্ধ পাঠ করিতে বা বক্তৃতা দিতে পাঠানর ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। যখন সম্মিলনে একজন পাঠক বা বক্তাকে অধিক সময় দেওয়া সম্ভবপর নয়, তখন সুপণ্ডিতের প্রবন্ধ বা বক্তৃতা শুনাই লাভজনক। কোন জেলা কোন বৎসর সুবিজ্ঞ-সাহিত্যিককে মনোনীত করিয়া বাৎসরিক সম্মিলনীতে পাঠাইতে না পারিলে কোনরূপ ক্ষোভের কারণ নাই। বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনায় হিংসাদ্বেষের উপচারে নৈবেদ্য সাজান উচিত নয়। কলিকাতা আমাদের রাজধানী; তথা হইতে মনোনীত বক্তা ও প্রবন্ধ পাঠকের সংখ্যা ১০।১২ জন হওয়া উচিত। বঙ্গের বাহিরে যে যে স্থানে শাখা সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত আছে বা হইবে, তৎতৎ স্থান হইতে এক একজন সাহিত্যিককে প্রবন্ধপাঠ করিতে বা বক্তৃতা দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা উচিত। কেবল পাটনা বাঁকিপুর ও কাশী প্রত্যেক স্থান হইতে ২ জন পাঠক ও বক্তা বাৎসরিক সম্মিলনে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে পারে।

প্রত্যেক বৎসরই কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হওয়া উচিত। যথা—স্ত্রীশিক্ষা; দৈনিক জীবনে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের প্রভাব; কৃষিবিদ্যার উন্নতির উপায়; দেশে অল্প মূলধনে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারণের পন্থা; ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বাঙ্গলাভাষা বিস্তারের উপায় ইত্যাদি।

বঙ্গের বাহিরে যে যে স্থানে বাঙ্গালী আছেন, বা বঙ্গভাষার আদর বাড়িতেছে, তৎতৎ স্থানে এক একটি শাখা সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনসমিতি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বেশ সাহায্য করিতে পারেন। কারণ ভারতের নানাস্থানে তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার হইতেছে, রোগীসেবাধর্ম্মের সহিত মধ্যে মধ্যে মাতৃভাষাসেবা-ধর্ম্ম এবং তার সঙ্গে শিক্ষাদানধর্ম্ম যোগ করিলে মন্দ হয় না। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে Jesuits সম্প্রদায় এ সব বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীভূপেন্দ্র দাসগুপ্ত।

বাঙ্গালী পল্টন।

['On the Bengalee double company' by S, N, Sircar M, A,
(Head Master, Oriental Semlnery) মহাশয়ের
ইংরাজী কবিতা পাঠান্তে রচিত এবং দীনধামে
গত পূর্ণিমা মিলনে পঠিত।]

(রচয়িতা—শ্রীরসময় লাহা)

(১)

ধনের লোভে মানের লোভে হওনি বদ্ধ-পরিকর,
কর্ম্মের ডাকে ধর্ম্ম যুদ্ধে হোচ্ছ তোমরা অগ্রসর।
দেশের কাজে জাগ্রত আজ নিদ্রা করি পরিহার,
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বাঙ্গালার।

(২)

বাক্যে নহে কার্য্যে তোমরা দিচ্ছ তেজের পরিচয়,
দেখাবে তাই পৌরুষভরে পুরুষকারের চিরজয়॥
আমরা ভীরু রণে বিমুখ একথা আজ বল্‌বে কে আর।
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বাঙ্গালার॥

(৩)

কিসের চিন্তা? হোক্ না কেন স্বল্প বাঙ্গসৈন্যদল,
শক্তি যখন উদ্বোধিত দৃঢ় যখন বাহুবল;
স্মৃতি যখন বইছে প্রতাপ বিজয়সিংহের পুণ্যভার।
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বঙ্গালার।

(৪)

চেয়ে আছে দেশের চক্ষু তোমাদেরি প্রতি আজ,
দেখাও তোমরা মানুষ বটে বীরের জাতি জগত মাঝ;
ধর্ম্মে বাঁধা বিজয় লক্ষ্মী দেখাও আর্য্য শৌর্য্যসার।
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বাঙ্গালার।

(৫)

ঘরে শুয়ে মরছে ক্লেশে রোগে নিত্য কত জন,
তোমরা নিতে যাচ্ছ হেসে সেই মরণে আলিঙ্গন;

কর্ত্তব্যে দেয় আত্মবলি রণে ছোটায় রক্তাধার,
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বাঙ্গালার।

(৬)

ফিরবে যবে সগৌরবে সার্থক হবে অভিযান।
তোমাদের সেই পুণ্য কীর্ত্তি ধন্য করবে দেশের মান।
জন্মভূমি যুক্তকরে যাচে আশিস্ বিধাতার,
পুত্র যত কর্ম্মে রত তোমরা সোণার বাঙ্গালার।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

পরিচারিকা—প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ।

এখানি কুচবিহার হইতে রাণী নিরুপমাদেবীর সম্পাদকতায় নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমেই দুইটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতেছি। প্রথম ইহা নারীর সম্পাদিত, দ্বিতীয়তঃ ইহা মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত। ভারতী সুপ্রভাত ও ভারত মহিলা পত্রিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ভারতী এখন যুবক সাহিত্যিকের হাতে। সুপ্রভাত আর প্রকাশিত হয় না। ভারত মহিলার সন্ধান আমরা জানি না। পূর্ব্বে অন্তঃপুর নামে পত্রিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইত। আমরা এই নূতন সম্পাদিকার সাহিত্য ক্ষেত্রে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় লাভ করি নাই। পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে এই নবীন সাহিত্য-সেবিনীকে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে বরণ করি। প্রতিভা, উপাসনা, ভারত মহিলা, তোষিণী এই চারিখানি মাসিক পত্র মফঃস্বল হইতে বাহির হয়। তার মধ্যে উপাসনা পশ্চিমদক্ষিণ বঙ্গের, বাকী তিনখানি পূর্ব্ব বঙ্গের। উত্তর বঙ্গের এই নবাভ্যুদিত প্রথম মাসিক পত্রিকাকে আমরা পরম আগ্রহের সহিত বরণ করি। মফঃস্বলেও সাহিত্য সেবা হয়—সেখানেও যে শিক্ষিত শিক্ষিতাগণের জ্ঞান বিস্তারে উৎসাহ আছে ইহা দেখিয়া আমরা পরম সুখী। পত্রিকার ছাপা কাগজ বাহ্যসৌষ্ঠব বেশ সুন্দর হইয়াছে।

প্রথমেই শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত চিত্র—পূজারিণী। চিত্রটি সুন্দর ও পবিত্র। পত্রিকার আরম্ভের কল্যাণকর। সম্পাদিকার—"উদ্বোধন," প্রথমপাতে। বেশ ছন্দোমাধুর্য্য আছে। হাত বেশ মিঠা।

'পূর্ব্বকথা'—শ্রী—, পূর্ব্বে কুচবিহারে পরিচারিকা নামে একখানি পত্রিকা ছিল। ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন যথাক্রমে ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহাত্মা ৺কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী, ঐ মহাত্মার কন্যা ময়ূরভঞ্জ

মহারাণী সুচারু দেবী এবং তদনুজা শ্রীযুতা মণিকা দেবী। তারপর অষ্টবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

তারপর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের "হেমান্তোৎসব।" কালিদাসবাবু সর্ব্বঘটে বিরাজ করেন। ইঁহার কোনও সাম্প্রাদায়িকতা নাই, কোন দলের মধ্যে এই কবি বন্দী নহেন। কাজেই ইনি সকল পত্রিকাতেই আছেন। পরিচারিকার মঙ্গলাচরণেও ইনি। নবীন কবিদের মধ্যে ইঁহার মত অজস্র রচনা আর কাহারও বড় দেখা যায় না।

তারপর গল্প—'হারজিত'—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল মহোদয়ের। গল্পে কথার বিশেষত্ব এবং রচনা নৈপুণ্য বেশ (art) দুই-ই আছে।

'মানসদেবতা'—কবিতা (শ্রীমতী অনুরূপা দেবী)—ইহাঁর কবিতা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কবিতাটি তত ভাল হয় নাই।

"কামরূপের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের উপকরণ" প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ হইতে কামরূপের ও প্রাগ্ জ্যোতিষের আচার ব্যবহার এবং এই দুই রাজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যাদিতে যে সকল কথা আছে তাহা আলোচিত হইয়াছে—কোচ জাতির ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের ইতিবৃত্ত ও তাঁহাদের জ্ঞানানুরাগ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহের 'নিবেদন' কবিতা বেশ লাগিল। নবীন কবির গলায় 'দরদ' আছে। 'মালাকার'—গল্পটিতেও বেশ কবিত্ব আছে। 'গানের জন্ম'—প্রিয়ম্বদা দেবীর—মন্দ নয়।

'মহিলা মঙ্গল'—শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদারের হাস্য-রঙ্গিল শান্ত রসাত্মক (serio-comic) ধরণের প্রবন্ধ। তত সুবিধা হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "কলাগাছ" উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—বেশ সরস ভাবে রচিত। 'কি সে?'—শ্রীআমোদিনী ঘোষের সুন্দর কবিতা। 'ঐশ্বর্য্য'—ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "শুভযাত্রা" কবিতা বেশ। "ছ' আনাজ"—ইহাতে ইংরাজী কৌতুক রচনা হইতে কয়েকটি অনুবাদ আছে।

'মাসিক কবিতা সমালোচনা'—বঙ্গ সাহিত্যে নূতন ধরণের সমালোচনার প্রবর্ত্তন। ইঁহারা শুধু কবিতারই সমালোচনা করিবেন। ইহা মন্দ নয়। সর্ব্ব শাস্ত্রের সমালোচনা করিতে যাওয়া অপেক্ষা একটি বিষয়ের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া পরিচারিকা ভালই করিয়াছেন। তবে ইহাতে সম্পাদকগণের প্রতি বড় তীব্র আঘাত করা হইয়াছে, নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের ভিতরের কথা ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সমালোচনাগুলিতে কোন চিন্তাশীল সমালোচক সমালোচনায় বেশ ধীরতা ও বিশেষজ্ঞতার দিয়াছেন।

নৈবেদ্য (কার্ত্তিক)

'কোজাগর' কবিতা—তত ভাল হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রীর—"শক্তিপূজার উপযোগিতা" প্রবন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য আছে বটে, কিন্তু উপাদেয় হয় নাই।

'সহস্রধারা দর্শনে'—সুন্দর কবিতা—শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের।

'সঙ্গীতের মোহ'—Tolstoi প্রণীত ক্রয়টজার সনাটা উপন্যাসের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদ তেমন ভাল হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'সুন্দরের জাতি' কবিতা চলন সই।

'বঙ্গ ভাষায় ত্রি-সমস্যা' প্রবন্ধে রাখালরাজ বাবু, অধ্যাপক যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি যে কয়জন সাহিত্যরথী ভাষার ভঙ্গি রীতিরূপ সম্বন্ধে সাধনা করিতেছেন তাঁহাদের বক্তব্যের সমালোচনা করিতেছেন। 'ভাই'—গল্পে বিশেষ শিল্প নৈপুণ্য নাই। 'মৃত্যুমিলন'—কবিতা তৃতীয় শ্রেণীর। 'বিজয়া' ও 'যোগী ও আমি' কবিতা সম্বন্ধেও তাই।

মানসী ও মর্ম্মবাণী— অগ্রহায়ণ।

প্রথম ছবি খানি পুরাতন।

শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর--ওরাঁওদিগের ধর্ম্ম—উপভোগ্য ও জ্ঞাতব্যবিষয়ে পূর্ণ। প্রবন্ধ লেখক বলেন—উরাঁওরা দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত। উরাঁওদের দেবতাগণের মধ্যে রাম ও সীতা আছেন এবং হনুমানও আছেন। উরাঁওগণ রামের বানরসৈন্যের সহিত অভিন্ন। শ্রীরামের সাহচর্য্যে ইহারা মনুষ্যত্বপদবীতে আরোহণ করিয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু উরাঁওদের মধ্যে শিক্ষিতলোকে কি প্রবন্ধ লেখককে মার্জ্জনা করিবেন?

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর 'সামাজিক সমস্যা'—মন্দ নহে। এবার দলাদলি সমন্ধে দু'কথা বলিয়াছেন। শুধু পল্লীগ্রামে নহে,নগরেও এই দলাদলির প্রভাব বেশ। পল্লীগ্রামে দলাদলি বেশীর ভাগ সামাজিক ব্যাপার লইয়া। নগরের দলাদলি—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রিক্ট বোড ইত্যাদির মধ্যে ও সাহিত্যসমাজে। পল্লীর দলাদলি অশিক্ষার ফল হইতে পারে—নগরের দলাদলি যে শিক্ষারই কুফল। পল্লীর দলাদলি হইতে নগরের দলাদলি যে আরও সাংঘাতিক হইয়া উঠে। প্রবন্ধ লেখক পরিশেষে সাহিত্যসমাজে ঈর্ষা দ্বেষ মতভেদ সঞ্জাত কুৎসাকর দলাদলির কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সেদিন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহোদয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্তিতে কবিরাজদের মধ্যে কি ঘৃণিত দলাদলিরই সৃষ্টি হইল! এই দলাদলি আরও দুঃখের বিষয়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের গুণ বিবেচন লইয়া সাহিত্যরাজ্যে এমন একটা দলাদলির আগুণ জ্বলিয়াছে যে আর তাহাকে অবহেলা করা চলে না—এখন ক্রমে উহা সাহিত্য হইতে ব্যক্তিত্বে পৌছিয়াছে। বাঙ্গলার সাহিত্যের ভাষা কি হইবে এই লইয়া দুইদল দুই দিকে দাঁড়াইয়া তাল ঠুকিতেছেন ও পায়তারা কষিতেছেন। ফলে মীমাংসার দিকে কেহই যাইতেছেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি কোনও দলের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে না।

এ সাহিত্যের এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে,—ইহার প্রাণশক্তি দেশের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। সাহিত্যিকদের দলাদলি করাই সার। বঙ্গসাহিত্যও একটা জীবিত অঙ্গী পদার্থ—Organism। এরূপ পদার্থ কোনো চরমকেই গ্রহণ করিবে না। জীবনশক্তি সকল বিরুদ্ধশক্তির সমন্বয় করিয়া লইয়া আপনার পুষ্টিসঞ্চয় করিবে। যদি বিদ্বেষদুষ্ট না হয়, তবে এই দলাদলির যে একটা ভাল দিক নাই, তাহাও নহে। ইহা জাতির কর্ম্মশক্তির লক্ষণ—এই বাদ প্রতিবাদ সাহিত্যের জীবনকে সর্ব্বদা কর্ম্মশীল ও সচেষ্ট করিয়া রাখিবে।

'স্মৃতিশক্তি'—চুনীলাল মিত্র মহোদয়ের। সরস করিয়া রচিত মনোবিজ্ঞানের প্রবন্ধ। লেখক শেষে বলিতেছেন—"স্মৃতি এক জন্মের ব্যাপার নহে—ইহা জন্ম জন্মান্তরে আমাদের অনুগমন করে।" মহাকবি কালিদাসের—"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" ইত্যাদি এবং "তাং হংসমালা শরদিব গঙ্গাং" ইত্যাদি শ্লোকে এই কথাই আছে। "মনঃ হি জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞং" প্লেটোর স্মৃতিবাদ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রাগ্‌জন্ম অস্তিত্ব এই কথাই বলে না কি? 'মায়া' (গল্প) কাঞ্চন মালা দেবীর। গল্পটি এক প্রকার। দৃষ্টি (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—মন্দ নহে।—কবি শেষে বলিয়াছেন—"স্বপ্নং নু মায়া মনিভ্রমোহনু" ও "সুখমিতি বা দুঃখমিতি" ইত্যাদি।

'ব্রজকাহিনী'—পুলিনবিহারী দত্তের। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহত্ত্বের উদাহরণ অনেকগুলি সুন্দর উপাখ্যান ইহার মধ্যে আছে।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্তের। বাংলা ভাষায় ভূতত্ত্ব রচিত হইতেছে। বড়ই আনন্দের কথা!

"খোদাবক্স লাইব্রেরী দর্শনে" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতা। ভালোয় মন্দে—আলোয় অন্ধকারে মিশ্রিত।

ভাগলপুর চিত্র—বেশ সরস। ভাগলপুরের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালী বেহারী সংঘর্ষ প্রসঙ্গও আছে। ভাগলপুরবাসিগণের আচার ব্যবহার চরিত্রের সমালোচনাও আছে। অনেক সামাজিক সমস্যাও আলোচিত হইয়াছে। "সমালোচনার সমালোচনায়"—শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয়ের ১টি প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বেশ যুক্তি সহকারে মহীতোষ বাবুর মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই—অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছেন। স্থলে স্থলে লেখকের বিচক্ষণতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

চামড়া—প্রবন্ধটি বেশ ভাল হয় নাই। বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ও নাই।

নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়—উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দর্ভ। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আগে আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইত।

"সেখ আন্দু"—প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার প্রবাসীতে প্রকাশিত ঐ নামীয় উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনার (অমূল্যচরণ ঘোষ কৃত) প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শৌরীনবাবু

অমূল্য বাবুর উপর প্রতিবাদচ্ছলে যেন বহুদিনের রাগ ঝাড়িয়াছেন—ইহা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নহে।

'ধ্রুব' শ্রীকালিদাস রায়ের দীর্ঘ কবিতা। নামের যোগ্যই হইয়াছে।

"আমার জীবন"—গল্প শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। গল্পটি প্রভাত বাবুর অনুকরণে রচিত। গল্পাংশটি—মন্দ নহে! 'সন্ধ্যাতারা'—কবিতা বেশ লাগিল। 'বেলজাম'—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মিত্রের। জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। লেখক Belgiumএর জায়গা গুলির যথার্থ উচ্চারণ দিয়া উপকার করিয়াছেন। "রাজসাহী স্মৃতি"—মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের। বেশ ভাষার লালিত্য আছে।

'চোখের মোহ' বিশেষত্ব শূন্য কবিতা।

ভারতবর্ষ (অগ্রহায়ণ)—প্রথমেই দেবকুমার বাবুর 'সিন্ধুবন্দনা'। কবিতাটি চলনসই—প্রথমপাতের উপযুক্ত নহে। "নিরন্ধ" বোধহয়" নীরন্ধ্র হইবে। "যাতনা মর্ম্মদাহী" মিলের খাতির চলিবে। দেববাবু 'এই' কথাটিকে 'এহি' লেখেন। 'ভাসমান' অর্থ দীপ্যমান। বোধ হয় এই অর্থে এখানে প্রয়োগ হয় নাই।

'চার্ব্বাক দর্শন ও তাহার সমালোচনা'—বেশ ভাল। প্রবন্ধে কবিসম্রাট (কবিসম্রাট বলিলে আমরা কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বুঝি) মহোদয় বলিয়াছেন, "যে বুদ্ধ, অর্হৎ ও চার্ব্বাক বেদ মহাতরুর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন—তাঁহাদিগকেও হিন্দুরা ভগবানের বা বৃহস্পতির অবতার বলিয়াছেন—যে দিন জগৎ হিন্দুর এই উদারতা বুঝিবে—ইত্যাদি।" কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই বেদ নিন্দকদিগকেও ঈশ্বরাবতার বলিলে হিন্দুর উদারতা প্রমাণিত হয় বটে কিন্তু হিন্দুজাতির—মূলনীতি (principle) এর ঠিক নাই বলিয়া আবার অপরের ধারণা জন্মিতে পারে না কি? এ ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির উদারতা প্রমাণ করিতে যাওয়া বিচারে টিকিবে কি?

'নির্ভর' কবিতা—চলন সই। 'মৃত্তিকা'—শ্রীকালিদাস রায়—মন্দ নয়।

'দিদি' নামক উপন্যাসের গুণবিবেচন বা appreciation—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১১।১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী গুণকীর্ত্তন। প্রবন্ধের অধিকাংশই গল্পের সংক্ষিপ্ত সার। সমালোচনায় তেমন পাণ্ডিত্য নাই।

"যদুমাষ্টার"—গল্পটি মন্দ নহে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোমের—'কবীর কমৌটীর অনুবাদ ভাল হয় নাই!

'রাফেল শান্তি'—Raphael সম্বন্ধে ও তাঁহার চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথা আছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের—"চীনের তাও সাধক কণ্ডিরে ছুকুব" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি উপাদেয়, এই প্রবন্ধে বিনয় বাবু বঙ্গদেশের সাধকগণের সহিত চীনা সাধকের তুলনা করিয়াছেন এবং ঐ কবির রচনার অনুবাদ দিয়া কবির ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ কবিতার ছন্দে না দিলেই ভাল হইত।

নগেন বাবুর—"মধুস্মৃতি" চলিতেছে—বঙ্গসাহিত্য নগেন বাবুর নিকট—এই

অনুষ্ঠানের জন্য কৃতজ্ঞ। "বুদ্ধির মূল্য"—গল্প বিশেষ ভাল হয় নাই। "বিবিধ প্রসঙ্গ"— গুলি উল্লেখযোগ্য।

'বঙ্কিম প্রতিভা'—অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা আছে। ললিত বাবু অনেক কথা যাহা বলেন নাই—ইনি তাহা বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহার "ছয় জন বৌদ্ধ তীর্থিকাচার্য্যের ইতিবৃত্ত"—প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ।

১। পূরণ কশ্যপ, ২। মোক্ষলি গোশাল, ৩। অজিত কেশকম্বলি, ৪। পকুধ কচ্চায়ন। ৫। সঞ্জয় বেলটি পুত্ত, ৬। নিগণ্ঠনাথপুত্ত এই ছয় জন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে আছে।

'খেজুরওয়ালা'—গল্প তৃতীয় শ্রেণীর। "তীর্থকুমার"ও তাই। 'মনোবিজ্ঞান' অতি সুন্দর প্রবন্ধ হইয়াছে। 'বিদায়' কবিতা মন্দ নহে।

শ্রীরাধাপদ শর্ম্মা।

ব্রজবেণুর কবি কালিদাস রায়ের প্রতি।

ক্ষুদ্র এ কীচক রন্ধ্রে কি গান শুনালে কবি কাব্যের কাননে—
আকুল করিল প্রাণ মরমের মাঝে আহা পশিয়া শ্রবণে।
তোমার বেণুর রবে বঙ্গের যমুনা আজ বহিছে উজান,
আকুল হইয়া ধায় চিত্তের গোপিনী যত ভুলি লাজমান।
গাহিলে মধুর ছন্দে আমাদেরই বাহু পাশে চিরবন্দী শ্যাম,
উদুখলে ফুলহারে বাঁধা চিত্ত কারাগারে সে যে অবিরাম।
কাঙাল ঠাকুর তিনি সুখের দুঃখের ভাগী মানব আত্মীয়,
কাঙালের ভার বহে কাঙালেরে বুকে করে কাঙালের প্রিয়!
জীবনের কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্ম যবে টলমল রাখে সে তখন,
রথের সারথি হয়ে সাধুরে বাচায়ে করে দুষ্কৃতি দমন।
জীবনের রাসে দোলে নহে স্থির স্থির হবে জীবনের রথে
যে দিন যাইতে হবে ঘন ঘোর অন্ধকারে অজানার পথে।
তাঁহারে পাইতে হলে শির পাতি নিতে হবে প্রণয় দুর্দ্দিন,
কালোদুখ দীঘি জলে সে যে সদা ফুটে থাকে আনন্দ-নলিন।
নিঠুর কপট শঠ কাঁদাতে যে ভাল বাসে তারে বয়' তুমি,
তাই গাহ বার বার—"অশ্রু বিনা এ জীবন হবে মরুভূমি।"
আর যে গাহিলে তুমি এ বিশ্বের ব্যথা আর দুঃখ রাশি যত,
প্রিয়ের পীড়ন সম কুসুম শয়নে তাহা কণ্টকের মত।
বসন্তের হাসি মাঝে কোকিলের কুহু স্বরে যেই ব্যাথা জাগে,
তাঁর দেওয়া দুঃখ ব্যথা প্রিয়ের হৃদয় মাঝে সেইরূপ লাগে।

আশা দিয়া নাহি আসে আবার সহসা আসে এই তার রীতি
দিবাভাগে বেণু করে নিশীথে নবনী তরে ফেরে নিতি নিতি
তার যত অত্যাচার বুকের স্পন্দন যেন চাঞ্চল্য নয়নে,
সে সবই স্বভাব লাভ তাহার অভাবে আর কি থাকে জীবনে ?
লীলা তার সুনিশ্চয়, সৃষ্টি তার কভু লয়, বিশ্বের বিকাশ,
লীলার মাতিবে যেবা শাশ্বত ভাণ্ডার তার, তার নাহি নাশ।
অবশেষে গাহ তুমি "কুলমান লাজ ভয় করি সমর্পণ,
দূরে ঠেলি সব ব্যথা শেষে ভক্ত করে লাভ সে পরা মিলন,
মিলনের মত্ততায় অন্ধতা, লক্ষণ নহে পূর্ণ মিলনের,
'মানে' তার সূত্রপাত,—'ভঙ্গে' যার ব্যবধান দুটী জীবনের।
জীবনের রাসে আজ দুই মিলে হয় এক বাধা করি জয়।
এক পুনঃ বহু হবে জাগে ঐ চারি ধারে এই বিশ্বময়।
মাগি তার পদরেণু বাজায়ে ব্রজের বেণু দিয়াছ আশ্বাস—
না হয় লভনি আজ তাতে কিবা আসে যায়—হয়ো না হতাশ!
আজ কিংবা কাল হোক কিম্বা যুগযুগান্তরে জন্মজন্মান্তরে
গ্রহণ করিতে হবে নিরূপিত আছে যাহা এ বিশ্বের তরে।
প্রহার আঘাতে যেবা ক্ষান্ত নাহি হয় কভু প্রেম বিতরণে
তাঁহার চরণ বিনা আর কোন গতি নাই মোদের জীবনে।"
ধন্য হে বৈষ্ণব কবি! সার্থক জীবন তব সার্থক জনম।
ব্রজের লীলার মাঝে ব্রহ্মাণ্ডে হেরেছ তুমি সত্যের চরম।
তোমার বাঁশীর স্বরে বর বার ঘাট মাঠ করেছে পাগল,
তোমার বেণুর তান বিশ্ব চিত্ত কারাগারে টুটান আগল
তোমার বাঁশীর ডাক ব্যাকুল উদাস করে বিষয় ব্যসনে
তোমার বাঁশীর বাণী সনাতন করে দিল মায়ার স্বপনে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

আকাঙ্ক্ষা।

আমার হৃদয় বীণায় বেজে উঠুক
একটা মহান্ গান;
ভয় কোলাহল ভেঙ্গে আসুক।—
অভয় আশীষ দান।
শান্ত উদার আকাশ চেয়ে,
ভোর বার্ত্তা আসুক ধেয়ে,
ম্লান মুখে, ভাঙ্গা বুকে
চির শান্তি দান।
সকল পথে সকল কাজে,
আসুক আমার হিয়ার মাঝে,
প্রীতি গন্ধে, মিলন ছন্দে
তোমারি আহ্বান।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

নেপালের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

প্রাচীনকালে মহাযান বৌদ্ধমতের অন্তর্ভুক্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মই নেপালের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এই ধর্ম্মের সঙ্গে তান্ত্রিক শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের এত সাদৃশ্য আছে যে দুই ধর্ম্মমতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অতি কঠিন। পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণের এই ধারণা ছিল যে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজা ও ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ঘটে; কোনও কোনও সময়ে কোথাও কোথাও এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ঘটিয়া থাকিলেও এই পতনের প্রধান কারণ ইহা নয়। হিন্দুধর্ম্মই ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া নিয়াছে। এই মিশ্রণ এমন ভাবে ঘটিয়াছে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণ ও দেবদেবীগণ-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কথা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে মিলিয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক মন্ত্র অনুষ্ঠান যদি যে আধুনিক হিন্দু পূজাপদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ তাহাও এই মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণের ফলেই বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত এখনও নেপালে আমরা বহু পরিমাণে দেখিতে পাই। নেপালের বহু বিহার ও বিহারের সংলগ্ন দেবমন্দিরে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেববিগ্রহ একত্র দেখা যায়। পূজকগণও প্রায়ত যেন একাধারে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যাজক হিন্দুব্রাহ্মণ। ইঁহারা ভিক্ষুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অথচ হিন্দু যাজকের ন্যায় বিবাহিত গৃহস্থ; বংশানুক্রমে এক এক বিহারে ইঁহারা যাজকপদে বৃত হইয়া আছেন। নেপালের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও আমরা এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিব।

প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রধান ছিল,—ক্রমে এই বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিকমতানুবর্ত্তী হইয়া তান্ত্রিক শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাসও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কখনও বৌদ্ধমত, কখনও হিন্দুমত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—এরূপ অবস্থারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, নেপালের অসংখ্য তীর্থও অন্যান্য প্রধান স্থান, প্রধান প্রধান বিহার চৈত্য ও মন্দির, এবং প্রধান ধর্ম্ম উৎসব সমূহের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূলতত্ত্ব কি, তান্ত্রিক হিন্দুমতের সঙ্গে বৌদ্ধমতের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ—ইত্যাদি বহু কৌতূহলোদ্দীপক কথা আমরা এই পৌরাণিক কাহিনী হইতে জানিতে পারি। নিম্নে আমরা নেপালের আদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং পরবর্ত্তী যুগের অতিলৌকিক ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের মূল কথাগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তাহার সত্যতা কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নেপাল বা কাটামুণ্ডের উপত্যকা আদিযুগে একটি বিশাল হ্রদ ছিল। এই হ্রদের নাম ছিল 'নাগহ্রদ'। বহু নাগ এই হ্রদে বাস করিত।

'সচ্চিৎ বুদ্ধ' হইতে 'আদিবুদ্ধ' আবির্ভূত হন। আদিবুদ্ধ হইতে ঈশ্বর বা লোকেশ্বর আবির্ভূত হন। তাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইল। জগতের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান সুমেরু বা হিমালয়। এই হিমালয়ে নাগহ্রদ অবস্থিত ছিল। সত্যযুগে বিপাশ্বিবুদ্ধ বন্ধুমতী হইতে আসিয়া নাগহ্রদের পশ্চিম তীরস্থ পর্ব্বতে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। চৈত্র পূর্ণিমার দিন এই হ্রদে একটি পদ্মবীজ তিনি নিক্ষেপ করিলেন। এই পর্ব্বতকে তিনি জাতমাত্রোচ্চ নাম দিলেন. তারপর অন্তর্হিত হইলেন। (এই জাতমাত্রোচ্চ পর্ব্বতই পরে নাগার্জ্জুন নামে পরিচিত হয়।) এই বীজ হইতে একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। আশ্বিন পূর্ণিমায় এই পদ্ম-মধ্যে স্বয়ম্ভূ জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হইলেন। এই জ্যোতির কথা শুনিয়া অরুণপুরী হইতে শিখীবুদ্ধ আসিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত হইতে এই জ্যোতিকে নিরীক্ষণ ও ধ্যান করিয়া মেষ সংক্রান্তির দিন তাহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই পর্ব্বতের নাম হইল ধ্যানোচ্চ—(পরবর্ত্তীকালে চম্পাদেবী নামে পরিচিত।)

তারপর ত্রেতাযুগে বিশ্বভূবুদ্ধ অনুপম নামক স্থান হইতে আসিলেন। লক্ষ পুষ্প উপহারে তিনি এই জ্যোতিরূপ স্বয়ম্ভূর পূজা করিলেন। যে পর্ব্বতের উপরিস্থিত বৃক্ষরাজি হইতে পুষ্প পতিত হইয়াছিল, সেই পর্ব্বতকে তিনি ফুলোচ্চ নামে অভিহিত করিলেন। (ইহাই পরবর্ত্তী ফুলচক পর্ব্বত।) তারপর কোন পথে এই হ্রদের জল নিঃসারিত হইতে পারে, তাহা শিষ্যদের দেখাইয়া দিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুকাল পরে মহাচীন হইতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী আসিলেন। মহামণ্ডপ বা 'মঞ্জুশ্রী-স্থান' নামক পর্ব্বতের উপরে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া তিনি স্বয়ম্ভূ জ্যোতি দেখিলেন। হ্রদের জল নিষ্কাশনের জন্য একটি পথ কাটিবার অভিপ্রায়ে তিনি দক্ষিণের দিকে পর্ব্বতে গেলেন। ফুলোচ্চ এবং ধ্যানোচ্চ এই দুইটি পর্ব্বতের উপরে তিনি বরদা এবং মোক্ষদা এই দুই দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে মধ্যস্থলে রহিলেন। তারপর দুই পর্ব্বতের মধ্যে একটি পথ কাটিলেন। পথের নাম হইল, 'কটবাল' এবং এই পথে হ্রদের জল বাহির হইল। নাগেরা সব জলের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া আসিল। কেবল নাগরাজ কর্কোটক তাঁহার অনুরোধে সেখানে রহিল। একটি বৃহৎ জলপূর্ণ খাতে তিনি তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই নূতন ভূস্থলের সমস্ত সম্পদের আধিপত্য তাহাকে দিলেন। তারপর বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে সেই পদ্মে স্বয়ম্ভূ এবং পদ্মের মৃণালমূলে গুহ্যেশ্বরী দেবীর দর্শন লাভ করিয়া তিনি পদ্মের মধ্যভাগে স্বয়ম্ভুর পূজা করিলেন। সেই পদ্ম পর্ব্বতে পরিণত হইল। সেই পর্ব্বত হইতে তাহার মৃণালমূলে গুহ্যেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান ভূমি পর্য্যন্ত মঞ্জুপাটন নামক একটি নগর তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন।*

গুহ্যেশ্বরীতে তিনি বহু বৃক্ষ রোপণ করিলেন, এবং এই নগরে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যাহারা গৃহস্থ হইতে চায়, তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়া একটি

---

* বর্ত্তমান পশুপতি মন্দিরের উত্তরে পশুপতিবনের নিকট গুহ্যেশ্বরী তীর্থ, এখানেই বর্ত্তমান স্বয়ম্ভু পর্ব্বত।

বিহারে ভিক্ষু শিষ্যদের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তারপর ধর্ম্মাকর নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মঞ্জুশ্রী মহাচীনে প্রস্থান করিলেন। শিষ্যগণ স্বয়ম্ভূ পর্ব্বতের উপরে মঞ্জুশ্রী চৈত্য নির্ম্মাণ করিল। সেখানে স্বয়ম্ভুর সঙ্গে মঞ্জুশ্রীরও পূজা হইত। এই সময় হইতে সেখানে কর্কোটক নাগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার নাম হইল 'তৌদহান' বা 'তৌদহ' অর্থাৎ বৃহৎ খাত।

ইহার কিছুকাল পরে এই ত্রেতাযুগেই ক্ষেমাবতী হইতে ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ আসিলেন এবং স্বয়ম্ভূ জ্যোতির মধ্যে গুহ্যেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিলেন। একটি পর্ব্বতে বাসস্থান গ্রহণ করিয়া তিনি শিষ্যবৃন্দের নিকটে স্বয়ম্ভূ এবং গুহ্যেশ্বরীর মহিমা এবং ভিক্ষু ও গৃহস্থের ধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের অভিষেকের জন্য জল না পাইয়া ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ এবং গুহ্যেশ্বরীর দিকে চাহিয়া—'এই পর্ব্বত হইতে জল বাহির হউক,—এই বলিয়া পর্ব্বতগাত্রে আপনার অঙ্গুষ্ঠ নিবিষ্ট করিলেন। গঙ্গাদেবী অমনই সেইস্থান হইতে দেবীমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্যদান করিলেন, তারপর জলরূপে প্রবাহিত হইলেন। গঙ্গার এই প্রবাহিনীই পরে বাঘমতী নদী নামে পরিচিত হইল।

এই পূত সলিলেই ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ শিষ্যদিগকে ভিক্ষু ধর্ম্মে অভিষেক করিলেন। অভিষেকের সময় শিষ্যদের মস্তক মুণ্ডিত হইল। কেশগুলির অর্দ্ধেক তিনি পর্ব্বতে একটি স্তূপের নিম্নে প্রোথিত করিলেন। বাকী অর্দ্ধেক আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে যেখানে এই কেশ পড়িল, সেইখানেই এক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হইল। সে সবের নাম হইল কেশবতী; স্রোতস্বিনীগুলি মিলিয়া একটি বৃহত্তর কেশবতীনদী * হইয়া বাঘমতীতে আসিয়া পতিত হইল। তারপর গুহ্যেশ্বরীতে গিয়া মঞ্জুশ্রীপাটনে তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মৃগরূপে সেখানে বিচরণ করিতেছেন। শিষ্যদিগকে তিনি বলিলেন, ইঁহারা স্বয়ম্ভূ ও গুহ্যেশ্বরীর উপাসক এবং এই দেশের অধিবাসীদের রক্ষক। এই বনের নাম তিনি মৃগস্থলী রাখিলেন। শিষ্যদের মধ্যে গৃহস্থগণকে মঞ্জুপাটন নগরে বাস করিতে আদেশ দিয়া এবং ভিক্ষুদের কোনও বিহারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধও অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেব তখন একটি পরমজ্যোতিরূপে প্রকাশিত হইলেন। জ্যোতিতে সপ্তস্বর্গ এবং সপ্তপাতাল পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চলিয়া গেলেন। মহাদেবের জ্যোতির্ম্ময়রূপ যেস্থলে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার নাম হইল পশুপতি। এখানে এখনও মহাদেবের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে, নাম পশুপতি মন্দির।

ধর্ম্মাকরের বংশীয় রাজগণ মঞ্জুপাটনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ত্রেতাযুগের অবসানে রাজা সুধন্বা মঞ্জুপাটন ত্যাগ করিয়া ইক্ষুমতী নদীর তীরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহার নাম হইল, সাঙ্কাশ্যা। সাঙ্কাশ্যা হইতে তিনি জনক পুরে গিয়া জনকনন্দিনী সীতার পাণিপ্রার্থী হইলেন। জনক সুধন্বাকে বধ

* এই কেশবতীই পরবর্ত্তী কালের বিষ্ণুমতী নদী।

করিয়া সাঙ্কাশ্যা নগরে আপনার ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।* কুশধ্বজের বংশধরগণ কিছুকাল নেপালে রাজত্ব করিলেন।

দ্বাপরযুগে কনকমুনি বুদ্ধ শোভাবতী হইতে আসিলেন। স্বয়ম্ভূ এবং গুহ্যে-শ্বরীর তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি স্বর্গে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিলেন। বারানসী হইতে তারপর কাশ্যপবুদ্ধ আসিলেন। তীর্থদর্শন করিয়া এবং সমাগত জনগণকে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তিনি গৌড় বা বঙ্গদেশে রাজা প্রচণ্ডদেবের নিকটে গেলেন। তাঁহার আদেশে প্রচণ্ডদেব স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে আসিয়া গুণাকর বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পর কাশ্যপবুদ্ধ অন্তর্হিত হইলেন। প্রচণ্ডদেব ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া সকল শাস্ত্রবিদ্যার অধিকারী হইলেন, তারপর শান্তশ্রী নামে আচার্য্য হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। পাপপূর্ণ কলিযুগ সমাগত প্রায় দেখিয়া আচার্য্য শান্তশ্রী স্বয়ম্ভূজ্যোতি প্রস্তরে আবৃত করিয়া তাহার উপরে একটি চৈত্য ও মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। চৈত্যের পাঁচটি প্রকোষ্ঠের নাম—বসুপুর, অগ্নিপুর, বায়ুপুর, নাগপুর এবং শান্তিপুর। এই শান্তিপুর তিনি যোগমগ্ন হইয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে বারাণসীর বিক্রমশীল বিহার হইতে ধর্ম্মশ্রীমিত্র নামে একজন পণ্ডিত ভিক্ষু নেপালে আসিলেন। একদিন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে একটি দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র তিনি দেখিলেন, যাহার অর্থ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মহাচীনে মঞ্জুশ্রীর নিকটে গিয়া এই মন্ত্রের অর্থ বুঝিবেন, এই সংকল্প করিয়া তিনি বাহির হইলেন। মঞ্জুশ্রী যোগবলে ভক্তের এই চেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া স্বয়ম্ভূপর্ব্বতের নিকটে আবির্ভূত হইয়া একটি সিংহ ও শার্দ্দূল লাঙ্গলে জুড়িয়া একখণ্ড জমি চষিতে আরম্ভ করিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ধর্ম্মশ্রীমিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জুশ্রী তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে তৎক্ষণাৎ একটি বিহার সৃষ্টি হইল। মঞ্জুশ্রী ভক্তশিষ্যকে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া এই বিহারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। বিহারের নাম হইল বিক্রমশীল। ক্ষেত্রের নাম হইল সাবাভূমি। এইখানেই কৃষকেরা সকলের আগে ধান্য রোপণ করে। বর্ত্তমানে এই বিহারের নাম থামবাহিল বা থাবমেল। সাবাভূমি ভগবান্‌ক্ষেত নামে পরিচিত।

তখন কুশধ্বজের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রচণ্ডদেবের পুত্র শক্তি-দেব গৌড় হইতে আসিয়া নেপালের রাজা হইলেন। ইহার এক বংশধর গুণকামদেব কোনও গুরুপাপে কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। দেবগণের রোষে দেশে ভীষণ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইল। গুণকামদেব শান্তিপুরে যোগমগ্ন শান্তশ্রী বা শান্তিকরদেবের আরাধনা করিয়া নবনাগের উপরে প্রভুত্বলাভ করিলেন। এই নাগেরাই বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া মৃতপ্রায় দেশকে পুনর্জীবিত করিল। সেই প্রাচীনকাল হইতে নাগদহে লুক্কায়িত কর্কোটক নাগও ইহাদের

* রামায়ণেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

মধ্যে ছিল। বহু আয়াসে গুণকামদেব কর্কোটক নাগকে হস্তগত করেন। ইহাকে লইয়া আসিবার সময় গুণকামদেব স্বয়ম্ভুপর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্ব পাদদেশে বিশ্রাম করেন। এখানে কর্কোকের একটি মূর্ত্তি এখনও আছে এবং স্থানের নামও 'নাগশীলা'। যে পথে তিনি নাগকে লইয়া আসেন, সে পথের নামও হইল "নাগবাট।" গুণকামদেব কর্কোটক নাগকে আচার্য্য শান্তিকরদেবের নিকটে লইয়া আসিলেন। তখন সকল নাগেরা তাঁহাকে পূজা করিল। তারপর তাহাদের রক্তে অঙ্কিত এক এক খানি চিত্র তাঁহাকে দিয়া কহিল, যখনই দেশে অনাবৃষ্টি হইবে, এই নাগচিত্রাবলীর পূজা করিলেই প্রচুর জলবর্ষণ হইবে। এখনও নেপালে অনাবৃষ্টি হইলে এই নবনাগ-চিত্রের পূজা হয় এবং গৃহে গৃহে চিত্রের ছোট ছোট প্রতিকৃতি রাখা হয়।

পরবর্ত্তী আর এক বংশধর সিংহকেতুর রাজত্বকালে সিংহল নামক একজন বণিক পাঁচশত বণিককে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণদিকে বহুদূর গিয়া সাগরতীরে আসিলেন। সাগর পার হইয়া একদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাক্ষসের উপদ্রবে সত্বর তাঁহারা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ফিরিবার পথে সাগর পার হইবার সময় রাক্ষসীদের মায়ায় তাঁহার সহচরগণ সকলে বিনষ্ট হইল। লোকেশ্বর আর্য্য-অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় সিংহল একা রক্ষা পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বীপ তাঁহার নাম হইতে সিংহল নামে পরিচিত হইল। সাগরপারস্থিত এক রাক্ষসী তাঁহার সঙ্গে মায়ারূপে তাঁহার প্রণয়িণী হইয়া আসিয়াছিল। সাঙ্কাশ্যার রাজা মায়ারূপিনী এই রাক্ষসীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। রাক্ষসী রাজাকে ভক্ষণ করিল।

প্রজারা সিংহলকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় রাজসিংহাসন আবার শূন্য হইল। দীপাঙ্কর বুদ্ধের পীঠস্থান দীপাবতীনগরে সর্ব্বানন্দ নামে একজন রাজা ছিলেন। বুদ্ধের অবতার বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। সর্ব্বানন্দ এই সময়ে গুহ্যেশ্বরীক্ষেত্রে আসিলেন এবং তিনিই রাজা হইলেন।

দীপাঙ্কর বুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কলিযুগে বুদ্ধ হইতেই লোকের মুক্তি হইবে এই বাণী ঘোষণা করিলেন। সর্ব্বানন্দ রাজপুরীর নিকটে দীপাঙ্কর বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি চৈত্য এবং মন্দির তাঁহার পূজায় উৎসর্গ করিলেন। এই স্থানেরও নাম হইল দীপাবতী।

এই স্থানে মণিচূড় প্রভৃতি বহু রাজা, ঋষি ও দেবদেবীরা আসিয়া তপস্যা করিতেন। মহর্ষি 'নে' ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাগমতী ও কেশবতীর (বিষ্ণুমতীর) সঙ্গমস্থলে তিনি বহুদিন তপস্যা করেন। তারপর স্বয়ম্ভূ এবং বজ্রযোগিনীদেবীর * আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তিনি অধিবাসীদিগকে

* নেপালের বৌদ্ধ পুরাণ তন্ত্রে চারিজন প্রধানা যোগিনীর উল্লেখ আছে,—মণিযোগিনী, বজ্রযোগিনী, বিদ্যাধরীযোগিনী ও হিঙ্গুযোগিনী। পরবর্ত্তী হিন্দুতন্ত্রে দুর্গার চৌষট্টি যোগিনীর নাম ও কোটিযোগিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সদ্ধর্ম্মে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। ইহার নাম হইতেই দেশের নাম হইল 'নেপাল'—অর্থাৎ 'নে' মুনির পালিত দেশ।

বহুকাল পরে দেশ আবার অরাজক হইল। তখন পূর্ব্বদেশবাসী কিরাতেরা আসিয়া নেপাল অধিকার করিল। পশ্চিম দিকে সুপ্রভা * নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। ইহাদের শেষ রাজা শঙ্কুর রাজত্বকালে কাঞ্চি-নগরের † রাজা ধর্ম্মদত্ত কাশীতে কোনও যোগীর নিকট বহু তীর্থের মহিমার কথা শুনিলেন। এক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া অপর নয় পুত্র এবং মন্ত্রী বুদ্ধিক্ষেমকে সঙ্গে লইয়া তিনি নেপালে আসিলেন। কিরাতরাজ শঙ্কুকে পরাভূত করিয়া তিনি নেপাল অধিকার করিলেন এবং বিশালনগর নামক একটি নগর স্থাপন করিয়া সেখানে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। পশুপতিতে একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বহু ধনরত্ন তিনি এই মন্দিরে উৎসর্গ করিলেন। একধারে একটি চৈত্যও নির্ম্মিত হইল। চৈত্যের নাম হইল ধর্ম্মদত্ত চৈত্য।

সহস্র বৎসর পরে ধনাসুর নামে এক দৈত্য নেপাল অধিকার করিল। ধনাসুরের স্ত্রী বসুন্ধরাদেবীর আরাধনা করিয়া প্রভাবতী নামে একটি নদীরূপিণী কন্যালাভ করিল। ধনাসুর কন্যার জন্য একটি ক্রীড়াসরোবর সৃষ্টি করিবার জন্য উপত্যকা হইতে জলবহির্গমণের দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সমগ্র উপত্যকা আবার জলপূর্ণ হ্রদে পরিণত হইল।

নাগহ্রদ আবার হ্রদ হইল। মহাবল কুলীক নাগ আবার ফিরিয়া আসিয়া ভগবান্ মঞ্জুশ্রীর কীর্ত্তিসমূহ বিনষ্ট করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি আর্য্য অবলোকিতে-শ্বর সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্বকে প্রেরণ করিলেন। তিনি আপনাকে একটি পর্ব্বতের রূপে পরিণত করিয়া নাগের পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন, এই পর্ব্বতের নাম হইল কৈলেশ্বর। এই ঘটনায় তক্ষকনাগ অতিক্রুদ্ধ হইয়া হ্রদে আসিয়া ভয়ঙ্কর উপদ্রব আরম্ভ করিল। এই পাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া নেপালের মধ্যবর্ত্তী গোকর্ণতীর্থে মঞ্জুশ্রীর প্রসাদলাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। নাগকুলের শত্রু গরুড় তাহাকে আক্রমণ করিলে তপোবলে বলীয়ান্ তক্ষক গরুড়কে জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখিল। গরুড় স্বীয় প্রভু বিষ্ণুর কৃপাপ্রার্থনা করিল। বিষ্ণু চক্রদ্বারা তক্ষককে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মঞ্জুশ্রীর উপাসক তক্ষককে বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর সুখবতী ভুবন অর্থাৎ স্বর্গ হইতে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণু ভক্তিসহকারে তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিলেন। আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর গরুড়ের সঙ্গে তক্ষকের মিত্রতা স্থাপন করিয়া দিলেন। তারপর গরুড় বাহন বিষ্ণু এবং সিংহবাহন অবলোকিতেশ্বর আকাশ পথে উঠিয়া একটি পর্ব্বতশীর্ষে অবতীর্ণ হইলেন। এই পর্ব্বতের নাম হইল চারু বা চাঙ্গু নারায়ণ।

এই সময়ে ভিক্ষু নাগার্জ্জুনপাদ জাতমাত্রোচ্চ পর্ব্বতে একটি গুহা খনন করিয়া সেখানে অক্ষোভ্যবুদ্ধের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন

---

* বর্ত্তমান থানকোট।

† মাদ্রাজের কাঞ্চিপুর বা কঞ্জিভরম্।

উপত্যকা প্লাবিত হইয়া জল এই মূর্ত্তির নাভিদেশ পর্য্যন্ত উঠিল, নাগার্জ্জুনপাদ দেখিলেন একটি নাগ জলের উপরে ভাসমান থাকিয়া ক্রীড়াচ্ছলে জলোচ্ছাসবর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। তখন তিনি নাগটিকে ধরিয়া সেই গুহার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন. যখনই গুহা মধ্যে জলের প্রয়োজন হইবে, এই নাগ সেই জল প্রদান করিবে। নাগের নাম হইল 'জলপুরিত।' এখন পর্য্যন্ত লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, গুহামধ্যে জলের সকল প্রয়োজন এই নাগই পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানে নাগার্জ্জুনপাদ একটি মৃন্ময়চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, গুহায় থাকিয়া তিনি অনেক তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং এইখানেই তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন। স্থানটি বড় একটি তীর্থ হইল এবং এই সাধু ভিক্ষুর নাম হইতে পর্ব্বতের নামও হইল 'নাগার্জ্জুন।'

মৃত্যুর পর মুমুক্ষু বৌদ্ধগণের মুখের অস্থি এইস্থানে প্রেরিত হয়। অস্থি প্রথমে আকাশে নিক্ষেপ করা হয়, তারপর মাটিতে পুতিয়া তার উপরে একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করা হয়।

সমস্ত উপত্যকা হ্রদরূপেই রহিয়া গেল। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন নাকি এইখানে একবার আসিয়া পাথরের নৌকায় জলক্রীড়া করেন। ধনাসুরদুহিতা প্রভাবতী তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। কতদিন পরে শেষে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ধনাসুরকে নিহত করিয়া, দক্ষিণদিকের পর্ব্বতদ্বার মুক্ত করতঃ নদীরূপিনী প্রভাবতীকে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। হ্রদ জলহীন হইয়া আবার উপত্যকায় পরিণত হইল। হরিবংশে প্রভাবতীহরণের যে উপাখ্যান আছে, তাহার সঙ্গে এই আখ্যানের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। হরিবংশে প্রভাবতীর পিতা দুর্গম বজ্রপুরের অধীশ্বর দানব বজ্রনাভ। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ হয়।

বহুকাল উপত্যকা জলহীন হইয়া রহিল। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভাট-ভাটিয়ানী ও তাহাদের পুত্র * এই তিন মায়ারূপ ধরিয়া এখানে আসিলেন। একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা স্বয়ম্বত নামক একজন ঋষিপুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা মণিযোগিনী দেবীর কৃপায় বহু ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই ধন তিনি দীন দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে এক মহাবীরের জন্ম হইয়াছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নেপালে আসিয়া তিনি বীরবিক্রমজিত নামে আপনার পরিচয় দিয়া রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

কোথা হইতে কেমন করিয়া রাজা এত ধন পান, জানিতে পারিয়া তিনিও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ মশলায় পরিলিপ্ত করিয়া একটি প্রকাণ্ড কটাহে আপনাকে তিনি ভাজিয়া ফেলিলেন। মণিযোগিনী সেই ভর্জ্জিত দেহপিণ্ড ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং

* রাজধানী কাটামুণ্ডের নিকটেই ইংরেজ রেসিডেন্টের বাসগৃহের পূর্ব্বে ভাটভাটিয়ানীর মন্দির আছে। পুরুষ, স্ত্রী ও বালক পুত্র—এই ত্রিমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁরা নষ্ট হইলে কুষ্ঠরোগ হয়, সাধারণের মধ্যে এইরূপ সংস্কার আছে।

ধনের কল্পতরু তাঁহাকে দান করিলেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া বিক্রমজিতকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে গেলেন।

মণিযোগিনী দেবীর নিকটে ইনি বত্রিশশক্তি-সমন্বিত একখানি সিংহাসন লাভ করেন। এই সিংহাসনে বসিয়া তিনি রাজধর্ম্ম পরিচালনা করিতেন। কালপূর্ণ হইলে পুত্র বিক্রমকেশরীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি মণিযোগিনীর তীর্থে দেহত্যাগ করিলেন।

শতরুদ্র বা শিবপুরী পর্ব্বতের পাদদেশে বিক্রমজিত বুদ্ধনারায়ণের * একটি চতুর্ভুজ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিগ্রহের সম্মুখস্থ কুণ্ডটি পূর্ণ রাখিবার জন্য দুইটি ধারাও উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিক্রমকেশরীর রাজত্বকালে সহসা একদিন এই নারায়ণধারা শুষ্ক হইল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কহিলেন, বত্রিশশক্তি বিশিষ্ট কোনও মানবের বলিদান ব্যতীত ধারায় আর জল বহিবে না। রাজা কিছুকাল চিন্তা করিয়া পুত্র ভূপকেশরীকে কহিলেন, "চতুর্থ দিনে বস্ত্রাবৃত যে পুরুষকে কুণ্ডের উপরে শয়িত দেখিবে, তাহাকে বলি দিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা নিজে গিয়া সেই কুণ্ডের উপরে বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিলেন। রাজপুত্র না জানিয়া তাঁহাকেই বধ করিলেন। রাজপুত্র যখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি পিতৃহত্যা করিয়াছেন, তখন যারপরনাই অনুতপ্ত হইয়া, মাতার হস্তে রাজ্য ভার দিয়া, পাপমুক্তির জন্য মণিযোগিনীর তীর্থে গিয়া তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দেবীর কৃপা হইল, তিনি তপস্বীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "একক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া পরস্পর চারিটি শ্রেণীর দেবমূর্ত্তি পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ঐ সারস এই পর্ব্বত হইতে যেখানে গিয়া বসিবে, সেইস্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিও।"

স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ভূপকেশরী সেখানে বৃহৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। বোধনাথের মন্দির † নামে ইহা প্রসিদ্ধ। ভোটিয়ারা এই মন্দিরটিকে বড় একটি পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস তাহাদের আদি লামা মৃত্যুর পর নেপালের রাজারূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মন্দির নির্ম্মিত হইল, রাজপুত্র মণিযোগিনীর পিঠে গিয়া পূজা করিলেন। দেবী আবির্ভূতা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি পাপমুক্ত হইলে। কলিযুগের তিন সহস্র বৎসর গত হইলে তোমার পিতামহ আবার এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বিক্রম আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তিনি 'বিক্রম সংবৎ' প্রবর্ত্তন করিবেন।

* এই নারায়ণ কখনও 'জলশয়ান নারায়ণ' কখনও বা 'বুদ্ধনীলকণ্ঠ' নামেও পরিচিত ছিলেন।

† মন্দিরটির পরিধি একক্রোশ নয়,—তিন শত গজ মাত্র। অপর একটি কথা আছে, এই যে বিকমাজী রাজার পুত্র মানদেব পিতৃহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মণিযোগিনী দেবীর আদেশে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

রাজপুত্রের মাতা অতি দক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন করেন। বহু মন্দিরে তিনি বহু দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার মধ্যে নবসাগর-ভগবতী এবং শোভা-ভগবতীর মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাটামুণ্ড উপত্যকার পূর্ব্বে বানেপা উপত্যকায় বাঘমতী নদীর তীরে একটি শ্মশানে শোভা-ভগবতীর মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রাণীর মৃত্যুর পর রাজ ভোজ বিশাল নগর অধিকার করিয়া বীর বিক্রমজিতের বত্রিশ-সিংহাসনে বসিতে প্রলুব্ধ হইলেন। রাজা সিংহাসনের নিকটে আসিবামাত্র সিংহাসনের বত্রিশ শক্তি এক একটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজা-বিক্রমজিতের এক একটি কীর্ত্তি-কাহিনী বিবৃত করিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ভোজ ইহার পরেও যেমন সিংহাসনে উঠিতে যাইবেন, অমনই সিংহাসন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল।*

যাহা ‥উক ভোজ বিশালনগরে রাজা হইলেন। কিন্তু তাঁহার গর্ব্বিত আচরণে রুষ্ট হইয়া নবসাগর-ভগবতী ভূগর্ভ হইতে অগ্ন্যদ্গম করাইয়া বিশালনগর বিনষ্ট করিলেন।

সহস্র বৎসর পরে মারবার দেশের পিঙ্গলা নাম্না কোনও রাণী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া স্বপ্নাদেশে গুহ্যেশ্বরীতে আগমন করেন। বহালকোট নামক স্থানে তিনি একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বহু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারে নাম হইল পিঙ্গলা বাহাল। তাঁহার এই কঠোর তপস্যার কথা শুনিয়া স্বামী আসিয়া আবার তাহাকে গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধমার্গী পুরোহিতদের উপরে বিহারের ভার অর্পণ করিয়া রাজা ও রাণী স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

বহুকাল চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতাদের পরম প্রিয়স্থান চিরকাল হীনশ্রী হইয়া থাকিতে পারে না। তাই চারিজন ভৈরব ও অনেক দেবদেবী আসিয়া নেপালকে আবার ধনে জনে পূর্ণ করিলেন। ইঁহারাই দ্বাপরযুগের অধিপতি হইলেন। ক্রমে দ্বাপরযুগের শেষ হইল, কলিযুগের আরম্ভ হইল।

কলিযুগের পৌরাণিক বৃত্তান্তের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যও অনেক মিশ্রিত আছে। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

সাময়িক ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

বাঁকিপুরে সাহিত্য সম্মিলন।

আবার বড়দিন আসিতেছে,—দেশময় বড়দিনের সভাসমিতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঁকিপুরে

* এই আখ্যায়িকা ভারতের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র আখ্যায়িকার রূপান্তর।

সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে; তাহার সভাপতিত্বে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৃত হইয়াছেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালনার রীতি সম্বন্ধে শ্রীযুত ভূপেন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মালঞ্চে প্রকাশিত হইল। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, পরিচালকবর্গকে সে সম্বন্ধে আমরা একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। দেশের সহিত্যিকবর্গের বেশ একটা মিলনের সমারোহ হয় বটে, কিন্তু যে ভাবে এখন সম্মিলন পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে তেমন কোনও কাজের মত কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ সম্মিলনেব একটি বড় লক্ষ্য থাকা উচিত, সম্মিলিত সাহিত্যিকবর্গ যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আলাপ পরিচয়ে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ অবসর বড় হয় না। তিন দিন চারিটি ভাগে চারিটি সভা হয়, সভায় ক্রমাগত প্রবন্ধ পাঠ হয়। রচনার তালিকা আধাআধি করিয়া অর্দ্ধেক সময় যদি সভাপতি সভার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল করিয়া প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে খোলা ভাবে আলাপ আলোচনা করেন, তবে উপস্থিত সকলেরই অধিকতর তৃপ্তি ও উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

তারপর প্রবন্ধ পাঠের কথা। বহু প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। সকলেই তাহা পড়িতে চান; কিন্তু সময়ে কুলায় না। অল্পমাত্র প্রবন্ধই সম্পূর্ণ পঠিত হয়। কোনটা আংশিক মাত্র পড়া হয়। কোনটা পড়াই হয় না,—পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় মাত্র। চারিটি ভাগে সভা হয় বলিয়া সকলে সকল প্রবন্ধ শুনিতেও পারেন না। যাঁরা লেখেন, তাঁদের তৃপ্তি হয় না। যাঁদের জন্য লেখেন, তাঁদেরও শোনা হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ শেষে সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য যাঁর যাঁর প্রবন্ধ মাসিক-পত্র গুলিতে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলের প্রবন্ধ সে মাসিকেও আবার গৃহীত ও প্রকাশিত হয় না। সুতরাং প্রবন্ধলেখকের শ্রম এবং সম্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার ব্যয়—অনেক স্থলেই বৃথা হয়। এ সম্বন্ধেও শ্রীযুত ভূপেন্দ্রবাবু যে যে কথা বলিয়াছেন,তাহাও চিন্তার বিষয় বটে। পঠিত প্রবন্ধ-গুলি যদি শেষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবু সেগুলি রক্ষিত হয় এবং লোকের জ্ঞানগোচরে আসে। কিন্তু এক বর্দ্ধমানে ব্যতীত আর কোথা হইতে এরূপ পুস্তক বাহির হয় নাই। বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলন হইতে যে বৃহৎ পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও কম নয়। সর্ব্বত্র ত এরূপ উদার সাহিত্য-সেবী মহারাজাধিরাজ মিলে না? এ ব্যয় ভার বহন করিবে কে? চাঁদা যাহা উঠে, প্রতিনিধিবর্গের সুভোগ্য ভোজ্যপানীয়েই তাহা ব্যয় হয়। এক একবার মনে হয়, বার মাস ত আমরা মোটা ডাল ভাতও মাছের ঝোলই খাই। তিন দিন পরের পয়সায় এই রাজভোগে উদরপূর্ত্তি নাই করিলাম। ইহাতে সাময়িক 'মিষ্টরসে রসনাতৃপ্তি' হইলেও অন্নবস্তুর উদরাময় ব্যতীত আর কোনও ভাবী ফল ত দেখা যায় না। এ ব্যাপারটা ব্যয় সংক্ষেপে সারিয়া পয়সাগুলি প্রবন্ধ ছাপাইবার জন্য ব্যয় করিলে মন্দ কি? তবে ভোগ-বিলাসী বড়লোকও অনেকে যান, তাঁহাদের কি গরীবানা খাওয়ায় চবিবে?

লোকের অবস্থার হিসাব করিয়া জনেজনের পৃথকরূপ আহারের ব্যবস্থা করা কিছু চলে না। সেট ভালও দেখায় না। তবে একটি কথা ভরসা করিয়া বলিতে চাই। এদেশে পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া প্রণামী দিবার প্রথা আছে। অবস্থা অনুসারেই সকলে প্রণামী দিয়া থাকেন। বাণাপূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাঁহারা যান, অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু প্রণামী তাঁহারা দিলে মন্দ কি? খালি হাতে উদর পূরিয়া কেবল প্রসাদ খাইয়া তাঁহারা নাই আসিলেন। মা কমলার বরপুত্র যাঁহারা, তাঁহারা না হয় গরীব মাসীর পূজায় একদিন অঞ্জলি ভরিয়াই ধনরত্ন প্রণাম-উপহার দিন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কতই তাহাতে তাঁহাদের খালি হইবে? কমলা বরং ইহাতে আরও কৃপা তাঁহাদিগকে করিবেন। বাণীর-সেবাপরায়ণ পুত্রের গৃহে কমলা চঞ্চলা নন, অচলা হইয়াই থাকেন।

কন্যাদায়ের প্রতিকার—কন্যার শিক্ষা।

অনেক বরপণ-নিবারণী ও কন্যাদায় প্রতিকারিনী সভা হইয়াছে,—এখনও হয়। কিন্তু বরপণও কমিল না, কন্যাদায়ের প্রতিকারও কিছু হইল না। মালঞ্চে আমরা বহু প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যেসব মূল কারণে বর্ত্তমান যুগে বরপণ এত অধিক দুঃসহ রকম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সেই সব কারণের নিরাকরণ ব্যতীত দূর হইবার নহে, এবং সে কারণও সহজে নিরাকৃত হইবার নহে। আগে যে সব সমাজবন্ধনের অধীন হইয়া সামাজিকগণ চলিতেন, সে সব বন্ধন এখন যারপরনাই শিথিল হইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, আমাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে সমাজ কোনও মতেই সামাজিকগণকে আপন শাসনগণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। সমাজশক্তি বলিয়া একটা শক্তিই এখন তেমন দেখা যায় না। সমাজনায়ক কোথাও এমন কেহ নাই, যাঁহাদের বিধান সকলে মানিবেন। এরূপ অবস্থায় বৈবাহিক সম্বন্ধে দেনাপাওনার একটা বাঁধানিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকা অসম্ভব। কে তাহা প্রবর্ত্তন করে? নিয়ম ভাঙ্গিলে কে তাহার শাসন করে? মাঝে মাঝে দুই এক-জন তাঁহাদের স্বাভাবিক উদারতাবশতঃ পুত্রের বিবাহে লম্বা দাবী হয়ত করিবেন না, ইহাই মাত্র সম্ভব। সাধারণভাবে সকলেই এমন একটা যো পাইয়া স্বার্থত্যাগ করিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। তাই বরপণ কমিবে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ইহাই হইবে ও হইতেছে যে দরিদ্র গৃহস্থগণ অনেকেই যৌবনের পূর্ব্বে বা প্রারম্ভেই আর কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না। বহুকন্যা যৌবনপ্রাপ্তির পরেও বহুদিন পিতৃগৃহে অনূঢ়া অবস্থায় থাকিবেন। এখনও এরূপ দেখা যায়, কন্যাবয়স্থা হইলে অভিভাবক তার বিবাহের জন্য বড় 'আকুলি বিকুলি' করেন। আর কিছুদিন পরেই চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইবেন। কুলীন ব্রাহ্মণঘরের কন্যাদের মত অনেক কন্যাই পিতৃগৃহে সুদীর্ঘ কৌমার্য্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হইবেন। অবস্থাটাও ক্রমে লোকের সহিয়া যাইবে। তখন বিবাহার্থী পুরুষ হয়ত বিবাহ্যা কন্যা খুঁজিয়া নিবেন। এখন কন্যার পক্ষ হইতেই বর খোঁজা হয়, বরের পক্ষ হইতে কন্যা খোঁজা বড় হয় না। চাওয়া পাওয়ার (demand and supply এর) হিসাবে বরের পক্ষেই বেশী সুবিধা রহিয়াছে। তাই বরের দরও বড় চড়িয়া

আছে। কিন্তু এমন একটা অবস্থা যখন আসিবে, কন্যাপক্ষ অনেকে হতাশই হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবেন, বরপক্ষ কন্যা খুঁজিবেন, তখন কাজেই বরের দর নামিতে পারে। তবে কন্যা প্রতিপালনের দায় এড়াইবার জন্য কন্যাপক্ষের 'বর চাওয়াটা' বেশী থাকিয়া যাইবার আশঙ্কাও একটা আছে। কিন্তু যখন চাহিয়াও মিলে না, মিলান সামর্থ্যের অতীত হয়,—তখন 'পাওয়া' যতই কাম্য হউক, 'চাওয়া' লোকে কিছু ছাড়িয়া দেয় বটে। এই যা ভরসা।

যাহাই হউক, বরের এই চড়াদরের ফলে নূতন একটা অবস্থা সমাজে বড় দ্রুত আসিয়া পড়িতেছে এই যে হিন্দুর ঘরে ঘরে অনূঢ়া কন্যা এখন বহুবয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিবে। হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উপরে ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা বলা কঠিন। ভালমন্দ যাহাই হউক, তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ভাল যদি হয়, সমাজ-সংস্কারকদের বড় একটা কাজ অথবা বক্তৃতার বিষয় কমিয়া যাইবে। মন্দ যদি হয়, সামাজিকবর্গ সামাজিকপাপের—সামাজিক নীতিবিদ্রোহের ফলভোগ করিবেন। যে সমাজ নিজের মঙ্গলে নিজে উদাসীন, আপনার ধর্ম্মরক্ষায় গৌরবরক্ষায় যাহার সামর্থ্য নাই, তাহাকে বিধ্বস্ত ও গ্লানি-পীড়িত হইতেই হইবে। কে আর তাহার উপায় করিতে পারে?

আর কিছু কেহ পারুন না পারুন, দেশের হিতচিন্তা যাঁহারা করেন, একটি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের মন এখন দেওয়া উচিত। সেটি সর্ব্বত্র এই অনূঢ়া কন্যাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা। সংশিক্ষায় ধর্ম্মশীলা ও উন্নতচরিত্রবতী হইয়া তাঁহারা যাহাতে আপনাদের মর্য্যাদা রাখিতে পারেন, এবং দরিদ্র পিতাভ্রাতাদির গলগ্রহ না হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন, এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এখন করিতে হইবে। কাজ কঠিন—বড় কঠিন—বহুব্যয় সাপেক্ষও বটে। কিন্তু যদি ইহা করা যায়, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বহুপরিবর্ত্তন ঘটিলেও, একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে না। নারীজীবনের পবিত্রতা গৃহের কল্যাণের ও সমাজধর্ম্ম রক্ষণের প্রধান আশ্রয়। তা যদি আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, নূতনযুগের নূতন অবস্থায় যে নূতন নীতিতেই আমাদের সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবন গঠিত হউক না, আমাদের সমাজ ও গৃহ কল্যাণভ্রষ্ট হইবে না।

শুভ অনুষ্ঠান।

বারাণসীতে একটি বেদবোধিনী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি বাঙ্গালী পাঠকের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা অক্ষরে ঋগ্‌বেদ সংহিতা প্রকাশের আয়োজন করিতেছেন। পুস্তকে মন্ত্র, তার বিশদ অন্বয়মুখী টিকা, সায়ণভাষ্য এবং শেষে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। পৃথক একধারে বাঙ্গালাতে বৈদিক ব্যকরণগত টিকাও থাকিবে। বেদের এইরূপ একটি সংস্করণ যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। বেদ আমাদের ধর্ম্মের মূল। বেদের দোহাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সর্ব্বদা দিয়া থাকেন,—কিন্তু বেদের বিদ্যা বাঙ্গলাতে একরূপ নাই বলিলেও চলে। ব্রাহ্মণকে বেদ পড়িতে হয়, নহিলে ব্রহ্মণ্য থাকে না। তাই চারিবেদের চারিটি ছন্দ সন্ধ্যা আহ্নিকের মন্ত্রের মধ্যে উদ্ধৃত করা আছে। যাঁহারা সন্ধ্যা আহ্নিক করেন,

তাঁহাদিগকে ঐ চারিটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বেদপাঠ এই পর্য্যন্তই হয়। উপনিষদ বেদের অঙ্গীয়। অধুনা বহু উপনিষদ গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ বাহির হইতেছে। লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত পণ্ডিতবর শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত মহোদয়ের সঙ্কলিত উপনিষদ গুলিই ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এরূপ বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, যতদূর জানি, সেই গ্রন্থ যাজক ও অধ্যাপক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যত পড়েন, তার অপেক্ষা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক বেশী পড়িয়া থাকেন। তবু অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উপনিষদের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রসংহিতা এখনও অপরিচিতই রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্‌বেদ-সংহিতার কতক অংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী তাহা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেন নাই। রমেশচন্দ্র প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবাদ অবলম্বনেই এই অনুবাদ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের অনুবর্ত্তীই তিনি ছিলেন। এখন দেশীয় পণ্ডিতগণের স্বাধীন অধ্যয়নের ফলে যদি ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসংহিতার এইরূপ একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়,তাহা যে মহাকল্যাণপ্রদ হইবে এবং দেশবাসী যে তাহা আদরে গ্রহণ করিবেন, একথা ভরসা করিয়া বলা যাইতে পারে।

সিংহলে বিশ্ববিদ্যালয়।

সিংহলেও একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। সিংহলের কলেজ এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। সিংহল অবস্থানের হিসাবে ভারতীয় একটি দ্বীপ বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সিংহল ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন নহে,—ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসনবিভাগের অধীন। ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশে—এমন কি একই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্য্যন্ত—পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত সিংহলে কেন হইবে না? হউক, শিক্ষার কেন্দ্র যত বেশী হয়, ততই শিক্ষার বিস্তার অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। ইংলণ্ড আয়তনে ও লোকসংখ্যায় এদেশের অপেক্ষা অনেক ছোট দেশ। আগে মাত্র দুইটি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এখন অনেকগুলি হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এতদিন মাত্র ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার বর্ত্তমান ব্যাপকতা মনে করিলে পাঁচটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় তাহার পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিতেই হইবে। তবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকটা নূতন ধরণের হইতেছে। এক স্থানে যতগুলি কলেজ সম্ভব হইতে পারে, মাত্র সেই সব কলেজ লইয়া সেই সেই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপাধি দান—কেবল ইহাই মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের অধ্যাপনার ভারও নিবেন। ছাত্রগণকে কলেজ সংসৃষ্ট ছাত্রনিবাসে শিক্ষকগণের সঙ্গে তাঁহাদের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা না নিয়া, যাহার পরীক্ষা নিবেন তাহার শিক্ষারও

ব্যবস্থা যদি করেন, তবে যে অনেক ভাল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছাত্রগণ কলেজের ছাত্রনিবাসে অধ্যাপকের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিবে, এরূপ ব্যবস্থার ফল কিরূপ হইবে, ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য ফলেই তাহার বিচার হইবে। এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। এরূপ ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্বন্ধে বাস্তবিক মতদ্বৈধ আছে। তারপর অধ্যাপক যদি গুরু না হন, আর ছাত্র যদি শিষ্য না হয়,—ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন যদি ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্বন্ধের আশ্রয় না হয়,—তবে এরূপ ব্যবস্থায় সুফল ঘটা দুষ্কর। বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু মত ও রুচির অনুযায়ী বহু গৃহে প্রতিপালিত, বহু অবস্থায় অভ্যস্ত, বহুবিধ প্রকৃতির যুবাবয়স্ক ছাত্রদের—অপরিচিত নূতন অধ্যাপকের সঙ্গে সহসা এক বিদ্যালয়ে মিলন মাত্রই যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জন্মিবে, এরূপ আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। যাহাহউক, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হইতেছে। দেখা যাউক, কার্য্যে কি ফল হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয়'—নামের অর্থ কি?

ইংরেজি 'ইউনিভর্সিটি' কথাটির তরজমা করিয়া বাঙ্গলা 'বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি হইয়াছে। ইউনিভার্স (Universe) কথাটির অর্থ 'বিশ্ব'—অর্থাৎ এক-সমষ্টি-ভূত সমগ্র সৃষ্টজগৎ। আবার এক অঞ্চলের সকল কলেজগুলির সমষ্টি লইয়া হয় 'ইউনির্ভার্সিটী'। কাজেই 'ইউনির্ভার্সিটী' নামের মৌলিক অর্থের সহিত 'ইউনিভার্স' বা 'বিশ্ব'—ইহার নিকট সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মনে করিয়াই বোধহয় 'ইউনিভার্সিটী'র বাঙ্গলা 'বিশ্ববিদ্যালয়' করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা ভুল, এবং এই ধারণা সম্ভূত এই তরজমাও ভুল। ইউনিভার্সিটী' শব্দ 'ইউনিভার্স' বা 'বিশ্ব' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হয় নাই। দুইটি শব্দই মূল এক ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়া পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইউনাস্—(Unus) এক, ভার্স (verse) পরিণত, এই দুইটি মূল হইতে 'বহু একে পরিণত' অর্থাৎ একসমষ্টি বলিয়া গৃহীত বা বিবেচিত,—ইহাই দুইটি কথার মৌলিক অর্থ। সৃষ্ট সকল পদার্থের একসমষ্টি-ভূত—সুতরাং 'ইউনিভার্স' অর্থ 'বিশ্ব'। আবার এক স্থানে সমবেত সকল পণ্ডিত এক সমিতিভুক্ত হইয়া শিক্ষাদান করেন, তাই 'ইউনিভার্সিটী' কথাটির মৌলিক অর্থ 'অধ্যাপক-সমিতি'। প্রাচীনকালে ইয়োরোপে যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই—পুস্তক দুর্লভ ছিল,—বড় বড় পণ্ডিতগণ কোনও কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে একত্র হইয়া মৌখিক বক্তৃতায় শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হন। নানা দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা আসিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিত। রাজারা দেখিলেন, এইরূপ অধ্যাপকগণের একত্র সমাবেশ হইতে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে রাজ্যের বহু মঙ্গল হইবে। তাঁহারা এক একস্থানে সম্মিলিত অধ্যাপকগণকে রাজকীয় সনন্দপত্রদ্বারা একমণ্ডলীভুক্ত করিয়া শিক্ষাসম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষ অধিকার প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজকীয় ব্যবস্থায় একত্রীভূত বা একসমিতিভুক্ত এক একটি অধ্যাপক-মণ্ডলীর নাম হইল—'ইউনিভার্সিটী'। প্রাচীন ভারতেও উচ্চশিক্ষাদানের

জন্য প্রসিদ্ধ একএক স্থানে বহু অধ্যাপক একত্র হইয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রতী হইতেন। ইঁহাদের এইরূপ সম্মিলনও একএকটি অধ্যাপক মণ্ডলী বা সমিতি হইয়াছিল। তবে বিশেষ বিশেষ অধিকারের জন্য কোনও রাজকীয় সনন্দের অপেক্ষা ইঁহারা করিতেন না। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই ইঁহারা অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন। রাজারা এবং ধনিব্যক্তিরা বৃত্তি ও ভূমি দান করিয়া অধ্যাপকগণকে প্রতিপালন করিতেন। এই সব অধ্যাপকমণ্ডলী 'পারিষদ' নামে অভিহিত হইতেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কাশী, পুনা প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপক-বর্গ কতক পরিমাণে প্রাচীন সেই সব পারিষদের অনুরূপ। বৌদ্ধ যুগে ভিক্ষুদের বিহারে বা মঠে সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ নানাশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, এবং বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। সুবিখ্যাত নালান্দার বিহার এইরূপ বড় একটি অধ্যাপনার কেন্দ্র ছিল। যাহাহউক, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' পরিবর্ত্তে 'পারিষদ' নামটিই বোধ হয়, ইংরেজি 'ইউনিভার্সিটী' কথার ঠিক দেশীয় নাম হইত। তবে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি গোড়ায় ভুল হইলেও—বেশ নাম হইয়াছে। বড় একটি শিক্ষা কেন্দ্রের অনুরূপ গাম্ভীর্য্য ও মহিমার ভাব এই নামটিতে আছে। তাই বুঝি নামটি সকলেই আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, কেহ করিতেও চাহিবেন না।

প্রাচীন যুগে যে অবস্থায় এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন কোন দেশেরই সেই অবস্থা আর নাই। কিন্তু মোটের উপর শিক্ষাপ্রণালী সেই প্রাচীন ধরণেরই রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সুধী ও চিন্তাশীল লেখক কারলাইল যাহা বলেন, তাহা সকলেরই বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কারলাইলের মত এইরূপ। প্রাচীন যুগে যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, পুস্তক সুলভ ছিল না। পণ্ডিতগণও তাঁহাদের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান বা চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সুযোগ পাইতেন না। সুতরাং তাঁহারা বক্তা এবং ছাত্রেরা শ্রোতা—এইরূপ ব্যবস্থা ব্যতীত তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাদানের এবং ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের শ্রেয়তর পন্থা আর ছিল না। তাই পণ্ডিতগণ বাচিক অধ্যাপনার জন্য একস্থানে সম্মিলিত হইতেন, এবং ছাত্রগণ দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদের বক্তব্য উপদেশ শুনিত। কিন্তু এখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যিনি যে বিষয়েই সাধারণকে শিক্ষাদান করিতে চান, মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে তাহা প্রচার করিতে পারেন। দূর হইতে ছাত্রদের আহ্বান করিয়া বক্তৃতার দ্বারা অধ্যাপনার আবশ্যক হয় না। প্রকৃত পক্ষে, সকল জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গের পুস্তক সংগৃহীত থাকে, এইরূপ একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার বা লাইব্রারীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত কেহ কেহ সেই পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষপদে ব্রতী থাকিলে, বিদ্যার্থিগণের অধ্যয়নের যথা-প্রয়োজন সাহায্য করিতে পারেন। বাকী অধিকাংশ সময় তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় এবং তত্ত্ব-অনুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট থাকিলেই সুফল অধিক হইবে।

সমর সংবাদ।

পশ্চিম রণক্ষেত্রে ঃ—গত জুলাই মাসের প্রথম হইতে ফরাসী দেশের উত্তরাংশে সোম নদীর উভয় তীরে মিলিত ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিণী যে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করেন সে সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। জুলাই মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে মিত্রবাহিনী প্রায় ৪৬ মাইল লাইনে গড়ে ৬৷৷• মাইল অগ্রসর হইয়াছেন! বিগত দুই সপ্তাহ যাবৎ এই রণক্ষেত্রে নূতন আক্রমণের বিশেষ সংবাদ আর কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। আশা করা যায় মিত্রবাহিমী শীঘ্রই নূতন বল সংগ্রহ করিয়া নবোৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবেন।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে ঃ—রুষিয়ার প্রান্তে অষ্ট্রীয়ার গেলিসিয়া প্রদেশে রুষ সেনাপতি ব্রাসিলক যে প্রায় ২৫০ শত মাইল লাইনে অগ্রসর হইতেছিলেন—তাহার উত্তরাংশে লাজক দুর্গের পূর্ব্বে প্রায় ৪০ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর জর্ম্মাণগণ রুষবাহিনীর গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ এবং দক্ষিণাংশে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়। গত মাসের মধ্যে এই রণক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

রুমেণীয়া রণক্ষেত্রে ঃ—রুমেণীয়ার রণক্ষেত্রের দিকে গত মাসে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রুমেণীয়ার উত্তরে অষ্ট্রীয়া, পশ্চিমে সার্ব্বিয়া ও বুলগেরিয়া, দক্ষিণে বুলগেরিয়া এবং পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর ও রুষিয়া; গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে রুমেণিয়া উত্তর সীমান্তস্থিত কার্পেথিয়ান পর্ব্বত মালার প্রধান প্রধান গিরিপথ সমূহে সৈন্য সমাবেশ করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই রাত্রিতে এবং পর দিবসের মধ্যেই রুমেণীয় বাহিনী এই সকল গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে ৮৷১০ মাইল পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ার রাজ্যাস্থিত গ্রাম ও সহরসমূহ দখল করিয়া বসে। প্রথম অষ্ট্রীয়ান বাহিনী এই অতর্কিত আক্রমণের বেগে ক্রমেই হটিয়া যাইতে থাকে। প্রায় একমাস যাবৎ উত্তর অঞ্চলে এইরূপ ব্যাপারই চলিতে থাকে এবং রুমেণীয় বাহিনী স্থানে স্থনে প্রায় ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়।

রুমেণীয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ডোব্রুজা প্রদেশ। এই প্রদেশের পশ্চিমে ও উত্তরে ডানিউব নদী, দক্ষিণে বুলগেরিয়া, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর, উত্তরে ডানিউব নদীর অপর পারেই রুষিয়া। রুমেণীয়া যুদ্ধঘোষণা করিবার পরেই রুষবাহিনী ডানিউব পার হইয়া ডোব্রুজা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বুলগেরিয়ার সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং একটি মিলিত রুষ ও রুমেণীয়া বাহিনী বুলগেরিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। জর্ম্মাণ সেনাপতি ম্যাকেন্‌সেন জর্ম্মাণ, বুলগার ও তুর্কবাহিনী সংগ্রহ করিয়া এই আক্রমণে বাধা দিবার আয়োজন করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডানিউব নদীর তীরে টুটুবাই নামক স্থানে একটি ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পরাজিত হইয়া

মিলিত রুষ ও রুমেণীয়া বাহিনী হঠিতে আরম্ভ করে। তার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যাকেন্‌সেনের আক্রমণে রুষ ও রুমেণীয় বাহিনী প্রায় ৫০ মাইল হঠিয়া রাসোভা টুজলা লাইনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্থানে ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে পর্য্যন্ত চারিদিন ব্যাপী মহাযুদ্ধে ম্যাকেন্‌সেনের বাহিনী পরাজিত হইয়া প্রায় ১০ মাইল হঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের প্রথম মাসের শেষ ভাগে রুমেণীয় বাহিনী উত্তর ও পূর্ব্ব উভয় দিকেই জয়লাভ করিয়াছিল।

যুদ্ধের দ্বিতীয় মাসের প্রারম্ভে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে জর্ম্মাণ সেনাপতি ফকেন-হায়েন বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া উত্তর অঞ্চলে ট্রানসিল ভেনিয়ার পার্ব্বত্য-প্রদেশে রুমেণীয় বাহিনীকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করেন। বটারটার্ণ গিরি সঙ্কটের যুদ্ধে রুমেণীয় বাহিনী বিশেষরূপে পরাজিত হইয়া হঠিয়া আসিতে বাধ্য হয়। প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে রুমেণীয় বাহিনী প্রায় সকল গিরিসঙ্কট হইতে বিতাড়িত হইয়া রুমেণীয়ার সীমান্ত পার হইয়া হঠিয়া আসিতে থাকে। দ্বিতীয় মাসের শেষ ভাগে ফকেন হায়েনের বাহিনী উত্তর অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গিরিপথ দখল করিয়া স্থানে স্থানে রুমেণীয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় মাসে ডোব্রুজা প্রদেশে প্রথম দুই সপ্তাহ যাবৎ উভয় পক্ষই পরস্পর আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। জর্ম্মাণ সেনাপতি ম্যাকেন্‌সেন্—এই অবসরে বহু তুর্কী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম-ভাগে ১৭ই অক্টোবর তারিখে মিলিত রুষ রুমেণীয় বাহিনীকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন এবং পরাজিত বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কৃষ্ণসাগর তীরে কনষ্টাঞ্জা বন্দর দখল করেন। তারপর রাজধানী বুখারেষ্ট হইতে ঐ বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের পার্শ্বস্থিত ডানিউব নদীর তীরে অবস্থিত চার্ণোভেডা নামক সহরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ২০শে তারিখে দুই দিন যুদ্ধের পর ঐ সহর জর্ম্মাণবাহিনী দখল করেন। ইহার ফলে মিলিত রুষ ও রুমেণীয়া বাহিনী উত্তর দিকে রুষ সীমান্তের অভিমুখে হঠিতে থাকে।

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে যুদ্ধের ফলাফল এইরূপ দাঁড়ায়। উত্তর সীমান্ত পার হইয়া যে রুমেণীয় বাহিনী গিরিপথ সমূহ দখল করিয়া স্থানে স্থানে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা পরাজিত হইয়া গিরিসঙ্কট ছাড়িয়া অবশেষে রুমেণীয়ার অভ্যন্তরেও স্থানে স্থানে হঠিয়া আইসে। পূর্ব্ব অঞ্চলে ডোব্রুজার সীমান্ত হইতে যে মিলিত রুষ ও রুমেণীয় বাহিনী বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাও পরাজিত হইয়া প্রায় ১০০ মাইল পশ্চাতে হঠিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং প্রায় সমগ্র ডোব্রুজা প্রদেশ জর্ম্মাণ সেনাপতি অধিকার করিয়া বসেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি রুমেণীয় বাহিনী পশ্চিম সীমান্তস্থিত ডানিউব পার হইয়া অষ্ট্রীয়ার অর্সোভা সহর দখল করিয়া বসে। নবেম্বর মাসের প্রথমে জর্ম্মাণগণ এই বাহিনীটিকে হঠাইয়া দিবার বিশেষরূপ চেষ্টা আরম্ভ করেন। অর্সোভা হইতে পূর্ব্বদিকে যে রেলপথ বুখারেষ্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই লাইনে অর্সোভা

হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে কিলাস্থ জংশন। ষ্টেশন উত্তরে ভালকান্ গিরিসঙ্কটের দিক হইতে অপর একটি রেলপথ আসিয়া সেখানে মিলিত হইয়াছে। নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে জর্ম্মাণ বাহিণী ভালকান গিরিসঙ্কট হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে এই উত্তর দক্ষিণ রেলপথের প্রান্তসীমা দখল করিয়া দাক্ষিণ দকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং কিলাস্থ জংশনষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হয়। কাজেই রুমেণীয় বাহিনী যে অর্সোভা অধিকার করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের পলায়নের পথ এইরূপে বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় তাহারা পশ্চাতে সরিতে আরম্ভ করে। এই রুমেণীয় বাহিনীর পরিণাম কি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই কিলাস্থ জংশন দখল করিয়া জর্ম্মাণ বাহিনী দক্ষিণদিকে রুমেণীয়ায় সীমান্তস্থিত ডানিউব নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং পশ্চিমদিক হইতে প্রায় ৫০ মাইল ব্যাপী রুমেণীয়া দেশের অংশ জর্ম্মাণ অধিকারে আইসে।

তারপর নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে জর্ম্মাণ বাহিনী রুমেণীয়ার পশ্চিম অংশে উত্তরে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে ডানিউব নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে রাজধানী বুখারেষ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এবং বুখারেষ্টের দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে সেনাপতি ম্যাকেনসেনেব একটি বাহিনীও ডানিউব পার হইয়া বুখারেষ্টের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। মিলিত রুষ ও রুমেণীয় বাহিনী শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃই হঠিয়া যাইতে থাকে। তারের সংবাদে প্রকাশ—গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মিত্রবাহিনী বুখারেষ্ট নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং জর্ম্মাণ বাহিনী তাহা দখল করিয়াছে। ১২ই ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ পলায়মান রুমেণীয় বাহিনী রুষ সীমান্তস্থিত মোল্‌ডেভিয়া প্রদেশের সন্নিকটে অবস্থিত বুজেন নদীর নিকটে পৌছিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে রুমেণীয়ার প্রায় দুইতৃতীয়াংশ জার্ম্মাণ অধিকারে আসিয়াছে।

চাট্‌নী।

"দাদা'র স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়?"

"বৌদি!"

"দূর লক্ষ্মীছাড়া। বৌদি কিরে? 'দিদি'—'দিদি'।"

"দিদি যে দাদার বোন্—স্ত্রী নয়।"

"ওরে, ব্যাকরণের স্ত্রী-পুরুষ ভাই বোনেই হয়। যেমন, 'দাদা—দিদি' 'ভাই'—'বোন,'—'ছেলে—মেয়ে', বাবা——"

'পিসি——'

ভক্ত। তবে আসি এখন। প্রণাম। কিছু প্রণামী দিতে পাল্লুম না,—আপনি যোগী—'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগ করেছেন কি না?

সাধু। হাঁ, 'কামিনী-কাঞ্চন' ত ত্যাগই ক'রেছি,—তবে কি জান বাবা—[illegible] কোনও বাধা নাই।

৩য় বর্ষ | মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

প্রথম অংশ—গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্রবন্ধ, রঙ্গকৌতুকাদি

প্রথম অংশ।

বৌদি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৭)

শিশির মীরপুর আসিয়াছে।

পঞ্চমীর সন্ধ্যা; শরতের নির্ম্মল আকাশে শশাঙ্কের হাসি ফুটিয়াছে। বিশ্ব-সৃষ্টিকে ওতপ্রোতভাবে আবেষ্টন করিয়া যেন একটি বিরাট 'ওঁ' অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে; ক্ষীণ, বক্র শশাঙ্ক যেন তাহারই চন্দ্রবিন্দুটি, লোকলোচনের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতলের ছোট একটি কক্ষ; কক্ষটি সুসজ্জিত; পূবের ও দক্ষিণের জানালা-গুলি উন্মুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণের দিকে একটা খোলা ঝুলবারান্দা; রেলিংএর থামগুলির মাথায় মাথায় বিচিত্র চীনামাটীর টব রহিয়াছে; টবে টবে ফুলগাছ, পাতাবাহারের গাছ; ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে; একটা মৃদু পবনপ্রবাহ ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; গন্ধ বিলাইবার জন্য, কক্ষমধ্যে

কে আছে, যেন তাহাকেই খুঁজিতেছিল। কক্ষমধ্যে আর কেহ ছিল না, শুধু—শিশির একটা টেবিলের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে!

বাতাস তাহার উড়ানীখানি একটু উড়াইয়া, কুঞ্চিত ললাটদেশ একটু স্পর্শ করিয়া, কাণের কাছের চুলগুলি একটু নাড়িয়া দিয়া, বহিয়া গেল।

শিশিরের কোনও দিকেই লক্ষ্য ছিল না। তাহার ললাট একটু কুঞ্চিত, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন; হাত দুইখানি মুষ্টিবদ্ধ। সে যে কিছু ভাবিতেছে, তাহা তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়।

এমন সময়ে, উত্তরের দিক্‌কার দুয়ার খুলিয়া কেহ সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যে আসিল, সে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, এবং ধীরে ধীরে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

দক্ষিণের খোলা জানালার পথে হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপরকার স্নিগ্ধ আলোকটাকে মুহূর্তের জন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, এবং লক্ষ্মীর মাথার অনভ্যস্ত গুণ্ঠনটাকে একটু সরাইয়া দিয়া গেল।

শিশির তীব্রদৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল, ঠিক্ তখনই একটু মৃদু হাসিয়া লক্ষ্মী কহিল, "তবু যে একবারটি এলে!"

শিশির দেখিল, লক্ষ্মীর উজ্জ্বল রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। দুই বৎসর শিশির লক্ষ্মীকে দেখে নাই। সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর, বিশ্বকর্ম্মার মতই নিপুণহস্তে একটি বালিকার লীলাচঞ্চল দেহলতার উপর দিয়া তরুণীর সকল সৌন্দর্য্যসম্পদ পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছে!

শিশির দেখিল, লক্ষ্মীর কালো চক্ষের দৃষ্টি আরও নিবিড় হইয়াছে; ঈষৎ বক্র রসপুষ্ট অধরপুট সোহাগের অপেক্ষায়ই যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে! কপোলের বর্ণসুষমার অন্তরালে দ্রুত, উচ্ছ্বসিত শোণিত সঞ্চার যেন ধরা পড়িতেছিল! কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ কৃষ্ণসর্পশিশুর মতই মুখখানির পাশে পাশে লতাইয়া নামিয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। পৃষ্ঠদেশ ছাপাইয়া, অংসে, উরসে, গুচ্ছের পর গুচ্ছ কুন্তল অযত্নবিন্যস্ত হইয়া শোভা পাইতেছিল। কালো চুলের মধ্য দিয়া, নীলাম্বরীর আড়াল দিয়া, কর্ণের স্বর্ণভূষণ মৃদু আলোকসম্পাতে জ্বলিতেছিল, মন্দানিল সংস্পর্শে রহিয়া রহিয়া দুলিতেছিল!

শিশিরকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে লক্ষ্মী কহিল, "কি ভাবছ?"

শিশির একটু চকিতভাবে আবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিল, অন্যমনস্ক-ভাবে কহিল, "ভাবছি, সত্যি তুমি কতটাই বদলে গেছ!"

লক্ষ্মী গর্ব্বিতা, লক্ষ্মী মুখরা, তবু তাহার যেন একটু লজ্জা করিতেছিল। সে একবার তাহার দৃষ্টি নত করিয়া লইল, তারপর একবার চকিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। শিশির তেমনই অন্যমনস্ক, টেবিলের উপরের আলোটার দিকেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে কহিল, "কই, আমি ত কিছুই বদ্‌লে যাইনি!"

—"যদি না বদ্‌লে যেতে, বোধ হয় ভাল হ'ত, লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী স্বামীর কথা ভাল করিয়া বুঝিল না, তবু কহিল, "না, আমি বদ্‌লাই নি!"

শিশির একবার একটু নড়িয়া চেয়ারের উপর ঠিক হইয়া বসিল, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"লক্ষ্মী,"—

লক্ষ্মী এমন একটা সুস্পষ্ট আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল না, একটু চকিত-ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি?"

লক্ষ্মী চাহিয়া দেখিল, শিশিরের দৃষ্টি তীব্র, সে যেন বিচারকের কঠোর পরুষ-দৃষ্টি; লক্ষ্মী দুই পা পিছাইয়া গিয়া, আর একবার স্বামীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "কি বল্‌বে?"

—"লক্ষ্মী, তোমাকে যেতেই হবে,—আজ, এখনি যেতে হবে! দেখ্‌ছ, আমি এখন পর্য্যন্ত কাপড় জামাও ছাড়িনি; তোমার কাছ থেকে একটা শেষ কথা পেতে চাই,"—

"মা বাবার সঙ্গে কি কথা হ'ল?"

এতটা সহজ সুরে লক্ষ্মী উত্তর দিল, যে শিশির তাহা মোটেই পছন্দ করিতে পারিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"তা, তুমি না জান্‌বার কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না; তবু যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, শোন! কাল পূজা, তাঁরা তোমাকে আজ যেতে দেবেন না। আর আমাদের গ্রামের জল হাওয়া নাকি তোমার সহ্য হবে না। তাই যতদিন আমি তোমার থাক্‌বার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমার কর্ম্ম-স্থলেই না কর্‌ছি, ততদিন তোমাকে এখানেই রাখ্‌তে চান্।—বোধহয় সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা; পূজার আপত্তিটা কিছু নয় বলেই মনে হ'ল!"—

লক্ষ্মীর মুখের হাসি অন্তর্হিত হইল, ধীরে ধীরে কহিল, "তা তুমি কি বললে?"—

"আমি নিয়ে যেতেই চেয়েছি, বেশী আর কি বল্‌ব, তাঁদের সেই একই কথা।"

"একবার ভাল করে বলে দেখ,"—

শিশির অস্থিরভাবে কহিল, "না। তা' আর হয় না। এখানে আমি এসেছি, তোমাকে নিয়ে যেতেই,—তুমি যাবে কি না আমি শুন্‌তে চাচ্ছি।"—শিশিরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছিল।

কুক্ষণে শিশির মীরপুর আসিয়াছিল, আরও অশুভ মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিশেষ চিন্তা না করিয়া লক্ষ্মী কহিল,—"মা বাবার অমতে জোর করে যাওয়াটা——"

লক্ষ্মীর মুখের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই অধীর শিশির তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা' হলে চিরদিনই মা বাবার কাছে থাক্‌বার সৌভাগ্য তোমার হ'ক্"—

চেয়ারটা সরাইয়া শিশির তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মীর দুই চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, কহিল, "আমার সৌভাগ্যের কথা বলিনি'; একবার ভাল করে মা বাবাকে বল্‌লে তাঁরা——"

—"না, সে আমি আর পার্‌ব না; আমার দাদার ও বৌদিদির চিঠিকে যাঁরা অপমান করতে পেরেছেন, আমি তাঁদের কাছে যে পর্য্যন্ত বলেছি, সেই যথেষ্ট, আর বেশী,"—

"তার বেশী বল্‌লে ত অপমান কিছু নেই?"

"অপমান!—হাঁ, অপমান বই কি। নিজের আত্ম-সম্মান জ্ঞানকে অপমান করাই হবে!"

লক্ষ্মী দক্ষিণ করাঙ্গুলিগুলি যুক্ত করিয়া বাম পাণিতলের শিথিল মুষ্টি মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"এমন?"—

—"হাঁ, এমনি বটে!"—

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, শিশির ভাবিল, এই লক্ষ্মী! এই নারীকে লইয়াই তাহার সারাজীবন অতিবাহন করিতে হইবে। এই ধনীর দুলালী, বিলাস-লালিতা নারী,—পল্লীর শান্ত বৈচিত্র্য-বিহীন গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে কোথায় তাহার আসন!

লক্ষ্মীর উজ্জ্বল রূপ, বিচিত্র ভূষা, কক্ষের স্নিগ্ধ আলোক-লেখা, পুষ্পগন্ধ-বাহী উদ্দাম-পবন-প্রবাহ, শিশিরের চতুর্দ্দিকে যেন একটা তীব্র উপহাস ও উপেক্ষার রচনা করিয়া তুলিতেছিল।

শিশির দুই পা সরিয়া আসিতে আসিতে কহিল, "লক্ষ্মী, তুমি যখন তর্কের সৃষ্টি করে তুলেছ, তখন তুমি যে যাবে না, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি! সে কথাটা তোমার মুখ দিয়েই শুন্‌তে আমার সাধ নেই; তোমাকে বল্‌তে না দিয়ে তোমার ভবিষ্যতের যাওয়ার পথটা আমি খোলা রাখ্‌লাম; কারণ আমি যদিই তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে না পারি, তোমার বাপ মা যাঁদের অপমান করেছেন, তাঁরা তোমাকে, যে অবস্থায়ই তুমি যাও না কেন, বরণ করে ঘরে তুলে নেবেন;—আমি এখনি চল্‌লাম, আশা করি তুমি তোমার বাপ মার দুলালী হয়ে সুখেই থাকবে।"

লক্ষ্মী ভয় পাইল; কহিল, "আমার সব কথাটাই শোন, তারপর যা' হয় বিচার ক'রে"—

ভাল করিয়া লক্ষ্মীর কথাগুলি শিশিরের উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশও করিল না। শিশির অস্থির পদে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। লক্ষ্মী প্রমাদ গনিয়া দুয়ারের দিকে ছুটিয়া গেল, দুয়ার বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই শিশির কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

লক্ষ্মী সেই অমুজ্জ্বল আলোকিত কক্ষের মধ্যে অনেক পর্য্যন্ত মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল।—

(৮)

এমন সময়ে চঞ্চলপদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরঝি, শিশির বাবু কোথায়?—মা ডেকেছেন তাঁকে।"

লক্ষ্মী তখনও নিজেকে ভাল করিয়া সাম্‌লাইতে পারে নাই; তাহার পীবরকক্ষ তখনও গুরুশ্বাসে কম্পিত হইতেছিল; দীপ্ত চক্ষুর প্রান্তভাগ তখনও অশ্রুসজল ছিল।

লক্ষ্মী কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া ডাকিল, "কিলা, হয়েছে কি তোদের?—জামাইবাবু কোথায়?"

কতকাল পরে স্বামী-সম্ভাষণ করিতে আসিয়া লক্ষ্মী যে তীব্র উপেক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার অন্তরদেশকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল; একটা দারুণ লজ্জা যেন তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। স্বামী যে এমন করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা সে একবারটি মনেও করিতে পারে নাই। বিনোদিনী আসিয়া যখন তাহাকে ডাকিল, তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে লক্ষ্মীর মাটীর

সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। এ যেন তাহারই অপরাধ, যেন তাহারই সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শিশির চলিয়া গেল; এবং সে যে কোথায় গেল, এবং কেন গেল, তাহার জবাব লক্ষ্মীকেই প্রত্যেকের কাছে দিতে হইবে!

শিশির আসিবার কিছু পরেই, লক্ষ্মীর যাওয়া সম্বন্ধে যে উত্তর সে সত্যশঙ্কর বাবুর কাছে পাইল, তাহাতেই শিশির ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিলয়াছিল; কিন্তু গৌরীর কাছে সত্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া, সে নম্রভাবে শুধু শুনিয়াই গেল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

সত্যশঙ্কর মনে করিলেন, জামাতা তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু শান্তদর্শন ভিসুভিয়সের অন্তর মধ্যে যে দারুণ জ্বালা গুমরিতেছিল, তাহা সত্যশঙ্কর বিন্দুমাত্রও অনুমান করিতে পারিলেন না।

লক্ষ্মীর মাতা বিন্ধ্যবাসিনী যখন কুশল প্রশ্নান্তে ঠিক্ একই ভাবে লক্ষ্মীর যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা বুঝাইয়া দিলেন, তখন শিশিরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল; কিন্তু সে ঘাড় গুঁজিয়া শুধু জামার আস্তিনটা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং একবার মাথা তুলিয়া বলিয়া ফেলিল,—"দাদা ও বৌদি বলে দিয়েছেন, নিয়ে যেতে,—নিয়ে যেতেই হবে! আশা করি আপনারা তারই বন্দোবস্ত করে দেবেন; নইলে আমি আজই চলে যাচ্ছি, যখন সুবিধা হয় পাঠাবেন।"—

এ কথার পরও যখন তিনি শিশিরের সঙ্গে পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা করিতে বসিয়া গেলেন, তখন শিশির আর কোনও কথাই কহিল না।

এমন সময়ে দাসী আসিয়া কহিল, "মা, জামাইবাবুকে বৌদিদি ভিতরে ডেকেছেন,"—

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "যাও বাবা, বিনোদ বুঝি তোমাকে ডাকৃছে!"—

দাসীর প্রদর্শিত কক্ষ মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই শিশির লক্ষ্মীর দেখা পাইল।

তারপর ভিসুভিয়সের চূড়ার কাছে একবার তাহার অন্তরস্থিত দারুণ জ্বালার অত্যুজ্জ্বল শিখা মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল, পর মুহূর্ত্তেই শিশির কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাতে শিশিরকে বিশেষ দোষী করা চলে না। ধনীর একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই, শিশির যে তাহার

আত্মসম্মান জ্ঞানকে কোনও অংশে এতটুকুও কুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। বরং অনেকস্থলে আত্মসম্মান-জ্ঞানটা কোনও মতেই যাহাতেই এতটুকুও ব্যাহত না হইতে পারে, সেজন্য সে আপনাকে ক্রমাগতই সতর্ক, সজাগ করিয়া রাখিত!

লক্ষ্মী বিতর্কের দিকে না যাইয়া যদি সহজ, সরলভাবে শিশিরের হাতে ধরা দিত, ব্যাপারটা কখনই এমন অপ্রীতিকর হইয়া উঠিত না। লক্ষ্মী যদি সেই দিনই বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত, অথবা প্রথম আলাপের মুহূর্ত্তেই, কোথায় শিশিরের আঘাত লাগিয়াছে, তাহা বুঝিয়া, নারীর কোমল হস্তে প্রলেপ প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহাহইলেও এমন একটা অনর্থ ঘটিত না!

বিনোদিনী আবার ডাকিল, কহিল, "বুঝি একটা অনর্থ ঘটিয়েছিস্;—কি করেছিস্ সর্ব্বনাশ, বল্‌না, লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী রুদ্ধ কম্পিতস্বরে কহিল, "কিছু করিনি আমি,—শুধু ভাব্‌ছি, এই হীন মেয়েজাতটাকে কেন ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন। এদের একটা কথাও মুখ ফুটে বল্‌বার সাধ্যি নেই,—স্বাধীনতা ত যেন নাই-ই,——"

বিনোদিনী কহিল, "সেজন্য ভগবানের দায় পড়েনি যে তোর কাছে জবাবদিহি কর্‌তে আস্‌বেন!—দেখ্, তোর ও মামুলি বই পড়া কথাগুলি ছাড়্। হিন্দুর ঘরের বউ তুই, তোর বাপু এত সব কেন? তা' যাক্, শিশিরবাবু কোথায়? খাবারগুলি ওঘরে রেখে এসেছি,——"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে কহিল, "চলে গেছেন।"

তীব্র বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্মীর বিবর্ণ মুখের উপর স্থাপন করিয়া বিনোদিনী কহিল, "চলে গেছেন!—সে কিরে?"

"কি কর্‌ব, আমি ত আর ধরে রাখ্‌তে পারিনে?"—লক্ষ্মীর স্বর অপমান ও উপেক্ষার বেদনায় কম্পিত হইতেছিল।

বিস্মিতা বিনোদিনী তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর ব্যথিতস্বরে কহিল, "ধরে রাখ্‌তে পার্‌লেই বুঝি ভাল হ'ত, লক্ষ্মী!—ঠাকুর যে কি বুঝেছেন, তা' তিনিই জানেন। মাও ত তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলেন না।—মেয়ে তার শরীর ধুয়ে কি জল খাবে? 'স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে না,'—সৃষ্টি ছাড়া কথারে বাপু!"

বিনোদিনী ফিরিয়া দুই পা' দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

লক্ষ্মী ছুটিয়া যাইয়া তাহার অঞ্চল টানিয়া ধরিল, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কি হবে বৌদি?"

"কি হবে, তা' আমি কি জানি?—যেমন তোমাদের সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধি!—তা' তুই যেতে দিলি কেন?"

"তিনি যে চলে গেলেন, আমি কেমন ক'রে বাধা দেব, বৌদি?"

"কচি খুকিটি আর কি! বাধা না দিতে পার্‌লি না ত, সঙ্গে চলে গেলি না কেনরে, হতভাগী?"

বিনোদ রাগিয়া গিয়াছিল; অঞ্চল টানিয়া লইয়া সিঁড়ির উপর দিয়া 'দুম্ দুম্' করিয়া নামিয়া গেল।

লক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতার আদরিণী, মাতার সযত্নবর্দ্ধিতা লক্ষ্মী, জীবনে কোনও দিন আঘাত পায় নাই, ব্যথা জানে নাই; আজ একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেদনায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

কে ঐ তেজোগর্ব্বিত, অভিমানদীপ্ত যুবা, যে এই ধনীর দুলালীর বুকের উপর দিয়া উদ্দাম গতিতে চলিয়া গেল! অথচ তাহারই জন্য অন্তরের কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থান নিবিড় বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিতেছে! তাহার এই অনাহূত পীড়নও যেন প্রীতিতে নন্দিত, সোহাগে বিগলিত! মাতার স্নেহ, পিতার আদরও যেন ইহার কাছে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল!

এমন করিয়া ত লক্ষ্মী কোনও দিন ভাবে নাই; এমন করিয়া বেদনার পীড়ন লাভ করিয়াও ত সে কোনও দিন এত তৃপ্তি পায় নাই! আজ তাঁহারই প্রদত্ত বেদনাটুকু লক্ষ্মীর কাছে একটি পরম গোপন সম্পদের মত মনে হইতেছিল!

লক্ষ্মী ভাবিল, সত্যই বুঝি তাহার শিশিরের সঙ্গে, কোনও দিকেই না চাহিয়া চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য ছিল!

তখন সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, যেখানে শিশির মুহূর্ত্তপূর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

শিশির ও লক্ষ্মী (বৌ'দি)

কমলা প্রেস,—কলিকাতা।

মুঙ্গের দুর্গ।

গঙ্গা মায়ের শীর্ণ বাহুর শীর্ণ শিরার শীর্ণ ধারা,
কেল্লা ঘিরে বইত নেচে যোদ্ধা প্রাণে দিয়ে সারা।
বঙ্গ দেশে যবন রাজা শেষ যবনের দুর্গ খানি,
মায়ের কোলে ছেলের মত বইত সুখে দিন যামিনী।
হঠাৎ সেদিন, রক্ত সাঁঝে গঙ্গা মায়ের বক্ষ বয়ে
ছুটে এল অনল কণা অনল রাশির গণ্ডি দিয়ে।
স্বর্ণ ছাওয়া যবন পুরী সেই অনলের তীব্র তাপে,
নিমেষ মাঝে দগ্ধ হল, ভস্মেতে দেশ উঠ্‌ল ছেপে।
গঙ্গা মায়ের শীর্ণ বাহুর শীর্ণ শিরার শীর্ণ ধারা,
ভস্মমাঝে মিলিয়ে গেল, ভস্ম ফাগে ছাইল ধরা।
শেষ যবনের দুর্গ প্রাচীর দুগ্ধ জিনি শুভ্র ছিল,
অনল রাশির ধূমের ধারা ধূম্র বসন পড়িয়ে দিল।
শেষ রেখে সে চূর্ণ হল, শেষ যবনের শেষের আশ—
মিলিয়ে গেল মধুর হাসি, রইল শুধু দীর্ঘ শ্বাস।
দীর্ঘতর দীর্ঘ সে শ্বাস, বিষাদ রাজের শ্রেষ্ঠ চর,
আঁচল দিয়ে লইল ঘিরে, শেষ যবনের দগ্ধ গড়,
(এবে) গঙ্গা মায়ের শীর্ণ দেহ ভগ্ন গড়ের অশ্রুধার,
জলোচ্ছ্বাসের আকুল ধ্বনি জীর্ণ গড়ের রোদন স্বর!
শেষ যবনের দুর্গ প্রাচীর দুগ্ধ জিনি শুভ্র ছিল,
করাল কালের অনল তারে ধূম্র বসন পরিয়ে দিল।
ধূম আঁচলে লুকিয়ে রাজা, রাজ্য হারা অশ্রু ত্যজি
গঙ্গা বুকে ভাসিয়ে ডিঙ্গি মিলিয়ে গেল ফকির সাজি।
কি ব্যাথা সেই দগ্ধ প্রাণে বুঝ্‌ল কে তার গভীরতা
বুঝ্‌ল কে তার ভগ্ন প্রাণের গুপ্ত জ্বালার নীরবতা।
কুয়াস মাখা অতীত মাঝে, বরষ কতই গেছে ব'য়ে,
এখনও সে ভগ্ন গাথা জীর্ণ গড়ের প্রাচীর গায়ে—
চিরতরে নিদ্রা মগন, স্মৃতি যেন নিশার স্বপন—
আপন প্রাণে আপনি কাঁদে, আপনি বুঝায় মন।
ধূম আঁচলে লুকিয়ে রাজা রাজ্যহারা অশ্রু ত্যজি
মিলিয়ে গেল সুদূর দূরে গঙ্গা ব'য়ে ফকির সাজি।

শ্রীমাখনলাল মৈত্র।

গোবর্দ্ধনের পঞ্চাঙ্ক জীবন।

প্রথম অঙ্ক। (বিদ্যানুশালন)

যাঁহারা ধনে মানে নামে যশে দেশের মাঝে দশের কাছে "বড়লোক" বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সৌভাগ্য-সুষমাময় জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা

সংগ্রহ ও প্রচার করিবার জন্য অনেকেই যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাই সংসারের চিরন্তন রীতি। আমি যে কারণেই হউক সেই পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন বিধানের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলাম। এই বিষয়ে আমার মৌলিকতা সম্ভবতঃ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি যাঁহার জীবন-কাহিনী প্রণয়নের নিমিত্ত—গল্পের কথা নয়, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রকৃতপক্ষেই—কল্পনাতীত মূল্যবান্ কাগজ কালী ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই গোবর্দ্ধন শর্ম্মা কে, কোথায় তাহার নিবাস ইত্যাদি কেহ জানেন কি? ভাগ্যদোষে গোবর্দ্ধনের নাম ধাম জগৎ-জনের জ্ঞানগোচরের অতিদূরে অবস্থিত। ইহার জীবনব্যাপিনী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-সাহিত্যাদি সাধনা চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী সিদ্ধির অমৃত-সুন্দর স্পর্শে চিরবঞ্চিত। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, যিনি ধনে কমলার দারুণ অভিসম্পাত-গ্রস্ত, জনে মা ষষ্ঠীর কৃপাবিন্দু লাভে পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চিত, জ্ঞানে বীণাপাণীর বিশেষ বিরাগ-ভাজন, মানে কীর্ত্তিদেবীর নির্ম্মম-নির্য্যাতনের একমাত্র লক্ষ্য স্থল সেই দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত গোবর্দ্ধনের নিস্ফল জীবনাখ্যান তৈলাক্তশীর্ষে তৈল-প্রদানের যুগে আমি ছাড়া অন্য কেহ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেন কি? গোবর্দ্ধনের প্রতি সমবেদনাধিক্য বশতঃই হউক, কিম্বা নূতনত্ব প্রদর্শনের প্রলোভনেই হউক, আমি গোবর্দ্ধন শর্ম্মার জীবন-কাহিনী প্রকাশের হাস্যাস্পদ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

গোবর্দ্ধন পার্থিব কোন বিষয়ে অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। আখ্যেয় পুরুষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা প্রচার করিতে পারিলে আজি এই জীবনাখ্যায়ক অন্তরে মহাতৃপ্তি ও অনুপম গৌরব অনুভব করিতে পারিত, কিন্তু অপরিসীম পরিতাপের কথা, তাহাকে বিপরীত ঘটনা বাঙ্গালার জনসমাজের শ্রীকরকমলে অনিচ্ছায় উপহার দিতে হইল।

এই সত্য-নিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ডায়েরীতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইতেই ইহার প্রথম জীবনের অর্দ্ধযুগের অধিককাল অতিবাহিত হইয়াছিল। যখন বয়স দশের সিঁড়ি পার হইয়া এগার বছরের দ্বারে আসিয়া হাজির হইল, তখন গোবর্দ্ধন গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিয়া কলিকাতার এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। কলিকাতায় ইঁহার এক মাতুল সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন, তিনি স্নেহ-ভাজন ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিয়া ইংরেজীপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পঁচিশ

ৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু নিতান্ত কঠিনহৃদয়া সরস্বতী ঠাকুরাণী ইঁহাকে কৃপাকণা বিতরণে অনুচিত কৃপণতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এই কর্ম্মবীর জীবন মৃত্যু পণ করিয়া দু'তিন বছরের চেষ্টায় প্রত্যেক বার বার্ষিক পরীক্ষার দ্বার ঠেলিয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন। পুরুষকার অপেক্ষা অদৃষ্টই অধিকতর শক্তিশালী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম খেয়াঘাটে আসিয়া ইনি এই নূতন সত্য, নূতন অভিজ্ঞতা, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার বিশিষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইলেন যে, যে তাঁহার পুরুষকার অদৃষ্ট-প্রেরিত খেয়া কর্ণধারদের অবিচারে ও অত্যাচারে প্রবেশিকার ঘাটের অতলজলে ডুবিয়া মারা যাইতেছে। একবার ন, দুইবার নয় অধ্যবসায়ের মূর্ত্তিমান অবতার গোবর্দ্ধন সাতবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া মস্তক প্রায় মস্তিষ্কবিহীন করিল। নিষ্ঠুর সিণ্ডিকেটের পাষাণ মন কিছুতেই বিগলিত হইল না,—সে দ্বার তাঁহার পক্ষে চিরকাল অর্গল-বদ্ধই রহিল। হায়, ইঁহারা কি এমন অদম্য অধ্যবসায়েরও পুরস্কার করিতে জানেন না? যদিও একবার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য। অর্থাৎ একবার উত্তীর্ণদের তালিকায় তাহার নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে একটা বিরাট্ ভোজও দিয়াছিল। কিন্তু হায়, দুই সপ্তাহ পরেই পত্রিকায় আবার প্রকাশিত হইল শ্রীদামগঞ্জ স্কুলের গোবর্দ্ধন শর্ম্মার স্থলে গৌরদাসপুর হাইস্কুলের গোষ্ঠবর্দ্ধন বর্ম্মা হইবে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের কাছে পুরুষকারের লাঞ্ছনা। ইহার পরে ভগ্ন-হৃদয় গোবর্দ্ধন দুঃখে ও ক্ষোভে নির্ম্মমতার নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এইখানে, এইভাবে তাহার সারস্বত-সাধনার অবসান ঘটিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক। (কর্ম্মানুশীলন)

গোবর্দ্ধন জ্ঞান-সাধনার নীরব নিকুঞ্জ হইতে ধনার্জ্জনের জন্য বিশাল কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল। সরস্বতীঠাকুরাণীকে জব্দ করিবার জন্যই বোধহয় তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় গোবর্দ্ধন শর্ম্মা মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিল। শৈশবে সে শুনিয়াছিল, "বাণিজ্যে বসতে

কৃষিকর্ম্মণি।” কর্ম্মভবনের প্রবেশ পথে পদার্পণ করিতে গিয়া সে সেই শৈশব-শ্রুত শ্লোকার্দ্ধ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিল। কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে দৃঢ়ভাবে সে সঙ্কল্প করিল যে, কৃষিবাণিজ্যের মধ্যদিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনস্তুষ্টি সাধনে যোলআনা শক্তিপ্রয়োগ করিবে। বস্তুতঃ অর্থের অন্বেষণে বাহির হইয়া গোবর্দ্ধন প্রথমে বণিক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রদর্শনে মনোযোগী হইল। বাণিজ্যের পথেও গোবর্দ্ধনকে বিপদ্ বিড়ম্বনার সহিত কম লড়াই করিতে হইল না। এই পথে পা ফেলিতে না ফেলিতেই গোবর্দ্ধন দেখিতে পাইল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের আরম্ভেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, মূলধন ব্যতীত এ সব করা যায় না। জল দিয়া জল আকর্ষণ করিতে হয়। এই সময়ের ডায়েরীতে দেখিতে পাইলাম,—দরিদ্র গোবর্দ্ধন নৈরাশ্যের ভ্রূকুটিতে ভীত না হইয়া অদম্য উৎসাহে সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। মূলধন যোগাড় করিতে দীন-হীন গোবর্দ্ধনের বৎসরাধিক কাল বৃথাব্যয়িত হইল। বিধবা পিতৃস্বসা ও মাতুল-শ্যালিকার নিকট হইতে মাসিক দুই টাকা সুদে সাতশত টাকা ঋণ করিয়া সে একখানি মনোহারী দোকানের প্রতিষ্ঠা করিল।

গ্রাহকদের অনুগ্রহের অভাব রহিল না, কিন্তু উত্তরকালে তাহা নিগ্রহে পরিণত হইল। অধিকাংশ আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, কৃপা করিয়া তাহার দোকানে পদার্পণ করিলেন, কিন্তু আত্মীয়তা ও বন্ধুতার সুবিধা তাঁহারাই যোলআনা ভোগ করিতে চেষ্টিত হইলেন। গোবর্দ্ধনের কথা ভাবিতে তাহাদের অবসর রহিল না। বাকী বা ধারে জিনিষ ক্রয় করা আমাদের দেশে আত্মীয়তা, বন্ধুতা ও সহানুভূতি প্রকাশের উজ্জ্বল নিদর্শন। গোবর্দ্ধনের আত্মীয় বন্ধুরাই বা এই দেশ প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক পাপে লিপ্ত হইবেন কেন? এই বাকী ধারের আঘাতে ভদ্রলোকগণ ব্যবসায় পরিচালনায় সাধারণতঃ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, গোবর্দ্ধনও কিছুকাল পরে সেই ভুক্ত-ভোগিতার অধিকার লাভে বঞ্চিত হইল না। গোবর্দ্ধনের সামান্য মূলধনের ক্ষুদ্র বাণিজ্য-বিপণি যখন প্রচুর বাকী বকেয়ার গুরুভারে ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইল, তখন চিন্তাক্লিষ্ট গোবর্দ্ধন আত্মীয়বন্ধুরূপী গ্রাহকদের কাছে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য লোক পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু এই কার্য্যে বিপরীত ফল প্রসূত হইল। অল্প ব্যক্তিই নিজের ঋণ পরিশোধ করিয়া বিপন্নবন্ধুকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং অধিকাংশ আত্মীয় বান্ধবই প্রেরিত লোককে

নিতান্ত বিরক্তির সহিত কর্কশ কণ্ঠে, "তাগাদা কেন? পালিয়ে যাচ্ছিনা ত, যখন সুবিধা হয় দিব" ইত্যাদি বলিয়া বিদায় দিয়া বন্ধুতা ও আত্মীয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। ইহার পরে গোবরর্দ্ধনের সাধের বাণিজ্যের অবস্থা কি হইল কেহ শুনিতে চান কি!'

যে দেশের ছোট বড়, উত্তম অধম, জ্ঞানী মূর্খ, আত্মীয় অনাত্মীয়, একই মাটীতে একই উপাদানে গঠিত, সে দেশের কি আর নিস্তার আছে?—কল্যাণ কি আশাকরা যায়?

ইহাই পরে একদিন সকলে শুনিতে পাইল গোবর্দ্ধনের দোকানে ঘৃতের দীপ জ্বলিয়াছে।

লক্ষ্মীর অর্চ্চনাতেও গোবর্দ্ধনের অদৃষ্টনিপীড়ন আরম্ভ হইল। বাণিজ্যের প্রতি অন্তরের প্রীতি দেখাইতে গিয়া গোবর্দ্ধন আজ পথের ভিখারী, দরিদ্রতার কশাঘাতে ছিন্নবিছিন্ন। এই ঘটনার পরে কয়েকমাস সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পিসিমাতা ও মাতুলশ্যালিকা যথাসময়ে গোবর্দ্ধনের বিপদ-বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা কপর্দ্দকহীন গোবর্দ্ধনের এই দুর্দ্দশাপ্রাপ্তিতে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সহজে গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে টাকা আদায় করা যাইবে না। সুতরাং পিসিমাতা ও মাতুলশ্যালিকা নিরুপায়ের একমাত্র সান্ত্বনার উপায় গোবর্দ্ধনের উপরে অজস্রগালি ও অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিসিমাতা ও মাতুলশ্যালিকার দুর্ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া গোবর্দ্ধন ডায়েরীতে লিখিয়া গিয়াছে,—"যাহার নিজের কিছুমাত্র সংস্থান নাই, যে ষোলআনা ধারের উপরে দাঁড়াইয়া ব্যবসায় চালাইতে প্রয়াস পায়, তাহার মত ভবিষ্যৎ-জ্ঞানহীন মূর্খ, আশার ছলনায় প্রতারিত হতভাগ্য, জীবন-ব্যাপী দুঃখ অশান্তি ভোগী ব্যক্তি বোধ হয় এ সংসারে অতি অল্পই আছে।" সংসারপথে প্রথম পদবিক্ষেপেই বিফলতার সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে আহত হইয়া গোবর্দ্ধন চির প্রিয়, চিরসঙ্কল্পিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবনের কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তমান অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে বাধ্য হইল। বাণিজ্যের পরে কৃষির কথা ভাবিতে সে আর সাহস পাইল না। তাহাতে এ লাভের অর্দ্ধেকও তাঁহার রুচিকর বলিয়া মনে হইল না। দাসবৃত্তি বলিয়া গোবর্দ্ধন বাল্যকাল হইতেই চাকরীটার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঘটনার চক্রে পড়িয়া সেই অস্পৃহনীয় দাসবৃত্তিকেই নিজ জীবনে বরণ করিয়া লইতে সে স্বীকৃত হইল। কারণ, সে স্পষ্ট বুঝিতে

পারিল, চাকরী ছাড়া পিসিমাতা ও মাতুলশ্যালিকার মর্ম্মচ্ছেদী ভৎর্সনা হইতে শীঘ্র অব্যাহতি পাওয়ার অন্য কোন উপায় নাই।

গোবর্দ্ধন যে কোন চাকরীই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত চাকরী মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া তাহারই অন্বেষণে এদিকে সেদিকে ঘুরিতে লাগিল। এই সময়ের ডায়রীতে সে লিখিয়াছে,—"চাকরীর উমেদার হইয়া আমি বহুদেশীয় কারবার, কারখানার কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিয়াছি। যদিও চাকরী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন রকম সফলতার পরিচয় পাইতে পারি নাই, তথাপি উমেদারীর পরিশ্রম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে, একথা ষোলআনা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। চাকরীর জন্য সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া আমি অনেক দেশীয় কারবার, কারখানার আভ্যন্তরীন অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা মধুর নহে, বড় তিক্ত। আরও অভিজ্ঞতা যাহা লাভ করিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি, কেহ যদি পরম শত্রুকে অভিসম্পাত করিতে চায়,—তবে 'উমেদারী কর'—ইহা অপেক্ষা বড় অভিসম্পাতও কিছু হইবে না। ছাত্র জীবনের কত অনভিজ্ঞতাজাত সরলতা-প্রসূত সাধের স্বপ্ন, মাধুর্য্যমাখা ধারণা এখন কর্ম্মক্ষেত্রের বিষাক্ত আলো বাতাসে ভাঙ্গিতেছে,—মলিন হইয়া যাইতেছে। এই পর্য্যন্ত যাঁহাদিগকে বাহির দেখিয়া মাতৃভূমির সুসন্তান, সমাজ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বান্ধব জ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া কৃতার্থ হওয়ার বাসনা হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়াছি, কর্ম্মভবনে প্রবেশ করিতে না করিতে তাহাদের অভ্যন্তর আকৃতি দেখিয়া সেই সুখ-স্বপ্নের মোহন আবেশ, সরল বিশ্বাস ধারণার আশাতীত বিস্তার, হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ যৌথ বা সম্মিলিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিচালকগণের তালিকায় ভারত-জননীর কত সুনামধন্য বরপুত্রদের যশোমণ্ডিত নাম সংযোজিত দেখিয়া আশায়-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তত্তৎস্থলে উপস্থিত হইয়াছি,—ভরসাও করিয়াছি, এখানে সাধুতার অবমাননা হইবে না, ন্যায়বিচারেও ব্যভিচার ঘটিবে না,—অন্য দশস্থানের মত ম্যানেজার, ডিরেক্টর, সেক্রেটারী বা তথাবিধ কর্তৃপুরুষের একছত্র আধিপত্য লক্ষিত হইবে না। বহুস্থলে যেমন দেখিয়াছি, সেক্রেটারী প্রভৃতির মধুর কুটুম্ব ব্যতীত অন্যের পক্ষে কার্য্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ, শ্যালক পুত্রাদি ছাড়া অপর প্রার্থীকে কৃপাকণা দানে নিরবচ্ছিন্ন বিস্মৃতি ও বাহিরের উমেদারগণের প্রতি সরলতায় ঢাকা প্রতারণা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সকল কার্য্যালয়ে সম্ভবতঃ (সম্ভবতঃই

বা বলি কেন নিশ্চিতই) তাদৃশ কুটুম্বপ্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হায়রে সংসার! সর্ব্বত্রই তোমার এক অবস্থা ও এক ব্যবস্থা, সর্ব্বত্রই বড়বাবুদের কুটুম্বগণেরই একমাত্র প্রবেশ অধিকার প্রত্যক্ষ করিলাম। বুঝিলাম, এ দেশের স্যাওড়া-চন্দনে প্রভেদ নাই, সূর্য্য ও জোনাকীর মূল্য প্রায় তুল্য! আমাদের দেশের লোক বড়ই হউক, আর ছোটই হউক, পৌনে ষোলআনাই স্বার্থের সন্ধানে জীবন ভরিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। কেহ যশের আশায় দশের কার্য্যে ব্রতী, কেহ অর্থের জন্য পরার্থ সাধনে দীক্ষিত, কেহ কেহ বা শক্তি সম্মান বৃদ্ধির জন্য সমাজের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যকুল ব্য'•স্ত! নিন্দা, প্রশংসা, অপমান, অবমাননা এবং আর্থিক লাভ ক্ষতিকে একসূত্রে মালাকারে গ্রথিত করিয়া গলায় পরিয়া দশের কল্যাণ, দেশেব মঙ্গল, সমাজের হিত, সাহিত্যের উৎকর্ষ একমনে ভাবেন বা ভাবিতে শিখিয়াছেন এমন লোক—হায়, বাঙ্গলায় ক'জন আছেন? বহু কারবার কারখানায় ঘুরিয়াও যখন আমি সেক্রেটারী বা ম্যানেজারের পরিচিত কুটুম্বগণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সামান্য বেতনেরও একটি চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না,তখন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিপিনের স্মরণাপন্ন হইলাম। বিপিন বড়লোকের ছেলে, সে ইচ্ছা করিলে আমার একটা কিছু করিয়া দিতে পারিবে, এই আশায়—তাহার কাছে ধরা দিলাম। বিপিনের কাকা দেশের একটি বড়রকমের যৌথ কারখানার বড়বাবু। তাঁহার অনুগ্রহে যদি কিঞ্চিত তণ্ডুলকণার যোগাড় হয় এই ভরসা। বাল্য-বন্ধু বিপিন চন্দ্র প্রকৃতপক্ষেই বন্ধুতার সম্মান রক্ষা করিল,—সে আমার দুর্ভাগ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিল,—তাই ত ভাই, এই ভাবে হাজার বৎসর চেষ্টা করিলেও তুমি কোনরূপ কাজের যোগাড় করিতে পারিবে না। বাঙ্গালামুলুকে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কাজের জন্য দরখাস্তকারীর মত মূর্খতা বোধহয় আর কিছুই নাই। তুমি বোধহয় জাননা, অনেক আফিসের বাবুরাই সাধারণতঃ শূন্যপদে নিজেদের লোক মনোনীত করিয়া বাহিরে একটি অর্থশূন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের উদ্দেশ্য, উপরওয়ালা ও অংশীদের কাছে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ পরিস্কার রাখা। বিনা সহায় সুপারিসে আজকাল কোথাও কোন কাজ পাইবে না। আমাদের ক্লাসের নলিনীর কথা মনে পড়ে কি? সে মুরুব্বির জোরে ও অন্য উপায়ে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে। স্থলবিশেষে কলা, মূলা এবং গোলাকার জিনিষেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। যতীশও ইহার শক্তিতেই উমেদারীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তুমি এই তিনের কিছুই কর নাই, কাজেই দুঃখের ঘূর্ণাধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।]

এইভাবে চলিলে চাকুরীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কখনও চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে না। বন্ধুর কথায় আমি কিন্তু একেবারে অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। চাকুরীর উমেদারীতে আসিয়া আমি অনেক আফিসের অনেক বড়বাবুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ত বিপিনের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই নাই। কুটুম্ব পোষণের ভাব অনেকটা অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতার অধিকার ভূক্ত হইয়া হইয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া—যাহাহউক, বিপিন আমাকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—ভাই, ভাবিতেছ কি? বিষকুম্ভপয়োমুখ সংসারের দশা?—না, নিজের কর্ম্মজীবনের ঘাত প্রতিঘাত? চিন্তা করিও না, নৈরাশ্যে ডুবিও না। আমি তোমাকে চাকরী যোগাড় করিয়া দিতেছি। তুমি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

গোবর্দ্ধনের ডায়েরীতে এইরূপ অনেক আক্ষেপ চিত্রিত রহিয়াছে। সকল-কথা খুলিয়া লিখিতে হইলে পুস্তকের আকার অস্বাভাবিক দীর্ঘতা ধারণ করিবে এবং অনেকে হয়ত সত্যকথার সূচিকাঘাতে মর্ম্মজ্বালা অনুভব করিবেন। দুইমাস পরে বিপিন খবর পাঠাইল,—"গোবর্দ্ধন, তোমার জন্য একটি কাজের যোগাড় করিয়াছি, আজই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

গোবর্দ্ধনও অবিলম্বে তাহাই করিল। বন্ধুর অনুগ্রহে একটি দেশীয় যৌথ কারখানায় কুড়ি টাকা বেতনে একটি চাকরী পাইয়া সে জীবনে এক নূতন আনন্দ অনুভব করিল। এই বিশ টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া পিসীমাতাদের ধার শোধও করিতে লাগিল। কিন্তু এই সুখ বহুদিন তাহার কপালে সহিল না। সম্বৎসর অতীত হইতে না হইতে না হইতে সকলে শুনিয়া দুঃখিত হইল, সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আবার অভাবের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন চাকরীতে প্রবেশ করিয়া একদিনের জন্যও নিজের কাজে আলস্যউদাসীনতা বা ত্রুটি-অমনোযোগ দেখায় নাই; কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সময় ও কার্য্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া আফিসের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও কোন দিন পরাঙ্মুখ হয় নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রেও গোবর্দ্ধনের পুরুষকার অদৃষ্টের দৌরাত্ম্যে নিপাড়িত হইল। যাঁহার সুনজরে পড়িলে চাকরী জীবনের সার্থকতা ঘটে, সেই ম্যানেজার বাবুর কৃপালোভে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিল। ম্যানেজার বাবুর একটা বড় রকমের মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল, তিনি নিজের প্রশংসা বলিতে ও শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অধঃস্তন চতুর কর্ম্মচারীরা এই সুযোগ কখনও উপেক্ষা করিত না। প্রশংসা করিতে পারিলেই

যে ম্যানেজার বাবুর কাছে সাতখুন মাপ এবং প্রশংসা দানে কৃপণতা করিলে যে তিলমাত্র দোষে ফাঁসির হুকুম হয়, ইহা গোবর্দ্ধনও যে বুঝিতে পারিয়াছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে ম্যানেজার বাবুর চাটুকারিতা বা তোয়াজ তোষামোদে চাকরীর উন্নতি করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করিল। যার যেমন প্রকৃতি! স্বভাবদোষে গোবর্দ্ধন অন্য দশজন "জলকাতের" সহিত মিলিতে পারিল না। কাজেই এই যৌথ-কারবারের আফিসে সে যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। আফিসের মুটে, মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত ম্যানেজার বাবু পর্য্যন্ত সকলেই "উপরিপ্রাপ্তির" উপাসক, শুধু গোবর্দ্ধনই এই পথে পদক্ষেপ করা পাপ মনে করিল। ফলে দশের ষড়যন্ত্রে সে সাধু হইয়াও চোর, কর্ম্মদক্ষ হইয়াও অকর্ম্মণ্য, বলিয়া ডিরেক্টরগণের নিকটে পরিচিত হইল। অধিকন্তু ম্যানেজার বাবুর গালি ভৎর্সনা ও বিরক্তি ভ্রূকুটি সহ্যকরাও হতভাগ্য গোবর্দ্ধনের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। শেষে একদিন ডিরেক্টরগণের ইঙ্গিতে চাকরী পরিত্যাগ করাই তার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এইখানে, এইভাবে গোবর্দ্ধনের জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তি লাভ করিল।

তৃতীয় অঙ্ক। (সমাজতত্ত্বানুশীলন)

গোবর্দ্ধন চাকরী পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন লক্ষ্য, এক নূতন উদ্দেশ্য, এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া লইল। এই সময়ের ডায়েরীতে সে সযত্নে লিখিয়াছে—"সংসারে আমি একা, একার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দশের দ্বারে ধরণা দেওয়ার দরকার কি? তারপর আমি ত একটা মানুষ; জগতের ক্ষুদ্র কীটাণুরা পর্য্যন্ত জীবন ধারণের জন্য পরপদসেবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না, তবে আমিই বা এই দগ্ধোদরের তাড়নায় চাকরীর উমেদারীতে এতটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি কেন?

দশে মিলিয়া এই সমাজ, সমাজের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া এই অভিশপ্ত জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে চেষ্টা করি না কেন? প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু গোবর্দ্ধন তাহাই করিল। ধনার্জ্জনের আশা বর্জ্জন করিয়া সে সমাজহিতে আত্মদান করিল। সমাজসেবাযজ্ঞে ব্রতী হইয়া গোবর্দ্ধন প্রথমেই নিজ গ্রামের স্থানীয় জমিদার ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়কে স্থায়ী সভাপতি করিয়া "সমাজহিত-সাধিনী" নামে এক সামাজিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিল। বাবু কাঙ্গালীচরণ মজুমদার,

কুলদাচরণ ঘোষ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী তরফদার, হরিপ্রসন্ন সেন, নবীনচন্দ্র বসু, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, মোহিনীমোহন ধর, যাদবচন্দ্র সিংহ, গগণচন্দ্র চাক্‌লাদার, সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী, কমলাকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি ঐ পল্লী ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুহের প্রধান বা মোড়লগণ আগ্রহে এই সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বতোভাবে, সভার উদ্দেশ্য পালন করিবেন বলিয়া কেহ প্রতিজ্ঞা করিতেও কালবিলম্ব করিলেন না। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল,—বরপণ নিবারণ, হিন্দুআচার রক্ষা, ব্রাহ্মণ-কুলীনদের মেলবন্ধন শিথিলীকরণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সর্ব্বজাতিতে সখ্য স্থাপন, অনাথ বিপন্নদের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। সেক্রেটেরী বা সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, তালুকদার বাবু কাঙ্গালীচরণ মজুমদার, সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন স্বয়ং গোবর্দ্ধন শর্ম্মা। প্রতি মাসে দুইটি করিয়া সভা আহূত হইতে লাগিল, প্রত্যেক অধিবেশনে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা জোরে চলিতে লাগিল, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার ভাষা ওজস্বিনী ও আন্তরিকতা-পূর্ণ। অধিবেশন সময়ে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছাস ও ঘন ঘন করতালির ধ্বনিতে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। সভার প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা শুনিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব দুঃখীরা আশায় বুক বাঁধিল,—তাহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল, কন্যাবিবাহের জন্য তাহাদিগকে আর ভাবিতে হইবে না, বরপণের প্রাণনাশ এবার আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।—এই সমাজ সংস্কারের জন্য গোবর্দ্ধনের মস্তকে চারিদিক হইতে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদের ফুল-চন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল। পাঁচমাস প্রবলবেগে সমাজ হিতসাধিনীর কার্য্য সম্পাদিত হইল। ষষ্ঠমাসে হিত-সাধিনীর অঙ্গে এক দারুণ আঘাত লাগিল। এই আঘাতের পর হইতে হিতসাধিনীর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল। সম্পাদক কাঙ্গালীচরণই হিতসাধিনীর এই দশা বিপর্য্যয়ের মূলীভূত কারণ। এস্থলে কাঙ্গালী বাবুর ব্যবহার প্রকাশকরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কাঙ্গালী বাবুর প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানীতে বেশ আস্থা, দানধ্যানাদিতেও যশঃ প্রতিপত্তি কম নয়। নাম যশঃই বা না হইবে কেন? এই যে সেদিন তাহার তৃতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে পাঁচটি গরীবকে পাঁচখানা নূতন কাপড় ও পাঁচআনা নগদ পয়সা দান করিয়াছেন,—এ কথা বোধ হয় সেই সময়ে সকলেই দৈনিক, সপ্তাহিক ও মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রপত্রিকায় পাঠ করিয়াছেন। কাঙ্গালী বাবু হলপ্ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে

এই দানের কথা বাজারে বাহির হয়। কিন্তু তাঁহার চতুর নায়েব নীলরতন দত্তই নাকি সম্পাদকদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া মনিবের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কাঙ্গালী চরণ বাবু নিজবাড়ীতে পিতার নামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার পাঁচ ছয় হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বিবাদ জুড়িয়া দিতেন। তত্বজ্ঞেরা কিন্তু অন্যরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের নিঃসন্দিগ্ধ সংবাদ এই,—"ছাত্রবেতনে ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সাহায্যেই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে। এজন্য কাঙ্গালী বাবুকে কাণা কড়িটিও ব্যয় করিতে হয় নাই। কাঙ্গালী বাবুর চারি কন্যা ও তিন পুত্র। তাঁহার বড় মেয়েটির বিবাহে ফাঁকী আওয়াজে অর্থাৎ মিথ্যাগুণ বর্ণনায় কোন বর পক্ষই বিনা টাকায় ধরা দিল না। এই বিবাহে কৃপণ তালুকদার কাঙ্গালী বাবুর কিছু টাকা খরচ হইল।

এই বিবাহের অব্যবহিত পরেই গোবর্দ্ধন হিতসাধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, "বরপণ নিবারণ" এই সামাজিক সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া দুরদর্শী বৈষয়িক কাঙ্গালী বাবু হিতসাধনীর সম্পাদকের পদ বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করেন; সম্পাদকের কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া তিনি যখন তখন, যেখানে সেখানে, বরপণ নিবারণ ও হিন্দুর আচার রক্ষাসম্বন্ধে তারস্বরে নানাকথা বলিয়া এক প্রবল দলগঠনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সেই সকল বক্তৃতার সারাংশ তৎকালীন সমস্ত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তখন চারিদিকে একটা ধ্বনি পড়িয়া গেল যে কাঙ্গালী বাবুর মত একাধারে নিষ্ঠবান হিন্দু ও সমাজ-সংস্কারক বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই আছে।

ইঁহার বরপণ নিবারণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় সার মর্ম্ম এই যে—বিবাহে পুত্রের উপরেই হউক বা কন্যার উপরেই হউক, কিছু গ্রহণ করিলেই পুত্রকন্যাকে বিক্রয় করা হইল। তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিলেন, "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যদ্দেশো শুক্র-বিক্রয়ী"—অর্থাৎ সেই দেশকে পতিত মনে করি, যেই দেশে পুত্রকন্যা বিক্রয়কারী পিতামাতা বাস করে। তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় দুই একজনের হৃদয় গলিয়া গেল। কিছুদিন পরে ইঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী জ্ঞানজীবন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমেরিকা হইতে সাবাননির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। জ্ঞানবাবুর ঘরেও দুই পয়সা আছে। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে যেমন সুশ্রী, স্বভাবে চরিত্রেও তেমনই প্রশংসাপ্রাপ্ত। জ্ঞানবাবু প্রকাশ করিলেন তাহার পুত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, হিন্দুসমাজে বিবাহ করিবে,

বিবাহে কোনরূপ চুক্তির ব্যবস্থা নাই ; তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। ইহা শুনিয়া কাঙ্গালী বাবু ভাবিলেন, তাইত, এই সুবিধা ছাড়াটা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। উপায়ও আবিষ্কৃত হইল, তিনি তার পরদিন সমাজ হিতসাধিনী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমরা শাস্ত্রে দেখিলাম, শিক্ষার জন্য হিন্দুকে সমাজ-নিষিদ্ধ আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত দোষই কাটিয়া যায়। প্রামাণিক মিতাক্ষরায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চতুর কাঙ্গালীবাবু একখানি ব্যবস্থাপত্রে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী পুরুষের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। পরে শুভদিনে, শুভলগ্নে সেই আমেরিকা প্রত্যাগত ছেলের সহিত গোঁড়া হিন্দু কাঙ্গালী বাবু বিনাপণে কন্যার বিবাহ দিলেন। এই ঘটনার পরে জমিদার ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত কাঙ্গালীবাবুর সামাজিক দলাদলি আরম্ভ হয়। একটা জমি লইয়া ভবানী বাবু ও কাঙ্গালীবাবুর মধ্যে বহুদিন যাবৎ মনোমালিন্য চলিতেছিল। জমিদার রায়চৌধুরী এই সুযোগে কাঙ্গালী বাবুকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, ক্রমে এই ব্যক্তিগত মনান্তরের ধাক্কা 'সমাজ হিত সাধিনীর' উপরেও আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। সম্পাদক কাঙ্গালী বাবু, অবস্থা বুঝিয়া, কুলদা বাবু, রাসবিহারী বাবু, উমাপদ বাবু প্রভৃতি বহু সভ্যকে নিজের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং জমিদার রায় চৌধুরী মহাশয় কাঙ্গালী বাবুর বেশী কিছু ক্ষতি করিতে না পারিয়া, নিজেই শেষে অভিমান ভরে 'সমাজ-হিত-সাধিনীর' সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। গোবর্দ্ধন বহু অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার "গোঁ" ফিরাইতে পারিল না। ভবানী বাবুর সহিত তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার হরিপ্রসন্ন সেন, পুরোহিত সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী, নায়েব মহাশয়ের ভ্রাতা মোহিনী মোহন ধর প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মী সভ্যও পদত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় হিত-সাধিনীর যথেষ্ট ক্ষতি হইল। বাঙ্গালার মৃত্তিকায় ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া অনেকেই সমষ্টি বা সমাজের সেবায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার মধুময় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না।

যাহা হউক ক্রমে তিন বৎসর অতীত হইল, এই সময়ের মধ্যে সম্পাদক মহাশয় কন্যাদায় হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার লাভ করিলেন—শেষের দুই কন্যার পরিণয়ও বিনাপণে সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার পরেই কাঙ্গালী বাবুর বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ পুত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষের বিবাহের পালা উপস্থিত হইল। সূক্ষ্ম-বুদ্ধি কাঙ্গালীবাবু তখন বরপণ-নিবারণী সমাজ-হিতসাধিনী সভাটাকে একটা মারাত্মক উপদ্রব মনে করিতে লাগিলেন। ইঁহার সম্পাদকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুত্রের বিবাহে তিনি

কোন মুখে পণগ্রহণ করিবেন! অথচ বি এ, পাশ পুত্রের বিবাহে পণ-প্রলোভন পরিত্যাগ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব! তাই তিনি ছুতানাতা ধরিয়া হিত-সাধিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে মনে প্রাণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ সাধক গোবর্দ্ধন শর্ম্মার প্রাণান্ত পরিশ্রম তাঁহার অভিসন্ধি-মূলক বাসনায় প্রবল বাধা উপস্থিত করিল। হিত-সাধিনীর অহিত-সাধনে তাঁহাকে অতি মাত্রায় ব্যগ্র ও ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া অনেকেই কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তদুত্তরে তিনি পরম উদারের ন্যায় বলিয়াছেন—"আর কি ভাই, সমাজের জন্য সুখ শান্তি, স্বাস্থ্য, অর্থ—সবই নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু এই সমাজের উন্নতি এখনও অনেক দূরে। যে সমাজে কাচ কাঞ্চন একদরে বিক্রীত হয় সে সমাজে কিছু করা যায় কি? আমি প্রাণপাত করিয়া সমাজের কি উপকার করিয়াছি, তাহা দেশের কয়টা লোকে বুঝিল? দেশে গুণীর আদর থাকিলে, কর্ম্মীর সম্মান থাকিলে, পরিশ্রমের গৌরব থাকিলে, ভবানীবাবু আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে কখনও সাহস পাইতেন না। আমি প্রকৃত পক্ষেই নিরাশ হইয়াছি, আমি আর কোন কিছুর মধ্যেই লিপ্ত থাকিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সংসারের দশা দেখিয়া আমার বাস্তবিকই বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমি সংসারের সমস্ত ভার গৃহিণীর উপর দিয়া একটু ধর্ম্মকর্ম্ম করিব ভাবিতেছি—" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার পর এক সপ্তাহ মধ্যেই তিনি গোবর্দ্ধনের সহস্র অনুনয়, অনুরোধ পদদলিত করিয়া হিত-সাধিনীর সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন।

কাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাবাবু, রাসবিহারী বাবু, উমাপদ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন স্থায়ী সভ্যও হিত-সাধিনীর সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই আঘাতে হিত সাধিনী প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গোবর্দ্ধন হিত-সাধিনীর কঙ্কাল লইয়া কালের ভেলায় ভাসিতে লাগিল। এদিকে বৈষয়িক শিরোমণি কাঙ্গালীচরণ পাঁচ হাজার টাকা পণ, সত্তর ভরি সোণার গহণা ও অন্যবিধ প্রচুর যৌতুক লইয়া কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত ধনী রামগোপাল চৌধুরীর একমাত্র কন্যার সহিত নিজপুত্রের বিবাহ দিলেন। বরপণের কথা তুলিয়া কেহ কোন কথা বলিতে অগ্রসর হইলে তিনি সর্ব্বস্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিতেন, 'কি জানি ভাই, আমি আর বিষয়বিষে নাই। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না,—ছেলে জানেন, আর গৃহিণী জানেন। গৃহিণী কত কষ্টে ছেলেকে প্রতিপালন ও মানুষ করিয়াছে, সেই পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে তাহার স্বাধীনতায়, তাহার অভিলাষে হস্তক্ষেপ করা আমি

সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বিবেচনা করিয়াছি, ইত্যাদি। গোবর্দ্ধন এই বকধার্ম্মিক-বহুল ও মুখসর্ব্বস্ব-সমলঙ্কৃত সমাজের আভ্যন্তরীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বড় দুঃখে, বড় নৈরাশ্যে, ডায়েরীতে লিখিয়া গিয়াছে যে—"আমি কর্ম্মক্ষেত্রে মিথ্যা-প্রতারণার আদর সম্মান দেখিয়া বড়ই অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়ি। এবং তাহা হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য পবিত্রবোধে সমাজ-বক্ষে আশ্রয় লই। কিন্তু এখন দেখিতেছি "স পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ"। বর্ত্তমান সমাজ, শয়তানের রাজ্য, কপট-প্রতারকের লীলাক্ষেত্র, ভণ্ড-তপস্বীদের অভিনয় রঙ্গমঞ্চ, শক্তিশালী ব্যক্তিদের একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্বের নিবাস-ভূমি। হিতসাধিনী সভার সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধানে লিপ্ত থাকিয়া আমি বহু পরিচিত যশস্বী সামাজিকের চরিত্র বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাহা হইতেই আমার এই মন্তব্য আমি লিখিলাম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

পঞ্চমুখী।

বালিকা।

পঙ্কজ-কোরক ঘিরি' শৈবালের রাশি,
কুন্দ দন্ত উজলিছে চারু মৃদু হাসি ;
কৌতুক চকিত দৃষ্টি, নিটোল কপোল,
অধরে কথার বৃষ্টি নাহি কোন গোল ;

কিশোরী।

কুন্তল লতা'য়ে আছে ললাটের পরে
নত দুটি কালো চোখে কজ্জলের লেখা,
স্মিত হাস্য ফুটি' রহে অধরের কোণে
কপোলে প্রথম স্বপ্ন সুষমার রেখা।

তরুণী।

ললাটে সিন্দুর বিন্দু কপোলে রাঙ্গিমা
নয়নে প্রেমের স্বপ্ন প্রদীপ্ত গরিমা,
অধরে বাঁধুলি পুষ্প, কাঁপিছে উচ্ছ্বাসে
প্রিয়ের অধর স্পর্শ পাইবার আসে।

প্রৌঢ়া।

মুক্ত আর নহে বেণী ছড়ান কুন্তল,
নয়নে গভীর দৃষ্টি স্নেহেতে চঞ্চল ;
কপোলে পাণ্ডুর আভা মুখে মৃদু হাসি,
পূজা শেষে কুড়াইছে আশীষের রাশি!

বৃদ্ধা।

কুন্তলে রজত লেখা, কুঞ্চিত কপোল;
নয়নে অমৃত দৃষ্টি মুখে মিঠা বোল ;
শশাঙ্কের শেষ লেখা অধরের হাসি,
তৃপ্ত তীর্থ যাত্রী এবে চয়ি' পুণ্যরাশি!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

হরিপ্রাণের অভিজ্ঞতা।

(১)

সেবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিতে গিয়া হঠাৎ বুকে যে কেমন একটা চোট্ লাগিয়াছিল সেই দরুণ বৃদ্ধ কৃষ্ণপ্রাণ পাল যে শয্যা লইলেন, সে শয্যাই তাঁহার মহাশয্যা হইল। চক্রবৃদ্ধি হারে টাকার সুদ গণিয়া মহাজন কৃষ্ণপ্রাণ প্রভূত অর্থ রাখিয়া গেলেন; কিন্তু নিজে কেবল শর্করা-বাহী বলীবর্দ্দের মত টাকার ভারই আজীবন বহিয়াছিলেন, স্বাদ কিছুই বুঝিলেন না। দেশের লোক তাঁহার মুখ দেখা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্তও নিত না। সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন একমাত্র পুত্র হরিপ্রাণ। পিতার জীবিতাবস্থায়ই হরিপ্রাণ যখন চাঁদপুরের স্কুলে "ফাইভ্" ক্লাশে চারিবার ক্রমান্বয়ে ফেল হইল, তখন বাপকে বলিল, যে দেশে থাকিয়া তাহার পড়াশুনার ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে, কারণ অনেক সময় বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম দেখিতে শুনিতেই অধিক-কাল ব্যয়িত হয়। অতঃপর স্থির হইল, সে ঢাকা যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঢাকাতেও মা সরস্বতী হরিপ্রাণের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন না; দু' বৎসরের চেষ্টায় মাষ্টার ইত্যাদি সকলের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া "ফোর" ক্লাশে উঠিল; কিন্তু মা সরস্বতী জেদ্ করিলেন হরিপ্রাণকে 'চতুষ্পদ' ছাড়া 'ত্রিপদ,' বা 'দ্বিপদ' কখনও হইতে দিবেন না। কি অবিচার!

পিতার মৃত্যুর পর হরিপ্রাণ ঠিক করিল, আর পড়া হইবে না; সম্পত্তি দেখে কে? ভাবিল চাঁদপুরে যাইয়া ভাল দেখিয়া একজন মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া ইংরাজি শিখিবে। একে বাপের আদুরে ছেলে, তদুপরি সপত্নী কমলার বিশেষ কৃপাভাজন বলিয়া সরস্বতী কর্ত্তৃক উপর্য্যোপরি নিগৃহীত হইয়া হরিপ্রাণ যখন "ফোর" ক্লাশ ছাড়িয়া বিষয়কর্ম্মে মন দিল, তখন তাহার বয়স ২২ বৎসর। কৃষ্ণপ্রাণ বাবুর বড় ইচ্ছা ছিল একটি পুত্রবধূ দেখিয়া যান; কিন্তু সে বাসনা চরিতার্থ করিবার অন্তরায় হইল, তাঁহার সুখ-বিদ্বেষী দৈব। কেহ কি আর কোন দিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যায় না? কিন্তু ওরকমটি কাহার হয়?

কৃষ্ণপ্রাণ বাবুর মৃত্যুর পর, হরিপ্রাণ সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল; প্রায় সমস্ত দিনই বন্ধুবর্গের সহিত আড্ডা দিয়া কাটাইত। বন্ধুগণ হরিপ্রাণকে

পরামর্শ দিল "দুর্গা পূজা কর।" হরিপ্রাণ তাহাতে সম্মত হইল, এবং খুব ঘটা করিয়া পূজা করিতে হইবে, সেই অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর ফর্দ্দ করিতে বন্ধুদের অনুরোধ করিল। সকলে মিলিয়া একটা বিরাট সভা করিয়া বসিল। কেহ বলিল "বাই খেমটা" আনাইতে হইবে? কেহ বলিল 'কৈলকাত্তার নাটক ছাড়া কি তামাসা অয়?' একজন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে মোশয়রা! হগ্‌গল ত কইলেন, কিন্তু ফর্দ্দের মধ্যে ঝার লণ্ঠনের কথা লেখছেন? বাত্তি আইবো কৈথ্যিকা?" আর একজন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আরে মোশয়! চুণের লাগ্যা কি আর দুগ্‌গাচ্ছোব ঠেইক্যা থাকব? কৈলকাত্তার হেই হাত তালা বড় দোকানটার থ্যিকা হগ্‌গল কিন্যা আনুম, আপনে ভাবেন ক্যান্? আমার কাছে হেই দোকানটার একটা মস্ত বইও আছে; রহেন্, আমি বারীর থ্যিকা লৈয়্যা আহি।" বলিয়া সে তিন লম্ফে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই Whiteaway Laidlawর বাড়ীর একটা কাপড় বাঁধা ক্যাটালগ হস্তে ঘরে Waterloo বিজয়ীর মত প্রবেশান্তর ধপাস্ করিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে বইটা ফেলিয়া দিয়া সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখেন মোশয়! বড় যে কন্। এইটার মৈদ্ধে এমন জিনিষ নাই যে না পাইবেন।" সকলে মিলিয়া আগ্রহের সহিত ক্যাটালগটা দেখিতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজী ভাষাবিদ্ হরিপ্রাণ ছাড়া অন্য কেহই জিনিষ পত্রের মূল্য ইত্যাদির বিবরণ পড়িতে পারিল না। হরিপ্রাণ ক্যাটালগের পাতা উল্টাইতে ছিল; হঠাৎ যেখানে লেডিস্ হ্যাটের এবং পরিচ্ছদাদির বিবরণ লিখিত রহিয়াছে, সেখানে তাহার চোখ পড়িল। ক্ষণেক ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া মনে মনে সে বলিল "এত সস্তা!" যাহা হউক, অনেক তর্কবিতর্কের পর দ্রব্যাদির একটা সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

সেদিন রাত্রে হরিপ্রাণের ভাল ঘুম হইল না; তাহার মাথায় কেবল প্রশ্ন হইতেছিল—"এত সস্তা!" ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ঠিক করিল, পরদিন একলা কাহাকেও না জানাইয়া সে কলিকাতা যাইবে। হরিপ্রাণ কাহাকেও কলিকাতা যাইবার কথা বলিল না। বন্ধুবর্গের সহিত স্বাভাবিক ভাবে অন্যান্য দিনের মত গল্প গুজব করিয়া সন্ধ্যার সময় বড় একটা "টেরাঙ্কে" তাহার যাবতীয় জিনিষ পত্র গুছাইয়া রাত্রি দু'টার সময় একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চাটিগাঁও মেলে (Chittagong mail) উঠিল। চাকরটা দ্বিতীয়শ্রেণীর

কেবিনে প্রভু হরিপ্রাণের শয্যা করিয়া দিয়া বাহিরে তাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল; আর হরিপ্রাণ বিছানায় শয়ন করতঃ অনেক কথা ভাবিতেছিল। কখনও বা গম্ভীর কখনও বা আপনা আপনিই হাসিয়া শতচূর হইতেছিল। ভৃত্যটা বাহিরে বসিয়া ভাবিতেছিল, তাহার প্রভুকে বুঝি কোন অপদেবতা অথবা ভূতে পাইয়াছে। পরদিন মধ্যাহ্নে খানসামা আসিয়া টেবিল সজ্জিত করিয়া খানা দিয়া গেল। হরিপ্রাণ চিরাভ্যস্ত চামচকাটা সাহায্যে খাদকের মত খাইতে বসিল। একটা মাংসের টুকরা ছুরির সাহায্যে খাইতে যাইয়া জিভ্ কাটিয়া ফেলিল। খানসামা পুনরায় কি লইয়া আসিয়া হরিপ্রাণের রুধিরাক্ত মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "হুজুর, আপসে আপনি জবান্ কাটডালা!" হরিপ্রাণ মুখ মুছিয়া বলিল "হ, হঠাৎ হইয়া যাতা হ্যায়, কিন্তু আমি চামুচ কাট্টায় খুব খাইতে পার্‌তা হ্যায়।" অতঃপর হরিপ্রাণ প্রহরণাদি ছাড়াই খাইয়া উঠিল। আহারান্তে দিব্য-কান্তি বাবুটি সাজিয়া হরিপ্রাণ কেবিনের বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতেছিল, কলিকাতা যাইয়া উঠিবে কোথায়। হরিপ্রাণের পরিচিত কলিকাতায় কেহ ছিল না, তাই ঐ কথাটা তাহার একটু বেশ চিন্তার বিষয় হইল। হরিপ্রাণ একজন যাত্রীর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল——

"মোশয়, আপনে যাইবেন কৈ?" ভদ্রলোকটি হরিপ্রাণকে আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"কোল্‌কাতা"।

হরি। মোশয় বুঝি হেইখানেই থাকেন?

ভ। হাঁ।

হরি। আচ্ছা, মোশয়—কোইথে পারেন কৈলকাত্তা গিয়া সুবিধা মতন কোনখানে থাকোন্ যায়?

ভ। কোলকাতায় অনেক বড় বড় হোটেল আছে, তাহাতে থাক্‌তে পারা যায়। মামুলি হোটেলও আছে। যার যে রকম ইচ্ছে, সে রকমই থাকতে পারে।

হরি। না মোশয়, আমি খুব ভাল হোডেল চাই।

ভ। তা' বেশ, তাও পেতে পারেন।

হরি। ভারা লইব কত, কইথে পারেন?

ভ। ভাড়া, জায়গা ও খানা বুঝে। এই ধরুন গ্র্যাণ্ড হোটেলে ২০৲ ক'রে দিন নেয়, গ্রেট্ ইষ্টারণ হোটেলেও প্রায় ওরকমই, কণ্টিনেণ্টেল্

হোটেলে কিছু কম, ১৫৲ আন্দাজ হ'বে। আর তা না হয়, আপনি রাধাবাজার হোটেলে থাকতে পারেন। খরচা অনেক কম হ'বে, আন্দাজ ৮৷১০৲ টাকায় বেশ থাকতে পারবেন।

হরি। সেই জাগাটা কোনখানে ?

ভ। গাড়োয়ানকে বল্লেই আপনাকে নিয়ে যাবে।"

ভদ্রলোকটির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে হরিপ্রাণ ক্যাবিনের কাছে আসিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া এবং হোয়াইট্ অ্যাওয়ের ক্যাটেলগ্ খানা লইয়া বাহিরে আসিয়া ভদ্রলোকটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আইচ্ছা, মোশয়, এই দোকানটা কোনখানে ?" ভদ্রলোকটি ক্যাটেলগটি দেখিয়া বলিলেন, "ও দোকান চৌরিঙ্গীতে ; গাড়োয়ানদের বল্লেই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।" হরিপ্রাণ সমস্ত খবর লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল ; বেলা ১—৪৫ মিনিটের সময় রেলে রওনা হইয়া রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া হরিপ্রাণ ভৃত্যসহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিল। একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ঠিক করিয়া গাড়োয়ানকে রাধাবাজার হোটেলে যাইতে বলিয়া হরিপ্রাণ গাড়ীর ভিতর বসিল। কলিকাতায় রাস্তার উপর দিয়া রেলগাড়ী চলে দেখিয়া হরিপ্রাণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কলিকাতার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চমৎকৃত হইয়া রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় হরিপ্রাণ রাধাবাজার হোটেলে আসিয়া উঠিল ; হোটেল স্বামী হরিপ্রাণকে একটি ঘর দেখাইয়া তাহার সম্মতি লইয়া সেখানে তাহার শয্যাদি করিয়া দিল।

পরদিন হরিপ্রাণ মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া একখানা রবার টায়ার ফিটন্ ভাড়া করিয়া ভৃত্যসহ Whiteaway Laidlawর বাড়ীতে আসিল। ভৃত্যকে বলিল "তুই এইখানে থাক্ ; ছোটলোক এগ্যারমইধ্যে যাইতে পারে না।" ভৃত্য অগত্যা তাহাই করিল ; হরিপ্রাণ ক্যাটালগ হস্তে বহুদর্শীর মত অভ্যস্ত ভাবে চাহিতে ২ দোকানে প্রবেশ করিল। প্রথমে কয়েক পা' অগ্রসর হইয়া হরিপ্রাণ হোয়াইট অ্যাওয়ের বিরাট ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া গেল, কিয়দ্দূর যাইয়া হরিপ্রাণ দেখিল সেখানে একটি মেম বিক্রেতা কোন ক্রেতার সহিত কথোপকথন করিতেছে ; হরিপ্রাণ তাহার হস্তস্থিত ক্যাটালগের কোন একটা জায়গা দেখিয়া নিজেই বলিয়া উঠিল "না।" আর একটু অগ্রসর হইয়া হরিপ্রাণ দেখিল, সেখানে আর একটি মেম কতগুলি ব্লাউসপিস্ ভাঁজ করিয়া রাখিতেছে ; সেখানে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া হরিপ্রাণ একটু বিরক্তস্বরে

বলিল, "আরে, তারে ক্যান্ দেহি না?" হঠাৎ অদূরে আর একটি মেমকে দেখিয়া—"ঐ ত পাইছি" বলিয়া একটা চিৎকার করতঃ তিন লম্ফে যাইয়া সেই মেমকে দু'হাতে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এতক্ষণ আছিলা কৈ ঠারাইন।" মেম সাহেব ত "O, Lord, O, Lord," বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হরিপ্রাণের আবক্ষ আলিঙ্গন হইতে আপনাকে সে শত চেষ্টায়ও মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। হরিপ্রাণ তাহাকে খুব দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "আগো, কান্দ ক্যান্? আমি তোমারে কিনুম্।" আধ মিনিটের মধ্যে সেখানে বহুলোক আসিয়া জড় হইল; মেম সাহেবকে হরিপ্রাণের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু হরিপ্রাণ তাহাকে আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "ক্যান্ মশয়রা, আমি ইয়ারে কিনুম, আমি টাকা লইয়া আস্‌ছি; সাত টাকা ক্যান্ আমি দশ টাকা দিমু; টাকা লইয়া আস্‌ছি, আপনারা টানাটানি করেন ক্যান্?" কিন্তু উপর্য্যুপরি সাহেবদিগের বুটের লাথি আর বেশীক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সে মেম সাহেবকে ছাড়িয়া দিল। সাহেবরা ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হরিপ্রাণের দিকে পুনরায় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক "Peace Peace" বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া হরিপ্রাণকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ছেলেটি, তোমার কি হ'য়েছিল?" হরিপ্রাণ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; কিন্তু, প্রহারজনিত রাগটা তখনও যায় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে মাটি হইতে ক্যাটালগটা তুলিয়া Ladys' Hatএর পৃষ্ঠাটা খুলিয়া ভদ্রলোকদিগের সাম্‌নে ধরিয়া খুব রোষভরে সে বলিল, "কি আর অইব মশয়? এই স্থাহেন ফর্দ্দের মধ্যে এই টুপীপড়া মেমসাহেবের দাম ল্যাহা রইছে হাত টাকা। আমি কত কষ্টে তালাস কইরা বাইর করছি; অখন ব্যাটারা দিতে চায় না, আরও আমারে মাইরা পিটাইয়া দিল!" ভদ্রলোকেরা সকলে খুব হাসিলেন এবং হরিপ্রাণকে দোকানের বাহিরে আনিয়া তাহার ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। হরিপ্রাণ বুঝিল, কলিকাতায় সবই জোচ্চুরী; ফর্দ্দে যাহা লিখে, তাহা দেয় না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

———

কালো।

কালো বলে সে তোমারে বাসেনি ভাল ?
কি বলিলে বল সখি, আবার বল।
ছল ছল দুনয়নে
চাহিয়া মুখের পানে
কি বলিছ, ভাল করে আবার বল।
কালো বলে সে তোমারে বাসেনি ভাল !

(২)

কেমন সে অপ্রেমিক ! প্রেমের তৃষা
সে বুঝি ভেবেছে শুধু চোখের নেশা !
নয়নে যা লাগে ভাল
তাই বুঝি শুধু আলো
আর যাহা সবি কালো—হায় দুরাশা !
রূপের সাগরে প্রেম রতন আশা।

(৩)

প্রেম যে প্রাণের ক্ষুধা চির বাসনা
জীবের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দিতেছে হানা।
নয়নে সে রূপ তৃষা
শ্রবণে সঙ্গীত ভাষা
অধরে অমৃত, ঘ্রাণে কুসুম কণা
সে কি শুধু নয়নের রূপ কামনা ?

(৪)

ভেবো না, কেঁদোনা বালা, সেধোনা তারে,
সে এসে আপনি ধরা দিবে তোমারে।
প্রেম নহে রূপ তৃষা,
রূপ নহে ভালবাসা।
প্রেমের গোপন বাসা হৃদি মাঝারে,
বুঝিবে সে একদিন নয়ন ধারে।

(৫)

চিনিবে সে একদিন প্রেমের আলো।
অনুতপ্ত ম্লানমুখে
তোমারে ধরিয়া বুকে
দেখিবে অবাক্ হয়ে তার সে কালো—
সারা এ আঁধার বিশ্ব করেছে আলো।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পিতৃ-তর্পণ।

(১)

তারিখ মনে না থাকিলেও সেটা যে ফাল্গুন মাস তাহা কবুল করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রভাতে যখন বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রবোধ নবীন কমলাদি বন্ধুগণ পরিবৃত হইয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংযোগে মর্ত্তের সুধা চা-রস পান করিতেছিলাম, তখন কাপশোভিনী দুগ্ধশর্করা-মিশ্রিতা ঈষত্তিক্ত-সুধা অতিমধুরা লাগিতেছিল, অথচ গাত্রস্থিত শালটি যে কখন সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া চেয়ারের উপর স্থানলাভ করিয়াছিল সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। সর্ব্বজন প্রশংসিত মধুরকণ্ঠবিহঙ্গ তাহার কলকণ্ঠ সঙ্গীতে আমাদের ন্যায় অকবির প্রাণে ভাবের আবেশ সঞ্চার করিতে না পারিলেও যে মধুময় কুহুস্বরে দিগন্ত প্লাবিত করিতেছিল সেটা ঠিক্ এবং মৃদুমন্দ মলয়পবন পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আনিয়া মানবচিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া ধরাবক্ষে বসন্তরাণীর আগমন বেশ নিঃশঙ্কচিত্তেই প্রকাশ করিতেছিল। বন্ধুবর প্রবোধ লেখক ও বেশ সুরসিক পুরুষ, তাহার প্রতিবাক্যে যখন আমরা অট্টহাস্যে বৈঠকখানা মুখরিত করিতেছিলাম, তখন ভৃত্য লছমন এক টুকরা কাগজ আনিয়া আমার হাতে দিল। সকলের কৌতুহল দৃষ্টি যুগপৎ সে দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহাতে লেখা ছিল :—

"মহাশয়, এই ব্যক্তি দরিদ্র, অদ্য প্রাতে ইহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, সৎকারার্থ কিছু সাহায্য করিলে আপনার নিকট চিরঋণী থাকিবে।"

ইতি সুরেন্দ্রনাথ বসু

"সুরেন বোস—কেহে তরুণ? কৈ তাকে ত চিন্‌তে পারছি না?" বলিয়া নবীন গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া লইয়া ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। প্রবোধ বলিল, "আরে তুমিও যেমন, ও সব বুজরুকি, পয়সার থাকৃতি পড়েছে, তাই ওই রকম একটা ভোল ফিরিয়ে এসেছে।" নবীন বলিয়া উঠিল "ঠিক, দেখতে পাচ্ছ না, লোকটার গুলিখোরের মত চেহারা? বোধহয় নেশার পয়সা কম পড়েছে।" কমল কিছু বলিল না। ইত্যবসরে আগন্তুকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম—কাল লম্বা মতন লোকটি পরিধানে ময়লা ছিন্ন বস্ত্র, গাত্রে তদুপোযুক্ত ময়লা একখানি চাদর। দারিদ্র্য সে দেহে তাহার কঠোর ছাপ দিয়া গিয়াছে। কোটরগত চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ কিন্তু মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া বিরাজমান। তাহাকে দেখিয়া সামান্য দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল, আজ পরের দুয়ারে হাত পাতিবার জন্য যেন সে লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল, পকেট হইতে সবে মাত্র মণিব্যাগটি বাহির করিতে যাইতেছি, অমনি প্রবোধ বাধা দিয়া লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করিল—"ভগবান তোমার অবস্থা ভাল করেছেন—অর্থের সদ্ব্যয় করবার জন্য, একটা নেশাখোরের নেশার পয়সা জোগানর চেয়ে পৃথিবীতে অনেক দানের পাত্র আছে"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। নবীনও সেই সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু কঠোর হৃদয় হইলেও আমি তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছিলাম না। আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চেয়ারে জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। ইহার পর আড্ডাটা আর ভাল জমিল না, কমল ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবাঃ! পৌনে নটা—আমার যে বেলা হ'য়ে গেল"—বলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চলিয়া গেল। একাকী হইবামাত্র সে ব্যক্তির মুখখানি মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; বাইসিকেল্ খানি হাতে করিয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দরোয়ান মুকুল সিং তাহার চির প্রচলিত প্রথামত টুল ছাড়িয়া উঠিয়া একটি লম্বা সেলাম করিল। আমি বলিলাম "দরোয়ানজী, যো আদমি আভি হামরা পাশ আয়া, উয়ো কোন সড়ক্ পর গিয়া বল্‌নে সেক্‌তা?"

"আরে উয়ো কালা আদমি, কেঁও খোদবন্দ্!"

"কেঁও নেই—জলদি বোলো।"

"উনকো ত হাম বাঁয়ে তরফ যানে দেখা, লেকেন—"

আমি সাইকলে উঠিয়া পড়িলাম। বিরলজন ল্যান্সডাউন রোডের উপর দিয়া গাড়ী বোঁ বোঁ করিয়া ছুটিতে লাগিল, প্রায় দশ মিনিট পরে সে লোকটিকে দেখিলাম। তাঁহাকে প্রায় ধরিয়াছি, অমনি সে বাঁদিকে একটা সরু গলিতে ঢুকিয়া পড়িল, আমিও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম।

(২)

কি দেখিলাম! এমন করুণদৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই। উঠানে তুলসী তলায় একটি বৃদ্ধা মহানিদ্রায় অভিভূতা, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া একটি বালিকা নীরবে ক্রন্দন করিতেছে ও মাঝে মাঝে মৃতার মুখপানে চাহিয়া ফুঁকারিয়া উঠিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই—বাহিরে কর্ম্মজগৎ অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে। যে যার নিজের কার্য্যে ব্যস্ত। যুবকটি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা "মামাগো! ভগবান্ আমাদের কি কল্লে গো!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

"চুপ কর্ খেঁদি, কাঁদিসনি। ভগবান্! ভগবান্ নেই! নৈলে তিনি কি এত কষ্ট দেখতে পারতেন, না তিনি থাকলে লোক এত পাষাণ এত কঠিন হতে পারত!" বলিয়া একটি মর্ম্মভেদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। উভয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ,—আর থাকিতে পারিলাম না, জানি না কেন আমার শুষ্ক নয়ন হইতে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু বর্ষিত হইতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, "মহাশয়!" "কে—ও" বলিয়া যুবক বাহিরে আসিল, তারপর আমাকে দেখিয়া একটু পিছাইয়া গেল। একটু অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম "মহাশয়, আজ থেকে আমি আপনার বন্ধু, পূর্ব্বের দুর্ব্যবহার ভুলে গিয়ে আমাকে একবার বন্ধুভাবে ভাবুন—একবার—অন্ততঃ আজকের জন্য।" দেখিলাম তাহার বদনে কৃতজ্ঞতার একটা স্বর্গীয় ভাতি প্রকটিত হইয়াছে—সে শুধু উর্দ্ধে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "ভগবান্, তুমি আছ!" তার পর আমার দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিল, "মহাশয় আপনি দেবতা।" তারপর আর কি—রৌপ্য মহিমায় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। যে সমস্ত প্রতিবেশী পূর্ব্বে কখনও তাহার গৃহের ছায়া স্পর্শ করে নাই, তাহারা অতি আগ্রহের সহিত বৃদ্ধার সৎকারার্থ তাহার গৃহে সমবেত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে তাহাদের চিরশত্রু "নরুর মা" বালিকাকে অযাচিত সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে।

যখন বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথোচিত সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস (সেই যুবকের নাম) বলিল, "মহাশয়, আজ যা আপনি আমার জন্য করলেন, ভাই তা ভায়ের জন্য আজ কাল করে না, আমি আর কি বলিব, ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।" আমি বলিলাম "ভাই, বন্ধু যদি বন্ধুর জন্য এতটুকু না করে, তবে সে বন্ধু নামের অযোগ্য। তা তুমি একটু সুস্থ হলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো—করবে কি ?"

"নিশ্চয়ই—আমি অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড নই" বলিয়া সে আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখি হৈ চৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে, আমার মত কুণো লোক সমস্ত দিন ঘরে নেই, এ কি কম ভাবনার কথা ? যাহাহউক, আমার আগমনে সকল গোল চুকিয়া গেল। কোন এক মিথ্যা কার্য্যের দোহাই দিয়া সে যাত্রা অব্যাহিত পাওয়া গেল। এ কাহিনী কিন্তু সকলের অজ্ঞাত রহিল।

ইহার তিন দিন পরে সন্ধ্যার পরে বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, বিপুল হাস্যরসের সহিত 'ব্রে' খেলাটা বেশ পূরদমেই চলিতেছিল। প্রবোধ ও নবীন দুজনেরই ব্রে হবার সমান সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কমলের একটা মারপেঁচে প্রবোধই অবশেষে ব্রে হইল। নবীন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল "ঠিক ঠিক হয়েছে এ তোমারই উপযুক্ত।" প্রবোধ বলিল, "যা হ'ক, খুব বেঁচে গেছিস রাস্কেল, আচ্ছা এবার এস চাঁদ। দেখা যাক কে হয়।" নবীন মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু সে হচ্ছে না বাবা, একবার চার পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে ডাক, তবে আবার খেলা আরম্ভ হবে।" এই বলিয়া সে হাততালি দিয়া উঠিল। যুদ্ধাহত রথীর মত প্রবোধ তাকিয়া ঠেসান দিয়া নলটি তুলিয়া লইয়া ঘন ঘন টান দিতে লাগিল। এমন সময়ে মনে হইল, দরোয়ান যেন কাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে, তাহার সুর পঞ্চম হইতে ক্রমে সপ্তমে উঠিতেছিল, বিজয়গর্ব্বোৎফুল্ল নবীন হাকিল, "লছমন, দারোয়ান এত্তে করে কেন গোলমাল করতা হায় ? হাম লোক খেলতে নাহি পারতা হায়।" প্রবোধ সময় পাইয়া বলিল "বাঃ বাঃ! একেবারে ফাষ্টক্লাস হিন্দি, সবে দিল্লী থেকে আসা হচ্ছে বোধ হয়—বলে যাও বাবা বলে যাও! থামলে কেন ? বল, 'বাবুকো একটু মান্য নেহি করতা হায়, একেবারে উচ্ছন্ন যাবার পন্থা তৈয়ারি করতে লাগা হায়।" হাসির রোলে ঘর কম্পিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় আমি গেটের দিকে অগ্রসর হইলাম,—দেখিলাম, 'কৃষ্ণদাস আমার দর্শন প্রার্থী, কিন্তু দারোয়ান তাহাকে

কিছুতেই ঢুকিতে দিবে না। "আরে, বাবু আভি খেল করনে রহে, মুলাকাত নেহি হোগা" বলিয়া সে তাহার আকর্ণবিস্তৃত গুম্ফরাজিতে ঘন ঘন কর-সঞ্চালন করিতেছে। কিন্তু আমি যখন কৃষ্ণদাসকে সসম্মানে হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে লইয়া আসিলাম, তখন সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, সেলাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। আমি তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম, "ভাই তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছি, আমায় মাপ কর। এখন কোনও কাজের কথা হতে পারে না, আমার সমস্ত বন্ধুগণ রয়েছেন, তাদের সম্মুখে আমি এ সমস্ত গোপনীয় কথা বলতে ইচ্ছা করি না। যদি কাল সকালে একবার——"

"নিশ্চয়ই আসব" বলিয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। বোধহয় বন্ধুদের উপস্থিতির কথা শুনিয়া সে এক মুহূর্ত্তও থাকিল না।

(৩)

পরদিন সকালবেলা লাইব্রেরী ঘরে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় প্রভাতবাবুর "দেশী ও বিলাতী" পড়িতেছিলাম, "প্রবাসিনী" পড়িতে পড়িতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে কৃষ্ণদাস ঘরে যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। মুখ তুলিবামাত্র তাহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। গৃহতলে একখানি কুশাসন বিছাইয়া সে আসন পরিগ্রহণ করিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমার সহিত প্রথম আলাপ হইতেই আমার কেমন ধারণা হইয়াছে যে তুমি উচ্চবংশ-সম্ভূত। অথচ তোমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারিতেছি না। তোমার জীবনের কাহিনী শুনিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে ত আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিও। দেখিলাম, তাহার মুখের ভাব অদ্ভুত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ। আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "তবে থাক্, যদি কষ্ট হয়ত বলতে হবে না।"

"কষ্ট, কষ্ট! হাঁ—তা হয় বৈকি! সে কাহিনী যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে রয়েছে। হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ছিঁড়ে ফেলে তবে সে কাহিনী বলতে হবে।—কিন্তু বলব, তবু আপনাকে বলব, আর এ অনল হৃদয়ে পুষে রাখতে পারি না, প্রাণটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।" এমন আবেগে এতগুলি কথা

এক সঙ্গে বলিয়া সে যেন একটু হাঁপাইয়া পড়িল। তারপরে একটু দম লইয়া আমার নিষেধসত্ত্বেও বলিতে আরম্ভ করিল :—

"ঠিক ধরেছেন মশায়, চিরকাল আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। আমার প্রপিতামহ খুব ধনী ছিলেন। বার মাসে তের পার্ব্বণ কিছুই বাড়ীতে বাদ যেত না। পিতামহের সময় থেকে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। পিতা কোন জমিদার সরকারে ক্যাসিয়ারের কার্য্য করতেন। জমিদার বা গ্রামের নাম বলতে পারব না, মাপ করবেন। সংসারে আমি, পিতা, মাতা ও একটিমাত্র ভগিনী—সেও বিবাহিতা, কাজেই বেশ সুখেই সংসার চলছিল—কিন্তু বিধাতার মনে কি ছিল বলা যায় না। কি একটা কর্ম্মোপলক্ষে—ঠিক মনে নাই,—পিতা তাঁর উপরিস্থিত কর্ম্মচারী জমিদারের নায়েব মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন। কি বলছেন, নাম? না সে পাষণ্ডের নাম উচ্চারণ করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। হুঁ—তারপর—শুনুন। পূর্ব্বেই বলেছি আমার ভগ্নী বিবাহিতা, সুন্দরী ব'লে গ্রামে তাহার বেশ খ্যাতি ছিল,—সেই দিন থেকে আমাদের সুখের সংসারে বজ্রঘাত হইল। ইহার দিন পাঁচেক পরে, সুঁদরগাঁ থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, তখন বেশ ঘোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ বোসেদের পুকুর-ধারে যেখানে বড় অশ্বত্থ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে স্ত্রীলোকের গলার স্বর শুনে একটু এগিয়ে গেলাম,—দেখলাম কলসী কাঁকে আমার ভগিনী দাঁড়িয়ে কাঁপছে, আর সেই পাষণ্ডটা তার হাত ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে, ক্রোধে হাতের লাঠিটা তার দিকে তাগ করে ছুঁড়লাম। কিন্তু তার গায় লাগল না, সে পালিয়ে গেল। তারপরে মূর্চ্ছিত ভগিনীকে কোন রকমে বাড়ী নিয়ে এলাম। উঃ! যদি হাতে পিস্তল থাকত, সেদিন নিশ্চয়ই তাকে যমের দক্ষিণ দোর দেখিয়ে দিতাম।" এইখানে সে একটু চুপ করিল, দেখিলাম তাহার চক্ষু ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল,—"পিতা গিয়ে জমিদার মহাশয়কে সব জানান, কিন্তু সেই পাষণ্ড তাঁর কাণে কি বিষমন্ত্র দিয়েছিল জানিনা, তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাতও করলেন না। তারপর আর কি? সেই দুর্ব্বৃত্তের ক্রোধানলে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত আহুতি দিয়ে এক নিস্তব্ধ রজনীতে আমরা গ্রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করলাম। পিতা অতিকষ্টে একটি রেলওয়েতে টিকিট দেখবার কার্য্য পান, তাহাতে কোন প্রকারে সংসার চলছিল। কিন্তু এ সুখও বিধাতার সইল না। সেই ১৯০৮ সালের ট্রেণসংঘর্ষণের কথা খবরের কাগজের পাঠকমাত্রেই

জানেন, তাতে অনেক লোক মারা পড়ে, এ হতভাগ্যের পিতাও তাদের মধ্যে একজন আমি তখন স্কুলে পড়ি, সুতরাং পড়া ছাড়িয়া একটা প্রেসে কার্য্য গ্রহণ করলাম। সংসারে মা ও আমি; ভগিনী তখন স্বামীগৃহে। কিন্তু ছমাস যেতে না যেতেই ভগিনী তাহার কন্যাকে আমার হাতে দিয়ে পিতার সহিত মিলিত হতে গমন করলেন। ইহার পর প্রায় দশ বৎসর নানাস্থানে কাজ করেছি। অবশেষে আমার শেষ ভরসা মা যখন রোগে শয্যাশায়ী হলেন, তখন চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। শেষে মাকে নিয়ে কলিকাতায় এলাম। শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত খরচ করলাম, কিন্তু তাঁকে রাখ্‌তে পারলাম না।" বলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাকুক, এই করুণ কাহিনী শুনিয়া আমি নিজেই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। একটু পরে তাহাকে বলিলাম, "ভাই, আর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে, যে পরিচয় গুলি তুমি গোপন করিলে সেগুলি বলিতে হইবে, অবশ্য এ কথা কেহ জানিতে পারিবে না।"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "তবে শুনুন—গ্রামের নাম পাথরগাঁ, আর সেই পিশাচটার নাম কুমুদনাথ রায়। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর জমিদারের নাম?

"সারদাচরণ ঘোষ।"

পৃথিবীটা যেন আমার চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল—আঁ! এ যে আমারই পিতা———

(৪)

কৃষ্ণদাস বাবু এখন আমার জমিদারির অন্তর্গত কাদখালি পরগণার নায়েব। দুই বৎসর পরে বড়দিনের ছুটিতে জমিদারী পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম, সঙ্গে কনিষ্ঠভ্রাতা অরুণচন্দ্র। অরুণ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজিতে এম এ পড়ে, আধুনিক ধরণের ছোকরা, একটু কবিতাপ্রিয় ও নিজেও মাঝে মাঝে লিখিতে চেষ্টা করে। কাদিখালিতে ৭।৮ দিন থাকিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস, তাহার নবপরিণীতা পত্নী ও মাতৃহীনা ভগিনীকন্যার যত্নে অতিসুখেই সময় অতিবাহিত হইতেছিল। সেই খেঁদি—এখন 'নিহারবালা'—আর এখন বালিকা নয়, নববর্ষাগমে বর্দ্ধিতোন্মুখলতার ন্যায় যৌবনের প্রথম আহ্বানে তাহার রূপ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে,—এখন বালচাপল্যের স্থানে লজ্জা তাহাকে অধিকার করিয়াছে এখানে আসিয়া অরুণকে একটু অন্যমনস্ক দেখিতেছি। খুব বেশী

কবিতা লিখিতেছে। একদিন গোপনে তার একখানা খাতা ও একটু দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু হাসিলাম।

সেদিন বেলা তিনটার সময় মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর বাহিরের ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলাম ও মনে মনে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার অশেষ প্রশংসা করিতেছিলাম, এমন সময় ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কৃষ্ণদাস ঘরে প্রবেশ করিল। আমি বলিলাম, "কি হে? এখনও আহারাদি হয়নি নাকি? কোথায় গিয়েছিলে?"

"আর বলেন কেন মশায়, একটা পাত্রের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, খেঁদি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তের উৎরে চৌদ্দয় পা দিয়েছে, কি করি মাথামুণ্ডু কিছু ভেবে পাচ্ছি না।" এই বলিয়া সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

"যাও আহারাদি সেরে এস, সব শোনা যাবে এখন"—বলিয়া আমি নলটি হাতে তুলিয়া লইলাম।

বেলা ৫টায় কৃষ্ণদাস পুনরায় আসিল। খেঁদির বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আজকাল বরের বাজার কি রকম তাহা সে সালঙ্কারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল এবং চশমখোর বরের পিতাদের একটু মৃদুমধুর গালাগালি দিতেও ছাড়িল না। তারপর বলিল—"বুঝ্‌লেন বড়বাবু, আজ একটা পাত্র দেখ্‌তে গিয়েছিলাম,—এই নন্দগ্রামে—এখান থেকে ক্রোশ পাঁচেক হবে। পাত্র এল, এ ফেল, ওখনকার ইস্কুলে ২০৲ টাকা মাহিনায় মাষ্টারি করে, সেও কিনা হাজার টাকা নগদ আর পঞ্চাশ ভরি সোণা চায়!" এই বলিয়া সে দক্ষিণ পদ কম্পিত করিতে করিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, "মা বল্‌তেন, আমার খেঁদির এমন শ্রী—এও নিশ্চয়ই রাজরাণী হবে, এখন দেখছি কেরাণীরাণী হলেই বাঁচি।" বলিয়া সে অধরপ্রান্তে একটি ক্ষীণ বিষাদের হাসি প্রকাশ করিল। দেখিলাম, তাহার চক্ষু সজল। সেই কাতরদৃষ্টি দেখিয়া মনে একটা আঘাত লাগিল! ধীরে ধীরে বলিলাম, "তা, তোমার মার কথাটা একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে। একেবারে রাজরাণী না হ'ক্—ছোট খাট ঐ রকম গোছের একটা কিছু হ'তেও বা পারে—যদি তুমি অনুমোদন কর।"

"সে কি বড়বাবু? খেঁদি——"

"খেঁদি আর কেন ভাই—বল নিহার। তা—আমাদের অরুণের সঙ্গে কি তার বিয়ে হ'তে পারে না?"

দেখিলাম সে বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,

সে কি আমার কথার ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই, হঠাৎ সে আমার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিল, "বড়বাবু!" আমি তাহাকে বক্ষে টানিয়া নিয়া কহিলাম—"আর বড়বাবু কেন? তুমি ত—হঁা—আর—'তুমি' কি 'ভাই' বলাও চলে না। সম্পর্কে যে গুরুজনই হ'চ্চ। তা ওঠ। দেরী ক'রে কাজ নেই। আজই—এখনই আশীর্ব্বাদটা ক'রে ফেলি!"

উভয়ে উঠিলাম। প্রাণে আমি বড় একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলাম। আমার স্বর্গীয় পিতা না বুঝিয়া এই নিরপরাধ সুখী পরিবারের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই আত্মজকর্ত্তৃক তার কতকটা যে এমন প্রতিবিধান হইল, ইহাতে প্রাণে তখন যে একটা তৃপ্তি অনুভব করিলাম. জীবনে কখনও তা করি নাই। পিতা দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও যারপরনাই সহৃদয় ছিলেন, তিনিও যে পরলোকে ইহাতে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হইল, সত্যই আজ পিতার তর্পণ করিলাম!

শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী।

হেমন্ত প্রভাত।*

কুয়াসা-অঞ্চলে ঊষা ঢাকি' রাঙা মুখ
থমকি' দাঁড়িয়ে কাছে পূবব-তোরণে;
সজল-শীতল বায়, হরিৎধান্ত শীষ্
কাঁপায়ে-কাঁপায়ে মৃদু বহে ঝিরি-ঝিরি।
সরসীর স্বচ্ছনীর নেবে গেছে দূরে,
চিহ্ন তার রাখি পাড়ে লুণ্ঠিত শৈবালে;
ধবলবলাকা বসি' কলম্বীর দলে—
অপলক চেয়ে আছে গ্রাসিবারে মীন।
জল-নামা কর্দ্দমার্দ্র ধান্য ক্ষেত্র পাশে—
মন্থর গতিতে চলে কর্কট-শম্বুক;
নীহার স্বপন-মুগ্ধ লতাতন্তু-জালে,
শালূক-কদলী ভেলা লুণ্ঠিত কর্দ্দমে।
শারদ-অঞ্জলি শেষ শেফালী-বালার,
'টুনি' ফুল গাঁথে শুভ্র মালা কমলার।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* 'টুনি'—বিক্রমপুরাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র পঙ্কজ পুষ্প। কথিত আছে, এই ফুল কমলার বড়ই প্রিয়। লেখক।

সংসার ও সন্ন্যাস

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে বৃদ্ধ ধনুকে তীর যোজনা করিয়া আকর্ণ টানিয়া সিঁড়ির নীচে শত্রুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু যখন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাদের সঙ্গে গেরাডকে না দেখিয়া সে নিতান্তই বিস্মিত হইল। ধনুক অবনত করিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে সে আগন্তুক দিকের প্রতি চাহিয়া রহিল! তাহারাও বৃদ্ধকে তদবস্থায় দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইল! ডিরিক সঙ্গীদিগকে বলিল, "বুড়ার হাব ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন আমাদিগকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে!"

মার্টিন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "তুমি কি পাগল না কি? ধনুকে একটা নূতন ছিলা পরাইলাম কি না, তাই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম কেমন হইল!"

"বটে! তা বাপু তুমি যে মানুষটি কি রকম, আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই! সে যা হউক, এখন আগুনটা একটু ভাল করিয়া জ্বাল দেখি, যাওয়ার আগে আমাদের ভিজা কাপড় গুলি একটু শুকাইয়া লই।"

মার্টিন—ডিরিকের কথানুসারে চুল্লিটি ভাল করিয়া ধরাইল। ডিরিক ও সঙ্গীরা চুল্লির পাশে বসিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিয়া দিল। ইহারই কিছুক্ষণ পরে দ্বিতল হইতে মার্গেরেটের আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়া তাহারা সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরস্পরের মুখের দিকে ভীত চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

তাহাদিগের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি একটি আলো লইয়া দ্রুত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। উপরে কি ব্যাপার হইতেছে না বুঝিতে পারিলেও ডিরিকের সঙ্গী সেখানে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া মার্টিনও দ্রুতপদে তাহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু ডিরিক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এই অবসরে তাহার অন্য সঙ্গীরাও আসিয়া মার্টিনের উপর পড়িল। যে লোকটি আলো লইয়া উপরে যাইতেছিল সে বিনা বাধায় চলিয়া গেল। কিন্তু ডিরিক ও তাহার চারিজন সঙ্গী মিলিয়াও বৃদ্ধ মার্টিনকে সহজে পরাভূত করিতে পারিল না। দুই তিনবার সকলে মাটিতে গড়াগড়ি দিবার পর বিশেষ কষ্টের সহিত

অবশেষে তাহারা এই বৃদ্ধ ভীমসেনকে পরাস্ত করিয়া তাহায় হাত পা শক্ত রজ্জু দ্বারা দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া ফেলিল।

মার্টিন এইরূপে নিরুপায় হইয়া পড়িয়া কেবল মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ডিরিকের সঙ্গী ততক্ষণে মার্গারেটের ঘরে গিয়া পৌছিয়াছে! কিন্তু উপায় কি? তার যে আর কোনও সাধ্যই নাই!

ডিরিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে মার্টিনকে বলিল, "বুড়া কুকুর! এখন যত ইচ্ছা দাঁত কড়মড় কর, কিন্তু আর কামড়াইবার সুযোগ পাইতেছ না।" তারপর সে সঙ্গীদিগকে বলিল, "ভাই সব, এ বুড়ার হাত খোলা থাকিতে আমাদের জীবন বড় নিরাপদ ছিল না।"

অপর একজন বলিল, "আমার মনে হয় গেরাড নিকটেই কোথাও আছে।"

ডিরিক উত্তর দিল, "আরে না, সে বরাত আমাদের নাই। কিন্তু ভাই সব, জোরিয়ান কেটেল মেয়েটার ঘরে গেল—সে যে আর ফেরে না! ব্যাপার খানা কি, একবার দেখিয়া আসা ভাল।"

ডিরিকের কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরে তাহারা হাসিবার অবসর পাইয়াছে, কাজেই এই কথা লইয়া কিছুক্ষণ হাসি ও রঙ্গরস চলিতে লাগিল। তাহাদিগের হাসি থামিতেই উপরে দ্রুত-পদ শব্দ শোনা গেল ও জোরিয়ান কেটেল আসিয়া উপস্থিত হইল।

"এই যে ভায়া—এতক্ষণে ফিরিবার কথা মনে পড়িল? তা বেশ! ব্যাপারখানা কি বল ত?"

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

জোরিয়ান কেটেল মার্গারেটের ঘরে পৌছিয়াই দেখিল যাহার সন্ধানে তাহারা সমস্ত দিন রাত্রি পথে পথে ফিরিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই ঘরেই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখ বিবর্ণ, দেহ অসাড় ও নিষ্পন্দ, মার্গারেটের ক্রোড়ে তাহার মস্তক স্থাপিত এবং সেও মূক গভীর শোকের প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে গেরাডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মার্গারেটের চক্ষু উন্মিলিত, কিন্তু

পলকহীন ও দৃষ্টিশক্তিবিহীন। নূতন লোক একজন প্রদীপ হস্তে যে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতেও তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞার উদয় হইল না।

জোরিয়ান এই মর্ম্মভেদী শোকের দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এতক্ষণ গেরাড কোথায় ছিল?" কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না—মার্গারেটের কোনও ভাবান্তর হইল না। তখন সে চারিদিক চাহিয়া কাঠের উন্মুক্ত বাক্সটির নিকটে গিয়া ব্যাপারটি এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতায় ও কারুণ্যে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ওঃ কি ভয়ানক পরিণাম! সামান্য কয়েকখানি চর্ম্মপটের জন্য আজ কি সর্ব্বনাশ হইল! এ যে আমাদের হাতে ধরা পড়িলেও ভাল ছিল। হায়! হায়! মেয়েটার যে কথা বলিবারও শক্তি নাই। গেরাড কি বাস্তবিকই মরিয়াছে? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি——"

এই বলিয়া সে ঘর খুঁজিয়া একখানি ক্ষুদ্র আয়না সংগ্রহ করিয়া গেয়াডের নাকের নিকট ধরিল এবং কিছুক্ষণ পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার উপর ক্ষীণ বাষ্প জমিয়া দর্পণখানি মলিন হইয়া গিয়াছে।

জোরিয়ান আগ্রহ সহকারে বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছে—মরে নাই!"

এই কথা কয়টি যেন যাদুমন্ত্রের ন্যায় মার্গারেটের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মোহ দূরীভূত করিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখে জোরিয়ানকে দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বাষ্পবদ্ধ কণ্ঠে আবেশভরে বলিতে লাগিল, "কে তুমি বন্ধু আমাকে এমন কথা শুনাইলে? ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন!"

জোরিয়ান বলিল, "এখন আমার কথা শোন—ইহাকে ধরিয়া চল বিছানায় শোয়ান যাক।'

এই বলিয়া জোরিয়ান গেরাডকে বিছানার উপর আনিয়া শোয়াইয়া দিল। তার পর তার সঙ্গে যে এক প্রকার তীব্র সুরা ছিল তাহার পাত্রটি বাহির করিয়া গেরাডের মুখে ও চক্ষে ২।৩ বার ছিটাইয়া দিল। সুরার তীব্র গন্ধে যেন গেরাড একটু জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেই ক্ষীণ শব্দটি মার্গারেটের কর্ণে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত অপেক্ষাও মনোহর বোধ হইতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ গেরাডের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিল না। তাহার ভয় হইল, পাছে আবার কোনও বিপদ ঘটে।

জোরিয়ান্ তাহার ভাব দেখিয়া বলিল, "বেশ বেশ—দূরে থাক, সেই ভাল! আমাকে যেরূপ চাপিয়া ধরিয়াছিলে এ বেচারীকে সেরূপ ভাবে আদর করিতে গেলে ইহার ক্ষীণপ্রাণটুকু এখনই বাহির হইয়া যাইবে। একটু সুস্থির থাকিতে দাও, তা হইলেই ইহার চেতনা ফিরিয়া আসিবে। এ ত আর বুড়ার প্রাণ নয় যে একটু শ্বাসরোধেই শেষ হইয়া যাইবে?"

ক্ষণকাল পরেই গেরাড একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং ধীরে ধীরে তাহার গণ্ডস্থলে রক্তিম আভা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তখন জোরিয়ান ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দরজায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কে পিছন হইতে তাহার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিল।

জোরিয়ান মুখ ফিরাইয়া দেখিল মার্গারেট সর্পের ন্যায় বাহুর বেষ্টনে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে। জেরিয়ান্ ফিরিয়া চাহিতেই মার্গারেট নিতান্ত মিনতি সহকারে অশ্রুপূর্ণ কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "দোহাই ঈশ্বরের! আপনি এ ঘটনা আপনার সঙ্গীদিগকে বলিবেন না। আপনি ইঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আপনিই কি আবার নৃশংশভাবে ইঁহাকে মৃত্যুর বিবরে পাঠাইবেন? একবার যাহা দান করিয়াছেন, আবার কি তাহা ফিরাইয়া লইবেন?"

জোরিয়ান্ বলিল, "না—না—ভয় নাই। তোমাদের দুইজনকে আমি একটু স্নেহের চক্ষেই দেখি। মনে করিয়া দেখ, সেদিন গির্জ্জায় যখন আমরা গেরাডকে বন্দী করি, আমিই তোমাকে কাতর দেখিয়া গোপনে বলিয়াছিলাম, যে তাহাকে নগরপালের বাটিতে নেওয়া হইবে। তবে কি জান,—এই—আমার বাড়ীতে অনেক গুলি খাওয়ার লোক—এ কাজে যথেষ্ট পুরস্কারও ছিল—তিন শত টাকা! তা মেয়ে, তুমি যদি আমাকে সেই চর্ম্মপটগুলির সন্ধান বলিয়া দিতে পার ত বড় উপকার হয়। ছেলে মেয়ে গুলির একটা উপায় হয়।"

"ওটাকা তারাই পাইবে, আপনি স্থির জানিবেন।"

"বটে! বটে! তবে কি সেগুলি,—এই ঘরেই আছে?"

"না, তা নাই। তবে আমি জানি যে কোথায় আছে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কাল আপনি এখানে আসিলেই সেগুলি পাইবেন। অবশ্য একলাই আসিবেন, অন্য কেহ যেন সঙ্গে না থাকে।"

"আরে সে ত নিশ্চয়ই। আমি এমন মূর্খ নই যে আবার একজন ভাগীদার জুটাইয়া আনিব। আর তুমিও নিশ্চিন্ত থাক। গেরাড যে এখানে আছে, একথা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারিবে না।"

এই কথা বলিয়া জোরিয়ান্ দ্রুতপদে বিদায় হইল। তাহার এদিকে অনেক বিলম্ব হইয়াছে, পাছে সঙ্গীরা কেহ তাহার সন্ধানে আসিয়া পড়ে, এজন্য সে ত্রস্তপদে তাহাদের নিকট ফিরিয়া গেল। দরজায় পৌছিয়া একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মার্গারেট গেরাডের শয্যাপার্শ্বে জানুপাতিয়া যুক্তকরে কম্পিত কলেবরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

জোরিয়ান্ সঙ্গীদিগের নিকট পৌছিতেই তাহারা হাস্যপরিহাসের সহিত নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। তদুত্তরে সে গম্ভীর বিষণ্ণভাবে বলিল, "ব্যাপার আবার কি? তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছ, তাহাতে ভদ্রলোকের মেয়েটি ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিল। এখন একটু সুস্থ হইয়াছে, দেখিয়া আসিলাম।"

"তবে চল, আমরা সকলে গিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়া আসি।"

"অর্থাৎ কিনা তাহার প্রাণের যেটুকু আশা আছে, তাও শেষ করিয়া আসি। বাপু, সে সব তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। তাঁর বাপ একজন চিকিৎসক, তা ত জান? আমি আজ তাকেই ডাকিয়া দিয়া আসিয়াছি। ওহে একটু সর, আমাকে একটু আগুনের পাশে বসিবার জায়গা দাও।"

সে যেরূপ সহজভাবে এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে কাহারও মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইল না। কিছুক্ষণ পরে সকলেই সাব্যস্ত করিল এত বৃষ্টিতে ভিজিবার পর শুধু আগুনের তাপে শরীর গরম হইবার সম্ভাবনা নাই, উপযুক্ত পানীয়েরও প্রয়োজন। অতএব সকলে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী সরাইয়ের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। সেখানে ভিতর বাহির দুইদিক গরম করিবার ব্যবস্থাই হইতে পারিবে।

ডিরিকের দলবল চলিয়া গেল, যাইবার পূর্ব্বে তাহারা মার্টিনের হাত পা খুলিয়া দিয়া গেল। ডিরিক সঙ্গীদিগকে বলিতে বলিতে গেল, "দেখিলে ভাই সব, আমার কথা ঠিক কিনা? আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে আমরা বড় দেরী করিয়া ফেলিয়াছি, গেরাডকে ধরা যাইবে না।"

গেরাডের পক্ষে সেই কাল রাত্রি কি ভীষণ মূর্ত্তিতেই আসিয়াছিল। অর্দ্ধ-রজনীর মধ্যেই একবার কারাদণ্ড ও একবার মৃত্যুদণ্ডের করালগ্রাসে পড়িতে পড়িতে সে রক্ষা পাইয়া গেল। কিন্তু কি উপায়ে? তাহার সুকৌশল রচিত গুপ্তস্থানের গুণে নয়—মার্গারেটের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণেও নয়—কিন্তু নৃশংস কার্য্যে জীবননির্ব্বাহ করিয়া যাহার মনুষ্যত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইভাব বর্দ্ধিত হওয়ায়! মনুষ্যহৃদয়ের কার্য্য-কারণ

সংঘাত এইরূপই বিস্ময়কর এবং বহু স্থলেই মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিণামও এইরূপই অকিঞ্চিৎকর!

মানুষের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় উৎকটসুখ ও বিকট দুঃখ—জীবনের এই উভয় সীমান্তরেখা হইতেই দূরে অবস্থান করিতে পান, তাঁহারাই সম্ভবতঃ জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। কিন্তু এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের প্রণয়ীযুগলের এই বিপদমুক্তির আনন্দাতিশয্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। আবার যাঁহারা অত্যন্ত সুখ ও অত্যন্ত দুঃখের মধ্যদিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন, মার্গারেট ও গেরাডের হৃদয়ের আনন্দাতিশয্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারি, এরূপ সাধ্যও আমার এ ক্ষুদ্র লেখনীর নাই।

চক্ষের সমক্ষে যে দেখিতে পায়—প্রিয়তম মৃত্যুর গ্রাস হইতে আবার জীবনে—আবার সংসারের সুখ সৌন্দর্য্যে ফিরিয়া আসিতেছে—যে দেখিতে পায়, প্রাণের অধিক প্রিয় সেই সুন্দর মুখখানিতে মৃত্যুর কালিমা অপসৃত হইয়া ধীরে ধীরে রক্তিমআভা ফুটিয়া উঠিতেছে—আবার সেই নীলমলিন নেত্রে প্রণয়ের স্নিগ্ধদৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছে—আবার সেই মুখকমল হইতে মধুর প্রেমসম্ভাষণ নিঃসৃত হইতেছে—এরূপ যে দেখিতে পায়—তাহার হৃদয়ের সেই আনন্দাতিশয্যের বিনিময়ে বুঝি বা জীবনের শতবর্ষব্যাপী দুঃখও অতিতুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। মার্গারেটের হৃদয়ের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইল। আর গেরাড? সে যখন চেতনা পাইল—চক্ষুউন্মিলিত করিয়া দেখিল, মার্গারেটের কোমল বাহুলতা তাহার উপাধান—শুনিতে পাইল—যাহা কোনও দিন শোনে নাই—তাহার হৃদয়ের উপাস্যা সেই প্রণয়িনী কত মধুর প্রেমসম্ভাষণে তাহাকে ডাকিতেছে—অনুভব করিতে লাগিল—সেই আঁখির কত তপ্ত অশ্রুধারা তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে—সেই বিম্বাধরের কত চুম্বন—সেই কুসুম সুকোমল দেহবল্লরীর কত আলিঙ্গন তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিতেছে। আহা! মৃত্যুর কালনিদ্রা হইতে জাগরণ যদি এরূপ সুখেরই হয়, তবে—হে মৃত্যু! তুমি শতবার বরণীয়!

গেরাড প্রথমেই এই একটি নূতন জ্ঞানলাভ করিল, তাহার প্রতি মার্গারেটের প্রণয় কিরূপ প্রগাঢ় কোমল ও মধুর। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় মার্গারেটের হৃদয়ে প্রণয়ের উত্তাপ যে কিরূপ সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা গেরাড এই প্রথমে উপলব্ধি করিল। কাজেই গেরাড মনে মনে তাহার শত্রুদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

গেরাড চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিতেই প্রণয়ীযুগল দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মার্গারেটের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার যেন সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। গেরাডের স্কন্ধের উপর তাহার মস্তক অবসন্ন হইয়া পড়িল। গেরাডও নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া পড়িল এবং সকলকে ডাকিতে যাইতে উদ্যত হইল। মার্গারেটের যেন ঈষৎ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে গেরাডের হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "না না গেরাড! আমার কাছ হইতে দূরে যাইও না, তুমি একটু দূরে গেলেও আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। ছিঃ. কেন তুমি এত উতলা হও? আমি একটু দুর্ব্বল বোধ করিতেছি মাত্র, এ বিশেষ কিছুই নয়, আমার হৃদয়ে যে আনন্দের প্রবাহ চলিতেছে, আমি এখনই সারিয়া উঠিব।"

এবার গেরাডের পালা। মার্গারেটের অবসন্ন মস্তক তাহার স্কন্ধে অবস্থিত—মার্গারেটের আলুলায়িত স্বর্ণাভকুন্তল রাশি তাহার বক্ষে ও পৃষ্ঠে বিলম্বিত—মার্গারেটের দ্রুতস্পন্দিত হৃদয় তাহার হৃদয়ে অবস্থিত! গেরাড কত সুমিষ্ট সম্ভাষণে—প্রণয়ের ভাষার কত সুধামাখা কথায়—মার্গারেটকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধহয় রমণীর এইরূপ দুর্ব্বলতাই তাহাকে পুরুষের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় করিয়া তোলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মার্গারেটের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। ক্রমে পুনর্ম্মিলনের প্রথম ভাবাবেগ প্রশমিত হইল। তখন ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের আলোচনা আরম্ভ হইল।

হায়, কি দুরদৃষ্ট তাহাদের! আজ তাহারা কত সুখী, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। কত দিনের জন্য—কি চির জীবনের জন্য—কে বলিতে পারে? মার্গারেট আজ যেমন গেরাডকে, হারাইতে বসিয়াছিল ইহাও কি ভাবী ঘটনার—ছায়াপাত বলিয়া মনে করা উচিত নয়? বিদেশে গেরাড কত বিপদে পড়িতে পারে—হয়ত সকল বিপদ উত্তীর্ণ না হইতেও পারে। হয়ত জীবনে এই শেষ সাক্ষাৎ। তাই যদি হয় তবে মার্গারেট সেই সুদীর্ঘ নিষ্ফল জীবনের ভার কেমন করিয়া বহন করিবে? এক দিনের জন্যও সে গেরাডের পত্নী-গৌরবের অধিকারী হইয়াছিল, এই স্মৃতিটুকু সম্বল থাকিলেও জীবনের শুষ্ক মরু কোনও প্রকারে সে অতিক্রম করিতে পারিবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে সেই রজনীতেই তাহারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাহকার্য্যের অনুষ্ঠান সে রাত্রিতে হওয়া অসম্ভব। কাজেই স্থির হইল, ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক

বিবাহের যে সকল মন্ত্রাদি আছে তাহা পাঠ করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইবে। এরূপ অনুষ্ঠান লোকসমাজের নিকট ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট ইহা ধর্ম্মানুগত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যে সমাজ তাহাদিগকে এরূপ অন্যায় অত্যাচার করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তাহার মতামতের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজনই বা কি ?

প্রণয়ীযুগল এইরূপ স্থির করিয়া তদনুযায়ী বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিল। তখন তাহারা স্বামী ও স্ত্রী ভাবে যেন নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল। যেন নূতন আনন্দে ক্রমে তাহাদের হৃদয়ের বিষাদ ভার কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষে তাহাদের বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু যাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন এতবার হইয়াছে তাহাদের হৃদয়ে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা নিতান্ত লঘু বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশাও আছে। যেখানে আশা আছে, সেখানে আনন্দও আছে। নবদম্পতীর হৃদয়ে ভবিষ্যতের ছবি আশার কুহকে ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর ভাব ধারণা করিতে লাগিল। আজ তাহারা সুখী—স্বর্গ-সুখের অধিকারী ? প্রেমের মোহন আবেশে নব দম্পতী রজনীর অবশিষ্ট ভাগ স্বর্গীয় সুখে অতিবাহিত করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

করুণা।

তোমারি করুণা ধারা
　　সুনীল গগন ভালে,
ঝরিছে করুণাধারা
　　শ্যামল ধরণীতলে,
করুণায় ফোটে ফুল,
　　গাহে পাখী মৃদুস্বরে ;
তটিনীর ঢেউ গুলি
　　ও করুণা গান করে।

পবিত্র করুণারাশি.
　　সযতনে তুলি শিরে—
সংসারের কর্ম্মপথে
　　চলে যাব ধীরে ধীরে।
মরণের পরপারে
　　অনন্ত জীবন যেথা
সঙ্গে করে নিয়ে যাব
　　তোমারি করুণা সেথা।

শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সাধনা।

(১)

আজ নীরদের বিবাহ। নীরদের বাড়ী কলিকাতায়, কালীঘাটে বিবাহ হইতেছে। অনিল শরৎ সুবোধ প্রবোধ প্রভৃতি সমপাঠী বন্ধুবর্গও বরযাত্রী হইয়া বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই যুবক এবং কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র—কেহ এম এ পড়ে, কেহ বি এ পড়ে, এবং কেহ বা বি এল পড়ে। আধুনিক কাব্য সাহিত্যাদিও সকলে কিছু না কিছু আলোচনা করিয়া থাকে, গল্প কবিতা প্রভৃতিও কেহ কেহ লিখিয়া থাকে। সমপাঠী ও সমরসিক বন্ধুর বিবাহ। সুতরাং সকলেরই চিত্তপ্রফুল্ল, মুখে মধুরহাসি। সকলেই—সুরূপ না হইলেও অতি সুবেশ বটে। কেশ সুবিন্যস্ত, কাহারও শ্মশ্রু, কাহারও বা গুম্ফশ্মশ্রু উভয়ই হাল-ফ্যাসানে—সম্মুণ্ডিত, নয়ন চশমাশোভিত, বক্ষ স্বর্ণচেনে অলঙ্কৃত, কাহারও নিজের, কাহারও বা ধারকরা শালে পরিচ্ছদও বিলাসীধনিতনয়োচিত,—কণ্ঠে সকলেরই বরযাত্রীর লক্ষণ পুষ্পমাল্য দোলিত। প্রায় সকলেই অবিবাহিত সুতরাং এমন দিনে সকলেরই প্রাণটা যেন প্রেমোন্মুখ বা বিবাহোন্মুখ হইয়া কেমন একটা মধুর পুলকের তড়িৎ-স্পর্শে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে! এমন তাদের এখন অনেক সময়েই নাচিয়া থাকে,—আজ অবশ্য কিছু বেশীই নাচিতেছে! নাচিবে না কেন? ছাত্রাবাসের ছোট ছোট ঘরে রাশি রাশি দর্শন বিজ্ঞান গণিত ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তকের মধ্যে ছোট্ট চৌকিখানির উপরে বসিয়াই যখন নাচে,—তখন বন্ধুর বিবাহের আসরে চারিদিকে যেখানে প্রেমের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে, প্রেমের সেই মধুর আবেশময় মাদকতা যেন সর্ব্বত্র এলাইয়া চলিয়া সকলের গায় পড়িতেছে, সেখানেই বা নাচিবে না কেন?

যথাসময়ে শুভলগ্নে বর বিবাহমণ্ডপে নীত হইল। বন্ধুরাও সঙ্গে গেল। কন্যাকর্ত্তা মন্ত্র পড়িয়া বরকে বরণ করিলেন। স্ত্রীআচারের জন্য পরামাণিক হাতে ধরিয়া বরকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া চলিল,—কুলাঙ্গনারা শঙ্খ হুলুধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিলেন। বন্ধুগণও হুটাপটি করিয়া লোক ঠেলিয়া গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। বিবাহের সময়ে বরযাত্রী যুবকগণের এটুকু নিঃসঙ্কোচ অধিকার সকলেই মানিয়া নিয়া থাকেন। গৃহমধ্যে স্বালঙ্কৃতা ও সুসজ্জিতা বহু বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সমুৎসুক উৎফুল্লনয়নে বরের দিকে চাহিলেন—কেহ হাসিলেন, কেহ একটু রঙ্গ করিলেন।

সাধনাশ্রম (সাধনা)

কমলা প্রেস,—কলিকাতা।

কেহ কেহ বা দ্বারে দণ্ডায়মান অপরিচিত যুবকদের পানে এক একবার চাহিয়া দেখিলেন, এরা কারা এবং কে কেমন বেশে সাজিয়া আসিয়াছে, কার রঙ কেমন, নাক মুখ কেমন, চশমা কেমন মানাইয়াছে, গায়ের শালই বা কেমন, বুকের চেন্ কার কত দামের হইবে, চুলের ছাটপাটি কে কোন্ ভঙ্গীতে করিয়াছে, ইত্যাদি। নারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক মুহূর্ত্তেই যেমন লোকের রূপ ও বেশভূষার একটা হিসাব মনে ধরিয়া নিতে পারে, এমন কোনও পুরুষের পারে কি? কেহ কেহ স্ত্রীআচারের প্রক্রিয়াগুলি আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধাবিধবা কেহ কেহ একটু দূরে দাঁড়াইয়া কি ভাবে কোন্ ক্রিয়া করিতে হইবে, তাহা হস্তাঙ্গুলি সঞ্চালনে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিলেন। যে এঁয়োরা ইহা করিতেছিলেন, তাঁহাদের এরূপ নির্দ্দেশের যে তাঁদের কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল, তা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া বৃদ্ধারা তাঁহাদের প্রবীণতা এবং ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতা দেখাইতে ছাড়িবেন কেন?

দ্বারে দণ্ডায়মান যুবকেরাও যে গৃহমধ্যে উপস্থিত নারীদের—বিশেষ তরুণী-কন্যাগণের বেশভূষার না হউক, রূপের একটা হিসাব মনে ধরিয়া নিবার প্রয়াস যে না পাইতেছিল, তা নয়।

সকলেই যথাসম্ভব সাবধানে পলকে পলকে স্মিতমুখী তরুণীগণের মুখের শোভা দেখিয়া নিতেছিল, পরস্পরের গা টিপিয়া ইসারা করিয়া দেখাইতেছিল, ফিস্-ফাস্ শব্দে কাহারও রূপের তারিফ করিয়া দুই একটা কথাও বলিতেছিল। একটি কন্যার মুখখানি অনিলের বড় মিঠা লাগিতেছিল,—সে প্রায় তার দিকেই চাহিতে লাগিল। কন্যাটি বাস্তবিক সুন্দরী, বয়স চৌদ্দ পনের হইবে,—এ বয়সে কুরূপাকেও শোভাময়ী দেখায়। একটু দূরে সে দাঁড়াইয়াছিল। সলজ্জ মুখখানিতে তার বড় মধুরহাসি ফুটিতেছিল। দ্বারের দিকে একবার চাহিতেই অনিলের মুগ্ধনয়নে তার নয়ন মিলিল। পাশে দণ্ডায়মানা একটি বধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সে আরক্ত মুখখানি সরাইয়া নিল। অনিল একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্ত্রীআচার হইয়া গেল। বর বাহিরে আসিয়া ছালনাতলায় গিয়া দাঁড়াইল। শুভদৃষ্টির সময় একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। বালবৃদ্ধ বরযাত্রী সকলেই নববধূর মুখখানি একবার দেখিবার জন্য ছালনাতলায় গিয়া ভিড় করিলেন। বরের বন্ধুবর্গ সকলকে ঠেলিয়া আগে গিয়া দাঁড়াইল। বধূর অবগুণ্ঠন যখন উন্মোচিত হইল, বন্ধুরা নীচু হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ দেখিল, হাসিল, টিটকারীও করিল। কেবল অনিলের তেমন একটা আগ্রহ দেখা গেল না। বধূ সুন্দরী

বটে,—ললাটে, কর্ণে ও কণ্ঠে বিচিত্র রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কারে আরও সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আহা! স্বল্পাভরণা হইলেও তার সেই মুখখানি যে আরও কত সুন্দর—কি মধুর সুষমাময়। কিন্তু হায়, কে সে? এ জন্মে কি আর সে মুখখানি সে দেখিবে?

বিবাহ হইয়া গেল। বর বাসরঘরে গেল। বরযাত্রীদেরও আহার হইল। বরযাত্রীরা প্রায় সকলেই রাত্রি সেখানেই যাপন করিবেন। নীরদ বধূকে বামে লইয়া বাসরসঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রমোদরঙ্গে ও সঙ্গীতে বাসরযামিনী যাপন করিবে,—বন্ধুরা স্থির করিল, তাহারাও অগত্যা পরস্পরের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে রাত্রি যাপন করিবে,—সঙ্গীতে বাসরসঙ্গিনীদের সঙ্গে পাল্লা দিবে। হারমোনিয়াম আসিল,—তাস আসিল। কেহ তাস খেলিতে বসিল, কেহ হারমোনিয়ামে সুর দিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। এ আসরে ভগবৎসঙ্গীত চলে না, 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি,'—'ওয়ি ভুবনমনমোহিনী'—এ সবও জমে না। অবশ্য শেষের এই 'ভুবনমনমোহিনী' জমে বটে,—যদি মনের তার তখন সকলের যে সুরে বাঁধা ছিল, 'মোহিনী' যদি সেই সুরের মত সেই মনের মোহিনা হয়। তা যাই হউক, সে সুরে সুর বাঁধা গানের ত অভাব নাই। 'রূপসী পল্লীবাসিনী,' 'আমার হৃদয়রাণী' ইত্যাদি সঙ্গীতে যুবকদের উৎফুল্লচিত্ত আবেশময় মত্ততার গ্রাম হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। বাসরেও সঙ্গীত হইতেছিল। অন্তঃপুরের ও বহির্ব্বাটীর সঙ্গীতে সত্যই যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। যাহারা ক্রীড়ামোদী, তাহাদের তাস মাঝে মাঝে যেন হাতে অচল হইয়া রহিতেছিল। সহসা বাসর হইতে বড় মধুরকণ্ঠে কার সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। আগেও গান হইতেছিল, কিন্তু কই? এমন মিঠা ত একটিবারও লাগে নাই! সকলেই মুগ্ধ ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

"বাঃ! বেড়ে গায়! কে ভাই?"

"আঃ! অমন গান ঘরে যদি কেউ গায়, কোন শালা আর থিয়েটারে যায়!"

"ওকে যে বিয়ে ক'র্‌বে——"

"যদি হ'য়ে থাকে?"

"তার স্বামীর সঙ্গে ডুয়েল লড়্‌ব।"

"চেহারাটাই আগে দেখ দাদা, সুধু কাণেই ত আর গান শুন্‌বে না? চোকেও ত মুখ দেখ্‌তে হবে?"

"চুলোয় দেও দাদা মুখ। হ'ক না কাল থাঁদা! কাণের সুরে যে চোকের দৃষ্টি ছেয়ে রাখ্‌বে।"

"দূর হতভাগারা! কার মেয়ে কি কার বউ কিছু জানিস্‌নি,—আগেই কাণে চোকে কি আপোষ হবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। বেসামালে একটা অচেনা অজানা সুরের সঙ্গেই প্রেমে পড়িস্‌নি যেন। শেষে পস্তাবি।"

"তুই ভারি বেরসিক শরৎ! ওই সুর যে——"

"বুঝি কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।"

"তোর যদি না পশে থাকে—তুই একেবারে নীরস পাষাণ!"

"ঠিক—ঠিক! বিয়ে কল্লে বউটা পাষাণের চাপে একেবারে হাঁপিয়ে মর্‌বে।"

"চুপ! চুপ! ওই আবার———"

আবার সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি উঠিল, যেমন সুর—গানটিও তেমনই মধুর। সকলে আবার তন্ময় হইয়া শুনিল।

"দেখ দেখি! এমন গান—এতেও যে না ভোলে——"

শরৎ কহিল, "ভোল্ না! আজ ভোল্, কাল তা আবার ভুলে যা! বস্। কোথায় কে—কার অচেনা মেয়ে না বউ—একটা মিঠে গান ক'রলে—আর অম্‌নি তার প্রেমে সব উন্মাদ আর কি? ডুয়েল ক'রেই তাকে কেড়ে নিতে প্রস্তুত। ওরে, সেকালের আসুর রাক্ষস বিয়েও এখন নেই, আবার বিলিতী ডুয়েলও হাল আইনে একেবারেই চলে না। আইন ত পড়িস? সে যে Culpable homicide—

"Not amounting to murder"

"তা অতটা নাই হ'ল,—নরহত্যা ত? একেবারে ফাঁসির মালা গলায় প'র্‌তে না হ'লেও লম্বা শ্বশুর ঘরে ত যেতে হবে? শ্বশুর ঘর হ'লেও প্রেমিকা সেথায় নেই, খালি ঘানি ঘোরাতেই হবে।"

"যাই হ'ক দাদা—গন্ধর্ব্ব বিয়ে চ'ল্‌তি থাক্‌লে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। নিদেন আজকে।"

শরৎ উত্তর করিল, "একটা মেয়েমানুষের গলা যতই পঞ্চমে চলুক, পাঁচটা বরের সঙ্গে গন্ধর্ব্ব বিয়ে ত তার চল্‌বে না?"

"স্বয়ম্বর ত চল্‌তে পারে!"

"হঁ্যা—হাঁ! ঠিক—ঠিক বলেছ প্রবোধ!" সকলে হো হো করিয়া হাত তালি দিয়া প্রবোধের এই মন্তব্য সমর্থন করিল।

"বেশ প্লান ঠাউরেছে প্রবোধ, একটা স্বয়ম্বরই ক'রে ফেলা যাক্! আমরা সবাই ক্যাণ্ডিডেট হ'য়ে বসি, সে এসে বেছে নিক্!"

"কাকে বেছে নেবে ?"

"যে সব চেয়ে বেশী তন্ময় হ'য়েছে তার গানে—"

"তথা প্রেমে।"

"কে তা বেছে দেবে ?"

"শরৎ—সে বোধ হ'চ্চে ক্যাণ্ডিডেটই হবে না ?"

"একেবারেই না, তোদের মত প্রেমপাগলা আমি নই।"

"বেশ ত। তবে তুই বেছে দে—কাকে সে মালা দেবে—কে সব চেয়ে বেশী তন্ময় হ'য়েছে।"

শরৎ উত্তর করিল, "তন্ময় যদি কেউ হ'য়ে থাকে—তবে সে অনিল।"

"কিসে ?" "কিসে ?" "কেন ?" "কিসে বুঝ্‌লে।"

সকলে একেবারে এই সব প্রশ্ন করিল।

শরৎ কহিল "অনিল একেবারে চুপ মেরে আছে। তোরা এত বকাবো ক'চ্চিস,—তার মুখে একটি বাক্যি নেই, মন যে কোথায়—কোন্ দেশে কার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তা কারও বুঝবার যো নেই। একেই বলে তন্ময়তা। কেমন অনিল ? নয় কি ?"

অনিল সত্য সত্যই একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মিষ্ট মুখখানি তার মনের মধ্যে অবিরত উকিঝুঁকি মারিতেছিল, গানের সুর শুনিবামাত্র অনিলের স্থির ধারণা হইল. এ মিঠা সুর সেই মিঠা মুখেরই। জাগ্রত কল্পনায় পরে তার মনে হইতেছিল, যেন সেই সুন্দরী তরুণী তার আরক্তিম মুখখানি নত করিয়া তার সম্মুখে বসিয়া সেই সঙ্গীত সুরসুধাবর্ষণ করিতেছে,—সেই সুধাপানে সে একেবারে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। সহসা শরতের এই প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিল,—কহিল, "অঁা! কি ? কি বলছ ?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাত তালি দিল।

"বলি কোথা ছিলে এতক্ষণ। সেই সুন্দরীর সঙ্গীত সুধাসিন্ধুর অতলজলে একেবারে নিমগ্ন হয়ে ?"

অনিলের সুন্দর মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিল।

"এই রে! হ'য়েছে! একেবারেই ম'জেছে! 'এখনও তারে চোকে দেখিনি, সুধু বাঁশী শুনেছি'——" এই বলিয়া শরৎ একটু সুর ভাজিল।

প্রবোধ বলিল "অনিলই তবে আজ এই স্বয়ম্বর সভার নল হ'ক! "আমরা

পাঁচ দেবতা লোভ সম্বরণ ক'রে আপন আপন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি। দময়ন্তীকে তবে কেউ ডাক।"

"বেড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধবে দাদা? শরৎ! এটাও তবে তোমাকেই ক'ত্তে হ'চ্চে।"

"বেড়ালের ভয়ে মর মর ইন্দুরের দলে আমি নেই—আমার গরজ প'ড়েছে যে ঘণ্টা বাঁধতে যাব। গরজ তোদের—তোরা দেখ যদি পারিস্! রাত ঢের হ'য়ে গেল। একটু ঘুমিয়েনি, সর্!"

এই বলিয়া শরৎ একটা তাকিয়া টানিয়া নিয়া শাল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তখন আবার বাসরে সেই মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত উঠিল। সঙ্গীত থামিল। রঙ্গ-রসও আর তেমন যেন জমিল না। শীতের রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল। বাসরও ক্রমে নীরব হইল। বন্ধুগণ একে একে শরতের পন্থা অনুসরণ করিল। কে কি মধুর স্বপ্ন দেখিল, সেই জানে। তবে অনিল যে স্বপ্নে সেই রাত্রিশেষটুকু সেই সুন্দরীর সঙ্গীতসুধা-সাগরের মধুর তরঙ্গভঙ্গে রঙ্গে নাচিতেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(২)

বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গেল; অনিল গিয়া নীরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কথায় কথায় গায়িকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গায়িকার নাম সাধনা, পিতা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী কলিকাতায় কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অবস্থা ভাল নয় বলিয়া সুপাত্র এখন পান নাই। যত দিন না পান, বিবাহ দিবেন না। অতি যত্নে সাধনাকে তিনি শিক্ষাদান করিতেছেন। তিনি নিজে সুগায়ক, কন্যাকেও উত্তম সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন। সাধনা তার স্ত্রীর সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে পড়িত এবং উভয়ে বেশ সখ্যও আছে। সাধনার আকৃতি ও বেশভূষাদি কিরূপ ছিল জিজ্ঞাসা করায় নীরদ যেরূপ উত্তর করিল, তাহাতে অনিল বুঝিল, তাহারই দৃষ্টা সেই সুন্দরীই এই সাধনা।

শেষে নীরদ হাসিয়া কহিল, "কেন হে? অত ক'রে পরিচয় নিচ্ছ যে? চোকেও দেখেছ, গানও শুনেছ,—একেবারে প্রেমে প'ড়েছ না কি? তা হ'লে বল, ঘটকালীটা——"

অনিল একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "না—না! তা নয়—তা নয়! তবে——"

"তবে—আর কি? সোজা বলেই ফেল না। একেবারে প'ড়ে না থাক, পড় পড় যে হয়েছ—তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তা বেশ হয়েছে—বিয়ে কর

না? গরীব ভদ্রলোক বেঁচে যায়, তোমারও বেশ একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়। বল না, ঘটকালী করি। আমি না পারি, ঘটকী একজন ঘরেই ত র'য়েছে—"

"তা—ওঁরা কি আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?"

"ওঁরা দেবেন, দিয়ে কৃতার্থই হবেন। এখন তুমি নেবে কি না, সেইটে বুঝে দেখ।"

"দিলে———"

"নিয়ে আরও কৃতার্থ হবে। কেমন?"

মুখভরা হাসিতে অনিলের দন্তরুচিকৌমুদী একেবারে পূর্ণ বিকসিত হইল। সে কহিল, "তা দাদা—যা বল্লে—এখন——"

"এখন আর কিছুই নয়। বিবাহ সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন কতটা সেইটে বুঝে দেখ। বাড়ীতে তোমার বাবা মা জেঠা খুড়ো দাদা এঁরা পাঁচ জন র'য়েছেন—"

"আমি যদি পছন্দ করি তাঁরা কেন বাদী হবেন?"

"তুমি এম এ পাশ ক'রে আইন প'ড়ছ। বাপ খুড়োরা সকলে ভাল চাকরী করেন—অবস্থা ভাল। মহেন্দ্র বাবু যে তোমার মত কিছু দিতে থুতে পারবেন, এমন ত মনে হয় না। অবশ্য তোমার বাবার মত কি রকম জানিনে, তবে—"

"বাবা হয়ত লম্বা একটা চাইতে পারেন। তবে এমন দায় ত কিছু নেই। আমি যদি জিদ ক'রে বলি, তবে অমত ক'রবেন না। আমার মুখের দিকে চেয়ে টাকার লোভটা অবিশ্যি ছাড়বেন।"

"তা যদি মনে কর, তবে প্রস্তাব করা যায়। বাস্তবিক মেয়েটি বড় ভাল। আমার স্ত্রীর কাছে তার কথা সব শুনেছি। বিয়ে ক'ল্লে খুব সুখী হবে সন্দেহ নাই।"

"আহা! অমন খাসা গায়, এক একটি গানেই যে এক একটি দিন—"

"যেন এক এক পাত্র মদের মত কেটে যাবে—নেশায় জীবনটা একেবারে ভরপুর ক'রে রাখবে—নয় কিহে?" নীরদ হাসিয়া এই কথা বলিল।

অনিলও হাসিয়া উত্তর করিল,—"যা ব'ল্লে দাদা! লেগে যাও তুমি, আমি বিয়ে ক'রব ঠিক ব'লছি। কাজটা এগিয়ে ফেল, তা হ'লে আর তাঁদের আপত্তি চ'লবেই না।"

"হুঁ! আচ্ছা, কালই তবে, দাদা, বউকে পাঠাব। তারপর আমি নিজেই যাব।"

অনিল একটু ভাবিয়া কহিল, "হাঁ, একবার—দেখবার কি একটু আলাপ পরিচয় ক'রবার সুবিধে হয় না ?"

"তা—ক্ষতি কি ? বিয়েই যখন ক'রবে দেখা শুনোয় এমন দোষ কি ? আর দেখবার ত রীতিও আছে। আচ্ছা, তাই ব'লব।"

(৩)

পর দিন নীরদের স্ত্রী ইন্দু মহেন্দ্র বাবুর গৃহে প্রেরিত হইল। সকলের আগেই নিভৃতে সে সাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

"সই! সই! বড় একটা সুখবর আছে। কি খাওয়াবি বল্ !" ইন্দু চটুল চোখে বড় মধুর হাসিয়া সাধনাকে জড়াইয়া ধরিয়া এই কথা বলিল।

সাধনাও হাসিয়া কহিল, "কি এমন সুখবর লো ? নীরদ বাবু বুঝি একটা নতুন কবিতা তোর নামে লিখেছে ? তা তোর সুখবর, ইতরজনকে মিষ্টান্ন তুই খাওয়াবি,—আমি আবার কি খাওয়াব লো ?"

"ওলো, আমার ত তা হ'য়েই গেছে। তোরই দিন আস্‌ছে—ইতরজনকে মিষ্টান্ন কিন্তু বেশ ক'রে খাওয়াতে হবে।"

সাধনা কহিল, "তোর ও হেঁয়ালী আমি কিছু বুঝি না। খুলে বল্ না কি হ'য়েছে ?"

"তোর বিয়ে হবে লো বিয়ে হবে। খাসা বর।"

"পোড়ার মুখ! কি বলে পাগলের মত ?"

"সোণার মুখ বল ভাই, সেণায় খবর এনেছি আর পোড়ার মুখ ব'লে গাল দিচ্ছিস্ ?"

"না—তোর ও সব কথা আমি কিছু শুনতে চাইনি।"

"মুখে না চাস, মনে মনে খুবই চাস। হাঁ—! তা শোন্—শোন্। খাসা বর। ওঁর বড় বন্ধু। এম এ পাশ ক'রেছে; ল' পড়্‌ছে! তোকে দেখেছে, তোর গান শুনেছে,—একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে। তোকে না পেলে সে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে যাবে।" বলিতে বলিতে ইন্দু সাধনার চিবুক ধরিয়া তার সলজ্জ মুখখানি নাড়িয়া কহিল, "ওলো, তোর এই মুখখানা দেখ্‌লে, আর তোর গান শুন্‌লে, ভুল্‌বে না এমন বর কি কেউ আছে ? সেদিন বাসরে গাইছিলি, আমার ত ভয়ই হ'চ্ছিল, বুঝি বাসরেই আমার সাত রাজার ধন মাণিকটি চুরী যায়।"

সাধনার সুন্দর মুখখানি একটু লাল হইয়া উঠিল, যৌবনপুষ্ট কান্ত দেহ ভরিয়া কেমন অননুভূতপূর্ব্ব একটা পুলকপ্রবাহ ছুটিল। ইন্দু কহিল, "বরের নাম হ'ল অনিল—দিব্যি নামটি। দেখ্‌তেও কার্ত্তিকটির মত। ওঁকে এসে বড্ড ধ'রেছে। তাই না উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, ওঁদের কাছে কথাটা পাড়তে।"

সাধনা একটু সলজ্জভাবে ঈষৎ আরক্ত মুখে কহিল, "কি বল্‌ছিস্ ভাই, আমি বুঝিনি। কে আমাকে দেখ্‌ল? কোথায় আমার গান শুন্‌ল——"

ইন্দু উত্তর করিল, "সেদিন বরযাত্রী হ'য়ে এসেছিল। ঘরে যখন বিয়ের আগের স্ত্রীআচার হয়, দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল,—তোকে দেখেছিল। অবিশ্যি তোকে চিন্‌ত না। তা হাজার ফুলের মাঝেও কমলরাণীর পানে কার চোক না পড়ে ভাই?"

"দুরহ পাপ! কি ছাই পাঁশ সব বলে।" ইন্দুকে ছোট একটু ধাক্কা দিয়া সাধনা তার মুখখানি ফিরাইয়া নিল। মুখখানি বড় বেশী লাল হইয়া তখন উঠিতেছিল! ইন্দু তাকে টানিয়া সম্মুখের দিকে ফিরাইয়া কহিল, "ছাই পাঁশ কিলো? ঠিক কথাই বল্‌ছি। নইলে এত লোকের মাঝে তোকে তার এম্‌নি চোকে ধ'রে গেল?"

"তা গিয়ে থাকে যাক্, ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। তুই চল্ ওঘরে মার কাছে।"

"যাব—যাব। আগে তোকে সব ব'লে নি! তারপর সইমাকে গিয়ে ব'ল্‌ব। তোকে ত দেখ্‌ল—তারপর বাইরে গিয়ে ওরা বস্‌ল। তখন বাসরে তোর গান হচ্ছিল। গান শুনে ত সবাই যেন একেবারে যেন নেশায় ভোর হ'য়ে উঠল। অনিল বাবুর কেমন আপনা থেকেই মনে হ'ল, গান তুই-ই গাচ্ছিস্, নইলে এমন মিঠে গান কি আর কারও মুখে বেরোয়? ব'ল্‌তে কি ভাই, তোদের নিশ্চয় জন্মজন্মের একটা টান র'য়েছে, নইলে এমন কথাটি কেন তার মনে হবে?"

সাধনার বক্ষ বড় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল,—আবার কেমন একটা বড় চঞ্চল উষ্ণ পুলকপ্রবাহ শিরায় শিরায় শোণিত আলোড়ন করিয়া ছুটিল, দেহ ভরিয়া একটা রোমাঞ্চ উঠিল। আহা, কে এ? সত্যই কি তার সঙ্গে ইহার প্রাণ জন্মজন্মান্তরের কোনও মধুর সম্বন্ধের সূত্রে বাঁধা! তা নহিলে কেনই বা এমন হইবে?

"কিলো, খুব মনে ধ'রেছে বুঝি? তা ধ'র্‌বেনা? এ যে জন্মজন্মের টান। তা ভাই বেশ একখানা নভেলের মতই হচ্চে। তুই হলি নায়িকা,—আর আমি নায়িকার বড় সখী,—আমিই কি কম? তা বেশ হবে। ওঁকে ব'ল্‌ব একখানা নভেল লিখ্‌তে,—বেশ লেখে ভাই। তা যাই, সইমার কাছে। কথাটা গে বলি। তুই ব'সে ব'সে ধ্যান কর।"

সাধনা হাসিয়া কহিল, "কাকে ধ্যান ক'র্‌ব লো?"

"ওহো! তাইত! ধ্যানের মূর্ত্তি ত পাস্‌নি? তা দেখ্‌না—ধ্যান ক'রেই যদি মূর্ত্তিটা মনের চক্ষে ফুটিয়ে নিতে পারিস্‌। এই মন্ত্র প'ড়ে ধ্যান করিস্‌।" এই বলিয়া ইন্দু মৃদু স্বর ভাজিয়া গায়িল—

"কে তুমি আমার হৃদয় দুয়ারে
দাঁড়িয়ে আঁধারে—দেখা দাও,
ওগো দেখা দাও!
অমিয় মধুর আলোকে ভাসিয়া
মুখানি তুলিয়া—হেসে চাও,
ওগো হেসে চাও!"

"দূরহ পাপ! একেবারে যেন ক্ষেপেছে! বিয়ের জল গায়-না শুকুতেই এত রঙ্গ। এরপর ত আরও দিন প'ড়ে র'য়েছে!"

"দিন কি আর প'ড়ে থাক্‌বে?—এমনি রঙ্গেভঙ্গেই নেচে চ'ল্‌বে। তোর চ'লবে আরও—গায়ে জল না প'ড়তেই যে নাচুনী আরম্ভ হ'য়েছে! তা তুই নাচ্‌ মনে মনে যত পারিস্‌—আমি যাই সইমার কাছে, কথাটা পাড়িগে। দেখিস্‌ নাচ্‌তে নাচ্‌তে যেন একেবারে ঘুরে প'ড়ে মুচ্ছে যাস্‌নি। এসে যেন হাসিমুখখানিতে আরও হাসি ফোটাতে পারি।"

এই বলিয়া ইন্দু বাহিরে গেল।

(৪)

ইন্দু বলিয়া আসিল। তার পরদিন নীরদ নিজেও গিয়া কথা পাড়িল। মহেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার পত্নী কমলা উভয়েই অতি আনন্দে ও আগ্রহে নীরদের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। কেনই বা করিবেন না? সাধনার বিবাহের জন্ম সুপাত্রের আশা তাঁহারা একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। আজ বিধাতার কৃপায় আপনা হইতেই আশার অতিরিক্ত এমন সুপাত্র আসিয়া ধরা দিল! দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে বিধাতা যে সাধনাকে প্রায়

অতুলনীয়া করিয়া জগতে এই দরিদ্রের গৃহে পাঠাইয়াছেন। পিতামাতার দারিদ্র্যে যাহা অসাধ্য হইত, সেই সৌভাগ্য যেন বিধাতা তাঁহারই দেওয়া সেই সৌন্দর্য্য দ্বারা নিজে আকৃষ্ট করিয়া সাধনার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আহা, নিজের অযাচিত আশীর্ব্বাদ অযাচিত ভাবে নিজেই আজ বিধাতা পূর্ণ করিলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামী স্ত্রী আজ বিধাতাকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

নীরদ জানাইল, আর একবার সাধনাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ের জন্য অনিল তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করে। মহেন্দ্র বাবু ও কমলা আনন্দে অনিলকে তাঁহাদের কন্যা দেখিতে আহ্বান করিলেন।

পরদিন অনিল আসিল সঙ্গে নীরদও আসিল। সাধনাকে সুন্দর সাজাইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

বাহিরে ইন্দুকে যতই ধমক চমক করুক, তার কথাগুলি সেদিন সাধনার প্রাণে গিয়া বড় মধুর স্পর্শ দিতেছিল। সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও সুরূপ কোনও যুবা তার রূপে ভুলিয়া, সঙ্গীতে মোহিয়া, তার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে প্রণয়িনী পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়াছে, একথা শুনিলে যৌবনপ্রাপ্তা কুমারী কে এমন আছে, যাহার প্রাণে একটা মধুর আবেশের বিভোরতা না আনিয়া দেয়? থাকিয়া থাকিয়া একটা আনন্দ শিহরণ দেহ মধ্যে না নাচাইয়া তোলে? একটা মধুর কল্পনা অবিরত চিত্তপটে একটা মধুরমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে না চায়? কে এমন আছে, যার সকল প্রাণ না সেই মূর্ত্তিকে উচ্ছ্বসোন্মুখ প্রেমের আদরে গিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতে না চায়? আরও ইন্দু বলিয়াছিল, তাদের মধ্যে জন্মজন্মের একটা টান আছে। সত্যই আছে; নহিলে একদৃষ্টিতে কেন তার মূর্ত্তি তাকে এমনই আকৃষ্ট করিবে? সঙ্গীতের সুর কাণে পৌঁছিবামাত্র কেন তার মনে একথা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিবে, যে যাকে সে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, এ গানের সুরও তার। আহা, একি সত্যই জন্মজন্মের তার হৃদয় দেবতা। সত্য—সত্য। নহিলে কেন এমন হইবে? তার প্রাণই কেন এমন করিয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত প্রেমিকের পানে টানিবে? ইন্দুই বা কেন এমন কথা বলিবে? দুইদিন ধরিয়া অবিরত এই কথা সাধনার মনে হইতেছিল,—একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দময় মদির আবেশ তাকে বিভোর করিয়া রাখিতেছিল;—কেমন একটা পুলকচঞ্চলতা

তার দেহ ভরিয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার প্রতি চরণ-ক্ষেপে, নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাতে এই আবেশ-বিভোরতা, এই মধুর চঞ্চলতা তাহার সকল সংযমচেষ্টা পরাভূত করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। কেমন একটা নূতন স্বপ্নরাজ্যে যেন সে দুইদিন ধরিয়া বিচরণ করিতেছিল।

কোনওরূপ প্রগলভতা বা উদ্দাম চঞ্চলতা সাধনার স্বভাবে কখনও দেখা যায় নাই। নিজের এই ভাবের পরিবর্ত্তনে, তার রস-কল্পনার নূতন এই উচ্ছ্বাস-চঞ্চল জাগরণে, এই আত্মহারাণ বিভোরতায়—নিজের অন্তরেই সাধনা নিজে বড় লজ্জিত, বড় কুণ্ঠিত হইতেছিল। সংযমের প্রাণপণ প্রয়াস সে পাইয়াছে। 'কিছু না' বলিয়া কত সে সব তার মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। 'ছি'—বলিয়া কতবার সে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে। কিন্তু এই প্রবল ভাবের বন্যার উত্তাল তরঙ্গে সব ভাগীরথীর নবোচ্ছ্বসিত প্রবাহের মুখে ঐরাবতের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! ছিঃ! কি এ তার হইল? পোড়ারমুখী ইন্দু আসিয়া কি এ কুহকমন্ত্র তার কাণে দিল? তার নারীর সম্ভ্রম, নারীর সঙ্কোচ, চিত্তে যে তার সকল আশ্রয়চ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছি—ছি—ছি! কেন তার এমন হইল? কিন্তু—তবু—আহা, কিএ আনন্দ! কিএ মধুর—মধুর—বড় মধুর বিভোরতা! আজ তার জন্মজন্মের হৃদয়ের দেবতা তার হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত। দূর হ'ক্ সব লজ্জা! দূর হ'ক্ সব কুণ্ঠা! আজ কেন সে তার দেবতাকে দ্বার খুলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া নিবে না? আজ কেন সেই দেবতাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া প্রাণের সকল জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা সে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিবে না? প্রাণ যে পূজার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে, সে পূজা প্রাণদেবতার চরণে কেন সে আজ অর্পণ করিবে না? কিসের সম্ভ্রম? কিসের সঙ্কোচ? কিসের কুণ্ঠা? এই পূজায় যে তার নারীজন্ম আজ সফল হইবে। জন্ম জন্ম যার পূজা করিয়া এই জন্মে যাকে হারাইয়াছিল, আজ যে সে আবার তাকে পাইতেছে! হারাণদেবতা পাইয়া সে আজ পূজায় বিমুখ হইবে? কেন? কিসে? কার ভয়ে?

আজ সাধনা তার সেই জন্ম জন্মের হৃদয়দেবতার বিস্মৃত মূর্ত্তি আবার দেখিবে, গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার বক্ষ বড় ঘন স্পন্দিত হইয়া উঠিল, চরণ থর থর কাঁপিল, শীতেও স্বেদাপ্লুতদেহ কেমন অসহনীয় পুলকশিহরণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পুষ্পপেলব কপোল দুটি যেন মধুময় উষার রক্তকিরণে রঞ্জিত

হইয়া উঠিল। অনিল নিষ্পলক দৃষ্টিতে মধুর সেই লজ্জারাগ রঞ্জিত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। সাধনা তার আনত দৃষ্টি 'তুলি' 'তুলি' করিয়াও তুলিতে পারিতেছিল না।—সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া চিত্তের লজ্জাকুলতা একটিবার দমন করিয়া সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল! নির্ণিমেষ সেই দেবতার নয়নে নয়ন মিলিল, মুহূর্ত্তে সেই নয়নের পথে উভয়েই প্রাণে প্রাণে যেন জন্মজন্মান্তরেরই একটা মধুময় নিবিড় সম্বন্ধের সাড়া পাইল! মুহূর্ত্তের সেই একটি দৃষ্টিতে হৃদয়দেবতার মূর্ত্তি যেন চিরজীবনের অতি পরিচিত নিত্য-আরাধ্য নিয়তধ্যেয় দেবমূর্ত্তির ন্যায় সাধনার হৃদয়ফলকে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইল।

নীরদ অনেক প্রশ্ন করিল, পড়িতে বলিল,—সাধনা কিছুরই উত্তর করিতে পারিলনা। পিতা অনেক বলিলেন, সাধনার স্তব্ধরসনা একটিবারও নড়িল না। একটি সঙ্গীতের জন্য সকলে কত অনুরোধ করিল,—সাধনা হারমনিয়মের কাছে বসিল, যন্ত্রে দুই একটা সুর মৃদু বাজিল, কিন্তু কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি কিছুই উঠিল না।

নীরদ হাসিয়া কহিল, "আজ থাক্,—আমরা আর একদিন আস্‌ব।" মগেন্দ্র বাবু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, "তাই এসো বাবা, তাই এসো! বড় লাজুক কিনা———তাই———"

"হাঁ, আর একদিনই আস্‌ব। দেখবেন—সেদিন কিন্তু এত লজ্জা ক'রে আমরা ছাড়ব না।"

সাধনার আরক্ত আনত মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিল। হাসি চাপিয়া মুখখানি সে ফিরাইয়া নিল। অনিল সে হাসিটুকু দেখিল। আহা, ওই অতি ছোট—অতিমৃদু হাসিটুকু—যেন উষার প্রথম কিরণ রেখা ফুটিতে ফুটিতেই মেঘে ঢাকিয়া গেল। কিন্তু তবু—আহা!—অন্তরালে কি পরিপূর্ণ একটা মাধুরীর আভাস তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইল!

নীরদ ও অনিল বিনীত সম্ভাষণে বিদায় গ্রহণ করিল। মহেন্দ্রবাব কন্যাকে মৃদুভৎর্সনা করিলেন। মাতা কমলা 'নেকী' 'ঢেঁকী 'হতভাগী' ইত্যাদি বলিয়া অনেক গালি দিলেন। সাধনা নীরবে উঠিয়া নিজের ছোট পড়িবার ঘরটিতে প্রবেশ করিল। ছলছল নয়ন হইতে তখন দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

* * * * *

দুই দিন পরে আবার নীরদ অনিলকে লইয়া আসিল। সেদিন সাধনা অনেক পরিমাণে আত্মসংযম-চেষ্টায় সফল হইয়াছিল। লজ্জার সঙ্কোচ যতই

থাক্, মোটের উপর ধীরভাবেই সে সকল প্রশ্নের উত্তর করিল, বই পড়িল, গানও করিল। অনিল সেদিন যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইয়া আসিল।

কয়দিন পরে মহেন্দ্রবাবু নীরদ ও অনিলকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দুও আহূত হইয়া আসিল। চপল ইন্দু সেদিন অনিলের সম্মুখেই উপস্থিত হইল। ইন্দুর সরল চপলতায় সঙ্গীত ও রঙ্গরসের মাত্রা সেদিন কিছু অধিক উচু সুরেই উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু একটু দূরে সরিয়াছিলেন। কমলা পাকশালে পাককার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। ইহাদের আমোদ প্রমোদে সেদিন কোনওরূপ বাধা বা কুণ্ঠার কারণ কিছু বর্ত্তমান ছিল না। এইরূপে ক্রমে তিন দিন অনিলের সঙ্গে সাধনার সাক্ষাৎ হইল। তৃতীয় দিনে সখী ইন্দুর উপস্থিতি হেতু কতকটা নিঃসঙ্কোচেই সাধনা অনিলের সঙ্গে আলাপ করিবার অবসর পাইয়াছিল।

(৬)

কয়েকদিন পরে কমলা একদিন স্বামীকে কহিলেন, "এদিকে ত বড় বাড়াবাড়িই হ'য়ে গেল, তুমিও ভাব্‌লে না, আমিও ভাবলুম না। এখন সম্বন্ধটা একেবারে পাকা করে ফেল।"

মহেন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন, "পাকার আর বাকী কি? নীরদ ত ব'লেই গেল, অনিল ওকে বিবাহ ক'র্‌বেই,—আপনারা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন।"

"তা হ'লেও ওর মা বাপ জেঠা খুড়ো পাঁচজন আছেন, সম্বন্ধ ত তাঁদের সঙ্গেই ঠিক ক'ত্তে হবে? ছেলে ত আর নিজে কর্ত্তা হ'য়ে এসে বিয়ে ক'ত্তে পারে না। অবিশ্যি অনিলের যখন এতটা আগ্রহ হ'য়েছে, তাঁরা কিছু অমত ক'র্‌বেন না। বয়েসের ছেলে—যুগ্যি হয়ে উঠেছে, তাই বুঝেই না অনিল কথা দিয়েছে। তা—তা হ'লেও—যেমন নিয়ম আছে, বাপ খুড়ো জেঠা এদের সঙ্গেই ত কথাবার্ত্তা ব'লে বিয়ের সম্বন্ধ ক'ত্তে হয়।"

"হাঁ, তা ত বটেই। আজই একটা চিঠি লিখে দিই।"

"কি লিখ্‌বে?"

"লিখব, অনিল মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রেছে, এখন তাঁরা অনুমোদন ক'ল্লেই সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া যেতে পারে।"

কমলা কহিলেন, "না—না! সর্ব্বনাশ! অমন কথা লিখো না। তাঁদের না জানিয়ে অনিল আগেই এসে মেয়ে দেখেছে, পছন্দ ক'রেছে,—এতে হয়ত তাঁরা কত কি মনে করবেন, বিরক্ত হবেন।"

"তবে—কি লিখব?"

"এমনিই সম্বন্ধের প্রস্তাব করে পাঠাও। আর লিখে দেও, তাঁরা কেউ এসে মেয়ে দেখে যান। যদি পছন্দ হয়, ক'রবেন।"

"তাতে কি সুবিধে হবে? তাঁরা পদস্থ লোক, অবস্থা ভাল,—আমি গরীব শিক্ষক। হয় ত এই রকম সম্বন্ধের প্রস্তাব করাই তাঁরা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ব'লে মনে করবেন। আমলই দেবেন না। আমল দিলেও হয়ত জান্‌তে চাইবেন, আমি কি দেব? আমি ত দিতে থুতে এমন কিছু পারব না।"

"ওগো, ও সব তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না। তুমি যেমন নিয়ম আছে, সম্বন্ধের প্রস্তাব ক'রে পাঠাও,—তারপর নীরদকে বল। সে অনিলকে দিয়ে আর যা দরকার তা ঠিক করিয়ে নেবে এখন। অনিল সাধনাকে বিয়ে ক'ত্তে চায়, ওকে কোথাও দেখে খুব পছন্দ ক'রেছে, টাকা কড়ি তেমন কিছু তুমি দিতে পারবে না, এ সব সেই তার মা বাপকে বুঝিয়ে নেবে এখন। তুমি আগু হ'তে ও সব কথা ব'ল্‌তে গেলে, সেটা ভাল দেখাবে না।"

"হুঁ—তা বটে। তবে চিঠি একটা আজই লিখে দিই,—আর নীরদকে গিয়েও ব'লে আসি।"

কমলা একটু কি ভাবিয়া কহিলেন, "মনটা কিন্তু কেমন কেমন ক'চ্ছে। সব যেন কেমন তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল,—একটু ভাববারও অবসর পেলুম না।"

"কেন, কি হ'য়েছে? ভাববার কি এমন আছে?"

কমলা সেইরূপ চিন্তিতভাবেই উত্তর করিলেন, "অনিলকে ত ছেলে ভাল ব'লেই মনে হয়। তবু বিয়ের সম্বন্ধটা একেবারে পাকা হবার আগে, ওদের এতটা মিশ্‌তে না দিলেই যেন ভাল হ'ত। বড় সড় হ'য়েছে—যদি——"

"না—না—না! পাগল দেখ! অনিল বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবক, সে কি কিছু না বুঝেই এতটা এগিয়েছে? কথা দিয়ে এতটা এগিয়ে কি আর ফিরতে পারে? সে কি শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলের মত কাজ হবে?"

"না হলেই এখন বাঁচি। যা হ'বার তা ত হ'য়েই গেছে। যা হ'ক, তুমি আর দেরী ক'রো না। আজই চিঠি লিখে দেও। সম্বন্ধটা তাড়াতাড়ি পাকা ক'রে ফেল। দুই হাত এখন এক হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

মহেন্দ্রবাবু সেই সেই দিনই পত্র লিখিয়া দিলেন। নীরদকেও গিয়া বলিয়া আসিলেন। আট দশ দিন পরে অনিলের পিতার নিকট হইতে পত্রোত্তর আসিল। পত্র এইরূপ—

"সবিনয় নিবেদন এই,—

আপনার পত্র পাইয়াছি। এবং ইহাও জানিতে পারিলাম যে আপনি আমার অজ্ঞাতে আমার পুত্র শ্রীমান্ অনিলকে আপনার গৃহে ডাকিয়া নিয়া আপনার কন্যাকে দেখাইয়া এবং তাহার দ্বারা সঙ্গীতাদি করাইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আপনি যতই উদারনৈতিক ও উন্নতিশীল হউন,—আমরা হিন্দু সমাজভুক্ত হিন্দু গৃহস্থ, এরূপ আচরণ যারপরনাই অসঙ্গত ও গর্হিত বলিয়াই মনে করি। আপনার কন্যা সুন্দরী ও সঙ্গীতনিপুণা হইতে পারেন, কিন্তু আপন দুহিতার রূপের ও সঙ্গীতের মোহে তরলমতি ও তরুণবয়স্ক যুবকদিগকে এইরূপে প্রলোভিত করিয়া নিবার চেষ্টা যিনি এদেশে এই সমাজে করিতে পারেন, তাঁহার যে কিছুমাত্র আত্মমর্যাদার ও কুলমর্য্যাদার বোধ আছে, এরূপ আমরা মনেও করিতে পারি না। এইরূপ লোকের এইরূপ কন্যাকে বধূরূপে গৃহে আনিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আপনি আপনার কন্যার জন্য কোনও পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারেন।

শ্রীমান্ অনিলের বিবাহ সম্বন্ধ আমি অন্যত্র করিয়াছি। শীঘ্রই বিবাহ হইবে। শ্রীমান্‌কেও এজন্য গৃহে আনা হইয়াছে। আশা করি, আপনি কোনওরূপ গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের মনস্তাপের কারণ হইবেন না। যদি এইরূপ কিছু ঘটে, তবে অনিল আমাদের ত্যজ্য হইবে, জীবনে তার উন্নতির সকল আশা, সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে। তাকে এবং তার সঙ্গে আপনার কন্যাকেও অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে।

নিবেদক—

শ্রীভবেশ চন্দ্র মজুমদার।

(৭)

নীরদ গিয়া যেদিন সন্ধ্যার পর অনিলকে জানাইল, মহেন্দ্র বাবু তার পিতার নিকট বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, তার পরদিনই অনিল পিতার এক পত্র পাইল। পিতা লিখিয়াছিলেন, অমুক স্থানের অমুকের কন্যা শ্রীমতী অমুকীর সহিত তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। অমুক তারিখে বিবাহ হইবে। অতএব অনিল যথাসময়ে গৃহে আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। তিনি তিনমাসের ছুটি নিয়া গৃহে গমন করিলেন। বিবাহের পর কিছুদিন পশ্চিমাঞ্চলে সকলে ভ্রমণ করিবেন। অনিল পত্র পড়িয়া একেবারে স্তম্ভিত হইল। পিতা যে তাহার অজ্ঞাতে বিবাহ সম্বন্ধ একেবারে স্থির করিয়া

ফেলিবেন, একথা কখনও তার মনে হয় নাই। মাতা যতই কোমলা হউন, পিতা ও পিতৃব্যগণের স্বভাবের কঠোরতা যে কতদূর অধিক ছিল, তাহা অনিল বিশেষরূপেই জানিত। সহৃদয় হইলেও অনিল যারপরনাই কোমলচিত্ত ও ভাবপ্রবণ। এরূপ স্বভাব যাদের, তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যের পথে সংকল্পের দৃঢ়তা অপেক্ষা কঠোর পীড়নের সম্মুখে অশক্ত নমনীয়তাই অধিক দেখা যায়। এতদিন কেবল একটা উদ্দাম ভাবের আবেগেই অনিল চলিয়াছিল, কিছু চিন্তা করে নাই,—ফলাফল কি হইতে পারে, ভাবের মোহে একথা তার মনেও কখনও উঠে নাই। সমস্ত জীবনে তার এই কয় দিন যেন সুধু চাঁদের আলোর আর ফুলের হাওয়ায় গড়া মধুময় স্বপ্নরাজ্যের মদির কেমন একটা স্বপ্নমাধুরীতে বিভোর ছিল, আজ সহসা জাগিয়া যেন সে কঠোর শুষ্ক পাষাণময় এই পৃথিবীর আঁধার গাত্রে আহত হইল। হায়, এ কি হইল? এমন একটা সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা ত সে কখনও মনে করে নাই! এখন উপায়? অনিল বড় ভীত হইল। পিতা, পিতৃব্যগণ, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে যে অতি কঠোর সংগ্রাম তাকে করিতে হইবে, তাহা মনে করিতেও সে শিহরিল, তার অন্তর শুকাইল। আহা, সাধনা! অমন সাধনা! সোণার প্রতিমা! পার্থিব মূর্ত্তিধারিণী দিব্যধামের দেববালা! তাকে সে কি করিয়া ত্যাগ করিবে? সে নিজে অগ্রসর হইয়া সরলা বালিকাকে তার প্রেমে আকৃষ্ট করিয়াছে। মানুষ হইয়া, কি প্রকারে এখন তার সর্ব্বনাশ করিবে? ওদিকে গৃহে পিতার সক্রোধ নিগ্রহ, পিতৃব্যগণের মৃদু ভৎর্সনা ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, মাতার রোদন, পিতৃব্যপত্নীগণের অনুনয়—এ সব অতিক্রম সে করিতে পারিবে কি? না—না, ভাবিবার কিছু নাই, ভয় পাইলে চলিবে না। তাহাদিগকে বুঝাইয়া, সকল ঘটনা জানাইয়া, মিনতি করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া সাধনার সঙ্গে যাহাতে তার বিবাহে তাঁহারা সম্মত হন, তাহা তাহাকে করিতেই হইবে। নীরদকে সংক্ষেপে অবস্থা জানাইয়া অনিল সেই দিনই গৃহে গমন করিল।

অনিল গৃহে পৌঁছিয়া শুনিল, মহেন্দ্র বাবুর পত্র আসিয়াছে। অনিলদের বহু জনে পূর্ণ বড় সংসার—জমিদারী তালুকদারী না থাকিলেও অবস্থা সচ্ছল, প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই শিক্ষিত, কৃতি ও পদস্থ। কুটুম্বস্বজনও অনেক আছেন। ওদিককার অঞ্চল ভরিয়া এই সংসারের একটা নাম ডাক আছে।

এ হেন সংসারের এমন উচ্চশিক্ষিত সমুজ্জল-উন্নতি-সম্ভাবিত পাত্রের সঙ্গে কলিকাতার কে অজ্ঞাতকুলনাম দরিদ্র স্কুলমাষ্টার তার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধের

প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে, ইহাতে সকলেই একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। চাঁদ ধরিতে উদ্বাহু বামনবৎ এই স্কুলমাষ্টারটা কে হে? তার স্পর্দ্ধা কি? স্কুল-মাষ্টার কি না? তাই বুদ্ধি বিবেচনাটাও একটু স্থূল। এরা ঐ রকমই হইয়া থাকে। পত্রখানি উপস্থিত সকলেই এক একবার পড়িলেন, হাসিলেন, এইরূপ কত কি বিদ্রূপ করিলেন,—তারপর ফেলিয়া রাখিলেন। পত্র গৃহতলে পড়িল। ছেলেপিলেরা তুলিয়া নিয়া উড়াইল, খেলা করিল, ছিঁড়িয়া ফেলিল। দাসী শেষে ঝাঁট দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। ইহার যে কোনও রূপ একটা উত্তর দেওয়া উচিত হইতে পারে, এমন একটা কথাও কাহারও মনে হইল না।

গৃহে আসিয়া গৃহের নারীগণকে সকল কথা বিবৃত করিয়া অনিল জানাইল, মহেন্দ্রবাবুর কন্যা সাধনার সঙ্গে তার বিবাহ না হইলে সে আত্মঘাতী বা বিবাগী হইবে। সুতরাং তার অজ্ঞাতে স্থিরীকৃত এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া সাধনার সঙ্গেই তাঁহারা তার বিবাহ দিন। ভ্রাতৃবধূদের কাছে সাধনার রূপের ও সঙ্গীতের অনেক প্রশংসাও সে করিল।

গৃহে অবিলম্বে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই কাহিনী বহুভাবে অলঙ্কৃত হইয়া নারীদের মুখ হইতে পুরুষদের কর্ণে প্রবেশ করিল,—ক্রমে পাড়াময় গ্রামময় বিস্তৃত হইল। প্রবীণ ও প্রবীণা প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী বহু নারীপুরুষ দলে দলে উপস্থিত হইয়া এই তুমুল আন্দোলন ক্রমে বহুগুণে তুমুলতর করিয়া তুলিলেন। কলিকাতার এই স্কুলমাষ্টার নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানী—নহিলে অত বড় মেয়ে ঘরে রাখিয়া তাকে স্কুলে ইংরেজি পড়াইয়াছে? মেয়েও তেমনই! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গান গাহিয়া কলেজের ছেলেদের মন ভুলাইতেছে! ছি, ছি, ছি! এরা কি ভদ্রলোক! এ যে একেবারে———! স্কুলমাষ্টারটা তবে নেহাৎ সাদাসিধা সরল লোক নয়—যেমন সেগুলা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এ লোকটা ঘোর চক্রী। দেখ দেখি ব্যাপারখানা? মেয়েকে দিয়া ছেলে ভুলাইয়া নিতেছে! বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা, মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে বসাইয়া আলাপ করায়! কত রঙ্গরস হয়, গান বাজনা হয়। ছি—ছি—ছি! আহা বয়সের ছেলে-ওকি অত বোঝে? সর্ব্বনেশে সর্ব্বনাশীরা যে ফাঁদ পাতিয়াছে,—তাহাতে মুনি ঋষিরাও বাঁধা পড়ে! প্রথম বয়স, হালকা মন, আরও যে নরম স্বভাব ওর,—ওকি এমন করিয়া পাতা ফাঁদে না পড়িয়া পারে? না—না! বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত অনিলকে আর ও পাপপ্রভাবের মধ্যে যাইতে দেওয়াই হইবে না।

সাধনা ও সাধনার পিতার বিরুদ্ধে এই সব কুৎসিৎ দোষারোপে অনিল বড় ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু এত লোকের এরূপ উচ্চকণ্ঠে তীব্র গালি, বিদ্রূপ ও বিতর্কের সম্মুখে একা তার ক্ষীণকণ্ঠের দুর্ব্বল প্রতিবাদ একেবারেই অভিভূত হইয়া যাইত। ভীষণঝটিকায় উত্তালতরঙ্গায়িত ভীমসিন্ধু মধ্যে মগ্নপোত-বিক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সে একেবারে অসহায় অবস্থায় যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিল। উদ্ধারের কোনও উপায় সে দেখিল না; একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এ দিকে সকলে পরামর্শ করিলেন, নিকটেই যে তারিখ আছে, সেই তারিখেই বিবাহ দিতে হইবে। সে কয়দিন কড়া পাহাড়ায় অনিলকে রাখিতে হইবে, যে পলাইয়া না যায়। কোনও চিঠি পত্র আসিলে না পড়িয়া তার হাতে দেওয়া হইবে না। আত্মঘাতী হইবে? বিবাগী হইবে? অনেক ছেলেই অমন সব কথা বলিয়া থাকে। বিবাহ হইয়া গেলে আর ও সব বলিবে না। কন্যা অতি সুন্দরী ও বয়স্থা, দস্তর মত লেখাপড়াও শিখিয়াছে। কন্যার পিতাও শিক্ষিত ও পদস্থ ভদ্রলোক। আধুনিক রুচি অনুযায়ী আরামবিরাম ও আনন্দ এই গৃহেও যথেষ্ট সে পাইবে। দুদিনেই কলিকাতার সেই চোখের নেশা, কাণের মোহ টুটিয়া যাইবে।

এই সব বন্দোবস্ত করিয়া অনিলের পিতা মহেন্দ্র বাবুর নিকট সকলের পরামর্শ অনুসারে সেই পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে অবিলম্বে গৃহে বিপুল আড়ম্বরে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্কুলমাষ্টারের কীর্ত্তি-কাহিনী লইয়া সবিদ্রূপ তীব্র আন্দোলনও চলিতে লাগিল। অনিল একেবারে নিরুপায় হইয়া গা ছাড়িয়া দিল। ইহার বিরুদ্ধে জয়লাভ দূরের কথা, কোনরূপ সংগ্রাম চালাইতে পারে, এরূপ শক্তিও অনিলের তরল কোমল চিত্তে ছিল না।

(৮)

অনিলের পিতার পত্র পাইয়া মহেন্দ্র বাবু যে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এ কথা না বলিলেও চলে। তাঁহার এমন যত্নে পালিতা ও শিক্ষিতা বুকের ধন সাধনাকে সুপাত্রে বিবাহ দিবেন, এই আশাভঙ্গ অপেক্ষাও অনিলের পিতা তাঁহার ও তাঁহার কন্যার মর্য্যাদায় যে এত বড় নির্ম্মম আঘাত করিয়াছেন, এই বেদনা তাঁর সরল প্রাণে অনেক বেশী বাজিল। তিনি দরিদ্র, তবু নিজের মানে নিজে গৌরবান্বিত ছিলেন। আজ অকারণে এত বড় একটা অবমাননা তাঁহাকে সহিতে হইল। তিনি ত যাচিয়া বড় ঘরের ভাল ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে যান নাই? ইহারা নিজেরাই ত আসিয়াছিল। অযাচিত ভাবে

আসিয়া কেন তাঁহাকে আর তাঁর সাধনাকে এত বড় অপমান তারা করিল? নিজের শত অপমান তিনি সহিতে পারিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দেববালার ন্যায় তাঁর সাধনা—তার আজ এত বড় অবমাননা হইল! আর সে অবমাননাও তাঁকে আজ নীরবে সহিতে হইবে! ক্রোধে এক একবার তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, শিরা স্ফুরিত, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আবার তখনই নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ধিক্! কেন তিনি ছেলে ছোকরাদের কথামত সাধনাকে তাহাদের সম্মুখে এভাবে উপস্থিত করিয়া এত বড় অমর্য্যাদা,—নারীর বা কুমারীর যার বড় অমর্য্যাদা হইতে পারে না—তেমনই অমর্য্যাদার ভাগিনী করিলেন? ক্ষোভে ক্রোধে ও পরিতাপে, এবং প্রতিবিধানের অক্ষমতার স্মরণে মহেন্দ্র বাবু অসহনীয় যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথম আঘাতের বেদনা কথঞ্চিৎ শমিত হইল, চিত্ত যথাসম্ভব স্থির করিয়া তিনি এই পত্রের একটা নকল নীরদের কাছে ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজের কোনও রূপ মন্তব্য তাহাতে লিখিলেন না।

কমলা অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বলি নীরদের কাছে একবার যাও না; গিয়ে বল না?"

মহেন্দ্র বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর কেন কমলা? একবার যা প্রতারিত আর অবমানিত হ'য়েছি, তাই যথেষ্ট। আর কেন?"

"কেন তারা আমাদের এই সর্ব্বনাশ—এমন অপমান ক'ল্লে? এর প্রতিকার কিছু এখন ক'র্‌বে না?"

"কেন ক'ল্লে! তাদের খেয়াল! আর কেন? তারা পদস্থ ধনীর সন্তান, বয়সে যুবা, কোনও দুঃখ কখনও পায়নি, কিছুতে কোন সংগ্রাম কখনও ক'র্ত্তে হয়নি, যখন যাতে খেয়াল হ'য়েছে অবাধে তা পেয়েছে। এই একটা খেয়াল হ'য়েছিল—একটা খেলা ক'রে গেল। আর ওদের দোষ কি? ওরা এই রকমই। আমি মুর্খ তাই পুতুলের মত তাদের হাতে ধরা দিলুম—খেলা ক'রে ভেঙ্গে এখন দুর্গন্ধ পাঁকে আমায় ফেলে তারা চলে গেল।"

বলিতে বলিতে দরদরধারে মহেন্দ্রবাবুর দুটি নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কমলা অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "তাই ব'লে কি চুপ করে থাক্‌বে? যা হবার তা ত হয়েছে, অভাগী মেয়েটার এখন কি হবে ভাবছ না? বয়েসের মেয়ে, বিয়ে হবে বলে দেখা শুনো আলাপ পরিচয় করেছে। মনে তার কি হয়েছে, কে জানে? এখন যদি বিয়ে না হয়——"

"কি করে আর হবে? যদি তার মনে কোনও দাগ পড়ে থাকেও—উপায় আর কি? বিধাতার যা ইচ্ছা ছিল, হ'ল,—কি করব? পিতামাতার রোগ যেমন সন্তান পায়, তাদের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলও তাকে তেমনি ভুগ্‌তে হয়। সাধনাও তাই ভুগ্‌বে। আর আমরাও জীবন ভরে এর জন্য পরিতাপ ক'রব।"

"বিয়ে না দিয়ে কি তাকে রাখ্‌তে পারবে? সে যে জাত যাওয়ার ব্যাপার হবে।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "জাত ত আমাদের যাবে? যাক্‌! আমাদের আহাম্মকীর ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। তবে জাত যাবে না, সে প্রায়শ্চিত্তের সৌভাগ্যও আমাদের হবে না। যে দিন কাল প'ড়েছে, অনেক মেয়ের বিয়ে এম্‌নিই হবে না।"

"এম্‌নি ত এতদিনও হয়নি, আরও দুবছর নাহয় না হত। কিন্তু এ কি হ'ল? ওগো, সাধনার কথা যে আমি আমি ভাবতেও পাচ্চিনি। দোহাই তোমার—একবার যাও নীরদের কাছে। নিজের অভিমান কি তোমার এত বড় হ'ল? মেয়েটার কথা একবার ভাববে না?"

"না—না—কমলা আর তা পারব না। অভিমান? আমার কিসের অভিমান কমলা? তবে সাধনার মান ত তার বাপ হ'য়ে আমি একেবারে পায়ে দলে যেতে পারি না! তার এই অবমাননা মাথায় নিয়ে আবার আমি নীরদের কাছে গিয়ে মিনতি ক'রব? না—না—আমাকে দিয়ে তা আর হবে না। সাধনারও যদি কোনও মর্য্যাদা বোধ থাকে, সেও তা চাইবে না। নীরদের কাছে যাব? কেন? আজ যদি অনিল আপনি সেধে এসে সাধনাকে বিবাহ ক'ত্তে চায়, তবু—বোধহয়—আর তার হাতে আমি সাধনাকে দিতে পারি না।"

কমলা আর কিছু বলিলেন না। নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সাধনাও অন্তরালে থাকিয়া পিতা মাতার কথা শুনিতেছিল। অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও সে মনে মনে পিতার কথারই সমর্থন করিল। ছি, ইহার পরেও আবার তিনি এই বিবাহের জন্য অপরের তোষামোদ করিতে যাইবেন! পিতা মাতা যদি অনুমোদন করেন, আজীবন কৌমার্য্যে ও ব্রহ্মচর্য্যে সে জীবন অতিবাহিত করিয়া কৃতার্থ হইবে, তবু———। কিন্তু পিতা মাতা উভয়েই তার এই দুর্ভাগ্যে বড় ব্যথিত হইয়াছেন, যে কারণে যে ভাবে যার দোষেই আজ এই দুর্ভাগ্য তার আসিয়া থাক, দুর্ভাগ্য যত কঠিনই হউক্‌,—ধীর চিত্তে সে সব সহিবে, তার অন্তরের বেদনা কথনও সে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তাঁদের ব্যথিত প্রাণে

আর ব্যথা সে দিবে না। সে যদি এই বেদনা অন্তরে দমন করিয়া, এই দুর্ভাগ্যকে একেবারে অবহেলা করিয়া ধীর শান্তভাবে জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারে, পিতা মাতাও অবশ্য চিত্তে সান্ত্বনা পাইবেন, ক্রমে এই দারুণ বেদনায়ও শান্তিলাভ করিবেন।

তার নারীর প্রাণের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া সাধনা বুক বাঁধিবার চেষ্টা করিল, নীরবে কিছুকাল করজোড়ে দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিল, তারপর নয়ন মার্জ্জনা করিয়া আলুলায়িত কুন্তল বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই আবার যেন তার বুক ভাঙ্গিয়া আসিল,—ভাঙ্গা বুক ভরিয়া বড় একটা তীব্র বেদনার রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সাধনা আবার বসিয়া পড়িল। কষ্টে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সে আবার যুক্তকরে দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিয়া আপন মনে কহিল, "ওগো দেবতা! মানুষের সকল সুখ দুঃখের বিধাতা! তুমি নাকি মঙ্গলময়, তুমিই না কি সকল শক্তির— সকল শান্তির মূলাধার! যদি দুঃখ দিয়েছ, সইবার শক্তি দেও,—সুখ না হ'ক শান্তি দেও। এই দুঃখেই তাতে আমার মঙ্গল হবে। দয়া কর দেবতা! একটা অভাগী মেয়ে আজ তোমার পায়ের কোণে পড়ে তোমায় ডাকছে, দয়া কর! তোমার ইচ্ছে হ'য়েছে, দুঃখ দিয়েছ, দেও ঠাকুর! তবু দয়া কর। শক্তি দেও, শক্তিতে শান্তি দেও,—এই দুঃখই আমি পরম মঙ্গল ব'লে মাথায় বরণ ক'রে নেব। ঠাকুর! বড় অভাগী আমি, যদি সইতে শক্তি দেও, দুঃখে আমি কোনও দুঃখ মনে ক'র্‌বনা। কিন্তু দেখো,—আর কাউকে আমার দুঃখে দুঃখী ক'রোনা। আমার দিকে চেয়ে যেন আমার মাকে কাঁদ্‌তে হয় না—বাবাকে নিশ্বাস ফেল্‌তে হয় না। এমন কিছু পথ আমাকে দেখিয়ে দেও, যাতে আমার আজকার এই দুর্ভাগ্যই একদিন তাঁদের গৌরবের হেতু হয়!"

(৯)

তিন চার দিন পরে মহেন্দ্র বাবু নীরদের এই পত্র পাইলেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু——

সহস্র প্রণতি পূর্ব্বক বিনীত নিবেদন এই যে আপনি যে পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু বলিব, সে মুখ আর আমাদের নাই। আমাদের হইতে যে কত বড় একটা অনিষ্ট ও অবমাননা আপনার হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এবং পারিয়া

লজ্জায় মরিয়া আছি। আপনার নিকট ক্ষমা চাহিবারও অধিকার আমাদের নাই। চিরজীবনই আপনার নিকটে এইরূপ অপরাধী হইয়া আমরা থাকিব।

যারপরনাই ভয়ে ও লজ্জায় আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিতেছি। যদি গ্রহণীয় মনে করেন, তবে কৃতার্থ হইব। আমার বন্ধুবর্গ সকলেই এই ঘটনার জন্য যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত। ইহার প্রতিকার যদি কিছু হইতে পারে, তার জন্য চেষ্টা যথাসম্ভব সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু কোনও চেষ্টা সফল হয় নাই। যাহা হউক, আমার একজন বন্ধু আছেন নাম শরৎচন্দ্র রায়। ইনিও সুশিক্ষিত এবং যার পর নাই সহৃদয়, অবস্থাও ভাল। এক বিধবা মাতা ভিন্ন ইঁহার উপরে অভিভাবক আর কেহ নাই। ইনি মাতার অনুমোদন পাইয়াছেন,—যদি আপনার ও আপনার কন্যার অনুমোদন হয়, তবে শরৎ তাঁহাকে অবিলম্বেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনার কন্যাকে ইনি দেখিতে চান না। আর কোনও কথাবার্ত্তারও কিছু প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটেই যে তারিখ আছে, সেই তারিখেই বিবাহ হইতে পারে। আপনাদের সেরূপ ইচ্ছা হইলে যত দিন প্রয়োজন অপেক্ষাও তিনি করিবেন। ইতি।

সেবক নীরদ।

দুই দিন পরে নীরদ মহেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে এই উত্তর পাইল।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার এই পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমরা সহৃদয় যুবক, তোমাদের কোনও রূপ লজ্জা বা পরিতাপের কারণ আমা হইতে হইলে, আমি বড় কুণ্ঠিত হইব। মনে কোনও ক্ষোভ রাখিও না। যদি কোনও বুঝিবার ত্রুটি হইয়া থাকে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীমতী ইন্দুকে আমার আশীর্ব্বাদ এবং সাধনার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। সাধনার নিতান্ত ইচ্ছা ইন্দু আগের মতই মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে দেখা নিঃশঙ্ক ভাবে করিতে আসে।

তোমার বন্ধু শরৎ বাবুর ন্যায় সহৃদয় ও উদারচেতা যুবক সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহাকে আমার সকৃতজ্ঞ আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণ পাত্রের হস্তে আমার সাধনাকে দান করিতে পারিলে বাস্তবিকই কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু তার মতের বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করিয়া বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না। বিবাহে তার ইচ্ছা নাই—কখনও হইবে কি না, বলিতে পারি-

না। সমাজে হয়ত এ জন্য আমাকে নিন্দনীয় এমন কি লাঞ্ছিতও হইতে হইবে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। তোমরাও ইহাতে মনে কোনও দুঃখ রাখিও না।

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা সকলে সুখে থাক এবং গুণানুরূপ উন্নতি লাভ কর। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

(১০)

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সাধনার জীবনের শেষ একটি চিত্র দেখাইয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব। পিতার সহায়তায় চারি পাঁচ বৎসরকাল সাধনা সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিল,—বিবিধ শিল্পও অভ্যাস করিল। জীবনের লক্ষ্য সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইয়াছিল। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সে নারীদের শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিল। মহেন্দ্র বাবুর নিতান্ত আগ্রহে আশ্রমের নাম হইল, 'সাধনাশ্রম'। ঐ দেখুন পাঠক, মূর্ত্তিমতী সাধনার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী সাধনা শিক্ষায়িত্রীর আসনে কি একখানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে অধীত বিষয় চিন্তা করিতেছে। চারিদিকে শিক্ষার্থিনী কন্যা ও বধূরা বসিয়া, কেহ পাঠ করিতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ বা কোনও শিল্প অভ্যাস করিতেছে।

আজ সাধনার প্রার্থনা সফল হইয়াছে, তার সে দিনকার সেই দুর্ভাগ্য জীবনে তাকে যে পথ দেখাইয়াছিল, সেই পথেই তার জীবন তার পিতৃ মাতার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কারণ হইয়াছে। আদরে যে সাধনা নাম তাঁহারা কন্যাকে দিয়াছিলেন, কন্যার জীবনে সে নাম সার্থক হইয়াছে!

সম্পূর্ণ।

তরবারি ও পিধান।

তরবারি খাপটিকে কহে মন্দ নানা
সেই ঢেকে থাকে ব'লে বাতাস লাগে না।
খাপ বলে ও কথাটি সাজে তোরি মুখে
তোমা হেন খল জনে রাখিয়াছি বুকে;
পেট ভরে বায়ু খেলে বাছারে আমার
কোথা রবে তীক্ষ্ণধার গৌরব তোমার!

শ্রীএককড়ি দে।

গণনাথ প্রশস্তি।

(মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহোদয়ের রাজসম্মান লাভ উপলক্ষে)

বাণী বরপুত্র তুমি জ্ঞানী গুণী জনগণনাথ,
এ মূর্খ ভক্তের আজি শ্রীচরণে লহ প্রণিপাত!
তোমার গৌরব-তূর্য্য নিনাদিত আজি দেশ মাঝে
চীনাংশুক জয়কেতু তব আজি সগর্ব্বে বিরাজে।
তোমার রথের রথ্যা সুসজ্জিত পুষ্প মালিকায়,
ভারত কোবিদবৃন্দ এককণ্ঠে তব জয় গায়,
উদ্ধত দম্ভীর শীর্ষ চারিদিকে আজি অবনত,
দেশ দেশান্তর হতে আনে অর্ঘ্য সুধীবর্গ যত,
তার মাঝে আনিয়াছি পর্ণপুটে আমি যূথীহার—
দরিদ্র কবির দান লহ দেব চরণে তোমার।
হে জ্ঞান সবিতা নব, খুলি নভোদিগন্ত কবাট,
রাত্রি শেষে পুন তুমি উজলিলে প্রাচীর ললাট,
ভারতের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তর জ্যোতি সমুজ্জ্বল,
মহাসিন্ধু উত্তরিয়া ছুটিয়াছে ময়ূখ বিমল,
হে জ্ঞান গৌরব রবি, আমি তব প্রভাতের পাখী
তোমার বরণ গাহি তব যশোদীপ্তি গায় মাখি।
এ গৌরবে শুধু কিগো আমরাই লভেছি গৌরব?
ত্রিদিবেও হয় আজি তব লাগি মহামহোৎসব!
অশ্বিনীকুমার গৃহে আজি স্বর্গে মিলন উল্লাস,
আশীর্ব্বাদ করে তোমা কাশীরাজ আর দিবোদাস,
ধন্বন্তরি হর্ষে সুধা দেবগণে করে বিতরণ,
বিরিঞ্চির বক্ষতলে হয় আজি আনন্দ স্পন্দন,
চরক সুশ্রুত মিলি বাগ্‌ভট হারীত সনে,
ভারতের পানে চাহে সগৌরবে প্রসন্ন নয়নে!
মাধব বিজয় ধোয়ী শিবদাস আর চক্রপাণি
তোমার শতায়ু যাচে এ গৌরবে আজি ধন্য মানি।

শম্ভু পদতলে বসি গঙ্গাধর করিছে প্রার্থন—
সম্পূর্ণ ব্রতের তার তব করে হোক উদ্‌যাপন।
অম্বষ্ঠ গৌরব রবি! ভারতের নব ধন্বন্তরি!
করোটি কঙ্কালে শুধু দেখ চেয়ে আছে দেশ ভরি,
তোমার ভৃঙ্গার হতে সঞ্জীবনী সুধা বারি ঢালো,
বিশুষ্ক দশায় পুনঃ জ্বালো তুমি জীবনের আলো,
দেহ আত্মা দুই দিক মাগে তোমা রোগনিবারণ,
দাও জ্ঞান এ দেশের দুই ব্যাধি করিতে হরণ।
তোমার অর্জ্জিত জ্ঞান হোক সারা দেশের সম্পদ
স্বদেশের বিদেশের হও তুমি পূজার সম্পদ,
আবার ফিরায়ে আনো ভারতের সে পুরা গৌরব,
চ্যবন ফিরাল যথা আপনার যৌবন বৈভব।
গরুড়ের দৃষ্টি দাও, হও জ্যোতি তার বিলোচনে,
রক্তিমা ফিরাও পুনঃ পাংশু ম্লান তাহার আননে
অভিশপ্তে দাও মুক্তি, সুপ্তে তুমি দাও জাগরণ,
ভস্মগুপ্ত বৈশ্বানরে জ্বালাইয়া তুল তপোধন।
কূপ মগ্ন দেব বাণী তব হস্তে লভুক উদ্ধার,
নির্ব্বাসিতা স্বাস্থ্য লক্ষ্মী অন্তঃপুরে ফিরুক আবার!
সন্ধ্যা বিভ্রম-নিভ বিভবেরে জান' চিরদিন
ধ্রুবের সাধনা পার্শ্বে এ গৌরব নিতান্ত মলিন।
তোমার গৌরব কিছু বাড়ে নাই এ নাম অর্জ্জনে,
উপাধি হয়েছে ধন্য যুক্ত হয়ে তব নাম সনে
পূর্ব্ব পশ্চিমের মহা মিলনের যুগ প্রবর্ত্তক!
বহু আশ করে দেশ তব পাশে হে মহাসাধক।

শ্রীকালিদাস রায়।

নেপালের স্বয়ম্ভু মন্দির।

কমলা প্রেস,—কলিকাতা

নেপালের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

(২)

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্য প্রভাবতীকে হরণ করেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক রাখাল আসিয়াছিল। রাখালেরা অনেকে নেপালেই রহিয়া গেল। দ্বাপর গেল,—কলি আসিল। রাখালদের মণ্ডলের একটি গাভী ছিল, নাম 'নে'। দুগ্ধবতী হইয়াও গাভীটি দুধ দিত না,—প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট এক সময়ে দূরে কোথায় চলিয়া যাইত। মণ্ডল একদিন গাভীর পশ্চাতে গিয়া দেখিল, একটি স্থানে গাভীটি দাঁড়াইয়া আছে, আর ঝর ঝর করিয়া দুধ পড়িতেছে। কৌতূহল বশতঃ মণ্ডল রহস্য জানিবার জন্য মাটি খুঁড়িয়া দেখিতে গেল। মাটির মধ্য হইতে একটি জ্যোতি নির্গত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তখন 'নে-মুনি' আসিয়া অধিবাসীদের ডাকিয়া কহিলেন, "কলিযুগে ক্ষত্রিয় রাজার প্রয়োজন তেমন নাই। এই রাখালপুত্রই তোমাদের রাজা হউক্।" অধিবাসীরা মুনির কথায় রাখাল পুত্রকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। ইঁহার নাম ছিল ভক্তমান্ গুপ্ত।

নে-মুনির প্রথম আবির্ভাবকালে মাতৃশোকার্ত্ত এক রাখাল বনে তাঁহার কুটীরের নিকটে একটি পুষ্করিণীর তীরে মাতার পিণ্ডদান করিয়াছিল। মাতা পুষ্করিণী হইতে হাত ও মুখ বাহির করিয়া সেই পিণ্ডগ্রহণ করেন। নে-মুনি এই স্থানকে মাতাতীর্থ * নাম দিয়াছিলেন। নে-মুনির প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত রাজগণ, এই মাতাতীর্থের নিকটেই তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন।

গুপ্তবংশীয় আটজন রাজার রাজত্বের পর আহিরবংশীয় তিনজন এবং কিরাত-বংশীয় উনত্রিশ জন রাজা নেপালে রাজত্ব করেন। গোকর্ণের বনাঞ্চলে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। নেপালের পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে সপ্তম কিরাতরাজ হুমতি অর্জ্জুনের আদেশে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গমন করেন। অষ্টম রাজা জিতেদস্তীর রাজত্বকালে কপিলাবস্তু হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ নেপালে আগমন করিয়া স্বয়ম্ভূর পশ্চিমে পুচ্ছাগ্রচৈত্যে অধিষ্ঠিত। শারিপুত্র, মৌদ্-গল্যায়ণ, আনন্দ প্রভৃতি বহু উচ্চবংশীয় ব্যক্তিকে তিনি স্বীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।+ মৈত্রেয় প্রভৃতি বহু বোধিসত্ত্ব এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি বহু দেবতা

* বৈশাখের ১০ই তারিখে এখনও নেপালীরা মাতাতীর্থে গিয়া মাতৃ-পিণ্ড দিয়া থাকে। এ তারিখেই নাকি মাতাতীর্থের উৎপত্তি হয়।

\+ ইঁহারা বুদ্ধদেবের কয়জন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

তাঁহার দর্শন লাভের জন্য এখানে আসিলেন। শাক্যসিংহ তাঁহাদের নিকটে স্বয়ম্ভুর মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

গুহ্যেশ্বরী তীর্থদর্শন করিয়া তিনি 'নমোবুদ্ধ' পর্ব্বতে গমন করিলেন। এখানে কোনও চৈত্যের নিম্নে প্রোথিত কতককলি অলঙ্কার বাহির করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, বহুপূর্ব্বে তিনি মহাসত্ত্ব নামে এখানে এক রাজপুত্র ছিলেন। একটি ব্যাঘ্রকে নিজ দেহ অর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার অলঙ্কার এখানে পুতিয়া রাখেন। আবার সেই অলঙ্কার তিনি সেই স্থানেই পুতিয়া রাখিলেন। তারপর স্বর্গে গিয়া জননী মায়াদেবীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। বহুদিন এখানে থাকিয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তারপর নির্ব্বাণ নিকটে বুঝিতে পারিয়া কুশীনগরে আসি-লেন। সেখানে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এবং আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষুগণের নিকটে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন।

কিরাতবংশীয় চতুর্দ্দশরাজা স্থঙ্কোর রাজত্বকালে ভারতেশ্বর মহারাজ অশোক নেপালে আসেন। সকল তীর্থ তিনি দর্শন করেন এবং অনেক চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার কন্যা চারুমতী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি নেপালের পুণ্যমহিমায় আকৃষ্ট হইয়া এখানেই বাস করিতে ইচ্ছা করেন। অশোক দেবপাল নামক একজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া বহু ভূমি ও ধন রত্নাদি দানে তাঁহাদিগকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা দেবপাটন নগর স্থাপিত করিলেন। শেষ জীবনে চারুমতী ভিক্ষুণী হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠিত বিহারে বাস করেন।

কিরাত রাজবংশকে বিধ্বস্ত করিয়া চন্দ্রবংশীয় রাজপুতরাজগণ নেপাল অধিকার করেন। গোদাবরীতে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। সোমবংশীয় চতুর্থ রাজা পশুপ্রেক্ষদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। পশুপতি মন্দির জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই মন্দিরের সংস্কার করিয়া তিনি সুবর্ণফলকে ইহার উপরিভাগ মণ্ডিত করেন এবং একটি অতি উচ্চ নূতন সুবর্ণ মণ্ডিত চূড়াও ইহার উপরে নির্ম্মাণ করেন। কলির ১২৩৪ অব্দে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। পঞ্চম ও শেষ রাজা নিঃসন্তান ভাস্করবর্ম্মা সূর্য্যবংশীয় ভূমি-বর্ম্মাকে আপন উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত করিলে। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ শাক্যসিংহ বুদ্ধের সঙ্গে নেপালে আসিয়াছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজগণ গোদাবরী ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বরে রাজধানী স্থাপন

করেন। একাদশ রাজা হরিদত্ত বর্ম্মা ভূতলে প্রোথিত জলশয়ান নারায়ণকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় পীঠস্থান শিবপুরী পর্ব্বতের পাদদেশে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। মাটি খুঁড়িবার সময় কোদালির আঘাতে বিগ্রহের একটি নাক কাটিয়া যায়। সেই নাককাটা নারায়ণ বিগ্রহই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে নীলকণ্ঠ নাম দিলেন এবং একটি মন্দির তাঁর জন্য নির্ম্মাণ করিলেন। এই নাককাটা নারায়ণ এখনও এই মন্দিরে বিদ্যমান আছেন।

সপ্তদশ রাজা রুদ্রদেব বর্ম্মার রাজত্বকালে সুনয়শ্রী মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ কপিলাবস্তু হইতে নেপালে আসেন। ইনি নেপাল হইতে তিব্বতে গিয়া এক যোগসিদ্ধ লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান হইতে যোগবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নেপালে ফিরিয়া আসিয়া দেবপাটনে তিনি একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গও নেপালে আসেন। তাঁহার পত্নী বিহারের দক্ষিণদিকে কুলিশেশ্বরী দেবীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুনয়শ্রী মিশ্র এই নিয়ম করেন, যে তাঁহার বংশধরগণ পুত্রের জন্ম হইলেই ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিহারে আসিয়া বাস করিবেন। ইহার শিষ্যগণও এক একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটি বিহারের নাম 'পিঙ্গা।' এই বিহারে পুরাকালের একরূপ বৃহৎ ধান্যের নমুনা রক্ষিত আছে। এক একটি ধান্য নাকি এক একটি বাদামের ন্যায় বৃহদাকার!

ইহার পুত্র বৃক্ষদেববর্ম্মা গোদাবরীর নিকটে বন্দ্য গাঁও নামক স্থানে পঞ্চ-বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। *

ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা বালার্চ্চনদেব রাজা হন। এ পর্য্যন্ত নেপালে কৃষিকার্য্য হইত না। শস্য বিদেশ হইতে আনীত হইত। সকলেই বসুন্ধরাদেবীর অঙ্গ খনন করিতে ভয় পাইত। বল্লাল নামক একজন বান্ধব-বিহীন বলিষ্ঠ যুবককে বালার্চ্চন প্রথম ভূমি খননে নিযুক্ত করেন। বল্লাল যে স্থলে প্রথম ভূমিকর্ষণ করেন, সেখানে তাঁহার একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পাটন নগরে মচ্ছিন্দ্রনাথের মন্দিরের নিকটে এখনও বল্লালের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় ইঁহাকে তণ্ডুলের পিষ্টক উৎসর্গ

* পঞ্চবুদ্ধ, পঞ্চবুদ্ধের সহধর্ম্মিণী পঞ্চতারা এবং ইঁহাদের পুত্র পঞ্চবোধিসত্ত্ব। পঞ্চবুদ্ধের নাম—অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, বৈরোচন, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধ। পঞ্চতারার নাম—লোচনা, মামকী, বজ্রধাত্বীশ্বরী, পাণ্ডরা ও তারা। পঞ্চবোধিসত্ত্বের নাম—বজ্রপাণি, রত্নপাণি, সামন্তভদ্র পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি।

করা হয়। যে ভূমি তিনি প্রথমে কর্ষণ করেন, সে ভূমির নাম হইল, 'সাবায় মাতেব ভূমি'।

এই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সপ্তম অবতারে ধরায় আবির্ভূত হন। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বিচারে বৌদ্ধমার্গী-দিগকে পরাভূত করিয়া, তিনি শৈবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ অনেকে নেপালে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যও নেপালে আসিলেন। এখানেও বৌদ্ধেরা পরাভূত হইয়া প্রায় সকলেই শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কথিত আছে, ৮৪০০০ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ তখন নেপালে ছিল। শঙ্করাচার্য্য সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। বৌদ্ধেরা কেহ কেহ মণিচূড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শঙ্করাচার্য্যও মণিচূড় পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। মণিযোগিনীদেবী একে একে ছয়টি ভীষণ ঝটিকা উৎপাদন করিয়া তাঁহার পর্ব্বতারোহণে বাধা দিলেন। সপ্তম বারে ঝড়ের বেগ অতিক্রম করিয়াও শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। সেখানেও বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য শৈবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। বৌদ্ধদেবতা মহাকালের মন্দিরে পশুবলি প্রদত্ত হইল। রাজা বালার্চ্চনও শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অসংখ্য ভিক্ষু বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল। শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণগণ পশুপতি, গুহেশ্বরী প্রভৃতি তীর্থস্থানের পূজার ভার পাইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে প্রায় লুপ্ত হইল।

অতি অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ দুর্গম স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের পর ইঁহারা আবার বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তের চেষ্টা যাঁহারা করেন, পিঙ্গলা বহালের পুরোহিত-গণের নামই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণী পিঙ্গলা গৃহী বৌদ্ধমার্গীদিগকেই বিহারের পৌরহিত্যে নিযুক্ত করেন। শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক পুরোহিতগণ তাঁহাদেরই বংশধর ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের তিরো-ভাবের পর ইঁহারা পিঙ্গলাবহালে ফিরিয়া আসিলেন। বহু সমারোহে গুহেশ্বরীদেবীর পূজা করিয়া, স্বয়ম্ভুর নামে উৎসৃষ্ট একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিলেন। শাক্যসিংহের সঙ্গে আগত শিষ্যগণের বংশধর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের হস্তে স্বয়ম্ভু গুহেশ্বরী এবং শাক্যসিংহ বুদ্ধের পূজার ভার অর্পিত হইল।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিধি অনুসারে পূজাপদ্ধতি চালবে এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারাও এই পুরোহিতদের সঙ্গে একত্র বসতি আরম্ভ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকালে বালার্চ্চনদেবের জ্যেষ্ঠ বৃক্ষদেববর্ম্মার গর্ভবতী বিধবারাণী একটি পুত্র প্রসব করেন। শঙ্করাচার্য্যের নামানুসারে ইঁহার নাম হইল শঙ্করদেব। ইঁহার রাজত্বকালে একমণ ওজনের একটি লৌহত্রিশূল নির্ম্মিত হইয়া পশুপতিমন্দিরের উত্তরদ্বারে রক্ষিত এবং পশুপতির নামে উৎসৃষ্ট হয়। ত্রিশূলটি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং ইহা পশুপতির মন্দিরে বড় একটি দেখিবার বস্তু। পশুপতি মন্দিরেব নিকটে রাজেশ্বরীদেবীর মন্দির সমীপে একটি কূপ ছিল। এই কূপের মধ্যে চাহিলে লোকে নাকি পরজন্মে তাহার কি রূপ হইবে তাহা দেখিতে পাইত। বহু লোকের পক্ষেই ইহা সুখকর নহে। রাজা শঙ্করদেব তাই এই কূপটি বন্ধ করিয়া তাহার উপরে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। লিঙ্গের নাম হইল অপাংসজাতি-স্মরণ-বিরাটেশ্বর।

এতদিন পর্য্যন্ত বাণেশ্বরে সোমবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। সপ্ত-বিংশতি রাজা শিবদেববর্ম্মার রাজত্বকালে দেবপাটনে রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। ইনি শতরুদ্র পর্ব্বত হইতে নৃত্যনাথ দেবের বিগ্রহ আনিয়া পশুপতি-নাথের নিকটে স্থাপিত করেন। দেবপাটন নগরকে নয়টি টোলে বা বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক টোলে এক একটি গণেশের প্রতিষ্ঠাও ইনি করেন। শিবপুরী পর্ব্বত হইতে ভৈরবশীলা নামক গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিয়া ইনি রাজগৃহে রাখেন। তারপর দেশকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য 'অঋণীশিলা' নামক আর একটি বিখ্যাত শীলাও তিনি রাজধানীতে আনেন।

বাগ্মতী নদীর তীরে বজ্রেশ্বরী বাছলাদেবীর পীঠস্থান ছিল। এই পীঠ-স্থানের নিকটে তিনি বিভিন্ন জাতির জন্য বহু শ্মশানঘাট স্থাপন করেন। বাছলাদেবীর পীঠে নরবলির প্রথার প্রবর্ত্তনও ইনি করেন। এই দেবীই তখন নেপালে প্রধানাদেবী বলিয়া পূজিতা হইতেন।

শেষজীবনে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি মৃগস্থলীতে আসিলেন। সেখানে মৃগস্থলীর মহিমা বর্ণনা করিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া রাজা কহিলেন, "প্রভু! আপনি ত চলিয়া যাইতেছেন। আমার গতি কি হইবে? দয়া করিয়া বলুন, কিসে আমি মুক্তিলাভ করিব।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "অন্য কোনও দেবতার

পূজা করিয়া মুক্তিলাভ কাহারও হয় না। যদি মুক্তি চাও, একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধের আরাধনা কর,—ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন কর !"

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কোনও ভিক্ষুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইলেন। একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে স্বয়ম্ভু এবং শাক্য-সিংহ বুদ্ধের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছু দিবস পরেই রাজা দেখিলেন, রাজভোগে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষুব্রত পালন করা বড়ই কঠিন। তিনি গুরুকে কহিলেন, "ভিক্ষুব্রতের কঠোরতা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। এমন কোনও পথ দেখাইয়া দিন, যাহাতে পৃথিবীতে সুখে থাকিয়াও আমি মুক্তিলাভ করিতে পারি।" গুরু কহিলেন, "ভিক্ষুরাও ইচ্ছা করিলে আবার গৃহস্থ হইতে পারে। এইরূপ গৃহস্থকে বজ্রাচার্য্য বলে। তুমি বজ্রাচার্য্য গৃহস্থ হও। কিন্তু নিয়ত বুদ্ধের আরাধনা করিও, তাহা হইলেই মুক্তি পাইবে।"

গুরুর আদেশে রাজা গৃহস্থ হইয়াও বুদ্ধের আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। ইহার পর আবার যে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভিক্ষু হইয়াও আবার বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বনের প্রথাও বিশেষভাবে এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সব ভিক্ষু গৃহস্থগণ বজ্রাচার্য্য বা বন্দ্য নামে অভিহিত হইলেন।

সোমবংশীয় একত্রিংশ রাজা বিশ্বদেববর্ম্মা—বাঘমতী এবং বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গমের উত্তরে বৃহৎ একটি বিষ্ণুর প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবদুর্গা এবং তাঁহার সঙ্গিনী কুমারীগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। অপুত্রক অবস্থায় ইহাঁর মৃত্যু হইল। বংশেরও লোপ হইল। এই সময়ে কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। মণিযোগিনী বলিয়াছিলেন, কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইলে বিক্রমজিতের পুনরাবির্ভাব হইবে এবং তিনি বিক্রম সম্বতের প্রবর্ত্তন করিবেন।

বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়া বিক্রমসংবৎ এখানে প্রবর্ত্তন করিলেন। তারপর নীলতারা নামক স্থানে অৰ্দ্ধনারীশ্বর হরসিদ্ধি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন। নেপালে তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। সোমবংশীয় শেষ রাজা বিশ্বদেববর্ম্মা ঠাকুরীবংশীয় এক রাজপুত অংশুবর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া যান। তাঁহার এই জামাতা ঠাকুরী অংশুবর্ম্মাই এখন নেপালের রাজা হইলেন।

দেবপাটন ত্যাগ করিয়া মধ্যলখু নামক স্থানে অংশুবর্ম্মা নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইহাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দেবদেবীগণ মূর্ত্তি ধরিয়া মানবের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূত হইতেন। ইহার পর তাঁহারা মানবের অদৃশ্য হইলেন,—অর্থাৎ পূর্ণ কলিযুগ উপস্থিত হইল।

ইঁহার রাজত্বকালে বিধুবর্ম্মা রাজবংশী নামক এক ব্যক্তি সপ্তধারা সমন্বিত বৃহৎ একটি পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করেন। পয়ঃপ্রণালী এখনও বর্ত্তমান আছে। একটি ধারার দক্ষিণ ভাগে প্রস্তর গাত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি শ্লোকও উৎকীর্ণ আছে—"মহারাজ অংশুবর্ম্মার সহায়তায় এই পয়ঃ-প্রণালী বিধুবর্ম্মা তাঁহার পিতার পূণ্য বৃদ্ধি কামনায় নির্ম্মাণ করিলেন।"

এই বংশের চতুর্থ রাজা নন্দদেব শালিবাহন প্রবর্ত্তিত শকাব্দ নেপালে প্রচলন করেন। সংবৎও শকাব্দ—দুইটি সনই নেপালে চলিতেছে।

পঞ্চম রাজা বীরদেবের রাজত্বকালে পাটনের নিকটবর্ত্তী ললিতবনে অতি কদাকার এক ঘাসুড়িয়া বাস করিত। সে প্রত্যহ ঘাস কাটিয়া মধ্যলখুতে আসিয়া বিক্রয় করিত তারপর মণিযোগিনী দেবীর পীঠে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিত। একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের জন্য পথে তাঁহার ঘাস বহিবার বাঁকটি পুতিয়া রাখিয়া সে জলের অন্বেষণে গেল। কিছু দূর গিয়াই সে একটি দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। স্নান ও জল পান করিয়া উপরে উঠিতেই তাহার কুৎসিত রূপ ঘুচিয়া অতি সুন্দর মনোহর রূপ হইল। পরদিন আবার ঘাস বেচিয়া সে নগরে গেল। রাজা তাহার সুরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ঘাসুড়িয়ার সঙ্গে সেই দীর্ঘিকায় আসিয়া তিনিও স্নান করিলেন। তাঁহার রূপ আরও সুন্দর হইল।

তিনি ঘাসুড়িয়াকে 'ললিত' এই নামে অভিহিত করিয়া আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলেন। এই দীর্ঘিকার নাম গৌরী-কুণ্ড তীর্থ। স্বপ্নে আদেশ পাইয়া রাজা এখানে একটি নগর নির্ম্মাণ করিলেন। নগরের নাম হইল, ললিতপাটন।

ষষ্ঠ রাজা চন্দ্রকেতুদেবের সময়ে বহু শত্রু আসিয়া নেপালে নানারূপ উৎপাত করিতে লাগিল। রাজা নিরুপায় হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুদত্ত বজ্রাচার্য্য নামক একজন তপস্বী তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য কামনীপর্ব্বতে গিয়া মহাকালীদেবীকে কঠোর আরাধনায় তুষ্ট করিয়া লইয়া আসিলেন। দেবীর অঙ্গের জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত হইল,—

শক্ররা ভয়ে পলায়ন করিল। দেবীর প্রসাদে রাজা আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইল, অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম হইল, লোম্‌লী মহাকালী।

চন্দ্রকেতুদেবের পুত্র নরেন্দ্রদেব লোম্‌লী মহাকালীদেবীর পীঠস্থানের নিকটে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিহারের নাম হইল তীর্থবিহার। কারণ তাঁহার পিতৃগুরু বন্ধুদত্ত স্বয়ম্ভূ তীর্থ হইতে আসিয়াছিলেন। বন্ধুদত্তই এই বিহারের প্রধান আচার্য্য হইলেন। বন্ধুদত্ত পদ্মান্তক ভৈরব, দশ ক্রোধদেবতা এবং মহাকালকে এই বিহারের চারিদিকে স্থাপিত করিলেন।

নরেন্দ্রদেব শেষজীবনে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া এক বিহারে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পুত্র অষ্টম রাজা বরদেব মধ্যলখু ত্যাগ করিয়া ললিতপাটনে রাজধানী করিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে সিদ্ধযোগী ভগবান্ গোরক্ষনাথ নেপালে আসেন। ধ্যানযোগে তিনি নিম্নলিখিত তত্ত্ব জানিতে পারেন——

সচ্চিৎ 'বুদ্ধ' নিরঞ্জন এবং অন্যান্য বুদ্ধগণ জগৎসৃষ্টি কামনায় পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়া আপনারা পঞ্চবুদ্ধমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভের পুত্র বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি 'লোকসংসারার্জ্জন' সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। আদি বুদ্ধ তাঁহাকে লোকেশ্বর নাম দিয়া সৃষ্টি কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে দিলেন। লোকেশ্বর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। দেবগণকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সুখাবতী-ভবনে (বা স্বর্গধামে) উপবিষ্ট হইয়া তিনি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ইঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম হইল 'আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব।' আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর স্বর্গ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিলেন। মহাদেব সেখানে তাঁহার নিকটে যোগধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিলেন। স্বীয়-ভবনে ফিরিবার পথে এক সমুদ্রতীরে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকটে যখন মহাদেব এই যোগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, পার্ব্বতী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। মহাদেবের উপদেশ বৃথা না হয়, তাই আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর মৎসরূপ ধরিয়া শ্রোতা হইলেন। মৎসরূপ ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল, 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' বা 'মচ্ছিন্দ্রনাথ'।'

গোরক্ষনাথ ধ্যানযোগে ইহাও দেখিতে পাইলেন যে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রত্যহ কামনীপর্ব্বতে আগমন করেন, কিন্তু এই পর্ব্বত বড় দুর্গম। সুতরাং মৎস্যেন্দ্রনাথকে দর্শনলাভ করিতে হইলে তাঁহাকেই নামাইয়া আনিতে হইবে।

* ইঁহাদের নাম পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু তাহার উপায় কি? অনেক চিন্তা করিয়া গোরক্ষনাথ স্থির করিলেন, নাগ সাধনা করিয়া জলদ নাগগণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া যদি অনাবৃষ্টি উৎপাদন করা যায়, তবে ক্লিষ্ট প্রজাগণের কাতর প্রার্থনায় মৎস্যেন্দ্রনাথ অবশ্য আবিভূত হইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন। গোরক্ষনাথ নাগসাধনায় সিদ্ধ হইয়া নাগগণকে রুদ্ধ করিলেন। দেশে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইল। রাজা বৃদ্ধ বন্ধুদত্ত আচার্য্যের নিকট জানিতে পারিলেন, অবলোকিতেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ব্যতীত এ অনাবৃষ্টি দূর হইবে না। আচার্য্য তাঁহার আবির্ভাবের জন্য যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। বন্ধুদত্ত, বৃদ্ধ ভিক্ষু রাজা নরেন্দ্রদেব এবং কতিপয় অনুচরবাহিত বহু পূজাসম্ভার লইয়া দোলন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু উপচারে পূজা করিয়া প্রথমে 'যোগাম্বর-জ্ঞান-ডাকিনী' দেবীকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য পুরশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার সাহায্যে কর্কোটক নাগকে মুক্ত করিয়া তাঁহারা কাপতল পর্ব্বতে আসিলেন। সেখানে আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশ্যে আবার পুরশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। ডাকিনী পিশাচ দানব প্রভৃতিরা বহু উৎপাত আরম্ভ করিল, কিন্তু মন্ত্রবলে এবং পূজায় তুষ্ট দেবগণের সাহায্যে সকল উৎপাত নিবারণ করিয়া বন্ধুদত্ত পুরশ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবলোকিতেশ্বর ভ্রমরের রূপ ধরিয়া তাঁহার ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্ধুদত্ত এই ঘটের পূজা করিলেন, এবং দেবগণকে আহ্বান করিয়া মহাসমারোহে মৎস্যেন্দ্রনাথের যাত্রা উৎসব সম্পাদন করিলেন।

চারিজন ভৈরব ঘট লইয়া চলিলেন। ব্রহ্মা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আগে আগে পথ ঝাঁট দিয়া চলিলেন; বিষ্ণু শঙ্খ বাজাইয়া চলিলেন; মহাদেব ঘটের জল পথে ছিটাইতে ছিটাইতে চলিলেন; ইন্দ্র ঘটের উপরে ছত্র ধরিলেন; যম ধূপ ধুনা প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইতে লাগিলেন; বরুণ শঙ্খ হইতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; কুবের পথে ধনরত্ন ছড়াইয়া দিলেন; অগ্নি দীপালোকে পথ আলোকিত করিলেন; নৈঋত সকল বাধা অপসারিত করিয়া দিলেন; এবং ঈশান ভূত পিশাচাদি অপদেবতাদের দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে সকল দেবতা আর্য্য-অবলোকিতেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের এই যাত্রা উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু দেবগণ স্বরূপে প্রজাবর্গ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলেন না। সকলে বন্ধুদত্ত, নরেন্দ্রদেব এবং তাঁহাদের অনুচরদের মাত্র দেখিল, আর দেখিল কতকগুলি পশুপক্ষী। কলির প্রজাগণের পাপচক্ষে দেবতারা পশু পক্ষী রূপেই প্রতিভাত হইলেন।

নেপালে অজস্র বৃষ্টিপাত হইল। এক স্থানে যাত্রা থামিল। একজন ভৈরব কুক্কুরমূর্ত্তি ধরিয়া এখানে 'বু' শব্দ উচ্চারণ করিল। বন্ধুদত্ত কহিলেন, 'ইহাই মৎস্যেন্দ্র নাথের জন্মস্থল। কুক্কুররূপা ভৈরবের 'বু' শব্দ তাহাই সূচিত করিল।' এইখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের ঘট প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে এখানে একটি নগরও গড়িয়া উঠিল। অমরগণ যাত্রায় এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাই স্থানের নাম হইল অমরপুর। দুইজন পুরোহিত আর্য্য-অবলোকিতেশ্বরের পূজার জন্য নিযুক্ত হইলেন। পালাক্রমে ইঁহারা দেবতার পূজা করিতেন। এই যাত্রার স্মৃতি হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছিন্দ্রনাথের রথযাত্রার উৎসব আরম্ভ হইল। মচ্ছিন্দ্রনাথের বিগ্রহ মহাসমারোহে রথে লইয়া এই যাত্রা হয়। সূর্য্যদেবের বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থান কালে (অর্থাৎ আশ্বিন হইতে চৈত্রের মধ্যে) মচ্ছিন্দ্রনাথের বিগ্রহ অমরপুর হইতে রথে করিয়া আনিয়া তৌবিহারের মন্দিরে রাখা হয়। চৈত্রের প্রথমে বিগ্রহকে স্নান করাইয়া ৮ই চৈত্র তাঁহাকে রৌদ্রে রাখা হয়। তারপর ১২।১৩ই দশ-কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। ১লা বৈশাখ রথে তুলিয়া তাঁহাকে ললিতপাটনের চতুর্দ্দিকে ঘোরাণ হয়। আষাঢ়ের পর তাঁহাকে অমরপুরে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবে এই রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

মচ্ছিন্দ্র যাত্রার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ নরেন্দ্রদেবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার দুই কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আর আমার কিছুই সম্পদ নাই। এই মুকুট আছে, এবং এই প্রজ্ঞাপরামিতা * শাস্ত্র আছে। আজ হইতে চতুর্থদিনে তোমরা আমার কাছে আসিবে। যে আগে আসিবে সে মুকুট পাইবে, আর যে পরে আসিবে সে শাস্ত্র পাইবে।' জ্যেষ্ঠা কন্যা আগে আসিয়া মুকুট পাইলেন, কনিষ্ঠা কন্যা প্রজ্ঞাপরামিতা শাস্ত্র পাইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বন্ধুদত্তও মুক্তি লাভ করিরা মচ্ছিন্দ্র নাথের দক্ষিণ চরণে মিলিত হইল। তারপরেই নরেন্দ্রদেবের মৃত্যু হইল। তিনি মচ্ছিন্দ্রনাথের বামচরণে লীন হইলেন। লোকে এখনও মচ্ছিন্দ্রনাথের তীর্থে গিয়া বিগ্রহের চরণ দুটি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

কলিযুগের ৩৬২৩ বর্ষে মচ্ছিন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়।

এই সময়ে শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণরূপে আবার অবতীর্ণ হন। পূর্ব্ব অবতারে প্রবর্ত্তিত নিয়ম এখনও চলিতেছে কিনা দেখিবার জন্য তিনি নেপালে আসিলেন।

* প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ।

তিনি দেখিলেন সর্ব্বত্র এমন কি মচ্ছিন্দ্রনাথের মন্দিরেও সেই নিয়ম চলিতেছে। কেবল পিঙ্গলাবহাল বৌদ্ধদের প্রভাব পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। মচ্ছিন্দ্র-নাথের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা বন্ধুদত্ত প্রধানতঃ শঙ্করাচার্য্যের মত অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরূপী শঙ্কর পিঙ্গলাবলে আসিয়া বৌদ্ধ আচার্য্যদিগকে দূর করিয়া দিলেন, তারপর ভোটদেশে গমন করিলেন। ভোটদেশের লামা তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে অবমাননা করেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অসুর ও চণ্ডাল বলিয়া গালিদিলেন। লামা ছুরিকাদ্বারা নিজের উদর বিদীর্ণ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমিও তোমার উদর এইরূপ বিদীর্ণ করিয়া দেখাও, দেহের মধ্যে কে অধিক পবিত্র।" ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া চিলের রূপ ধরিয়া উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। লামা তাঁহার ছায়া একটি শূলে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে সংলগ্ন করিলেন। তারপর একখণ্ড প্রস্তরদ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া তাহার উপরে বসিয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন। লামার হস্তে এইরূপে এখানে শঙ্করাচার্য্যের পরাভব হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রতিপত্তি রহিল। এইস্থান এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে।

ঠাকুরীবংশের পঞ্চদশ রাজা গুণকামদেব কঠোর ব্রত উপবাসে মহালক্ষ্মী-দেবীর আরাধনা করেন। দেবী প্রীত হইয়া স্বপ্নে ইঁহাকে এইরূপ আদেশ করিলেন—বাঘমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে নে-মুনির পূর্ব্ব আশ্রম ছিল। কাষ্ঠেশ্বর দেবতার বিগ্রহ এখানে বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ প্রত্যহ এখানে আসিয়া লোকেশ্বরকে দর্শন করেন এবং পুরাণপাঠ শ্রবণ করেন। রাজা এইখানে দেবীর খড়্গের আকারে একটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিবেন। নগরের নাম কান্তিপুর হইবে।

রাজা অবিলম্বে শুভদিন দেখিয়া খড়্গের আকারে কান্তিপুর নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। আকার খড়্গের ন্যায় বলিয়া নগরের অপর নাম হইল 'কাটমুণ্ড'। এই নামই কালে প্রসিদ্ধ হইল। রাজা এখানেই রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেই অবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই খড়্গাকার নগর কাটামুণ্ডই প্রধানতঃ নেপালের প্রধান রাজধানী রহিয়াছে। নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা নানাদিক হইতে চণ্ডেশ্বরী, রক্তকালী বা কঙ্কেশ্বরী প্রভৃতি বহু দেবীকে আনিয়া নগরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, লুপ্ত নবদুর্গার পূজা, পঞ্চলিঙ্গ ভৈরবের যাত্রা এবং আরও অনেক পূজা ও যাত্রার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন।

তারপর নানাদেশ জয় করিয়া রাজা গুণকামদেব বহু ধনরত্ন নেপালে লইয়া আসিলেন। পশুপতির মন্দির সংস্কার করিয়া স্বর্ণমণ্ডিত তাম্রপাতে তাহা অলঙ্কৃত

করিলেন, তারপর মহাসমারোহে পশুপতির পূজা করিয়া তাঁহার একটি রথযাত্রার প্রবর্ত্তনও করিলেন। কঙ্কেশ্বরী কালীদেবীর সম্মুখে 'সিতি' উৎসব নামে একটি অদ্ভুত উৎসবও তিনি প্রবর্ত্তন করেন। জ্যৈষ্ঠমাসে কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে নগরের বালকগণ একত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে, —ইহাই এই সিতি উৎসব।*

ইঁহার পুত্র অষ্টাদশ রাজা জয়কামদেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলেন। তখন নোয়াকোট পর্ব্বত হইতে বৈশ্যঠাকুরী বংশীয়েরা আসিয়া তাঁহাদের একজনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই রাজার নাম ছিল ভাস্করদেব। কয়েকজন রাজার রাজত্বের পর অংশুবর্ম্মার জনৈক বংশধর বামদেব বৈশ্যঠাকুরী রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া নেপালের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

এই বংশের দশম রাজা অরিদেবের 'মল্ল' উপাধি হইতে পরে বংশের নাম মল্লবংশ হইল। দ্বাদশ রাজা আনন্দ মল্ল বারানসী হইতে অন্নপূর্ণাদেবীকে সাধনায় আকৃষ্ট করিয়া আনিয়া তাঁহার পীঠস্থানে একটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। নগরের নাম হইল ভক্তপুর; পরে ইহা ভাটগাঁও নামে বিখ্যাত হয়। চণ্ডেশ্বরী দেবীর আদেশে বাণপুর প্রভৃতি আরও সাতটি নগর ইনি প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়দেব মল্লের রাজত্বকালে কর্ণাট হইতে নান্যদেব নামক একরাজা নায়ের নামক দেশ হইতে বহু নেওয়ার সৈন্য লইয়া আসিয়া নেপাল অধিকার করেন। 'মাজু' এবং 'স্বেখু' দুই দেবতাকেও ইনি লইয়া আইসেন। পরাভূত মল্লরাজগণ ত্রিহুতে গিয়া আশ্রয় নিলেন। ভাঁটগাঁও নান্যদেবের রাজধানী হইল।

ষষ্ঠরাজা হরিদেবের সময় আবার কাটমুণ্ডে রাজধানী আসিল। হরিদেবের রাজত্বকালে প্রজাবর্গের ভীষণ এক বিদ্রোহ ঘটে। রাজা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। পশ্চিমদেশের পর্ব্বতঅঞ্চলে খশ ও মগর জাতির বাস ছিল। একজন মগর এই সময়ে নেপাল হইতে নিজের দেশে গিয়া নেপালের সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করিল। রাজা মুকুন্দসেন ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া এবং রাজ্যের অরাজক অবস্থার কথা জানিয়া বহু খশ ও মগর সৈন্যসহ নেপাল আক্রমণ করিলেন। অনার্য্য খশ মগর সৈন্যগণের পাপাচারে দেবতারা রুষ্ট হইলেন। মুকুন্দসেন পরাজিত হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে পলায়ন করিলেন। কিন্তু এই সময় হইতে বহু খশ ও মগর নেপালে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল।

* প্রখ্যাতনামা বাহাদুর অন্যান্য অনেক হঠোরপ্রথার সঙ্গে এই প্রথাও তুলিয়া দিয়াছেন।

৭।৮ বৎসর কাল নেপালে কোনও রাজা ছিলেন না। তারপর আবার নোয়াকোট হইতে বৈশ্যঠাকুরী বংশীয় বহু রাজা আসিয়া নেপালের নানাস্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। প্রায় ২৫০ শত বৎসর কাল ইঁহাদের বংশধরগণ নেপালে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করেন। ইঁহারা অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্ম্মশালা এই সময়ে নেপালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইঁহাদের রাজত্বের অবসান কালে অযোধ্যা হইতে ভগবান্ রামচন্দ্রের একবংশধর হরিসিংহদেব মুসলমানগণের আক্রমণে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পরিবার পরিজন সহ নেপালের সীমান্তে সামানগড়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মায়াবীজ নামক (রাক্ষস বংশীয়) একজন সিংহলী শিল্পী ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। রাজার আদেশে মায়াবীজ তুর্য্যভবানীর একটি বৃহৎ পঞ্চতল মন্দির নির্ম্মাণ করিল। তুর্য্যভবানীদেবীর আদেশে রাজা নেপালে আসিলেন। অধিবাসীদের নিকটে তিনি বলিলেন,—তুর্য্যভবানী পূর্ব্বে অমরপূরের প্রধানা দেবী ছিলেন। রাবণ ইঁহাকে লঙ্কায় লইয়া যায়। রামচন্দ্র আবার দেবীকে অযোধ্যায় আনেন। তিনি সেই অযোধ্যা হইতে দেবীকে আনিয়া সিমানগড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লঙ্কাবাসী রাক্ষসবংশধর মায়াবীজ দেবীর এক অপূর্ব্ব মন্দির সেখানে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

অধিবাসীরা এই কথা শুনিয়া সিমানগড়ে আসিয়া দেবীকে দর্শন করিল। দেবীর প্রভাবে তাহারা হরিসিংহদেবকেই আপনাদের রাজা নির্ব্বাচিত করিল। ভাটগাঁও নগরে তিনি তাঁহার রাজধানী করিলেন। সেখানেই আবার দেবীকে নিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।

এই বংশের শেষরাজা শ্যামসিংহদেব। ইঁহার রাজত্বকালে ভীষণ এক ভূমিকম্পে মচ্ছিন্দ্রনাথের মন্দির পতিত হয় এবং বহুলোকের মৃত্যু তাহাতে হয়। ইঁহার একটিমাত্র কন্যাসন্তান ছিল। এই কন্যাকে তিনি ত্রিহুতনিবাসী ভূতপূর্ব্ব মল্লরাজগণের একবংশধরের সঙ্গে বিবাহ দেন। ইঁহার নাম জয়ভদ্রমল্ল। ইনি শ্যামসিংহ দেবের মৃত্যুর পর নেপালের রাজা হন।

সপ্তম রাজা জয়স্থিতিমল্ল বিশেষ বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি নেপালের প্রজাবর্গের মধ্যে যেরূপ বিবিধ জাতির সংস্থান ও বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই স্থায়ী হয়। এই সময় হইতে রাজাদের কীর্ত্তি সম্বলিত বহু উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায়। ইহাদের রাজত্বকালে নেপাল প্রধানতঃ তিনটি রাজ্যে

বিভক্ত হইয়া পড়ে ভাটগাঁও, কান্তিপুর, ও ললিত-পাটন—তিন রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভাটগাঁও রাজ্যই ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল।

যোগী গোরক্ষ নাথের আশ্রম যেখানে ছিল, সেই অঞ্চল তাঁহার নাম হইতে 'গুর্খা' নামে পরিচিত হয়,—অধিবাসীদের নামও হয় গুর্খা।

ভাটগাঁওয়ের রাজা নন্দমল্লের রাজত্ব কালে তিন রাজ্যের মধ্যে ভীষণ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। গুর্খার রাজা ছিলেন তখন নরভূপাল সাহ। তিনি নেপালে আধিপত্য লাভের জন্য দেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আবার গুর্খায় ফিরিয়া গেলেন। নরভূপালসাহের পুত্র পৃথি নারায়ণ সাহ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ইনিই মল্লরাজগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র নেপালের অধীশ্বর হন। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সেই অবধি গুর্খা জাতিই নেপালে প্রভুত্ব করিতেছেন।

এইখানে পৌরাণিক আখ্যায়িকা সম্বলিত নেপালের প্রাচীন ইতিবৃত্ত শেষ হইল, বলা যাইতে পারে।

জয়দেব।

সুন্দর হে! তোমার কল-কণ্ঠেরি ওই সঙ্গীতে—
হৃদয়ভরা আবেশ মাখা গীতি মধুর ভঙ্গিতে—
তপন ওগো মধ্যদিনের, সাহিত্যেরি বিমানে
জয়দেব! আজও ভুবন ভরা তোমার জয়গানে।
বঙ্গশালে কল্পনারি উঠ্‌ছে গীতি-লহরী—
দেব! সেথা তোমার পূজা, দিবস সারা শর্ব্বরী।

বন্দি তোমা, ওগো প্রেমিক! ওগো সাধক-প্রবর!
মাগি, চরণ ধূলার তলে, পরশ, তব সুন্দর!
কুঞ্জ তোমার ভরা প্রেমে, হৃদয়-ভরা-মাধুরী,
কোকিল তোমায় থাকে ঘিরে, বসন্তের মঞ্জুরী।
গানের সুরে ঢাকা সেথা, তুমি যেথায় বিহর,
সৌন্দর্য্যেরি মুক্ত-হাওয়ায় মণ্ডিত সে অম্বর,
উজল সেথা, দীপ্ত তোমার গৌরবেরি আলোতে—
মানস-দেশ-মধুর-করা কল্পনারি জগতে।

শ্রীসুহৃৎকুমার বসু।

ভিখারী।

আমাদের এই জাতিভেদের বর্ণভেদের দেশে ভিক্ষুকেরও নানা জাতি—নানা বর্ণ। কেহ বা বৈরাগী—তৈলচিক্কন নধর গঠন, গলায় তুলসীর মালা, মুণ্ডিত মস্তকের উপরে রেফাকৃতি ভ্রমর কৃষ্ণ শিখা—সর্ষপ তৈলে ল্যাজারাসের ফার্ণিচারের মত চক চক করিতেছে,—নাসিকার বিশাল তিলক কপাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া কপাল ও নাসার সকল পার্থক্য বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। করতল বা গোপীযন্ত্র হাতে বাবাজী পাড়ায় পাড়ায় শ্রীরাধিকার নাম বিলাইয়া ফিরিতেছেন। কেহ বা নাগা—পথের ধারে আস্তাকুড়ের ছাই উঠাইয়া সারা অঙ্গে বিভূতি বিলেপন পূর্ব্বক 'ব্যোম শিব শঙ্কর বলিয়া' দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। দুনিয়ার মধ্যে সম্বল চিমটা ও কম্বল। কাহারও বেশ সাদা ধুতি ও চাদর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—চোখের কোলে ঘন কালি এবং মুখে কোকেনের চিহ্ন প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। ছোট এক জোড়া করতাল ও লাল চক্রাকৃতি পদার্থ বিশেষের উপরে কড়ির চোখ বসান কোনও মূর্ত্তি হাতে হাজির হইয়াই—"মা শীতলা এয়েছেন মা" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ঠুং ঠুং করিয়া করতাল বাজাইয়া কেহ গান জুড়িয়া দিলেন। কাহারও ঝোলা কম্বল কাচের মালায় পয়গম্বরের বেশ, কাহারও বা হাতে প্রদীপ—মুখের বুলি—"যাহা পীর তাহা মুস্কিল—আসান হোয়—মা পয়সা একঠো মেলে বাবা——"

এইরূপ ভিখারীর সংখ্যাও অগণ্য—জাতি ও বর্ণ বিভেদও তেমনই অসংখ্য। ত্রেত্রিশকোটি দেবতার মত ইহাদেরও সমস্ত নাম কাহারও মনে থাকে না, কেহ মনে রাখিতেও পারে না। ইহাদের অধিকাংশই পুরুষ পরম্পরায় এই ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের আশ্রয়ে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া দিব্য আরামে দিন কাটাইতেছে এবং সকল বাসনা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে।

ভিখারী বলিতে ইউরোপে কিন্তু এ শ্রেণীর জীব বুঝায় না। ভিক্ষা করা সেখানে আইনে নিষিদ্ধ। কাজেই ভিখারী বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কাহারও জীবিকার্জ্জনের উপায় নাই। যাহাকে উপায়ান্তরের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, সে দুই চারিটা দিয়াশলাই অথবা কিছু চিঠির কাগজ বা পেন্সিল কলম বা নিতান্ত পক্ষে কিছু জঙ্গলের ফুল হাতে করিয়া পথে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এবং পথিকদের মধ্যে যাহার মুখ দেখিয়া দয়ালু বলিয়া বোধ হয়, তাহার

কাছে ঐ সকল জিনিশ বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া অতি সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে আপনার দুঃখ নিবেদন করে—কেন না যাহার নিকট সে দুঃখ নিবেদন করিবে, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট দেশের অন্নহীন ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, দেশের সমস্ত লোক ট্যাক্স দিয়া তার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছে; ইহার উপর আবার ভিক্ষা কেন? যাহার অন্নের অভাব হইবে সে অনায়াসেই এই সকল অন্নসত্রে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে। ইউরোপের সমস্ত সহরে ও প্রত্যেক প্রধান গ্রামে এইরূপ অন্নসত্র খোলা আছে। কর্ম্মীর দেশে কাহাকেও বিনা আয়াসে আরামে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে দেওয়া হয় না। এই সকল Work Houseএ থাকিতে হইলে রীতিমত পরিশ্রম করিয়া নানা শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হয়, তাহার পরিবর্ত্তে অন্ন ও বস্ত্র মিলে। সরকারী Work House ব্যতীত অন্যান্য আরও অনেক দানশালা আছে। প্রায় প্রত্যেক গির্জ্জাতেই কিছু কিছু দানের ব্যবস্থা আছে। গির্জ্জার পুরোহিত আপন এলেকার মধ্যে কতগুলি নিঃসহায় লোক আছে, তাহার একটা তালিকা রাখেন এবং সপ্তাহে দুইবার হউক একবার হউক নির্দ্ধারিত সাহায্য দান করেন। এই সাহায্য প্রায়শঃই রুটির আকারে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া অনেক দানশীল ব্যক্তিও দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই প্রকারে সাহায্য যাহারা লাভ করে, তাহাদিগকে বলে 'পপার' অর্থাৎ নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তি,—Beggar বা ভিখারী নহে। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য যাহারা পায়, তাহাদের রীতিমত একটা হিসাব গবর্ণমেণ্ট রাখেন।

১৯১৫ সালের নূতন সেনাসংগ্রহের সময়েও এরূপ একটা তালিকা নূতন করিয়া তৈয়ারী হয়। ঐ তালিকায় দেখা যায় যে এক লণ্ডন সহরেই লক্ষাধিক পপার নানা ভাবে সাহায্য লাভ করিতেছে। তাহার মধ্যে ৬০২৩০ জন লোক সরকারী Work Houseএর আশ্রয়ে আছে এবং ২৬০৯৩ জন গির্জ্জা প্রভৃতি হইতে সাহায্য পাইতেছে।

"Social Service" নামক মাসিকপত্র এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে তালিকাভুক্ত লোক ব্যতীত আরও অনেক পপার লণ্ডনে আছে, যাহারা একেবারেই বেকার, ভিক্ষাও করে না, রীতিমত কোনও একটা কাজও করে না। এমন অধ্যবসায়ও নাই যে চুরী চামারিও করিতে পারে। ইহাদের তালিকা কোথায়? যাহা হউক, তালিকাভুক্ত যত লোকের খবর পাওয়া গিয়াছে, যুদ্ধের জন্য তাহাদের মধ্যেও একটা পরিবর্ত্তন বেশ দেখা যাইতেছে।

১৯১৫ সালের পপারের সংখ্যা ১৯১০ সালের সংখ্যা অপেক্ষা ১৪৯০৮ কম। অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার লোক যুদ্ধের জন্ম কাজ কর্ম্মের জোগাড় করিতে পারিয়াছে। এই সকল লোকের জায়গায় এই ১৫ হাজার নিঃসম্বল লোক কর্ম্ম পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত।

দুর্য্যোগে।

আজিকে দুর্য্যোগ রাতি
নিভেছে তারার ভাতি,
অন্ধকারে জল স্থল হ'ল একাকার!
ঝঞ্ঝার তাণ্ডব তালে
সুগম্ভীর বজ্ররোলে,
প্রকৃতির বক্ষভেদি' ওঠে হাহাকার!

মেঘ-মালা-মর্ম্মস্থলে
বিদ্যুতের দীপ্তি জ্বলে,
মুহুর্মুহু তীব্রতেজে ঝলকি' গগণ
অবিশ্রান্ত শীলাবৃষ্টি
লণ্ডভণ্ড করে সৃষ্টি,
মহাত্রাসে মানবের মলিন বদন।

হে মত্ত ভৈরব ভোলা
একি এ সংহার লীলা!
সম্বর' সম্বর' রুদ্র! মৌন শান্তি দানে—
ভয়ার্ত্ত হৃদয় মাঝে
এস তুমি সৌম্য সাজে,
করুণা বঞ্চিত আজি করো না সন্তানে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কোহিনুরের ইতিহাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিখ-অধিকারে কোহিনুর।

কোহিনুর লাভ করিয়াই, রণজিৎসিংহ একখানি সুবর্ণময় সুদৃশ্য বাহুভূষণ বা বাজু প্রস্তুত করিলেন এবং উহার মধ্যভাগে কোহিনুর ও উভয় প্রান্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অনুজ্জল অপর দুইটি হীরক সন্নিবদ্ধ করিয়া স্বীয় দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিতে লাগিলেন। অন্যূন পাঁচবর্ষ কাল সেইভাবে ব্যবহার করিয়া শেষে তিনি উহাকে বাজু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং উষ্ণীষ-বেষ্টনীর উপরিভাগে, পাগড়ীর শিরপেঁচে বিনিবেশিত করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি জন্মিল না। একবর্ষ পরে আবার তিনি কোহিনুরকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

রণজিৎসিংহ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন পর্য্যন্ত এই মহামূল্য মণি ভোগ করেন। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে, একদিনও তিনি কোহিনুর-শূন্য হইয়া রাজ-সিংহাসনে উপবেশন কি বিশিষ্ট দরবারাদিতে যোগদান করেন নাই। কোহিনুরের প্রতি তাঁহার এতদূর মমত্ব, এমন আসক্তি জন্মিয়াছিল যে, মৃত্যুর দিনেও তিনি ইহার কথা ভুলিতে পারেন নাই; অপিতু সেই অন্তিম সময়ে, দেহত্যাগের মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, ইহার দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং শেষ দেখা দেখিবার জন্য, কোহিনুর প্রমুখ তাঁহার সমস্ত মণি-রত্নাদিই সম্মুখে উপস্থিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে, তিনি প্রথমে অপরাপর রত্নগুলি একে একে দর্শন করিয়া শেষে কোহিনুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কিয়ৎকাল নির্ণিমেষ নেত্রে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বাষ্পনিরুদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এই কোহিনুর পৃথিবীর সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ, সমস্ত মূল্যবান মণিরত্নের বরণীয় ও শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইহা রাজভোগ্য নহে, দেবভোগ্য রাজশির হইতে দেবশিরেরই ইহা সম্যক উপযোগী। অতএব আমার মৃত্যুর পরে ইহা যেন শ্রীজগন্নাথদেবের ব্যবহার্থে শ্রীক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়।" কোহিনুর সম্বন্ধে শিখসিংহের শেষ মন্তব্য, অন্তিম অভিমত

শ্রবণ করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ বিশেষতঃ তাঁহার পুত্র, অমাত্য ও সর্দ্দারগণ সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ কোহিনুরের মত অমূল্য, অতুল্য রত্ন শিখজাতির হস্তস্খলিত ও উৎকলবাসীর অধিকারভুক্ত হইবে ভাবিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রথমতঃ কেহই সে কথার প্রতিবাদে সাহসী হইলেন না। পরিশেষে সকলের পরামর্শমতে জনৈক প্রবীণ শিখ-প্রধান নিতান্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ যে অনুমতি করিতেছেন তাহা সর্ব্বাংশেই সমীচীন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডাব্রাহ্মণেরা কোহিনুর লইয়া কি করিবেন? ইহাতে তাঁহাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? শেষে তাঁহারা হয়ত ইহাকে বিক্রয় করিতেই বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই অমূল্যরত্নের ক্রেতাই বা এই ভূ-ভারতে কোথায় পাওয়া যাইবে?" রণজিৎ বুঝিলেন, কোহিনুর ত্যাগ করা তাঁহার পুত্র বা সচিববৃন্দ, কাহারও অভিপ্রেত নহে। তখন তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় বলিলেন,—"না, তবে আর কোহিনুরকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা তোমাদের নিকটেই থাকুক।" কোহিনুর শিখজাতির অধিকারভ্রষ্ট হইল না দেখিয়া, শিখপ্রধানগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

রণজিৎসিংহের পরলোক হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গসিংহ, পৌত্র নৌনেহালসিংহ এবং পালক পুত্র সেরসিংহ, পর পর রাজা হইয়া পঞ্জাবের শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিলেন। অবশেষে তাঁহার পঞ্চবর্ষীয় শিশুপুত্র দলিপসিংহ, তদীয় জননী রাণী ঝিন্দনের তত্ত্বাবধানে, সমস্ত পঞ্জাব রাষ্ট্রের একছত্রা প্রভু হইয়া উঠিলেন এবং কোহিনুরও তাঁহার কোমল দক্ষিণ বাহু আশ্রয় করিয়া শিখ-দরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। রণজিতের মৃত্যুর পরেই পঞ্জাবে নানা গণ্ডগোল ও অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং দুর্দ্দান্ত খালসা সেনারা প্রবল হইয়া চারিদিকে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এখন আবার শিশু দলিপসিংহকে রাজপদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত অশান্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল এবং শতদ্রুনদী পার হইয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সুনিয়মে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতেছিলেন। অধুনা শিখদিগকে রাজ্য আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহারাও অস্ত্রধারণ করিলেন এবং মুদকী, ফিরোজসহর, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ এই চারি স্থানে চারিবার ঘোর যুদ্ধ করিয়া, তাহা-

দিগকে হারাইয়া দিলেন। শিখেরা ভীত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ ও প্রভূত অর্থ দিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। কোম্পানীর তদানীন্তন সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী বা গবর্ণর জেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোরে গিয়া শিশু দলিপসিংহকে নূতন করিয়া পঞ্জাব-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই সূত্রে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শিখ-রাজপ্রাসাদে এক মহতী-সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় সপার্ষদ শিশু মহারাজ, শতাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারী-পরিবৃত লর্ড হার্ডিঞ্জের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে, হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কোহিনুর দর্শনে অভিলাষী হইলেন, আর তদনুসারে তৎক্ষণাৎ সচিব গোলাবসিংহ কর্ত্তৃক উহা আনীত ও সসমাদরে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। কোহিনুরের লোকাতীত সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ দৃষ্টে হার্ডিঞ্জ মোহিত হইলেন এবং শতমুখে উহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া, সমাগত সমস্ত ইংরাজ রাজপুরুষকে উহা দেখাইবার জন্য, গোলাপসিংহকে অনুরোধ করিলেন। গোলাপসিংহ প্রত্যেক ইংরাজ রাজপুরুষকে কোহিনুর দেখাইলেন, আর তাঁহারা সকলেই উহার গুণানুবাদ ও সুখ্যাতি করিলেন। অতঃপর হার্ডিঞ্জ মহাশয় আবার কোহিনুর গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে শিশু দলিপসিংহের ক্ষুদ্র বাহুতে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। গবর্ণর জেনারলের তথাবিধ ঔদার্য্য ও সদ্ব্যবহার দৃষ্টে সমাগত সভ্যগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারিদিকে 'ধন্য' 'ধন্য' রব উত্থিত হইল। এইরূপে প্রথম শিখসমরের অবসান হইল এবং ইংরাজের অনুগ্রহে কোহিনুর পূর্ব্ববৎ শিখরত্নাগারের শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিল।

শিখ ইংরাজের সন্ধি স্থায়ী হইল না। দুই বৎসরের মধ্যেই শিখেরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া ইংরাজের শত্রুতাচরণ করিল, আর তজ্জন্য ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আবার শিখ ইংরাজে দ্বিতীয় সমর বাধিয়া উঠিল। প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধ কিছুদিন ধরিয়া চলিল, উভয়পক্ষে বহুসেনা হত ও আহত হইল, কিন্তু শেষে ইংরাজেরাই বিজয়লাভ করিলেন। চিলিয়ানবালার দিবসব্যাপী যুদ্ধে শিখেরা অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিলেও গুজরাটের যুদ্ধে তাহাদিগের সমস্ত তেজ ও দম্ভ চূর্ণ হইয়া গেল। গবর্ণর জেনারল লর্ড ডালহৌসী সমস্ত পঞ্জাবরাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। সেই সময়ে যে সন্ধিপত্র লিখিত হইল, তাহাতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া শিশুরাজা দলিপ-সিংহ মণিকোহিনুর-সহ পঞ্জাবপ্রদেশ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই সন্ধিপত্রের তৃতীয় ধারায় কোহিনুর সম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছিল,

তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—'মহারাজ রণজিৎসিংহ সাহসুজার নিকট হইতে যে কোহিনুর হীরক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্জাবের বর্ত্তমান মহারাজ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের অধিশ্বরীকে সমর্পিত হইবে।' উল্লিখিত সন্ধি অনুসারে লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে পঞ্জাবসহ কোহিনুর মণিগ্রহণ করিলেন এবং দলিপসিংহ কোম্পানীর অনুগ্রহে বার্ষিক ৫৮,০০০ আটান্ন হাজার পাউণ্ড বা ৮,৭০,০০০ আট লক্ষ সত্তর হাজার টাকা (মতান্তরে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড বা ৬,০০,০০০ ছয় লক্ষ টাকা) বৃত্তিলাভ করিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। কোহিনুর বিজিত শিখদিগকে ত্যাগ করিয়া বিজেতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাগত হইল—বীরভোগ্য জ্যোতির্গিরি বীর ইংরাজের অভিনন্দন করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

কোম্পানীর অধিকারে কোহিনুর।

শিখ-দরবার হইতে কোহিনুর লইয়া লর্ড ডালহৌসী সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজপুরুষ হেন্‌রী লরেন্সের উপরে উহার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। লরেন্স কোহিনুর লইয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটায় আবদ্ধ করিলেন এবং কৌটাটি স্বীয় ওয়েষ্টকোটের পকেটে রাখিয়া, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন সেইভাবে অতীত হইল। সাহেব নানা রাজকার্য্যের আতিশয্যে কোহিনুরের কথা বিস্মৃত হইলেন এবং বিস্মৃতিবশতঃ একদা সেই কৌটাযুক্ত ওয়েষ্টকোট, অপরাপর পরিচ্ছদের সহিত, রজকালয়ে প্রেরণ জন্য, স্বীয় সর্দ্দার বেহারার হস্তে প্রদান করিলেন। বেহারা সাহেবের বস্ত্রাদি বন্ধন করিতে গিয়া কৌটাবদ্ধ কোহিনুর দেখিতে পাইল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কৌটাটি একটা ভগ্ন টীন বাক্‌সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সে দুরভিসন্ধি বশতঃ সেইরূপ করিয়াছিল কি সামান্য প্রস্তর বা কাঠখণ্ড বোধে তাচ্ছিল্য করিয়াই ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সেই ঘটনার দেড়মাস পরে কোহিনুরের খোঁজ পড়িল।—লর্ড ডালহৌসী লরেন্সের নিকটে কোহিনুর চাহিয়া পাঠাইলেন। লরেন্স মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—কোহিনুরের কথা স্মরণ হওয়ায় এবং তাহা কোথায় রাখিয়াছেন স্থির করিতে না পারায়, তাহার উদ্বেগের অবধি রহিল না। তিনি মহা 'ব্যস্ত সমস্ত' হইয়া কোহিনুরের সন্ধান করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না—প্রাণপণে যত্ন করিয়াও তিনি কোহিনুরের উদ্ধার-সাধনে অসমর্থ হইলেন। বেহারা বিস্মৃতি কি ভয় বশতঃই হউক অথবা ইচ্ছা করিয়াই হউক, কোহিনুর প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করিল। যাহা হউক, অবশেষে গবর্ণর জেনারলের বিশেষ চেষ্টায় কোহিনুরের সন্ধান হইল। কেহ কেহ বলেন,—'সর্দ্দার বেহারা কোহিনুরের কোনও সংবাদই অবগত ছিল না, সে কোনও টীন্ বাক্‌সে উহা ফেলিয়া কি লুকাইয়াও রাখে নাই। দেখিতে না পাইয়া বস্ত্রাদির সহিত রজকালয়েই পাঠাইয়া দিয়াছিল, আর সেই স্থল হইতেই ডালহৌসী বাহাদুর উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ফলে, যেরূপেই হউক, কোহিনুর পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনারলের হস্তগত হইল।

কোহিনুর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ডালহৌসী আর উহা নিজের নিকটে রাখিতে সাহসী হইলেন না—অবিলম্বে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদনুসারে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লরেন্স সাহেবের তত্ত্বাবধানে কোহিনুর ইংলণ্ডে কোম্পানীর মহামান্য সভাপতির নিকটে প্রেরিত হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন (মতান্তরে ৩রা জুলাই) তারিখে স্বয়ং রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তদানীন্তন মহামান্যা ইংলণ্ডেশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে সসম্মানে কোহিনুর মণি সমর্পণ করিলেন। জ্যোতির্গিরির প্রোজ্জ্বল প্রভা পরম্পরায় ইংলণ্ডীয় রাজভবন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ডে কোহিনুর।

কোহিনুর ইংলণ্ডের রাজগৃহে আনীত হইলে মহারাণীর স্বামী, সেক্সকোবার্গ ও গোথার রাজকুমার মহামান্য প্রিন্স আলবার্ট মহোদয় উহা দর্শন করিলেন। তিনি কোহিনুরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল মনোহর কান্তি এবং সুন্দর আকৃতি দৃষ্টে যেরূপ প্রীতিলাভ করিলেন, উহার একাংশে একটী অগভীর রন্ধ্র চিহ্ন বা 'খুঁত' দেখিয়া ততোঽধিক বিমর্ষ হইলেন। কোহিনুরের ন্যায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ হীরকের উপরে সেরূপ একটি কলঙ্ক-চিহ্ন থাকা যে উহার গৌরবের পরিচায়ক নহে পরন্তু শোভা ও সৌন্দর্য্যের হানিজনক তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, আর তজ্জন্য উহাকে কলঙ্কমুক্ত করিতে, নির্ম্মল ও সুদৃশ্য করিয়া লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। আলবার্ট অবিলম্বে সার ডেভিড্ ব্রুষ্টার (Sir David Brewster) নামা জনৈক বিখ্যাত রত্নবিদের পরামর্শে, তক্ষনক্রিয়ার দ্বারা উহাকে 'নিখুঁত' করিয়া কাটাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। অচিরকাল মধ্যেই হলণ্ডদেশ হইতে দুইজন সুদক্ষ মণিকার

ইংলণ্ডে আনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছামত একটী দ্রুত-বিবর্ত্তনশীল ছেদক-যন্ত্র (cutting wheel) নির্ম্মিত হইল। সেই যন্ত্রের বিবর্ত্তন মিনিটে তিন সহস্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া, মণিকারযুগল কোহিনুরের তক্ষণক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত অষ্টত্রিংশৎ দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শেষে সেই কার্য্য সমাহিত হইল—কোহিনুর সুন্দর গোলাপফুলের আকারে ক্ষোদিত ও নির্ম্মলীকৃত হইয়া এক অভিনব অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এই তক্ষণ ব্যাপারে, মণিকার-দ্বয়ের পারিশ্রমিক প্রভৃতিতে আলবার্টের ৮,০০০ আটহাজার পাউণ্ড বা ১,২০,০০০ একলক্ষ বিংশতীসহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইল এবং কোহিনুর তৌলে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া গেলেও, সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্যে শতগুণ বর্দ্ধিত ও অতুলনীয় হইয়া উঠিল।

মহারাণীর মণির অভাব না থাকিলেও, তাঁহার রাজমুকুটে * শতশত মণি-মাণিক্য সন্নিবদ্ধ থাকিলেও, তিনি কোহিনুরকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি কখনও কখনও বুরুচের (Brooch) ন্যায় এবং কখনও বা অঙ্গবিধরূপে কোহিনুর ধারণ করিতেন। অতঃপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহার জগন্মান্য জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়, তাহার সুবিশাল সাম্রাজ্য সহ কোহিনুর মণির অধিকারী হন। এখন তাঁহারই পৌত্র, ইংলণ্ডের সর্ব্বজনপ্রিয় বর্ত্তমান অধীশ্বর এবং আমাদের পরম-প্রীতি-ভাজন, ও সুশাসক প্রজারঞ্জক ভারত সম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় তাঁহার সেই সাম্রাজ্য-সম্পদ ও মণি কোহিনুরের উত্তরাধিকারী। আমরা ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি—আমাদের সম্রাট দীর্ঘজীবী হইয়া, শিরে এই সূর্য্যপ্রভা জ্যোতির্ণিধি ধারণ করিয়া নিরাপদে সাম্রাজ্যসুখ সম্ভোগ করুন। কোহিনুর অচল হইয়া চির-দিনই ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের গৌরব ও সুষমা সম্বর্দ্ধিত করুক।

শ্রীঅঘোর নাথ বসু কবিশেখর।

---

* মহারাণীর রাজমুকুট ইয়ুরোপের সমস্ত রাজমুকুট হইতে শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান। ইহাতে ১৩৬৩ একহাজার তিনশত তেষট্টীটি নানা আকারের রত্ন, ১২৭৩ একহাজার দুইশত তিয়াত্তরটী গোলাপ-হীরক, ২৭৩ দুইশত তিয়াত্তরটী ক্ষুদ্র মুক্তা, ২৬ ছাব্বিশটী নীলকান্তমণি, ১১ এগারটি পান্না, ৪ চারিটী মাণিক ৪ চারিটি ডিম্বাকার মুক্তা এবং ১টী বড় মাণিক সন্নিবদ্ধ আছে। লণ্ডনের টাওয়ার (Tower) নামক প্রাসাদের রত্নগৃহে, কোহিনুরের একটী কৃত্রিমমূর্ত্তি বা নকলের সহিত, এই রাজমুকুট সংরক্ষিত আছে।

"বড়দিন।"

মিলেছি সকলে মধুর মিলনে।
অমৃত লহরী খেলিছে পরাণে,
মধুর মধুর ভাবে বিভোল।
মধু ভাতি যেন ফুটিছে বয়ানে,
অনিল হিল্লোলে শুভ সমাচার,
প্রাণে প্রাণে আজি বহিছে সবার।
পরাণের হাসি আননে বিকাশি,
শত শত ফুল ফুটিছে কাননে,
ভাসে কি পুলক সবার নয়নে।

পরাণে, পরাণে, শান্তির লহরী,
যেন থেকে থেকে বহিছে।
কদিনেরি তরে শীতল সমীরে,
হৃদয়ে সুখেরি তরঙ্গ খেলিছে
পুলক পরাণ চমকি শিহরি,
আশার আলোক ছুটিছে।
এ সুখ স্বপন—এই হাসি রাশি।
থাকে যেন বিভু।—চিরদিন মিশি

শ্রীকাদম্বিনী দেবী

আমাদের শিক্ষা ও গৃহ।

লেখা পড়ার বয়স হইলেই অভিভাবকেরা ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয় দেন, দিয়াই তাঁহারা এইরূপ নিশ্চিন্ত হন। ছেলে স্কুলে পাড়তেছে, স্কুলে পড়া শেষ হইলে কলেজে পাড়বে,—লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইবে। তাহাদে অশন, বসন, শয়ন,—বিদ্যালয়ের বেতন, বই খাতা প্রভৃতি শিক্ষার উপকরণ— এই সব যোগাইতে পারিলেই বস্? আর কি এমন করণীয় থাকিতে পারে অভিভাবকগণ প্রায়তঃই এইরূপ মনে করেন। মনে করেন ছেলের শিক্ষা পক্ষে এই খানেই তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ হইল! কিন্তু কি লেখা পড়া জ্ঞানার্জ্জন কি সাধনায় জীবন গঠন—শিক্ষার এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যের সফলত পক্ষে, আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি কতটুকু কি করিতে পারে, এ কথ অতি অল্প:লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে দিবসের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা জন্য ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিভি বিষয়ের পড়া দেওয়া পড়া নেওয়া, আর ছাত্রেরা ভুল করিলে অথবা নিতা

দুরূহ পাঠ কিছু থাকলে মোটামুটি তাহা একটু বুঝাইয়া দেওয়া,—ইহা ব্যতীত সেখানে আর কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। এক এক শ্রেণীতে আবার অনেক ছাত্র পড়ে, ছাত্রদের মেধা ও শুশ্রূষাও প্রায় এক এক জনের এক এক রকম। এরূপ অবস্থায় সকল ছাত্রকে সব শিখাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, তাহারা শিখিল কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও অবসর অতি অল্প শিক্ষকেরই হয়। তারপর সাধারণতঃ আমাদের দেশের সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকবর্গের যোগ্যতা বা কর্ম্মনিষ্ঠার অবস্থা যে কিরূপ, তাহা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে মালঞ্চে আলোচিত হইয়াছে, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, অতি দক্ষ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলেও কোনও শিক্ষক সকল ছাত্রকে স্কুলে সব শিখাইয়া দিতে পারেন না সুতরাং গৃহে তাহাদের অনেক পড়িবার প্রয়োজন হয়,—আর সে প্রয়োজন যে সকলের নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হইয়া আছে, তাও নয়। কারণ বাড়ীতে পড়া প্রস্তুত করিবার একটা প্রচলিত প্রথাই রহিয়াছে।

তারপর, বিদ্যালয়ে যেরূপ অল্প সময়ের জন্য ছাত্রে ও শিক্ষকে সাক্ষাৎ হয়, এবং তাহাও যে ভাবে যেরূপ কার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষকই ছাত্রগণের জীবন গঠন সম্বন্ধে—শক্তি থাকিলেও—কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না। যেটুকু পারেন বাহিরে। কিন্তু বাহিরে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সদুপদেশে ও সৎকর্ম্ম সাধনায় তাহাদের জীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারেন, এরূপ যোগ্য, একব্রত, একনিষ্ঠ শিক্ষক দেশে কয়টি মিলে? মিলিলেও গ্রামে বা ছোট সহরে এরূপ সুযোগ্য শিক্ষকগণ যেটুকু পারেন, বড় সহরে তাও পারেন না। সেখানে বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রশিক্ষকে সদাসর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইবার অবসরই কম ঘটে! সুতরাং জীবন গঠনোপযোগী সাধনার জন্যও ছাত্রগণের গৃহের অভিভাবকগণের উপরেই প্রধাণতঃ নির্ভর করিতে হয়।

জ্ঞানার্জ্জন এবং জীবন গঠন—শিক্ষার এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য বিদ্যালয় অপেক্ষা গৃহই ছাত্রগণের অনেক বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু হায়, সেখানে ছাত্রগণ এ বিষয়ে অতি অল্প সহায়তাই প্রাপ্ত হয়!

সুধু স্কুলের পড়ায় হয় না, ছাত্রদিগকে বাড়ীতেও যথেষ্ট পড়িতে হয়। পড়া বাড়ীতেই হয়, বিদ্যালয়ে তার পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন হয় মাত্র,—তার বেশী বড় কিছু হয় না। বাড়ীতে ছাত্রদের পড়িতে হয়, পড়ার নিয়মও আছে। নিয়ম আছে, সকালে সন্ধ্যায় ছাত্রেরা সাধারণতঃ বাড়ীতে পড়ে। কিন্তু তারা

পড়ে কি? কেমন করিয়া পড়িতে হয়, ধীর ও নিবিষ্ট ভাবে কোন বিষয় কেমন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানে না,—কেহ তাহাদের শিখাইয়াও দেয় না। সুতরাং তাহারা সময়মত পুস্তক লইয়া গিয়া বসে, তারপর তারস্বরে পুস্তকের পাঠ আবৃত্তি করিতে থাকে। এক একখানি পুস্তক খুলিয়া, তার পাঠ যাহা আছে তাহা কয়েকবার উচ্চ নিনাদে আবৃত্তি করিয়াই আবার পুস্তক বন্ধ করিয়া রাখে। যাহা পড়িল, তাহা বুঝিল কি না, একটি কথাও তাহার মনে আছে কি না, তাহা একবার চিন্তা করিয়াও বড় কেহ দেখে না। প্রায় সকল গৃহেই দেখা যায়—(মা ষষ্ঠী বাঙ্গলার গৃহগুলিতে কৃপার কার্পণ্য বড় করেন নাই) দুইটি তিনটি চারিটি পাঁচটি—অথবা যত আছে—সব ছেলে পিলেরাই একত্র এক ঘরে—রাত্রি হইলে একটি আ[illegible] চারিধারে—ঘিরিয়া বসিয়া, পাঠ্য পুস্তকের উপরে ঝুঁকিয়া যে যার পাঠ—[illegible]র যতদূর চড়ে ততদূর গলা চড়াইয়া উচ্চ চীৎকারে আবৃত্তি করিতেছে।

ওদিকে তাকিয়ায় হেলিয়া গুড়ুক খাইতে খাইতেই হউক, বন্ধুজন সহ তাস পাসা খেলিতে খেলিতে অথবা রহস্যালাপ করিতে করিতেই হউক, অথবা নিজের হিসাব পত্র বা মক্কেলের কাগজ পত্র দেখিতে দেখিতেই হউক, বালকের এই কণ্ঠস্বর অভিভাবকের কর্ণগোচর হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হন; ভাবেন, ছেলে আমার বেশ পড়িতেছে। কিন্তু ছেলে মাথামুণ্ড কি পড়িল, সাপ পড়িল কি ব্যাঙ পড়িল, কি পড়িয়া কি বুঝিল, কি, শিখিল, সে দিকে এতটুকু মনোযোগ দিবার ক্লেশও তিনি স্বীকার বড় করিতে চান না। তার পর যে সব ছেলের পড়ায় তেমন মন নাই, তাড়নার ভয়ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারা পড়িতে বসিতেও চায় না। সকালে সুযোগ খুঁজিয়া বাহিরে খেলিতে যায়, সন্ধ্যার পর বই খুলিয়া একটু নাড়ে চাড়ে, খেলার কথা কি পাঁচ রকম দুষ্টামীর কথা ভাবে, না হয় ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। অভিভাবক কেহ ভ্রূক্ষেপও করেন না—কেহ দুই চারি দিন বকাবকি ও মারধর করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দেন। ছেলের কথা মনে পড়িলে, কখনও নিজের অদৃষ্ট, কখনও ছেলের মেধা ও প্রকৃতি, অধিকাংশ সময় বেচারী শিক্ষকের ছাত্রশাসন ক্ষমতার নিন্দা করিয়া ক্ষুব্ধমনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। আবার কেহ অবিরত এত বেশী গালি গালাজ আর মারধর করিতে থাকেন যে, ছেলের শেষে এমনই একটা হাড় ভাঙ্গা জিদ জন্মিয়া যায় যে, কিছুতেই তাকে আর নরম করা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে আবার ঘরে বৃদ্ধা পিতামহী, বিধবা

বর্ষীয়সী পিসী অথবা জ্যাঠাইমা কেহ যদি থাকেন,—তবে তাড়না সম্ভব হইলেও—এক পক্ষে তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের অতিরিক্ত আদরে ছেলে একেবারেই বিগড়াইয়া যায়।

যাহা হউক, এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যায়,—ছেলেদের বিদ্যাভ্যাসে কোন রূপ উন্নতি হইতেছে কি না, এই যে নিত্য স্কুলে [illegible]তেছে আসিতেছে, এই যে দুবেলা বাড়াতে বই নাড়িতেছে, আর চীৎকার [illegible]তেছে, এই যে সে দিন দিন কালি কলম কাগজে পয়সা খরচ করিতেছে, [illegible] শিখিতেছে কি না, তাহার সংবাদ কেহ বড় কিছু নেন না। কেবল [illegible]ব শেষ যখন পরীক্ষা হয়, তখন ছেলে নম্বর পাইল কি না, নম্বর পাক না পাক, উপরের শ্রেণীতে উঠিল কি না, এ সম্বন্ধে অভিভাবকদের মধ্যে কিছু [illegible]বেগের লক্ষণ দেখা যায়। আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই বৎসরান্তে স্কুলে যে পরীক্ষা হয়, তাহা একটা খেলার ব্যাপারের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষা একটা নেওয়া হয়, নম্বরও দেওয়া হয়, পাশ ফেলের তালিকাও একটা রাখা হয়। কিন্তু ছাত্রদের নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে তুলিয়া দিবার সময় এই যোগ্যতার নিদর্শনের হিসাব বড় করা হয় না। যারা নম্বর কম পাইল, উপরে উঠিতে পারিল না, তারা স্কুলে একদম কাঁদিয়া পা ধরিয়া, পিছনে পিছনে ঘুরিয়া শিক্ষককে পাগল করিয়া তোলে। তারপর বাড়ীতে গিয়া কাঁদিয়া না খাইয়া শুইয়া থাকে, কেহ আত্মহত্যা করিবে, পলাইয়া যাইবে—এইরূপ ভয়ও দেখায়। দুর্ব্বল অভিভাবক অনেক সময় ছেলের ওই দুঃখ চক্ষে দেখিতে পারেন না, অথবা ছেলের কাঁদা কাটার যন্ত্রণা সহিতে পারেন না। ভয়ও পান, পাছে ছেলে আত্মহত্যা করে, কি পলাইয়া যায়। তখন তিনি পদ-গৌরবে বিশেষ সম্ভ্রান্ত হইলে, শিক্ষককে ডাকাইয়া অথবা চিঠি দিয়া, আর তেমন বড় না হইলে নিজেই শিক্ষকের কাছে গিয়া, ছেলেকে উপরে তুলিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। রোরুদ্যমান ছাত্রের করযোড়ে অবিরত কাতর প্রার্থনা, অবিশ্রান্ত পশ্চাতে পশ্চাতে তাহাদের 'Sir, Sir' শব্দজাত কর্ণকুহরের যন্ত্রণা, উপেক্ষা করিতে পারিলেও অভিভাবকের অনুরোধ বা অনুরোধরূপে আদেশ উপেক্ষা করা অনেক শিক্ষকের পক্ষেই অসাধ্য হইয়া উঠে। একটির পর একটি করিয়া প্রায় সকল ছাত্রকেই তাঁহাদের তুলিয়া দিতে হয়। আর না তুলিয়া দিলেও উপায় নাই। স্কুলে উপরের শ্রেণীতে কোনও মতে না তুলিয়া দিলে, বালকগণ বাড়ীতে আব্দার নেয়, সেই স্কুলে তারা পড়িবে না; নিচের ছেলেদের সঙ্গে

পড়িবে, এ অপমান তাহারা সহিবে না, তারা গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, বিবাগী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এ আব্দার রক্ষা না করিয়া পারেন, শাসনে ছেলেকে নিরস্ত করিতে পারেন, এমন দৃঢ়তা অতি অল্প অভিভাবকেরই দেখা যায়। কাছাকাছি আরও অনেক স্কুল আছে, সুতরাং ছেলেকে তিনি তার পুরাতন স্কুল হইতে তুলিয়া সহজেই অন্য কোনও স্কুলে দিতে পারেন ও দেন। কাছাকাছি স্কুল না থাকিলেও ছেলের আব্দারে দূরের কোন স্কুলে পাঠাইবার ব্যয় ভার গ্রহণেও তাঁহারা অনেক সময় কুণ্ঠিত হন না। এদিকে ছাত্র-বেতনই স্কুল গুলির প্রায় একমাত্র আয়ের উপায়। ছাত্র কমিয়া গেলে শিক্ষক-গণ বেতন পান না, তাঁদের চাকরী থাকে না। সুতরাং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ও আয় রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে, পারুক আর নাই পারুক, ছেলেদের তুলিয়া দিতেই হয়।

অভিভাবকবর্গের যত্নশিথিলতা এবং দুর্ব্বলতা হইতে এই যে এক বিশ্রী অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের অনেক রূপ অনিষ্ট হইতেছে।

ছেলেরা অন্য অনেক রকম শাস্তি লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিতে পারে,—কিন্তু দলের ছেলেরা ফেলিয়া উপরে চলিয়া যাইবে, নীচের ছেলেরা আসিয়া সমান হইবে, ইহাতে তাহাদের আত্ম-অভিমান বড় ক্ষুণ্ণ হয়, মনে বড় গ্লানি হয়। শিক্ষা-প্রণালীতে যতই ত্রুটি থাক, মন দিয়া খাটিলে অনেক ছেলে আপনা হইতেই অনেক শিখিতে পারে। পাঠে মন যাহাদের আপন হইতে না যায়, তাড়নার ভয় অপেক্ষা এই অপমানের ভয়ে জোর করিয়া পাঠে মন তাহারা বেশ দিতে পারে। একবার মন দিয়া শিখিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে, এই চেষ্টা তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়; তখন আর ইহাতে কষ্ট হয় না। আলস্যের জড়তা অথবা সাময়িক আরামবিরামের প্রলোভন ক্রমে আপনিই কমিয়া আসে। কিন্তু ছেলেরা সকলেই জানে, পড়ুক আর না পড়ুক, উপরে তারা উঠিবেই। সুতরাং পাঠে মন দিবার প্রধান উত্তেজক কারণ যে এই ভয় তাহা তাহাদের বড় থাকেই না। বৎসরান্তে একদিন যে তাহাকে এজন্য একটু কাঁদিতে হইবে, শিক্ষকের হাতে পায়ে ধরিতে হইবে, যুক্তকরে কাতর প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতে হইবে, দৈনিক আরাম বিরামের ও আমোদপ্রমোদের প্রলোভন-মোহে দূরের এই একদিনের অপমানের কথা, গ্লানির কথা, তার মনেই বড় আসে না।

তারপর 'ক' না শিখিয়া কেহ 'কৃষ্ণ' শিখিতে পারে না। দাঁড়াইতে না পারিলে তুলিয়া ঠেলিয়া দিলেই কেহ চলিতে পারে না। যাহা শিখিয়া উপরের পড়া সে বুঝিবে, তাই সে শিখিল না; উপরের পড়া শিখিবে কি প্রকারে? সুতরাং পাঠ্য বিষয় ক্রমেই তাহার নিকট দুরূহ হইয়া উঠে। তখন শিখিবার ইচ্ছা কখনও হইলেও সে আর তা পারে না।

জ্ঞানলাভে ইহাতে যে ক্ষতি হয় তাহা ত হয়ই, পরোক্ষভাবে নৈতিক অধোগতিও ইহাতে কম হয় না। বৎসরের পর বৎসর উপরে উঠা, উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্য হওয়া ছাত্রজীবনের একটি প্রধান কাম্য বিষয়। এই কাম্যলাভে তার সকল শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন, সকল অলস আরামের প্রলোভন ত্যাগ করা প্রয়োজন। এইরূপে কঠোর সাধনায় যত্ন করিলে যে কাম্য অধিকার সে লাভ করিতে পারে, যত্ন না করিলে তাহা পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া তার উচিত নয়, তাহা সে কোন যত্ন না করিয়া সারা সৎসর বসিয়া খেলিয়া ঘুমাইয়া একদিন একটু কাঁদিয়া একটু কাতর প্রার্থনা করিয়া শিক্ষকের অনুগ্রহ সে পায়। ইহাতে তাহাদের অজ্ঞাতে, তাহাদের চরিত্রে একটি বড় হীন ভাবের সঞ্চার আরম্ভ হয়। এই হীনতায় মনুষ্যত্বের লক্ষণ আত্মমর্য্যাদাবোধের বিকাশ তাহাদের মনে তখন হইতে পারে না! যে সুখ, যে উন্নতি, যে অধিকার আমরা আপন শক্তি বলে লাভ করিতে পারি, আপন শক্তিতেই মাত্র যাহা লভ্য, তাহার জন্য শক্তিসঞ্চয়ে ও শক্তিপ্রয়োগে যেটুকু আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক, তাহা না করিয়া আরাম বিরামে সময় যাপন করিয়া কেবল প্রার্থনায় অন্যের অনুগ্রহে তাহা আমরা লাভ করিতে চাই। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই যে প্রধান একটি হীনতা ও দুর্ব্বলতা, জাতীয় চরিত্রের প্রধান একটি কলঙ্ক, জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান একটি বিঘ্ন—ইহার সঙ্গেও যে শিক্ষাজীবনের এই একই রূপ হীনতার কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কথাও বলা যায় না। ছাত্রজীবনে আত্মমর্য্যাদা যাহারা এমন অবহেলায় হারাইতে থাকে, বড় হইয়া কর্ম্মজীবনেরও জাতীয়জীবনের কঠোর সংগ্রামে সেই আত্মমর্য্যাদা তাহারা আর কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? অবশ্য আমাদের কর্ম্মজীবনে ও জাতীয়জীবনে আত্মমর্য্যাদাবোধের অভাব যাহা দেখা যায় তাহার ইহাই যে একমাত্র কারণ, তা নয়। তবে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই কারণও যে অনেক পরিমাণে এই হীনতা আমাদের মধ্যে আনিতেছে এবং রাখিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তারপর এই একটি কর্ত্তব্যপালনে এই শৈথিল্য হইতে—এই শৈথিল্য যে কোন

দুঃখের কারণ হইতে পারে তাহা না বুঝিতে পারায়, অন্যান্য সকল কর্ত্তব্যেই বালকগণের একটা দায়িত্ববোধহীন শিথিলতা আসিয়া পড়ে। এই শিথিলতা জীবনময় তাহাদের ব্যক্ত হয়, জীবনের কর্ম্মশক্তিকে একেবারে দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে।

শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির পক্ষে—মনের স্বাভাবিক শক্তিগুলি বিকাশের পক্ষে—শিক্ষকের সহায়তার সঙ্গে বালকদের স্বাবলম্বনও অনেক পরিমাণে আবশ্যক হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট হইতে যে সহায়তা প্রয়োজন, তাহা বালকগণ অল্পই পায়। এদিকে গৃহেও অনেক অভিভাবক এমন একটি ব্যবস্থা করেন, যাহাতে তাহাদের স্বাবলম্বন-শক্তি বিকাশেও বিশেষ প্রতিকূলতা ঘটে। আজকাল গৃহশিক্ষক রাখা একটি 'ফ্যাসানের' মত দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, তাঁহাদের ছেলেপিলেদের জন্য পাঠগৃহের অন্যান্য অনাবশ্যক বিলাস-সামগ্রীর ন্যায়—এক একজন গৃহশিক্ষকও চাই। বালকগণ ইস্কুল হইতে যে পাঠ লইয়া আসে, বাড়ীতে আপনাদের চেষ্টায় অনেকে যে তাহা সব ভাল শিখিতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। অভিভাবকগণ নিজেরা তাহাদিগকে শিখাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। অনেকের অবসর হয় না; অনেকের সে যোগ্যতাও নাই। কতক বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার আশায়, কতক বিদ্যালয়ের তাড়না হইতে ছেলে পিলেদের রক্ষা করিবার উদ্দেশে কতক বা ছেলেকে ভাল করিবার চেষ্টায় যাঁহারা কোনও মতে কুলাইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই গৃহশিক্ষক রাখিয়া থাকেন। কিন্তু এইটুকু কেহ মনে করেন না যে—শিক্ষকতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়াই সকল শিক্ষক শিক্ষানীতিবিৎ নহেন। সুশিক্ষক গৃহে দুই এক জন বালকের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিলে, বালকের উপকার হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ শিক্ষক কয়জন মিলে? সকলেই আবার শিক্ষাজীবী নন। অনেক দরিদ্র কলেজের ছাত্র, অনেক আফিসের আমলা কর্ম্মচারীও গৃহশিক্ষকতা করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই এটাকে কিছু অর্থোপার্জ্জনের একটা অবান্তর উপায় স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। অনেকে একঘণ্টা কি দুঘণ্টা করিয়া এমন ৪।৫টা করিয়াও গৃহশিক্ষকতা গ্রহণ করেন। বালক কোনও মতে ইস্কুলে গিয়া পাঠগুলি বুঝাইয়া দিয়া আসিতে পারে, কোন তাড়না ভোগ না করে, অভিভাবকের নিকট বালকের পাঠে শৈথিল্য সম্বন্ধে শিক্ষকের কোনও রূপ অভিযোগ না আসে, এই সব শিক্ষকগণের প্রায়শঃ সেইদিকেই দৃষ্টি থাকে। সেটুকুর জন্য যাহা প্রয়োজন তাই মাত্র করিয়া দিয়াই তাঁহারা চাকরীটুকু রাখিতেই ব্যস্ত থাকেন।

তাই তাঁহারা বালকের নিজের যাহা করিতে হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে তাই মাত্র করিয়া দিয়াই চলিয়া আসেন। তাড়াতাড়ি অঙ্ক কয়টি করিয়া দেন, অর্থ কয়টি বলিয়া দেন, অন্যান্য অনুশীলন গুলি সব লিখাইয়া দেন। বালকের পড়া হইল,—ইস্কুলে ঠকিবে না, সেও বাঁচিয়া গেল,—অভিভাবকও নিশ্চিন্ত রহিলেন।

বিদ্যালয়ের সহায়তা বালক বড় কিছু পায় না। গৃহে আত্ম চেষ্টায় তাহার যেটুকু জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা, তাও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তারপর শিক্ষায় সে যে স্বাবলম্বন-অভ্যাসে সুযোগ হারাইল, সে সুযোগ তার আর কিছুতেই আসে না। স্বাবলম্বন যে কি, স্বাবলম্বন যে জীবনের উন্নতির পক্ষে কত সহায়, সে তাহা আর বুঝিল না। শিক্ষায় এই আপাত সুখকর নিরায়াস পরনির্ভরতা হইতে অলস নিশ্চিন্ততা, আপাত মনোরম পরনির্ভরতা তার জীবনের প্রকৃতি হইয়া উঠে।

শিক্ষার একটি অঙ্গ পাঠ ও জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে গৃহে বালকগণ কিরূপ সহায়তা পাইয়া থাকে, তাহা বিবৃত হইল। এখন সাধনায় জীবনগঠন রূপ যে শিক্ষা, তার সম্বন্ধেও গৃহরূপ ক্ষেত্র তাহাদের পক্ষে কিরূপ, পরবর্ত্তী সংখ্যায় আর এক প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

সুধী বচন।

সুভাষিতময়ৈর্দ্রব্যৈঃ সংগ্রহং ন কারোতি যঃ।
সোঽপি প্রস্তাবযজ্ঞে কাং প্রদাস্যতি দক্ষিণাম্॥

সুভাষিতময় ধনের সংগ্রহ যে না করে অর্থাৎ মিষ্ট কথা বলিবার শক্তি যার হয় নাই, প্রস্তাবরূপ যজ্ঞে (অর্থাৎ লোক সমাজে কথার বিবিধ প্রসঙ্গে) সে কি দক্ষিণা দিবে! (অর্থাৎ কিসে তার কথাবার্ত্তার ও আলোচনার চরম সার্থকতা হইবে?)

সংসারকটুবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোঽপমে।
সুভাষিত রসাস্বাদ সংগতি সুজনে জনে॥

সংসার রূপ কটু বৃক্ষে দুইটি অমৃতের ন্যায় ফল আছে,—মিষ্ট কথার রসাস্বাদ এবং সুজনের সঙ্গ।

সুভাষিতরসাস্বাদ জাত রোমাঞ্চ কঞ্চুকাঃ।
বিনাপি কামিনীসঙ্গং কবয়ঃ সুখমাসতে॥

সুভাষিত রসের আস্বাদজাত রোমাঞ্চ কঞ্চুকবৎ দেহ যদি আবৃত করিয়া থাকে, তবে কবিরা নারীসঙ্গ ব্যতীতও সুখে থাকেন।

সুভাষিতেন গীতেন যুবতীনাং চ লীলয়া।
মনো ন ভিদ্যতে যস্য স যোগী হ্যথবা পশুঃ॥

সুভাষিত গীতে এবং যুবতী লীলায় যাহার মন অধীর না হয়, সে হয় যোগী না হয় পশু।

'ব্রজবেণু'র জের *

[কৈফিয়ৎ :—কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের মাঞ্চে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের 'ব্রজবেণুর সমালোচনা' বাহির হয়। প্রবন্ধের শেষে সংক্ষিপ্ত একটু মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছিলাম, এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরসংখ্যায় করিব। পরবর্ত্তী পৌষ সংখ্যায় পারি নাই, বর্ত্তমান মাঘ সংখ্যায় দিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজয় বাবুর আর একটি প্রবন্ধ আসিয়াছে। এবার সেইটিই আমরা প্রকাশ করিলাম। দুই প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলির উত্তর আমরা আগামী সংখ্যায় দিব।—সম্পাদক।]

পত্রিকাদিতে পুস্তকাদি-সমালোচনার যে সনাতন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলাম, অর্থাৎ যুক্তিহীন স্তুতি-নিন্দায় কোনোপ্রকার যা' তা' একটা-কিছু লিখিয়া দিয়া দায়িত্বশেষ করি নাই; লেখকের লক্ষ্য এবং কার্য্য এতদুভয়কে পাশাপাশি গ্রহণ করিয়া একটু বিচারের চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং উক্ত চেষ্টায় লেখক-বন্ধুর মনোরাজ্যের কতকগুলি ত্রুটি ধরা পড়ায় দেখাইয়া দিয়াছিলাম, কি উপায় অবলম্বন করিলে কবি তাঁহার কাব্যশক্তিকে লক্ষ্যপেথের ভিতর চালাইয়া দিতে পারিবেন।

ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। প্রবন্ধের পাদ টীকায় সম্পাদক মহাশয়ও একটু অনৈক্যের আভাস দিয়াছেন!

* * * * *

সেই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই প্রবন্ধে জানাইতেছি।

প্রথমতঃ, সম্পাদক মহাশয়ের কথা :—

(১) যে প্রমাণে 'ব্রজবেণু'র বিচার হইয়াছে, যদি তাহাই মাত্র বর্ত্তমান "যুগোপযোগী" বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে মন্তব্য মোটের উপর মন্দ হয় নাই; কিন্তু সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন কি?

(২) যে ভাবের যে সুরের কবি-গীতি মাত্র বর্ত্তমান "যুগোপযোগী" বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়াছে তাহা 'বিশ্ববেণু'তেই বাজিতে পারে 'ব্রজবেণু'তে নয়।

(৩) 'ব্রজ' বলিলে 'বেণু' বলিলে—কদম্বমূলে সেই ত্রিভঙ্গ নন্দের দুলাল আর বামে ভুবনমোহিনী 'রাধা' বিনোদিনী যে আপনিই আসিয়া পড়ে।

(৪) রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ছাড়িয়া 'বিশ্ববেণু' বাজিলেও বাজিতে পারে, 'ব্রজবেণু' বাজে না।

আমার পক্ষ হইতে উক্ত প্রশ্নটি ও 'রায়' গুলির বিনীত প্রতিবাদ এই :—

(১) "যুগোপযোগী" কথাটি আমার প্রবন্ধ বা আলোচ্য কাব্যের ভূমিকা এতদুভয়ের কোনোটিতেই নাই, উহা সম্পাদক মহাশয়ের মনগড়া কথা,—বিশেষতঃ কোনোপ্রকার Criterion সম্বন্ধেই একটা কেহ স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারে না যে ইহাই মাত্র বর্ত্তমান "যুগোপযোগী"। কবির লক্ষ্য ছিল—'বর্ত্তমান

---

* কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মালঞ্চে' প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

যুগের ভাবে গোকুল-গীতিকে জীবনরাগরঞ্জিত' করা ; বর্ত্তমান যুগ বলিতে রবীন্দ্রীয় যুগই বুঝায়, এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবে ভাবুক, সে কারণ ঐ-ভাবেরই উপযোগী করিয়া আমি Criterion নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং উহারই উপর আমার বিচার-চক্র ঘুরাইয়াছি। এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের মাঝখানে কোনো ত্রুটী পাইলে সম্পাদক মহাশয় অনায়াসেই তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু কথা ঘুরাইয়া বা যে কথা আমি বলি নাই তাহা আমার মুখে গুঁজিয়া দিয়া একটা অসম্ভব প্রশ্ন করিলে আমার উপর অবিচার করা হয়।

(২) এখানেও "যুগোপযোগী" কথা সম্বন্ধে বক্তব্য পূর্ব্ববৎ। 'বিশ্ব' ও 'ব্রজ' এ দুটিকে সম্পাদক মহাশয় স্বতন্ত্র ধরিতেছেন, কিন্তু এই 'ব্রজবেণু'রই ব্রজেশ্বর সম্বন্ধে কবি তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কবিতাটিতে লিখিয়াছেন—"এই বিশ্ব তব রঙ্গভূমি, নিত্য নট বিহর তুমি" এবং ভূমিকাতেও বারংবার ঐরূপ বুঝাইতেছেন। তবে কি জন্য 'বিশ্ববেণু'র গান 'ব্রজবেণু'তে আশা না করিব ?

(৩) এরূপ মনে আসিয়া পড়ার জন্য দায়ী আমাদিগের সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা। যে কবি সার্ব্বভৌমিক সাহিত্য দিবার আশা দিয়া কাব্য উপহার দিতেছেন, সংস্কার-ভার ও সম্প্রদায়ের জাল হইতে নূতন নূতন ভাব-লোক-সৃষ্টির ভিতর গতানুগতিক সাধারণ-চিত্তগুলিকে মুক্তি দেওয়াই তাঁহার কার্য্য।

(৪) 'বিশ্ববেণু'তে যাহা বাজে তাহাকে বাজাইয়া তোলা যদি 'ব্রজবেণু'র অসাধ্য হয়, তাহা হইলে 'বিশ্বেশ্বর' ও 'ব্রজেশ্বর' অভিন্ন দাঁড়াইতে পারেন না। এই উক্তিতেই প্রমাণ হইতেছে যে আলোচ্য কাব্যে অনন্ত ও চিরন্তনের গান নাই,—ইহা সার্ব্বজনীন নয়, সাম্প্রদায়িক। আমার সমালোচনার প্রতিপাদ্যই এই কথা,—প্রভেদ এই, সম্পাদক মহাশয় যাহা 'অসম্ভব' মনে করিয়াছেন, আমি তাহা 'সম্ভব' বলিয়া বুঝিতেছি ; এবং কি কারণে কবি পারেন নাই তাহা দেখাইয়া দিয়া, কি উপায়ে পারা যাইত তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভূমিকায় আছে— "কবি এই বিশ্বকে ভগবানের Manifestation বলিতে চাহেন" অর্থাৎ Pantheism এর উপর তাঁহার অনুরাগ লুকাইতে চাহেন না। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি কবিতায় এ অনুরাগ ব্যক্ত হইয়া পড়ায়, এবং সে কবিতাগুলি সকলেরই উপভোগ্য হওয়ায়, তাঁহার মনের গতি-পথেই আমি ঠেলা দিয়াছিলাম, এবং যেহেতু তিনি এ-পুস্তিকায় রাধা ও কৃষ্ণ উভয়কেই লইয়াছেন, সেই কারণ Manifested অংশটুকুকে রাধারূপে গ্রহণ করিয়া (ব্যক্ত ও অব্যক্তের) যুগল-মিলন-চিত্র সম্পূর্ণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এ ভাবটি রবীন্দ্র-সাহিত্যেই ইঙ্গিত-প্রাপ্ত, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণকে সার্ব্বভৌমিক উপভোগ গ্রাহ্য করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় যে ইহাই, তদ্বিষয়েও আমি সংশয়শূন্য। অপরপক্ষে সমন্বয়-সাধন অসম্ভব হইয়া 'বিশ্ববাসীর' চক্ষে 'ব্রজেশ্বর'ও নিরর্থক হইয়া পড়েন। সম্পাদক মহাশয়ের আপত্তির উত্তরে এই পর্য্যন্ত। এইবার বন্ধুবর কৃষ্ণবিহারীর অভিযোগগুলি দেখা যাক। তাঁহার মন্তব্যগুলি এইরূপ :—

(১) "আপনার মাপকাটি বা Standard টাই ভ্রান্ত।

(২ বৈষ্ণব Ideal এর Spirit একেবারেই আপনি ধরিতে পারেন

নাই, এবং আপনার প্রবন্ধের প্রতিছত্রেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, মতগুলি যে আন্তরিক তাহা বুঝিতেছি।"

(৩) "কালিদাসের প্রতি আপনার প্রবন্ধ সুবিচার করে নাই।"

(৪) "মানুষ কৃষ্ণ ও মানুষী রাধা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যে রসবিকাশের জন্য যে কতটা অত্যাবশ্যক তাহা না বুঝিয়া আপনি নানারূপ অবান্তর কথা কহিয়াছেন।"

(৫) "এ-জাতীয় কবিতাকে প্রকটভাবে আধ্যাত্মিক বা সার্ব্বজনীন করিতে গেলে উহাকে মাটী করা হয় এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্বটাই নষ্ট করা হয়। যথা— সন্তান বা প্রেমিকরূপে যেখানেই কবি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন সেইখানেই কবিতা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাহা ভাল হয় নাই।"

(৬) "যে হিসাবে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি, সে হিসাবে যে-কোনো বৈদেশিক বড় কবিকেও ত বৈষ্ণব কবি বলা যায়।"

এই মন্তব্যভরা চিঠিখানি পাইয়া উত্তরে লিখিয়াছিলাম—"যদি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর এ শ্রদ্ধা আপনার থাকে যে উহা নিত্যকালের মানবধর্ম্মকে ব্যক্ত করিয়াছে, উহা অনন্ত-বোধের ধর্ম্ম, চিরন্তন-উপলব্ধির ধর্ম্ম, তাহা হইলে প্রকাশ্যপত্রে আপনার স্বকীয় প্রকাশের ও প্রাণের ভাষায় উহার আদর্শ-মাহাত্ম্য ও মঙ্গলমূর্ত্তি আমার ধারণাকে ধ্বংশ করিয়া আপনি প্রদর্শন করুন। আর যদি ভাবেন, উহা সাম্প্রদায়িক, সার্ব্বজনীনতার দাবীলেশহীন—তাহা হইলে অবশ্য তর্কের শেষ এইখানে করাই ভাল, কারণ সেক্ষেত্রে উক্ত ধর্ম্ম রসাতলে গেলেও এ পক্ষের আপত্তি নাই।" প্রত্যুত্তরে যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার দিয়া যে পত্রখানি বন্ধু লিখিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ—বৈষ্ণব Ideal এর Spirit এত বেশী বুঝি যে অপরকেও বুঝাইয়া দিতে পারি, এরূপ স্পর্দ্ধা আমার চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া মনে করি না। সমালোচক কবিতার দোষ ধরিতে পারেন বলিয়া কি করিয়া কবি তাহাকে ফরমাইস করিবেন, 'তুমি নিজে একটা নির্দ্দোষ কবিতা লিখিয়া দেখাও'? বৈষ্ণব আদর্শের নিগূঢ়তত্ত্বটিও কাব্যেরই ন্যায় ভক্তের অন্তরের উপলব্ধির সামগ্রী, আমার ন্যায় ভক্তিহীন কেহ তাহা ভাল করিয়া বোঝেন কিনা সন্দেহ। তবে মোটামুটি যে ধারণা আছে, তদনুসারেই বলিয়াছিলাম, আপনি এটি একেবারেই ধরিতে পারেন নাই।"

মোটামুটি ধারণাই এইভাবে বন্ধুবর ব্যক্ত করিয়াছেন :—

(ক) "বৈষ্ণবের কাছে ভগবৎপ্রেম একটা স্বতন্ত্র জিনিষ; সাংসারিক জীবনের সম্বন্ধগুলা যেমন reality, এই ভগবৎমিলনও সেইরূপ real—allegory নহে, শুধু idea নহে। রবি বাবুর conception ভুল; তিনি লিখিয়াছেন "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!"—কিন্তু বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ চায় না, চায় গোলোক। বৈকুণ্ঠের ভগবান্ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত চতুর্ভুজ রাজা, বৈষ্ণবের ভগবান্ দ্বিভুজ মুরলীধর।

(খ) "বৈষ্ণব উপনিষদকে দু'চক্ষে' দেখিতে পারে না। উপনিষদ বলে

'একমেবাদ্বিতীয়ং'—বৈষ্ণব বলে 'দুই আছে' বৈকি—'তুমি' আর 'আমি'। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তফাতে থাকিতে পাইবে না; সখ্য দাস্য ভাবে তোমাকে আমার সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইতেই হইবে। ভক্ত ও ভগবান্ এক—ইহাই রাধাকৃষ্ণের মধুরমিলন।

(গ) বৈষ্ণবের নিকট ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ—একেবারে নিবিড় নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া একাত্ম হইবার আকুল বাসনা। ইহাই সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। ৺বলেন্দ্রনাথ জয়দেবের মূল্য বোঝেন নাই বা ৺প্রিয়নাথ সেন বৈষ্ণব-সাহিত্য-পরিসর ক্ষুদ্র দেখিয়াছেন বলিয়া উহার মাহাত্ম্য একটুও কমিবে না।"

কালিদাসের ভূমিকা-সম্বন্ধে ইনি বলেন—"কালিদাস নিজে তাহার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছে, তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। পাঠক নিজের মত করিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করিবে, কবির ব্যাখ্যা নাও লইতে পারে। প্রমাণ—রবিবাবুর 'সোণার তরী'র আপন-ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করে নাই। 'ব্রজবেণু'র বিচার বৈষ্ণবের দিক দিয়াই হওয়া উচিত।"

এইবার আমার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ ও উত্তর প্রদানের পালা। গ্রহণ করুন:—

(১) সম্পাদক মহাশয়কে যাহা বলিয়াছি এক্ষেত্রেও অবিকল সেই কথা; উপরন্তু এইটুকু যে, কৃষ্ণ বাবু যাহাকে কবির 'ব্যাখ্যা' বলিয়া 'সোণার তরী'র নজীর দেখাইয়াছেন আমার বুদ্ধিতে তাহা কবির 'লক্ষ্য' রূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমার মাপকাটি সেই 'লক্ষ্য' অনুসরণেই নির্ব্বাচিত। কবির ব্যাখ্যা যে মদীয় প্রবন্ধের কুত্রাপি গৃহীত হয় নাই তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ এই যে উক্ত প্রবন্ধের সর্ব্বাঙ্গ দিয়াই বৈষ্ণব ideal না বুঝার পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ বৈষ্ণব-কবি (?) কালিদাসের স্বকীয় ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তী হইলে এটা (হয়ত বা) ঘটিত না। কেহ যদি কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গোয়ালন্দের গাড়ীতে চড়িয়া বসে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভুলটা ভাঙিয়া দেওয়া উচিত—অতএব কবির লক্ষ্যটাকে লক্ষ্য করিয়া এপক্ষ ভ্রান্তিবুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই।

(২) বৈষ্ণব idealএর spirit কি ছিল না ছিল, তাহা লইয়া আমি অনর্থক মাথা গরম করি না, প্রাপ্তির মধ্যে যেটা আসল সেই হৃদয়ধর্ম্ম সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, কারণ আমার বিশ্বাস—কোনও ধর্ম্মেরই spirit জানা তত বড় কর্ত্তব্য নয়, যতবড় কর্ত্তব্য হৃদয়-ধর্ম্মের মর্ম্ম জানা। সকল ধর্ম্মই মানুষের প্রাণ হইতে গড়া, অতএব প্রাণের দিকে চাহিলেই উহাদের key-note মিলিতে পারিবে। ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ও প্রকাশিত করাই, আমার বিশ্বাসমতে, মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, পরন্তু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা নয় যে ধর্ম্মবিশেষের ছাঁচে আপনাকে ঢালাই করিব। এই ব্যক্তিত্বকেই সামনে রাখিয়া বৈচিত্রের ভিতর হইতে আমার গ্রহণ ও ত্যাগের কার্য্য চলিতেছে, সুতরাং আন্তরিকতা যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছি,

এই সার্টিফিকেটটুকুই আমার আত্ম-সান্ত্বনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। যাঁহারা idealএর ইতিবৃত্ত-সংগ্রাহক তাঁহারা মর্ম্ম ভ্রমে বিশেষ বিশেষ idealএর চর্ম্ম লইয়া টানাটানি করুন—যে ব্যক্তি মোটেই ঐতিহাসিক নয় সে যেন কখনও উক্ত কার্য্যকে গৌরবজনক না মনে করে।

(৩) কালিদাসের প্রতি অবিচার করিতে পারি, কিন্তু 'তাহার প্রতি আমার ভালবাসা'র উপর করি নাই—উক্ত প্রমাণ, কৃষ্ণবাবুরই কথা—"মত যে আন্তরিক তাহা বুঝিয়াছি।"

(৪) মানব-মানবীই ভগবানের প্রকাশ, অতএব প্রিয়-যা-কিছু-রস ধর্ম্মের অভিমুখে বিকশিত করিবার জন্য তাহারাই যে যথেষ্ট হইবে না কেন, তাহার কোনও যুক্তি কৃষ্ণবাবু দেখান নাই এবং বৈষ্ণব-কাব্য সাহিত্যের শৃঙ্গার-রসটা কি জন্য যে বৈষ্ণবের ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন, তাহারও কোনও উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই—সুতরাং আমারও আপাততঃ বক্তব্য কিছু নাই। তবে আশ্চর্য্য এই যে আমার কথাগুলিকে অবান্তর ছাড়া আর কিছুই তাঁহার মনে হয় নাই; এটুকু তাঁহার জানা উচিত ছিল, ক্ষুদ্র একটি ফুল ও বৃহৎ একটা পর্ব্বত এতদুভয়ের 'তথ্যে' যতই ভিন্নতা থাক না কেন, 'সত্যে' ক্ষেত্রে' একটা গভীর ঐক্যও আছে। এই ঐক্যের দিক দিয়া যাতায়াতের পথ পাইলে বিষয় ও বিষয়ান্তরের মাঝখানে কিছুই অবান্তর থাকে না। ধর্ম্ম ও আদর্শের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধেই একথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বটে।

(৫) বিশেষত্ব?...নির্বিশেষকে প্রকাশ করাতেই বিশেষত্বের সার্থকতা, আপনাকে বড় করাতে নয়। বিভিন্ন বিশেষত্বের ফাঁক দিয়া অভিন্ন নির্বিশেষকে, অনন্ত-বহুর ফাঁক দিয়া অনন্ত এককে যদি উজ্জ্বলতরই না দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ বিশেষত্ব আপনাকে আপনি বড় করিয়া ভগবানকে আড়াল করিয়াছে সুতরাং মায়িকই হইয়া উঠিয়াছে। সেক্ষেত্রে চিত্তবান্ বা কবির একমাত্র কর্ত্তব্যই হইতেছে তাহাকে ফুটা করিয়া ফাঁক বাড়ানো। সখা বা সন্তানরূপে (প্রেমিকরূপ সম্বন্ধে আমি ভিন্নমত) যেখানেই কালিদাস কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, সেইখানেই যে কবিতা সুন্দর হইয়াছে তাহার কারণ, ও-দুটি তাহার প্রাণের সহজ রস। কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণবিহারী'কে সখারূপে বা আপন নবজাত কন্যাটিকে সন্তানরূপে আহ্বান করিলেও অবিকল এই সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পাইত—শ্রীকৃষ্ণের গুণপনা ওখানে কিছুই নাই। আধ্যাত্মিকতা প্রাণে জাগে নাই বলিয়াই চেষ্টা সফল হয় নাই, অথচ কৃষ্ণ-রাধিকার সম্বন্ধটিকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঐ Philosophic mindই দরকার। গুপ্ত মহাশয় যে আধ্যাত্মিকতার চেষ্টা কালিদাসে দেখিতে পাইয়াছেন—আমি তাহাও পাই নাই। যে দু'একটিতে সে চেষ্টা প্রকাশ করিতে গিয়াছে তাহা তাত্ত্বিকতামাত্র—আধ্যাত্মিকতা ও তাত্ত্বিকতায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য তফাৎ।

(৬) যে কারণে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবি সেই কারণে যে কোনও

বৈদেশিক বড় কবিকেও বৈষ্ণব-কবি বলিয়া স্বীকার করিতে (একমাত্র সংস্কারের বাধা ছাড়া) সত্যকারের বাধা বাস্তবিকই ত নাই। খুলিয়া লিখিয়াও অনাবশ্যক বোধে একথা কাটিয়া দিয়াছিলাম। তবে উপবীত-ধারীমাত্রই যাঁহাদের চক্ষে ব্রাহ্মণ, পরন্তু ব্রাহ্মণের গুণবিশিষ্ট চিত্তধারীরা নহেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র ; কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহাদিগকে বলা যায় —"মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের তা'রা আজ সব সরিয়া দাঁড়া।"

কিন্তু সে যা' হোক্—বৈষ্ণব আদর্শের spirit সম্বন্ধে বন্ধুবর নিজের অভিজ্ঞতা যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যে খুবই উপভোগ্য একথা অস্বীকার করিতে পারি না। "আমি ঠিক বুঝি না, উহা ভক্তের অন্তরের উপলব্ধির সামগ্রী" বলিয়াই যদি পাশ কাটাইতে হয় তবে আস্ফালন একটু কম প্রকাশ করিলেই মানাইত ভাল।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

যাহা হউক, মোটামুটি ধারণাটার দিকে যাওয়া যাক্ :—

(ক) ভগবৎ-প্রেম বা পরাপ্রীতি সকলেরই বুদ্ধিতে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ এবং ভগবৎ-মিলনও কোনও বিশ্বাসমতে allegory বা শুধু idea নহে। রূপক জিনিষটা মোহ ও নামরূপ-ফাঁস ছেদন করিবার অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবের ভগবান্ যে 'দ্বিভুজ মুরলীধর' এ তথ্যটিও যদি বন্ধুবরের মতে বৈষ্ণবাদর্শের 'মর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তিনি আশ্বস্ত হউন—উহা আমার জানা আছে, এমন কি আমারই সম্মুখের দেওয়াল-গাত্রে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন-চিত্র এখনও টাঙানো দেখিতেছি। কিন্তু বন্ধুবর জানিয়া রাখুন, ঐ দ্বিভুজ মুরলীধরটি বৈষ্ণবের দেবতা হইলেও Philosoplyর ভগবান নহেন—অর্থাৎ ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ ঐ বিশেষ মূর্ত্তিটিতে ব্যক্ত হয় নাই—উহা সাম্প্রদায়িক, বিশ্বজন-গ্রাহ্য নহে। রূপের মধ্যে যিনিই ভগবানকে বিশেষ করিয়াছেন, তিনিই সেইরূপের গণ্ডীতে ভগবৎ-লক্ষণকেও মানব-ধারণা-ক্ষেত্রে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

(খ) 'বৈষ্ণব উপনিষদকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না'—ইহা ভক্তমাত্রেরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বটে! সত্য কথা যে উপনিষদ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলে, কিন্তু সে বলা শুধু এইজন্য যে উপনিষদ অসংখ্যের ভিতর ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছে—শুধু 'দুই' নয়, 'অসংখ্য'কেই সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়া তবে উপনিষদ বলে—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। দ্বিভুজ মুরলীধরের সহিত তদ্ভক্তের একাঙ্গতাকে কৃষ্ণবাবু 'রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন' বলিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব Philosophyতে বলে মূলাপ্রকৃতি ও পরম-পুরুষের মিলনই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন—বলা বাহুল্য এ রাধাকৃষ্ণ দেহী নহেন। চক্ষের সম্মুখের এই জগতটা, এটা ঐ মূলাপ্রকৃতিরই স্থূল পরিণতি, অতএব সাহস করিয়া কাব্যের আশ্রয় হিসাবে এই জগতটাকেই অনায়াসে 'রাধা' বলা চলিতে পারে।

(গ) নিবিড় নিষ্ঠুর পীড়নের ভিতর দিয়া ভক্ত ও ভগবানের একাত্ম

হইবার চেষ্টায় বাধা দিতে চাহিব, এতবড় পাষণ্ড অবশ্যই আমি নহি—তথাপি জয়দেব বা (কালিদাসের) জয়দেব-প্রভাব-পুষ্ট কবিতাগুলির 'কৃষ্ণকে' যে 'নরাধম' বলিয়াছি, তাহা এইজন্য যে. তথাকথিত পীড়ন ক্রমাগতই দেহটার উপর ঘটিয়াছে, অথচ 'ভক্তি' একটি অতীন্দ্রিয় চিত্তভাব। অবশ্য 'বিলাস-কলায়' যাঁহারা 'কুতূহলী' তাঁহাদের এ সকল কাব্য-প্রচেষ্টা খুবই পছন্দসই মনে হইবার কথা। তবে আমি ভাবি—যাহা অন্যত্র জঘন্য বলিয়া গণ্য, কেবলমাত্র দুটো নামের আড়ালে তাহারই অজস্র-বর্ণনা পবিত্র হইয়া উঠিবে এরূপ অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি দিয়াই মরা উচিত। উলঙ্গতাও অপবিত্র নয়, যদি মনের পবিত্রতা দিয়া সে চিত্র মণ্ডিত করিয়া দেওয়া যায়—টেনিসনের Godiva কে 'অশ্বপৃষ্ঠে বিবসনা' দেখিলেও সাধ্য কি আমাদের যে সঙ্কুচিত হই—কিন্তু জয়দেব ? তিনি উপভোগ করিয়া করিয়া ভগবানের নামে শৃঙ্গার-দৃশ্য আঁকিতেছেন আর পাঠক-সম্প্রদায়কে ক্রমাগতই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে, ইঙ্গিতে, ইসারায় তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। ইহাতে যদি মাহাত্ম্য থাকে তবে বন্ধুবর কৃষ্ণবিহারী অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ চিরকালই তাহা উপভোগ করুন; 'নাস্তিক' অপবাদও শিরোধার্য্য, তথাপি এ মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি বলিয়া মিথ্যাবাদী হইব না।

"ভক্ত হও, তবে বুঝিবে"—এই সহজ উপদেশটী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্তি প্রাণে জাগিলে 'বিষ্ঠা'ও হয় ত 'চন্দন' হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এই ভক্তি উদ্রেকের ভার যদি কবিরা না লন তবে লইবে কে ? 'ভক্তি-সাহিত্য' ভক্তের কাছে তত্ত্ববুদ্ধি-পরীক্ষা দিবার জন্য, না ভক্তিপথে সাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ?

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

সাময়িক ও বিবিধপ্রসঙ্গ।

কংগ্রেস্ ও মস্লেম লীগ।

লক্ষ্ণৌনগরে এবার বড়দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন দেশের বড় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসে দুইটি দলের দুইটি বিভিন্ন মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনাতেই বাঙ্গলায় সেই প্রবল স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন দুই দলের মতের পার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশী তীব্র হইয়া উঠে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সুপ্রবীণ রাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীযুত দাদাভাই নৌরোজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে সুবৃহৎ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন দলগত মতভেদ প্রবল একটা বিরোধের মতই দেখা গিয়াছিল। যাহাহউক, দুইদলই তখন একরূপ আপোষে মিলিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন সুসম্পন্ন করেন। এই কংগ্রেসেই প্রথমে শ্রীযুত দাদাভাই নৌরোজী স্বায়ত্বশাসন (Self Government)

কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই প্রথমে স্বায়ত্বশাসনের তাৎপর্য্য বুঝাইতে 'স্বরাজ' (Home rule) কথাটি ব্যবহার করেন। পর বৎসর সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু দুইদলের বিরোধ তখন এত বড়ই একটা দুর্দ্দম উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে কংগ্রেস পর্য্যন্ত তাহাতে ভাঙ্গিয়া গেল। সাহেবদের পরিচালিত সংবাদ পত্র সমূহ এই দুইদলকে Moderate অর্থাৎ নরম এবং Extremist অর্থাৎ চরম—এই দুই নামে অভিহিত করেন। দেখিতে দেখিতে এই দুই নামই প্রচলিত হইয়া পড়িল,—যদিও Extremist বা চরম দলের লোকেরা আপনাদিগকে Nationalist অর্থাৎ 'জাতীয় দল' বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেই অবধি গত বৎসর পর্য্যন্ত মডারেট বা নরম দলের ভাঙ্গা কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া আসিতেছিল। এবার লক্ষ্নৌনগরে দুইদলের মিলনে নয় বৎসর পরে আবার পুরা কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। ইহাই এবারকার কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রধান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মস্লেমলিগের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন। কংগ্রেস জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় মহামিলন সমিতি। তবে হিন্দু ও পার্শীরাই প্রধানতঃ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। মুশলমান সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও স্বম্বন্ধ রাখেন নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা পৃথক একটি রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন করিয়া আসিতেছেন—তাহার নাম মস্লেম লীগ। ইহাতে ভারতীয় মুশলমান সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় মঙ্গল যেন হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় মঙ্গল হইতে পৃথক এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ পাইত। ভারতে মুশলমান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুই লোকসংখ্যা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাদির হিসাবে প্রধান। বস্তুতঃ পার্শিসম্প্রদায়কে বাদ দিলে কংগ্রেস একরূপ হিন্দুর রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির মতই হইয়া দাঁড়ায়। হিন্দু ও মুশলমান,—ভারতীয় প্রজামণ্ডলীর প্রধান এই দুই সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য এবং রাষ্ট্রীয় মঙ্গল এক নহে—পরস্পর সাপেক্ষ নহে, উভয়ের মধ্যে বড় একটা বৈষম্য আছে,—কংগ্রেস এবং মস্লেমলীগের পৃথক অস্তিত্ব এবং একই সময়ে পৃথক স্থানে অধিবেশন যেন ইহারই লক্ষণ সূচিত করিত। এবার লক্ষ্নৌনগরে একেবারে মিলিত না হইলেও একই স্থানে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিয়া, মতসামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়া, প্রায় একই আদর্শ ধরিয়া কংগ্রেস ও মস্লেমলীগ আপন আপন অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পরস্পরের প্রতি এক জাতীয়ত্বের সমবেদনা দেখাইবার জন্য মস্লেমলীগের নেতৃবর্গ কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের নেতৃবর্গও মস্লেমলীগে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা যে ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে বড় একটি শুভ সূচনা একথা ভারতহিতৈষী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মগত ও সমাজগত বহু বৈষম্য ভারতবাসীর মধ্যে বর্ত্তমান, অথচ রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সকলেরই একরূপ। রাষ্ট্রীয় মঙ্গলও সকলের একপথে একভাবেই হইবে। রাষ্ট্রীয় কল্যাণলাভ করিতে হইলে, ধর্ম্মগত ও সমাজগত বহুবৈষম্য স্বত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকলকেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে হইবে। নহিলে

ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয়মঙ্গল কখনও হইবে না। প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দুমুশলমানের কথাই ধরা যাউক্। হিন্দু মুশলমানকে কিম্বা মুশলমান হিন্দুকে একেবারে চাপিয়া পিষিয়া ছোট বা নির্জ্জীব করিয়া রাখিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নয়। দুই সম্প্রদায় এখন সমানভাবেই শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে উন্নতিলাভের জন্য, মানবোচিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। আবার হিন্দু মুশলমানকে অথবা মুশলমান হিন্দুকে যে আপন ধর্ম্মে আনিয়া আপন সমাজভুক্ত করিয়া নিবেন, অথবা দুই সম্প্রদায়ই স্বায় স্বায় ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন কোনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া এক সমাজভুক্ত হইবেন, সেরূপ সম্ভাবনাও আদৌ দেখা যাইতেছে না। অথচ রাষ্ট্রীয় জীবনেও পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া, পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার উপায় নাই। এক শাসনাধীন একই দেশের অধিবাসীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় মাত্র সেইখানে— যেখানে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপরে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া রাখিতে পারে। ভারতের হিন্দুমুশলমানে এখন সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ব্যতীত রাষ্ট্রীয়মঙ্গল কাহারও হইতে পারে না। ধর্ম্মগত ও সমাজগত বৈষম্য ইহার পক্ষে কিছু পরিমাণে দুরতিক্রম্য হইলেও যে অনতিক্রম্য বাধা এরূপ বলা যায় না। দুরতিক্রম্যতা যে যে কারণে আছে, তাহা দূর করিয়া ধর্ম্মগত ও সমাজগত বহু বৈষম্যের মধ্যেও রাষ্ট্রীয়জীবন সকলেরই কেমন করিয়া এক ও সমান হইতে পারে, তাহাই এখন রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের প্রধান চিন্তার ও চেষ্টার বিষয়। তাহারই কিছু সূচনা এবারকার কংগ্রেসের ও মস্লেমলীগের অধিবেশনে দেখা গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয়মঙ্গলের পক্ষে ইহা বড় একটি শুভ সূচনা।

স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজ—Self Government—Home rule.

বৃটিশ-সাম্রাজ্যের বিস্তার অতি বিপুল। দেশদেশান্তর লইয়া এত বড় সাম্রাজ্য এই পার্থিব জগতে আর কোনও জাতির কখনও হয় নাই। গ্রেটবৃটেন (ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড) এবং আয়ারলণ্ড লইয়া সম্মিলিত মূলরাজ্য— ইয়োরোপের এককোণে মহাসাগরমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু ইহারই শাখা-প্রশাখা এখন পৃথিবীময় ব্যপ্ত হইয়াছে। আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দক্ষিণ সাগরের বহুদ্বীপের বৃটিশ উপনিবেশগুলি বড় এক একটি দ্বিতীয় বৃটেনের মতই হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ ইংরেজ বা ইয়োরোপীয়; শাসনপ্রণালীও বৃটেনের শাসনতন্ত্রের অনুরূপে গঠিত এবং অধিবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক উপনিবেশে আমাদের বড়লাটের মত একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা কয়েক বৎসরের জন্য প্রেরণ করেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজশক্তির প্রতিনিধি-রূপে থাকিয়া উপনিবেশের পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে পার্লামেণ্টের অনুমোদিত মন্ত্রী সভার দ্বারা পরিচালিত শাসনকার্য্যের উপরে সাধারণভাবে একটা কর্ত্তৃত্ব করেন। ইহা ব্যতীত আর কোনওরূপ প্রভুত্ব ঔপনিবেশিক

মানসপত্র।

সরস সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা—মাঘ, ১৩২১।

বিষয় সূচি

দ্বিতীয় অংশ—আলোচনা, প্র   ্রাদি।

চিত্র সূচি—

মালঞ্চ সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী।

১। মালঞ্চের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ডাকমাশুল সমেত ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

২। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসরের মধ্যে যিনি যখনই মালঞ্চের গ্রাহক হইবেন, বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখের সংখ্যা হইতেই তাঁহার নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইবে,—এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য ৩৲ টাকা দিতে হইবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন,—নাম ও ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই তাঁহাদের নামে ভি, পি, ডাকে পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। প্রত্যেক মাসের পত্রিকা সেই মাসের মধ্যেই বাহির হইবে। কোন মাসের সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। ভাল কোন গল্প কি আলোচনা সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ কেহ ফেরত চাহিলে পূর্ব্বে জানাইবেন এবং দয়া করিয়া তার জন্য মাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত হইলে, কোন সংখ্যায় বাহির হইতে পারে, যত শীঘ্র সম্ভব লেখককে জানান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মালঞ্চ।

Printed by Kshitindra Mohan Sen Gupta, Printer,
THE KAMALA PRINTING WORKS.
3, Kashi Mitter's Ghat Street.

(বিশেষ প্রয়োজনীয়)

মালঞ্চের গ্রাহকগণের

মতামতাদির জন্য

নিবেদন

মালঞ্চের উন্নতি—গ্রাহকবর্গের অনুগ্রহে মালঞ্চের প্রথম বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। এত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া এত অল্পদিনে 'মালঞ্চ' যে সাধারণের এরূপ সহানুভূতি পাইতেছে তাহার কারণ নিশ্চয়ই গ্রাহকগণের গুণ-গ্রাহিতা। মালঞ্চের উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব কি—মালঞ্চ কি উদ্দেশ্যে কিরূপ ভাবে গ্রাহকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে তাহার পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে মালঞ্চ এখনও নিখুঁত হয় নাই। কিন্তু সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহকগণ আমাদের নিম্নের প্রার্থনা দুইটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ণ করিলে মালঞ্চ দ্বিতীয় বর্ষে নিখুঁত হইবে ভরসা করিতে পারি।

কৈফিয়তঃ—আমাদের প্রার্থনা কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে মালঞ্চ বিলম্বে বাহির হয় বলিয়া অনেকে হয়তঃ আমাদের যে একটী ত্রুটী মনে করেন, সেই বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। মালঞ্চের প্রথম অর্থাৎ গত বৈশাখের সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হওয়ায় প্রতি মাসের সংখ্যা পরবর্ত্তী মাসে বাহির হইলেও প্রকৃত পক্ষে মালঞ্চ একমাস অন্তরই বাহির হইতেছে। ইহা ব্যতীত মুদ্রন, ছবির অঙ্কন, হাফটোন ব্লক প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য বিভিন্ন লোকের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় অনেক সময় আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত লোকের একের বা একাধিকের ত্রুটীতে সময় সময় বিলম্ব হইয়া পড়ে।

যাহা হউক আগামী বৈশাখ হইতে প্রতিমাসের সংখ্যা যাহাতে সেই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির করিতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এবং উপরোক্ত কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটিলে এই বৎসরের ফাল্গুনের সংখ্যা ফাল্গুনের মধ্যে ও চৈত্রের সংখ্যা চৈত্রের মধ্য ভাগে বাহির করিতে পারিব বলিয়া আশাকরি।

ভরশাকরি, সহৃদয় গ্রাহকগণ কেহ আমাদের এই দৃষ্টতঃ বিলম্বের জন্য ত্রুটী লইয়া থাকিলে আমাদের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়া মালঞ্চের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ভুলিবেন না।•

মালঞ্চের দোষ গুণ :—দোষ গুণের বিচার যে পাঠকের উপর তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা হয়তঃ দোষগুলি বুঝিতে না পারায় তাহা দূর করিতে পারি না। নিজের মুখের ন্যায় নিজের দোষ আমরা অনেকেই দেখিতে পাই না। যদিও গ্রাহকগণের এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করার পদ্ধতি নাই, তত্রাপি—

মালঞ্চের গ্রাহকগণের নিকট হইতে তাহা জানিয়া প্রতিকার করিবার আমাদের একান্ত বাসনা।

আমাদের গ্রাহকগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; কেননা, মালঞ্চের উদ্দেশ্য মহৎ—মালঞ্চের গ্রাহকগণও মহৎ কার্য্যের—প্রতিপোষক।

মালঞ্চের বিষয় সন্নিবেশ :—এ পর্য্যন্ত আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মালঞ্চ পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট ইহাই বুঝিয়াছি মালঞ্চের বিষয় সন্নিবেশ প্রণালী অন্যান্য মাসিক হইতে বিভিন্ন—এই সন্নিবেশ প্রণালী গ্রাহকের মনঃপূত কিনা জানা আবশ্যক।

মালঞ্চের বিষয় নির্ব্বাচন :—যে যে বিষয় গুলি মালঞ্চে প্রকাশিত হইতেছে পাঠকগণ অবশ্য তাহা ও তাহার উদ্দেশ্য জানেন। অন্য অনেক বিষয়ও থাকা আবশ্যক এবং প্রকাশিত হইতেও পারে—কিন্তু সকল বিষয়ের একই মাসিকে স্থান সঙ্কুলন হওয়া সম্ভব নহে। মালঞ্চে প্রকাশিত হইতেছে না, এরূপ কোন কোন বিষয় দেশের ও সর্ব্বসাধারণের উন্নতি ও উপকারের জন্য থাকা আবশ্যক পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন কি?

প্রার্থনা :—আন্তরিক ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত প্রত্যেক কার্য্যের উন্নতিই অনেক সময় ব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রাণপণ চেষ্টা আছে কিন্তু অর্থ সাহায্য ত গ্রাহকগণই করিতেছেন এবং তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছা, সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত মিলিত হইলে মালঞ্চ দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া যে বাঙ্গলা সাহিত্যের ও দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হইবে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিই আয় বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়—এদিকে আমরা আশাতীত রূপে কৃতকার্য্য হইলেও আমাদের সীমাবদ্ধ চেষ্টা অপেক্ষা গ্রাহকবর্গের সমবেত চেষ্টা যে বহুগুণেঅধিক কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব গ্রাহকবর্গ, পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য পাঠকগণের নিকট—

প্রার্থনা

তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক—

১। উপরিলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যত সত্বর সম্ভব তাঁহাদের মতামত আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিতে ভুলিবেন না।

২। তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে প্রত্যেকেই এই বৎসর অন্ততঃ ২।৩ জন করিয়া নূতন গ্রাহক করিয়া দিতে পারেন তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা করিবেন। এইজন্য প্রতি সংখ্যায় ২খানা করিয়া অর্ডার কার্ড বা নূতন গ্রাহকের জন্য আদেশ পত্র দেওয়া হইল।

[শেষোক্ত প্রার্থনাটিতে কেহ বিরক্ত হইবেন না—মালঞ্চের গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক গণকে মালঞ্চের উপকার করিতে বলার কারণ তাঁহাদের ন্যায় আগ্রহের সহিত কে চেষ্টা করিবে?]

ভরশা করি এই সংখ্যায় সহিত প্রেরিত অর্ডার কার্ড ২ খানি সত্বরই প্রতি গ্রাহকের চেষ্টায় পূর্ণ হইয়া আমাদের আশা সফল করিবে। নিবেদন ইতি—

একান্ত বশম্বদ

মাঘ ১৩২১ সাল। মালঞ্চ কার্য্যাধ্যক্ষ।